বাংলা
ভাষাতত্ত্বের
ইতিহাস

বাংলা মঙ্গলকাব্যে
ইতিহাস
তৃতীয় সংস্করণ

মায়ের হাতে
দিলাম

আলোচনায় সহায়ক হইয়াছে। জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণের স... একখানা
শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থখানি কলিকাত...নে সাধায়
হইতে প্রকাশিত হইবার পূর্বেই, ইহার মুদ্রিত ফাইলগুলি আমা...ধারাবাহিক
সুযোগ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। বঙ্গীয়-লোক-সংস্কৃতি-পরিষদে...র অনেক
নাটোরের মহারাজ-কুমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিৎ রায় মহাশয় একখ...ধর্মের
সন্ধান আমাকে বলিয়া দিয়া পরম উপকার করিয়াছেন—এতদ্ব্যতীত না...ভাগ্যও
তাঁহাদের নিজস্ব পুঁথি-সংগ্রহটিও তিনি সর্বদা আমার জন্য উন্মুক্ত রা...নদুর্গা,
কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক আমার সহপাঠী বন্ধু শ্রীযুক্ত ...হানীয়
নিয়োগী মহাশয় যদি পুস্তকখানির মুদ্রণ-কার্য সম্পর্কিত সমস্ত দায়িত্বের ভা...র্মের
না লইতেন, তাহা হইলে ইহা প্রকাশিত হইতে যে আরও কত বিলম্ব হইত...াজ
বলিতে পারি না।

পুস্তকখানি যাহাতে সাহিত্যের ইতিহাসের নামে গ্রন্থ-তালিকা ও সঙ্কলন মা...
না হয়, এই বিষয়ে এই সংস্করণে অধিকতর লক্ষ্য রাখিয়াছি। এই হিসাবে ইহাতে
বাংলা প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার সনাতন পথ বহুলাংশে পরিত্যক্ত
হইয়াছে। যাহা পুরোহিতের বিধি ও গায়েনের পুঁথির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল,
তাহা উচ্চতর সাহিত্যের বিচার দ্বারা এখানে পরীক্ষা করিয়াছি;—অপার্থিব
দেবতার অলৌকিক মাহাত্ম্য মাত্র বলিয়া যাহা বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজ
কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহার ভিতর পার্থিব মানবের চিরন্তন সুখদুঃখ-বেদনার
সন্ধান করিয়াছি,—ইহাতে কতদূর সফল হইয়াছি তাহা সুধী পাঠকবৃন্দ বিবেচনা
করিবেন।

এই গ্রন্থ রচনার শ্রম আমার ব্যর্থ হয় নাই। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশি...
হইবার সঙ্গে সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে ভাষায় এই ...
পরিচয় গ্রন্থকারকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, তাহাই ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার
বলিয়া মনে করি। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তকখানিকে ...
এম. এ. পরীক্ষার ও শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা-সংসদের অন্য পরীক্ষার
পাঠ্যরূপে অনুমোদিত করিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

কলিকাতা
মহাষ্টমী, ১৩৫৭ সাল

আলোচনা
অন্তর্গত উ
নিজের ম

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

নাই। দ্যালয়ে বাংলায় এম. এ. ও অনার্স শ্রেণীতে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধিঅধ্যাপনা করিতে যে সমস্ত উপকরণ একত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম, রসগ্রাহিহারই কতকাংশের উপর ভিত্তি করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে।

যাহাতে ইহা কেবল নীরস পাঠ্যবস্তুর তথ্যালোচনায় পর্যবসিত না হয় কেও লক্ষ্য রাখিয়াছি। ইহা স্বীকার্য যে, মধ্যযুগের বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইলেও সেই যুগের এই একটি বিষ বিরাট কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটি বিক্ষিপ্ত আলোচনা ব্যতীত সমগ্রভাবে ঐতিহাসিক আলোচনা আজ পর্যন্তও হয় নাই। এই পুস্তকখানির কলেবর দেখিয়াই মধ্যযুগে এই উপেক্ষিত বিশিষ্ট একটি সাহিত্য-বস্তুর গুরুত্ব সম্বন্ধে কতক আভাস পাওয়া যাইবে। বর্তমান সময়ে এই পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য সম্বন্ধে এই পুস্তকের 'পরিচায়িকা'য় যাহা উক্ত হইয়াছে, তদতিরিক্ত আমার বক্তব্য আর কিছু নাই ; ইহা রচনা করিয়া আমি যদি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি অতি প্রয়োজনীয় অথচ এ যাবৎ উপেক্ষিত বিষয়-বস্তুর উপর সামান্যও আলোকপাত করিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক মনে করিব।

এই পুস্তকখানি রচনা করিতে গিয়া যে কতকগুলি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি, তাহাদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। গ্রন্থভাগে উল্লেখ করিয়াছি, মঙ্গল-সাহিত্য প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িক প্রেরণা হইতে জাত, সেইজন্য ইহাদের উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা করিতে ইহাদের সহিত সম্পৃক্ত ধর্ম ও লোকাচারগুলি আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বাংলার লৌকিক ধর্মের কোন ধারাবাহিক প্রামাণ্য ইতিহাস আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন লৌকিক ধর্মাচার ও দেবতার অস্তিত্ব রহিয়াছে, ইহাদের সহিত পৌরাণিক হিন্দুধর্মের কোন সম্পর্ক নাই,—ইহারা প্রাক্-আর্য সমাজ-সম্ভূত। ইহাদের আলোচনা দ্বারা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি অতি মূল্যবান্ অধ্যায় সংযোজিত হইতে পারে। বাংলার নৃতত্ত্ব,

জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়ও ইহার মূল্য অপরিসীম। কিন্তু একমাত্র সংক্ষিপ্ত জিলা 'গেজেটিয়র', আদম শুমারির বিবরণ ও স্থানে স্থানে সামান্য কয়েকটি বিক্ষিপ্ত আলোচনা ব্যতীত এই বিষয়ের একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর ধারাবাহিক ইতিহাস আজ পর্যন্তও রচিত হয় নাই। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের অনেক অঞ্চলেই খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদিগের অনুগ্রহে এই জাতীয় স্থানীয় লৌকিক ধর্মের বিবরণ কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশের পক্ষে এই সৌভাগ্যও হয় নাই। বাসুলী, শীতলা, জড়াজড়ি, ডরাই বিষহরী, গারসী, সুবচনী, বনদুর্গা, ঘেঁটু, ভাদু, ওলাঝোলা, করমপুরুষ, ঘাগরবুড়ি, কালাঝড়ে প্রভৃতি অসংখ্য স্থানীয় দেবতা বাংলার নানাস্থানে আজিও পূজিত হইতেছে। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের ব্যাপক প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া ইহাদের অস্তিত্ব প্রাচীনতম কাল হইতে আজ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবেই রক্ষা পাইয়া আসিতেছে। ইহাদেব ইতিহাস দূরের কথা, ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয় নাই। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-বৈষ্ণব-নিষেবিত সমাজই বাংলার সমাজের সম্পূর্ণ পরিচয় বহন করিতে পারে না, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের রচয়িতৃগণ এই একটি অতি মূল্যবান্ কথা এ পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। সেইজন্য উচ্চতর বর্ণের সমাজের বাহিরে তাঁহারা আর দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পান নাই। এই উপেক্ষা হইতেই বাংলার সমাজের একটা অতি মৌলিক দিক্ উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। এই গ্রন্থে যথাসাধ্য বাংলার সেই প্রাচীনতম লৌকিক ধর্মগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কারণ, মধ্যযুগের সাহিত্যকে মধ্যযুগের এই লৌকিক ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করা যায় না। সেইজন্য মধ্যযুগের সাহিত্যের আলোচনায় তৎকালীন সমাজের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনাও অপরিহার্য হইয়া উঠে। এই বিষয়ে আমাদের বাঙ্গালার ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ব-জাতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ যদি অগ্রসর হইয়া সহায়তা করেন, তাহা হইলেই এই যুগের সাহিত্যের ইতিহাসও তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সম্পূর্ণরূপে গঠন করা যায়।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনার আর একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, এই সম্বন্ধে অধিকাংশ পুস্তকই আজ পর্যন্ত অমুদ্রিত। এমন কি যাহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিতও হইয়াছে, তাহাও উপযুক্ত সম্পাদনার অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এমন কি, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের একখানি

নির্ভরযোগ্য সংস্করণ আজিও প্রকাশিত হয় নাই। অথচ সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান হইতেও এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তকে চিত্রসংযোগ করিয়া, কিংবা বাঁধাই ও কাগজের উৎকর্ষদ্বারা প্রাচীন কোন গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না। প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনায় যে অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহা কেহ স্বীকার করিতে সম্মত না হইয়া আপাতরমণীয় রূপে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা সাধারণের মধ্যে গ্রন্থ প্রচারের সহায়তা হইলেও, এই শ্রেণীর মুদ্রিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কোন মৌলিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় না। অতএব এই গ্রন্থরচনায় আমি তথাকথিত মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে বিশেষ কিছুই সাহায্য লাভ করিতে পারি নাই। অমুদ্রিত পুঁথির উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই নিজস্ব যথাসম্ভব সতর্ক বিচার-বুদ্ধি লইয়া অগ্রসর হইয়াছি।

অনেক স্থলেই কবিদিগের বংশধরগণ অদ্যাপি বর্তমান আছেন, কিন্তু তাঁহারাও কবিদিগের সম্বন্ধে সাধারণ অপেক্ষা অধিক সংবাদ রাখেন না। মনসা-মঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি বিজয়গুপ্তের বংশধরগণ আজিও বরিশাল জিলার গৈলা গ্রামে বসবাস করিতেছেন। বিজয়গুপ্তের বংশধর বলিয়া পরিচিত প্যারিমোহন দাস মহাশয় বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বলিয়া যে পুস্তক মুদ্রিত করিয়া নানা চিত্রে সুশোভিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার এক-তৃতীয়াংশ পদই স্বতন্ত্র কবির ভণিতাযুক্ত, অধিকাংশ পদে কোন কবিরই ভণিতা নাই। সামান্য কয়েকটি পদে বিজয়গুপ্তের ভণিতা পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্তের অমুদ্রিত পুঁথিগুলিরও একই অবস্থা। বংশধরদিগের গৃহে রক্ষিত কবির গ্রন্থখানি এত বিকৃত হইবার কি কারণ থাকিতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না। পদ্মাপুরাণের অন্যতম প্রধান কবি নারায়ণদেবেরও বংশধরগণ অদ্যাপি বর্তমান আছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহাদের গৃহেও সন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহাদের কাছে নারায়ণদেবের যে পুঁথি রক্ষিত আছে, তাহার মধ্যেও অনেক স্বতন্ত্র কবির ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন কবির ভণিতাযুক্ত এই প্রকারেরই একটি পুঁথি নির্বিচারে মুদ্রিত করিয়া দিয়া নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই সম্পর্কে উল্লেখ করিতে পারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার বিশ্বাস এম. এ. মহাশয় কবির জন্মভূমির অনতিদূরে এক স্থানে নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের একখানি সম্পূর্ণ পুঁথির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন বলিয়া

জানাইয়াছেন। তাহার প্রতিলিপিও তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে এমন কোন স্বার্থত্যাগী প্রতিষ্ঠান নাই, যাহা হইতে এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে। ময়মনসিংহের প্রবীণ উকিল আজন্ম সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মজুমদার বি. এল. মহাশয়ও নারায়ণদেবের একখানি সম্পূর্ণ পুস্তক উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু একই কারণে তাহাও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না।

এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও এই পুস্তকখানি রচনা করিবার পক্ষে আমার বিশেষ কতকগুলি সুবিধা লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। প্রথমতঃ পদ্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গলের ব্যাপক প্রচার-ক্ষেত্র পূর্ব-ময়মনসিংহের গীতি-ভূমিতে আমার জন্ম। আশৈশব নারায়ণ-দ্বিজবংশীর পদ্মাপুরাণ গান শুনিয়া আসিতেছি। স্থানীয় সামাজিক জীবনের উপর যে ইহাদের প্রভাব কত ব্যাপক তাহা শুধু পুস্তক পাঠের অভিজ্ঞতা ব্যতীতও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেও অনুভব করিয়াছি। সেইজন্য এই সমস্ত বিস্মৃতপ্রায় কবিদিগের পরিচয় সংগ্রহ ও সাহিত্যের বিচারে তাঁহাদের কাব্যের মূল্য নিরূপণ করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনেক দিন হইতেই মনের মধ্যে জাগিয়াছে। অতঃপর কর্মব্যপদেশে ধর্মমঙ্গলকাব্যের উদ্ভব-ভূমি রাঢ়দেশের কেন্দ্রস্থলে চারি বৎসর কাল বাস করিবার সুযোগ লাভ করি। ইতিপূর্বে ধর্ম-সাহিত্য ও পশ্চিম রাঢ়ের ধর্ম-পূজা সম্বন্ধে পুঁথিপত্রে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, ব্যক্তিগত ভাবে তাহাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সার্থক করিবার সুযোগ পাই। ইহা হইতেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত এই মঙ্গলকাব্যগুলির বিস্তৃত বিবরণ রচনা করিবার ইচ্ছা দৃঢ়তর হয়। এই পুস্তকে আমার এই প্রকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলই বর্ণনা করিতে পারিয়াছি বলিয়া ইহা এই বিষয়ের নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য তথ্য বলিয়া দাবী করিতে পারি।

ধর্মমঙ্গল সম্বন্ধে আমার বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার অধিকার ইহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পূর্বেই কতক অর্জন করিয়াছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. অনার্স শ্রেণীতে পাঠ করিবার কালীন এই বিষয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তির পাদমূলে বসিয়া অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। 'ধর্মপূজা-বিধানে'র সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ, 'শ্রীধর্ম-পুরাণে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ. এবং 'চণ্ডীমঙ্গল-

বোধিনী'-প্রণেতা ও 'শূন্য-পুরাণে'র সম্পাদক স্বর্গীয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. মহোদয়গণ আমার অধ্যাপক। তাঁহাদের সাহচর্যে আসিয়া এই বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহা এই সম্পর্কে কখনও উপেক্ষণীয় নহে। আমার এই পুস্তক প্রকাশ করিবার মূলে তাঁহাদের প্রেরণা গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁহারা আমাকে বহু মূল্যবান্ উপকরণ ও উপদেশাদি দ্বারা সর্বদা উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এক প্রকার অসম্ভব। অনেকের কাছেই আমার ঋণ এত গভীর যে, তাঁহাদের শুধু নামোল্লেখের লৌকিকতায় ধৃষ্টতারই মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

নারায়ণদেবের বংশধর বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার গৃহে রক্ষিত পদ্মাপুরাণের পুঁথিখানি দেখিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। তিনি আমার অনুরোধে তাঁহাদের বংশলতার অনুলিপি আমাকে পাঠাইয়া দেন। তাহাই গ্রন্থভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব-ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ পল্লীগীতি-সংগ্রাহক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের নিকট হইতে কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর বা 'পীরের পাঁচালী' ও দ্বিজবংশী সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি। কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু মহাশয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার হইতে আমাকে কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আলোচনার সুযোগ দিয়া পরম উপকার করিয়াছেন। ঢাকা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় শুধু যে তাঁহার বহুমূল্য পুস্তকাগার সর্বদা আমার জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি তাঁহার এই বিষয়ে ব্যক্তিগত বহু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা আমার বহু সংশয় দূর করিয়া দিয়াছেন। বাংলার মধ্যযুগের ঐতিহাসিক জ্ঞানের উপর তাঁহার তৎকালীন সাহিত্যের জ্ঞান সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, এই গ্রন্থ রচনায় তাঁহার সান্নিধ্য লাভ আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছে। বিশেষতঃ এই পুস্তকের আলোচনায় অনেক স্থলেই বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্যের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এই সম্বন্ধেও তাঁহার সহায়তা আমার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান্ হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালার গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. মহোদয় আমাকে সর্বদা নানা পুঁথির সন্ধান বলিয়া দিয়া ও নিজে সন্ধান করিয়া আমার প্রয়োজনীয় অংশ পুঁথি হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়া আমার অনেক শ্রম লাঘব করিয়াছেন। বিশেষতঃ হরিদত্ত সম্বন্ধে

তাঁহার একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধও আমাকে ব্যবহার করিবার সুযোগ দিয়াছেন। তাঁহারই সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালার পদ্মাপুরাণের বিরাট সংগ্রহ হইতে হরিদত্ত ও ষষ্ঠীবর সম্বন্ধে অনেকগুলি নূতন তথ্য আবিষ্কার করা গিয়াছে।

এই গ্রন্থ রচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহোদয় ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের নিকট হইতে যথেষ্ট উপদেশ ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি। আমার এই পুস্তক রচনায় যদি কোন কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মূলে তাঁহাদেরই নিকট হইতে লব্ধ শিক্ষার কথা চিরদিন গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব। এতদ্ব্যতীত বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ননীলাল সেনগুপ্ত এম. এ., ও বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমোদলাল পাল এম.এ'র নিকট হইতেও বহু পরামর্শ ও উৎসাহ পাইয়াছি।

এই পুস্তক রচনায় আমি আমার ছাত্রদিগের নিকট হইতেও যে পরিমাণ সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাহাও নিতান্ত নগণ্য নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কৃতী ছাত্র আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ মথুরেন্দ্রনাথ নন্দী বি. এ. ও শ্রীমান্ বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী এম. এ. প্রুফ সংশোধন ও কপি-তৈয়ার কার্যে আমাকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। এই সম্পর্কে আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মুহম্মদ আলি বি. এ. হবিবুর রহ্‌মান ও শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার সেন শর্মার নিকটও যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। এইভাবে দশজনের সহায়তায় এই কার্য অপেক্ষাকৃত অল্প দিনেই সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

আশ্বিন, ১৩৪৬ সাল

বিষয়-সূচী

ভূমিকা

উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য ১-৯৮

মঙ্গলকাব্য কি ? ১-৩, পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য ৪-১০, লৌকিক ধর্ম ও মঙ্গলকাব্য ১১-১৭, বৈষ্ণব ধর্ম ও মঙ্গলকাব্য ১৮-২১, অনুবাদ সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য ২২-২৪, ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্য ২৫-২৯, পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্য ৩০-৩৪, বিজয়কাব্য ও মঙ্গলকাব্য ৩৫, লোক-কথা ও মঙ্গলকাব্য ৩৬-৪১, ইতিহাস ও মঙ্গলকাব্য ৪২-৪৫, সাহিত্যগুণ ৪৬-৪৯, কাব্যরূপ ও কাব্যভাষা ৫০-৫২, জাতীয় মূল্য ৫৩-৫৬, অলৌকিকতা ৫৭-৬১, সাধারণ বৈশিষ্ট্য ৬২-৭৯, শ্রেণীবিভাগ ৮০-৮২, মঙ্গল নামের উৎপত্তি ৮৩-৮৬, জাগরণ ৮৭-৮৯, প্রচার ৯০-৯৩, যুগবিভাগ ৯৪-৯৮

প্রথম অধ্যায়

ৌকিক শৈবধর্ম—শিবের গীত—শিবমঙ্গল কাব্য ৯৯-১৫৯

প্রাগ্‌বৈদিক দেবতা শিব ৯৯, বাংলার সমাজে পৌরাণিক শৈব ধর্ম ১০০, কৃষকের দেবতা ১০১, কোচ জাতির সমাজে শিব ১০২, গৃহস্থ শিব ১০৩, রাঢ় দেশের শিব বা ভৈরব ১০৪, নাথ ধর্ম ও সাহিত্যে শিব ১০৫, ধর্মসাহিত্যে শিব ১০৭, শিবের গাজন ১০৯, পাঁচু ঠাকুর ১১১, শিবের গীত ১১৩, শিবের ছড়া ১১৪, শিবের চাষ ১১৫, শিবের বিবাহ ১১৮, শিবমঙ্গল কাব্যের বিষয় ১২০-২৩, শিবমঙ্গলের কবিগণ ১২৪-১৫৯ : রামকৃষ্ণ রায় ১২৪-৩৭, শঙ্কর কবিচন্দ্র ১৩৮-১৪০, রামেশ্বর ভট্টাচার্য ১৪১-৪৭, দ্বিজ কালিদাস ১৪৮, দ্বিজ মণিরাম ১৪৯-৫০ বিবিধ কবি ১৫১-৫২, 'মৃগলুব্ধ' ১৫৩-৫৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতে সর্পপূজার উৎপত্তি—বাংলার মনসা পূজা—মনসামঙ্গল কাব্য—মনসামঙ্গলের কবিগণ ১৬০-৩২৬

শাক্তধর্মের দুইটি ধারা—আর্য ও প্রাগার্য ১৬০, বাংলায় লৌকিক শাক্ত ধর্মের পুনরুত্থান ১৬১, ভারতে সর্পপূজার উৎপত্তি ১৬৩, ভারতে সর্পপূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ১৬৩, নাগ ও সর্প ১৬৪, নাগপূজা ও সর্পপূজা ১৬৫, জীবিত

সর্পের পূজা ১৬৬, সর্পপূজা ও ভারতের আদিবাসী ১৬৮, গৃহ্যসূত্রে সর্পসংস্কার ১৬৯, মহাভারতে নাগ ১৭০, ৺১৭২, স্ত্রীদেবতার পরিকল্পনা ১৭২, বাংলার অনার্য সংস্কার ১৭৩, সর্পপূজা ১৭৩, প্রস্তরে খোদিত সর্পমূর্তির পূজা ১৭৫, জাঙ্গুলী তারা ১৭৬ জাঙ্গুলী তারা ও অথর্ববেদের কিরাত-কন্যা ১৭৯, জাঙ্গুলী ও মনসা ১৭৯, মনসানামের উৎপত্তি ১৮০, রাজগীরের মনিয়ার মঠ ১৮১, উত্তর ভারতের মনসা দেবী ছোটনাগপুরের আদিবাসী ও মনসা ১৮৩, দক্ষিণ ভারতের সর্পের দেবী,—মুদামা, মনে মঞ্চাম্মা ১৮৪, মুদামা ও মনসা ১৮৬, বাংলার ভাস্কর্যে মনসা ১৮৮, পুরাণে মনসা ১৯২, মনসা-মঙ্গলের কাহিনী ১৯ গারড়ী—নেতার কাহিনী ১৯৯, কাহিনীর উদ্ভব-ক্ষেত্র ২০০, বিহারে কাহিনী ২০৪, দাক্ষিণাত্যের অম্মবরুর কাহিনী ২০৯, রাঢ়ে মনসা-ম কাহিনী ২১২, 'গাছ বেড়া' অনুষ্ঠান ২১৫, মনসার ব্রতকথা ২১৬, মনসা-মঙ্গল কাহিনীর উদ্ভব-কাল ২১৯, মনসা-মঙ্গলের কবিগণ ২২১-৩১৫ : হরিদত্ত ২২১-২৭, নারায়ণ দেব ২২৭-৩৮, বিজয়গুপ্ত ২৩৮-৪৯, বিপ্রদাস ২৪৯-৫২, গঙ্গাদাস সেন ২৫২-৫৩, দ্বিজ বংশীদাস ২৫৩-৬১, কালিদাস ২৬১-৬২, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ২৬২-৬৮, জগজ্জীবন ঘোষাল ২৬৮-৮৬, ষষ্ঠীবর দত্ত ২৮৬-৩০৩, রামজীবন ৩০৩-৪, জীবন মৈত্র ৩০৪-৩০৭, দ্বিজ রসিক ৩০৭-৮, বিষ্ণু পাল ৩০৮ বাণেশ্বর রায় ৩১১-১৩, বিবিধ কবি ৩১৩-১৫, মনসা-মঙ্গলের পদ-, ৩১৫-১৬, চরিত্র-বিচার ৩১৬-২৬

তৃতীয় অধ্যায়

লৌকিক চণ্ডীপূজার ইতিহাস—চণ্ডীমঙ্গল কাব্য—চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ ৩২৭-৫০০

চণ্ডীর প্রকৃতির বিভিন্নতা ৩২৭, বাংলার প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজ ও বাংলার লৌকিক দেবদেবী ৩২৮, ওরাওঁ সমাজের চাণ্ডী ৩২৯, চাণ্ডী ও চণ্ডী ৩৩১, বজ্রতারা ও চণ্ডী ৩৩৪, বজ্রধাত্বীশ্বরী ৩৩৬, বাসুলী ৩৩৬, বিশালাক্ষী ৩৩৭, বিসলমরী ৩৪০, মঙ্গলচণ্ডী নামের উৎপত্তি ৩৪২, আদ্যা ও চণ্ডী ৩৪৪, ডাকিনী দেবতা ৩৪৫, 'যোষিতামিষ্ট দেবতা' ৩৪৭, চণ্ডীপূজার প্রবর্তন-কাল ৩ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য—কালকেতুর উপাখ্যান ৩৫৪, ধনপতি সদাগরের উ

, ৩৬১, চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ ৩৬৫-৪৬৯, মাণিক দত্ত
াধব ৩৭৩-৮৬, মুকুন্দরাম ৩৮৬-৪১৫, দ্বিজ রামদেব ৪১৫-
রাম সেন ৪২৪-২৮, হরিরাম ৪২৮-২৯, ভারতচন্দ্র রায় ৪২৯-৫৩,
জয়নারায়ণ সেন ৪৫৩-৫৬, ভবানীশঙ্কর ৪৫৬-৫৮, অকিঞ্চন চক্রবর্তী ৪৫৮-৬৭,
জনার্দন ৪৬৭-৬৯, বিবিধ কাব্য ৪৬৯-৭০, 'বাসুলী-মঙ্গল' ৪৭০, 'গোসানী-মঙ্গল' ৪৭৭, চরিত্র-বিচার ৪৮৩, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিণতি—শাক্ত পদাবলী
১১১৪-৫০০

চতুর্থ অধ্যায়

রে ইতিহাস—ধর্মমঙ্গল কাব্য—ধর্মমঙ্গলের কবিগণ ৫০১-৬৫৪

ঠাকুরের পূজা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত ৫০১, ইহার ক্রটি ৫০২, ধর্মপূজার ভৌগোলিক সীমা ৫০২, রাঢ় দেশ ও ধর্মপূজা ৫০৪, ধর্মঠাকুর কে ৫০৪, বিভিন্ন মতবাদ ৫০৫, কূর্মমূর্তি ৫০৬, ধর্মঠাকুরের মহিমা ৫০৯, বিভিন্ন নাম ৫১০, ধর্মপণ্ডিত ডোম ৫১১, পূজার বিভিন্ন প্রণালী—নিত্যপূজা ৫১২, বার্ষিক পূজার বিবরণ ৫১৪, ঘর-ভরা উৎসবের বিবরণ ৫৩৪, ব্রাহ্মণ ও ডোমের অধিকার ৫৪০, অবিমঙ্গলের কাহিনী ৫৪৬-৫২, বাংলার পশ্চিমে প্রতিবেশী অঞ্চলে ধর্মপূজা ৫৫২, ছোটনাগপুরের আদিবাসী অঞ্চলে ৫৫৬, রেবন্ত ৫৫৮, ইতু ৫৫৯, ধর্মপূজা কাহার পূজা, ৫৬০ ধর্ম ও সূর্যপূজা ৫৬১, চড়ক ৫৬৬, ধর্মপূজায় মাটির ঘোড়া ৫৭০, সর্বশুক্ল ধর্মঠাকুর ৫৭১, আদিম সূর্যপূজা ৫৭৫, ধর্মঠাকুর ও ডোম জাতি ৫৭৬, ধর্মপূজায় সূর্যোপাসনার তিন ধারার মিশ্রণ ৫৮১, ঐতিহাসিকতা ৫৮৫-৬০৪, ধর্মমঙ্গলের কবিগণ ৬০৫-৪৩ : ময়ূরভট্ট ৬০৬-১১, আদি রূপরাম ৬১১, খেলারাম ৬১১-১২, মাণিকরাম ৬১২-১৯, রূপরাম ৬১৯-২২, শ্যাম পণ্ডিত ৬২২-২৩, সীতারাম ৬২৩-২৫, রামদাস ৬২৬-২৭, প্রভুরাম ৬২৭, ঘনরাম ৬২৮-৩৫, রামচন্দ্র ৬৩৬, সহদেব ৬৩৭, নরসিংহ ৬৩৯, হৃদয়রাম ৬৪০, গোবিন্দরাম ৬৪১, রামনারায়ণ ৬৪২, রামকান্ত ৬৪২, বিবিধ কবি ৬৪৩, কাব্যবিচার ৬৪৩

পঞ্চম অধ্যায়

বিধ মঙ্গলকাব্য ৬৫৫-৭৪৭

প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য ৬৫৫, কালিকা-মঙ্গল ৬৫৬-৬৯১,

কালিকাদেবীর উদ্ভব ৬৫৬, তাঁহার চরিত্র ৬৫৭, কাহিনী ৬৫৮-৫৯ : লোক-সাহিত্যে চোরের কাহিনী ৬৫৯, কালিকা-মঙ্গলের কবিগণ ৬৬৩-৬৯১ : কঙ্ক ৬৬৩, শ্রীধর ৬৬৫-৬৮, সাবিরিদ খাঁ ৬৬৯-৭২, গোবিন্দ দাস ৬৭২-৩, কৃষ্ণরাম ৬৭৪-৫, প্রাণরাম ৬৭৬, বলরাম ৬৭৬-৮, রামপ্রসাদ ৬৭৯-৮৩, ভারতচন্দ্র ৬৮৩-৮, নিধিরাম ৬৮৮-৯, দ্বিজ রাধাকান্ত ৬৮৯, কবীন্দ্র ৬৯০, শীতলা-মঙ্গল ৬৯২-৭১৭, শীতলা-মঙ্গলের কাহিনী ৬৯৮, শীতলা-মঙ্গলের কবিগণ : নিত্যানন্দ ৭০২, বল্লভ ৭০৫ ; ষষ্ঠীমঙ্গল ৭০৭-১৭, ষষ্ঠীর পরিচয় ৭০৭, হারীতী ও ষষ্ঠী ৭০৮, বার মাসের বার ষষ্ঠী ৭০৯, ষষ্ঠী-মঙ্গলের কাহিনী ৭১১, ষষ্ঠীমঙ্গলের কবিগণ : কৃষ্ণরাম ও রুদ্ররাম ৭১৩, শঙ্কর ৭১৪ ; সারদা-মঙ্গল ৭১৮-২৩, সারদা-মঙ্গলের কাহিনী ৭১৮, কাহিনীর উৎপত্তি ৭২২ ; রায়-মঙ্গল ৭২৪-৩৬, ব্যাঘ্রপূজার উদ্ভব ৭২৪, দক্ষিণ রায় ৭২৬, রায়মঙ্গলের কাহিনী ৭২৭, বনবিবির কাহিনী ৭৩১, রায়মঙ্গলের কবিগণ : মাধব আচার্য ৭৩২, কৃষ্ণরাম ৭৩২, অন্যান্য ব্যাঘ্রসম্পর্কিত রচনা ৭৩৫ ; সূর্য-মঙ্গল ৭৩৭-৭৪৬, সূর্যপূজার তিনটি ধারা ৭৩৭, মাঘমণ্ডল ৭৩৭, সূর্যের পাঁচালী ৭৩৯, বাংলার লৌকিক সূর্য-কাহিনী ৭৪৩, রামজীবনের 'আদিত্য চরিত' ৭৪৬, সূর্য-সম্পর্কিত অন্যান্য রচনা ৭৪৬, অন্যান্য মঙ্গলকাব্য ৭৪৭ ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঐতিহাসিক কাব্য ৭৪৮-৭৬৭

বাংলার ঐতিহাসিক কাব্যের বিকাশ ৭৪৮, গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ' ৭৪৯, ইহার কাহিনী ৭৪৯, ইহার ঐতিহাসিকত্ব ৭৫৩, কবির পরিচয় ৭৫৫, ভারতচন্দ্র রায়ের 'মানসিংহ কাব্য' ৭৫৬, ইহার কাহিনী ৭৫৮, কাব্যের ভিত্তি ৭৫৯, প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য ৭৬০, ভবানন্দ সম্পর্কিত প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য ৭৬১, কাব্যমূল্য ৭৬৫, বিজয়রামের 'তীর্থ মঙ্গল' ৭৬৬-৭৬৮, কবি ও কাব্যপরিচয় ৭৬৭ ।

পরিশিষ্ট

শব্দসূচী ৭৭১

ভূমিকা

মঙ্গলকাব্য কি ?

আনুমানিক খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যান-কাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। কিন্তু ইহা বাংলা দেশের একটি বিশেষ যুগের সাহিত্য-সাধনা হইলেও, ইহার সৃষ্টি-প্রেরণা কোন একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাস হইতে আসে নাই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া বাংলা দেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে। বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের বিস্তৃত ভিত্তির উপরই ইহাদের প্রতিষ্ঠা। খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খৃস্ট-পরবর্তী প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে বিবিধ মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলি যে উদ্দেশ্যে রচিত হয়, বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিও সেই উদ্দেশ্যেই সর্বপ্রথম রচিত হইতে আরম্ভ করে। মহারাজ অশোকের সময় হইতে সমগ্র ভারতময় যে বৌদ্ধধর্মের একাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহারই প্রতিক্রিয়ারূপে এতদ্দেশীয় জনগণের অবলম্বিত ধর্মবিশ্বাস ও হিন্দুধর্মের মূলগত আদর্শ এই উভয়ের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতে এক নবসংস্কার-প্রবুদ্ধ হিন্দুধর্মের উন্মেষ হইয়াছিল। সেই যুগে বেদ ও উপনিষদ্-বর্ণিত ব্যক্তিসত্তাহীন ভাব-সর্বস্ব দেবতাগণকে তাঁহাদের কল্পিত গুণাবলীর উপর বাস্তবরূপ আরোপ করিয়া ভারতের কর্মভূমিতে অবতীর্ণ করাইতে হইল। কারণ, ইতিপূর্বে বুদ্ধদেব ব্যক্তিগত কর্মসাধনার ভিতর দিয়া একটা প্রতিকূল সমাজের বুকে নিজের ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন,—দুশ্চর তপস্যা ও বহু কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়া মানবের দুঃখ-বেদনাকে আপন অন্তরে অনুভব করিয়াছেন। তাই এ'ক' আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বৈদিক হিন্দুধর্মের যখন সংস্কারের গুলির মহৈল, তখন হিন্দুর দেবতাদিগকেও আর কল্পনার স্বর্গলোকবিহারী কাহিনীরবা চলিল না। তাঁহাদিগকেও মূর্তি ধারণ করাইয়া মর্ত্যের সমাজে

মানবের মেলায় নিজেদের কর্তব্য সাধন পথে অগ্রসর করাইতে হইল। এইরূপ বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়াই খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে সংস্কৃত পুরাণগুলি রচিত হইতে থাকে—এই ভাবে প্রত্যেক পুরাণেই এক একজন কল্পিত কর্মশক্তিমান্ দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুধর্মে পৌত্তলিকতার জন্ম যে দিনই হইয়া থাকুক, পৌরাণিক যুগেই যে তাহার প্রকৃত প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা সর্ববাদিসম্মত।

বঙ্গদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলেও জানিতে পারা যায় যে, এই দেশে খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল। ইহার পূর্বে পালরাজগণ এই দেশে প্রায় চারি শত বৎসর রাজত্ব করেন। মধ্যভারতে যে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে আনুমানিক খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, বঙ্গদেশে সেই বৌদ্ধধর্মেরই শাখাবিশেষ নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেও অধিক দূর অগ্রসর হইতে হয় না। বঙ্গদেশের অনতিদূরবর্তী বিহার প্রদেশই বৌদ্ধধর্মের প্রথম উদ্ভব-ভূমি এবং মধ্যভারতের ব্রাহ্মণ্যসংস্কার বহুকাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের এই প্রথম উদ্ভব-ভূমি বিহার প্রদেশ অতিক্রম করিয়া বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে নাই। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে আর্যভাষার সহিত আর্যসংস্কারও কিছু কিছু এই দেশে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিতেছিল। এমন কি, খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চুয়াঙ্ উত্তর বঙ্গে মহাযান-হীনযান বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ইত্যাদির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মকেও বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী ধর্ম বলিয়াই লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি ইহাও স্বীকার্য যে, পরবর্তী বৌদ্ধ পালরাজগণের চারি শত বৎসর রাজত্বকালের মধ্যেও এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তেমন বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। যদিও পালরাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তথাপি পাল রাজত্বের শেষ অর্থাৎ খৃস্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিংবা সংস্কৃত ভাষার চর্চা তেমন ব্যাপকতা লাভ করে নাই।

পালরাজগণের সময় হইতেই সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের সহিত স্থানীয় কতকগুলি লৌকিক ধর্ম-সংস্কারের সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মিশ্র কতকগুলি লৌকিক ধর্মমতের উদ্ভব ভূমির সংলগ্ন পশ্চিম অঞ্চলে সেনরাজদিগের বহুকাল পর পর্যন্তও অস্ট্রিক

ভাষা-ভাষী জাতির প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সেনরাজদিগের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম এই দেশের সামাজিক জীবনের উপর ক্রমে ক্রমে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম তৎকালীন বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার সম্মুখীন হইয়া বিভিন্ন আদর্শের দিক হইতে আবার নূতন সংস্কৃতি লাভ করিতে লাগিল। এই ভাবেই দেশে বিভিন্ন লৌকিক ধর্মমতগুলির সৃষ্টি হয়। ক্রমে সমাজের উপর মূল হিন্দুধর্মের প্রভাব যতই প্রবল হইতে আরম্ভ করিল ততই এই বিভিন্নমুখী লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়গুলি এক কেন্দ্রগত আদর্শের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহারই ফলে বর্তমান বাংলার হিন্দুসমাজে পঞ্চোপাসক হিন্দুসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

সেনরাজগণের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে আরম্ভ করিলেও এতকালের দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতির যে উপাদানসমূহ এদেশের সমাজের একেবারে মজ্জায় গিয়া স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা একেবারে পরিত্যক্ত হইল না। সমাজে ক্রমে পুরাতন ধর্ম-বিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া নবাগত আদর্শের উপর আশা ও আশ্বাস স্থাপিত হইল সত্য, তথাপি রক্ষণশীল এই সমাজ পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিল না ; তাহারা নূতনকে যে ভাবে গ্রহণ করিল, তাহা পুরাতনেরই রূপান্তর মাত্র হইল—এই প্রদেশের প্রচলিত ধর্মসংস্কারই যুগোচিত পরিমার্জনা মাত্র লাভ করিয়া সমাজের অন্তস্তলে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতে লাগিল।

মধ্যযুগের বাংলার সমাজ এই নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি সংস্কারকে একসূত্রে গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কি ভাবে একত্রে লীন হইয়া আছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয়।

ন্দনহীন
াব্যগুলির
। এই প্রা
ষ্ট হইয়া উঠিয়া
এ'কথা সত্য
গুলির মধ্যেও
াহিনীর সম্পূর্ণ

পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য

বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন কাহিনী বাংলার যে সামাজিক স্তর হইতেই উদ্ভূত হউক না কেন, কালক্রমে তাহা শিক্ষিত হিন্দুসমাজের অনুশীলনের বিষয় হইবার ফলে তাহাদের উপর সংস্কৃত পুরাণগুলির প্রভাব দুর্নিবার হইয়া উঠে। মঙ্গলকাব্য আখ্যানমূলক রচনা, পুরাণের ভিত্তিও আখ্যায়িকা। এই সূত্রে মঙ্গলকাব্যের লৌকিক আখ্যায়িকার মধ্যে পৌরাণিক কাহিনীসমূহ আসিয়া প্রবেশ করিতে থাকে। কালক্রমে মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলি নির্দিষ্টসংখ্যক পালায় বিভক্ত হইয়া আটদিন, বারদিন কিংবা একমাস ব্যাপিয়া গীত হইবার একটি বিশেষ রীতি অবলম্বন করিল, তখন এই নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ করিবার জন্য মঙ্গলকাব্যের মৌলিক কাহিনীগুলির মধ্যে নির্বিচারে পৌরাণিক কাহিনী আনিয়া যোগ করা হইতে লাগিল। কিন্তু এই সকল পৌরাণিক কাহিনী কোন দিনই মঙ্গলকাব্যের মূল লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে সহজ সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ, পুরাণ এবং মঙ্গলকাব্য উভয়ের লক্ষ্য বিভিন্ন। সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, পুরাণের লক্ষ্য দেবতা এবং মঙ্গলকাব্যের লক্ষ্য মানুষ। পুরাণ একান্তভাবে অলৌকিকতাশ্রয়ী এবং মঙ্গলকাব্য প্রধানতঃ বাস্তবজীবনাশ্রয়ী। যে মঙ্গলকাব্য বাস্তব জীবন পরিত্যাগ করিয়া পুরাণের মত অলৌকিকতার উপরই একান্ত নির্ভর করিয়াছে, মধ্যযুগের বাংলার বিদগ্ধ সমাজে তাহার কোনও স্থান হয় নাই। অতএব যেখানে পুরাণের ব্যতিক্রম, সেখানেই মঙ্গলকাব্যগুলির সার্থকতা।

কিন্তু বাহিরের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, পুরাণের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের অন্ততঃ একটি বিষয়ে ঐক্য রহিয়াছে। পুরাণ বিশেষ কোন দেবতার মাহাত্ম্য-প্রচারমূলক রচনা, মঙ্গলকাব্যও তাহাই। তবে এই বিষয়ে সহানুভূর মধ্যে পার্থক্য আছে। পুরাণের মধ্যে দেবতাব মাহাত্ম্য আনুপূর্বিদশ শতাব্দীগায়েই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে—ইহার কোন মর্ত্য পরিচয় নাই। ইহারভ করে নাই তো, তাহার আচরণ দৈব, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের নায়ক স্বর্গভ্রষ্ট মানুষ, ছাযান বৌদ্ধধর্মে মানবিক। পুরাণে বিরোধের মধ্য দিয়া দেবতার আত্মপ্রতিষ্ঠা করিা হয়। মঙ্গলকাব্যের দেবতাকে মানুষের অবিশ্বাসকে জয় করিতে হয়; উদ্ভব দিয়া একটি উচ্চাঙ্গের নাটকীয় দ্বন্দ্ব বিকাশলাভ করিবার সুযোগ অস্ট্রিক

দেবতা তাঁহার মাহাত্ম্যে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবতা মানুষের স্বীকৃতি লাভ করিতে না পারিলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং পরোক্ষে মানুষকেই মঙ্গলকাব্যে বড় করা হইয়াছে। অতএব মঙ্গলকাব্য পুরাণ হইয়াও কাব্য, পুরাণের পুরাণ ব্যতীত আর কোন পরিচয় নাই।)

বিভিন্ন পুরাণ পর্যালোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে কালক্রমে সংস্কৃত পুরাণগুলির মধ্য দিয়া একটি বাঁধাধরা বিষয়-পরিবেশনের রীতি বিকাশ লাভ করিয়াছিল। 'কূর্মপুরাণে' পুরাণের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া ইহার এই পাঁচটি লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, প্রজা সৃষ্টি, রাজবংশ বা ঋষিবংশ, মন্বন্তর, রাজবংশ বা ঋষিবংশজাত চরিত্রের কার্যাবলী বর্ণন পুরাণের এই পাঁচটি লক্ষণ। পুরাণ রচনায় এই পাঁচটি লক্ষণ কালক্রমে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয়। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র 'চরিত্র' বা রাজবংশ- বা ঋষিবংশ-জাত কোনও চরিত্রের কার্যাবলী বর্ণনা করিবার যে সামান্য সুযোগটুকু রহিয়াছে, কেবলমাত্র তাহার মধ্য দিয়াই সামান্য লৌকিক তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা এত দৈবভাব-ভারাক্রান্ত যে তাহার ভিতর হইতে কোনও মানবিক পরিচয় উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। মঙ্গলকাব্যগুলিও কালক্রমে রচনা ও বিষয়-বস্তু পরিবেশনের দিক হইতে একটি বিশিষ্ট আদর্শ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু মর্ত্য-জননীর গর্ভে আশ্রয় লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবির স্বর্গবিহারী কল্পনা মর্ত্যের ধূলামাটিতে নামিয়া আসিয়াছে। পুরাণ-রচয়িতার দৃষ্টি কখনও মর্ত্যাভিমুখী হইবার সুযোগ পায় নাই। বিধিবদ্ধ হইবার ফলে একান্ত দৈব-ভাবাক্রান্ত পুরাণগুলি প্রাণ-স্পন্দনহীন হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মানুষের সঙ্গে সংস্রব রক্ষা করিবার ফলে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এই প্রাণ-স্পন্দনের অভাব কোনদিনই অনুভব করা যায় নাই। এই প্রাণের পরিচয় কখনও ইহার অন্তরে, কখনও ইহার বাহিরে চিরদিনই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

এ'কথা সত্য যে, পুরাণের উক্ত পাঁচটি লক্ষণের কিছু কিছু কালক্রমে মঙ্গলকাব্য-গুলির মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা মঙ্গলকাব্যের মূল কাহিনীর সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত কিংবা তাহার অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে নাই—

বহিরঙ্গের অনাবশ্যক ভার-স্বরূপই হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্য 'দেব-খণ্ড' ও 'নর-খণ্ড' নামক দুইটি সুস্পষ্ট খণ্ডে বিভক্ত। 'দেবখণ্ড' পুরাণ ও 'নর-খণ্ড' কাব্য। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই পুরাণ ও কাব্য পরস্পর এই প্রকার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া স্থানলাভ করিয়াছে। কিন্তু পুরাণ পুরাণই, তাহার কাব্যগত কোন পরিচয় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাণের প্রেরণা হইতেই মঙ্গলকাব্যের জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু শত শত বৎসর অনুশীলনের ফলেও পুরাণ পুরাণই রহিয়া গিয়াছে; কারণ, মানুষের সঙ্গে পুরাণ কখনই কোন সম্পর্ক স্থাপন করে নাই; কিন্তু মানুষের কাহিনী লইয়া সূত্রপাত হইবার ফলে মঙ্গলকাব্য পুরাণের স্তর অতিক্রম করিয়া কাব্যের স্তরে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু এ'কথাও সত্য যে, কাব্যের পথে ইহার ক্রমোন্নয়ন অব্যাহত থাকিতে পারে নাই; মঙ্গলকাব্যের মৌলিক প্রেরণা নিঃশেষিত হইয়া যাইবার ফলে পৌরাণিক আদর্শ ইহাকে কালক্রমে পুনরায় লক্ষ্যচ্যুত করিয়াছিল—তখন কেবল পুরাণের অনুকরণ নহে, পুরাণের অনুবাদও বাংলা সাহিত্যকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

পুরাণ-রচনার প্রেরণা হইতেই মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব হইলেও এ' কথা সত্য যে, পৌরাণিক আদর্শ কিংবা পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের কোনদিনই অটুট নিষ্ঠা প্রকাশ পায় নাই। অর্থাৎ তাঁহারা পৌরাণিক আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য কখনও লৌকিক উদ্দেশ্যকে বলিদান করেন নাই। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, মনসা-মঙ্গলে মহাভারতোক্ত জরৎকারু অতি সহজেই মনসাদেবীতে পরিণতি লাভ করিলেন, চণ্ডীমঙ্গলে যোগীন্দ্র শিব দাম্পত্যজীবনের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, শিবমঙ্গলে ত তিনি হাতের ত্রিশূল ভাঙ্গাইয়া লাঙ্গল জোয়াল প্রস্তুত করিতেছেন। অতএব পৌরাণিক আদর্শ মঙ্গলকাব্যের কবিদিগকে কোনদিনই লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। পুরাণের মধ্যে কেবলমাত্র যে কাহিনীই আছে, তাহা নহে—পুরাণ একাধারে স্মৃতিশাস্ত্র ও দর্শন। পুরাণের কাহিনীর দিকটা মঙ্গলকাব্যের উপর কতকটা প্রভাব বিস্তার করিলেও, যে দিকটায় ইহার স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা আছে, মঙ্গলকাব্যের উপর তাহার কোনও প্রভাব অনুভব করা যায় না। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য পুরাণের মত একাধারে আখ্যায়িকামূলক রচনা, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র নহে—কেবলমাত্র আখ্যায়িকাই ইহার অবলম্বন। অতএব তত্ত্ব পরিবেশনের যে একটা দাবী পুরাণের আছে, মঙ্গলকাব্য

তাহা পালন করিবার দায়িত্ব কোনদিনই গ্রহণ করে নাই। বাস্তবজীবনের বিশ্লেষণই মঙ্গলকাব্যের লক্ষ্য।) পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের মৌলিক আদর্শ পরস্পর যে কত পৃথক্, ইহা হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। অতএব পুরাণের নিকট হইতে কোন বিষয়ে যদি মঙ্গলকাব্যের ঋণ প্রকাশ পায়, তবে কেবলমাত্র ইহার আখ্যায়িকা-অংশেই এই ঋণ প্রকাশ পাইতে পারে। আঙ্গিকের দিক হইতেও পুরাণের নিকট মঙ্গলকাব্যের কোন ঋণ নাই, বরং সংস্কৃত কাব্যের নিকট এই বিষয়ে তাহার কিছু ঋণ আছে। সুতরাং পুরাণের উদ্দেশ্য মঙ্গলকাব্য দ্বারা কোন দিন পূর্ণ হইতে পারে নাই—সেইজন্য বাংলায় মঙ্গলকাব্য রচিত হইবার জন্য পুরাণ-রচনার ধারা লুপ্ত হয় নাই। পুরাণ-রচনার ধারা লুপ্ত হইবার অন্য কারণ আছে—তাহা সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষেই অভিন্ন, কেবল বাংলাদেশের পক্ষে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিছু নাই।

হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংঘাতের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যেমন সংস্কৃত পুরাণগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল, বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের প্রথম সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তেমনই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব হইয়াছিল। (প্রাচীনতম সংস্কৃত পুরাণগুলি ছিল—ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা নিরপেক্ষ মানব-মাহাত্ম্যকীর্তনমূলক রচনা। পরবর্তী পুরাণের পাঁচটি লক্ষণের পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে তখন কেবলমাত্র একটি লক্ষণই ছিল, তাহা মানব-চরিত্র-মাহাত্ম্য কীর্তন। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বীর পুত্রসন্তান লাভ করিবার উদ্দেশ্যে নারীর সীমন্তোন্নয়ন উপলক্ষে মানব চরিত্রের বীরত্ব-কাহিনী কীর্তিত হইত, তাহাই সংস্কৃত পুরাণগুলির ভিত্তি।) কালক্রমে ইহার এই মানবচরিত্র-মহিমা কীর্তন নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়িয়া অলৌকিকতাই প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিল। মানবিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া একান্ত অলৌকিকতা আশ্রয় করিবার জন্য সংস্কৃত পুরাণগুলি ক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল। (মঙ্গলকাব্যের মৌলিক কাহিনীগুলিও অলৌকিকতা-বর্জিত মানবিক কাহিনীমাত্রই ছিল) ক্রমে তাহাও অলৌকিকতা-ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু পুরাণের মত ইহা মানবিক সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিল না। পুরাণ তাহার উপলক্ষ্য হইয়া রহিল, মানুষের প্রতি তাহার লক্ষ্য স্থির রহিয়া গেল।

সেনরাজবংশের পতনের পরই এদেশে আর এক বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাষ্ট্রশক্তি এক সম্পূর্ণ নূতন ধর্মমতের পরিপোষক ছিল। তাহা মুসলমান ধর্মমত। এই মুসলমান ধর্মমতের সঙ্গে স্থানীয় লৌকিক ধর্মমতগুলির

আদর্শগত বিরোধ এত অধিক ছিল যে, তাহা ক্রমে পরস্পর দুই সমাজের মধ্যে এক বিপুল ব্যবধানের সৃষ্টি করিল। রাষ্ট্রপোষিত এই মুসলমান ধর্মমতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেশের তদানীন্তন আপামর জনসাধারণ আপনাদিগকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিতেছিল। তখনই (মঙ্গলকাব্যের মৌলিক ধর্ম ও সম্প্রদায়নিরপেক্ষ কাহিনীগুলির মধ্যে এক অলৌকিক দৈবশক্তির পরিকল্পনা করিয়া ঐহিক জীবনের সকল দুঃখদুর্দশা তাহারই ইচ্ছাধীন বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবার প্রয়াস দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-পীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল এবং দুঃখ-ক্লেশকে ভাঙ্গাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল।) এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ—কিছু সান্ত্বনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না। এই চেষ্টা সাহিত্যকে তাহার বিশেষ দেশকালের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না।' এই অবস্থায় পরপীড়িত জাতি অল্পকাল মধ্যেই জীবনের সর্বপ্রকার উচ্চতর আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল, নিজের মধ্যে নিজের পরিত্রাণের পথ খুঁজিতে গিয়া সকল রকমে দৈব সহানুভূতির উপর আত্মসমর্পণ করিয়া রহিল। সামাজিক জীবনের এই অবস্থা হইতেই বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির জন্ম হইয়াছিল। (বৌদ্ধ ও অন্যান্য নিরীশ্বরবাদী ধর্মের সমুত্থান হইয়া হিন্দু সমাজেও একদিন অনুরূপ অবস্থায়ই পুরাণগুলির উদ্ভব হইয়াছিল।)—

বাংলা দেশে আর্যসভ্যতা স্থাপিত হইবার পূর্বে সাধারণ জনগণের মধ্যে যে ধর্ম-বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সেই সকল ধর্মবিশ্বাসেরই কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। মানব-মনের একটি আদিম বৃত্তি ভয়—মানব সভ্যতার শৈশবেও সর্বপ্রথম ভয় হইতেই দেবতার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। বাংলার প্রাচীনতম দেব-পরিকল্পনাও এ' দেশের প্রাগৈতিহাসিক আদিম সমাজের এই প্রবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত। উন্নত আর্য সমাজ কর্তৃক পরিকল্পিত দেবতাদিগের পরম কারুণিক কল্যাণাদর্শ মঙ্গলকাব্যের নিম্নতর সমাজের এই অনুদার ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিদ্বারা সম্যক্ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্যই মঙ্গলকাব্যের দেবতাগণ নীচ, স্বার্থপর, ক্রূর, প্রতিহিংসাপরায়ণ, অকৃতজ্ঞ ও ছলনাময়। তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তের মস্তক আপনা হইতে কোন দিন নত হইয়া আসে না, তাঁহাদের মহিমার প্রতি আকর্ষণ বশতঃ কেহ তাঁহাদের শরণাপন্ন হয় না, শুধু তাঁহাদের

অকারণ নিগ্রহের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকিবার জন্য ভয়ে তাঁহাদের নামোচ্চারণ করে মাত্র। দেবতাদিগেরও এই বিষয়ে সতর্কতার অবধি নাই, কাহারও এতটুকু অবমাননার প্রতিশোধ লইতে তাঁহাদের মুহূর্তও বিলম্ব হয় না। বাণিজ্য করিয়া বহুদিনের নিরুদ্দিষ্ট সদাগর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছে শুনিয়া কোন মিলনোৎসুক পরিজন যদি দেবতার প্রসাদ অভুক্ত রাখিয়া আগ্রহাতিশয্যে সেই পথের দিকে ধাবমান হয়, তাহা হইলে প্রবাসী সদাগর আর গৃহে প্রত্যাগত হইতে পারিবে না; ঘাটের পাষাণে ঠেকিয়া হইলেও ভরাডুবি হইবে;—দেবতা তাঁহার প্রসাদের অবমাননার প্রতিশোধ স্বরূপ সেই নিরপরাধ সদাগরের প্রাণ লইতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। কিন্তু এই আশুতোষ দেবতাদিগের এমনই মহিমা যে যদি, অনুতপ্ত ভক্ত পুনরায় গিয়া সেই পরিত্যক্ত প্রসাদ মাটি হইতে তুলিয়া শ্রদ্ধাসহকারে আহার করে, তন্মুহূর্তেই সেই সদাগর বাঁচিয়া উঠিবে। সামান্য অমর্যাদা হইতে আত্মরক্ষার্থ মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের এত সতর্কতা হইতে কি ইহাই মনে হয় না যে, বস্তুতঃ সেকালের সমাজে কোন মর্যাদারই তাঁহারা অধিকারী ছিলেন না? (মঙ্গলকাব্যের প্রত্যেক দেবতাই একান্ত অনিচ্ছুক ভক্তের নিকট হইতে এক প্রকার জোর করিয়া পূজা আদায় করিয়া তারপর ছাড়িয়াছেন—স্বেচ্ছায় ভক্তিপরায়ণ হইয়া কেহই বড় তাঁহাদের পূজা করে নাই।) শক্তির যথেচ্ছ প্রয়োগ দ্বারা সমাজকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া, স্বপ্ন দ্বারা নির্যাতনের হুমকি দেখাইয়া, নানা চক্রান্তে সমুদ্যত দণ্ড হস্তে তাঁহারা নিজেদের পূজা আদায় করিয়াছেন। কিন্তু এই শক্তিদ্বারা আর কিছু করিতে পারা গেলেও অন্ততঃ সমাজের হৃদয় জয় করিতে পারা যায় না। বিভীষিকার আতঙ্ক ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু স্বভাবজ ভক্তি চিরস্থিরা। (মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের প্রতি নব-সংস্কার-দীক্ষিত হিন্দুসমাজের এই ভয়ের অস্তিত্ব থাকিলেও কোন কালেই শ্রদ্ধার লেশমাত্রও যে ছিল না, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। শ্রদ্ধা গুণটি মানবের উচ্চতর বৃত্তি-সম্ভূত, কিন্তু যে স্তরের সমাজ-মন হইতে মঙ্গলকাব্যের দেব-পরিকল্পনা সম্ভব হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শ্রদ্ধার মত উচ্চতর চারিত্রগুণের অস্তিত্ব থাকিবার কথা নহে।)

(কিন্তু এই বিষয়েও কোন কোন মঙ্গলকাব্যোক্ত দেবতার কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। কোন কোন মঙ্গলকাব্যের দেবতা যেমন কাব্যের নায়কের সঙ্গে বিরোধের ভিতর দিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তেমনি আবার দেখিতে পাওয়া যায়. কোন কোন মঙ্গলকাব্যের দেবতার সঙ্গে কাব্যের নায়কের কোন বিরোধ নাই।

বরং দেবতাদিগের আশীর্বাদ ও সহায়তাই তাহাদের জীবনের সর্ববিধ সাফল্যের মূল। এই শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্রে নিম্নশ্রেণীর সমাজভুক্ত মানবোচিত দুর্বলতা নাই, উন্নত আর্য দেব-পরিকল্পনার আদর্শে তাঁহাদিগেরও পরম কারুণিক কল্যাণাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য যে, মঙ্গলকাব্যের এই শ্রেণীর দেব-পরিকল্পনা পরবর্তী কালে উদ্ভূত হইয়াছিল—তখন পৌরাণিক আদর্শের প্রভাব তাহাদের উপর বিস্তৃত হইয়াছে। পূর্ববর্তী মঙ্গল-কাব্যের দেবতাদিগের প্রকৃতির সঙ্গে পুরাণ-প্রভাবিত মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের প্রকৃতিগত পার্থক্যের ইহাই কারণ।

লৌকিক ধর্ম ও মঙ্গলকাব্য

বাংলার লৌকিক ধর্মের উপর একটা পৌরাণিক আভিজাত্য আরোপ করা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মঙ্গলকাব্য-বর্ণিত দেবচরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উপরে যে আলোচনা করা হইল, তাহার সঙ্গে পৌরাণিক দেবদেবী-চরিত্রের মৌলিক পার্থক্যের জন্যই এই প্রয়াস প্রায় সর্বত্রই ব্যর্থ হইয়াছে। এই সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। লৌকিক দেবতাদিগের মধ্যে শিব সর্বপ্রাচীন। ইহার কারণ, পৌরাণিক দেবদেবীদিগের মধ্যে শিবকেই সর্বপ্রথম বাংলার লৌকিক ধর্মমতগুলির প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসিতে হয়। দাক্ষিণাত্যের তামিল অঞ্চলেও লৌকিক ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সম্মুখীন হওয়ায় অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই বিষয়ে উল্লিখিত হইয়াছে, '...there has been a strong tendency in the Tamil country, where Brahmin influence is strong, to connect the old village deities with the Hindu pantheon, and especially with the God Siva, the most popular deity in South India.'[১]

বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের অবসানের পর হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগে সম্পূর্ণ অনুরূপ অবস্থারই উদ্ভব হইয়াছিল। দেশের সাধারণ সমাজ হিন্দু পৌরাণিক শিব-চরিত্রকে নিজেদের জাতীয় আদর্শে নূতন করিয়া লইয়াছিল। তাহার ফলে এ' দেশে শিব-চরিত্রের পুরাণ-বহির্ভূত এক অভিনব পরিচয় প্রকাশ পাইল। এই শিব বাঙ্গালীর নিজস্ব সৃষ্টি, এক সম্পূর্ণ আভিজাত্যহীন বাংলার কৃষকের লৌকিক দেবতা। বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ,—খনার বচন বলিয়া পরিচিত বাংলার প্রাচীনতম প্রবচনগুলি যেমন কৃষিবিষয়ক, তেমনই বাংলার প্রাচীনতম দেবতাও এই দেশের কৃষিপ্রধান অঞ্চলসমূহে কৃষিকার্যেরই সহায়করূপে কল্পিত হইয়াছেন। বাংলার লোক-সাহিত্যেও এই শিবের চরিত্র নিতান্ত সাধারণ-বুদ্ধি গ্রাম্য কবির স্থূলসৃষ্টি। কোন কোন মঙ্গলকাব্যে তাঁহার উপর পৌরাণিক প্রভাব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার পৌরাণিক ও লৌকিক চরিত্রের মধ্যে যে কেবলমাত্র সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিয়াছে, তাহা নহে—প্রায় সর্বত্রই জাতীয় আদর্শের নিকট

---

১ H. Whitehead, *The Village Gods of South India*, Calcutta, 1921, p. 133

পৌরাণিক আদর্শ ম্লান হইয়া গিয়াছে। খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য কৃত শিব-মঙ্গল কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিব কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে বিশ্বকর্মাকে দিয়া তাঁহার হাতের ত্রিশূল ভাঙ্গাইয়া জোয়াল, কোদাল, ফাল ইত্যাদি চাষের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন—

'ঈশ্বরীর ইচ্ছায় বিশাই পায় পড়ে।
লাঙ্গল জোয়ালি মই সত্ত দিল গড়ে॥
পূর্বে পরামর্শ ছিল পার্বতীর সাথে।
শূলে হ'তে শূলী শূল দিল তার হাথে॥
শাল পাতি শূল ভাঙ্গি সজ্জা কর বসি।
জোয়ালি কোদাল ফাল দা উখুন পাশী॥
তৌলে ক'রে শূলে ধরে তৌলিল তখন।
ঠিক সাবা হৈল খাড়া দু'শ দশ মণ॥
কায় কত দিব? দিবে যার যত সয়।
বিবরিয়া বিশ্বকর্মা বিশ্বনাথে কয়॥
পাঁচ মণে পাশী করি আশী মণে ফাল।
দু মণের দু জলুই অর্ধেকে কোদাল॥
দশ মণের দা অষ্ট মণের উখুন।
দু'শ দশ মণ দেখ করিয়া একুন॥
বুঝে পশুপতি অনুমতি দিলা তারে।
বিশাই বসাইল শাল শিবের গোচরে॥'

এইভাবে কৈলাসেশ্বর শিব শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিয়া কৃষি-বৃত্তিদ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে লাগিলেন। ইহার অর্থ এই যে, পৌরাণিক আদর্শের উপর বাঙ্গালীর জাতীয় আদর্শ জয়লাভ করিল।

খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রধানতঃ বৌদ্ধ পালরাজদিগের রাজত্বকালে নাথ-সম্প্রদায় নামক এক স্বতন্ত্র ধর্ম-সম্প্রদায় এ'দেশে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। এই ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোকশ্রুতি অবলম্বন করিয়া পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে নাথ-সাহিত্য নামে এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক (Sectarian) সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাহার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কোনও সংস্রব নাই। কারণ, নাথ-সাহিত্যে সিদ্ধাচার্য কিংবা

তাঁহাদিগের শিষ্যা ও শিষ্যদের অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহাদের অপার্থিব কার্যকলাপেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। অলৌকিকতার বর্ণনায় এই বিশিষ্ট প্রকৃতির সাম্প্রদায়িক সাহিত্য এত ভারাক্রান্ত যে, ইহার মধ্যে বাংলার কোন জাতীয় চিত্র প্রবেশ লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। তবে বাংলার শিব দেবতাটির লৌকিক রূপের সঙ্গে ইহাতেও পরিচয় লাভ করা যায়। নাথধর্ম সম্ভবতঃ বাংলার বাহিরেই উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা এই দেশে আসিয়া প্রসার লাভ করিবার পূর্ব হইতেই এ'দেশের সমাজে এই কৃষকরূপী লৌকিক শিব-দেবতার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মনে হয়। তারপর নাথধর্ম এ'দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচলিত হইবার পর তাহা এতদ্দেশীয় লৌকিক শৈব ধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গেল। ফলে, বাংলার মঙ্গলকাব্যসমূহ নাথধর্ম-পরিকল্পিত শিব-চরিত্র দ্বারাও কতকটা প্রভাবিত হইয়াছে। সেনরাজত্বের প্রতিষ্ঠার পর হইতেই এই দেশীয় সমাজের উপর যখন হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল, তখনই বাংলার সমাজে কৃষক শিবের পরিবর্তে পৌরাণিক শিবের শান্ত সমাহিত মূর্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল—তখন তিনি বিশেষ হইতে নির্বিশেষে উন্নীত হইয়া গেলেন।

প্রাচীনতম কালে শিব বাঙ্গালী কৃষকের সাহচর্যে আসিয়া যে কর্মতৎপরতা দেখাইয়াছেন, উচ্চতর সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তৎপরবর্তী যুগেই তিনি ইহার ব্যতিক্রম দেখাইতে লাগিলেন। তখন তিনি আর কৃষকের দেবতা নহেন, বরং পৌরাণিক দেবাদিদেব,—হিন্দু সমাজের Supreme Deity বা পরমেশ্বরের সন্নিকটবর্তী স্থান লাভ করিয়াছেন। তাহারই ফলে খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই সাধারণ সমাজের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়—দেশের লৌকিক সাহিত্যেও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই যুগে তুর্কী বিজয়ের জন্য বাংলার সামাজিক জীবনের উপর যে তীব্র এক বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার মধ্যে নিষ্ক্রিয় দেবতা সম্পর্কিত কোন দার্শনিক বিলাসের অবকাশ ছিল না। এই সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, 'বস্তুত সাংসারিক সুখ দুঃখ বিপৎ সম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন যে দেবতা ইচ্ছা-সংযমের আদর্শ তাঁহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয়, আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ

সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন। চণ্ডীর উপাসকেরাই কি সকল দুর্গতি এড়াইয়া উন্নতি লাভ করিতেছিলেন? অবশ্যই নহে। কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। আমাবই প্রতি বিশেষ অকৃপা, ইহার ভয় যেমন আত্যন্তিক, আমারই প্রতি বিশেষ দয়া ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয়। কিন্তু যে দেবতা বলেন, সুখ দুঃখ, দুর্গতি সদ্গতি ও কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ও দিকে দৃক্‌পাত করিও না, সংসারে তাঁহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে;—সংসার মুখে যাহাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধনজনমান চায়। ধনপতির মত ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না, বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসক হইতে হইল।'[১]

এই উক্তি কবি-কল্পনামাত্র নহে, ইহা উচ্চতর সমাজ-বিজ্ঞান-সম্মত। একজন প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন, 'That primitive worship has primarily a practical aim is seen from the fact that the lower peoples generally worship only those spirits or deities who are supposed to influence human affairs. The real reason why the Supreme Beings are not, as a rule, worshipped, is their indifference to the course of nature and the life of man.'[২] অর্থাৎ আদিম জাতির ধর্মোপাসনার একটি বাস্তব উদ্দেশ্য আছে; সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে-সকল উপদেবতা কিংবা দেবতা মানুষের ব্যবহারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া থাকেন, নিম্নশ্রেণীর লোক সাধারণতঃ তাঁহাদেরই উপাসনা করিয়া থাকে। পরমেশ্বর প্রকৃতির দেবতার যে তাহাতে আরাধনার কোন ব্যবস্থা নাই, তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, এই প্রকৃতির দেবতা প্রাকৃতিক নিয়ম ও মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রতি উদাসীন। অতএব নিশ্চেষ্ট ও ভক্তের ঐহিক দুঃখে উদাসীন পরমেশ্বর প্রকৃতির দেবতা (Supreme Being) শিবের বিরুদ্ধে আদিম ধর্ম-প্রবৃত্তিজাত শক্তিদেবতার আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনী লইয়াই মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব হয়।

বাংলার লৌকিক শক্তিধর্ম বাংলার নিজস্ব জাতীয় উপাদানে গঠিত এক

[১] সাহিত্য (১৩০৭), ১৪৪

[২] R. Karsten, *The Origins of Religion* (London, 1935), p. 20

অভিনব অধ্যাত্মবোধ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার সঙ্গে পৌরাণিক শক্তিবাদ কিংবা হিন্দু বা বৌদ্ধ তন্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই। ইহাতে আত্মশক্তির উদ্বোধনের কোন কথা নাই, বরং প্রতি পদে বিভীষিকাময়ী শক্তির নিকট আত্মশক্তি বলিদানের কথা আছে। ভারতীয় শাক্ত ধর্মের একটি মূল কথা, দুর্বলের শক্তিসাধনা—দেবতাকে শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপিণী বলিয়া কল্পনা করিয়া ভক্ত তাঁহার সাযুজ্য দ্বারা নিজের মধ্যে সেই শক্তির উদ্বোধন করিয়া থাকে। কিন্তু নিম্নতর জাতির শক্তি-দেবতা বিভীষিকাময়ী মাত্র, তাহার সহিত সাযুজ্যের কল্পনা ত দূরের কথা, তাহার নিকট হইতে আত্মগোপন করিয়া চলাই বরং সমাজের লক্ষ্য। এই আত্মগোপনের প্রবৃত্তি ভয় হইতে জাত, ভক্তি হইতে নহে।

বাংলার লৌকিক শাক্তধর্ম এদেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের দানবপূজারই পরবর্তী সংস্করণ হইলেও কালক্রমে ইহা কতকগুলি নূতন বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল। আদিম সমাজের দানবচরিত্রের মত বাংলার লৌকিক শাক্ত দেবচরিত্রসমূহ সমাজ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া পরিকল্পিত হয় নাই। যে সকল আদিম সমাজে দানব-পূজা (Devil-worship) প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে আরাধ্য দানবকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কদাচ অনুভব করা হয় না। সেই জন্য এই সকল চরিত্রের মধ্যে অতিরিক্ত অতিপ্রাকৃতবাদ (Supernaturalism) আসিয়া পড়ে। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলার লৌকিক দেবচরিত্রসমূহ প্রাগৈতিহাসিক যুগের দানবচরিত্রের উগ্রতা ও অতিপ্রাকৃততা পরিহার করিয়া বহুলাংশে মানবিক বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। পূজ্য ও পূজকের পার্থক্য এখানে অনেক সময় ঘুচিয়া গিয়াছে। যে প্রকৃতিরই দেবতা হউক, তাঁহাকে মানুষের স্তরে নামাইয়া লওয়া বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক সাধনার একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্য। সেইজন্যই ভয়ঙ্কর বলিয়াও যে সকল দেবতার এখানে কল্পনা করা হয়, তাঁহারাও সমাজের কোন বাস্তব খল-চরিত্রের উপর ভিত্তি করিয়া পরিকল্পিত হইয়া থাকে। এইজন্য এই দেবতাদিগকে লইয়া রচিত কাব্যসমূহের মধ্যে বাঙ্গালীরই জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালী জাতিরই একটি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বলিতে হইবে, নতুবা দাক্ষিণাত্যের কোন লৌকিক দেবতার সঙ্গে সেখানকার কোন সমাজেরই এই যোগ অনুভব করা যায় না।

খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতেই বাংলার সমাজের উপর ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিতে থাকে। তাহার ফলে তাহার দেবচরিত্রসমূহ পৌরাণিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে থাকে। সেই জন্য পরবর্তী দেবচরিত্রসমূহ

পূর্ববর্তী দেবচরিত্র হইতে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। এমন কি, অনেক দেবতা সমাজের লৌকিক ভিত্তির পরিবর্তে প্রত্যক্ষভাবে পুরাণ হইতেই আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল দেবচরিত্রে বাঙ্গালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হইবার অবকাশ পায় নাই এবং তাহাদিগকে লইয়া যে সকল আখ্যান-কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহা পুরাণের বঙ্গানুবাদ ব্যতীত আর কোন সাহিত্যিক মর্যাদা লাভের অধিকারীও নহে।

কিন্তু একটা বিষয় এখানে লক্ষ্য করা যায়—নব আর্য সংস্কারদীক্ষিত পুরুষ যখন ক্রমাগতই পুরাণানুগ ধর্মের প্রতি অধিকতর আসক্ত হইতেছিলেন, তখনও রক্ষণশীল স্ত্রীসমাজের মধ্যে লৌকিক দেবদেবীর পূজার প্রচলন অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই ধারারই অনুসরণ করিয়া আধুনিক বাংলার স্ত্রীসমাজে বিবিধ ব্রত ও পার্বণগুলি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। সেই জন্য ইহাদের মধ্যে বাংলার আদিম ধর্মের কতকগুলি মূল্যবান উপকরণ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। যে-যুগে সর্বপ্রথম বাংলার পুরুষ ও নারীর আধ্যাত্মিক আদর্শ দুই স্বতন্ত্র ধারায় পৃথক্ হইয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে সেই যুগেই মঙ্গলকাব্যগুলিরও উদ্ভব হয়। সেইজন্যই কাব্যের নায়কের সঙ্গে নায়িকার আধ্যাত্মিক আদর্শ লইয়া সর্বদাই বিরোধের কথা বলা হইয়াছে। নারী তাহার দুর্বল হৃদয়ে প্রচলিত প্রথাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছে, আর পুরুষ নূতন আদর্শের মোহ বশতঃ তাহা বারবারই পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু বাংলার বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে বাংলার লৌকিক দেবদেবীগণের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া, পরবর্তী কালে বাংলার সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্মের সমুচ্চ মন্দিরেও ইঁহাদের জন্য কিঞ্চিৎ স্থান দান করিবার প্রয়োজন হইল।

বাংলার লৌকিক দেবদেবীগণের উদ্ভবের সম্ভাবিত ইতিহাস এই গ্রন্থের যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে, কারণ মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ইঁহাদের উদ্ভবের ইতিহাসের সঙ্গেও জড়িত। তবে একটি কথা ইঁহাদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রণিধানযোগ্য এই যে, এই সকল লৌকিক দেবতা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বেশী দিন রক্ষা করিতে পারেন নাই। কারণ, এই দেশে এই সকল সঙ্কীর্ণতামূলক সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের উপর দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের কূলপ্লাবিনী বন্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে এই সমাজের প্রায় সমগ্র সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের বৈষম্যের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে কল্পিত রাধিকার মাধুর্য শাক্ত চণ্ডীর উগ্রতাকে নমনীয় করিয়া দিয়া ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর মনে আগমনী-বিজয়া গানের ঝঙ্কার তুলিয়া দিয়াছে; নৃমুণ্ডমালিনী খর্পরধারিণী কালিকামূর্তি ভক্ত রামপ্রসাদের ভাব-কল্পনায় অপূর্ব

স্নেহশালিনী মাতৃমূর্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্য পরবর্তী মঙ্গলকাব্যসমূহে বাংলার সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাসের কোন ইঙ্গিত অপেক্ষা একটা চিরাচরিত পর্যুষিত প্রথারই নিয়মিত অনুকৃতি মাত্র দেখিতে পাই। যে সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য লইয়া খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে এই মঙ্গলকাব্যগুলির রচনা আরম্ভ হইয়াছিল, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই প্রায় সেই উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়া যায়। তখন হইতেই মঙ্গলকাব্য সাম্প্রদায়িকতামুক্ত হইয়া একটা বিশিষ্ট সাহিত্য রচনার আদর্শ মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় ষোড়শ শতাব্দী ও তাহার পূর্ববর্তী কালের মঙ্গলকাব্যগুলির যে একটা বিশেষ মূল্য আছে, ইহার পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির সেই মূল্য অপেক্ষাকৃত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হইবে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দুইটি মৌলিক ধারা—একটি বৈষ্ণব কাব্যের ধারা ও অপরটি মঙ্গলকাব্যের ধারা। বৈষ্ণবকাব্য একান্ত আত্মকেন্দ্রিক ভাবের বাহন, কিন্তু মঙ্গলকাব্য সম্পূর্ণ আত্মনিরপেক্ষ ও বস্তুধর্মী। বৈষ্ণব ও শাক্তের জীবনদর্শনের পার্থক্যই যে তাহাদের কাব্যাদর্শের মধ্যেও এই পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রত্যেক দেশের মতই বঙ্গদেশেও ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই সর্বপ্রথম সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সেইজন্যই প্রথম অবস্থায় ইহা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের ফলে কালক্রমে সেই ভাব যখন মঙ্গলকাব্যগুলি হইতে কতকটা হ্রাস পাইয়া আসিল, তখনই ইহাদের প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্যও রসিক-সাধারণের কাছে ধরা পড়িল। বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুকাল পর পর্যন্তও মঙ্গলকাব্যই এই দেশের উচ্চতর হিন্দুসম্প্রদায়ের কবি-প্রতিভা বিকাশের একমাত্র অবলম্বন ছিল। সেই-জন্যই পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে আমরা বাংলার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবি-মনের পরিচয় পাই।

বৈষ্ণব ধর্ম ও মঙ্গলকাব্য

শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া বাংলার জাতীয় সাহিত্য রচনার প্রয়াস সার্থক হইলেও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়া যে কেন তাহা সম্ভব হইল না, তাহাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সমগ্রভাবে বাংলার সমাজকে পরিহার করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম আত্মকেন্দ্রিক (individualistic) যে স্বতন্ত্র ধর্মের আদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার প্রেরণা লইয়া সমগ্র জাতির কাব্য তাহার পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয় নাই। বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম যেমন আত্মভাবমূলক ধর্ম, তেমনই তাহার সাহিত্যিক বিকাশও আত্মভাবপরায়ণ (subjective) সাহিত্যের মধ্য দিয়াই সার্থক হইয়াছে। ইহারই ফলে বাংলার অপূর্ব বৈষ্ণব গীতিকবিতাগুলির জন্ম হইয়াছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে শাক্তগণ যেমন মঙ্গল-কাব্য রচনার ভার লইয়াছিলেন, তেমনই বৈষ্ণব সম্প্রদায় আর এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির সাহিত্য-বস্তু সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাই গীতিকাব্য। অতএব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাহিত্য-সৃষ্টির আবেগ গীতিকাব্য রচনার দিকে প্রবাহিত হওয়াতেই জাতীয় কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়াস নগণ্য হইয়া রহিয়াছে। তবে এ কথাও সত্য যে, কোন কোন বৈষ্ণব কবি চৈতন্য-জীবন-চরিত রচনার মধ্য দিয়া জাতীয় কাব্য রচনা করিবার মত শক্তির অস্তিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই সম্পর্কে 'চৈতন্য-ভাগবতে'র রচয়িতা বৃন্দাবনদাসের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'চৈতন্য-ভাগবতে' কোন জাতীয় বাস্তব চরিত্রের সৃষ্টির প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই ইহাকে জাতীয় কাব্যের পর্যায়ে ফেলা যায় না। ইহার প্রত্যেকটি চরিত্রের সৃষ্টিই আধ্যাত্মিক আদর্শ-প্রণোদিত। ইহাতে চৈতন্য চরিত্রের বাস্তব দিক অপেক্ষা তাঁহার জীবনের অলৌকিক দিকের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মানুষ চৈতন্য হইতে দৃষ্টি সরাইয়া কবি অবতার চৈতন্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ফলে এই সকল কাব্যে মানবতা বোধের ফলে [illegible] অভাব দেখা যায়; তবে কোন কোন স্থানে ইহার বাস্তব রূপও যে গিয়াছে। বৈষ্ণব স[illegible]াহা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও সমগ্রভাবে ইহার কোন করিয়া দিয়া ভাবপ্রবণ বাঙ্গা [illegible]শনে আগমনা[illegible]পারে না। বৈষ্ণব-চরিতকারদিগের নৃমুণ্ডমালিনী খর্পরধারিণী কালিকামূর্তি ভক্ত রামপ্রসাদী। কারণ, যে বাস্তবতার

প্রতি সহানুভূতি জাতীয় কাব্যের একটি বিশিষ্ট গুণ, সেই বাস্তবতার প্রতিই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদিগের নিদারুণ বিতৃষ্ণা। তাঁহাদের আদর্শে ঐহিক সংসার কিছুই নহে, একমাত্র পারত্রিক কল্যাণই জীবনের লক্ষ্য; কতকগুলি আচারই জীবনের সর্বস্ব, গার্হস্থ্য জীবন অর্থহীন—জীবনের প্রতি এই মনোভাব বর্তমান থাকিলে জাতীয় কাব্যের সৃষ্টি যে সার্থক হইতে পারে না, তাহা বিস্তৃত করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। এই জন্যই দেখিতে পাই যে, উচ্চশ্রেণীর কবি-গুণ থাকা সত্ত্বেও কোনও বৈষ্ণব চরিত-গ্রন্থই জাতীয় কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে নাই। এমন কি, বৃন্দাবনদাসের মধ্যে যে প্রকৃত কবিজনোচিত গুণটুকু দেখা গিয়াছিল, তাহাও তাঁহার পরবর্তী আর কোন বৈষ্ণব-চরিতকারের মধ্যে দেখা যায় নাই।

বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতর দিয়া বাংলার তদানীন্তন বৈষ্ণব সম্প্রদায় যখন ঐহিক জীবনের সম্বন্ধে নিদারুণ উপেক্ষার ভাব প্রচার করিতেছিল, তখনই শাক্ত কবিগণ মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য দিয়া ঐহিক জীবনের প্রতি চরম আসক্তির বাণী প্রচার করিতেছিলেন। মঙ্গলকাব্যের শাক্ত কবিগণ তাঁহাদের কীর্তিত-মহিমা দেবতাদিগের নিকট হইতে ঐহিক জীবনের সুখসমৃদ্ধির বর প্রার্থনা করিয়া লইয়াছিলেন;—পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য, সুন্দরী ভার্যা অর্থাৎ ঐহিক জীবনের সমৃদ্ধির যাবতীয় উপকরণই তাঁহাদের কাম্য ছিল। তাঁহাদের কামনার মূল সুরটি ভারতচন্দ্রের একটি ছত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে; 'অন্নদা-মঙ্গলে'র ঈশ্বরী পাটনী অন্নদার কাছে বর চাহিতেছেন,

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

মোক্ষ নহে, স্বর্গ নহে, পারত্রিক কোন কল্যাণ নহে, ঐহিক জীবনের নশ্বর সুখ-সমৃদ্ধিই এখানে দেবতার কাছে পরম কাম্য বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব আদর্শের সঙ্গে এখানেই মঙ্গলকাব্যের শাক্ত কবিদিগের আদর্শের মূল বিরোধ। মধ্যযুগের বাংলার সমাজে বৈষ্ণব ধর্ম যেমন বৈরাগ্যের বাণী শুনাইয়াছে, তেমনি অপর পক্ষে মঙ্গলকাব্যবর্ণিত লৌকিক শাক্তধর্ম পরম সংসারাসক্তির গুণগান করিয়াছে। ভোগের ভিতর দিয়া সাধনাই ছিল মঙ্গলকাব্যের আধ্যাত্মিক বাণী। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—ইহাই মঙ্গলকাব্যের ভোগ-দর্শনের স্বরূপ।

এক হিসাবে বৈষ্ণবকাব্যকে মঙ্গলকাব্যের পরিপূরক (complement) বলা যাইতে পারে। বাংলার সমাজের ব্যক্তি-হৃদয়ের যে আবেগ মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহাই বৈষ্ণব কাব্যের শতমুখী ধারায় স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছে।

একদিকে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যেমন মধ্যযুগের বাংলার সমষ্টি-জীবন প্রতিফলিত হইয়াছে, তেমনই আর এক দিক দিয়া বৈষ্ণব কবিতায় ব্যষ্টি হৃদয়ের একান্ত সুখ-দুঃখের অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যে ভাব-রসের অভাব ছিল, বৈষ্ণব সাহিত্য তাহা পূর্ণ করিয়াছে এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে যে ভাব-রসের অভাব ছিল, তাহা মঙ্গলকাব্য পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে পরস্পরের প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব ছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য পরস্পরকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই প্রভাব কেবল বহিরঙ্গগত এবং বিচ্ছিন্ন মাত্র—একের প্রভাব অন্যের মর্মমূলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কারণ, ইহাদের পরস্পরের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী। তবে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যতদিন আদর্শগত শৈথিল্য দেখা দেয় নাই, ততদিন পর্যন্তই পরস্পরের স্বাধীন বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহার আদর্শ যখন শিথিল হইয়া আসিল, তখন ইহার উপর বৈষ্ণব আদর্শের প্রভাব দুর্জয় হইয়া উঠিল, সে কথা অন্যত্রও উল্লেখ করিয়াছি। অতএব কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্যের আদর্শগত অধঃপতনের যুগের নিদর্শন দেখিয়াই এই সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হয় না যে, 'এই দুইটি কাব্যধারার অন্তর্নিহিত সত্যপ্রেরণা বহুলাংশে অভিন্ন।' মঙ্গলকাব্যের ভক্তি ও বৈষ্ণবীয় জীবনাদর্শের ভক্তির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। দ্রোহবুদ্ধি এবং অবিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়া যে মঙ্গলকাব্যের ভক্তিবিশ্বাসের জন্ম হয়, তাহা নহে—ভয় হইতে যে ভক্তির জন্ম, তাহার মধ্যে দ্রোহবুদ্ধি ও অবিশ্বাস প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে মাত্র, কখন সম্পূর্ণ দূর হইয়া যাইতে পারে না; কিন্তু বৈষ্ণবীয় জীবনাদর্শজাত ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি, কোন বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ইহার জন্ম হয় না, সেইজন্য ইহা যেমন পবিত্র নির্মল, তেমনই চিরস্থায়ী। অতএব বৈষ্ণব সাহিত্যের বহিরঙ্গগত কোনও প্রভাব মঙ্গলকাব্যের উপর কার্যকরী হইলেও, ইহাদের অন্তর্নিহিত ভক্তির অনুভূতিতে ইহারা পরস্পর সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাবে রচিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, 'সমাজের চিত্ত যখন নিজের বর্তমান অবস্থাবলম্বনে বদ্ধ থাকে এবং সমাজের চিত্ত যখন ভাব-প্রাবল্যে নিজের অবস্থার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়, এই অবস্থার সাহিত্যের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক।' অতএব ইহাদের 'অন্তর্নিহিত সত্যপ্রেরণা'তে যে সুদূর পার্থক্য থাকিবে তাহাও নিতান্তই স্বাভাবিক।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য মানবতার জয়গানে মুখর। কৃষ্ণলীলার একান্ত আধ্যাত্মিক বিষয়কে কেন্দ্র করিয়াও বৈষ্ণব কবিগণ পরোক্ষে মানবতারই জয়গান গাহিয়াছেন ; খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অজয়ের তীরে বাংলার আদি কবির কণ্ঠে যে সুর সর্বপ্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাই পরবর্তী প্রায় পাঁচ শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রতি বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে অনুরণিত হইয়াছে। 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে' যে বৈষ্ণবের গান নয়, তাহা বাঙ্গালী কবি অতি সহজেই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। মঙ্গলকাব্যে এই মানবিকতার অনুভূতি আরও প্রত্যক্ষ। বৈষ্ণব কবিতায় দেবতাকে বাদ দিয়া মানুষ নহে, বরং এই দুই-ই সেখানে অভিন্ন হইয়া দেখা দিয়াছে এবং তাহার ফলে মানুষের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তাহাতে সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই—তাহার একটা বিশেষ অংশ শুধু সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে প্রতিটি মানুষ পূর্ণাঙ্গ, তাহার দেহের মালিন্য পর্যন্ত তাহাতে প্রত্যক্ষ। শুধু তাহাই নহে, এই মলিনতা লইয়া মানুষ সেখানে তথাকথিত দেবতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। মঙ্গলকাব্যে মানুষই লক্ষ্য, দেবতা উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতায় দেবতা লক্ষ্য, মানুষ উপলক্ষ। সর্বজনীন মানবতার ভিত্তির উপরই মঙ্গলকাব্যের কাব্যধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

অনুবাদ-সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য

পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃত পুরাণের অনুবাদ মাত্র। দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠানে পুরোহিত কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় যে চণ্ডী পঠিত হয়, তাহাই দশজনের আসরে বাংলা ভাষায় গীত হওয়ার জন্য এই সমস্ত অনুবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। অতএব ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর কোন জাতীয় চরিত্র বা চিত্র স্থান পাইতে পারে নাই। ইহাদের সঙ্গে বাঙ্গালীর একটা বাহ্যিক ধর্মীয় যোগ থাকিলেও আভ্যন্তরীণ জাতীয় যোগ যে ছিল না, তাহা সত্য। এইজন্য পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যসমূহ জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে নাই। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ ব্যতীতও কোন কোন বিশেষ পৌরাণিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া পৌরাণিক কাহিনীরই পরিবেশে আরও বহু মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল; এই সকল রচনার মধ্য দিয়া বাংলা ভাষার অনুশীলন হইলেও সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহাদের কোন প্রকার দান স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না।

সংস্কৃত মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের বাংলা অনুবাদগুলিকে উপরোক্ত পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলেও, এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সংস্কৃতের অন্ততঃ একখানি অনুবাদগ্রন্থ কতকটা বাঙ্গালীর জাতীয় রূপ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা রামায়ণ। ইহার একমাত্র কারণ, এ-দেশের সম্প্রদায় নির্বিশেষে পুস্তকখানির ব্যাপক প্রচার। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রামায়ণই সর্বাধিক প্রচলিত কাব্য। প্রচারের ব্যাপকতা এবং সর্বজনীন লোকপ্রিয়তার জন্যই রামায়ণের অনুবাদই সর্বাধিক লৌকিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। তাহার ফলেই ইহার মধ্যে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র কতকটা প্রতিফলিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যে সকল বিচ্ছিন্ন লৌকিক উপকাহিনী আসিয়া সংযুক্ত হইয়া ইহাদিগকে জাতীয় কাব্যের মর্যাদা দান করিয়াছে সেই সকল বহু উপাদান গিয়া তাহাতেও আশ্রয় লাভ করিয়াছে। এই হিসাবে বাংলা রামায়ণ কতকটা বাংলার জাতীয় লক্ষণাক্রান্ত। বাঙ্গালীর বিশিষ্ট আচার, ধর্ম-বিশ্বাস, সংস্কৃতি ইত্যাদির পরিচয় বাংলার লৌকিক মঙ্গলকাব্যগুলি যে পরিমাণ বহন করিয়া থাকে, বাংলা রামায়ণগুলিও তদপেক্ষা কম বহন করে নাই। কিন্তু তথাপি এ'কথা সত্য যে, ইহাতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্রের মধ্যে

বাংলার জাতীয় রূপের পরিচয় পাওয়া গেলেও, সমগ্রভাবে বাংলা রামায়ণ কাব্যখানি বহির্বাংলার আদর্শেরই প্রতীক্। বিশেষতঃ বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের দিক হইতে ইহা প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলে, ইহার কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির মধ্যেও আদর্শগত ঐক্য নাই। বাংলার বৈষ্ণবগণ নিজেদের ধর্মীয় আদর্শের দিক হইতে যেমন ইহার কাহিনী পুনর্গঠন করিয়াছেন, তেমনই শাক্তগণও ইহার উপর নিজেদের দিক হইতে যথেষ্ট কারুকার্য করিয়াছেন। এই দুই স্বতন্ত্র ও পরস্পর-বিরোধী ধর্ম-সম্প্রদায়ের হাতে পড়িয়াই ইহার কাহিনীগত ঐক্য ও সঙ্গতি নির্মমভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। মূলতঃ বাংলা রামায়ণের উপর তিনটি আদর্শই অল্পবিস্তর কার্যকরী দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথমতঃ মূল রামায়ণের মৌলিক আদর্শ, দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালী বৈষ্ণবের ভক্তিবাদের আদর্শ ও তৃতীয়তঃ মঙ্গলকাব্যের শক্তিবাদের আদর্শ। এই তিন আদর্শের মধ্যবর্তী হইয়া ইহার কেন্দ্রীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; বিশেষতঃ চরিত্র সৃষ্টির মধ্যেও সঙ্গতি রক্ষা পায় নাই। তথাপি ইহার মধ্যে কতকটা যে জাতীয় গুণ বর্তমান রহিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না।

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি অনেক স্থলেই রামায়ণের স্থান অধিকার করিয়াছে। ধর্মমঙ্গলকাব্যগুলিই রাঢ়দেশের রামায়ণ। রামায়ণের কাহিনী ও আদর্শ সেখানে মঙ্গলকাব্যের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া পরিবেশন করা হইয়াছে। মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলিও বাংলাদেশে রামায়ণের স্থান অধিকার করিয়াছিল। সীতার পাতিব্রত্যের আদর্শের তুলনায় বেহুলার পাতিব্রত্যের আদর্শই এ'দেশের সমাজকে অধিকতর মুগ্ধ করিয়াছে। তথাপি রামায়ণের যে সকল উৎকৃষ্ট অংশ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে পারে, তাহাও কালক্রমে মঙ্গলকাব্যগুলির স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

এ' কথা সত্য যে, রামায়ণ মহাভারতের আদর্শ দ্বারা পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলি যেমন প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তেমনই মঙ্গলকাব্য দ্বারাও রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদগুলি বহুলাংশে প্রভাবিত হইয়াছে। বাংলা মহাভারতে দাতাকর্ণের উপাখ্যানটি সর্বজনবিদিত; কিন্তু মূল সংস্কৃত মহাভারতে তাহা নাই; ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র পালাটিই সামান্য রূপান্তরিত হইয়া বাংলা মহাভারতের অনুবাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। লৌকিক রামায়ণের হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ সংগ্রহের কাহিনীটি মনসা-মঙ্গলের শঙ্কর গারড়ীর কাহিনী হইতে গৃহীত। মঙ্গলকাব্য কিংবা রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদগুলি এ'দেশে পূর্ণাবয়ব লাভ

করিবার পূর্বেই এই সকল কাহিনী লোক-গাথার আকারে সমাজে প্রচলিত ছিল ; তারপর এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত লৌকিক কাহিনীকেই একত্র সমাবেশ করিয়া মঙ্গলকাব্য-গুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। ক্রমে রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদসমূহও যখন এ'দেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করিতে লাগিল, তখন তাহারা স্বভাবতঃই সমসাময়িক এই মঙ্গলকাব্যগুলির প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিল না। ক্রমে মঙ্গলকাব্যের সর্বজয়ী প্রভাব এই সকল অনুবাদ-সাহিত্যকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া দিল যে, এই সকল ভাষান্তর হইতে আগত কাব্য নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে বাধ্য হইল। অতএব মূলতঃ বহির্বাংলার ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের বাহন হইলেও, যে-আকারে তাহাদের অনুবাদগুলি সেকালের সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা বাংলার জাতীয় কাব্য হিসাবে তাহাদের দাবী একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তবে ইহাদের মৌলিক আদর্শ মূলতঃ এ'দেশের সমাজ-নিরপেক্ষ ছিল বলিয়া এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্নমুখী প্রভাবের ফলে ইহাদের চরিত্রগত ঐক্য বহুলাংশে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া এই অনুবাদ-কাব্যগুলিকে বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

মঙ্গলকাব্যের বিষয়-বস্তুর উপর যখন বৈষ্ণব পদাবলীর স্নিগ্ধ মধুর রস বর্ষিত হইতে লাগিল, তখনই তাহা খণ্ড খণ্ড গীতি-কবিতায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। বাংলা কাব্যের ধারা তখন হইতে এক স্বতন্ত্র প্রবাহে আপনার পথ খুঁজিয়া পাইল। এই সকল খণ্ড গীতি-কবিতার মধ্যেও বাঙ্গালীর চিরন্তন ভাব-গতি অব্যাহত রহিয়া গেল। আগমনী গানে বাঙ্গালী কবির যে একটি অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যেই তাহার প্রথম স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। এইভাবে দেখিতে পাই, মঙ্গলকাব্য ও তাহার পরবর্তী গীতি-কবিতাগুলি একই যোগসূত্রে আবদ্ধ।

ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহার সহিত বাংলার স্ত্রী-সমাজে প্রচলিত ব্রতকথার দেব-চরিত্রের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। অতএব ইহাদের পরস্পর কি সম্পর্ক তাহা একটু বিস্তৃতভাবে এখানে আলোচনার প্রয়োজন। ব্রতকথাগুলি মেয়েলী ব্রতাচারের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে, ব্রতাচার হইতে স্বতন্ত্র ইহাদের কোনও মূল্য কিংবা স্থান নাই। ব্রতকথাগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এক একটি অপরিহার্য অঙ্গ, তাহার ফলে ইহাদের মধ্য দিয়া একটি প্রধান গুণ এই প্রকাশ পাইয়াছে যে, বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া ইহারা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। অতএব ব্রতকথাগুলি একটি প্রাচীনতর ও অধিকতর রক্ষণশীল ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং কোন কোন সময়ে যে ব্রতকথার কাহিনী পল্লবিত হইয়া মঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে দেখা যায়, ইহার অর্থ এই যে, ব্রতকথা হইতেই মঙ্গলকাব্য রচনার প্রেরণা ও বিষয়-বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে—মঙ্গলকাব্য হইতে ব্রতকথার প্রেরণা কিংবা বিষয়-বস্তু গৃহীত হয় নাই।

ব্রতকথাগুলি ধর্মীয় আচারের অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে ইহারা বহুল প্রচারের ভিতর দিয়াও অপরিবর্তিত থাকিবার যে সুযোগ লাভ করিয়াছিল, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কারণ, মঙ্গলকাব্যগুলি কোনও বিশেষ পূজাচারের অন্তর্ভুক্ত নহে। কোনও দেবতার পূজা উপলক্ষে সেই দেবতার মঙ্গলগান গীত হইলেও, তাহা কখনও প্রকৃত সেই পূজার অন্তর্নিবিষ্ট আচার রূপে গৃহীত হয় নাই। অর্থাৎ আর্থিক সঙ্গতি না থাকিলে কোন দেবতার পূজা উপলক্ষে সেই দেবতার মঙ্গল গানের অনুষ্ঠান না করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু ব্রতকথাগুলি আবৃত্তি না করিলে ব্রত সম্পূর্ণ হয় না। অতএব ব্রতকথাগুলি কোন আকারেই পরিবর্তিত হইতে পারে না, অথচ মঙ্গলকাব্যের পক্ষে ইহার মূল কাহিনী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোন কোন অংশ পরিবর্তিত ও পরিত্যক্ত হইতে কোন বাধা নাই। সেইজন্য যুগে যুগে কবিগণ 'নূতন মঙ্গল' রচনা করিলেও 'নূতন ব্রতকথা' কেহ কখনও রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা যায় না। সুতরাং ব্রতকথাগুলি যে মঙ্গলকাব্য হইতে প্রাচীনতর, এই বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই। এখানে একটি দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ

করা যাইতে পারে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী কাল হইতেই সমস্ত বাংলাদেশ ব্যাপিয়া মনসা-মঙ্গল কাব্য প্রচারিত থাকা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতেই মনসার ব্রতকথা নামক একটি ক্ষুদ্র ব্রতকথা সংগৃহীত হইয়াছে—ইহা এক সদাগর ও তাহার সাত পুত্রবধূর কথা। কেবল বাংলা দেশেরই বিভিন্ন অঞ্চল নহে, ইহা উত্তর প্রদেশের এটোয়া জেলা এবং মহারাষ্ট্র ও গুজরাট হইতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব কাহিনীটি অত্যন্ত প্রাচীন; তথাপি এখন পর্যন্তও ইহা প্রচলিত আছে ইহার সহিত মনসা-মঙ্গলোক্ত কাহিনী অর্থাৎ চাঁদ সদাগর ও বেহুলার কাহিনীর কোনও সম্পর্ক নাই। অথচ এ'কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি অধিকতর কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ। অতএব মঙ্গলকাব্য হইতে যদি ব্রতকথার উৎপত্তি হইত, তবে মনসার ব্রতকথায় চাঁদ সদাগর বেহুলার কাহিনী স্থান না পাইয়া সদাগরের সাত পুত্রবধূর একটি অকিঞ্চিৎকর কাহিনী স্থান পাইবার কোনই কারণ ছিল না। বরং মনসার ব্রতকথাটি হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা প্রাচীনতর যুগে উদ্ভূত হইয়া মনসার ব্রতকথাটি মেয়েলী মনসাব্রতের আচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য পরবর্তী কালে অধিকতর কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি প্রচারিত হইবার যুগেও ইহা তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে। আচারের অন্তর্ভুক্ত না হইলে ইহা সহজেই পরিত্যক্ত হইত এবং ইহার পরিবর্তে স্বচ্ছন্দে সেখানে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি গৃহীত হইত। অতএব মঙ্গলকাব্য হইতে যে ব্রতকথার উৎপত্তি হয় নাই, তাহা এখানে সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। মনসার ব্রতকথার দৃষ্টান্ত হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সর্বত্রই যে ব্রতকথা হইতেই মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাও নহে। মঙ্গলকাব্য অনেক সময় নূতন বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়াও রচিত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া একবার কোন দেবতার মঙ্গলগান সমাজে প্রসারলাভ করিলে সেই দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে গিয়া আর নূতন কোন বিষয়-বস্তু অবলম্বন করা সম্ভব হইত না—শতাব্দীর পর শতাব্দী একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকিত।

ব্রতকথা মৌখিক ধারা (oral tradition) অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে, মঙ্গলকাব্য লিখিত (written) সাহিত্যের অন্তর্গত। প্রত্যেক দেশেই মৌখিক সাহিত্যকে ভিত্তি করিয়াই লিখিত সাহিত্য জন্মলাভ করিয়া থাকে, লিখিত সাহিত্য হইতে মৌখিক সাহিত্য সৃষ্ট হইবার কোন নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায়

না। অতএব ব্রতকথার মৌখিক ধারার উপরই কালক্রমে মঙ্গলকাব্যের লিখিত সাহিত্যের ধারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এ'কথা স্বীকার করিতে হয় যে, ইহার লিখিত ধারা অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য রচনার ধারা প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার মৌখিক ধারাটি লুপ্ত হইয়া যায় নাই। কারণ, মঙ্গলকাব্য দ্বারা ব্রতকথার কোনও উদ্দেশ্যই সাধিত হয় নাই। ব্রতকথার প্রতিপালক স্ত্রী-সমাজ, মঙ্গলকাব্য পুরুষের সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাহাদ্বারাই প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ব্রতকথার ভিতর দিয়া নারীজীবনের ব্যক্তিগত নানা ঐহিক কামনার অভিব্যক্তি দেখা যায়—মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে বৃহত্তর সমাজ-চেতনা রূপলাভ করিয়াছে। ব্রতকথার আবৃত্তি পারিবারিক অনুষ্ঠান মাত্র, কিন্তু মঙ্গলগান বৃহত্তর সামাজিক অনুষ্ঠান। ব্রতকথা অন্তঃপুরের বিষয়, মঙ্গলগান বারোয়ারীতলার বিষয়। একটির ভিতর দিয়া পারিবারিক জীবন ও অপরটির ভিতর দিয়া গোষ্ঠী-জীবন প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্র পরস্পর স্বতন্ত্র—একের অভাব অন্যদ্বারা দূর হয় নাই, বাংলার সমাজের বিশেষ অবস্থায় মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছিল, সেই অবস্থা বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অধঃপতন ও পরিণামে সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিয়াছে; কিন্তু রক্ষণশীল স্ত্রীসমাজের ভিতর দিয়া ব্রতকথা আজ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে। সমাজের মধ্য হইতে ভাব সংগ্রহ করিত বলিয়া সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের অন্তর্নিহিত ভাব ক্রমবিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু শাশ্বত ব্যক্তি-স্বার্থবোধের উপর ব্রতকথার ভিত্তি ছিল বলিয়া তাহা শত শত বৎসরের ব্যবধানেও অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে। অতএব মঙ্গলকাব্য ব্রতকথার দাবী পূর্ণ করিতে পারে নাই; সেইজন্য মঙ্গলকাব্যগুলির বহুলপ্রচারের যুগেও ব্রতকথাগুলি অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিল এবং বর্তমান যুগে মঙ্গলকাব্য লুপ্ত হইয়া গেলেও ব্রতকথাগুলি অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে—পাশ্চাত্যশিক্ষা-সংস্পর্শহীন স্ত্রীসমাজ এখনও ইহা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু পল্লীসমাজেও মঙ্গল-গানের আর প্রচলন নাই।

তথাপি এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মঙ্গলকাব্যের চরিত্রের পরিকল্পনা ব্রতকথারই দেব-চরিত্র পরিকল্পনার প্রভাব-জাত। অন্তঃপুরাশ্রিতা অসহায়া নারী দৈব করুণার উপর সর্বতোভাবে আত্মনির্ভর করিয়া যেমন নিজের অবস্থার মধ্যে শান্তি ও সান্ত্বনার সন্ধান পাইয়া থাকে, একদিন তুর্কী-আক্রান্ত

বাংলার হিন্দু সমাজও অন্তঃপুর-বন্দিনী নারীর মতই তেমনই অসহায় বোধ করিয়াছিল। আত্মশক্তিতে মানুষ যখন বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে তখন সে স্বভাবতঃই দৈব-শক্তির উপর নির্ভর করে। যে অসহায় অবস্থার ভিতর দিয়া নারী দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ব্রতকথাগুলির জন্মদান করিয়াছে, সেই অবস্থার ভিতর দিয়াই পুরুষকেও মঙ্গলকাব্যের দেবত্ববোধ জাগ্রত করিতে হইয়াছিল বলিয়া উভয়ের পরিকল্পিত দেবচরিত্রের মধ্যে ঐক্য প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ'কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর উপর মেয়েলী ব্রতকথা-গুলির প্রত্যক্ষ প্রভাবও কিছু কিছু কার্যকরী হইয়াছে। সেইজন্য অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও ব্রতকথার মূল দেব-চরিত্র এবং মঙ্গলকাব্যের মূল দেব-চরিত্রের মৌলিক উপাদান বিষয়ে বিশেষ কোন পার্থক্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। উভয়-দিকেই উদ্দিষ্ট-দেবতা ভক্তের রক্ষক এবং অভক্তের সংহারক এবং উভয় ক্ষেত্রেই দেবতাদের মর্ত্যলোকে নিজস্ব পূজা প্রচারই লক্ষ্য।

ব্রতকথার অনেক অপরিস্ফুট বিষয় মঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়া সুপরিস্ফুট হইয়াছে—এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে মঙ্গলকাব্যগুলি অনেক সময় ব্রতকথার টীকা বা ভাষ্যের কাজ করিয়াছে। ব্রতকথার মধ্যে সূত্রাকারে যে সকল বিষয় অবস্থান করিয়াছে, মঙ্গলকাব্যে তাহাই বিস্তৃততর বর্ণনালাভ করিয়াছে। ব্রতকথার সূত্র বা ইঙ্গিতগুলিকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য নূতন নূতন চরিত্র ও ঘটনা সন্নিবেশের স্বাধীনতা মঙ্গলকাব্যের কবিগণ সর্বদাই গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রতকথার চরিত্রগুলি কোনও বিশিষ্ট পরিচয় লাভ করিতে পারে না, তাহাদের নির্বিশেষ পরিচয় মাত্র প্রকাশ পায়; যেমন, এক রাজা, এক সদাগর কিংবা এক বামুন। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলি বিশিষ্ট পরিচয় লাভ করিয়া থাকে; যেমন, রাজা বীরসিংহ, রাজা চন্দ্রকেতু, চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর, সোমাই ওঝা ইত্যাদি। এই জন্যই ব্রতকথার চরিত্রগুলি সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় না, মঙ্গলকাব্যে ব্রতকথার চরিত্রগুলির এই অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে—ইহাতে প্রত্যেক চরিত্রই সুস্পষ্ট ব্যক্তিপরিচয় লাভ করিয়া আধুনিক উপন্যাসবর্ণিত চরিত্রের মর্যাদা লাভ করে।

ব্রতকথার প্রধান ধর্ম সংক্ষিপ্ততা, বর্ণনার বাহুল্য ইহাতে সাধারণতঃ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে; ইহা মৌখিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, কারণ, সংক্ষিপ্ততা স্মরণ করিয়া রাখিবার পক্ষে সহায়ক হইয়া থাকে। মঙ্গলকাব্য লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত

বলিয়া বর্ণনা-বাহুল্য ইহার বৈশিষ্ট্য। মঙ্গলকাব্যের বিষয়-বর্ণনা অনেক সময় 'এপিক-ধর্মী' হইয়া উঠে, কিন্তু ব্রতকথায় এই গুণ প্রকাশ পাইবার উপায় নাই। ব্রতকথায় চিত্র-রূপের বৈচিত্র্য নাই; ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতে হইলে সকল ব্রতকথাতেই শুনিতে পাওয়া যাইবে 'হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গোয়াল ভরা গরু, মরাই ভরা ধান'। ইহার চরিত্রগুলি যেমন নির্বিশেষ, তেমনই ইহার কোন চিত্ররূপও সবিশেষ পরিচয় লাভ করিতে পারে না; সেইজন্য ইহার চরিত্র-গুলির মত চিত্রগুলিও মনের উপর কোনও দাগ কাটিতে পারে না।

পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ হইতে জাত সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় প্রেরণায় ব্রতকথাগুলির জন্ম, অলৌকিকতা ইহাদের অবলম্বন, কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলি বৃহত্তর সমাজ-চেতনার ফল, ইহাদের বাস্তব ধর্ম অনেক সময় ইহাদের অলৌকিকতাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া উচ্চাঙ্গ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা দিয়া থাকে। ব্রতকথার পরিকল্পনায় রক্ষণশীল ও মঙ্গলকাব্যের পরিকল্পনায় প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পায়। কারণ, ব্রতকথা কোনদিন নূতন করিয়া রচিত হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু 'নূতন মঙ্গল' রচিত হইয়া সর্বদাই সমাজের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্য

ব্রতকথাগুলি প্রধানতঃ গদ্যেই আবৃত্তি করা হইয়া থাকে, কোন কোন সময় ইহাদেব গদ্যরূপ পদ্যাকারে পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ইহাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য লোপ পাইয়াছে। গদ্যে আবৃত্তির ভিতর দিয়া কথার (tale) যে একটি বিশিষ্ট রস প্রকাশ পায়, পদ্যের বাঁধাধরা ও একঘেয়ে ছন্দের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না। গদ্যেরও যে একটি ছন্দ ও সুর আছে, ব্রতকথার আবৃত্তির মধ্য দিয়া তাহা ধরা পড়ে। মৌখিক সাহিত্যধারার অন্তর্গত গদ্য ব্রতকথাগুলি যখন কোন কোন ক্ষেত্রে লিখিত হইবার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন তাহাদের গদ্যরূপ পরিহাব করিয়া বৈচিত্র্যহীন পয়ার-ত্রিপদী বা পাঁচালী-লাচাড়ী ছন্দে পদ্যাকারে সেগুলি লিখিয়া লইবার প্রবৃত্তি দেখা দিল। ইহার কারণ, সেকালের বাংলা সাহিত্যে গদ্যের কোন লিখিত রূপ ছিল না—যাহা কিছু লিখিত হইত, তাহাই পদ্যে লিখিত হইত। সেইজন্য লক্ষ্মীর ব্রতকথার যখন আমরা মৌখিক আবৃত্তি শুনি, তখন ইহা গদ্যেই শুনিতে পাই, কিন্তু যখন ইহার কোন লিখিত রূপ পাঠ করিতে শুনি, তখন তাহা পদ্যেই শুনিতে পাই। পুরুষ পুরোহিতের হাতে পড়িয়া কোন কোন ব্রতকথা লিখিত হইয়া পদ্যরূপ লাভ করিয়াছে ; অতএব যে সকল দেবতায় পুরুষের প্রয়োজন, একান্তভাবে নারীর স্বার্থের সঙ্গে যাঁহাদের বিশেষ কোন যোগ নাই, তাঁহাদের সম্পর্কিত ব্রতকথাগুলি অধিকাংশই পদ্যরূপ লাভ করিয়া প্রচারিত হইয়াছে। ব্রতকথার পদ্যরূপের নাম পাঁচালী। অবশ্য পাঁচালী কথাটি আরও নানা অর্থে খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সকল বিভিন্ন অর্থ এখানে বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন নাই, তবে সাধারণ ভাবে এ'কথা এখানে বলা যাইতে পারে যে, আখ্যায়িকামূলক পদ্য রচনাকেই মধ্যযুগে পাঁচালী বলিত। সেই অর্থেই ব্রতকথার পদ্যরূপকে পাঁচালী বলা হইলেও কালক্রমে ইহা একটি বিশিষ্টার্থ লাভ করিয়াছে। এই শ্রেণীর তিনটি পাঁচালী মধ্যযুগের শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে—তাহা সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী এবং ত্রিনাথের পাঁচালী। ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্রের সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য এই যে, ব্রতকথার দেবতা প্রধানতঃ স্ত্রী-জাতীয়া,

কিন্তু ইঁহারা সকলেই পুরুষ। ব্রতকথার দেব-চরিত্রের সঙ্গে একমাত্র নারীরই সম্পর্ক—নারীর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-সমৃদ্ধিরই তাঁহারা দাত্রী, পুরুষের বহির্মুখী-জীবনের সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তাঁহাদের বিশেষ কোন যোগ নাই। কিন্তু সত্যনারায়ণ, শনি এবং ত্রিনাথ—ইঁহারা সকলেই পুরুষের বহির্মুখী জীবনের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হইয়া পুরুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। ইঁহাদের কাহারও সম্পর্কে কোন গদ্য ব্রতকথা প্রচলিত নাই; কারণ, স্বতন্ত্রভাবে নারীর সমাজে তাঁহাদের কোনও প্রতিষ্ঠা নাই। পুরুষের মনেই তাঁহাদের মাহাত্ম্যের বিকাশ হইয়াছে, সেইজন্য তাঁহাদের মাহাত্ম্যসূচক পদ্য রচনাই সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, এই পদ্য রচনাই পাঁচালী নামে পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ইহাদের মৌলিক সম্পর্ক রহিয়াছে।

বাংলা দেশে লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক যত পাঁচালী প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালীরই সর্বাধিক প্রচার হইয়াছিল। ইহার উদ্ভব যে খুব প্রাচীন, তাহা বলিতে পারা যায় না; কারণ, খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী ইহার কোনও পুঁথিই পাওয়া যায় না; কিংবা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যেও সত্যনারায়ণের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। 'স্কন্দপুরাণে'র এক স্থলে সত্যনারায়ণের উল্লেখ আছে সত্য, তবে তাহা যে পরবর্তী যোজনা তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব মনে হয়, খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী কিংবা তাহার সামান্য পূর্ববর্তী কালের কোনও অলৌকিকতা-সিদ্ধ মুসলমান ফকির বা পীরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার সমসাময়িককাল কিংবা তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরবর্তী কাল হইতেই সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী-গুলি রচিত হইতে আরম্ভ করে।

মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ভারত হইতে মুসলমান ফকির-গণ বাংলা দেশে আসিয়া প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন এবং রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় তাঁহারা এদেশের সমাজের জনসাধারণের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারে মনোযোগী হন। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য-পুষ্ট এই সকল মুসলমান সাধু ফকিরদিগের প্রতি হিন্দু জনসাধারণের দৃষ্টি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি তাহাদের যে অবিমিশ্র শ্রদ্ধাভাবের উদয় হয়, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। শ্রদ্ধাভাবটি এখানে ছিল গৌণ, যে ভাবটি মুখ্যতঃ উদয় হইয়াছিল, তাহা ভয়; আত্মশক্তিতে মানুষ যখন বিশ্বাস হারায়, তখনই দেবশক্তির উপর তাহার নির্ভর করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া

উঠে, এ'কথা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। মুসলমান রাজশক্তি কর্তৃক শাসিত বাংলার হিন্দু সমাজ সেদিন আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রক্ষা করিবার সকল প্রকার অবলম্বন হইতে বঞ্চিত হইয়া একান্ত দৈব-নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্যের ভিতর দিয়াও এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল; তাহার ফলেই মধ্যযুগের বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি যেমন গড়িয়া উঠিয়াছিল, পাঁচালীগুলিও তেমনই গড়িয়া উঠিয়াছে। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মধ্যেও সেইজন্য মঙ্গলকাব্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যগুলি চারি শত বৎসর ব্যাপিয়া বাংলার আখ্যায়িকা-মূলক কাব্য রচনার যে ধারার প্রবর্তন করিয়াছিল, সেই ধারারই দূরতম শাখারূপে সত্যনারায়ণের পাঁচালী জন্মলাভ করিয়াছিল।

চৈতন্যধর্ম প্রবর্তিত হইবার পর হইতে সমাজে শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণের উপাসনা একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিল। মুসলমান ধর্মের বলিষ্ঠ একেশ্বরবাদ যখন এ'দেশে প্রসার লাভ করিতেছিল, তখন চৈতন্যধর্ম শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণকে অবলম্বন করিয়া এ'দেশের মধ্যে এক সুস্পষ্ট একেশ্বরবাদ গড়িয়া তুলিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ বহির্ভূত তৎকালীন বাংলার হিন্দু সমাজের উপরও তাহার প্রভাব স্বভাবতঃই বিস্তৃতি লাভ করিল। এই যুগে সত্যপীর সত্যনারায়ণরূপে হিন্দুর গৃহে পূজা লাভ করিতে লাগিলেন। ইহার বিজাতীয় সকল উপকরণ নারায়ণের নামে শোধিত হইয়া হিন্দুর দেব-মন্দিরে নিঃসঙ্কোচে প্রবেশাধিকার লাভ করিল।

বাংলাদেশ প্রাচীনকাল হইতেই ধর্মসমন্বয়ের দেশ। কৃত্তিবাস বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়া শক্তিদেবী চণ্ডীর পূজা করাইয়াছেন; বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকাকে দিয়া কৃষ্ণকালীর উপাসনা করাইয়াছেন,—তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণই কালীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম সমাজের বহু সঙ্কীর্ণতা ও ছোটবড়র পার্থক্য দূর করিয়া দিয়াছে। মুসলমান ধর্ম যখন বাংলা দেশের উপর আপনার একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, তখন হিন্দু সমাজ তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিবার পরিবর্তে তাহার সম্মুখীন হইয়া মুসলমান ধর্মের মৌলিক উপাদানগুলিকে নিজের ধর্মের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছে। খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ সকল দিক দিয়াই পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী ক্রমপরিণতিরূপে আমরা খৃস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণেশ্বরের মূর্তিমান বেদান্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে লাভ

করিয়াছি। বাঙ্গালীর সর্বধর্মসমন্বয়ের দীর্ঘ সাধনা তাঁহার মধ্যেই চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। সত্যনারায়ণ উপাসনার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ধর্মের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই প্রয়াসের মৌলিক উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দু সমাজ তাহা বিস্মৃত হইয়া সত্যনারায়ণের উপাসনাকে নিজস্ব ধর্মাচারেব অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের গবেষকদের মধ্যে ইহার যে তাৎপর্যই অনুভূত হউক না কেন, হিন্দু সমাজের নারায়ণোপাসনার মধ্যেই ইহার পরিণতি আজ সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। সত্যনারায়ণের নামে ভগবানের অহৈতুকী করুণা শক্তির উদ্বোধনই আজ এই উপাসনার লক্ষ্য। সত্যনারায়ণের পাঁচালী বাংলার জনশ্রুতিমূলক (traditional) সাহিত্যের অন্তর্গত, যে কবিই ইহা বাংলার যে অঞ্চলেই সর্বপ্রথম রচনা করুন না কেন, তাহা আজ বাংলার সর্বত্রই যে কেবলমাত্র প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা নহে—ইহার মৌলিক বৈশিষ্ট্যও সর্বত্রই সমানভাবে রক্ষা পাইয়াছে। সত্যনারায়ণের পাঁচালী সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষেই পুরোহিত কিংবা তাহার সহকারী কর্তৃক আবৃত্তি করা হয়—এই আবৃত্তি পূজাচারেরই অন্তর্ভুক্ত। সেই জন্যই মৌলিক কাহিনীতে ইহার কোনও পরিবর্তন সাধন সম্ভব হয় নাই। তবে শত শত কবি আড়াই শত বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ এই বিষয় অবলম্বন করিয়া পাঁচালী রচনা করিয়া আসিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও ভারতচন্দ্র রায়ও এই বিষয়ে পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই দুইজন কবির রচনা সমগ্র সমাজের এই বিষয়ক পাঁচালী রচনার ধারা রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে নাই—দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন সময়ে একই বিষয় অবলম্বন করিয়া পাঁচালী রচনা করিয়াছেন। অতএব বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয়ে ইহাদের যে স্থানই থাকুক না কেন, বাংলার আঞ্চলিক রস ও অধ্যাত্ম পরিচয়ে যে ইহাদের মূল্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়, তাহা স্বীকার করিতেই হয়।

শনির পাঁচালী সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মত এত ব্যাপক প্রসার লাভ করিতে পারে নাই—প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গেই ইহার প্রচার সীমাবদ্ধ। শনির পূজা উপলক্ষেই ইহা পঠিত হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত ইহার কোন স্বাধীন পরিচয় নাই। শনির দশায় মানুষ কি প্রকার অকারণ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকে, তাহারই কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবৎস-চিন্তার পৌরাণিক আখ্যানের ভিতর দিয়া অনুরূপ

ভাব ব্যক্ত করা হইলেও, বাংলার শনির পাঁচালীর কাহিনীটির সঙ্গে পুরাণের কোনও যোগ নাই। ইহা বাঙ্গালীর নিজস্ব সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জাত। শনি ম্লেচ্ছ গ্রহ—হিন্দুর গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার পূজার অনুষ্ঠান হয় না, উন্মুক্ত গৃহাঙ্গিনায় তাঁহার পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে এবং সেখানেই তাঁহার পাঁচালী পঠিত হয়। কোন উচ্চবর্ণের কবি তাঁহার পাঁচালী রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা যায় না—ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের অনুযায়ী কোন সদাগর চরিত্র ইহার নায়ক নহে। ইহার নায়ক ব্রাহ্মণ, সুতরাং দরিদ্র এবং ভিক্ষুক, কিন্তু কাহিনীর মধ্য দিয়া ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যোচিত অন্যান্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। রচনার দিক দিয়া ইহাও অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে।

সর্বশেষে ত্রিনাথের পাঁচালীর কথা উল্লেখ করিতে হয়। ইহার প্রচার সর্বাপেক্ষা সীমাবদ্ধ। কেবলমাত্র দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিত নাথসম্প্রদায়ের পুরুষ সমাজেই ইহা প্রচলিত। হিন্দু সমাজের নিম্নতম স্তরে ব্রতকথা কিংবা মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালীর প্রচলন নাই। কিন্তু ত্রিনাথের পাঁচালী যাহার মধ্যে প্রচলিত, তাহা সমাজের নিম্নতম স্তর বলিয়াই উল্লেখ করিতে হয়। অবশ্য এ' কথা বলিতে পারা যায় যে, নাথ সম্প্রদায় হিন্দুসমাজ-নিরপেক্ষ এক স্বতন্ত্র সমাজ; অতএব হিন্দু সমাজের সঙ্গে তুলনায় তাহা নিম্নে হইলেও ইহার নিজস্ব ক্ষেত্রে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সাধারণতঃ এই সমাজ সম্পূর্ণ নিরক্ষর, অতএব ত্রিনাথের পাঁচালী পদ্যাকারে রচিত হইলেও ইহা মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্গত। অতএব এই দিক দিয়া ইহা ব্রতকথার সমধর্মী। ত্রিনাথ অবশ্য কালক্রমে শিবের সঙ্গে অভিন্ন হইয়াছেন, কিন্তু হিন্দু ত্রয়ী (trinity) ও বৌদ্ধ ত্রিশরণের মতই এককালে ইহাদ্বারা নাথ সম্প্রদায়ের তিনজন শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু অর্থাৎ মীননাথ, গোরক্ষনাথ, ও জালন্ধরীনাথকে বুঝাইত বলিয়া মনে হয়। যাই হউক, ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্রের প্রভাব ইহার উপর স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, হিন্দু সমাজের প্রত্যক্ষ সংস্রবের বহির্দেশেও মঙ্গলকাব্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ত্রিনাথের পাঁচালীর কাহিনী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাহাতে দেবতা ত্রিনাথের অহৈতুকী করুণা ও অলৌকিক শক্তির কথা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া যে কাহিনীগুলি প্রকাশ পায়, তাহা অক্ষম অনুকরণেরই ফলমাত্র।

বিজয়কাব্য ও মঙ্গলকাব্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'বিজয়' বলিয়া পরিচিত কয়েকখানি কাব্য প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ ইহাদিগকে 'বিজয়-কাব্য' আখ্যা দিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে 'বিজয়-কাব্যে'র কি পার্থক্য, তাহা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হয়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, মঙ্গলকাব্যের মত একই শ্রেণীর বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া 'বিজয়-কাব্য' রচিত হয় না। মালাধর বসু কৃত 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' বা 'গোবিন্দ-বিজয়'। ইহা অনুবাদ-সাহিত্যের অন্তর্গত। কোনও মহাভারতের অনুবাদকেও 'পাণ্ডব-বিজয়' বলা হয়। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে'র অন্তর্গত 'দুর্গাসপ্তশতী' অবলম্বনে রচিত বাংলা পদ্য রচনাকে সাধারণতঃ 'চণ্ডী-বিজয়' বলিয়া উল্লেখ করা হইত। বলা বাহুল্য যে 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', 'পাণ্ডব-বিজয়', 'চণ্ডী-বিজয়' প্রভৃতির মধ্যে পারস্পরিক কোনও সম্পর্কই নাই—ইহারা বিভিন্ন বিষয়ক সংস্কৃত রচনার বাংলা অনুবাদ মাত্র। তারপর নাথগুরু গোরক্ষনাথের মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া মধ্যযুগের পল্লীকবিগণ যে আখ্যায়িকা-গীতি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'গোরক্ষ-বিজয়'। ইহা বাংলার নাথ-সম্প্রদায়-বিষয়ক রচনা হইলেও, লোক-সাহিত্যে (folk-literature)-র অন্তর্গত। ইহাতে কয়েকজন নাথগুরুর অলৌকিক ভজন-সাধনের কথা বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি ইহার কাহিনী মানবিক গুণ-সমৃদ্ধ। বিষয়-বস্তু, আঙ্গিক ও ভাব—ইহাদের কোনদিক হইতেই ইহার সঙ্গে পূর্বোক্ত রচনাগুলির কোনই যোগ নাই। মুসলমান ধর্মবিষয়ক উপকরণ গ্রহণ করিয়া 'রসুল-বিজয়' নামকও একখানি কাব্য রচিত হইয়াছিল—বলাই বাহুল্য যে, ইহার সঙ্গেও পূর্বোল্লিখিত কোন রচনারই কোনও সম্পর্ক নাই। অতএব ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মঙ্গলকাব্য যেমন প্রায় অভিন্ন প্রকৃতির বিষয়-বস্তু লইয়া একই আদর্শে অনুপ্রাণিত রচনা, তথাকথিত 'বিজয়-কাব্য' তেমন নহে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'বিজয়-কাব্য' নামে কোন কাব্যের শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব হয় না। 'বিজয়'-নামধেয় কাব্যসমূহের কোন কোনটি অনুবাদ সাহিত্যের অন্তর্গত, কোনটি লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত, আবার কোনটি মুসলমান-সাহিত্যেরও অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়। অতএব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'বিজয়-কাব্য' বলিয়া কাব্যের কোনও শ্রেণীবিভাগ কিংবা মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে ইহাদের কোনও সম্পর্কের কথা স্বীকার করা যায় না।

লোক-কথা ও মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্য লিখিত (written) সাহিত্য-ধারার অন্তর্গত এবং লোক-কথা মৌখিক (oral) সাহিত্য-ধারার অন্তর্গত হইলেও উভয়ের মধ্যে বিষয়গত কতকগুলি সাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ লোক-সাহিত্যের মৌখিক ধারা (oral tradition)-র উপর ভিত্তি করিয়াই মঙ্গলকাব্যের লিখিত (written) ধারার সৃষ্টি হইয়াছে। লোক-সাহিত্যের যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ ব্রতকথা হইলেও লোক-কথা (folk-tale)-র বহু বিভিন্ন উপাদানও আসিয়া কালক্রমে ইহাতে সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছে। কেবলমাত্র 'মনসা-মঙ্গল' কাহিনী হইতে তাহাদের কিছু নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা গেল।

লোক-কথায় দেবদেবীর জন্ম একটি অতি উল্লেখযোগ্য বিষয়; দেবতা অলৌকিক চরিত্র, অতএব অলৌকিক উপায়েই ইঁহাদের জন্ম হইয়া থাকে। পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদ্‌গণ এই বিষয়টিকে supernatural birth motif বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। মনসা-মঙ্গল কাব্যে মনসার জন্মবৃত্তান্তটি যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ইহার মধ্যেও এক অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। শিব-বীর্যে পদ্ম-পাতার উপর অযোনি-সম্ভবা মনসার জন্ম হইয়াছে— স্বাভাবিক নিয়মে জননীগর্ভে তাঁহার জন্ম হয় নাই। বিভিন্ন জাতির লোক-সাহিত্যে এই বিষয় অবলম্বন করিয়া অগণিত রূপকথা (fairy tale) রচিত হইয়াছে।

লোক-কথার একটি সাধারণ বিষয় এই যে, ইহাতে কনিষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠা কন্যা, কিংবা কনিষ্ঠা পুত্রবধূ অসাধ্য সাধন করিবে। পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদ্‌গণ ইহাকে successful youngest son (daughter or daughter-in-law) motif বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মনসা-মঙ্গল কাহিনীর মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, চাঁদ সদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দর এবং কনিষ্ঠা পুত্রবধূ বেহুলা যথার্থই অসাধ্য সাধন করিয়াছে। বাংলাদেশেও কোন কোন রূপকথায় শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাজা তাঁহার কনিষ্ঠা রাণী ও তাহার সন্তানকে বনবাস দিয়াছেন, কিন্তু অবশেষে সেই কনিষ্ঠা রাণীর সন্তানই নানা অসাধ্য সাধন করিয়া রাজা ও তাঁহার অন্যান্য রাণীর সন্তানকে নানা ভাবে রক্ষা করিয়াছে, তাহার ফলে পরিণামে সে রাজার অনুগ্রহ

লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। লোক-কথায় সাত পুত্রের জনক রাজা কিংবা সদাগরের একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্রই কাহিনীর নায়কত্ব লাভ করিয়া থাকে, অন্যান্য পুত্রদিগের কোন পরিচয় প্রকাশ পায় না। চাঁদ সদাগরের কাহিনীতেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁহার সাত পুত্র ও সাত পুত্রবধূ ছিল; কিন্তু তাহাদের ভিতর হইতে একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠা পুত্রবধূই কাহিনীর মধ্য দিয়া নিজেদের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রকাশ করিতে সক্ষম হইল, জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধূগণ পটভূমিকার মধ্যে অস্পষ্ট হইয়া রহিল।

লখীন্দরের পুনর্জীবন-লাভ লোক-সাহিত্যের একটি সাধারণ বিষয়। পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদ্‌গণ ইহাকে resuscitation motif বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। বিবিধ উপায়ে এই পুনর্জীবন-লাভ সম্ভব হইতে পারে। ইংরেজি লোক-কথায়ও শুনিতে পাওয়া যায় 'the parts of the dismembered corpse are brought together and revived.' (Thompson, *The Folktale*, New York, 1946, p. 255). এই উপায়েই লখীন্দরের পুনর্জীবন-লাভ সম্ভব হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, মঙ্গলকাব্যের মূল কাহিনীর পরিণতিতে লোক-সাহিত্যেরই একটি বিষয় অবলম্বন করা হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যে এই বিষয়ে কোনও মৌলিকতা নাই।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির লোক-সাহিত্যে এই একটি বিশ্বাস প্রচলিত থাকিতে দেখা যায় যে, মানুষের দেহ ধ্বংস হইয়া গেলে তাহার আত্মা ক্ষুদ্রতর কোনও জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে—ইহা একেবারে ধ্বংস হইয়া যায় না। একজন পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিৎ বলিয়াছেন, 'Sometimes it is thought of as having the form of a mouse, or bird or butterfly which leaves the mouth at the supreme moment' (ঐ, পৃ. ২৫৮)। মনসা-মঙ্গল কাব্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, অনিরুদ্ধ ও উষা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া যখন আত্মত্যাগ করিল, তখন—

সোনার পুতুলি দুটি ছাই হঞা গেল।
ভ্রমর-ভ্রমরী দুটি উড়িতে লাগিল॥ —(বিষ্ণু পাল)

ইহাদের আত্মা দুইটি ভ্রমর-ভ্রমরীর রূপ লাভ করিয়া প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া পড়িল। পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যের অনুরূপ ইঁদুর, পাখী কিংবা প্রজাপতির পরিবর্তে এখানে যে মানব-মানবীর আত্মা ভ্রমর-ভ্রমরীর রূপ লাভ করিল, ইহার

কারণ, বাংলার লোক-সাহিত্যে ভ্রমর-ভ্রমরী একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। বাংলার ছেলেভুলানো ছড়ায়ও শুনিতে পাওয়া যায়—

হেঁসেল ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমরা-ভ্রমরী।
মায়ের কোলে ঘুম যায়রে দুধের কুমারী॥

তারপর বাংলার বহু রূপকথায় শুনিতে পাওয়া যায় যে, কোন দৈত্য স্ফটিক-স্তম্ভের মধ্যে তাহার ভ্রমররূপী আত্মাটি গোপনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আহারান্বেষণে বাহির হইয়া যায়। তারপর একদিন এক রাজপুত্র আসিয়া স্ফটিকস্তম্ভ ধূলিসাৎ করিয়া ভ্রমরটি বিনাশ করে—তাহাতেই দৈত্যের মৃত্যু হয়। অতএব বাংলার লোক-সাহিত্যে ভ্রমর জীবাত্মার প্রতীক্ রূপে একটি বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। সেই সূত্রেই মনসা-মঙ্গল কাব্যের অনিরুদ্ধ ও ঊষার আত্মা এখানে ভ্রমর-ভ্রমরীর রূপ লাভ করিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, এখানেও লোক-সাহিত্যের সাধারণ একটি বিষয় (motif) মঙ্গল কাব্যের উপজীব্য হইয়াছে।

মনসা-মঙ্গল কাহিনীতে চাঁদ সদাগর এবং শঙ্কর গারড়ী উভয়কেই মহাজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মহাজ্ঞান কি? এই জ্ঞানের অধিকারী হইলে অসাধ্য সাধন করা যায়। কিন্তু ইহা সাধারণ জ্ঞানের মত নহে। সাধারণ জ্ঞান কেহ হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে না, কেহ কাড়িয়াও লইতে পারে না, কিন্তু কৌশল জানা থাকিলে ইহা হরণ করিয়া লইয়া যাওয়া যায়; ইহা অপহৃত হইলে সকল শক্তি লোপ পায়। পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যে ইহাকে magic power বা magic wisdom বলে। এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিশেষ সাধনার প্রয়োজন। শঙ্কর গারড়ী নেতার সাধনা করিয়া নেতা-প্রদত্ত সর্পমাংস-মিশ্রিত অন্ন আহার করিয়া এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি নিজে যেমন 'আকাট, অকুট' শরীর লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই সর্পবিষ নাশ করিবার শক্তিতে ধন্বন্তরির মত শক্তিশালী রূপে সমাজে গণ্য হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যেও এই ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক যে 'one can acquire magic wisdom from eating something, particularly from eating a part of a serpent' (ঐ, পৃঃ ২৬০)। পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই যে মহাজ্ঞান বা magic power, তাহা অপহৃত হইতে পারে। মনসা-মঙ্গল কাব্যেও আমরা দেখিয়াছি যে, শঙ্কর গারড়ী এবং চাঁদ সদাগর উভয়েই তাঁহাদের জীবনের এক দুর্বল মুহূর্তে ইহা হরণ করিবার কৌশল এক ছদ্মবেশিনী নারীর নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন—তাহার ফলেই তাহা

অপহৃত হইয়াছে। 'Magic power stolen by concubine' এবং 'betrayal of husband's secret by wife'—পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যের ইহারা সাধারণ বিষয় —বাংলাদেশেও এই শ্রেণীর দুই একটি লোক-কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোক-সাহিত্যেরই বিষয় এখানেও মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য হইয়াছে। লোক-সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার কোনও ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করা যায় না। বাংলার লোক-সাহিত্য বাংলা ভাষায় রচিত, ইহার এই বহিরঙ্গ পরিচয়ের কথা বাদ দিলে ভাবের দিক দিয়া ইহাতে যে সর্বজনীনত্ব আছে, তাহা ইহাকে বিশ্বের লোক-সাহিত্যের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে সহায়তা করিয়াছে। উপরের আলোচনা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যাইবে।

পূর্বনির্দিষ্ট মত সর্পাঘাতে লখীন্দরের মৃত্যু এবং তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর সহায়তায় তাঁহার পুনর্জীবন প্রাপ্তির বিষয়ও লোক-কথারই সাধারণ বিষয় (motif) মাত্র। মার্কিনদেশীয় লোক-সাহিত্যে Enchanted Prince-নামক একটি কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। 'At the prince's birth it is prophesied that he will meet his death from a serpent. To forestall this fate he is confined to his tower. When he grows up, however, he sets out on adventures and finds a king who will give his daughter in marriage.........the marriage takes place. In later parts of the story the princess saves his life from a snake.' (ঐ, পৃ. ২৭৪)। এই রূপকথার সঙ্গে মনসা-মঙ্গল কাহিনীর যে মৌলিক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পারস্পরিক কোনও প্রত্যক্ষ কিংবা অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল নহে—মানব-মনের শাশ্বত ঐক্যেরই ফল। এখানেও একটি মঙ্গলকাব্যের মৌলিক কাহিনী লোক-সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতেই যে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা অনুভূত হইবে।

প্রত্যেক দেশেরই লোক-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সতী নারী কতকগুলি অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী হয়; এই শক্তির বলেই সে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এ' দেশের পুরাণেও লক্ষহীরার কাহিনীতে এক সতীর উল্লেখ আছে—তাঁহার চরিত্রেও যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও লোক-সাহিত্যের প্রেরণা হইতেই জাত। মনসা-মঙ্গলের সতী চরিত্র বেহুলাও কতকগুলি অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ধনামনা, ঘাটওয়াল, গোদা, টেটন

ইত্যাদির পাপ অভিলাষ ব্যর্থ করিয়া যে তিনি নিজের কর্তব্যপথে অগ্রসর হইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছেন, এই অলৌকিক শক্তির বলেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু কাহিনীর শেষভাগে তাঁহার সতীত্বের যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার ভিতর দিয়াই তাহার চরম শক্তির পরীক্ষা হইয়াছে। এখানে সাধারণভাবে মনে হইতে পারে যে, রামায়ণে সীতার অগ্নি-পরীক্ষার কাহিনী হইতেই মনসা-মঙ্গলেও বেহুলার সতীত্বের পরীক্ষার কথা আসিয়াছে। কিন্তু এ' কথা সত্য নহে। রামায়ণে কেবল-মাত্র সীতার অগ্নি পরীক্ষার কথাই আছে, কিন্তু মনসা-মঙ্গলে তাহার পরিবর্তে বেহুলার 'অষ্ট পরীক্ষা'র কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা লোক-সাহিত্যের সাধারণ বিষয় মাত্র—রামায়ণের প্রভাব-জাত নহে; যদি মনসা-মঙ্গলের উপর ইহা রামায়ণের প্রভাব-জাত হইত, তবে বেহুলার 'অষ্ট পরীক্ষা'র পরিবর্তে একমাত্র অগ্নি-পরীক্ষার কথাই থাকিত। পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্য সমালোচকগণ এই বিষয়টি chastity test motif বলিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিৎ বলিয়াছেন, 'Many forms of testing are found in folklore and legend ; they are generally connected with ordeal. The test by fire is the most common.' রামায়ণের মধ্যে এই বিষয়ক নিতান্ত সাধারণ প্রণালীটিই অবলম্বন করা হইয়াছে, কিন্তু মনসা-মঙ্গলে সর্প-পরীক্ষা (snake ordeal), কুশাঙ্কুর-পরীক্ষা (razor's edge ordeal), জল-পরীক্ষা (water-ordeal), শূন্য-পরীক্ষা (পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যে ইহার কোনও প্রতিরূপ পাওয়া যায় না), জৌঘর-পরীক্ষা (fire ordeal), তুলা-পরীক্ষা ইত্যাদি বিবিধ পরীক্ষার কথা উল্লেখ আছে। ইহার অর্থ এই যে, মনসা-মঙ্গলের প্রত্যক্ষ প্রেরণা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ হইতে আসে নাই—লোক-সাহিত্যের বিস্তৃততর ক্ষেত্র হইতে আসিয়াছে।

সর্প বা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার প্রতিহিংসা গ্রহণের বৃত্তান্ত লইয়াই মনসা-মঙ্গল রচিত হইয়াছে। সর্পের প্রতিহিংসা প্রত্যেক দেশেরই লোক-সাহিত্যের একটি নিতান্ত সাধারণ বিষয়। ইংরেজিতে ইহাকে revengeful serpent motif বলা হইয়া থাকে। 'Injured snake avenges' নামেও লোক-সাহিত্যের যে একটি বিষয় (motif) আছে, তাহাও মনসা-মঙ্গল কাহিনীর ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়; কারণ, injury বা আঘাত যে সর্বদাই শারীরিক হইতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই; সর্পের পক্ষে যে আঘাত শারীরিক, সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পক্ষে তাহাই মানসিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অতএব ইহাও মনসা-মঙ্গল কাব্যের

মৌলিক বিষয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে, এখানেও মনসা-মঙ্গলের কাহিনী লোক-সাহিত্যের প্রেরণা হইতে জাত—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ হইতে জাত নহে।

সমুদ্রমধ্যস্থ পুরীর বর্ণনা মনসা-মঙ্গল কাব্যের অন্যতম বিষয়, কমলে কামিনীর বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গলের বিষয়ীভূত। সমুদ্রমধ্যস্থ পুরীর পরিকল্পনা লোক-সাহিত্যেরই প্রেরণা-জাত। একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত এই সম্পর্কে অনুমান করিয়াছেন, 'The literature of chivalry must have been a great stimulus to tales about remarkable castles—castles of gold or silver or even of diamond, castles suspended on chains or upheld by giants or built on the sea.' প্রাচীন বাংলাদেশেও বহির্বাণিজ্যের যুগ ইউরোপের Chivalryর যুগের মতই সমাজের বহির্মুখী কর্মবহুল যুগ ছিল—অতএব সেই যুগেই এ'দেশেরও লোক-সাহিত্যের মধ্যে অনুরূপ প্রেরণা কার্যকরী থাকা একান্তই স্বাভাবিক।

ব্রতকথা বাংলার লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। মঙ্গলকাব্যের মত ব্রতকথারও উদ্দেশ্য লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন, ব্রতকথা হইতেই যে মঙ্গল-কাব্যের প্রেরণা আসিয়াছে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ইতিহাস ও মঙ্গলকাব্য

বাংলার মধ্যযুগের প্রথম ভাগে বৈষ্ণব ও শাক্তের মিলন পরবর্তী সময়ের মত এত ঘনিষ্ঠ ছিল না। শাক্তগণ বৈষ্ণবদিগকে যে কতদূর অবজ্ঞা ও ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, মধ্যযুগের বৈষ্ণব ও শাক্ত-সাহিত্যে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই-সকল সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাস ব্যতীতও এই মঙ্গলকাব্যগুলি হইতে তৎকালীন দেশের রাজনৈতিক অবস্থারও কতক আভাস পাওয়া যায়। মনসা-মঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হাসান হোসেনের পালা, চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্গত অনার্য ব্যাধ কর্তৃক শৈবরাজ্য কলিঙ্গ আক্রমণের কাহিনী, ধর্মমঙ্গলের অন্তর্গত ডোম সেনাপতির সাহায্যে লাউসেনের ঢেকুর-বিজয়—ইহাদের মধ্যে সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসেরও একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলির ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করিবার কালে এ'কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইহারা সর্বাংশেই সমসাময়িক কালের ইতিহাস নহে। অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে যে বিস্তৃত নৌ-বাণিজ্যের বর্ণনা আছে, তাহা মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল নহে। যে যুগে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রধানতঃ খৃস্টীয় পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী—এই যুগে বাংলার সদাগরেরা ভারতের উপকূল অঞ্চল কিংবা বৃহত্তর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে যে বাণিজ্যরত ছিল, তাহা নহে। কারণ, সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস হইতে তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ পাল এবং হিন্দু সেন রাজত্বের আমলে বাঙ্গালীর জীবন শিল্পে বাণিজ্যে নানাদিক দিয়া যেমন বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এ' দেশে তুর্কী আক্রমণের পর হইতেই তাহা চারিদিক হইতে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, কালক্রমে তাহার সংস্কার সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছিল। অথচ সকল মঙ্গলকাব্যই তুর্কী আক্রমণের পর রচিত হইয়াছিল। অতএব মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যে বাংলার সওদাগরদিগের ভারতীয় উপকূল অঞ্চলে বাণিজ্য করিয়া ধনৈশ্বর্য লাভ করিবার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ঐতিহাসিক দিক দিয়া মধ্যযুগের পূর্ববর্তী ঘটনা বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। পাল রাজত্বের শেষভাগে বাংলার বহির্বাণিজ্য নানাদিক দিয়া বিস্তার লাভ করিয়া-ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। সেই যুগে সমাজে স্বভাবতঃই বৈশ্য সদাগরদিগেরই প্রাধান্য ছিল। সেইজন্য মঙ্গলকাব্যের নায়কমাত্রই বৈশ্য সদাগর। ব্রাহ্মণের

প্রতিষ্ঠা তখন সমাজে স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু যে যুগে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছে, সে যুগে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, তাহা সত্ত্বেও মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য দিয়া একটি প্রাচীনতর ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে। পাল ও সেন রাজত্বে বাংলার সদাগরদিগের বহির্জগতের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্কিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার সংস্কার এই সমাজে এত দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছিল যে, সেই বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া প্রায় পাঁচ শতাধিক বৎসর পরও এ' দেশে জাতীয় কাব্য রচিত হইয়াছে। বাংলার ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের উপর বণিক সমাজের যে প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, প্রধানতঃ পাল রাজত্বকালীন বাংলার সমাজ-জীবনের ঐতিহ্যের উপর ইহাদের উভয়েরই কাহিনীর মৌলিক ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু সেইজন্যই তাহা পাল রাজত্বেরই নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের আধার স্বরূপ বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কারণ, পরবর্তী কালের সমাজ-জীবনেরও বহু উপাদান ইহাদের মধ্যে গিয়া স্থান লাভ করিয়াছে। অতএব মঙ্গলকাব্য-গুলির মধ্য হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিবার কালে ইহাদের মধ্যে কি ভাবে যে বিভিন্ন যুগের উপাদান একত্র মিশ্রিত হইয়া এক অখণ্ড রসবস্তুরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—কোন যুগের ঐতিহাসিক তথ্যই ইহাদের মধ্য হইতে অবিমিশ্রভাবে লাভ করা যাইতে পারে না। মনসা-মঙ্গলের চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার পালা এবং হাসান হোসেনের পালা একই ঐতিহাসিক যুগের চিত্র নহে—একটি বাংলার তুর্কী আক্রমণের পূর্ববর্তী বিষয়, অপরটি ইহার পরবর্তী বিষয়। একই কাহিনীর মধ্যে একই উদ্দেশ্যে উভয়েই স্থান লাভ করিলেও ইহাদের মধ্যে কালগত সুদূর ব্যবধান রহিয়াছে। অতএব মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্য হইতে যাঁহারা মধ্যযুগের অবিমিশ্র উপাদান লাভ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন।

মঙ্গলকাব্যগুলি চারিশত বৎসরের অধিককাল ধরিয়া রচিত হইয়াছে, অতএব ইহাদের মধ্যে বিশিষ্ট কোন একটি যুগ-চেতনা যে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। তুর্কী আক্রমণে আকস্মিক সামাজিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া ইহাদের উদ্ভব হইয়াছিল, অতএব ইহাদের উদ্ভবের যুগে ইহাদের মধ্য দিয়া সমাজ-জীবনের যে এক পরাজয়ের মনোভাব (defeatist mentality) প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সত্য। এই মনোভাবের মধ্য হইতেই দৈবনির্ভরশীলতার জন্ম।

প্রত্যক্ষ সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের উপর ভিত্তি করিয়া মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব হইয়াছিল—ইহাদের উদ্ভবের কালে ইহাদের মধ্যে এই বিশিষ্ট যুগ-চেতনা অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যাইত। কিন্তু ইহার পরবর্তী যুগে যখন চৈতন্যধর্মের প্রভাব বাংলার সমাজের মধ্যে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠিল, তখন সমাজের মধ্য হইতে পরাজয়ের মনোভাব অনেকখানি দূর হইয়া গিয়া ইহার মধ্যে এক নূতন আশাবাদের জন্ম হইল। কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলি ইতিপূর্বেই সমাজের পরাজিত মনোভাবের ভিত্তির উপর একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ; তখন ইহাদের মধ্যে আর নূতন কোন চেতনা সঞ্চার করিয়া দিবার অবকাশ ছিল না। চৈতন্যধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব মঙ্গলকাব্যগুলির অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই—কেবল বহিরঙ্গে কোন কোন স্থলে বিচ্ছিন্ন প্রভাব স্থাপন করিয়াছে মাত্র। অতএব চৈতন্যের সমসাময়িক কালের বিশিষ্ট যুগচেতনা সে যুগের মঙ্গল-কাব্যগুলির মূল ধারার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। যদি তাহাই হইত, তবে বৈষ্ণব-সাহিত্যের স্বাধীন উদ্ভব ও বিকাশ সে যুগে সম্ভব হইত না। বৈষ্ণব-সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্য উভয়েই যে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়া সে যুগে বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, একের অভাব অন্য দ্বারা সে দিন পূর্ণ হয় নাই।

কালক্রমে যখন মঙ্গলকাব্যের অধ্যাত্ম আদর্শ শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল, তখনই সেই শৈথিল্যের অবকাশে বৃহত্তর সমাজের বিশিষ্ট যুগ-চেতনা তাহার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। এই কার্য খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। চৈতন্য ধর্মের ক্রমাগত প্রভাবের ফলে এক দিক দিয়া সে যুগে যেমন মানবিকতার প্রতি গৌরব-বোধ বাড়িয়াছে, অন্য দিকে তেমনই মঙ্গলকাব্যের দৈবশক্তির নিস্ফলতাবোধ সমাজের মধ্যে দৃঢ়মূল হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের মুহূর্তেই ইহার মধ্যে যে যুগ-চেতনার বিকাশ দেখা গিয়াছিল, তাহাই অপরিবর্তনীয় (rigid) থাকিয়া আরও প্রায় তিন শতাব্দীকালের যুগচেতনাকে অস্বীকার করিয়াছিল —তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজের হৃদয় দৈবভক্তিহীন হইয়া পড়িবার ফলে সে যুগের মঙ্গলকাব্যের উপর যুগপ্রভাব পুনরায় কার্যকরী হইয়া উঠিল—নিজের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মঙ্গলকাব্যগুলি চারিদিক হইতে যুগের উপকরণ দ্বারা নিজেদের অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। তখন একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণ ধর্মবোধের পরিবর্তে সর্বধর্মসমন্বয়ের এক উদার আদর্শ মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য দিয়া

যেমন প্রচারিত হইয়াছিল, তেমনই অন্যদিকে এক ঘৃণিত নীতিবোধের পরিচয়ও ইহাদের পবিত্রতা দূর করিয়া দিয়াছিল। অতএব মঙ্গলকাব্য রচনার সর্বশেষ যুগে ইহার ভক্তিহীন শূন্য অন্তঃকরণ চারিদিক দিয়া উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারই অবারিত পথে সমাজের কেবলমাত্র যে নূতন ভাবসম্পদ তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল তাহাই নহে, ধূলি বালি দ্বারাও তাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

সাহিত্য-গুণ

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মঙ্গলকাব্যগুলিই এককালে বাংলার সমগ্র হিন্দু-সম্প্রদায়ের সাহিত্য-রচনার একমাত্র আদর্শ ছিল। সেইজন্য সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ মৌলিক সাহিত্যও এককালে এই জাতীয় কাব্যের মধ্য দিয়াই রচিত হইয়াছিল। মুকুন্দরাম, ঘনরাম, ভারতচন্দ্রের মত প্রথম শ্রেণীর কবির কল্পনা এই-জাতীয় কাব্যের মধ্য দিয়াই সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে কালক্রমে মঙ্গলকাব্যগুলি একটা নির্দিষ্ট বিশেষত্ব-বর্জিত বাঁধা-ধরা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে গিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেও প্রকৃত কবি-প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় কোন দিনও ঘটে নাই। তাহা হইলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মুকুন্দরামের মত এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ভারতচন্দ্রের মত সত্যকার প্রতিভা-সম্পন্ন দুইজন কবির সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটিত না; এই মঙ্গলকাব্যের বিধি-নিয়মের গণ্ডীর মধ্যেই তাঁহাদের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের জীবন-দর্শনে যে বাস্তবতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই ইহাকে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগিতা দান করিয়াছে। প্রত্যেক কবিরই মঙ্গলকাব্যের বাস্তব জীবনোপকরণ যে সমান নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করিবার দক্ষতা ছিল, তাহা নহে—কিন্তু তথাপি প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেরই এক একটি বাঁধা-ধরা কাহিনী ছিল বলিয়া ইহার বাস্তব ধর্ম সম্পর্কেও একটা আদর্শ একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল। অতএব কবির প্রতিভা যে-স্তরেরই থাকুক, প্রচলিত বিষয়-বস্তু গতানুগতিকভাবে ব্যবহার করিয়াও, তাঁহার কাব্যে তিনি কতকটা বাস্তব রস আপনা হইতেই ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। মঙ্গলকাব্যের বাস্তব জীবনচিত্রের পার্শ্বে অলৌকিক চিত্রও আছে সত্য, কিন্তু 'অলৌকিক আখ্যানগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া কাব্যের অপ্রধান অংশে পরিণত হইয়াছে, ও কেবল অতীতের ধারার সহিত যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায়মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। দেবতা মানুষের অধীন হইয়াছেন—দেব-কীর্তি বর্ণনা উজ্জ্বল বাস্তব চিত্রের নিকট নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে।' (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৯৩৯, পৃঃ ১৫) পুরাণে মানুষ দেবতার অধীন, কিন্তু মঙ্গলকাব্যে দেবতা মানুষের অধীন। মনসা-মঙ্গল কাব্যই ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

জীবনের মধ্যে উচ্চভাবের অনুসন্ধান কাব্যের বিষয়, কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ জীবনের নিতান্ত তুচ্ছ সুখদুঃখ, আশা-তৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া কোনও উচ্চ ভাবের (lofty ideal) অনুসন্ধান করিতে সাধারণতঃ দেখা যায় না, এই গুণে মঙ্গলকাব্যগুলি উপন্যাসধর্মী ; ইহাদের মধ্য দিয়া আধুনিক উপন্যাসের অনুরূপ জীবন দৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ ইহাদের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ জীবনের খুঁটি-নাটি বর্ণনা করিবার যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, কোনও উচ্চ ভাব, নীতি বা আদর্শের অনুসন্ধান করিবার সেই প্রয়াস দেখা যায় না। কাব্য অপেক্ষা উপন্যাসের বাস্তবতা-গুণ অধিকতর প্রত্যক্ষ ; মঙ্গলকাব্য পদ্যাকারে রচিত বলিয়াই কাব্য বলিয়া পরিচিত, ইহার রচনা বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণাত্মক নহে। আবার ইহা পদ্য হইয়াও গদ্যধর্মী। সমসাময়িক কালে পদ্যই লিখিত সাহিত্য রচনার একমাত্র বাহন ছিল বলিয়া, মঙ্গলকাব্যগুলি পদ্যাকারেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—ইহাদের মৌলিক প্রেরণা পদ্যের নহে, গদ্যের। বিষয়গুলি অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে—সংস্কৃত কাব্যের বহিরঙ্গে যে অলঙ্কার-সমৃদ্ধি দেখা যাইত, দীর্ঘকাল মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে তাহারও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায় নাই। এমন কি খৃস্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহাদের মধ্যে যে অলঙ্করণের প্রয়াস দেখা দিয়াছিল, তাহা দ্বারাও ইহাদের প্রত্যক্ষতা-গুণ যে খুব বেশি ক্ষুন্ন হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারা যায় না। অতএব বর্ণনার প্রত্যক্ষতা মঙ্গলকাব্যেব একটি বিশিষ্ট গুণ। এই গুণেও ইহা আধুনিক উপন্যাসের স্বধর্মী।

কিন্তু মঙ্গলকাব্য কেবলমাত্র আধুনিক উপন্যাসের সমধর্মী এই কথা বলিলেই ইহার সাহিত্যিক পরিচয় সম্পর্কে শেষ কথা বলা হয় না। জীবন-বিশ্লেষণ উপন্যাসের ধর্ম ; উপন্যাসের জীবনের মধ্যে দ্বন্দ্বসংঘাত খুব সুস্পষ্ট হইয়া না উঠিলেও ক্ষতি নাই। দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব উপন্যাস অপেক্ষা নাটকের মধ্য দিয়াই সার্থকতর ভাবে রূপ পাইয়া থাকে। মঙ্গলকাব্যের কাহিনী সাধারণভাবে অনুসরণ করিলেই দেখা যাইবে যে, দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির পরস্পর সংঘাত ইহাতে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ইহার মধ্যে উপন্যাসের ধর্ম অপেক্ষা নাটকের ধর্মই অধিকতর স্পষ্ট বলিয়া অনুভূত হইবে। ইহার কাহিনীব প্রথম হইতেই দুইটি বিপরীত-ধর্মী শক্তি পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে এবং একটির বিরুদ্ধে আর একটি আত্মরক্ষার জন্য জীবন-পণ সংগ্রাম করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি শক্তি যে মানুষ তাহা বুঝিতে ভুল হয় না, আর একটি শক্তি আপাতদৃষ্টিতে দৈব বলিয়া

ভুল হইতে পারে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাও মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ, দৈবের নিকট হইতে মানুষ যখন নিগ্রহ সহ্য করিয়া থাকে, তখন মানুষ তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না—জীবনের যে দুঃখদুর্দশার দৃশ্যতঃ কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, তাহাকেই আমরা অ-দৃষ্ট বা দৈব বলিয়া থাকি ; কিন্তু মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যাহাকে আমরা দৈবশক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি, তাহা অদৃশ্য নয়, অতএব তাহাকে অদৃষ্ট (fate) বলা যায় না। তাহার দৃশ্য পরিচয় আছে—তাহাই মনসা, চণ্ডী, কালিকা, শীতলা, ধর্মঠাকুর ইত্যাদি। ইহারা নামে দেবতা হইলেও প্রকৃতিতে মানুষ—ইহারা মানুষের মত ঈর্ষ্যা ও প্রতিহিংসা-প্রবণ, লোভী ও কাপুরুষ। অতএব মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তাহা মানুষের সঙ্গে মানুষেরই দ্বন্দ্ব—অদৃশ্য কোনও শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ মানুষের সংগ্রাম নহে। অতএব এই বৈশিষ্ট্যের জন্য মঙ্গলকাব্যগুলি সার্থক নাটকীয় গুণের অধিকারী হইয়াছে। বিশেসতঃ মঙ্গলকাব্যের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র পরোক্ষ বর্ণনা ও আত্মভাবমূলক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় নাই—তাহা প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্য দিয়া উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিরুদ্ধধর্মী ঘটনাগুলি পরস্পর সম্মুখীন করিবার যে কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া যে যথার্থ নাটকীয় গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আত্মভাব-মূলক বস্তুবিশ্লেষণ (subjective interpretation) উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য ; নাটকের মধ্যে ইহা থাকিতে পারে না—আত্মনিরপেক্ষ বস্তুধর্মিতা নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য ; মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও এই গুণটি প্রকাশ পাইয়াছে, ইহার মধ্যে উপন্যাসের পূর্বোক্ত গুণটি বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পায় নাই। বর্ণিত বিষয়ের মধ্য হইতে সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত থাকিয়া কবিগণ মঙ্গলকাব্যের ঘটনারাশির পরিবেশন করিয়াছেন—তাঁহাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা দ্বারা তাহা কোন দিক হইতেই নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে subjectivity বা মন্ময়তার যে সেদিন জন্ম হয় নাই, তাহা নহে—বৈষ্ণব পদাবলীই ইহার প্রমাণ। কিন্তু মঙ্গলকাব্য রচনার ক্ষেত্রে আত্মভাব-নিরপেক্ষ বস্তুধর্মতারই বিকাশ হইয়াছে, এই দিক দিয়া বৈষ্ণব কবিতার কোনও প্রভাবও ইহার মধ্যে স্বীকৃত হয় নাই। এই মনোভাবের ভিতর দিয়া মঙ্গলকাব্যের নাটকীয় গুণের বিকাশও সার্থক হইয়াছে। তারপর দেখিতে পাওয়া যায় যে, মঙ্গল-কাব্যের কাহিনী যতই শিথিলগতি হউক না কেন, ইহা একটি নাটকীয় ধারা অনুসরণ করিয়া থাকে ; নাটকের মতই ইহার ঘটনার ক্রমোন্নয়ন, চরমোন্নয়ন,

সংঘাত ও পতন ইত্যাদি অনুভব করা যায়। ইহাতে উপন্যাসের বিশ্লেষণধর্মী গুণ নাই বলিলেই চলে। লোক-সাহিত্যের স্তর অতিক্রম করিয়া যাহা সবে মাত্র লিখিত সাহিত্যের পর্যায়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার মধ্যে নাটকীয় গুণই অধিক প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক। কারণ, লোক-সাহিত্য বিশ্লেষণাত্মক নহে—প্রত্যক্ষ ঘটনাত্মক। গীতিকা (ballad)-ই তাহার প্রমাণ। গীতিকা কাহিনী-প্রধান রচনা—বিশ্লেষণ-প্রধান নহে। গীতিকার মৌখিক ধারা অনুসরণ করিয়াই মঙ্গলকাব্যের লিখিত ধারার উৎপত্তি হইয়াছে। সেইজন্য মঙ্গলকাব্য গীতিকার কাহিনীগত গুণের সার্থক উত্তরাধিকারী হইয়াছে। এই সূত্রেই নাটকীয় গুণও ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

পূর্বে বলিয়াছি যে, জীবনের মধ্যে উচ্চভাবের অনুসন্ধান কাব্যের বিষয়, মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে এই উচ্চভাবের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ জীবনের খুঁটিনাটির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে এবং এইজন্যই ইহাদের মধ্য দিয়া নাটকীয় গুণও প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিষয়ে মনসা-মঙ্গল কাব্য একটি ব্যতিক্রম বলিয়া বোধ হইতে পারে। কারণ, ইহার মধ্য দিয়া জীবনের উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য। তথাপি ইহার মধ্যেও বিরুদ্ধ শক্তির পরস্পর যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অন্যান্য মঙ্গল-কাব্য অপেক্ষাও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এখানে সংগ্রাম বা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া জীবনের উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ; অতএব ইহাও নাটকীয় গুণ বর্জিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, মঙ্গলকাব্যের প্রত্যেকটি চরিত্র সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে পারে নাই—ইহারা এক একটি type বা ছাঁচ মাত্র। অতএব ইহাদের প্রকৃত নাটকীয় পরিচয় সার্থক বলিয়া মনে হইতে পারে না। কিন্তু এ'কথা মনে রাখিতে হইবে, মঙ্গলকাব্যগুলি প্রধানতঃ কাব্য, পুরাপুরি নাটক নহে—ইহাদের কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় গতির অভাব আছে। অতএব কাব্যের বৈশিষ্ট্য যে ইহাদিগের মধ্যে কিছুই থাকিবে না, তাহা নহে। তবে উপরে যে কথা বলা হইল, তাহা এই যে, ইহাদের মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ অপেক্ষা নাটকের লক্ষণই অধিক—ঘটনা-বিন্যাসের দিক হইতেই প্রধানতঃ ঐ কথা বলিতে পারা যায়।

কাব্যরূপ ও কাব্যভাষা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আখ্যায়িকা-কাব্য মাত্রই পাঁচালী নামে পরিচিত ছিল; মঙ্গলকাব্যও পাঁচালী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে—সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদও পাঁচালী, মঙ্গলকাব্যও পাঁচালী। অতএব ইহাদের রচনার বহিরঙ্গগত পরিচয়ের মধ্য দিয়া বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না। সুদীর্ঘ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ কিংবা অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত, বিবিধ পুরাণ প্রভৃতি রচনার আঙ্গিক আনুপূর্বিকই মঙ্গলকাব্যেও অনুসরণ করা হইয়াছে। আখ্যায়িকা-কাব্যের কাহিনীভাগ বর্ণনার প্রধান অবলম্বন ছিল পয়ার ছন্দ; ইহা দ্বারাই কাহিনীর মধ্যে গতি সঞ্চারিত হইত; এই গতি যতই শিথিল হউক, তথাপি ইহা দ্বারাই কাহিনী সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইত। কেবলমাত্র কাহিনীর মধ্যে গতি সঞ্চার করিবার জন্য নহে, নিগূঢ় বিষয় বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিবার যে শক্তি পয়ার ছন্দের আছে, তাহা 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মত সার্থক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। পয়ার ছন্দ মধ্যযুগে গদ্য। আধুনিক যুগে গদ্যদ্বারা যেমন সকল ভাবই ব্যক্ত হইতে পারে, মধ্যযুগে পয়ার দ্বারাও তাহাই সম্ভব হইত। অতএব পয়ার ব্যতীত অন্য কোন ছন্দের সহায়তায় মঙ্গলকাব্যের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব হইত না। তবে রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের রচনা-রূপের কিছুই যে পার্থক্য নাই, তাহা নহে। বাংলাদেশে খৃস্টীয় আনুমানিক চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে রামায়ণ-মহাভারতের বাংলা অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু চারি-পাঁচশত বৎসর ধরিয়া ইহার বহিরঙ্গগত রূপের কোন পরিবর্তন হইতে দেখা যায় নাই। কাহিনীর অংশে ইহাতে পয়ার এবং আবেগমূলক অংশে ইহাতে দীর্ঘ অথবা লঘু ত্রিপদী সর্বদাই ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহার কাব্যরূপ আনুপূর্বিক অপরিবর্তিত (rigid) ছিল; কিন্তু মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কাব্যরূপের এই অনমনীয়তা ছিল না—যদিও পয়ারই ইহার মুখ্য অবলম্বন ছিল, তথাপি ক্রমবিকাশের পথে ইহা নূতন নূতন ছন্দ লইয়াও পরীক্ষা করিয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি মাণিক দত্ত গতানুগতিক ছন্দ অর্থাৎ পয়ার ত্রিপদীর কোনও ব্যতিক্রম করেন নাই; কিন্তু তাঁহার পরবর্তী কবি মুকুন্দরামের মধ্যে দুই

একটি নূতন ছন্দের বিকাশ দেখা গেল। তারপর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল' রচনায় পয়ার-ত্রিপদীর বনিয়াদের উপরই বিচিত্র ছন্দের সুরপুরী সৃষ্ট হইল।

এ'কথা সত্য যে, মঙ্গলকাব্য রচনার প্রথম যুগে ইহার উপর সংস্কৃত কাব্যরূপের কোনও প্রভাব ছিল না; ক্রমে সেই প্রভাব ইহার উপর কার্যকরী হইয়াছে। কেবলমাত্র সংস্কৃত প্রভাবই নহে,—বৈষ্ণব কাব্যরূপের প্রভাবও মঙ্গলকাব্যকে কালক্রমে স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু একটি বিশিষ্ট আদর্শ সম্মুখে থাকিত বলিয়া অনুবাদ-পাঁচালীগুলির কাব্যরূপের ক্রমবিকাশ সম্ভব হইত না। মঙ্গলকাব্য-গুলি কেবলমাত্র একটি মৌলিক কাহিনীর দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ইহার বহিরঙ্গের ক্রমবিকাশ স্বীকার করিয়া লইয়াছে—সেইজন্য মাণিক দত্তের কাব্যের বৈচিত্র্যহীনত হইতে মুকুন্দরামের সহজ পথ ধরিয়া আমরা ভারতচন্দ্রের কাব্যের বিচিত্র রূপ-লোকে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছি।

মঙ্গলকাব্য লোক-সাহিত্যের নিতান্ত নিকটবর্তী ছিল বলিয়া ইহাতে মধ্যে মধ্যে ছড়ার ছন্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্য লোক-সাহিত্যের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া গিয়া একটি যে নাগরিক পরিচ্ছন্নতা লাভ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে লোক-সাহিত্যের আর কোন প্রভাবই অনুভূত হইতে পারে নাই।

মঙ্গলকাব্যের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার প্রথম যুগের ভাষা স্থূল ও গ্রাম্যভাবাপন্ন, মধ্যযুগের ভাষা সহজ ও সাবলীল এবং শেষ যুগের ভাষা অলঙ্কার-সমৃদ্ধ। অতএব ইহার কাব্যরূপের মত কাব্যভাষারও একটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করা যায়। এক দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, ইহার প্রথম যুগের ভাষা কাব্যের উপযোগিতা লাভ না করিলেও অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। মঙ্গলকাব্যের ভাষায় তখনও অলঙ্করণের কৃত্রিমতা প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় নাই, সহজ কথায় প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবন-পরিচয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র—সেই জীবন-দৃষ্টির মধ্যে যে রস নাই, তাহা নহে—কিন্তু সেই রস অলঙ্কার শাস্ত্রের বাঁধা-ধরা রস নহে, মানব-মনের সহজাত রসানুভূতি মাত্র। এই রস প্রকাশ করিবার ভাষাও তেমনই অমার্জিত। কিন্তু তাহাতে কবিত্বের যে অভাব ছিল, তাহা নহে। পরবর্তী যুগের ভাষা মার্জিত, অথচ সরল। ভাষার প্রয়োগে পূর্ববর্তী যুগের কবিগণ যেমন নিরঙ্কুশ ছিলেন, এই যুগের কবিগণ তেমন ছিলেন না—তবে এ'যুগের রচনা আয়াস-লব্ধ ছিল না, বরং অনায়াস-সৃষ্ট বলিয়াই বোধ হইবে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের

শেষ যুগে ভাষা সচেতন শিল্পবোধের পরিচায়ক হইয়া উঠিল। এই যুগে বিদেশী শব্দও মঙ্গলকাব্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। রসই এই যুগের লক্ষ্য ছিল বলিয়া যাহাদ্বারাই এই রসসৃষ্টি সম্ভব হইত, তাহাই ইহার অবলম্বন হইত। এই যুগের কবি ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন—

যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস ল'য়ে।

অতএব রসসৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হইবে ভাবিয়া তিনি 'যাবনী মিশাল' ভাষায় তাঁহার কাব্যের দীর্ঘ অংশ রচনা করিয়াছিলেন। আরবি-পারসি শব্দ মঙ্গলকাব্যের শেষ যুগের ভাষায় বহুল পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। অনেক সময় সংস্কৃতের অন্ধ আনুগত্য এই যুগের মঙ্গলকাব্যের ভাষা কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছে।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা কিংবা ব্রজবুলির ভাষার যে প্রভাব ছিল না, তাহাও বলিবার উপায় নাই। মধুর রস সৃষ্টি করিবার জন্য কোন কোন অংশে আনুপূর্বিক ব্রজবুলিরও সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা কাব্যদেহের বিচ্ছিন্ন ও বাহ্য অলঙ্কার-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, ইহার অন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। প্রথম যুগের মঙ্গলকাব্যের ভাষা ছিল পল্লীকবির সহজ প্রত্যক্ষ গ্রাম্য ভাষা, পরবর্তী যুগে ইহা ভাবুকের ভাষা ও শেষ যুগে ইহা শিল্পীর ভাষায় ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে। চৈতন্যপূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যের ভাষা ও চৈতন্যপরবর্তী মঙ্গলকাব্যের ভাষার তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, চৈতন্য-সাহিত্য মঙ্গলকাব্যকে কি অপরূপ লাবণ্য দান করিয়াছে—ইহার স্থূল গ্রাম্যতা বহুলাংশে বর্জন করিয়া ইহার ভিতর হইতে সুমার্জিত রূপের সন্ধান দিয়াছে।

জাতীয় মূল্য

প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িকতার নিম্নস্তর হইতে উদ্ভূত হইলেও কালক্রমে যখন এই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি সাহিত্যের উচ্চতর আদর্শের সেবায় নিয়োজিত হইল, তখনই এই শ্রেণীর কয়েকখানি কাব্য জাতীয় কাব্য (National poetry) হিসাবে স্থান পাইবার যোগ্যতা অর্জন করিল। একটা বহুসম্প্রদায়বিশিষ্ট বিরাট জাতির বিভিন্নমুখী চিন্তাধারার সুন্দর সমন্বয় সাধন করিয়া এই জাতীয় মঙ্গলকাব্যগুলি বিশৃঙ্খল সমাজের মধ্যে এক ঐক্যের সন্ধান নির্দেশ করিয়া দিয়াছে। তাহারই ফলে দেখিতে পাই, উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ-কবি অস্পৃশ্য ব্যাধ-সন্তানকে তাঁহার কাব্যের নায়ক করিয়া তাহাকে শৌর্যে বীর্যে মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; 'জাতি যায়', এই আশঙ্কা সত্ত্বেও অস্পৃশ্য ডোম-পূজিত ধর্মঠাকুরকে নিজের আরাধ্য বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন করিয়া কল্পনা করিতেছেন। পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির এই যে মঙ্গল আদর্শ তাহা পূর্ববর্তী অক্ষম কবিদিগের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া বাঙ্গালী কবির মঙ্গলকাব্যের পরিকল্পনাকে 'পরিণাম-রমণীয়' করিয়া দিয়াছে।

কোনও জাতীয় কাব্যে সেই জাতির সমসাময়িক সংস্কৃতির সহিতই যে আমরা পরিচয় লাভ করি, তাহা নহে—তাহাতে জাতীয় জীবনের নিত্য কালের যাহা বিশেষত্ব তাহারও সন্ধান পাওয়া যায়। এই জাতীয় কাব্যের অভাব বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যগুলিই কতক পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সুন্দর সুসঙ্গত জাতীয় চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা, ভাঁড়ু দত্ত, মুরারি শীল; ধর্মমঙ্গলের কর্পূর সেন, মহামদ পাত্র; মনসা-মঙ্গলের সনকা,—ইহারা বাঙ্গালীর গৃহের নিত্যকালের চিত্র। এই সমস্ত চরিত্র চিত্রণে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ সুদূর দেব-লোকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, বাঙ্গালীর নিত্য পরিচিত গৃহাঙ্গন হইতে ইহাদিগকে তুলিয়া লইয়া সাহিত্যে অমরতা দান করিয়াছেন। এই চরিত্রগুলির সহিত পরিচিত হইয়া আমরা প্রাচীন কালের সহিত আধুনিক কালের যোগসূত্র রচনা করিতে পারি এবং সেই সুদূর অতীতেও পরিচিত পদধ্বনি শুনিয়া চমকিত হই। সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের জীবনের এমন নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ যোগসাধন ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে আর কখনও ঘটে নাই।

মঙ্গলকাব্যের মধ্য দিয়াই জাতির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে—এই সকল কাব্যের মধ্যেই জাতির প্রকৃত আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই হিসাবে ইহাদিগকে সমগ্র বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পারে।

কেহ কেহ মঙ্গলকাব্যগুলিকে জাতীয় মহাকাব্য আখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্তু সাহিত্যিক রস-বিচারে মহাকাব্যের একটি বিশেষ সংজ্ঞা নির্দিষ্ট রহিয়াছে। মঙ্গল-কাব্যে ঐ সংজ্ঞানির্দিষ্ট উপাদানগুলির একান্তই অভাব। যে সর্বব্যাপী বিশালতা ও ব্যাপকতা মহাকাব্যগুলিকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছে, মঙ্গলকাব্যে তাহা নাই। বীররসই মহাকাব্যের লক্ষণীয় সুর—কিন্তু মঙ্গলকাব্যে করুণ রসের অতিশয় প্রাধান্য। ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র গতানুগতিক ও বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা কোন কাব্যকেই মহাকাব্যের মর্যাদায় উন্নীত করা যায় না, মহাকাব্যোক্ত বীররসের সুর ইহার নায়ক চরিত্রের মধ্যেই সমাহিত থাকে ; তাহার চরিত্র-বিকাশের অপরিহার্য পরিণতির পথে সেই যুদ্ধবিগ্রহ যেন আপনা হইতেই ঘটিয়া থাকে। ধর্মমঙ্গলের নায়ক-চরিত্রে সেই প্রেরণা নাই, অতএব বিচ্ছিন্ন কতকগুলি যুদ্ধবর্ণনাদ্বারা ইহার বীররস সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই। ভাব-প্রবণ বাঙ্গালীর পক্ষে মহাকাব্য রচনা সার্থক হয় নাই। এখানেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। মঙ্গলকাব্যগুলি গীতোদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল ; ইহার ছন্দ, ধ্বনি, শব্দবিন্যাস গীতিকাব্য সৃষ্টির পক্ষেই অনুকূল হইয়াছে—ইহার মধ্যে মহাকাব্যের উদাত্ত-গম্ভীর সমুদ্র-কল্লোল শুনিতে পাওয়া যায় না।

ধর্মমঙ্গল-কাব্যগুলিকে পশ্চিম বঙ্গেরই জাতীয় কাব্য (National poetry) বলা যাইতে পারে। এখানে কি ভাবে যে একটা জাতীয় কাহিনী মঙ্গলকাব্যের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় দিব। বহু প্রাচীনকাল হইতেই রাঢ়ভূমিতে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল হইতে স্বতন্ত্র একটা সামাজিক জীবনের আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বিশেষ করিয়া রাঢ়ভূমিরই সম্পদ্। সেইজন্য এই কাব্যে চরিত্র-সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য বিষয়-বস্তুতেও একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিম বঙ্গ বা রাঢ়দেশ বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্রবল অনার্য জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত। বিহার প্রদেশ হইতে আর্য-সভ্যতা সর্বপ্রথম উত্তর বঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছিল ; এই উত্তর বঙ্গ পথেই আর্যসভ্যতা য়ুয়ান্ চুয়াঙের সময়েই কামরূপ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। সেইজন্য বহুকাল পর্যন্ত রাঢ় প্রদেশের অভ্যন্তর অনার্য জাতিরই বাসভূমি রহিয়া গিয়াছিল ; এমন কি খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে

লিখিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ব্যাধ কালকেতু নিজের সম্বন্ধে এই প্রকার পরিচয় দিতেছে,—

'অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়॥'

তারপর আরও বলিতেছে,—'ব্যাধ গোহিংসক রাঢ়, চৌদিকে পশুর হাড়'। রাঢ়ের চোয়াড় জাতির মত ডোম জাতিও ইহার প্রাচীন অধিবাসী। ডোম জাতির বীরত্বের কথা সারা বাংলার ছেলে-ভুলানো ছড়ায় আজিও শুনিতে পাওয়া যায়,— যেমন, 'আগডুম, বাগডুম, ঘোড়াডুম সাজে', অর্থাৎ অগ্রবর্তী ডোম-সৈন্যদল, বাগ বা পার্শ্বরক্ষক ডোমসৈন্যদল ও ঘোড়াডুম, অর্থাৎ অশ্বারোহী ডোমসৈন্যদল ইত্যাদি। ধর্মমঙ্গলকাব্যগুলি এই বীর ডোমজাতির বিজয়-গাথা।

ইহা হইতেই জানা যাইবে যে, বাংলার কেন্দ্রীয় যে সভ্যতা তাহার সহিত ঐ অনার্য-অধ্যুষিত রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীর প্রায় কোনই যোগ ছিল না। তাহারা দৈবশক্তি অপেক্ষা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিল বেশী, কারণ কোনও দৈব প্রলোভন তাহাদিগকে বহুকাল পর্যন্ত প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। রাঢ় চিরদিনই বীরের ভূমি, —বীরভূম, মল্লভূম, শূরভূম—সেইজন্যই তাহার এই সকল নামকরণও সার্থক। ব্যক্তিচরিত্রের এই যে মহান্ আদর্শ তাহা হইতে স্খালিত করিয়া দুর্বল দেবতার পাদমূলে মানুষকে আনিয়া সেখানে বলি-উপহার অর্পণ করা হয় নাই। মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব লইয়া দেবতারও যে ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে, এই কাব্যগুলিতে তাহারই নির্দেশ রহিয়াছে। অবশ্য ধর্মমঙ্গলকাব্যসমূহের নায়ক লাউসেন এই জাতীয় মনুষ্য নহে। লাউসেন স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা, কিন্তু কবির কল্পনায় সাধারণ মনুষ্য-চরিত্রগুলির নিকট এই কল্পিত দেব-চরিত্র ম্লান হইয়া গিয়াছে; দেবতা যে মানুষের বুদ্ধি ও পরাক্রমের নিকট কত অক্ষম,—মানুষকে ছলনা, ভয় ও প্রবঞ্চনা করিয়া যে দেবতার দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, লাউসেনের ভিতর তাহাই দেখিতে পাইয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা অপেক্ষা সমবেদনাই অধিক হয়। অতএব আমাদের এই আলোচনার প্রসঙ্গে দেবতার ছায়াচ্ছন্ন এই লাউসেনকে ত্যাগ করিয়াই লইতে হয়। ধর্মমঙ্গলকাব্যের ডোমজাতীয় পুরুষ ও নারী চরিত্রগুলিই রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করিতেছে।

পশ্চিম বঙ্গই মধ্যযুগে বাংলায় প্রবেশের দ্বার ছিল। পাঠানের আক্রমণ, মুঘলের আক্রমণ, বর্গীর আক্রমণ সমস্তই পশ্চিম বঙ্গের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া রাঢ়দেশেই সর্বপ্রথম তাহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। পালরাজগণও বাহির হইতেই এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। উপর্যুপরি এই সকল বিপদের মধ্যবর্তী হইয়া এই প্রদেশের অধিবাসিগণ আত্মরক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট রহিয়াছে। শুধু পুরুষ নয়, স্ত্রীলোককেও তাহার মান, মর্যাদা ও সতীত্ব রক্ষার জন্য বলসঞ্চয় করিতে হইয়াছে—নির্ভীক ভাবে পুরুষের সম্মুখীন হইয়া সম্মুখ সমরানলে আত্মাহুতি দান করিতে হইয়াছে। সেইজন্য স্ত্রী-চরিত্রেরও একটা বিশেষ দিক্ আমরা ধর্মমঙ্গলকাব্যসমূহে লক্ষ্য করি। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। এই সম্পর্কে ইহাও সম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই অঞ্চলে মানব-জাতির যে শাখা বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহার মধ্যে নারী ও পুরুষ সমান সামাজিক অধিকার ভোগ করিত এবং সেই ঐতিহ্যের ধারাই এই অঞ্চলে এখন পর্যন্ত অব্যাহত চলিয়া আসিতেছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হইবে, কি ভাবে মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া একটা বিশিষ্ট জাতীয় মনোভাব সাহিত্যের ভিতর এককালে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। মঙ্গলকাব্য এখানেই জাতীয় কাব্যের গৌরব লাভ করিয়াছে।

মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন প্রভৃতি কাব্যগুলিতেও এইভাবেই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের একটা নিত্যকালের চিত্রের সহিত আমাদের সহসা মুখোমুখী হইয়া যায়। জামাতা শিবের দারিদ্র্য-কল্পনায় বাঙ্গালী পিতা চিরদিন নিজের কন্যারই দুর্ভাগ্যের বিভীষিকা কল্পনা করিয়াছে ; ছয় বিধবা পুত্রবধূ-বেষ্টিতা শোকাতুরা সনকার মাতৃহৃদয়ের হাহাকার অকালবৈধব্য-পীড়িত এই সমাজে নিত্যকালই ধ্বনিত হইতেছে।

একজন আধুনিক সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন, 'এই সমস্ত চিত্র এত জীবন্ত এবং এমন নিখুঁত বলেই এগুলো উপেক্ষিত হ'বার নয়। সত্যকে আশ্রয় ক'রে এ'দের জন্ম বলেই রচনার সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও এগুলো সুখপাঠ্য—কিন্তু এ'র ভেতর থেকে কোন আধ্যাত্মিকতা আবিষ্কার করতে গেলেই বিপদ্ ঘটবে—কারণ, তা' এতে নেই।' এই দিক দিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শ হইতেও ভ্রষ্ট হয় নাই।

অলৌকিকতা

প্রাচীনতর মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে পূর্বালোচিত ঐতিহাসিক ও জাতীয় মূল্য থাকা সত্ত্বেও ইহারা যে অতিরিক্ত অলৌকিক কাহিনীতে ভারাক্রান্ত তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রাচীন সাহিত্যে অলৌকিকত্বের স্থান সম্বন্ধে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে। অলৌকিকত্বের (Supernaturalism) আশ্রয় না লইয়া যে প্রাচীন কালে উচ্চশ্রেণীর কাব্য-রচনা সার্থক হইত এমন কথা বলিতে পারা যায় না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া কতক অলৌকিকত্ব-বর্জিত দুই একখানি কাব্য রচিত হইয়াছে; অবশ্য তাহা যে কোনই সার্থকতা অর্জন করিতে পারে নাই, তাহাও সত্য। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রাচীন কাব্য রচনায় অলৌকিকত্ব একেবারে অপরিহার্য নহে। তবে এ' কথাও সত্য যে, ইউরোপীয় কিংবা ভারতীয় মহাকাব্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহে অলৌকিকতার পরিপূর্ণ প্রভাব রহিয়াছে। প্রাচীন কাব্যের মধ্যে ঘটনাগত অলৌকিকত্ব ব্যতীতও অলৌকিক চরিত্রের সমাবেশ করা হইয়া থাকে। অলৌকিক চরিত্র বা দৈব চরিত্রের সাহায্যেই অলৌকিক ঘটনাসমূহের সংঘটন হয়। প্রাচীন কাব্যের একটি বিশিষ্ট গুণ এই যে, ইহা বর্ণনা-বহুল হইবে। প্রাচীন কাব্যের বাস্তব অংশের বাহুল্য-পূর্ণ বর্ণনা একদিক দিয়া যেমন প্রাচীন সাহিত্যের আদর্শে অসম্ভব, তেমনই সমসাময়িক সাহিত্যের পাঠকের নিকটও অপ্রীতিকর ছিল। সেইজন্য মূল কাহিনীর বাহুল্যের অংশটুকু একমাত্র অলৌকিকত্বের বর্ণনা ব্যতীত পূরণ করিবার উপায় ছিল না। বিশেষতঃ এই অলৌকিকতার উপর সেই যুগের লোকের গভীর বিশ্বাস ছিল, বরং প্রত্যক্ষ ও বাস্তব সত্যের উপর তত বিশ্বাস ছিল না। সেই হিসাবে এই সকল মঙ্গলকাব্য তৎকালীন যুগ-মানসের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। এই সম্পর্কে সেক্সপীয়রের নাটক-কাব্যগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেশ ও কাল নিরপেক্ষ সর্বজনীন সাহিত্য রচনা করিলেও সেক্সপীয়র তৎকালীন ইংলণ্ডের সাধারণ সংস্কার ও ধর্ম-বিশ্বাসের প্রভাব-মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার বহু নাটকে অলৌকিকত্ব লক্ষণীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অতএব বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া প্রাচীন সমাজের রুচি বিচার করা যায় না। দুই একখানি অলৌকিকত্ব-বর্জিত কাব্য সেকালে রচিত হইলেও, তাহা যে সাধারণ

নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল, তাহা তাহাদের অপেক্ষাকৃত অপ্রচলন হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কাহিনীর মূল পরিণতির সঙ্গে ইহার অলৌকিকত্বের কোন আবশ্যক যোগ না থাকিলেই তাহা কাব্যের মর্যাদায় উন্নীত হইতে পারে। কাব্যের কাহিনীর স্বাভাবিক পরিণতি ইহার কোন অলৌকিক ঘটনার উপর নির্ভর করিলে ইহার কাব্যগুণ খর্ব হইবে, নতুবা তাহা কাব্যের বাহ্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিবে। প্রকৃত কথা 'Supernaturalism in epics should be given subordinate place to the natural or rather the human'. অলৌকিকতাকে কাব্যের মধ্যে মুখ্যবস্তু না করিয়া গৌণবস্তু মাত্র করিয়া লওয়া প্রাচীন কাব্যমাত্রেরই বৈশিষ্ট্য ছিল। এ সম্বন্ধে বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতেই অলৌকিকতা কাহিনীর অনাবশ্যক অংশ মাত্র। মনসা-মঙ্গলে বেহুলার দুর্ভাগ্যের জন্য মনসাকে কেহই প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী করিবে না—ইহার নিরবচ্ছিন্ন করুণ রসের প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া মানুষের চিরন্তন দুর্ভাগ্যের কথাই স্মরণ হইবে, মনসার কথা মনেও হইবে না; ইহা বিশিষ্ট কোন দেব-চরিত্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফল বলিয়া বিবেচিত হইলে বেহুলার প্রতি সর্বজনীন মানবিক সহানুভূতি সম্ভব হইত না। চাঁদ সদাগরের লাঞ্ছনার মূলে বিশেষ কোন দেবতার প্রতি তাহার ব্যক্তিগত আক্রোশ বলিয়া যদি বিবেচিত হইত, তাহা হইলে মনসা-মঙ্গল বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য হইতে পারিত না। চাঁদ সদাগরের মধ্যে দৈব-লাঞ্ছিত সমাজের প্রত্যেক পুরুষই আত্মপরিচয় লাভ করিয়াছে। মনসা রূপে কল্পিত দৈব যে বেহুলার জীবনের দুর্ভাগ্যের মূলে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, মনসা-মঙ্গলের কবিগণ তাহাই নানা লৌকিক (popular) উপায়ে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। বাণিজ্যযাত্রায় দুস্তর সমুদ্রের বুকে স্বামিপুত্রকে ভাসাইয়া দিয়া এই সমাজের নারীদিগের একান্তভাবে একদিন দৈবের উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইয়াছে। অতএব এই দৈববিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তব সমাজ-চেতনারও নিবিড় যোগ রহিয়াছে। উপরন্তু, In spite of the fact that we are not seriously asked to believe in it, it does beautifully and strikingly crystallize the poet's determination to show us things that go past the reach of common knowledge.'

চিরকাল সমাজ অদৃষ্টের রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন সমাজ বিশেষভাবেই এই অদৃষ্টবাদী ছিল; অথচ সংসারের এই অ-দৃষ্ট ও

অপরিজ্ঞাত সত্যের কোন প্রত্যক্ষ ও সহজ ব্যাখ্যা তাহার জানা ছিল না। এই জন্য কাহিনীর এই অ-দৃষ্ট অংশটুকুর সঙ্গে জড়িত হইয়া দৈব-কাহিনী এই সমস্ত কাব্যের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির দেব-চরিত্র সম্বন্ধে একটি কথা আমি পূর্বেও একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, তাহা পাশ্চাত্ত্য প্রাচীন কাব্যসমূহের দেব-চরিত্রের মত মনুষ্য সমাজের সঙ্গে একটি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। সেই জন্য তাহাদের চরিত্রে দেব-গুণ বিশেষ একটা নাই; তথাপি তাহাদের উপর একটা স্বতন্ত্র আবরণ যে রহিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। প্রাচীন গ্রীক্ মহাকাব্যের দেবতাগণ ব্যক্তিত্বে এবং কর্মে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া মনুষ্য সমাজের সঙ্গে মিশিয়াছেন, ভারতীয় পৌরাণিক দেবতাগণও তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু বাংলার মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের তেমন সুপরিচ্ছন্ন স্বাতন্ত্র্য সর্বত্র রক্ষা পায় নাই। যতটুকু পাইয়াছে ততটুকু দ্বারা কাহিনীর মধ্যে তাঁহারা প্রায়ই কোন মনুষ্য চরিত্রের অতিরিক্ত শ্রদ্ধা লাভেও সক্ষম হন নাই। অতএব অলৌকিকতার দিকটা মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যে সর্বত্র তত প্রকট হইয়া উঠে নাই; কেবল পরবর্তী কয়েকখানি কাব্যে অক্ষম কবিদের অপরিস্ফুট কল্পনায় ইহার অসংযত নৃত্য দেখিতে পারা যায়।

মঙ্গলকাব্যের কাহিনী কবির স্বকপোলকল্পিত বলিয়া যদি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ না হয়, সেইজন্য কবি গ্রন্থারম্ভেই গ্রন্থোৎপত্তির একটা দৈব কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কাব্যোক্ত দেবতা কাব্যরচনায় কবিকে স্বপ্নাদেশ করিয়াছেন; নতুবা তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কবির যশ লোপ করিবার উদ্দেশ্যে নিজে এই কাব্য-রচনায় কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন না।

দৈবাদেশে কাব্যরচনার রীতি প্রাচীন কালে প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক দেশেই মানুষের স্বভাব-সুলভ মনোবৃত্তি হইতে স্বাধীনভাবে এই দৈবভীতির জন্ম হইয়াছে; এই বিষয়ে কোন জাতি যে অপর কোন জাতির নিকট ঋণী, তাহা বলিতে পারা যায় না। কোন কাব্যরচনার মূলে দেবতার ইচ্ছা যদি নির্দেশ করা যায়, তাহা হইলে সেই যুগে সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা সহজ হইত। সমাজে তখনও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, অতএব যে কোন ব্যক্তি যদি কোন কথা বলিত, তাহা কেহ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিত না। ব্যক্তি-প্রতিভাকে সর্বদাই সে যুগে কল্পিত দৈব-শক্তিতে আচ্ছন্ন রাখিতে হইত। পুরাণ, উপপুরাণ, সমগ্র

মহাভারত সমস্তেরই রচনা-গৌরব বেদব্যাসে আরোপ করিবারও ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। এই দেশের সমগ্র প্রাচীন সাহিত্য-কীর্তির মূলেই এই নীতি বর্তমান। সেইজন্যই মঙ্গলকাব্যগুলির রচয়িতা হিসাবে একজন মানব দেহধারী কবিকে স্বীকার করিয়া লইলেও, দেবতার প্রেরণাই যে তাহার মূল—এই বিশ্বাস পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া লওয়া প্রয়োজন বোধ হইত; অতএব প্রত্যেক কাব্যারম্ভেই দৈবাদেশের অবতারণা করা হইত। এই রীতি মঙ্গলকাব্য হইতে বৈষ্ণব সাহিত্যেও-প্রসারিত হইয়াছিল। এমন কি, প্রাক্-চৈতন্যযুগেই মালাধর বসু 'শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণে'র অনুবাদ করিতে গিয়া বেদব্যাসের স্বপ্নাদেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই রীতি প্রাচীনতম কাল হইতেই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে।

মঙ্গলকাব্য রচনার এই নিয়মের প্রতিষ্ঠা এত দূর পর্যন্ত স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল' যদিও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রত্যক্ষ আদেশেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া কবি প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন, যেমন,

'কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি গীতে দিলা অনুমতি
করিলাম আরম্ভ সহসা।'

তথাপি এই রাজাদেশের পরও একটা স্বপ্নাদেশের অবতারণা করিবার প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল। উপরি-উদ্ধৃত কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ-বাক্যের পরই কবি বলিতেছেন,

'স্বপনে রজনী শেষে বসিয়া শিয়র দেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি নূতন মঙ্গল কহি
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে॥'

দৈবশক্তি কিংবা দেবতার স্বপ্নাদেশের প্রতি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক সমাজের যে খুব একটা শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, তাহা নহে—ইহাতে সর্বতোভাবেই একটা নির্দিষ্ট প্রাচীন প্রথারই অনুসরণ করা হইয়াছে মাত্র। ইংরেজি সাহিত্যে প্রায় মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রত্যেক কবিকেই কোনও আখ্যায়িকা-কাব্য রচনা করিবার কালে কোনও প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করিয়াই কাব্য রচনা করিতে হইত; স্বকপোলকল্পিত স্বাধীন কোনও বিষয়-বস্তুর অবতারণা করা কোন কবির পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না।

এই সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, '......it was until at least the end of the Middle Ages with writers like Chaucer, who carefully quoted authorities for their plots—and sometimes even invented originals so as to dispel the suspicion that some new and unwarranted story was being foisted on the public. Though the individual genius of such writers appears clearly enough, they always depended on authority, not only for their basic theological opinions but also for the plots of their stories. A study of the sources of Chaucer or Boccaccio takes one directly into the stream of traditional narratives.'

মঙ্গলকাব্যের রচনায়ও প্রত্যেক কবিরই পুচ্ছগ্রাহিতা অর্থাৎ বিষয়-বস্তু সম্পর্কে পূর্ববর্তী কবির অনুসরণ করিবার ইহাই একমাত্র কারণ।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা গেলেও খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব পযন্ত মঙ্গলকাব্যগুলি বিশিষ্ট একটা রূপ লাভ করিতে পারে নাই। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই মঙ্গলকাব্যগুলি একটা বিশেষ গতানুগতিক রচনা-প্রথার অনুকরণ আরম্ভ করে। তখন বিষয়-বস্তুর পরিকল্পনার দিক হইতে এই শ্রেণীর কাব্য সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য-বর্জিত হইয়া পড়ে। তখন হইতে প্রত্যেক মঙ্গল-কাব্যের নায়কই স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু, বিশেষ কোন দেবতার পূজা-প্রচারের উদ্দেশ্যেই মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য অভিশাপগ্রস্ত হইতেছে। তারপর স্পৃশ্য অস্পৃশ্য নির্বিচারে যে কোন মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া মর্ত্যের ধূলিমাটিতে ভূমিষ্ঠ হইতেছে। এই পূজা-প্রচাব-সম্পর্কে যত প্রকার বাধা-বিপত্তি সমস্ত কিছুর হাত হইতেই সেই মঙ্গলকারী দেবতা তাহাকে রক্ষা করিবেন, এই সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকিয়াই মহাবিপৎসঙ্কুল পথেও সে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হইতেছে না—সেই উদ্দিষ্ট দেবতার ছায়ায় তাহার পার্থিব মনুষ্যত্বটুকু সর্বদাই আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু এবং ধর্মমঙ্গলের লাউসেন। একটা মহীয়সী কবি-কল্পনাকে কী নির্দয় ভাবে যে বিধি-নিয়মের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া যাইতে পারে, তাহা উক্ত দুই মঙ্গলকাব্যের কবি দেখাইয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়-বস্তুর মধ্যে আর নূতনত্ব একেবারেই চোখে পড়ে না। সমস্ত মঙ্গলকাব্যেরই বিষয়-বস্তুর পরিকল্পনা খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী। পরবর্তী কাব্যগুলি সেই কাহিনীকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কাব্যোক্ত চরিত্রগুলিরই মার্জিত রস-রূপ দিয়াছে মাত্র; তাহা ছাড়াও কাহিনীকে যে কোন কোন স্থলে পল্লবিত না করা হইয়াছে, অবশ্য এমনও নহে।

প্রথমেই গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা, অতঃপর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণন, সৃষ্টি-রহস্য কথন, মনুর প্রজাসৃষ্টি, প্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, উমার তপস্যা, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, গৌরীর বিবাহ, কৈলাসে হরগৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, পার্বতী-চণ্ডী বা শিবের সম্পর্কিত অন্য কেহ যেমন মনসা প্রভৃতির নিজেদের পূজা-প্রচার-চেষ্টা, নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে

পূজা প্রচার, স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশুর স্বর্গে প্রত্যাবর্তন—এই সকল বিষয়েরই বৈচিত্র্যহীন আলোচনা সকল পরবর্তী মঙ্গলকাব্যেরই বৈশিষ্ট্য। এই সকল বর্ণনাপ্রসঙ্গে বারমাসী, নারীগণের পতিনিন্দা, চৌতিশা বা বর্ণানুক্রমিক চৌত্রিশ অক্ষরে দেবতা-স্তব, এগুলি প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেরই অপরিহার্য বিষয়-বস্তু হইয়া আছে। কেবল ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে শিব-প্রসঙ্গের পরিবর্তে হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান ও অন্যান্য কতকগুলি স্বতন্ত্র বিষয় দৃষ্ট হয়। এখানে মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও তাহাদের সঙ্গে বাংলার জাতীয় প্রকৃতির কত দূর যোগ রহিয়াছে, তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

নায়িকার 'বারমাসী' বর্ণনা বাংলার প্রাচীন কাব্যগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বারমাসীর বর্ণনায় প্রাচীন কবিগণ পরিবর্তমান প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর পটভূমিকায় নায়ক-নায়িকার সুখদুঃখের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। একমাত্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই যে এই বারমাসীর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। মনে হয়, মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের পূর্ব হইতেই এই বিষয়ক খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন লোক-গীতি প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। অতঃপর তাহা পরবর্তী যুগের এই শ্রেণীর কাব্যসাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া আরও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। মধ্যযুগের কাব্যকাহিনীর মধ্যে ইহাদের যোগ খুব নিবিড় নহে। কোন মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মধ্যেই ইহাদের বর্ণনা অপরিহার্য বলিতে পারা যায় না। দেশের লৌকিক সাহিত্যে প্রচলিত এই বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড গীতিগুলি মঙ্গলকাব্যকে আশ্রয় করিয়া যেমন পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তেমনই দেশের অন্যান্য সমসাময়িক সাহিত্য-বস্তুকেও অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এইজন্য কোন কোন রামায়ণের অনুবাদে সীতার বারমাসী, বৈষ্ণব কবিতায় রাধিকার বারমাসী, চৈতন্য-জীবন-চরিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাসী, ময়মনসিংহ গীতিকায় মহুয়ার বারমাসী মলুয়ার বারমাসী ইত্যাদির সহিত পরিচয় লাভ করা যায়। ইহাদের ক্ষেত্র ও বিষয়-গত বৈচিত্র্য এত অধিক যে, মধ্যযুগের যে কোন সাহিত্য অবলম্বন করিয়াই ইহা প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব মঙ্গলকাব্যেরই ইহা কোন বিশিষ্ট লক্ষণ নহে। তবে ইহাদিগকে নিজেদের মধ্যে স্থান দিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি জাতীয় কাব্যেরই মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজের প্রচলিত বহু বিচ্ছিন্ন পরিণত বা অপরিণত সাহিত্যিক প্রয়াস জাতীয় কাব্যের মধ্যে আসিয়া সুসঙ্গত পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। এই

বারমাসীগুলির বর্ণনায় যদিও কালক্রমে বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিকতার আশ্রয় লওয়া হইত, তথাপি প্রথম যুগের বারমাসীগুলির মধ্যে বাঙ্গালীর ব্যক্তি-জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি যে ভাবে মূর্ত হইয়াছে, তাহার জাতীয় মূল্য অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ইহাদের প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যেও যেমন বাংলার প্রকৃতিরই খুঁটিনাটি বাস্তব চিত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়, ইহাদের পটভূমিকায় অবস্থিত নায়ক-নায়িকার অনুভূতিও তেমনই বাস্তব ও জীবন্ত বলিয়া অনুমিত হয়। প্রকৃতির পটভূমিকায় মানব-মনের সুখ-দুঃখের বর্ণনার রীতি সংস্কৃত কাব্যেও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাসের 'মেঘদূতম্' কাব্য এ'বিষয়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার মত। কিন্তু তাহাতেও পরিবর্তমান প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল মানব-মনের বর্ণনা পাওয়া যায় না। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কাব্যে ষড়্ঋতুর গতানুগতিক ও অলঙ্কারশাস্ত্রানুমোদিত বর্ণনার শ্রোত্রীহিসাবে একটি স্ত্রী-চরিত্র কাব্যের সঙ্গে ক্ষীণতম যোগসূত্রে আবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কবি-প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কোন কোন শ্লোকে এই প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন, 'নিদাঘকালোঽয়মুপাগতঃ প্রিয়ে!' (১।১) কিংবা 'ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে!' (২।১) অতএব এই চরিত্রটি কাব্যের নায়িকা নহে, বিশেষতঃ বাহ্য প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে তাহার অন্তরের যোগও অত্যন্ত কৃত্রিম। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্যে আর কোথাও বারমাসীর মত কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

অতএব সংস্কৃত সাহিত্য হইতে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের এই বারমাসীর বর্ণনাগুলি আসিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। বিহার প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতে এই প্রকার বারমাসীর অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। পাটনা জিলার ভূমিহার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও রাজপুত পরিবারের মেয়েদিগের মধ্যে 'ছৌমাসা' নামক এই প্রকার লোক-সঙ্গীতের প্রচলন আছে। 'ছৌমাসা' অর্থ ছয়মাসী; বাংলা মঙ্গলকাব্যে বারমাসের পরিবর্তে নায়িকার ছয় মাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনামূলক রচনাও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই ছয়মাসী বা ছয়মাস্যা বলে। মনে হয়, বাংলা ও বিহারে এই বারমাসী বা ছয়মাসীর বর্ণনায় বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী কোন উপজাতীয় অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতের প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, মধ্যভারতে কোন কোন আদিম জাতির মধ্যেও বাংলা দেশের অনুরূপ বারমাসী গান আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। এমন

কি, সুদূর পাঞ্জাব অঞ্চলেও অনুরূপ সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইউরোপের কোন কোন অঞ্চলের লোক-সাহিত্যে Seasonal songs নামক প্রায় অনুরূপ বর্ণনার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। মানব মনের এক শাশ্বত বৃত্তি হইতেই যে সকল দেশেই এই প্রকার রচনার উদ্ভব হইয়া থাকিবে, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য ইহার অপরিহার্য পাক-প্রণালীর বর্ণনা। উপযুক্ত কোন অবকাশ পাইলেই এই সকল কাব্যের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই রন্ধন-কার্যের বিস্তৃত বর্ণনার অবতারণা করা হইয়াছে। এই সকল বর্ণনার মধ্যে কবিগণ বাস্তবতার প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। মধ্যযুগের আখ্যান-কাব্যের বাহিরেই ইহাদের উদ্ভব হইয়াছিল; কালক্রমে মঙ্গলকাব্যের কাহিনী অবলম্বন করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মধ্যযুগের কাব্য-সাহিত্য পরিণত রূপ লাভ করিবার পূর্বে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন লৌকিক (popular) রচনা হিসাবে ইহা এদেশে প্রচলিত ছিল। ডাকের নামে প্রচলিত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন লোক-প্রবচনের মধ্যেও এই প্রকার পাক-কার্যের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়; সমাজের জনসাধারণের রুচির অনুগামী বলিয়া চারিদিক হইতে এই সকল বিচ্ছিন্ন লৌকিক রচনাসমূহ কালক্রমে মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছে।

বলাই বাহুল্য যে, মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মধ্যে এই সকল বর্ণনা সর্বত্রই অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু যেহেতু মঙ্গলকাব্যের কাহিনী-ভাগ গৌণমাত্র, ইহার পারিপার্শ্বিক বর্ণনাই মুখ্য, সেইজন্য কাব্যের মধ্যে ইহার স্থান দোষাবহ বলিয়া মনে হয় নাই। কাহিনীর অগ্রগতিতে এই সকল একঘেয়ে দীর্ঘায়িত বর্ণনা বিশেষভাবেই বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে, কিন্তু তথাপি কাব্যের কাহিনীর পরিণতির উপর সেই যুগের শ্রোতৃমণ্ডলীর কৌতূহল নিবদ্ধ থাকিত না; বরং কোন পারিপার্শ্বিক খণ্ড বর্ণনার মধ্যে যদি তাহারা নিজেদের বাস্তব রস ও রুচির অনুগামী দুই একটা কথা শুনিতে পাইত, তাহা হইলে তাহাতেই তাহাদের কৌতূহল নিবদ্ধ হইয়া পড়িত। অতএব ইহাও প্রাচীন কাব্যের একটা অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করিতে হয়। এই সকল বর্ণনার মধ্যে কৃত্রিমতা যে খুব বেশী আছে, তাহা নহে—সর্বত্রই তাহা কবিদিগের বাস্তব অভিজ্ঞতা-জাত। প্রাচীন কাব্যের শ্রোতৃমণ্ডলীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারাও তাহা বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত। সেই জন্যই ইহা কবি ও পাঠক

উভয়েরই সমান ঔৎসুক্য লাভ করিত। কেবল মাত্র মঙ্গলকাব্য অবলম্বন করিয়াই যে এই শ্রেণীর রচনা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা নহে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, 'চৈতন্য-ভাগবত' এবং এই প্রকার সমসাময়িক অন্যান্য রচনার মধ্যেও বাঙ্গালীর জাতীয় রুচির অনুমোদিত এই বিশেষ রীতিটির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যে ইহার বিস্তৃততম বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা সত্য। এই সকল বর্ণনায় প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদিগের কৃতিত্ব সম্পূর্ণই মৌলিক; বাস্তবতার প্রতি প্রীতি বিশেষভাবে এই দেশেরই বিশেষ প্রকৃতির জাতীয় চরিত্রের প্রেরণা হইতে ইহাদের জন্ম হইয়াছে। কারণ, দেখা যায় যে, ভোজন-বিলাসিতা বাঙ্গালী চরিত্রের একটি বিশিষ্ট ও মৌলিক জাতীয় গুণ।

মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নারীদিগের পতিনিন্দার বর্ণনা। ইহাতে বিবাহ-সভা কিংবা অন্যত্র কাব্যের নায়ককে দর্শন করিয়া বিবাহিত নারীগণ তাহার সঙ্গে নিজেদের পতিদিগের তুলনা করিয়া নিজেদের স্বামি-দুর্ভাগ্যের কথা পরস্পর আলোচনা করিয়া থাকেন। এই তুলনামূলক আলোচনায় কাব্যোল্লিখিত নায়কের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইলেও, ইহা দ্বারা যে সামাজিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কোন দিক হইতেই প্রশংসার যোগ্য নহে। এই রীতিটি মূলতঃ সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়; বাণভট্ট-রচিত কাদম্বরী নামক গদ্য-কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গুরু-গৃহপ্রত্যাগত রাজকুমার চন্দ্রাপীড়ের রূপ-যৌবন দর্শন করিয়া বিদিশা নগরের নারীগণ নিজেদের স্বামি-দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিতেছেন। কিন্তু সেখানে বাণভট্টের বর্ণনা বাঙ্গালী কবিদিগের মত এত অসংযত ও স্থূল নহে। তথাপি ইহার ইঙ্গিতটি যে সেখান হইতেই আসিয়া বাঙ্গালীর তদানীন্তন সমাজের রুচির অনুমোদন লাভ করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পাতিব্রত্যের এক অতি কঠোর আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হইলেও ইহাদের মধ্যেও পতিনিন্দার এই গতানুগতিক বর্ণনা স্থান লাভ করিয়াছে। ইহাতে একদিকে মৃত পতির অস্থি কয়খানি সম্বল করিয়া অপরিস্ফুট-যৌবনা এক নারী পাতিব্রত্যের শ্বেত-পতাকা উড়াইয়া দুস্তর সংসার-গাঙ্গুরে দুঃখের ভেলা লইয়া ভাসিয়াছে, আর একদিকে তাহারই প্রতিবেশিনী নারীগণ নিজেদের পতিদিগের ঐহিক ছোটখাট দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ করিয়া তাহাদিগের প্রতি নির্লজ্জ ধিক্কারে পাতিব্রত্যকে পদদলিত করিতেছে।

পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এই বর্ণনায় যে কদর্য মনোভাব কদর্যতম ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে, পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে তাহার কিছু অভাব দেখা যায়। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের মঙ্গলকাব্য মাত্রই নীতির দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত ; ইহার কারণ, চৈতন্যদেবের চরিত্রের মধ্যে যে উচ্চ নৈতিক গুণ ছিল, তাহা সমসাময়িক বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে বাংলার সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সেকালে স্থূল গ্রাম্যজীবনের বাস্তব চিত্র অবলম্বন করিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি যে কুরুচি ও দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেছিল, চৈতন্য-সাহিত্যেই সর্বপ্রথম তাহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। তাহারই ফলে চৈতন্য-পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির নৈতিক স্থর উন্নততর হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের এই শ্রেণীর বর্ণনাগুলিও বাস্তব ভিত্তির উপর রচিত নহে, বরং কেবলমাত্র গতানুগতিকতার মুখরক্ষার জন্যই রচিত। বাস্তবতা যখন ইহার ভিতর হইতে পরিত্যক্ত হইল, তখন ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি দ্বারা এই শ্রেণীর রচনার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করা হইতে লাগিল। ভারতচন্দ্রের মধ্যে এই উৎকর্ষ একেবারে চরমে গিয়া পৌছিয়াছে ; এই একান্ত পর্যুদিত একটি বিষয় বর্ণনা [illegible]রিতেও একমাত্র [illegible]যার গুণে ভারতচন্দ্র ইহার মধ্যে যে সৌন্দর্য দান করিয়াছেন, [illegible] দ্বারা ইহার বস্তুগত কদর্যতা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। 'বিদ্যাসুন্দরে' নায়ক-নারীদিগের পতিনিন্দায় ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

আহা ম'রে যাই,
লইয়া বালাই,
কুলে দিয়া ছাই
ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া
ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া
সাগর পারে॥
কহে একজন,
লয় মোর মন
এ' নব রতন
ভুবন মাঝে।

বিরহে জ্বলিয়া
সোহাগে গলিয়া
হারে মিলাইয়া
পরিলে সাজে ॥
আর জন কয়,
এই মহাশয়
চাঁপা ফুল ময়,
খোঁপায় রাখি।
হলদি জিনিয়া
তনু চিকণিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া
হৃদয়ে মাখি ॥

বিবাহাচারের বিস্তৃত বর্ণনা মঙ্গলকাব্যগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এই বিষয়ক রচনায় বাংলার সমাজের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং এই শ্রেণীর বর্ণনা কেবলমাত্র গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের বাঁধাধরা নিয়মানুবর্তী মাত্র নহে। বাংলার ইতিহাস নামে যে সকল গ্রন্থ আধুনিককালে শিক্ষিত সমাজের নিকট পরিচিত, তাহাদের মধ্যে এ' দেশের রাজনৈতিক বিবরণ ব্যতীত বাঙ্গালীর অতীত জীবনের আর কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না। কিন্তু কেবলমাত্র রাজনৈতিক চিত্রের ভিতর দিয়া কোন দেশেরই সমাজ-জীবনের আভ্যন্তরিক কোন পরিচয় লাভ করিতে পাবা যায় না। সুতরাং কেবলমাত্র দেশের রাজনৈতিক ঘটনার উত্থান-পতনের বর্ণনাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য হইতে পারে না—দেশের সাধারণ মানুষের অতীত পরিচয় যদি ইতিহাসের মধ্য দিয়া প্রকাশ না পায়, তবে সাধারণ মানুষও সে বিষয়ে কোনও কৌতূহল অনুভব করিতে পারে না। সেইজন্য আমাদের দেশের ইতিহাসের কেবলমাত্র শিক্ষাগত (academic) মূল্য ব্যতীত আর কোনও মূল্য নাই। বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসের এই ত্রুটি দূর করিবার পক্ষে মঙ্গলকাব্যগুলি যে পরম সহায়ক হইতে পারে, ইহাদের বিবাহাচারের বর্ণনাগুলিই তাহার প্রমাণ। পূর্বেই বলিয়াছি, এই বিবাহাচারের বর্ণনাগুলি বাংলার সর্বত্র অভিন্ন নহে—ইহার অর্থ মঙ্গলকাব্যের মৌলিক কাহিনী সম্পর্কে সর্বত্র অভিন্নতা রক্ষা করা হইলেও, ইহার

বহিরঙ্গগত বিস্তৃত (details) পরিচয়ের ভিতর দিয়া বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বত্র রক্ষা করা হইয়াছে। কবিগণ নিজস্ব সমাজের মধ্যে যে সকল বিবাহানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদেরই উপকরণ তাঁহাদের কাব্য-রচনারও উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হইত। এই বিষয়ে প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের কবিই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন—সেইজন্য যে কবি যে অঞ্চলে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কবি সেই অঞ্চলেরই সামাজিক প্রথার এক একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব বিভিন্ন কবির এই বিষয়ক রচনাগুলি একত্র সংকলিত করিতে পারিলেই তাহা হইতেই বাংলার বিশেষ স্তরের একটি সমাজের বিবাহাচারের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। সমাজের ক্রম-পরিবর্তনের ধারা যাঁহারা অনুসরণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট এই শ্রেণীর তথ্য পরম মূল্যবান্। আমাদের দেশে নৃতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব কিংবা জাতি-তত্ত্বের আলোচনা আজিও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই ; সেইজন্য ইহাদের মূল্য সম্পর্কে আজিও কেহ সম্যক্ অবহিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু একদিন যখন সেই প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে, তখন মঙ্গলকাব্যের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকিবে না।

বিবাহের আচারগুলি অত্যন্ত রক্ষণশীল ; কারণ, বিবাহের উদ্দেশ্য সন্তান লাভ। প্রাচীন সমাজের বিশ্বাস ছিল যে, বিবাহের প্রচলিত আচারে কোনও ব্যতিক্রম ঘটিলে সন্তান-লাভেও বিঘ্ন উপস্থিত হয় ; অতএব ইহাদের মধ্য দিয়া সমাজের রক্ষণশীলতার একটি পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বিবাহ সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান—ইহার ভিতর দিয়া পারিবারিক জীবন-ধারা রক্ষা পায় এবং পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া বৃহত্তর সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠে। বিবাহাচারগুলি মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যে এত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা হইতে বাংলার সমাজ সম্পর্কে এই প্রকার বহু খুঁটিনাটি তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে।

প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই একাধিকবার এই সকল বিবাহাচারের সুবিস্তৃত বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যাইবে। মনসা-মঙ্গল কাব্যে তিনটি বিবাহের অনুষ্ঠান হইয়াছে, যথা—মনসার বিবাহ, চাঁদ সদাগরের বিবাহ এবং লখীন্দরের বিবাহ ; তিনটি বিবাহের বর্ণনাই প্রায় অনুরূপ, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একটি আর একটির পুনরাবৃত্তি মাত্র নহে। এই সকল বর্ণনা পরিবেশন করিতে কবিদিগের কোনও ক্লান্তি দেখা যায় না, শ্রোতৃবর্গের স্বীকৃতি ছিল বলিয়াই কবিগণ এই বিষয়ে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা

গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। এই সকল বর্ণনার ভিতর দিয়া সে যুগের সমাজ নিজের বিষয়ে নিজেই পর্যালোচনা করিত, ইহাদের শ্রুতি-পরম্পরায় সমাজ আত্মবিস্মৃতি হইতে পরিত্রাণ পাইত।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে বিবাহাচারের মত আর কোনও সামাজিক আচারেরই এত বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় না। (কিন্তু এই বিবাহাচারের বর্ণনার ভিতর দিয়াই মধ্যযুগের সমগ্র সমাজটির প্রকৃত পরিচয় যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।) পূর্বেই বলিয়াছি, এই বর্ণনার মধ্যে প্রাণহীন গতানুগতিকতার পরিবর্তে, প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবন-চেতনার স্পর্শ আছে। সেইজন্য বর্ণনাগুলি কৃত্রিম না হইয়া সজীব বলিয়া মনে হয়। তবে এ' কথা সত্য, ইহাদের বর্ণনার ভিতর দিয়া নিম্নশ্রেণীর সমাজ-জীবনের কোনও পরিচয় প্রকাশ পাইবে না—কবিগণ যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, ইহা তাহারই পরিচয়। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ অধিকাংশ উচ্চশ্রেণীসম্ভূত, অতএব তাঁহাদেরই সমাজের পরিচয় ইহাদের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। যখন কোনও নিম্নশ্রেণীর লেখক মঙ্গলকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তখন তিনি উচ্চ-শ্রেণীর লেখকদিগকে অনুকরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন—সেইজন্য তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া কোনও মৌলিকতা প্রকাশ পাইতে পারে নাই। (অতএব মঙ্গলকাব্যের বিবাহাচারগুলির মধ্য দিয়া বাংলার বিভিন্ন সামাজিক স্তরের পরিবর্তে কেবলমাত্র উচ্চতম স্তরটিরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে স্বীকার করিতে হয়।) এমন কি কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ব্যাধ কালকেতুর বিবাহাচার বর্ণনা করিতে গিয়াও তাঁহার নিজস্ব সমাজের এই সম্পর্কিত আচারের কথাই বর্ণনা করিয়াছেন, অনার্য ব্যাধ-সমাজের বিবাহাচারের কথা উল্লেখ করেন নাই। ইহার কারণ, মঙ্গলকাব্যের কবিগণ কোনও বিষয়েই প্রত্যক্ষ সমাজটিকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার ফলেই মঙ্গলকাব্যের রচনা বাস্তবধর্মী হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে

(বিশ্বকর্মার শিল্পকীর্তির বিস্তৃত বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ।) ইহার মধ্য দিয়া সে' কালের বাংলার স্থাপত্য ও অন্যান্য বিবিধ শিল্পের পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিশ্বকর্মার পুরী নির্মাণের মধ্যে এ' দেশের স্থাপত্য-শিল্প, নগর-পত্তনের মধ্য দিয়া নগর-সংস্থাপনা (Town planning), ডিঙ্গা নির্মাণের মধ্য দিয়া সমুদ্রগামী নৌকা-নির্মাণ-কৌশল, কাঁচুলী, টোপর প্রভৃতি নির্মাণের ভিতর দিয়া চারুশিল্প সাধনার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।।

বাংলার সদাগরদিগের সমুদ্রযাত্রার বর্ণনায় যেমন একটি প্রাচীনতর ঐতিহ্যের

অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়, উল্লিখিত বিষয়গুলির বর্ণনায় তাহার পরিবর্তে কবিদিগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই ভিত্তি করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ পুরী নির্মাণের কথাই ধরা যাউক। কোনও গতানুগতিক রীতি অনুসরণ করিয়া ইহার বর্ণনার অবতারণা করা হয় নাই। পুরী হইলেই যে তাহা বিশাল এবং স্বুবর্ণহীরকাদি-মণ্ডিত হইবে, ইহার মধ্যে তাহার উল্লেখ নাই—বরং তাহার পরিবর্তে কোনও কোনও মঙ্গলকাব্যে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কাদা দিয়া এই পুরীর ভিত্তি পত্তন করা হয়।

'কাদা তুলি দিল বীর শুভক্ষণ বেলা।' —মুকুন্দরাম

কোদালি দিয়া মাটি কাটিয়া তুলিতে হয়, ইহার জন্য দৈহিক শক্তির প্রয়োজন, সূক্ষ্ম শিল্পবোধের প্রয়োজন নাই—

'যখন কোদালি ধরে বীর হনুমান।
বাসুকি সহিত নাগ হয় কম্পমান॥' —মুকুন্দরাম

অতএব কোদালের সহযোগে কাদা দিয়া মঙ্গলকাব্যের পুরী নির্মিত হয়, সুতরাং ইহা আর যাহাই হউক, অমরাবতী নহে—স্বর্ণ-লঙ্কাও নহে; ইহা সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের মাটির ঘরবাড়ী। মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের কল্পনা কখনও আকাশ স্পর্শ করিতে পারে নাই, ইহা আকাশের দিকে মুখ তুলিয়াও মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, স্বর্গ রচনা করিতে বসিয়াও মর্ত্যের কাদামাটি তাহার উপাদান করিয়া লইয়াছে। ইহা অমরাবতীর দেবপুরী সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হইয়াছে সত্য, কিন্তু বাংলার মাটির ঘরগুলি সৌন্দর্যে ভরিয়া দিয়াছে।

(পল্লীর সমাজ হইতেই মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছে, নাগরিক জীবনের সঙ্গে ইহা কোন যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। কিন্তু সে'জন্য সেকালের নাগরিক জীবনের সঙ্গে যে মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের কোন পরিচয় ছিল না, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যে নগর-পত্তনের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাই ইহার প্রমাণ। ইহাদের বর্ণনার মধ্যে মধ্যযুগের বাংলার এক একটি নগর যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে—এই সকল রচনাও কবিদিগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জাত, তাহাতে কৃত্রিমতা কিংবা গতানুগতিকতার প্রভাব অনুভব করা যায় না।) মঙ্গলকাব্যের কবিগণ সেকালের একটি নগর বর্ণনা করিতে বসিয়া তাঁহাদের চক্ষু চারিদিকে খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, কেবলমাত্র নিজের সমাজটির উপরই যে সেই দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নহে। নাগরিক জীবন

যে মিশ্র সমাজ-জীবন, ইহার বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে ঐক্য আছে, ইহার বিভিন্ন সমাজ পরস্পর আপেক্ষিক হইয়াও যে স্বতন্ত্র, মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের নগর বর্ণনার ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। মধ্যযুগের বাংলার নাগরিক জীবনের এমন পূর্ণাঙ্গ চিত্র আর কোথাও পাওয়া যায় না ; এমন কি যে ইতিহাসকে আমরা প্রাচীন তথ্য-সম্পর্কিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার মধ্যেও এই বিষয়ক যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনই অস্পষ্ট। অতএব এই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাইতে হইলে মঙ্গলকাব্যের বর্ণনার সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই। অথচ এ' কথা সত্য যে, বাংলার কোনও উল্লেখযোগ্য ইতিহাসের মধ্য দিয়া এই সকল তথ্য আজও পরিবেশন করা হয় নাই। তাহার ফলে এই বিষয়ক আলোচনা কোথাও সার্থক কিংবা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

অবশ্য এ' কথা সত্য যে, মঙ্গলকাব্যের পূর্বোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির মত নগর-পত্তন কিংবা নগর-বর্ণনা ইহার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না ; মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'র মত এত বিস্তৃত নাগরিক জীবনের বর্ণনা আর কোন মঙ্গলকাব্যে নাই। ইহার কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, পল্লী-জীবনের নিভৃত ছায়াতলে মঙ্গলকাব্যের পরিবেশ রচিত হইয়া থাকে, সেখানে নাগরিক জীবনের কোলাহল গিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। বর্তমান যুগের মত নাগরিক জীবন সেদিন পল্লী-জীবনকে প্রভাবিত করিতে পারিত না ; কারণ, বাংলার পল্লীজীবনের সংহতি তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল ; অতএব নব-প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনই পল্লীজীবন দ্বারা সেদিন প্রভাবিত হইয়াছে। নাগরিক সমাজ-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাও পল্লীবাসীর খুব ব্যাপক ছিল না। সেইজন্যই মঙ্গলকাব্যের কোন কোন কবি নগর-জীবনের বর্ণনার ভিতর দিয়া তাঁহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রকাশ করিতে পারিলেও, ইহা মঙ্গল-কাব্যের একটি একান্ত আবশ্যক রীতি হিসাবে কোনদিনই গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার সদাগরদিগের উপকূল বাণিজ্যের (coastal trade) বিষয় লইয়া মঙ্গলকাব্যের কাহিনী রচিত হইয়াছে—এই সম্পর্কে ইহাদের মধ্যে সমুদ্রগামী নৌকা বা ডিঙ্গা নির্মাণের বিস্তৃত বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়। এই রচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, এই সকল বর্ণনা এই সম্পর্কিত একটি প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করিবার ফল, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল নহে। কারণ, যে যুগে এই

বর্ণনাগুলি রচিত হইয়াছে, সেই যুগে অর্থাৎ মধ্যযুগে বাংলার সদাগরদিগের উপকূল বাণিজ্য লোপ পাইয়াছিল, সমুদ্রগামী নৌকানির্মাণেরও তখন আর কোনও প্রয়োজন ছিল না। সেইজন্য এই বিষয়ক বর্ণনাগুলি এত জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু ইহাদিগের মধ্য হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার পূর্ববর্তী যুগে এই শিল্প এ' দেশে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এবং তাহার ফলে এই বিষয়ক সংস্কার মধ্যযুগ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছিল। মধ্যযুগের প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই ইহার বর্ণনা এক অপরিহার্য বিষয় হইয়া রহিয়াছে, কোন কোন কবির এই বিষয়ক রচনায় যে বিস্তৃতি ও গভীরতা দেখা যায়, তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে, সমাজ-জীবন হইতে ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয় তখনও একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

প্রত্যেক শিল্পকর্মের গুরুই বিশ্বকর্মা—স্থাপত্য-শিল্প হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মতম চিত্রকলাও বিশ্বকর্মারই কার্য। মঙ্গলকাব্যের সকল শিল্পকীর্তিই বিশ্বকর্মার নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। সেইজন্য পুরী, নগর, নৌকা নির্মাণের মত কাঁচুলী, টোপর, ফলা প্রভৃতি নির্মাণ এবং তাহাদিগের চিত্রকরণের কার্যও বিশ্বকর্মারই কীর্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই ইহাদের বর্ণনা অপরিহার্য। অন্ততঃ প্রত্যেকটির না হউক, ইহাদের অন্ততঃ এক কিংবা একাধিক বিষয়ের বর্ণনা প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিশ্বকর্মা চণ্ডীর কাঁচুলী নির্মাণ করিয়া ইহার মধ্যে সমগ্র রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ কাহিনী চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অপরিসর একখানি কাঁচুলীতে এত বিস্তৃত বিষয়ের চিত্রকরণের কোন অবকাশ আছে কি না তাহা বিচার না করিয়া বর্ণনার পর বর্ণনা স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব মনে হয়, এই সকল বর্ণনার কোন বাস্তব মূল্য নাই, কিংবা কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতেও ইহারা রচিত নহে। যুদ্ধের ফলা বা ঢাল, বিবাহের শোলার মুকুট প্রভৃতির মধ্যেও অনুরূপ চিত্রকার্যের বিস্তৃত বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্য দিয়া প্রাচীন বাংলার চিত্র-কলা সাধনার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পাঠক মাত্রেরই কৌতূহল সৃষ্টি করিতে পারে। উড়িষ্যার মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যে যে শিল্প একদিন পাষাণে রূপায়িত হইয়াছিল, তাহাই মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের লেখনীতে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

সমুদ্রপথের বর্ণনা মঙ্গলকাব্য মাত্রেরই অপরিহার্য অঙ্গ। পূর্বেই বলিয়াছি,

এই বর্ণনা পড়িলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা ভারত সমুদ্রের উপকূল বাণিজ্য পথ। সমুদ্রপথের বর্ণনার মধ্যে কালীদহের বর্ণনা এক অপরিহার্য বিষয়। কালীদহেই চণ্ডীমঙ্গলের কমলে কামিনী বা সামুদ্রিক মরীচিকার আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহারই উত্তাল তরঙ্গে চাঁদ সদাগরের ভরাডুবি হইয়াছিল। পূর্বে বলিয়াছি, যখন মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়, তখন বাঙ্গালীর সমুদ্রপথে বাণিজ্যযাত্রার অবসান ঘটিয়াছিল; অতএব এ' জাতির বিস্মৃতপ্রায় যুগের একটি সংস্কারের উপর ভিত্তি করিয়া সমুদ্রযাত্রার কথা বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং ইহার বর্ণনার মধ্য দিয়া অস্পষ্ট বাস্তব সত্যের সঙ্গে সঙ্গে অবাস্তব কল্পনারও সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। সমুদ্রপথে প্রতি পদে অনিশ্চয়তা ও দুর্যোগের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়—সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কিত এই সংস্কার মধ্য যুগ পর্যন্ত যে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক সমুদ্রযাত্রার বর্ণনাই এক একটি উন্মত্ত ঝড়ের বর্ণনায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্র ঝড়ে সর্বস্বান্ত সদাগরের করুণ চিত্রের পার্শ্বে মঙ্গলকাব্যের পশ্চিম বঙ্গের কবিগণ একটি হাস্যরসের চিত্রও পরিবেশন করিতেন, তাহা বাঙ্গাল মাঝিদিগের খেদ। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, বহু প্রাচীন কাল হইতেই সমুদ্রগামী নৌকা চালনার কার্যে পূর্ববঙ্গের নাবিকগণই অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। আজিও তাহাদের এই বিষয়ক অভিজ্ঞতার পরিচয় সর্বজনবিদিত।

(প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের কবিই গ্রন্থমধ্যে আত্মপরিচয় ও গ্রন্থোৎপত্তির একটি বিবরণ দিয়া থাকেন।) আত্মপরিচয় অংশে পিতা-পিতামহ মাতা-মাতামহ প্রভৃতির নাম ও বাসস্থানের উল্লেখ থাকে এবং গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ অংশে দেবতার স্বপ্নাদেশই যে কাব্য-রচনার মুখ্য কারণ, তাহা উল্লেখ করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই অংশেই কবিজীবনের কোন ব্যক্তিগত বিষয়েরও উল্লেখ থাকে। কিন্তু এই অংশে গ্রন্থরচনার সময়ের উল্লেখ থাকে না। ইহা ভূমিকা বা মুখবন্ধরূপে কাব্যের প্রথম দিকে যুক্ত থাকে। কাব্য যেখানে শেষ হইয়া যায়, সেইখানেই হেঁয়ালীর আকারে কাব্যরচনার সময় নির্দেশ করা হয়। এই হেঁয়ালী লিপিকার, অনুলিপিকারগণ সহজে বুঝিতে না পারিয়া ক্রমে এমন বিকৃত করিয়া ফেলে যে, ইহা হইতে অর্থোদ্ধার করা আর কিছুতেই সম্ভব হইয়া উঠে না। বিশেষতঃ এই অংশ গ্রন্থের সর্বশেষে থাকে বলিয়া তাহা সহজেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সকল কারণে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বহু গ্রন্থের রচনাকাল নিরূপণ করা সম্ভব হয় না।)

এ' দেশের সমাজ জন্মান্তরবাদী। জীবনে যাঁহারা মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণ মানুষ নহেন, অভিশপ্ত দেবতা, ইহাও এ' দেশের লোক বিশ্বাস করিয়া থাকে। সেইজন্য প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেরই নায়ক-নায়িকা যে স্বর্গ-চ্যুত দেবতা, তাহা বর্ণনা করা হইয়া থাকে। বিশেষ দেবতার পূজা প্রচারের জন্য নাম মাত্র অপরাধে তাঁহাদিগকে স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হয়—তারপর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গেলে তাঁহারা স্বর্গলোকে ফিরিয়া যান। মর্ত্যলোক কাহারও চিরদিন বাস করিবার স্থান নহে, এখানে সকলেই অতিথি, পূর্বজন্মের সুকৃতি বা দুষ্কৃতির ফলে মানুষ ইহজন্মে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে—ভোগ শেষ হইয়া গেলে নিত্য লোকে ফিরিয়া গিয়া অনন্ত শান্তির অধিকারী হয়। এই কাহিনী হইতে এই সমাজ নিজের জীবনে এই শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়া আসিতেছে।

প্রহেলিকা বা ধাঁধা লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ। জাতির বিবিধ লৌকিক রসোপকরণ অবলম্বন করিয়া লোক-সাহিত্যের ভিত্তির উপরই মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে বলিয়া লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট উপকরণ প্রহেলিকা বা ধাঁধাও মঙ্গল-কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মঙ্গলকাব্যের কাহিনী মাত্রই নিতান্ত শিথিল-গ্রন্থি—ইহার কাহিনীগত শৈথিল্যের অবকাশে জাতির বিবিধ রসোপকরণ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল কাহিনীর ধারায় সম্পূর্ণ অসংলগ্ন বিবেচিত হইলেও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রহেলিকা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে; ইহার অবতারণা ব্যতীত কোন উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্যই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু এই প্রহেলিকাগুলি মৌখিক সাহিত্যের স্তর অতিক্রম করিয়া মঙ্গলকাব্যের লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে ইহাদের সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন বিনষ্ট হইয়াছে। কবিদিগের পাণ্ডিত্যের স্পর্শ ইহাদিগের স্বচ্ছ রূপ অনেক ক্ষেত্রেই আবিল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা লিখিত হইয়া প্রচারিত হইবার ফলে ইহাদিগের মধ্য হইতে এই বিষয়ক একটি প্রাচীন ধারার সন্ধান লাভ করা যায়। প্রহেলিকাগুলি যে একদিন ভারতের অন্যান্য আদিম জাতির মত বাঙ্গালীরও সমাজ-জীবনের আচার-ভুক্ত ছিল, মঙ্গল-কাব্যগুলি হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন আদিম সমাজে বিবাহোপলক্ষে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে প্রহেলিকা জিজ্ঞাসা করে, বরপক্ষ প্রহেলিকা-গুলির যথাযথ উত্তর দিতে পারিলে তাহারা কন্যার গৃহে উপস্থিত হইবার অধিকার লাভ করে। বাংলার যে সমাজ মঙ্গলকাব্যের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল, তাহার

মধ্যেও যে এই আচার একদিন প্রচলিত ছিল, ইহাদের মধ্যে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় ইহা একটি অতি মূল্যবান্ উপাদান বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে।

(প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই নারীর সতীত্বের পরীক্ষার একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, ইহা রামায়ণের সীতার অগ্নি-পরীক্ষার অনুকরণ-জাত, কিন্তু এ' কথা সত্য নহে। কারণ, মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে সীতার অগ্নি-পরীক্ষার অনুরূপ কোন পরীক্ষার পরিবর্তে একাধিক পরীক্ষার উল্লেখ আছে।) মনসা-মঙ্গলে বেহুলার অষ্টপরীক্ষার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা লোক-সাহিত্য মাত্রেরই একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ইংরেজিতে ইহাকে chastity test বলে—মঙ্গলকাব্যে ইহা লোক-সাহিত্যেরই প্রেরণার ফল। এ' সম্পর্কে পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

বিপন্ন নায়ক কর্তৃক দেবীর চৌতিশা স্তব বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। ক হইতে আরম্ভ করিয়া হ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনবর্ণ ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক পদের আদিবর্ণরূপে ব্যবহার করিয়া রচিত স্তবই চৌতিশা স্তব নামে পরিচিত। ইহাতে ক্রমান্বয়ে চৌত্রিশটি অক্ষর ব্যবহার করিতে পারা যায় বলিয়া ইহাকে চৌত্রিশা বা চৌতিশা বলে। যেমন,

> **ক**রযোড়ে কবিবর করে পরিহার।
> করগো করুণাময়ি কৃপা একবার॥
> **খ**ট্টাঙ্গ খর্পরা খরা খরতর অসি।
> খেণেকে করিবে খুন রক্ষা কর আসি॥
> **গি**রিসুতা গুণবতি গহনবাসিনি।
> গলে নরমুণ্ডমালা গগনবাসিনি॥
> **ঘো**র ঘন বাদিনি শরণ দেহ শিবা।
> খুশীতে রহুক ক্ষিতীন্দ্র নানা করিবা॥
> **ঙ** (উ) মা তুমি আসিয়া উষারে কৈলা দয়া।
> ঙ (উ) রিতে উচিত বিদ্যা মাগে পদছায়া॥ ইত্যাদি—

বলা বাহুল্য, এই সকল রচনার ভিতর দিয়া কোন কবিত্ব প্রকাশ পায় না, দেবতার প্রতি ভক্তির ভাবও যে ইহাদের ভিতর দিয়া সার্থক বিকাশ লাভ

করিয়াছে, তাহাও মনে হইতে পারে না—ইহাদের রচনার মধ্য দিয়া কেবল মাত্র পাণ্ডিত্যের নিষ্ফল আস্ফালন দেখিতে পাওয়া যায়। যে যুগে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ভাবের দৈন্য ও ভক্তির অভাব দেখা দিয়াছিল, সেই যুগেই ইহাদের মধ্য দিয়া এই দৈন্য ও অভাব গোপন করিবার এই প্রয়াস দেখা গিয়াছিল। পরবর্তী মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে এই লক্ষণ অত্যন্ত বিকট আকার লাভ করিয়াছে।

এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা দেশে রচিত 'বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ' নামক একখানি উপপুরাণে মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ প্রণালীতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি চৌতিশা স্তবের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়।[১] আর কোনও প্রাচীন কিংবা সংস্কৃত পুরাণে অনুরূপ রচনার পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা হইতে মনে হয়, খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই বাংলা মঙ্গলকাব্য নিজস্ব রূপ লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার সদাগরদিগের বৈদেশিক বাণিজ্যের সংস্কারের উপর মঙ্গলকাব্যের কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে—সেইজন্য প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই এই বাণিজ্য-রীতির কিছু পরিচয় আছে। যে বিনিময় (barter) প্রথা দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্য সে'কালে নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহার একটি বর্ণনা প্রত্যেক মঙ্গল-কাব্যেরই বিষয়ীভূত হইয়াছে। তবে এই বর্ণনা সর্বদাই যে বাস্তব, তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না—কারণ, ইহা অবলম্বন করিয়া প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের কবিই তাঁহার পাঠকদিগকে একটু কৌতুকরস পরিবেশন করিয়াছেন। ইহাদের চিত্রগুলি অতিরঞ্জিত করিয়াই এই কৌতুকরস সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। যাহাই হউক, ইহার কোন বাস্তব মূল্য প্রকাশ না পাইলেও, এই বিষয়ক একটি সংস্কার যে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, এই বর্ণনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়। তারপর মঙ্গলকাব্যের একঘেয়ে কাহিনীর মধ্যে ইহাদের সহায়তায় একটু হাস্যরসের বৈচিত্র্যসৃষ্টি কাব্যের দিক হইতে যে সার্থক হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

যুদ্ধ বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। এক মনসা-মঙ্গল ব্যতীত সকল মঙ্গলকাব্যেই বিস্তৃত যুদ্ধ বর্ণনার উল্লেখ আছে। বীররসের সঙ্গে সঙ্গে বীভৎস রসেরও ইহাতে পরিবেশন করা হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সঙ্গে

[১] বৃহদ্ধর্মপুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩০০ সাল), মধ্যখণ্ড, বিংশ অধ্যায়, শ্লোক ১৩৪-৭১, পৃ. ১৩৯-১৪০।

এই সকল বহির্মুখী যুদ্ধের বর্ণনা নিবিড় যোগ স্থাপন করিয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়া ইহাদের মধ্য দিয়া কেবলমাত্র গতানুগতিকতার পরিচয় প্রকাশ পায়, নিষ্প্রাণ কৃত্রিমতাই ইহাদের বৈশিষ্ট্য। কোন কোন মঙ্গলকাব্যে ইহাদের বর্ণনা অত্যন্ত বিস্তৃত এবং নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন; কাহিনীর অগ্রগতির ইহারা দুরপনেয় বাধা। ইহাদের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী কবিদিগের সমসাময়িক সামরিক জীবন সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে বর্ণনাগুলি আরও জীবন্ত হইয়া উঠিত—রামায়ণ এবং মহাভারত অনুবাদের মধ্য দিয়া যে গতানুগতিক যুদ্ধের বিবরণ পরিবেশন করা হইয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ তাহাই অনুকরণ করা হইয়াছে মাত্র। অতএব ইহাদের বর্ণনা গৌণতঃ সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারতের অনুকরণ-জাত—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জাত নহে। সুতরাং ইহাদিগের মধ্য হইতে মধ্যযুগের বাংলার কোনও ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সমীচীন হয় না। মঙ্গলকাব্যের যুদ্ধ বর্ণনা যে প্রধানতঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুরূপ বর্ণনার অনুকরণ-জাত তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, ইহাদের প্রত্যেক বর্ণনার মধ্যেই হনুমান-চরিত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। শুধু তাহাই নহে, গন্ধমাদন পর্বত হইতে বিশল্যকরণী আনিয়া কোনও কোনও মৃত চরিত্রের পুনর্জীবন দানের কথাও তাহাতে বর্ণিত হইয়া থাকে। তবে বিশল্যকরণীর প্রসঙ্গ বাংলার লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে আসিয়া রামায়ণ এবং মঙ্গলকাব্য উভয়ের মধ্যে প্রবেশ করাও অসম্ভব নহে।

(দেবীর জরতী বা বৃদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া নায়ক-নায়িকাকে ছলনা বা রক্ষা করা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয়।) পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যে old lady motif নামক একটি সাধারণ বিষয় আছে—বাংলার লোক-সাহিত্যেও ইহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। 'এক যে ছিল বুড়ী'—বহু লোক-কথারই ইহা প্রসঙ্গ। আমরা সকলেই জানি চাঁদের মধ্যেও এক বুড়ী বসিয়া চরকা দিয়া সূতা কাটে। অতএব বৃদ্ধা লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট চরিত্র; সেই সূত্র হইতেই ইহার কথা মঙ্গলকাব্যেও আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। লোক-কথার পরিকল্পনায় আপাত-দৃষ্টিতে যে অসহায়, অশক্ত অথবা অক্ষম, সেই সর্বাধিক দৈবশক্তির অধিকারী হয়। 'Successful youngest son' প্রভৃতি বিষয়ের ইহাই মৌলিক উদ্দেশ্য। মঙ্গলকাব্যের জরতী চরিত্রের মধ্যেও সেইজন্যই দৈবশক্তি আরোপ করা হইয়া থাকে। জরতী বেশ ব্যতীতও দেবতাদিগের কাক ও মাছির (কোনও কোনও

স্থলে শ্বেত কাক ও শ্বেত মাছি) রূপ ধারণও মঙ্গলকাব্যের একটি অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

মশান বা শ্মশান বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।) মঙ্গলকাব্যের মধ্য দিয়া সংস্কৃত মহাকাব্যের মত বিবিধ রস পবিবেশন করা হইয়া থাকে—মশান বর্ণনার ভিতর দিয়াই বীভৎস রসের বর্ণনা মুখ্য হইয়া উঠে। অবশ্য যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে প্রেতের হাট প্রভৃতি প্রসঙ্গ অবতারণার ভিতর দিয়াও বীভৎস রসের অবতারণা করা হয়; কিন্তু মশান বর্ণনার ভিতর দিয়া ইহা আরও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবার স্থযোগ পায়। এই সকল বর্ণনাও গতানুগতিক এবং অত্যন্ত কৃত্রিম।

কাহিনীর উপসংহারে নায়ক-নায়িকার স্বর্গারোহণ বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের একটি অপরিহার্য বিষয়।) স্বর্গারোহণ বর্ণনার পর কোন কোন মঙ্গলকাব্যে ফলশ্রুতি ও কবির ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়া থাকে, ইহাকে অষ্টমঙ্গলা বলে। চণ্ডীমঙ্গল হইতে এই রীতি অন্যান্য কোন কোন মঙ্গলকাব্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু নায়ক-নায়িকার স্বর্গারোহণ বর্ণনা সকল মঙ্গলকাব্যেরই অপরিহার্য বিষয়। কাহিনীর সমাপ্তি যতই করুণ হউক না কেন, স্বর্গারোহণের ভিতর দিয়া ইহার মধ্যেও একটা আধ্যাত্মিক সান্ত্বনার সন্ধান পাওয়া যায়; সেইজন্যই ইহার অবতারণা হইয়া থাকে।

শ্রেণীবিভাগ

বাংলার লৌকিক দেবতাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে সকল কাব্যের মধ্যে বাঙ্গালীর ব্যক্তি-চরিত্রেরই জয়গান করা হইয়াছে, তাহাদিগকেই মধ্যযুগের বাংলার মঙ্গলকাব্য বলা হইয়া থাকে। অন্যথায় বৈষ্ণব সাহিত্যেও চৈতন্য-মঙ্গল, গোবিন্দ-মঙ্গল, কৃষ্ণ-মঙ্গল, অদ্বৈত-মঙ্গল প্রভৃতি নামে অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আমাদের আলোচ্য মঙ্গল-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। কারণ, তাহাদের বর্ণিত বিষয়-বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাতে চৈতন্যদেব বা তাঁহার পার্শ্বচরগণের অলৌকিক জীবনী, শ্রীকৃষ্ণের অপার্থিব লীলা-মাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে এবং সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যগুলির প্রভাব বশতঃ ইহাদিগকেও মঙ্গল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ আদৌ হয় নাই। তবে ইহাদেরও কোন কোন বিচ্ছিন্ন চিত্র যে কাব্যোচিত গুণে গৌরবান্বিত তাহা অস্বীকার করা যায় না।

প্রসিদ্ধ চৈতন্য-জীবন-চরিতকার বৃন্দাবন দাস তাঁহার অমর গ্রন্থ 'চৈতন্য-ভাগবত'কে সর্বপ্রথম 'চৈতন্য-মঙ্গল' নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন, এমন প্রবাদ প্রচলিত আছে। 'চৈতন্য-চরিতামৃত'কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে 'চৈতন্য-মঙ্গল' বলিয়াই সর্বদা উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি লোচনদাসের চৈতন্য-জীবনীর নামও 'চৈতন্য-মঙ্গল'; জয়ানন্দের রচিত চৈতন্য-জীবনীও 'চৈতন্য-মঙ্গল' নামেই প্রসিদ্ধ। ইহাদের বিষয়-বস্তু হইতেই জানা যায় যে, এই শ্রেণীর সাহিত্য মধ্যযুগের পূর্বোল্লিখিত মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে; ইহা বৈষ্ণব জীবনচরিত-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইহা হইতে একটি বিষয় অনুমান করা যায় যে, সেই যুগে শাক্ত-সম্প্রদায়ের মঙ্গলকাব্যের প্রচলন সমাজে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, শাক্ত-বিদ্বেষী বৈষ্ণবগণও তাঁহাদের বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক সাহিত্য-বস্তুকে বাহ্যতঃ এইভাবে শাক্তপ্রভাব-চিহ্নিত করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মধ্যযুগের সাহিত্যে মঙ্গল অভিধেয় কাব্যে কীর্তিত তিন শ্রেণীর দেবতার সহিত পরিচিত হওয়া যায়, যেমন, (১) বৈষ্ণব (২) পৌরাণিক ও (৩) লৌকিক—

(১) **বৈষ্ণব** চৈতন্য-মঙ্গল

অদ্বৈত-মঙ্গল

গোবিন্দ-মঙ্গল
কৃষ্ণ-মঙ্গল
রাধিকা-মঙ্গল
জগৎ-মঙ্গল
কিশোরী-মঙ্গল
স্মরণ-মঙ্গল
গোকুল-মঙ্গল
রসিক-মঙ্গল
জগন্নাথ-মঙ্গল ইত্যাদি

(২) **পৌরাণিক** গৌরী-মঙ্গল
ভবানী-মঙ্গল
দুর্গা-মঙ্গল
অন্নদা-মঙ্গল
কমলা-মঙ্গল
গঙ্গা-মঙ্গল
চণ্ডিকা-মঙ্গল ইত্যাদি

(৩) **লৌকিক** শিবায়ন বা শিব-মঙ্গল
মনসা-মঙ্গল
চণ্ডী-মঙ্গল
ধর্ম-মঙ্গল
কালিকা-মঙ্গল (বা বিদ্যাসুন্দর)
শীতলা-মঙ্গল
রায়-মঙ্গল
ষষ্ঠী-মঙ্গল
সারদা-মঙ্গল
সূর্য-মঙ্গল

বৈষ্ণব মঙ্গলকাব্যগুলি অন্তঃপ্রকৃতি ও বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সেইজন্য ইহারা আমাদের বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নহে। পূর্বেই বলিয়াছি,

সর্বশেষোক্ত শ্রেণীর কাব্যই সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালে তাহাদেরই প্রভাব পৌরাণিক কাব্যসমূহেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; তাহারই ফলে পৌরাণিক আখ্যানমূলক মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি হইয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ 'এপিক'-কাব্যকে খাঁটি-'এপিক' (primitive epic or epic of growth) এবং সাহিত্যিক-'এপিক' (literary epic or epic of art) এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। খাঁটি 'এপিক' সমগ্রভাবে যে একজনেরই রচনা, তাহা নহে—অনেক সময় ইহা লোক-পরম্পরাগত বিষয়-বস্তুর ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিণতির ফল; সমাজের রস-চিত্তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু লৌকিক সাহিত্যোপকরণ অবলম্বন করিয়াই ইহা দানা বাঁধিয়া উঠে। কিন্তু সাহিত্যিক 'এপিক' ব্যক্তি-প্রতিভার সচেতন শিল্পসৃষ্টি। (বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিকেও সেইরূপ 'খাঁটি মঙ্গলকাব্য' এবং 'সাহিত্যিক মঙ্গলকাব্য' এই দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যগুলি খাঁটি মঙ্গলকাব্যরূপে গ্রহণ করা যায়—কারণ, ইহাদের মধ্যে কবির ব্যক্তি-মানস অপেক্ষা বৃহত্তর সমাজ-মানস অধিকতর প্রত্যক্ষ। প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেরই একটি কেন্দ্রীয় কাহিনী এই যুগে গড়িয়া উঠিলেও বিচিত্র উপকরণ-সম্ভারে ইহার গতি আড়ষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ব্যক্তি-প্রতিভার শিল্পক্রিয়া ইহাদের মধ্যে তখনও বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু খৃস্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতেই মঙ্গলকাব্যগুলির উপর ব্যক্তি-রস-চেতনার অনুভূতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ভারতচন্দ্রের মধ্যে সাহিত্যিক মঙ্গলকাব্যের শিল্প-সচেতনতা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে।

(খৃস্টীয় যোড়শ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যগুলি খাঁটি 'এপিক' ও সাহিত্যিক 'এপিকে'র মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত। এই যুগের উল্লেখযোগ্য কবি দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম) ইঁহারা জনশ্রুতি (tradition)-র ধারা সহজভাবে অনুসরণ করিয়া আসিয়াও তাহার মধ্যে স্বকীয় অনুভূতির স্পর্শ দান করিয়াছেন। ইঁহারা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মত কাব্যের বহিরঙ্গে কোনও শিল্পরূপ দিতে পারেন নাই, কিন্তু স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা ইহাদের অন্তর্লোকে একটি বিশিষ্ট ঔজ্জ্বল্য দান করিয়াছেন। অতএব ইঁহাদিগকে খাঁটি মঙ্গলকাব্য ও সাহিত্যিক মঙ্গলকাব্য রচনার মধ্যবর্তী কবি বলিয়া নির্দেশ করা যায়।

মঙ্গল নামের উৎপত্তি

এখন এই শ্রেণীর সাহিত্যকে মঙ্গল নামে অভিহিত করিবার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হয়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর মধ্যে 'মঙ্গল রাগ' অন্যতম। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীও মঙ্গল রাগে গীত হইত বলিয়া জানিতে পারা যায়। প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিষয়ক পুস্তকাদিতে অবশ্য মঙ্গল রাগের খুব ব্যাপক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহাতেই মনে হয়, ইহা স্থানীয় একটি রাগ মাত্র ছিল। বলা বাহুল্য, কোন সঙ্গীত-শাস্ত্রকারই ইহাকে ষড়্রাগ বা জনক-রাগের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, ইহা রাগিণী বা উপরাগের পর্যায়ভুক্ত। ক্ষেমকর্ণ পাঠক রচিত 'রাগমালা' গ্রন্থে মঙ্গলরাগকে হিন্দোলরাগের অন্তর্গত একটি উপরাগ (পুত্র) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১] নারদ রচিত 'চত্বারিংশচ্ছত-রাগ-নিরূপণম্' নামক গ্রন্থে ভৈরবরাগের পুত্রবধূরূপে মঙ্গল-কৌশীকী নামক একটি রাগিণীর উল্লেখ করা হইয়াছে।[২] মনে হয়, ইহা উক্ত মঙ্গল রাগ ও কৌশীকী রাগিণীর একটি মিশ্র রূপ। উক্ত পুঁথি দুইখানির একখানিও খৃস্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে এবং ইহাদের প্রচারও খুব ব্যাপক ছিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন ও মধ্যযুগের পদ্য-সাহিত্য মাত্রই গানের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল, মঙ্গল-সাহিত্যও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। এইজন্যই মনে হইতে পারে, আদ্যোপান্ত মঙ্গল রাগে কিংবা প্রধানতঃ মঙ্গল রাগে যাহা গীত হইত, তাহাই সাধারণভাবে মঙ্গলগান বলিয়া অভিহিত হইত। কিন্তু মঙ্গলগানের যে-সকল প্রাচীন পুঁথির মধ্যে রাগ-রাগিণীর নির্দেশ দেওয়া আছে, তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, মঙ্গলগান আদ্যোপান্ত যে মঙ্গলরাগেই গীত হইত, তাহা নহে—তাহাতে অন্যান্য রাগ-রাগিণীও ব্যবহৃত হইত। তবে ইহাতে মনে হইতে পারে যে, হয়ত তাহা প্রধানতঃ মঙ্গলরাগেই গীত হইত বলিয়া এই শ্রেণীর গানের নামও মঙ্গলগান হইয়াছে। প্রাচীন বাংলায় পাঁচালীর সুরে যে গান গাওয়া হইত, তাহাও সাধারণ ভাবে পাঁচালী নামেই অভিহিত হইত। যদিও প্রাচীনকাল হইতে উত্তর ভারতীয় রাগ সঙ্গীত নানা রূপান্তরের ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে সত্য, তথাপি বর্তমানে মঙ্গলরাগের যে পরিচয় পাওয়া

---

[১] স-স ।।। D৬, ৫ (খ)

[২] O. C. Ganguli, *Rag and Ragini* (Bombay, 1948). 202

যায়, তাহা উক্ত ধারণার পোষকতার অনুকূল নহে; কারণ, বর্তমানে মঙ্গল রাগ ভৈরব রাগের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়, সেইজন্য তাহা একমাত্র প্রভাত-কালেই গেয়। কিন্তু মঙ্গলগান প্রভাতে আদৌ গীত হইত না। অতএব এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। মঙ্গলগানের মধ্যে পাঁচালীর সুরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত বলিয়া একমাত্র পাঁচালী বলিয়াও প্রাচীনতম মঙ্গলগানগুলিকে উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্রমে পাঁচালীর উপর মঙ্গল-রাগের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বশতঃই সম্ভবতঃ ইহা মঙ্গল নামে পরিচিত হইতে থাকে। পদ্মা বা মনসার গীতের উপর সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব বশতঃ ইহার নাম হয় পদ্মাপুরাণ। অবশ্য সাধারণ ভাবে ইহা মনসা-মঙ্গল নামেও পরিচিত।

কিন্তু কোন্ বিষয়ক গান প্রধানতঃ এই মঙ্গল রাগে গাওয়া হইত, এখন তাহাই বিবেচ্য। ব্যাপক অর্থে দেব-মহিমা প্রচারক গীত মাত্রই মধ্যযুগের বাংলায় মঙ্গল গীত নামে অভিহিত হইত। এই অর্থেই জয়দেব গোস্বামী রচিত 'গীত-গোবিন্দ' কাব্যে মঙ্গল শব্দটি এদেশে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে; যেমন, 'শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি' (১।২৫)। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কবি-রচিত ইহার পরবর্তী আরও বহু পদ ইহার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, যেমন,

'প্রভু কন গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।
মুকুন্দ গায়েন প্রভু শুনিয়া বিহ্বল॥' —চৈতন্য-ভাগবত ২।২৫

বিবাহাদি অনুষ্ঠানে যে সকল গীত গাওয়া হইত, সাধারণ ভাবে তাহাদিগকেও মঙ্গল বলিয়া অভিহিত করা হইত বলিয়া মনে হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরা-কাণ্ডে শিবদুর্গার বিবাহোপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে—

'নানা মঙ্গল নাট গীত হিমালয়ের ঘরে।
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে॥' (সা. প. সংস্করণ, পৃ-৬)

হিন্দীভাষায় বিবাহ অর্থে কোন কোন সময় মঙ্গল কথাটি ব্যবহৃত হয়। কাশীতে কিছুদিন পূর্বেও 'বুঢ়ুয়া মঙ্গল' নামক যে অনুষ্ঠান হইত, তাহা 'বুঢ়ুয়া' বা শিবের সহিত পার্বতীর বিবাহানুষ্ঠান ব্যতীত আর কিছুই নহে। 'মঙ্গল' শব্দটি সম্ভবতঃ 'আঙ্গুল', 'লাঙ্গুল', 'গঙ্গা' ইত্যাদির ন্যায় ভারতীয় কোন অনার্য ভাষা হইতে আগত। মূলতঃ মিলন অথবা বিবাহ অর্থে শব্দটি দ্রাবিড় ভাষায় আজ পর্যন্তও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মালয়ালাম্ ভাষায় বিবাহ অর্থে 'মঙ্গল্যম্' শব্দ অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়। কুর্গদেশে ব্যাঘ্রের বিবাহ নামক একটি লৌকিক উৎসব আছে। সাধারণ লোক ইহাকে 'নরী-মঙ্গল' বলিয়া জানে। নরী শব্দের অর্থ দ্রাবিড় ভাষায় শৃগাল, কুর্গদেশের শিকারিগণ ব্যাঘ্রকে শৃগাল বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। মালয়ালাম্ দেশের স্থানের নাম ম্যাঙ্গালোর, তীরুমঙ্গল প্রভৃতি শব্দের মধ্যে মঙ্গল শব্দের অস্তিত্ব আছে। একথা অবশ্য সত্য যে, আধুনিক দ্রাবিড় ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কে বলিবে এই মঙ্গল শব্দটি সংস্কৃত হইতে গৃহীত, না কোন প্রাচীন দ্রাবিড় শব্দেরই কোন সংস্কৃত রূপ? যদিও বিবাহ একটি মাঙ্গলিক ব্যাপার সন্দেহ নাই, তথাপি সোজাসুজি বিবাহ অর্থে মঙ্গল শব্দের ব্যবহার ত সংস্কৃত অভিধানেও দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ তামিল ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থ বিবাহাদি শুভ অনুষ্ঠানে ক্ষৌরকর্মের জন্য ব্যবহৃত ক্ষুর। তামিল ভাষায় নাপিতানীকেও 'মঙ্গলৈ' বলা হয়। তেলেগু ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থ ক্ষৌরকার। বিবাহাচারে ক্ষৌরকারের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলেও শব্দটি দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রাবিড় ভাষার বিভিন্ন আধুনিক শাখায় বিবাহ-সম্পর্কিত কোনও শব্দের অর্থে অদ্যাপি রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং মনে হইতে পারে যে, দ্রাবিড় ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থই বিবাহ।

কেহ কেহ অনুমান করেন, 'there were several kinds of *mangalas* and the narrowing down of *mangala* to mean marriage exclusively is a fairly recent phenomenon'.[১] কারণ, কিছুকাল পূর্বেও দ্রাবিড় ভাষাভাষীর দেশে, বিশেষতঃ কুর্গ অঞ্চলে, প্রায় প্রত্যেক জাতকর্মকেই মঙ্গল নামে অভিহিত করা হইত। যেমন বয়ঃপ্রাপ্ত বালকের কর্ণভেদ অনুষ্ঠানকে বলিত 'হেম্মিকুট্টি-মঙ্গল', বয়ঃপ্রাপ্তা বালিকার কর্ণভেদ অনুষ্ঠানকে বলিত 'পোলেকণ্ড মঙ্গল'; নারীর প্রথম গর্ভধারণ উপলক্ষে যে পারিবারিক অনুষ্ঠান হইত, তাহাকে বলিত 'কুলিয়ম্মে মঙ্গল', দশটি জীবিত সন্তানের জন্মদাত্রী জননীর সম্মানার্থে একটি সামাজিক অনুষ্ঠান হইত, তাহাকেও 'মঙ্গল' বলিত। গৃহারম্ভকালে যে পূজানুষ্ঠান হইত, তাহাকে বলিত, 'মনে মঙ্গল' ইত্যাদি। কিন্তু মনে হয়, বিবাহ অর্থ হইতেই মঙ্গল শব্দটি অন্যত্র প্রসারিত হইয়াছে। অথবা অন্যান্য অর্থ হইতে কালক্রমে

[১] Srinivas, *Religion and Society Among the Coorgs of South India* (Oxford, 1952), pp. 70-71.

কেবল মাত্র বিবাহ বুঝাইতেই দ্রাবিড় ভাষায় ইহার অর্থ সঙ্কুচিত (contracted) হইয়াছে।

অতএব দ্রাবিড় ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থই বিবাহ এবং ইহা হইতেই বিবাহ উপলক্ষে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের রাগকেই প্রাচীন বাংলায় মঙ্গলরাগ বলা হইত,—পরে ইহার অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া দেব-দেবীর বিবাহ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই অর্থেই শব্দটি হিন্দীভাষায়ও প্রচলিত আছে। অতঃপর বাংলায় দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-সূচক রচনা মাত্রই মঙ্গল নামে পরিচিত হইতে থাকে।

এখানে আরও একটি কথা মনে হইতে পারে। কোনও অপ্রিয় বিষয় বা নামকে অনেক সময় সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই প্রবৃত্তিকে ইংরেজিতে euphemism বলে। মঙ্গলকাব্যের দেবতার চরিত্র মাত্রই অমঙ্গলকারী (malignant)। অতএব ইহাদের অমঙ্গলকারিণী শক্তিকে প্রশমিত (pacify) করিবার কিংবা মনোমধ্যে ইহাব বিষয় স্থান না দিবার প্রবৃত্তি হইতেও তাঁহাদিগের মাহাত্ম্যসূচক গীতিকে মঙ্গলগান বলিয়া উল্লেখ করা হইতে পারে। বসন্ত রোগের নিদারুণ অন্তর্দাহের জালার মধ্যেও মানসিক শান্তি লাভ করিবার জন্য এই রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে এই কারণেই 'শীতলা' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কালক্রমে সকল শ্রেণীর দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তনই মঙ্গল নামে পরিচয় লাভ করে।

জাগরণ

মঙ্গলগানকে সাধারণ ভাবে জাগরণ বলা হয়। এই কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য কি? প্রাক্-চৈতন্যযুগে খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতেই 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে'র কবি মালাধর বসু কথাটি সর্বপ্রথম এই ভাবে ব্যবহার করেন, যথা—'পূজিয়া ত ভগবতী করিল জাগরণে।' ইহার অর্থ স্পষ্টতই মনে হয় যে, সেকালে লোকে দুর্গাপূজা উপলক্ষে গান গাহিয়া রাত্রি জাগরণ করিত। প্রাচীন বাংলার হস্তলিখিত পুঁথিগুলির মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত চণ্ডীমঙ্গলকে সাধারণ ভাবে জাগরণের পুঁথি বলা হইয়াছে। সেইজন্য মনে হইতে পারে যে, চণ্ডীমঙ্গল বুঝি কেবল মাত্র রাত্রি জাগিয়াই গাওয়া হইত, অতএব ইহার এই নাম। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল যে কেবল মাত্র রাত্রেই গাওয়া হইত, দিনে হইত না, এ' কথা সত্য নহে। চণ্ডীমঙ্গল গানের অধুনা-প্রচলিত রীতি দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয় না; ইহা যে চণ্ডীমঙ্গল গানের প্রাচীনতর রীতি, তাহাও নহে, কারণ, প্রাচীন হস্তলিখিত চণ্ডীমঙ্গল পুঁথির যে পালা বিভাগ আছে, তাহাতে প্রত্যেক দিনের দিবাপালা ও নিশাপালা বলিয়া স্বতন্ত্র বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে জাগরণ কথাটির মূল তাৎপর্য কি?

কেবল মাত্র চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যেই নহে, প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের যে পালা বিভাগ করা হইয়া থাকে, তাহাদেব মধ্যে একটি পালা জাগরণ পালা নামে উল্লিখিত হয়। ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন বিষয়ক চব্বিশটি পালার মধ্যে একটির নাম জাগরণ পালা। মনসা-মঙ্গলেরও একটি পালার নাম জাগরণ পালা। চণ্ডীমঙ্গল এক মঙ্গলবারে আরম্ভ হইয়া সাতদিন ব্যাপিয়া গীত হইত ও অষ্টম দিবসে সমাপ্ত হইত বলিয়া বিষয় অনুসারে ইহার পালার নামকরণ না হইয়া বার অনুসারে (যথা রবিবারের দিবা-পালা, রবিবারের নিশা-পালা ইত্যাদি) ইহার পালার নামকরণ হইত। চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে সোমবারের নিশা-পালাটি দীর্ঘতম; মনে হয়, ইহা সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া গীত হইত এবং ইহাই চণ্ডীমঙ্গলের জাগরণ পালা। মঙ্গলগানের বিশেষ একটি পালাকে জাগরণ পালা বলা হইয়া থাকে বলিয়াই সমগ্রভাবে মঙ্গলগানকে জাগরণ গান বলা হয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই শ্রেণীর আখ্যায়িকা সঙ্গীতের একটি অংশ বা পালাকে জাগরণ পালা কেন বলা হয়? দেখিতে পাওয়া যায় যে, মঙ্গলগানের যে পালা বিভাগ করা হইয়া থাকে, তাহাতে সমগ্র কাহিনীর বিষয়-বস্তু সমান ভাগে বিভক্ত করা হয় না, বরং বিষয় অনুসারে বিভক্ত করা হয়। এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, কোন পালা এক বেলা গীত হইবার পক্ষে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, আবার কোন পালা অতিরিক্ত দীর্ঘ; যদিও নিশা-পালাগুলি সর্বদাই দীর্ঘতর। বিশেষ কোন কোন পালা আদ্যোপান্ত শুনিবার বাধ্যবাধকতা ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বরিশাল অঞ্চলে মনসা-মঙ্গলের কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে রয়ানী বলিয়া পরিচিত লোক-সঙ্গীত গীত হয়, তাহাতে লখীন্দরের সর্পদংশন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার পুনর্জীবন লাভ পর্যন্ত বৃত্তান্ত প্রত্যেক শ্রোতার পক্ষেই অবশ্য শ্রোতব্য,—লখীন্দরের সর্পদংশনের বৃত্তান্ত শুনিয়া কোন শ্রোতা তাহার পুনর্জীবন লাভ পর্যন্ত না শুনিয়া আসর ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না। পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত মনসা-মঙ্গলের প্রাচীন পুঁথিসমূহে এই অংশকেই জাগরণ পালা বলা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, মনসা-মঙ্গল কাহিনীর মধ্যে এই অংশ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং এক আসরে ইহা সম্পূর্ণ গাহিতে হইলে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যায়; স্বভাবতঃই এই জন্য শ্রোতাকে রাত্রি জাগরণ করিতে হয়। সেইজন্যই মনসা-মঙ্গলের অন্তর্গত এই পালার নাম যে জাগরণ হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ধর্মমঙ্গলের অন্তর্গত জাগরণ পালাটিও কাহিনীর মধ্যে দীর্ঘতম পালা। মঙ্গলগানের সর্বশেষ রাত্রি-পালাটিই দীর্ঘতম—ইহা গাহিতে সমগ্র রাত্রি জাগরণের প্রয়োজন। রাত্রির পালাগুলি ক্রমে দীর্ঘ হইয়া শেষ রাত্রির পালাটি দীর্ঘতম হয়। রাত্রি জাগরণ করিয়া যে লোক-সঙ্গীত গাওয়া হয় পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে এখনও তাহাকে জাগরণই বলে। বাঁকুড়া জিলায় সারা ভাদ্র মাসে রাত্রি জাগিয়া কুমারী মেয়েরা যে ভাদুগান গাহিয়া থাকে তাহাকে ভাদুর জাগরণ বলে। একটি ভাদুগানে পাইয়াছি, 'জাগ্‌ব ভাদুর জাগরণে'। আর একটি গানে আছে, 'কি আনন্দ হ'বে গো আজ, আমার ভাদুর জাগরণে।' অতএব মঙ্গলগানের কোন কোন অংশ রাত্রি জাগরণ করিয়া গাওয়া ও শোনা হইত বলিয়া তাহাকে জাগরণ বলিত। অতএব কেবল মাত্র চণ্ডীমঙ্গলকেই জাগরণ বলে বলিয়া যে বিশ্বাস প্রচলিত আছে, তাহা সত্য নহে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রংপুর অঞ্চলের কৃষকদিগের মধ্যে 'জাগ গান' নামক যে এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহার সঙ্গেও জাগরণ কথার সম্পর্ক

আছে; কারণ, 'জাগা' ও 'জাগরণ' উভয়েরই অর্থ এক; জাগ গানও রাত্রি জাগিয়া গাওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার বিষয়-বস্তু স্বতন্ত্র।

কেহ কেহ মনে করেন, চণ্ডীমঙ্গলগান এক মঙ্গলবারে আরম্ভ হইয়া অষ্টম দিবসে পরবর্তী মঙ্গলবারে সমাপ্ত হইত বলিয়া ইহাকে অষ্টমঙ্গলা বলিত। কিন্তু মনে হয়, এক মঙ্গলবারে আরম্ভ হইয়া পরবর্তী সোমবার পর্যন্ত ইহার মূল কাহিনী গীত হইত এবং অষ্টম দিবস মঙ্গলবারে মূল কাহিনীর বিষয়-বহির্ভূত কোন কোন অংশ, যথা কবির আত্ম-পরিচয়, ফলশ্রুতি ও অন্যান্য কোন প্রসঙ্গ গীত হইত; অষ্টম দিবসে গীত মূল কাহিনীর বহির্ভূত অংশকে অষ্টমঙ্গলা বলিত। পরে মঙ্গলগানের উপসংহার অর্থে অষ্টমঙ্গলা কথাটি চণ্ডীমঙ্গল হইতে ধর্মমঙ্গলকাব্যে বিস্তৃতি লাভ করে। ধর্মমঙ্গলের একজন কবি তাঁহার গ্রন্থারম্ভে ধর্মঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—

তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ সাঙ্গ হয়।
অষ্টমঙ্গলায় দিব আত্মপবিচয়॥

কোন প্রাচীন পুঁথির উল্লেখ হইতে মনে হয় চণ্ডীরই এক নাম অষ্টমঙ্গলা।[১] বস্তুতঃ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অষ্টমঙ্গলা কথাটি যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে ইহার অর্থ খুব স্পষ্ট নহে। তবে মনে হয়, শুভদিনে কোন শুভ কার্য আরম্ভ হওয়ার পর অষ্টম দিবসের অন্যতম শুভদিনকেই মূলতঃ অষ্টমঙ্গলা বলিত। পরে বিভিন্ন অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

১ ব-প্রা-পু-বি ১।১, ১৬৩

প্রচার

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি মধ্যযুগে বাংলার বাহিরেও প্রচার লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের কিছু পূর্ববর্তী কালে মনসা-মঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ কবি পূর্ব বঙ্গে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম নারায়ণদেব। তাঁহার সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। নারায়ণদেবের মনসা-মঙ্গল সমগ্র আসাম প্রদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, এমন কি এখন পর্যন্ত আসামের অধিবাসিগণ নারায়ণদেবকে তাঁহাদের দেশেরই অধিবাসী বলিয়া জানেন। মনসা-মঙ্গলের বেহুলা-লখীন্দরের উপাখ্যান উত্তর বিহারে প্রচলিত আছে। সেখানকার ভাষায় এই পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে চৌপাই নগরের রাজা চান্দো সৌদাগর। তাহার স্ত্রী সোনিকা। উভয়ের পুত্র লখিন্দর। বিহুলার পিতা-মাতার নাম বাস্থ সৌদাগর ও মাণিক্যে, বাসস্থান উজানী নগর। বিহারী ও অসমীয় লোক-সাহিত্যে মনসার উপাখ্যান বাংলারই অনুরূপ।

বিভিন্ন জাতীয় মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসা-মঙ্গলই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। বঙ্গদেশের সর্বত্র হইতেই ইহার প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে পূর্ব বঙ্গেই মনসা-মঙ্গলের অধিকতর প্রচার হইয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য পশ্চিম বঙ্গেই অধিক প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেখানেও ইহার পূর্ব বঙ্গের মনসা-মঙ্গলের মত এত ব্যাপক প্রচার ছিল না। ইহার কারণ, পূর্ব বঙ্গে মনসা-মঙ্গলই একপ্রকার একমাত্র মঙ্গলকাব্য, পশ্চিম বঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের পাশাপাশি আর একটি বিরাট মঙ্গল-সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহা ধর্মমঙ্গল। পশ্চিম বঙ্গে চণ্ডীদাস-লোচনদাস-গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণের অপূর্ব পদাবলী-সাহিত্যের সম্মুখে অন্য কোন বিশেষ এক সাম্প্রদায়িক কাব্যের প্রতিষ্ঠা কষ্টসাধ্য ছিল, কিন্তু পূর্ব বঙ্গে মনসা-মঙ্গল কাব্যের সহিত তেমন ভাবে প্রতিযোগিতা করিবার মত অন্য কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-বস্তু না থাকার জন্যই মনসা-মঙ্গলের প্রচার বিস্তৃততর হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও একটা কথা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মনসা-মঙ্গলের চরিত্রগুলির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যাহা বাঙ্গালীর অন্তস্তল স্পর্শ করিত। চাঁদ সদাগরের মত দৈব-লাঞ্ছিত সমুন্নত পুরুষকারের চিত্র বাংলার আর কোন মঙ্গলকাব্যে নাই।

মানুষের জীবনে দৈব যে কত বলবান,চাঁদ সদাগরের তথাকথিত পরাজয়ে তাহাই যেন দেখান হইয়াছে। জীবনের সর্বত্র এই পরাজয়ই বাঙ্গালী হিন্দুর সেই যুগে নিত্য অভিজ্ঞতার বস্তু ছিল। তাহারা চাঁদ সদাগরের চরিত্রে নিজেদের পরাজয়ের সান্ত্বনা-সন্ধান করিত। তারপর বেহুলা। সাংসারিক দুঃখ-কষ্টে চির অভ্যস্ত এই সমাজ একমাত্র নিজের আদর্শকে চিরদিন উচ্চ করিয়া ধরিয়া লইয়া পথ চলিয়াছে। পরাজয় যে জীবনে মানিয়া লইল, সেই ত দুর্ভাগা। নৈরাশ্যমথিত হৃদয়ে আশার একটি দীপশিখাকেও যে অনির্বাণ রাখিয়া দুস্তর সংসার-গাঙ্গুরে ভেলা ভাসাইয়া দিয়াছে, তাহার জীবনে বাঁচিবার মত বলের ত অভাব হয় না এবং পরিণামে বাঁচিয়া উঠিতেও পারে সে-ই। কাব্যের সমস্ত ট্রাজিক কল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া বেহুলার বিজয়িনী মূর্তিই অনির্বাণ দীপালোকে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। চাঁদ সদাগরের সংসার-শ্মশান-অধিষ্ঠাত্রী শোকাতুরা সনকার দুর্নিবার অশ্রুধারার অনন্ত উৎস বাংলার শত শত মাতৃ-হৃদয়েই বিরাজমান। সেইজন্য তাহাদের অন্তরের যোগ ইহার সহিত অতি সহজেই স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। রোগ-শোক-দুঃখ-বেদনা-জর্জরিত বাঙ্গালী জীবন এই সকল চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া পরম সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে। গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে মনে হইবে যে, সকল মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসা-মঙ্গল কাব্যেই আধুনিক মনোভাবের পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দৈবের সঙ্গে পুরুষকারের যে কঠিন সংগ্রামের কথা আছে, তাহাই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত-রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রেরণা দান করিয়াছিল। দেবতার উপর মানুষের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় মনসা-মঙ্গলের কাহিনী সার্থক হইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের মানবিকতা-বোধ ইহার মত আর কোন মঙ্গলকাব্যের মধ্য দিয়া এত স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই।

এই গুণে মনসা-মঙ্গল অন্যান্য মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা অধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ ঠিক আমাদের সামাজিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত চরিত্র নহে; ফুল্লরাও বড় সংক্ষিপ্ত,—দুঃখ-দারিদ্র্য-সহনশীলতার একটা সুন্দর সহজ চিত্র সেখানে পাই বটে, কিন্তু তাহার সমাধানের ইঙ্গিত কোথাও পাই না। মনসা-মঙ্গলের পরিণাম শিক্ষাপ্রদ, সান্ত্বনাদায়ক; ইহার মানবিকতার আবেদন অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। কিন্তু অন্য কোন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এই গুণটুকু লক্ষিত হয় না। ধর্ম-মঙ্গলকাব্য শুধু রাঢ়ভূমিতেই আবদ্ধ ছিল এবং ইহা একমাত্র রাঢ়দেশেরই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বাহন; সেইজন্য রাঢ় দেশে ইহার ব্যাপক প্রচার হইলেও অন্যত্র ইহার

প্রচার সম্ভব হয় নাই। সমগ্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ইহার প্রচার-ক্ষেত্র সর্বাপেক্ষা অল্প-পরিসর।

বর্তমান যুগে এই মঙ্গলকাব্যোক্ত দেবতাদিগের স্থান কোথায় এই সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, যে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে মঙ্গলকাব্য-গুলির রচনা আরম্ভ হয়, তাহা কতক সিদ্ধ হইয়াছে। লৌকিক দেবতাদিগকে হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে সেই যুগে একমাত্র বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিই যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহা নহে—কতকগুলি পরবর্তী অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণও এই কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ 'ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে'র মনসাদেবীর উপাখ্যান ও 'বৃহদ্ধর্ম-পুরাণো'ক্ত কালকেতু উপাখ্যানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ষষ্ঠী, শীতলা ইত্যাদির উপাখ্যানও পরবর্তী সংস্কৃত উপপুরাণগুলিব মধ্যে স্থান পাইতে লাগিল। এই ভাবে এক দিকে সংস্কৃত পুরাণ ও অপর দিকে বাংলা মঙ্গলকাব্য ইহাদের যুগপৎ প্রচেষ্টায় অনার্য দেবতাগণ হিন্দু সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া লইতেছিলেন। কিন্তু এমন সময় খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ রঘুনন্দনের স্মৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া নব হিন্দু আদর্শে দীক্ষা-লাভ করিল। হিন্দুর সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন যে সকল বিধি-নিয়ম ও আচার-সংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক, রঘুনন্দন মনু এবং তৎপরবর্তী সংহিতাকারদিগের গ্রন্থ হইতে তাহা সংকলন করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে স্থাপিত করিলেন। বলাই বাহুল্য যে, তাহাতে বাঙ্গালীর লৌকিক ধর্মাচরণের প্রতি বিশেষ কোন সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয় নাই। শ্রীনাথাচার্য কৃত 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব', রঘুনন্দন রচিত অষ্টবিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত 'তিথিতত্ত্ব' প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থে মনসা, মঙ্গলচণ্ডী প্রমুখ বাংলার লৌকিক দেবতাদিগের পূজা-বিধানের নির্দেশ থাকিলেও, তাঁহারা তাঁহাদের লৌকিক রূপ পরিহার করিয়া নূতন ভাবে তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। বহির্বাংলার আর্য নাগ-পূজাব মধ্যে মনসা-পূজা আপনার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়াছে; মঙ্গলচণ্ডীও পৌরাণিক চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। ইহাতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুর উচ্চতর কোন সামাজিক আচারের মধ্যে মঙ্গল দেবতাগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী পৌরাণিক অন্নদা, ধর্মঠাকুর পৌরাণিক বিষ্ণু, মনসা 'ব্রহ্মণা মনসা সৃষ্টা' এই সমস্ত কষ্টকল্পিত আভিজাত্যের সৃষ্টি দ্বারা নিজেদের উদ্ভবের অখ্যাতিকে পৌরাণিক গরিমায় সমাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব আমরা দেখিতে পাই, ষোড়শ শতাব্দীর পর

হইতে বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক জীবনে নব সংস্কার প্রবর্তিত হওয়াতে সমাজে লৌকিক দেবতাদিগের প্রাধান্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। ইহার পর হইতে ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত যে সকল মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহা কোন সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া রচিত হয় নাই—ইহা সাহিত্য রচনার একমাত্র আদর্শ রীতি ছিল বলিয়াই এ দেশের সমসাময়িক সাহিত্য-রস-বস্তুগুলি মঙ্গলকাব্যের রূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

যুগবিভাগ

খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব-যুগ (age of origin) বলা যাইতে পারে। খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে রচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'র চণ্ডী স্তোত্রের একটি শ্লোকে (বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৩.১৬.৪৫) উল্লিখিত হইয়াছে,

'ত্বং কালকেতু বরদা চ্ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহন নৃপাদ্ বণিজঃ সসূনো
রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী॥'

এই একই শ্লোকে চণ্ডী যে কালকেতুকে বর দিয়াছিলেন, তিনি যে গোধিকারূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সিংহলের রাজা শ্রীশালবাহন যে বণিকপুত্রকে নিজের কন্যা দান করিয়াছিলেন, চণ্ডী যে কমলে কামিনীর রূপ ধারণ করিয়া হস্তী একবার গ্রাস করিয়া পুনরায় বমন করিয়াছিলেন ইত্যাদি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতেই মনে হয়, 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' রচিত হইবার কালে চণ্ডীমঙ্গল ইহার নিজস্ব রূপ লাভ করিয়াছিল। কালকেতু ব্যাধ ও ধনপতি সদাগরের কাহিনীযুক্ত যে চণ্ডীমঙ্গলের বিষয়-বস্তু আমরা শুনিতে পাই, 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'র উক্ত শ্লোকটিতে তাহারই ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষজ্ঞদিগের মতে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত হয়।[১] চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ইতিপূর্বেই যে একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'র উল্লেখ হইতেই তাহা জানিতে পারা যাইবে। কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ও ধনপতি সদাগরের কাহিনী পরস্পর স্বতন্ত্র দুইটি কাহিনী হওয়া সত্ত্বেও ইহারা যে তখন হইতেই একই চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, 'বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে'র একই শ্লোকে উভয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

এই যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন প্রায় কিছুই হস্তগত হয় নাই, তবে এই যুগে মঙ্গলকাব্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরবর্তী কবিগণের রচনার মধ্যেও উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

---

১ R. C. Hazra, 'The Bṛhad-dharma Purāṇa, A Thirteenth Century work of Bengal', *The Journal of the University of Gauhati,* Vol. VI (1955), p. 258

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মনসা-মঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্ত তাঁহার পূর্ববর্তী মনসা-মঙ্গল রচয়িতা কাণা হরিদত্ত সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে,

'মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরি দত্ত॥
হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥'

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিলীয়মান-স্মৃতি হরি দত্তের বৈশিষ্ট্যহীন রচনার উপর বিজয় গুপ্ত নূতন করিয়া মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার পূর্ববর্তী কবি মাণিক দত্তকে যথোচিত বৈষ্ণব বিনয় সহকারে স্মরণ করিতেছেন,

'মাণিক দত্তেরে বন্দোঁ করিয়া বিনয়।
যাহা হইতে হইল গীত-পথ-পরিচয়॥'

এখানেও দেখিতে পাই, চণ্ডীমঙ্গলেব প্রাচীনতম কবি মাণিক দত্ত এই জাতীয় কাব্য-রচনার পথ-প্রদর্শক মাত্র। মাণিক দত্ত সম্ভবতঃ খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তীও ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি ময়ূর ভট্টের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছেন,

'ময়ূর ভট্টেরে বন্দি সঙ্গীত আদ্য কবি।'

তাহাতেও দেখিতে পাই, ময়ূর ভট্টের কৃতিত্বের মধ্যে ইহাই যে তিনি ধর্ম-মঙ্গল কাব্যের আদি কবি—তাঁহার কাব্যের অন্য কোন বিশেষত্বের উল্লেখ নাই। বৈষ্ণব-প্রভাবান্বিত সমাজে বাস করিয়া বিনয়-অভ্যাস-গুণে চৈতন্যপরবর্তী যুগের কবিদ্বয় তাঁহাদের পূর্বসূরিগণের কাব্য সমালোচনায় যে অপ্রিয় অংশ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাই প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি বিজয় গুপ্ত অত্যন্ত রূঢ় মন্তব্যে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার এই অসংযত উক্তি হইতেই আমরা সেই যুগের ঐ জাতীয় কাব্যের একটা মূল্য বিচার করিতে পারি।

অবশ্য একটা বস্তুর উদ্ভবেই তাহার পরিপূর্ণতা আমরা আশা করিতে পারি না।

প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীই মঙ্গল-কাব্যের সৃজন যুগ (age of creation)। পূর্ববর্তী যুগের বিশ্লিষ্ট আখ্যায়িকাগুলি এই যুগে আসিয়া সংহতি (compactness) লাভ করিল। এই যুগেই প্রসিদ্ধ মনসা-মঙ্গলকার বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশী দাস ; চণ্ডী-মঙ্গলকার দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম ; ধর্ম-মঙ্গলকার মাণিক গাঙ্গুলী, খেলারাম প্রভৃতি আবির্ভূত হন। এই সময়ে উল্লিখিত শক্তিমান কবিদিগের হাতে মঙ্গলকাব্যগুলি পরিপূর্ণ অবয়ব লাভ করে সত্য, কিন্তু এই পরিপুষ্ট অবয়বের উপর তখনও কারুকার্য করিবার কাজ যথেষ্ট বাকি ছিল। এই যুগেই ইহাদের উপর সংস্কৃত পুরাণের ও কাব্যের প্রভাব প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন উচ্চতর হিন্দুসমাজের নিকট পুরাণ-বহির্ভূত লৌকিক কাহিনীর কোনই আবেদন ছিল না—সেইজন্য তখন বিভিন্ন লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর অংশ মিশ্রিত করিয়া লৌকিক কাহিনীর মধ্যবর্তিতায় পৌরাণিক দেবতাদিগের মহিমা প্রচার করিবার প্রয়াস দেখা দিল—এই ভাবে সেই যুগে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটি আভিজাত্যের ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। তথাপি তখনও ইহারা ভাষায় এবং কল্পনায় সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা-মুক্ত হইয়া সাহিত্যিক সমুন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। সেই কাজ অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘনরাম চক্রবর্তী ও ভারতচন্দ্রের জন্য অবশিষ্ট রহিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীকে মঙ্গল-কাব্যের ঐশ্বর্য যুগ (age of glory) বলা যাইতে পারে। পূর্ববর্তী যুগের ভাষা যেমন সরল ও সহজ ছিল, তেমনি ভাব ও কষ্ট-কল্পনা-প্রসূত ছিল না ; সহজ কথায় প্রত্যক্ষ সত্যটি অন্তরের নিভৃততল একেবারে স্পর্শ করিত। কিন্তু এই যুগে সেই একই বিষয়-বস্তুর উপরই শব্দ-ঝঙ্কার ও রচনা-পারিপাট্য মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এক কৃত্রিম বাহ্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিল। পূর্ববর্তী যুগকে যদি ভাবযুগ বলা যায়, তবে এই যুগকে শব্দযুগ বলিতে হয়। এই যুগেই সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্য কি ভাষায়, কি ভাবে গ্রাম্যতা-মুক্ত হইল। ঘনরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায় ইঁহারাই এই যুগের স্রষ্টা। বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া এই যুগে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার প্রয়াস হয় নাই, কিন্তু চরিত্রগুলিকে অভিনব রূপ দান করিয়া কাব্যদেহের অলঙ্কার সজ্জার যে নিপুণ ব্যবস্থা করা হইল, তাহা সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যের এক অতি মূল্যবান্ সম্পদ হইয়া রহিল।

পূর্বেও বলিয়াছি, মঙ্গলকাব্য-রচনার মধ্যযুগ—যাহাকে আমরা সৃজনযুগ বা age of creation বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি—সেই যুগে লৌকিক দেবতাদিগের

সমাজে প্রবেশাধিকার অনেকটা সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। সেইজন্য নূতন মঙ্গলকাব্য-সৃষ্টির উপাদানের জন্য বাঙ্গালী কবিদিগকে বাধ্য হইয়া সংস্কৃত পুরাণোক্ত দেবতাদিগের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। সেই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসাহিত্যে পৌরাণিক দেবতার মাহাত্ম্যসূচক পূর্বালোচিত পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইতে আরম্ভ করে। মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক দেবতাগণ খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকেন। রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ', রূপনারায়ণ ঘোষের 'দুর্গামঙ্গল' ইত্যাদি এই যুগেই উদ্ভূত হয়। কিন্তু এই সকল রচনায় মৌলিক কল্পনার অভাব সর্বত্রই দৃষ্ট হয়; উচ্চতর রুচি-অনুমোদিত কাব্যের প্রসাদ-গুণ এই জাতীয় মঙ্গলকাব্যে একেবারেই নাই। এই মঙ্গলকাব্যগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃত পুরাণাদির ভাষানুবাদ মাত্র। রূপনারায়ণের 'দুর্গামঙ্গল' 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে'র ভাষানুবাদ এবং রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' শিবপুরাণোক্ত কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সত্যকার মৌলিক কবিত্ব-বিকাশ সেই মধ্যযুগে একমাত্র লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য-সূচক মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রেই সম্ভব হইয়াছে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় এই যুগের মঙ্গলকাব্যকেই 'first original poem in Bengali, apart from songs and translations' বলিয়াছেন।

ধর্মীয় বিশিষ্ট বিষয়-বস্তু লইয়া মধ্যযুগে যে সকল আখ্যায়িকা কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদেরই বৈশিষ্ট্য বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা গেল। কিন্তু এতদ্ব্যতীতও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচালীর আকারে সেই যুগে অসংখ্য দেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পদ্য রচনা আবির্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অধিকাংশই কাব্যের মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। দেবতাদের লোকপ্রীতির উপরই যে সকল সময় কাব্যের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিত, তাহা নহে। দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্মঠাকুরের মত একটি স্থানীয় দেবতা লইয়া এত উচ্চাঙ্গের কাব্য রচিত হইল, অথচ ষষ্ঠীদেবীর মত একটি ব্যাপক প্রচারিত দেবতার মাহাত্ম্যও সামান্য কয়েকটি অকিঞ্চিৎকর পাঁচালী রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, সংস্কৃত পুরাণে ষষ্ঠীদেবীর যথেষ্ট গুণকীর্তন করা হইয়াছে; পুরাণে যে সকল দেবতার স্থান হয় নাই, মঙ্গলকাব্য তাঁহাদেরই জন্য লিখিত হইত।

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে বাংলা মধ্যযুগের জাতীয় কাব্য-সাহিত্যের উপরই যবনিকা পাত হইয়া গেল, তাহা নহে—সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর নিজস্ব

জাতীয় বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত যে একটা বিরাট সাহিত্য প্রায় সাত শত বৎসরের সাধনার ফলে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা চিরতরে গতিশক্তিহীন হইয়া পড়িল। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বেই ইংরেজগণ পলাশীতে জয়লাভ করিয়া রাজ্যের কর্তা হইয়াছে। তারপর বাঙ্গালীর জীবনে এক আমূল পরিবর্তনের যুগ আসিয়াছে। এই রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার অবসানে প্রায় একশত বৎসর পরে বাঙ্গালী জাতি যখন একটা অবস্থার মধ্যে গিয়া স্থৈর্য লাভ করিল, তখন পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে নব সভ্যতার আলোক ধীরে ধীরে এই সমাজের উপর বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। তাহার সমুজ্জ্বল প্রভায় আকৃষ্ট হইয়া জাতি ক্রমে ক্রমে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতে লাগিল।

অতএব দেখা যাইতেছে, সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মত মঙ্গলকাব্যের বিলোপ মঙ্গলকাব্যের বহিরঙ্গগত অধঃপতনের ভিতর দিয়া আসে নাই—রচনাগত শৈথিল্য ইহার বিলুপ্তির কারণ নহে—দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তনই ইহার বিলোপের কারণ। ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের ভিতর দিয়া সেই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। কারণ, মঙ্গলকাব্যের যে যুগে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই যুগ যে ইহার সর্বাঙ্গীণ অধঃপতনের যুগ তাহা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? তবে, এ' কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সে যুগে মঙ্গলকাব্য-রচনার শিল্পগুণ বৃদ্ধি পাইলেও অন্তরের দিক দিয়া ইহার দৈন্য দেখা দিয়াছিল—ইহার বহিরঙ্গের রসপুষ্টি ইহার অন্তরগত ভাব-দৈন্য কিছুতেই ঘুচাইতে পারে নাই। অতএব, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত না হইলেও মঙ্গলকাব্য অধিক অগ্রসর হইবার প্রাণশক্তি ইতিমধ্যেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং ইহার বিনাশ সকল দিক হইতেই অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রথম অধ্যায়

লৌকিক শৈবধর্ম—শিবের গীত—শিবমঙ্গলকাব্য

লৌকিক শৈবধর্ম

ভারতীয় যে সকল প্রাগ্-বৈদিক দেবতা পরবর্তী হিন্দু সমাজেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শিবই সর্বপ্রধান। ইহা হইতে স্বভাবতঃই অনুমিত হইবে যে, এ দেশের প্রাগ্-বৈদিক সমাজে তৎকালীন শৈবধর্মের অত্যন্ত ব্যাপক প্রভাব ছিল। মহেঞ্জোদরোর সাম্প্রতিক আবিষ্কার হইতেও এই বিষয় সমর্থিত হয়। সেইজন্যই মনে করা হয় যে, বর্তমানে ভারতের যে অঞ্চলে আর্যেতর জাতির লোক অধিক সংখ্যায় বসবাস করে, সেই অঞ্চলেই শৈবধর্মের ও যে অঞ্চলে আর্যজাতির বংশধরগণ অধিক পরিমাণে বাস করে, সেই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলা দেশ হইতে বহু দূরবর্তী অঞ্চলে উদ্ভূত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহা বাংলা দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইবার পূর্বেই ইহাকে প্রাগার্য (pre-Aryan) শৈব ধর্মের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল। অতএব বাংলা দেশে প্রথম হইতেই যে শৈব ধর্মের প্রচার হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে আর্যেতর সমাজের উপাদান পূর্ব হইতেই মিশ্রিত ছিল। শুধু তাহাই নহে, অনার্য দেবতা শিব ইতিপূর্বেই আর্য সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়া স্বকীয় মহিমায় স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

বৈদিক রুদ্র দেবতার মধ্যেই অনার্য উপকরণ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। অতএব দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈদিক দেব-সমাজের মধ্যেই এই অনার্য দেবতা নিজের স্থান করিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পরবর্তী পৌরাণিক সাহিত্যে রুদ্র দেবতার এই বৈদিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানী বুদ্ধের অনুকরণে তাঁহার এক শান্ত সমাহিত শিবমূর্তির পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। মহেঞ্জোদরোতে আবিষ্কৃত শীলমোহরগুলির মধ্যে যোগাসনারূঢ় এক দেবমূর্তির পরিচয় হইতে মনে হয় যে, যোগীন্দ্র শিবের পরিকল্পনা প্রাগার্য (pre-Aryan) সমাজ হইতে উদ্ভূত; কালক্রমে তাহাও আসিয়া পৌরাণিক পরিকল্পনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়। এইভাবে ভারতীয় পৌরাণিক সমাজ রুদ্র, শিব ও যোগী চরিত্রের মধ্যে কোন প্রকার সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার

প্রয়াস পাইয়াছে। সেইজন্য একদিকে এই দেবতা যেমন ঘোর, ভৈরব এবং রুদ্র, আবার তেমনই অন্যদিকে অঘোর, শিব এবং দক্ষিণ—আবার তিনিই যোগীশ্বর ও যোগীন্দ্র। পৌরাণিক সাহিত্যের ভিতর দিয়াই প্রধানতঃ আর্যধর্ম বাংলা দেশে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া এই দেবতার চরিত্রগত বিভিন্নমুখী এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথম হইতেই এই দেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল। সেইজন্য কোথাও তিনি মঙ্গলকারী দেবতা, আবার কোথাও তিনি রুদ্র ভয়ানক। শিবের এই দুইটি প্রধান চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের উপরই বাংলার লৌকিক শৈব ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

বহিরাগত শৈবধর্ম বাংলার সমাজের উচ্চতর স্তরেই সর্বপ্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই ক্রমে তাহা নিম্নতর সমাজেও প্রসার লাভ করে। কিন্তু নিম্নতর সমাজের মধ্যে প্রচারিত হইয়া এই শৈবধর্ম ইহার পৌরাণিক আদর্শ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। নিম্নতর সমাজ নিজস্ব সংস্কারের ভিত্তির উপর উচ্চতর সমাজ হইতে সর্বদা তাহার সকল বিষয়ে প্রেরণা লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত মানসিক শিক্ষার অভাবে যে সকল উপকরণ উচ্চতর সমাজ হইতে তাহাতে গৃহীত হয়, তাহার মধ্যে তাহাদের যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হইতে পারে না—নিম্নতর সমাজের সংস্কারানুযায়ী তাহারা নূতন রূপে পুনর্গঠিত হয়। অনেক সময় তাহা এমনভাবে পরিবর্তিত হইয়া যায় যে, তাহাদের মৌলিক পরিচয়ই উদ্ধার করা কঠিন হইয়া পড়ে। পৌরাণিক শৈবধর্ম যখন উচ্চতর হিন্দু সমাজ হইতে ক্রমে নিম্নতর সমাজের মধ্যেও প্রচার লাভ করিল, তখন ইহা এইভাবে নূতন রূপ লাভ করিল—তাহা বাংলা দেশের সর্বত্রই যে অভিন্ন হইল তাহা নহে; কারণ, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়াই এই নূতন পরিকল্পনায় সৃষ্টি হইয়াছিল। এই জন্য ইহার মধ্যে আদর্শগত অনৈক্যও অনেক সময় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে মূল পৌরাণিক আদর্শ হইতে এই সকল স্থানীয় পরিকল্পনা অত্যন্ত দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল।

বাংলাদেশে আর্যসভ্যতা বিস্তৃতির ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, উত্তর বিহার বা মগধ হইতে ইহার সংলগ্ন অঞ্চল উত্তর বঙ্গেই আর্যসভ্যতা সর্বপ্রথম বিস্তৃতি লাভ করে। উচ্চতর সমাজ হইতে তাহা তদানীন্তন উত্তর বঙ্গের অধিবাসী নিম্নতর জাতির মধ্যেও প্রচারিত হয়। শৈব ধর্ম বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করিবার পূর্বেই উত্তর বঙ্গে সাধারণ জন-সমাজের মধ্যে প্রচারিত হইয়া সেই অঞ্চলে একটি স্থানীয় রূপ লাভ করিয়াছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিব একজন কৃষক। বলা বাহুল্য যে, উত্তর বঙ্গের সাধারণ কৃষক সমাজেই শিবের

এই অভিনব পরিকল্পনা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু কৃষক হইলেও প্রত্যক্ষ কৃষিকার্যে তাঁহার অসীম অনাসক্তি। অবশ্য এই অনাসক্তির ভাবটুকু তাঁহার চরিত্রের উপর পৌরাণিক চরিত্রেরই প্রভাবের ফল বলিতে হয়। কৃষিকার্যে ঔদাসীন্যের জন্যই তিনি নিত্য সাংসারিক অভাব অনটনের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন। এই অসচ্ছলতার জন্য তিনি কৃষিকার্যে মনোযোগী না হইয়া বরং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই ভাবে বাংলার কৃষকগণ একদিকে যেমন কৃষিকার্য দেব-বৃত্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়া ইহার উপর এক অপরূপ গৌরব দান করিয়াছিল, আবার অন্য দিকে তেমনি ভিক্ষাকার্যকেও দেব-বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া নিষ্ক্রিয় জীবনের মহিমা কীর্তন করিয়াছিল।

পৌরাণিক অকিঞ্চন শিবের পরিকল্পনার উপরই ভিক্ষুক শিবের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, অবশ্য ইহার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম হইতে আগত ভিক্ষু-জীবনের আদর্শও কতক কার্যকরী হইয়াছিল বলিয়া অনুভব করা যায়। বলা বাহুল্য, ইহাদের সঙ্গে শিবের কৃষক-চরিত্রের কোন রকম সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় না। কৃষিকার্য ব্যতীতও বাংলাদেশে শিবচরিত্রের উপর আরও কয়েকটি গুণ আরোপ করা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ভাঙ্ ও গাঁজায় আসক্তি। শিব কর্তৃক বিষপানের পৌরাণিক কাহিনীকেই সেকালের বাঙ্গালী কৃষকগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও রুচি অনুযায়ী এই ভাবে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছিল; এইভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাংলার শিব একদিকে একজন অলস কৃষক, আবার অন্য দিকে গাঁজা এবং ভাঙে পরম আসক্ত।

এদেশে আর্যসভ্যতা বিস্তারের পূর্বে উত্তর বঙ্গে কোচ নামক এক জাতি বাস করিত। কৃষিকার্যই ইহাদের প্রধান বৃত্তি ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক আদিম জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে-সকল জাতির মধ্যে কৃষিকার্য প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে কৃষিকার্যের জন্য এক দেবতার পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে। কোন কোন জাতির মধ্যে ইনি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতা (Fertility god) বলিয়া পূজিত হন। ইনি কখনও স্ত্রীরূপে, কখনও বা পুরুষরূপে পরিকল্পিত হন। উক্ত কোচ জাতির মধ্যেও এই শ্রেণীর এক দেবতার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। এখনও উত্তর বঙ্গে বিশেষতঃ দিনাজপুর জিলার সদর মহকুমায় কৃষকদিগের মধ্যে মহারাজা নামক এক দেবতার পূজা হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে নবান্নের সময় স্থানীয় কৃষকগণ নিজেদের মধ্যে

চাঁদা তুলিয়া বারোয়ারী ভাবে এই দেবতার পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, এই মহারাজার আশীর্বাদেই তাহারা কৃষিকার্যে সুফল লাভ করিতে পারে। অতএব ইনি উক্ত ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতা ব্যতীত আর কিছুই নহেন। ইহার মহারাজা নামকরণ বহু পরবর্তী। মনে হয়, এই অঞ্চলে আর্যসভ্যতা বিস্তৃতির পর স্থানীয় কৃষকদিগের এই উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতা (Fertility god) কোন কোন স্থানে মহারাজা বলিয়া উল্লিখিত হইলেও ব্যাপকভাবে শিব বলিয়াই পরিচিত হইতে থাকেন। সেইজন্য প্রাচীন বাংলার কবিগণ শিবকে সর্বত্রই কৃষিকার্যের সহায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উত্তর বঙ্গের এই মহারাজা ঠাকুর, পশ্চিম বঙ্গের ধর্ম ঠাকুর (পরে দ্রষ্টব্য) ও শিবঠাকুরের মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নাই। তাঁহাদের পূজোপলক্ষে প্রায় অভিন্ন লৌকিক ছড়া আবৃত্তি করা হইয়া থাকে।

কোচ কৃষক সমাজেই বাংলার লৌকিক শৈব ধর্মের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাংলার বহু দূরবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যেও শিবকে কোচ রমণীদিগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাংলার সর্বত্র প্রচলিত লৌকিক শিবের ছড়ায় কোচনী রমণীর প্রতি শিবের আসক্তির বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। অতএব মনে হয়, কোচ জাতীয় কৃষকদিগের সমাজেই পৌরাণিক শিব সর্বপ্রথম আসিয়া প্রবেশ লাভ করেন; অতঃপর সেখানেই তাঁহার চরিত্র স্থানীয় কোচদিগের সামাজিক জীবনের উপাদানে মিশ্রিত হইয়া একটি স্থানীয় ও লৌকিক রূপ পরিগ্রহ করে; কালক্রমে তাহাই বাংলার সর্বত্র প্রচার লাভ করে। কিন্তু বাংলাব অন্যান্য অঞ্চলে তাহা প্রচার লাভ করিবার পরও কোচ-সংস্রবের লোক-রুচিকর উপকরণগুলি কখনও তাঁহার মধ্য হইতে পরিত্যক্ত হয় নাই। বিশেষতঃ সংস্কৃত শৈব পুরাণগুলির মধ্যেও শিবচরিত্রের অনুরূপ দুর্নীতিপরায়ণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে, দিগম্বর শিব এক ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করিলে পর ঋষি-পত্নীগণ তাঁহার সহিত অশ্লীল রস-পরিহাস করিতেছেন।[১] অতএব তাঁহার উক্ত কোচ-রমণী সম্পর্কের পরিকল্পনায় কতকটা পৌরাণিক প্রভাব থাকাও আশ্চর্য নহে। কোচ-রমণীর সঙ্গে শিবের সম্পর্কের অর্থ এই যে, হিন্দুধর্মের মধ্যস্থতায় শৈব ধর্মের প্রভাব যখন কোচ সমাজের উপর বিস্তার লাভ করিল, তখনও কোচ সমাজের মাতৃতান্ত্রিক ভিত্তি শিথিল হইয়া যায় নাই—সামাজিক ও পারিবারিক পূজা পার্বণে কোচ পুরুষদিগের পরিবর্তে কোচ-

[১] স্কন্দপুরাণ (বঙ্গবাসী, ১৩১৮), মহেশ্বর খণ্ড, কেদার খণ্ড, অধ্যায় ৬, শ্লোক ১৮-১৯

নারীরাই পৌরোহিত্য করিত। এখনও উত্তর বঙ্গের পূর্ব-সংলগ্ন অঞ্চল গারো ও খাসি অঞ্চলে যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহাতে পুরুষদিগের পরিবর্তে নারীরাই পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। উড়িষ্যাব শবর জাতির মধ্যে পুরোহিত এখনও নারীই, পুরুষ নহে। কোচ নারীগণ আর্যেতর দেবতা শিবের পূজায় বিশেষ উৎসাহ দেখাইত, ইহা হইতে শিবের সঙ্গে কোচ-নারী সংস্রবের কথা কল্পিত হইয়া থাকিবে। মাতৃতান্ত্রিক কোচ সমাজে নারীর নৈতিক আদর্শ খুব উচ্চ ছিল না বলিযাই এই সম্পর্কের সূত্র ধরিয়া শিব-চরিত্রেও নৈতিক বিচ্যুতির কথা আসিয়াছে।

পারিবারিক জীবনের সহস্র বন্ধনের মধ্যে নিবিড় সুখ উপভোগ করিতে বাঙ্গালী চিরদিন অভ্যস্ত। দুঃখ-দারিদ্র্য ও ঐহিক অসচ্ছলতা কিছুতেই তাহার এই বন্ধন শিথিল কবিতে পারে না। এদেশের নারীজীবনের আদর্শও স্বতন্ত্র। সহস্র দুঃখ-দারিদ্র্য অভাব-অসন্তোষের মধ্যেও তাহাদের দাম্পত্য জীবন অশিথিল থাকিয়া যায়। শিবের মত স্বামীই নারীর আশৈশব জীবনের কাম্য। নিজের স্বামীর মধ্যে এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারা নারীজীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে। সেইজন্য ব্যক্তি হিসাবে স্বামী যাহার যেমনই হউক না কেন, তাহার জন্য কাহারও মনে ক্ষোভ বোধ হয় না। এ'দেশের স্বামীও যে কোন অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া লইয়া অতি সহজেই দাম্পত্য জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। বাঙ্গালী কবিগণ শিবকে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ স্বামী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। গৃহধর্মের আদর্শই বাঙ্গালীর নিকট সর্বাপেক্ষা বড়; সেইজন্যই তাহাব পরিকল্পিত দেবতা আদর্শ গৃহধর্মে প্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক শিবের মত তিনি প্রমথনাথ হইয়া শ্মশান-বিহারী নহেন, বরং তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত,—তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবেষ্টিত গৃহী। যদিও তাঁহারও আবাস কৈলাস বলিয়াই উল্লিখিত হয়, তথাপি অতি সহজেই অনুভব করা যায় যে, এই কৈলাস বাংলারই এক নিভৃত পল্লী ব্যতীত আর কিছুই নহে। দুই পুত্র, দুই কন্যা ও এক সর্বংসহা পত্নী লইয়া এই পল্লীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাস। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেন, তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।' (গ্রাম্য সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী ৬, ১৩৪৭,

পৃঃ ৬৪৮) একজন আধুনিক সমালোচকও বাংলার হরগৌরীবিষয়ক কাহিনী সম্পর্কে যথার্থই বলিয়াছেন যে, 'এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্বতীর কৈলাস-জীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তস্য ভার্যা পার্বতী ঠাকুরাণীর জীবন-কাহিনী।'[১] গৃহধর্ম পালনের মধ্যেও যে আধ্যাত্মিক চরিতার্থতা সার্থক হইতে পারে এদেশের প্রাচীন কবিগণ তাঁহাদের লৌকিক শিবের পরিকল্পনায় তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। অতএব বাংলার শিব পৌরাণিক আদর্শানুযায়ী যোগী নহেন, বরং আদর্শ গৃহী।

কৃষকের কল্যাণকর দেবতা রূপে উত্তর বঙ্গের কোচ সমাজে যে শিবচরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পরিকল্পিত শিবের চরিত্রে তাহারই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। ইহার কারণ, এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে মৌলিক জাতিগত পরিচয়ে পার্থক্য আছে। বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল সাধারণতঃ রাঢ় নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে প্রাচীনকাল হইতে মৃগয়াজীবী কোল-মুণ্ডা জাতির এক শাখা বসবাস করিতেছিল। উত্তর বঙ্গের কোচ জাতীয় অধিবাসীদিগের মত তাহারা কৃষিজীবী ছিল না। সেইজন্য স্বভাবতঃই কৃষিকার্যের সহায়ক কোন দেবতারও তাহাদের মধ্যে কোন স্থান ছিল না। এই কোল-মুণ্ডা জাতির প্রধান দেবতার নাম ছিল মরাং বুরো, ইনি পর্বতের অধিষ্ঠাতা দেবতা। ইনি মানবের মহা অনিষ্টকারী; উপযুক্ত পূজা না পাইলে নানা দুর্বিপাক সৃষ্টি করিয়া তিনি গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করিয়া ফেলেন। কালক্রমে হিন্দুধর্ম যখন এই কোল-মুণ্ডা জাতি অধ্যুষিত বাংলার এই পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিল, তখন স্বভাবতঃ এদেশে এই অনার্য-জাতি-প্রভাবিত হিন্দুসমাজের অন্যতম প্রধান দেবতা শিবকে এই প্রকার রক্তপিপাসু ও ভয়ঙ্কর বলিয়াই কল্পনা করিল। অতএব তাঁহাকেও তাহারা তাহাদের মরাং বুরোর মত পশুবলি দ্বারা পূজা করিয়া পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। এমন কি এই অঞ্চলে পরবর্তী কালে আর্যসভ্যতার প্রভাব অধিকতর হওয়া সত্ত্বেও সাধারণের মধ্যে শিব সম্পর্কিত এই মনোভাবের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিল না। বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম—এই সকল অঞ্চলের বহুস্থলেই আজ পর্যন্তও বার্ষিক শিবপূজা বা চৈত্র সংক্রান্তির সময় শিবের সম্মুখে পশুবলি দেওয়া হয়। এই অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক গ্রাম্য শিবমন্দিরের আঙ্গিনার মধ্যেই 'ভৈরব থান' নামক একটি স্থান আছে।

[১] নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা (১৯৪০), ২৬-২৭

আধুনিক কালে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের প্রভাব বশতঃ অনেক স্থলে শিবের সম্মুখেই পশুবলি না দিয়া এই ভৈরব থানে আনিয়া পশুবলি দেওয়া হয়। তামিল দেশেও হিন্দু-প্রভাব বশতঃ বর্তমানে গ্রাম্য দেবতাদিগের সম্মুখে পশুবলি দিবার প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহাদের সম্মুখে একটি পবদা টানিয়া দিয়া তাঁহাদের আবরণ দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে এখনও পশুবলি দেওয়া হইয়া থাকে। বাংলাদেশে ভৈরব শিবের আবরণ দেবতার স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। বীরভূম জিলার বারমল্লিকা, পাইকর, দক্ষিণ গ্রাম প্রভৃতি গ্রামে এখনও শিবের সম্মুখেই প্রতি বৎসর পশুবলির ব্যবস্থা করা হয়। শিব-চরিত্রের এই অভিনব পরিচয় কেবলমাত্র পৌরাণিক শৈবধর্মের যে বিরোধী তাহা নহে, ইহা বাংলা দেশেরও আর কোন অঞ্চলে দৃষ্টিগোচর হয় না।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম এ'দেশে প্রচার লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বহু উপাদানও আসিয়া লৌকিক শৈবধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হইতে আরম্ভ করে। পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনাও বুদ্ধদেবের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত। অতএব বাংলার তদানীন্তন বৌদ্ধ সমাজ শিবের চরিত্রের মধ্যেই নিজেদের আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিল। জৈন তীর্থঙ্করদিগের জীবনাদর্শ গৌতম বুদ্ধ ও পৌরাণিক শিব হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র নহে, এই জন্যই কালক্রমে তদানীন্তন বাংলার বিরাট বৌদ্ধ ও জৈন সমাজ নিজেদের ধর্মীয় উপকরণ দ্বারা এ'দেশের শৈবধর্মকে অভিনবরূপে পুনর্গঠন করিয়া লইয়াছিল। বাংলাদেশের তদানীন্তন আর একটি ব্যাপক প্রচলিত ধর্ম নাথধর্ম। শৈব কিংবা বৌদ্ধ ধর্মের বাহিরে ইহার উদ্ভব হইলেও শৈবধর্মের ব্যাপক প্রসার বশতঃ কালক্রমে ইহার মধ্যে গিয়াও শৈবধর্মের উপকরণরাশি প্রবেশ লাভ করিল। কালক্রমে নাথসিদ্ধাগণও শিবকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ ও অনার্য—এই সকল ধর্মমত হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বাংলার লৌকিক শৈবধর্ম এক অভিনব সঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করিল।

বিভিন্ন আদর্শ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিজস্ব ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তির উপর নাথধর্ম যে কি ভাবে শিব-চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছিল, এখানে সংক্ষেপে তাহারই পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

নাথধর্মের আদি গুরু মীননাথ যখন কদলীপত্তনে গিয়া ষোড়শ সহস্র কামিনীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া কাল কাটাইতেছেন, তখন গোরক্ষনাথ তাঁহার উদ্ধার-

মানসে তাঁহার নিকট নানা নীতি-কথার অবতারণা করিতেছেন। তাহার উত্তরে মীননাথ বলিতেছেন,

মোর গুরু মহাদেব জগত ঈশ্বর।
গঙ্গা গৌরী দুই নারী থাকে নিরন্তর ॥
যার দুই নারী তার সাক্ষাতে দিগম্বর।
হেনরূপে করে গুরু কেলি নিরন্তর ॥
তান আছে গৃহবাস আহ্মি কোন হই।
ভবে মোর একগতি শুন আমি কই ॥

মীননাথের কথা শুনিয়া গোরক্ষনাথ বলিলেন, 'শিব মনুষ্য নহেন, তিনি দেবতা, তাঁহার সঙ্গে তোমার তুলনা দেওয়া বৃথা।' যাহাই হউক, গোরক্ষনাথ নিজের চরিত্র ও সাধনা দ্বারা তাঁহার গুরুর উদ্ধার সাধন করিলেন। এ'দিকে শিবানী পার্বতী গোরক্ষনাথের চরিত্র-বলের কথা শুনিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল কৌশলই ব্যর্থ হইল। শুধু তাহাই নহে, গোরক্ষনাথ দেবীর চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে রাক্ষসী করিয়া ছাড়িয়া দিলেন,—প্রতিদিন একটি মনুষ্য আহার করিয়া তাহার দিন কাটিতে লাগিল। এ'দিকে শিব পত্নীর বিরহে কাতর হইয়া তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলেন। মহাদেব ধ্যানবলে গোরক্ষনাথের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া পত্নীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,

তথাতে না পাইল শিব দেবী অন্বেষণ।
গোর্খেরে ধরিয়া শিবে করে কদর্থন ॥
কোথা গেল মোর নারী তুহ্মি কি করিলা।
শিবের বচন শুনি গোর্খ যে হাসিলা ॥
ভাঙ ধুতুরা খাও কি বলিব তোরে।
কোথা ত হারাইছ নারী ধর আসি মোরে ॥

যাহাই হউক, অবশেষে গোরক্ষনাথের সহায়তায় শিব পার্বতীর উদ্ধার সাধন করিয়া তাঁহাকে কৈলাসে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথের নিকট নিজের পত্নীর পরাজয়ের দুঃখ ভুলিতে পারিলেন না।

এদিকে গর্বন্ধ রাজার কুমারী কন্যা বিরহিণী স্বামী লাভের জন্য শিবপূজা করিতেছিলেন। তিনি শিবের নিকট মৃত্যুঞ্জয় স্বামীর বর প্রার্থনা করিয়া দুশ্চর

তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভক্তবৎসল শিব আবির্ভূত হইয়া গোরক্ষনাথকে তাঁহার পতিরূপে পাইবার জন্য বর দিলেন; কারণ, মর-সংসারে একমাত্র গোরক্ষনাথই যোগবলে অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ'দিকে গোরক্ষনাথ মহাসঙ্কটে পড়িলেন,—তিনি যোগী ব্রহ্মচারী; তিনি বুঝিতে পারিলেন, শিব তাঁহার পত্নীকে অপমানিত করিবার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য এই অভিনব কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। গোরক্ষনাথ যোগবলে ছয় মাসের শিশুতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়া কন্যাকে মাতৃ-সম্বোধন করিলেন। এইভাবে গোরক্ষনাথ শিবের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজের চরিত্রবল অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।

নাথ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে শৈবধর্মের পূর্বোল্লিখিত সম্পর্কের ফলে বাংলা এবং বাংলার বাহিরে, এমন কি তিব্বতী ভাষায়ও নাথ-সাহিত্যে এই প্রকার শিব-কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে নাথদিগের গুরু সিদ্ধাচার্য ও তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত প্রধান প্রধান শিষ্যের অলৌকিক জীবন-কাহিনী বর্ণনাই নাথ-সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শিবকে তাহারা পরবর্তী কালে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার প্রসঙ্গ তাহাদের সাহিত্যে গৌণ অংশ মাত্র অধিকার করিয়া আছে।

পশ্চিম বঙ্গের একটি লৌকিক দেবতা ধর্ম ঠাকুরের নামে এককালে যে বিস্তৃত সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল (পরে দ্রষ্টব্য) তাহার মধ্যে শিবচরিত্রের এই ভাবে পরিকল্পনা করা হইয়াছে,—

ধর্ম ঠাকুরের ঘর্ম হইতে আদি জননী আদ্যাশক্তির জন্ম হইল। আদ্যাশক্তিকে গৃহে রাখিয়া ধর্ম বল্লুকা নদীতীরে তপস্যা করিতে গেলেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর ব্যাপিয়া তিনি তপস্যায় নিমগ্ন রহিলেন। তারপর তাঁহার বাহন উলূকের কথায় তিনি তপস্যা ত্যাগ করিয়া গৃহে আদ্যাশক্তির সংবাদ লইতে গেলেন। এ'দিকে আদ্যাশক্তি যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া ধর্মঠাকুর তাঁহার বরের সন্ধানে পুনরায় বহির্গত হইলেন। গৃহমধ্যে এক পাত্রে মধু ও আর এক পাত্রে বিষ রাখিয়া গেলেন। ক্রমে যৌবন-ভার আদ্যার অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া বিষ পান করিয়া ফেলিলেন, ফলে তিনি গর্ভবতী হইলেন। কালক্রমে তাঁহার গর্ভ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিনজনের জন্ম হইল। তাঁহারা জন্ম লাভ করিয়াই কারণসমুদ্রের তীরে গিয়া তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব তিনজনই জন্মান্ধ ছিলেন, তাঁহাদিগের ভক্তি পরীক্ষা করিবার

নিমিত্ত ধর্মঠাকুর দুর্গন্ধ শবরূপে কারণ-জলে ভাসিতে ভাসিতে একে একে তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটবর্তী হইলেন,—

দুই চক্ষু অন্ধ বহ্মা জোগে বোসে আছে।
ভাইসিতে ভাইসিতে পরভু গেলা তার কাছে ॥
দুর্গন্ধ পাইয়া বহ্মা ভাইসিতে লাগিল।
তিন অঞ্জলি জল দিয়া ভাসাইয়া দিল ॥

সেখান হইতে শব ভাসিতে ভাসিতে বিষ্ণুর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল,—

দুর্গন্ধ পাইয়া তবে বিষ্টু মহাবলী।
ভাসাইয়া দিলা তারে দিয়া তিন অঙ্গলি ॥

এ'বার শব ভাসিতে ভাসিতে শিবের সম্মুখে আসিয়া ঠেকিল,—

দুর্গন্ধ পাইয়া শিব ভাবে মনে মন।
কথা নাহি কার জন্ম মরিল কুন জন ॥

শিব তত্ত্বজ্ঞ; তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহা নিরঞ্জনের মায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে; কারণ, কোথাও কাহারও তখন পর্যন্ত জন্মই হয় নাই, অতএব শবগন্ধ কোথা হইতে আসিবে?

দু'হাতে ধরিআ মড়া তুলিআ লইল।
দুর্গন্ধিত শব লএ শিব নাচিতে লাগিল ॥
পচা গন্ধ মড়া হএ আইলা নারাঅন।
চিনিতে নারিল আহ্মার ভাই দুইজন ॥

ধর্মঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিনটি চক্ষু দান করিলেন,—

শ্রীধর্ম বল্লেন তুহ্মি আহ্মারে চিনিলে।
দুহি চক্ষু অন্ধ ছিল ত্রিলোচন হইলে।

সংস্কৃত পুরাণাদিতে শিবের ত্রিলোচন হইবার বহু কারণের উল্লেখ আছে, পুরাণ-বহির্ভূত এখানে এই আর একটি স্বতন্ত্র কারণের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা গেল।

কিন্তু শিব কেবল মাত্র নিজের দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি ধর্মঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলেন,

আর এক নিবেদন করি নারাঅনে।
চক্ষুদান দেহ তুহ্মি ভাই দুহিজনে ॥

এত শুনি পরাৎপর বলে ত্রিলোচনে।
তব মুখামৃতে চক্ষু পাইব দুহিজনে॥
মুখর অমৃত দিয়া দোহার চক্ষু দিল।
অমৃত পাইয়া দুহার দিব্য চক্ষু হইল॥

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের অনুগ্রহে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া আদ্যাশক্তি ও ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য চলিলেন। ধর্মঠাকুর ব্রহ্মাকে সৃষ্টির, বিষ্ণুকে পালনের ও শিবকে জগৎ ধ্বংসের কার্যে নিয়োজিত করিলেন। তিনি আদ্যাশক্তিকে জীব-জন্মের জন্য মনোনিবেশ করিতে আদেশ করিলেন। তাহার উত্তরে আদ্যাশক্তি বলিলেন, আমি অযোনি-সম্ভবা, আমি কি করিয়াই বা কাহাকে বিবাহ কবিব? ধর্মঠাকুর বলিলেন, 'জন্ম জন্মান্তবে শিব তোমাকে বিবাহ করিবে, তাহার ঔরসেই তোমার গর্ভে প্রজাসৃষ্টি হইবে।'

মধ্যযুগের অন্যতম মঙ্গল-সাহিত্য চণ্ডীমঙ্গলেও অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। বাংলার এই সকল লৌকিক আখ্যান কালক্রমে কতকগুলি অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণেও গিয়া স্থান লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' ও 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' উল্লেখযোগ্য।

একটি প্রাগৈতিহাসিক লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান কালক্রমে এ'দেশের কোন কোন অঞ্চলে শৈবধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—তাহা গাজন নামে পরিচিত। শৈবধর্ম প্রভাবিত অঞ্চলে ইহা শিবের গাজন, ধর্মঠাকুর প্রভাবিত অঞ্চলে ইহা ধর্মের গাজন ও লৌকিক বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত অঞ্চলে ইহা আদ্যের গাজন নামে পরিচিত। কোন কোন অঞ্চলে ইহা নীলের গাজন নামেও কথিত হয়। শিবের পৌরাণিক এক নাম নীলকণ্ঠ, তাহা হইতে সংক্ষেপে নীল হইযাছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু নীল শব্দের অন্য কোন তাৎপর্য থাকাও সম্ভব। কোন কোন স্থলে এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় দেলপূজা; দেউল (মন্দির) শব্দ হইতে দেল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন; কিন্তু এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে দেউল বা মন্দিরের এমন কোন সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না, যে জন্য ইহার নামই দেউল পূজা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। অতএব মনে হয, দেল শব্দও স্বতন্ত্র কোন সাংস্কৃতিক ধারা হইতে আসিয়াছে। মালদহ জিলায় প্রায় অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান আছে, তাহার নাম আদ্যের গম্ভীরা। গম্ভীরা শব্দের অর্থটি খুব স্পষ্ট নহে। পশ্চিম বঙ্গের ধর্মঠাকুর পূজায় ধর্মঠাকুরের আসনরূপে ব্যবহার করিবার জন্য

একপ্রকার কাঠ ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম গামার কাঠ, ইহাকে গম্ভীরা কাঠও বলা হয়। ওড়িয়া ভাষায় গম্ভীরা শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র নির্জন কক্ষ। পুরীতে কাশীমিশ্রের গৃহে চৈতন্যদেব যে ক্ষুদ্র কক্ষটিতে বাস করিতেন তাহাকে বলা হইয়াছে গম্ভীরা। এই অর্থেই ওড়িয়াতে গম্ভীরা শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু মালদহের আদ্যের গম্ভীরার ক্ষেত্রে উপরোক্ত কোন অর্থ প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। ছোটনাগপুরের ওরাওঁ মুণ্ডা জাতির মধ্যেও অনুরূপ ধর্মানুষ্ঠান প্রচলিত আছে, সেখানে ইহা মাণ্ডা পরব নামে পরিচিত। উড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চলেও এই শ্রেণীর অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ইহার নাম সাহীযাত্রা। মহীশূরের সাত ভগিনী মারীর (বা মারী সাত ভগিনীর) বাৎসরিক উৎসবের নাম মারী যাত্রা। মাঘ মাসে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা কতকটা বাংলা দেশের গাজনের অনুরূপ।

শিবের গাজনের মধ্যে শিব-সম্পর্কিত কতকগুলি লৌকিক ছড়া আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। সাধারণ লোকের হাতে পড়িয়া শিবের চরিত্র ইহাতেও এক অভিনব রূপ লাভ করিয়াছে, এখানে তাহার সামান্য পরিচয় দেওয়া যাইবে—পশ্চিম বাংলার প্রায় সর্বত্রই যে গ্রাম্য শিবমন্দির আছে তাহার সংলগ্ন আঙ্গিনায় সাধারণতঃ চৈত্র-সংক্রান্তির দিন এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যাহারা বিশেষ ভাবে পূজায় যোগ দিবার জন্য প্রতি বৎসর মানসিক বা মানত করে, তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বলা হয়, ইহাদের মধ্যে একজন মূল সন্ন্যাসী হয়, তাহার নির্দেশেই অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ পালন করিয়া থাকে ;—শিবমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন পর অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত শিব-সম্পর্কে কতকগুলি ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে যে শিবের ছড়া গীত হইয়া থাকে তাহাতেও শিবের কৃষক-চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকাব লাভ করা যায়। কোন কোন গীতের বিষয়-বস্তু এই—শিব কার্পাস তূলার চাষ করিয়া থাকেন। কার্পাস তূলা দ্বারা গঙ্গাদেবী সূতা কাটিয়া দেন, শিব নিজেই সেই সূতা দিয়া তাঁতে নিজের জন্য কাপড় বুনিয়া লন। আনকোরা কাপড়খানি নেতা ধোপানী ক্ষীরসমুদ্রের জলে কাচিয়া দেয়।

গাজন উপলক্ষে গ্রাম্য শিবতলা হইতে 'বড তামাসা'র যে মিছিল বাহির হয়, তাহাতে গাজুনে শিব নামে একখণ্ড কাষ্ঠ কিংবা প্রস্তরকে বাদ্যভাণ্ড সহকারে গ্রামান্তরের শিবতলায় লইয়া যাওয়া হয়। এই মিছিলের মধ্যে নৃত্যগীত সহকারে

শিব-সম্পর্কিত বিবিধ লৌকিক কাহিনী গীত হইয়া থাকে। কোন কোন বিষয় অভিনীতও হয়। যেমন, শিবের কৃষিকার্য বিষয়টি কোন কোন স্থলে এই ভাবে অভিনীত হইতে দেখা যায়—একজন বীজ ছড়ায়, একজন লাঙ্গল দিয়া মাটি চাষ করে, দুই ব্যক্তি হালের বলদের অভিনয় করিবা যোয়াল কাঁধে লইয়া টানে, কোন ব্যক্তি পাকা ধান কাটিবার অভিনয় করে; তাহাকে মূল-সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করে, 'বলি শিবঠাকুর, কত ধান হ'লো'? উক্ত ব্যক্তি তাহার একটি জবাব দেয়, ইহা হইতেই সকলে সেই বৎসরের ধান্য উৎপাদনের পরিমাণ বুঝিয়া লয়। সাঁওতাল-দিগের মধ্যেও ফাল্গুন চৈত্র মাসে যে 'বহাপরব' অনুষ্ঠিত হয়, সেই উপলক্ষে, 'On arriving at the *jaher*, Jahcrera sweeps the *thanas*, the naeka asks the *bongas*, *i.e.*, those personating the gods, for the things they have brought, and places them on a mat. He next proceeds to ask them questions, a proceeding which probably was originally an attempt to find out something about the coming year.' (*Bengal District Gazetteers*, *Santal Parganas*, Calcutta, 1910, p. 128.)

এতদ্ব্যতীত গৌরীর শঙ্খ পরিধানের একটি লৌকিক কাহিনীও এই উপলক্ষে গীত হয়। তৃতীয় দিবসে এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়, এই উপলক্ষে গাজুনে বাস্থল বা পুরোহিত আসিয়া শিব পূজা করে, সন্ন্যাসিগণ শিব, গৌরী, ভূত, পিশাচ ইত্যাদি সাজিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে নৃত্য করে, তারপর বাদ্যভাণ্ড সহকারে নর্তকের দল গৃহে গৃহে ঘুরিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করে। কোন কোন স্থানে চড়ক হয়; চড়কের পর এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণা জিলার ভাগীরথীর দুই তীরে পাঁচুঠাকুর নামে এক দেবতা আছেন। পেঁচো নামক কোন বৃক্ষবাসী অপদেবতা হইতেই তিনি ক্রমে পাঁচুঠাকুর ও অবশেষে পঞ্চানন ঠাকুর নামে পরিচয় লাভ করিয়া বর্তমানে শিবরূপে পূজিত হইতেছেন। এই অঞ্চলে ভূতে পাওয়া অর্থে পেঁচোয় পাওয়া কথাটি আজিও প্রচলিত আছে। সংস্কৃত ও বাংলা কবিতায় এই দেবতার মাহাত্ম্যসূচক কয়েকটি কাহিনী রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে শিবের সঙ্গে তাঁহার অভিন্নতা সম্পাদনের প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরের আলোচনা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন লৌকিক ধর্মের উপাদানের উপর ভিত্তি

করিয়া এই দেশে শিবের এক অভিনব সঙ্কর-রূপ পরিকল্পিত হইয়াছিল। এই প্রকার বিভিন্নমুখী ও বিপরীতধর্মী কতকগুলি আদর্শের একত্র সংমিশ্রণের ফলে বাংলার শৈব উপাদান দ্বারা কোন বিশিষ্ট সাহিত্য এ'দেশে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই; ইহার বিভিন্ন উপাদানগুলি এমন ভাবে পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র যে ইহাদের দ্বারা কাহিনী ও আদর্শগত কোনও অখণ্ডতা সৃষ্টিও সম্ভব হয় নাই, পরবর্তী আলোচনাই ইহার প্রমাণ।

শিবের গীত

বাংলায় একটি সুপরিচিত প্রবচন আছে, 'ধান ভানতে শিবের গীত'। ইহা হইতেই এ'দেশে একটি লৌকিক শিব-গীতিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্রভাবে এই গীতিকা আজ পর্যন্ত কোথা হইতেও আবিষ্কৃত হইয়া মুদ্রিত হয় নাই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে এই শিব-গীতিকার কোন কোন বিভিন্ন অংশের সঙ্গে আজিও পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও যে বাংলার সমাজে ইহার একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ রূপ বহুল প্রচলিত ছিল, সে যুগের বাংলা সাহিত্যে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ চৈতন্যচরিতকার কবি বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ইতিহাসের তথ্যরাশিতে পরিপূর্ণ। তাঁহার বর্ণনায় পাওয়া যায়,

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায়—গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেঢ়ি নৃত্য করে॥
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর মূর্তি দিব্য জটাধর॥
এক লাফে উঠে তার কান্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বলে মুই যে শঙ্কর॥
কেহো দেখে জটা শিঙ্গা ডমরু বাজায়।
'বোল', 'বোল', মহাপ্রভু বোলয়ে সদায়॥
সে মহাপুরুষ যত শিবগীত গাইল।
পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল॥[১]

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই শিবের গীত মুখে মুখে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল। শৈব বলিয়া পরিচিত এক শ্রেণীর ভিক্ষুক এই গীত গাহিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। এই

---

[১] বৃন্দাবন দাস, চৈতন্যভাগবত (বসুমতী, ৪র্থ সংস্করণ), ১৩২-১৩৩

শিবের গীত সমাজের নিম্নতম স্তরের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই শিব-গীতিকার পূর্ণাঙ্গ রূপ কি ছিল, তাহা উদ্ধৃত অংশ হইতে জানিতে পারা যায় না।

রংপুর জিলার কৃষকদিগের মধ্যে শিব সম্পর্কে কতকগুলি লৌকিক ছড়া আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। যোগিসম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকগণই সাধারণতঃ এই সকল গান গাহিয়া থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কালক্রমে নাথ যোগিগণও শিবকে নিজদিগের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, এই সূত্রেই তাহাদের রচিত লোক-গীতিকায় শিবের মহিমা কীর্তন করা হইয়া থাকে। মনে হয়, সেকালের সমাজে এই শ্রেণীর গানই শৈব ভিক্ষুকগণ দ্বারে দ্বারে গাহিয়া বেড়াইত। নিম্নে দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে,—

চণ্ডী বলে শুন গোসাই জটিয়া ভাঙ্গেড়া।
তোমার সঙ্গে আও করিলে নাগিবে ঝগড়া॥
চার ছেইলার মাও হৈলাম তোর ঘরের ঘরে।
দয়া করি চারখান শাখা নাই পিন্ধাইস্ মোরে॥
ভাসুব আইসে শ্বশুর আইসে রন্ন আন্ধি খাও তারে।
আমার হাত মুড়া গোসাই তা, নজ্জা নাগে তোরে॥
শিব বলে, শুন চণ্ডী, দক্ষরাজার বেটি।
শাখা দিবার না পাইম আমি যাক বাপের বাড়ী॥

এ কথা শুনিয়া চণ্ডী আনন্দিত মন।
নাইওর লাগিয়া চণ্ডী করিল গমন॥
কার্তিক গণেশ নিল ডাইনে বাঁয়ে সাজাইয়া।
অগ্নিপাটা শাড়ী নিল পরিধান করিয়া॥

নাইওরক নাগিয়া চণ্ডী যায় ত চলিয়া।
পালঙ্কেতে বুড়াশিব আছে শুতিয়া॥
নারদমুনি ডাকে তাকে মামা মামা বলিয়া।
ওহে মামা, ওহে মামা, তুমি বড় আসিয়া॥
পাকা আড় পহর বেলা আছ পালঙ্কে শুতিয়া।
ঝগড়া নাগাইয়া চণ্ডী যায় গোসা হইয়া॥
নারদ ভাইগ্না তাকে ডাকায় কান্দিয়া কাটিয়া॥

ওহে মামী, ওহে মামী, কার্তিক গণেশের মাও।
এক পাও আগাইবা যদি মামী, কার্তিকের মুণ্ডু খাও॥
ফিরা পা আগাইবা যদি গণেশের মুণ্ডু খাও।
ফিরা পা আগাইবা মামী আমার মাথা খাও॥
নারদ ভাইগ্নার বাক্যেত মহল ফিরিয়া গেল।
মহল যাইয়া চণ্ডী মাতা কামের ব্যাখ্যা দিল॥[১]

উত্তর বঙ্গে প্রচলিত আরও একটি শিবের ছড়া এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে; ইহাতে দেখা যাইবে কি ভাবে একই বিষয়বস্তু বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে,—

আমার জাতের কথা শিব তুই কলু ভাঙ্গিয়া।
তোমার জাতের কথা কইলে নাগিবে ঝগড়া॥
ভাসুর আইসে শ্বশুর আইসে রণ-পরশুম তাকে।
হাতে শাঙ্কা নাই ছ্যান গোঁসাই নজ্জা পাছু তাতে॥
শাঙ্কা কিনিয়া ছ্যাও হে মদন মুরলী।
দশ হাতে দশ মুট শাঙ্কা কানে মদন কড়ি॥
শাঙ্কা না পাইলে তবে যাব বাপের বাড়ী।
বাপের বাড়ী যাব দুর্গা ভাইয়ের বাড়ী যাব।
কাটনি কাটিয়া তবে তুই ছেইলাক পালিব॥[২]

ধর্মমঙ্গল সাহিত্যে[৩] রামাই পণ্ডিত সঙ্কলিত 'শূন্য-পুরাণ' নামক একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্মপূজা উপলক্ষে যে গাজন হইয়া থাকে তাহাতেও তাহার বিবিধ অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। এই গাজন উপলক্ষে শিবের চায বিষয়ক যে একটি অনুষ্ঠান পালন করা হইয়া থাকে, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই বিষয়ক নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি উক্ত 'শূন্য-পুরাণে' সঙ্কলিত হইয়াছে, মনে হয় ইহাও প্রাচীন শিব-গীতিকার একটি অংশ,—

যখন আছেন গোসাঞি হয়া দিগম্বর।
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিয়া বুলেন ঈশ্বর॥

১ গোপীচাঁদের গান, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সঙ্কলিত (১৯২৪) ২, ৩৬-৩৭, ভূমিকা
২ ঐ ৩৯ ৩ পরে দ্রষ্টব্য

রজনী পরভাতে ভিক্খার লাগি যাই।
কুথাএ পাই কুথাএ না পাই ॥
হর্তুকী বএড়া তাহে করি দিন পাত।
কত হরস গোসাঞি ভিক্খাএ ভাত।
আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চষ চাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস ॥
পুখরি কাদাএ লইব ভূমখানি।
আরসা হইলে ছিচএ দিব পানি ॥

আর সব কিষাণ কাঁদিব মাথায় হাত দিয়া।
পরম ইচ্ছায় ধান্য আনিব দাইআ ॥
ঘরে অন্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব ॥
কাপাস চষহ পরভু পবিব কাপড়।
কত না পরিব গোসাই কেওদা বাঘের ছড় ॥
তিল সরিষা চাস কর গোসাঞি বলি তব পাএ।
কত না মাখিব গোসাঞি বিভূতিগুলা গাএ ॥

মুগ বাটলা আর চষিহ ইখু চাস।
তবে হবেক গোসাঞি পঞ্চামর্ত্তর আশ ॥
সকল চাস চস পরভু আর রুইও কলা।
সকল দব্ব পাই যেন ধর্ম পূজার বেলা ॥
এতেক সুবিধা হব মনে ত ভাবিল।
মন পবন দুই হেলএ সিজন করিল ॥
সুনার যে লাঙ্গল কৈল রূপার যে ফাল।
আগে পিছু লাঙ্গলেত এ তিন গোজাল ॥

আগে জোতি পাশ জোতি আভদর বড় চিন্তা। (!)
দুদিগে দুসলি দিআ জুআলে কৈল বিন্ধা ॥
সকল সাজ হৈল পরভুর আর সাজ চাই।
গটা দশ কুআ দিয়া সাজাইল মই ॥

তাকর ভুভিতে চাই ভুগাছি সলি দড়ি।
চাষ চসিতে চাই স্থনার পাচন বাড়ি॥
মাঘ মাসে গোঁসাই পিথিবি মঙ্গলিল।
যতগুলি ভূম পরভু সকলি চষিল॥[১]

ইহার সহিত মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রচিত এই পদ্যটির তুলনা করা যাইতে পারে—ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে শিব সম্পর্কিত এই বিশ্বাস মিথিলা হইতে উত্তর বঙ্গ পথে বাংলা দেশের অন্যত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল, কিংবা প্রাচীন বাংলাদেশ হইতেও তাহা মিথিলায় যাওয়া অসম্ভব নহে—

বেরি বেরি অরে শিব মোঞে তোকেঁ বোলঞে
কিরিষি করিয় মন লাই।
বিন্থ সমরে হর ভিখিএ পত্র মাগিয়
গুণ গৌরব দূর জাই॥
নিরধন জন বোলি সবে উপহাসএ
নহি আদর অনুকম্পা।
তোহেঁ শিব পাওল আক ধুথুর ফুল
হরি পাওল ফুল চাম্পা॥
খটগ কাটি হরে হর যে বঁধাওল
ত্রিশুল ভাগয় করু ফারে।
বসহা ধুরন্ধর হর লএ জোতিঅ
পাএট স্থর সরিধারে॥
ভণই বিদ্যাপতি স্থনহ মহেশর
ই জানি কইলি তুঅ সেবা।
এতএ জেবরু সে বরু হোঅও
ওতএ সরন দেবা॥[২]

অর্থাৎ—হে শিব, বার বার তোমাকে আমি বলি, কৃষিকার্য কর; হে হর, তুমি নির্লজ্জ হইয়া ভিক্ষা মাগ, তাহাতে তোমার গুণ-গৌরব দূর হয়। নির্ধন বলিয়া সকলে উপহাস করে, সমাদর কিংবা অনুকম্পা প্রকাশ করে না; হে শিব, তুমি

[১] রামাই পণ্ডিত, শূন্য পুরাণ, চারু বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৩৩৬), ১৮২-৮৫

[২] বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩১৬), ৫১৪-১৫

আকন্দ ও ধুতুরা ফুল পাইলে, হরি চাঁপা ফুল পাইল। হে হর, খট্টাঙ্গ কাটিয়া লাঙ্গল বানাও, ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া ফাল কর। হে হর, ভাল দেখিয়া (ধুরন্ধর) বৃষ লইয়া জুতিয়া দাও, তোমার জটায় যে গঙ্গার ধারা আছে তাহা দিয়া (ক্ষেতের) পাট কর। বিদ্যাপতি বলেন, শুন মহেশ্বর, এই জানিয়া তোমার সেবা করিলাম। এখানে (ইহলোকে) যাহা হইবার তাহা হউক, সেখানে (পরলোকে) শরণ দিও।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেই গাজন উৎসব প্রচলিত আছে, এই সকল বিভিন্ন অঞ্চলে শিব-বিষয়ক যে সকল গীত গাওয়া হয়, তাহা সকল সময়ে এক ও অভিন্ন নহে, প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই স্থানীয় প্রভাব ইহাদের মধ্যে অনুভব করা যায়। সুদূর বাখরগঞ্জ অঞ্চলে এই উপলক্ষে শিবের বিবাহ-বিষয়ক এই গীতটি গাওয়া হয়,—

শিব চইলাছেন বিয়ার বেশে নারদ বাজায় বীণা।
পাড়াপড়শী দেখতে এল বিয়ার কথা শুইনা॥
টিপ্ টিপ্ ডম্বুরা বাজে শিঙায় গুন্ গুন্ করে।
খৈস্যা পড়ল মৃগ চর্ম শিব ল্যাংটা লইয়া নাচে॥
মেনকা সুন্দরী এল জামাই দেখিবারে।
পাগলা জামাই দেখ্যা সবে আউয়া ছিয়া করে॥
কিবা আকৃতি জামাইর কিবা জামাইর রূপ।
জুইটা চক্ষু ফুটা রইছে পঞ্চখানি মুখ॥
না দিব গৌরারে বিয়া কার বা বাপের ডর।
ডঙ্কা মাইরা পাগল জামাই বাড়ীর বাইর কর॥[১]

এই সম্পর্কে শিবের বিবাহে এয়োগণের গীত, শিব-পূজার জন্য পুষ্প-চয়নের গীত, ভগবতীর শঙ্খ-পরিধান বিষয়ক গীত ও শিব-সম্পর্কে আরও বহুবিধ গীত গাওয়া হয়। ভগবতীর শঙ্খ-পরিধানের কাহিনীটি বাংলার সর্বত্র প্রচলিত। পূর্বে রংপুর জিলার কৃষকদিগের মধ্যে ইহা যে ভাবে প্রচলিত আছে, তাহা উল্লেখ করিয়াছি; তাহার সঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত বরিশাল অঞ্চলে প্রচলিত গীতটি তুলনা করিয়া দেখা যাইতে পারে,—

শঙ্খ পরিতে গৌরাইর মনে বড় সাধ।
করযোড়ে কন কথা শিবের সাক্ষাৎ॥

---

[১] ব-সা-প ১, ১৬০

বৃদ্ধ হইয়াছি গৌরাই কখন যেন মরি।
কিসের লাইগ্যা কর বেশ দরবার-সুন্দরী॥
কুচনী নগরে আছে তোমার বাপ ভাই।
সেইখানে যাইয়া পর শঙ্খ আমার কিছু নাই॥
বৃদ্ধ হইয়াছি গৌরাই আমি লড়ি করি ভর।
ভিক্ষা মাগি যাই আমি দেশ দূরান্তর॥
নারদ বলে মামা আমার কথা রাখ।
যৌবন কালে স্ত্রীলোক নাইওর পাঠাও কেন॥
শিব বলে শুন ভাইগ্‌না আমার কথা রাখ।
শঙ্খ বণিক হইনা গৌরাইর মন বুঝিতে যাও॥

উপরি-উদ্ধৃত শিব-বিষয়ক এই সকল বিচ্ছিন্ন ছড়া ও গীতিকা ব্যতীতও অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যেরই সূচনায় সূত্রবদ্ধ শিব-কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যাইবে। শিব-সম্পর্কিত ছড়া ও বিবিধ লোক-গীতিকা হইতে প্রধানতঃ উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত পৌরাণিক উপাদান মিশ্রিত করিয়া অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে বিভিন্ন বিষয়ক মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এই প্রকার শিব-কাহিনী সংকলিত হইয়াছিল। শৈবধর্মের ধ্বংসস্তূপের উপর যেমন পরবর্তী লৌকিক ধর্মের দেউল গড়িয়া উঠিতেছিল, তেমনই শিব-কাহিনীর উপরই সেই সকল লৌকিক দেবতার কাহিনীমূল প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। কেবল লৌকিক দেবতার কাহিনীমূলেই যে শিব-কাহিনী বর্ণিত হইত, তাহা নহে—সমাজে এই শিব-গীতিকার প্রভাব এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল যে, কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ-কাব্যের মূল কাহিনীর সঙ্গে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে আনিয়া শিব-কাহিনী যুক্ত করা হইয়াছে। তৎকালীন বাংলার সমাজে একমাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত দেবতাই ছিলেন শিব, সেইজন্য লৌকিক দেবতাগণও সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া শিবের সঙ্গে একটা সম্পর্কের কল্পনা করিয়া লইতেন।

তথাপি আনুপূর্বিক শিব-কাহিনী লইয়া অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে কয়েকখানি শিব-মঙ্গল কাব্যও রচিত হইয়াছিল। এখন তাহাদেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

শিব-মঙ্গল কাব্য

পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদান মিশ্রিত করিয়া শিব-মঙ্গল কাব্যগুলিতে যে কাহিনীটি সাধারণতঃ পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহা এইরূপ ;—একদিন সমবেত দেবতাদিগের সভায় শিব তাঁহার শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতিকে কোন সম্মান দেখাইলেন না ; এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন, তাহাতে সকল দেবতা নিমন্ত্রিত হইলেন, দক্ষ কেবলমাত্র শিবকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। পিতৃগৃহে যজ্ঞের কথা শুনিয়া সতী বিনা নিমন্ত্রণেই সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দক্ষ তাঁহার সম্মুখে শিবের নিন্দা করিতে লাগিলেন, শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিলেন ; শিব একথা শুনিতে পাইয়া যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার অনুচরগণ যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া দিল।

সতী গিরিরাজের ঔরসে মেনকার গর্ভে গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। আশৈশব তিনি শিবকে পতিরূপে কামনা করিতে লাগিলেন। গিরিরাজ ভিক্ষুক শিবের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলেন। প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গৌরী স্বামীর সঙ্গে কুটীরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু দিন আর কাটে না ; ভিক্ষুকের ঘরের সম্বল ফুরাইয়া আসিয়াছে, নিশ্চিত অনাহার সম্মুখে। গৌরী শিবকে চাষ করিবার যুক্তি দিলেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত অলস প্রকৃতির ; সেইজন্য এই পরিশ্রমের কার্যে কোন উৎসাহ দেখাইলেন না। তিনি বলিলেন, চাষের ফল অনিশ্চিত। তিনি ব্যবসা করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার পুঁজি কোথায় ?

অগত্যা স্থির হইল তিনি চাষই করিবেন। ইন্দ্রের নিকট হইতে তিনি ভূমি পাট্টা লইলেন ; বিশ্বকর্মার হাতে ত্রিশূলটি দিয়া বলিলেন, 'ইহার-লোহা গালাইয়া লাঙ্গল, জোয়াল, মই গড়িয়া দাও।' বিশ্বকর্মা ত্রিশূল গালাইয়া চাষের সকল সরঞ্জাম গড়িয়া দিলেন। এ'বার বীজ ধান কোথায় পাওয়া যাইবে ? শিব গৌরীকে বলিলেন, 'কুবেরের কাছে যাও, গিয়া বীজ ধান ধার কর, ধান ঘরে উঠিলে শোধ দিব, বলিও।' গৌরী নিজে যাইতে অস্বীকার করিলেন, অগত্যা শিব নিজেই কুবেরের নিকট হইতে বীজ ধান ধার করিয়া আনিলেন।

মাঘ মাসের শেষের দিকে খুব বৃষ্টি হইল। অনুচর ভীমকে লইয়া শিব জমি চাষ করিলেন, যথাসময়ে ধান রোপণ করা হইল, প্রচুর ধান হইল; নারদের নিকট হইতে ঢেঁকিটি ধার করিয়া আনিয়া ভীম ধান ভানিল, গৌরীর সংসারে আর অভাব রহিল না। কিন্তু শিব মর্ত্যলোকে গিয়া চাষে এমন মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, আর কৈলাসে ফিরিবার নামও করেন না। এদিকে মর্ত্যলোকে তাঁহার কতকগুলি কুচনী সঙ্গিনী জুটিয়াছে। গৌরী তাঁহাকে কৈলাসে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। কিন্তু উপায়? উড়ানি মশা দিয়া পার্বতী মর্ত্যলোক ছাইয়া ফেলিলেন, মশার কামড়ে শিব অস্থির হইয়া পড়িলেন, তথাপি কৈলাসে ফিরিবার মন নাই; পার্বতী এ'বার ডাঁশ ও মাছি পাঠাইলেন; সর্বাঙ্গে ঘৃত মাখিয়া শিব তাহাদের কামড় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন; তারপর জেঁাকের উপদ্রব আরম্ভ হইল; তথাপি শিব পার্বতীর প্রতি উদাসীন, কৃষিকার্যে মত্ত হইয়া আছেন।

অবশেষে পার্বতী বাগ্দিনীর রূপ ধারণ করিয়া শিবের কৃষিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শিবের ক্ষেতে তিনি মাছ ধরিতে লাগিলেন; তাহাতে ছড়া হইতে ধান ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তথাপি বাগ্দিনীকে শিব কিছু বলিলেন না; বরং তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন; বিবাহ করিলে তিনি ক্ষেতের জল সেচিয়া বাগ্দিনীকে মাছ ধরিতে সাহায্য করিবেন। শিব বাগ্দিনীকে খুসী করিবার জন্য ক্ষেতের জল সেচিয়া মাছ ধরিতে লাগিলেন। বাগ্দিনী শিবের নিকট হইতে একটি পিতলের অঙ্গুরী চাহিয়া লইলেন। শিব এইবার বাগ্দিনীর নিকট আলিঙ্গন প্রার্থনা করিলেন; আলিঙ্গন দিবার ছলনা করিয়া বাগ্দিনী কৈলাসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, শিব তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন; বাগ্দিনী পার্বতীর রূপ ধারণ করিয়া কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পার্বতী শিবকে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন; কারণ, তিনি বাগ্দিনীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে অঙ্গুরী উপহার দিয়াছেন; শিব অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পার্বতী তাঁহার কাছে স্বামীর ব্যভিচারের কথা জানাইলেন। ঝগড়া আরও পাকা করিবার জন্য নারদ পার্বতীকে পরামর্শ দিলেন, 'স্বামীর কাছে এক জোড়া শাঁখা চাও, শাঁখা পরিলে স্বামী চিরদিন বশ থাকিবে।' পার্বতী শিবের নিকট শাঁখা পরিবার অভিলাষ জানাইলেন। কিন্তু শিব ভিক্ষুক, তিনি স্ত্রীর শাঁখা

কি করিয়া জোগাইবেন ? এক বিপদের উপর আর এক বিপদ দেখা দিল। তিনি ভাবিয়া কোন কূল পাইলেন না।

অভিমানে পার্বতী পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন। পিতৃগৃহে তখন দুর্গোৎসব। নারদ শিবকে পরামর্শ দিলেন, 'পার্বতীকে যদি ফিরাইয়া আনিতে চাও তবে শাঁখারী সাজিয়া হিমালয়ে যাও, নিজে তাঁহার হাতে শাঁখা পরাইয়া তাঁহাকে ঘরে লইয়া আস।'

শিব অগত্যা তাহাই করিলেন, শাঁখারীর বেশ ধরিয়া তিনি হিমালয় যাত্রা করিলেন। শাঁখা দেখিয়া পার্বতীর আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। শাঁখার মূল্য জিজ্ঞাসা করায় শিব বলিলেন, 'ইহার মূল্য আত্মসমর্পণ।' পার্বতী শিবকে চিনিলেন ; তিনি দশ হাত বাড়াইয়া দিলেন, শিব নিজের হাতে তাহাতে শাঁখা পরাইয়া দিলেন। পার্বতীর অভিমান দূর হইল। তাঁহারা কৈলাসে ফিরিয়া আসিলেন।

উল্লিখিত কাহিনী হইতে একটি বিষয় সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, ইহার মধ্যে চরিত্র- ও ঘটনা-গত ঐক্য বড় নাই। ফলে ইহার প্রধান চরিত্রগুলি বর্ণিত ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। নগাধিরাজ হিমালয়ের জামাতা ত্রিলোকেশ্বর শিব বিবাহের অব্যবহিত পরই এমন অন্নকষ্টে পড়িলেন যে তাহা দূর করিবার জন্য তাঁহাকে স্বয়ং কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল। কৃষিকার্য করিতে করিতেই তিনি কুচনী সঙ্গিনীদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতে লাগিলেন। তারপর একদিন এক বাগ্দিনীকে দেখিয়া তাহারই প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে একদিন শিব শাঁখারী সাজিয়া শাঁখা বিক্রয় করিতে চলিলেন। বলা বাহুল্য, এই সকল ঘটনা পরস্পর সামঞ্জস্যহীন, সেইজন্য ইহা হইতে শিবের চরিত্রগত ঐক্যের সন্ধান দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। শিব চরিত্রের এই স্বতন্ত্র গুণগুলির উদ্ভবের ইতিহাসও যে স্বতন্ত্র তাহাও সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বাংলার বিভিন্ন লৌকিক সংস্কার হইতে বিভিন্ন-কালে পরস্পর স্বাধীনভাবে বিভিন্ন স্থানীয় (local) দেবতার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। পরবর্তী কালে যখন এ'দেশের বিভিন্নমুখী লৌকিক ধর্মসংস্কারগুলি এক হিন্দুধর্মের বিরাট পক্ষচ্ছায়ায় আসিয়া সমবেত হইল, তখনই পৌরাণিক ও এই সকল লৌকিক বিভিন্ন দেব-কল্পনার মধ্যে একটা ঐক্যের সন্ধান করিয়া লইবার প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, তাহারই ফলে পৌরাণিক শিব, কৃষক, লম্পট, শাঁখারী এই সকল বিভিন্ন গুণের

সহিত সংমিশ্রণ লাভ করিলেন। এই সকল স্বতন্ত্র উপকরণের একত্র সংমিশ্রণের ফলে বাংলা শৈব সাহিত্য একটি নিজস্ব সুসমঞ্জস সাহিত্য-বস্তুতে পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদা-মঙ্গলে'র প্রথম খণ্ডেও এইজন্যই চরিত্র-সৃষ্টির সম্পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহোদয় শিবমঙ্গলকাব্যের কাহিনীগত অসংলগ্নতার রহস্য সন্ধান করিতে না পারিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, শিবচরিত্রের পুরাণ-বহির্ভূত অংশ 'কবির স্বকপোলকল্পিত'। অবশ্য তাঁহার সময় উপরি-উদ্ধৃত বিচ্ছিন্ন শিব-গীতিকাগুলি আবিষ্কৃত হয় নাই, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, শিব-সম্পর্কিত এই সকল পুরাণ-বহির্ভূত কাহিনী বহুকাল হইতেই এদেশের সমাজে প্রচলিত ছিল; শিবমঙ্গলকাব্যগুলিতে তাহাই উপজীব্য করা হইয়াছে।

উদ্ধৃত শিব-কাহিনীর মধ্যে যে দুইটি স্থূল পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা পৌরাণিক ও লৌকিক। প্রাচীন শিব-গীতিকার মধ্যে পৌরাণিক অংশ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল। কিন্তু মঙ্গলকাব্য রচনার যুগে তাহাই প্রাধান্য লাভ করিল।

শিব-মঙ্গলের কবিগণ

রামকৃষ্ণ রায়

খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামকৃষ্ণ রায় শিব-বিষয়ক বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান অবলম্বন করিয়া তাঁহার সুবৃহৎ শিব-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন।[১] এ পর্যন্ত অনুসন্ধানের ফলে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাই সর্বপ্রথম সুসংবদ্ধ শিব-মঙ্গল কাব্য—ইহার বহু পূর্ব হইতেই মঙ্গল-কাব্যের একটি বিশিষ্ট ধারার উদ্ভব হইয়া ইতিমধ্যেই একটি সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করা সত্ত্বেও, শিব-বিষয়ক কোনও কাহিনী লইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনও শিব-মঙ্গল কাব্য ইতিপূর্বে রচিত হয় নাই। ইহাকে শিব-বিষয়ক একটি কোষ-গ্রন্থ (encyclo-paedia) বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে শিব-প্রসঙ্গের এমন সুনিপুণ সংকলন বাংলা সাহিত্যে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যখানির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। রামকৃষ্ণ তাঁহার কাব্যকে সর্বত্র 'শিবায়ন' অথবা 'শিবের মঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং মঙ্গলকাব্য রচনার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্বপ্নাদেশে যে তাঁহার কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাও এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,

'ভারতী দিলেন উক্তি নহে মোর নিজ শক্তি
স্বপ্নের ইঙ্গিত অনুগ্রহ।'

কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে এইভাবে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন,

'পিতামহ রায় যশশ্চন্দ্র মহামতি।
তাঁর পদাম্বুজে মোর অশেষ প্রণতি॥
পিতামহী বন্দিলাঙ নাম নারায়ণী।
সরস্বতী বন্দিলাঙ তাঁহার সতিনী॥
মাতামহ বন্দিলাম নাম সূর্য মিত্র।
তেরজ কুলীন তিঁহো পবিত্র চরিত্র॥
পিতা কৃষ্ণরায় বন্দো সর্বশাস্ত্রে ধীর।
যাহার প্রসাদে এই মনুষ্য শরীর॥

[১] 'শিবায়ন', রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রচিত, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, প্রকাশিত ১৩৬৩।

মাতা রাধাদাসীর চরণে দণ্ডবৎ।
যাঁর গর্ভবাস হইতে দেখিল জগৎ॥
কায়স্থ দক্ষিণ রাঢ়ি বংশেতে উৎপত্তি।
গোত্র কাশ্যপ আমার দেবতা প্রকৃতি॥
মিরাস বন্দিনু বাস্তু রসপুর দেশ।
এতদূরে ভাইরে বন্দনা হৈল শেষ॥
রামকৃষ্ণ দাস গান শিবের মঙ্গল।
ভক্তজনে প্রভু তুমি করিবে কুশল॥

রামকৃষ্ণের 'মিরাস' বাস্তু রসপুর গ্রাম হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতা থানার অধীন; ইহা আমতা হইতে মাত্র তিন মাইল উত্তরে দামোদর নদের তীরে অবস্থিত। কবির বংশধরগণ আজও সেই গ্রামে বসবাস করিতেছেন। কবির পিতামহ যশশ্চন্দ্র পাঠান আমলে মুসলমান নবাব প্রদত্ত রায় পদবী লাভ করেন, তিনি উচ্চ সামাজিক মর্যাদারও অধিকারী ছিলেন। এই বংশের আভিজাত্যের ধারা আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কবি রামকৃষ্ণ তাঁহার নিজের পিতাকে 'সর্বশাস্ত্রে ধীর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শিব-মঙ্গল কাব্য রচনায় রামকৃষ্ণ যে বিস্তৃত শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত শিক্ষার ফল বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। বিষয়-বৈভবের সঙ্গে সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞানের যোগাযোগ সর্বত্র সুলভ নহে—পিতাপুত্র উভয়েই এই দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন।

কাব্য রচনা কালে রামকৃষ্ণের যৌবন অতীত হয় নাই বলিয়া মনে হয়; কারণ, অন্যান্য পারিবারিক তথ্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, কবির দুই পত্নী ছিল এবং তাহাতে সাত পুত্রের জন্ম হয়। কিন্তু তিনি তাঁহার গ্রন্থমধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র জগন্নাথ ও দ্বিতীয় পুত্র বলরামের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, আর কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতেই মনে হয়, তাঁহার আর কোনও পুত্রের তখনও জন্ম হয় নাই। যৌবনেই রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র উপাধি লাভ করিয়াছিলেন; কারণ, তিনি তাঁহার শিব-মঙ্গল কাব্যের প্রথম হইতেই প্রায় সর্বত্র ভণিতায় নিজের নামের পরিবর্তে এই উপাধিও ব্যবহার করিয়াছেন। মনে হয়, তিনি যৌবনের আরম্ভ হইতেই কবিযশ লাভ করিয়াছিলেন এবং কবিচন্দ্র উপাধি লাভ করিবার পরই শিব-মঙ্গল কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন—এই কাব্য রচনা করিয়া যে তিনি এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। কবির বংশধরদিগের গৃহে রক্ষিত এই কাব্যের পুঁথিতে

তাঁহার ভণিতায় একটি মালসী গান পাওয়া গিয়াছে। হয়ত এই শ্রেণীর বিচ্ছিন্ন ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। এই ভক্তিমূলক সঙ্গীতগুলিও যে তাঁহার যৌবনেরই রচনা, তাহাও সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন, চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' তাঁহার যৌবনের রচনা এবং পদাবলী তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদেরও 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' তাঁহার যৌবনের রচনা, 'শাক্ত পদাবলী' তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা। সেইজন্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং 'বিদ্যাসুন্দর কাব্যে'র মধ্যে লালসার উদ্দাম নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রামকৃষ্ণের রচনা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যৌবনের রচনা হইলেই যে তাহাতে লালসার স্পর্শ থাকিবে, তাহা নহে—কারণ, রামকৃষ্ণের উক্ত মালসী গানটি যেমন ভক্তিচন্দনের নির্মল সুরভিতে পবিত্র, তাঁহার আনুপূর্বিক শিব-মঙ্গল কাব্যও তেমনই মঙ্গলকাব্যোচিত রুচিবোধ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। রুচির দিক দিয়া সংস্কৃত শিব-বিষয়ক পুরাণগুলিই সর্বাধিক কুরুচির পরিচায়ক। সেই পুরাণগুলি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কাব্য রচনা করা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ কোন দিক দিয়াই তাঁহার কাব্যের মধ্যে কুরুচির প্রশ্রয় দেন নাই, ইহা রামকৃষ্ণের উচ্চ নীতি-বোধের ফল। এই নীতিবোধ তাঁহার ব্যক্তিগত গুণ ছিল, সমগ্রভাবে সে যুগের সমাজগত গুণ ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। বৈষ্ণব ধর্মের উচ্চ নৈতিক আদর্শ তাঁহার জীবনে কার্যকরী হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার উচ্চ নীতিবোধ জন্মিয়াছিল। তিনি শিব-মঙ্গল কাব্য রচনা করিলেও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; কারণ, তিনি তাঁহার কাব্যে চৈতন্য-নিত্যানন্দের শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের সর্বত্র ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও গুরুর প্রতি সশ্রদ্ধ উল্লেখ রহিয়াছে। এই বিনয়-গুণ বৈষ্ণবধর্ম-সুলভ বলিয়া সহজেই অনুভব করা যায়। চৈতন্য-ধর্মের প্রভাবের ফলে ধর্মসমন্বয়ের যে উদার আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, রামকৃষ্ণের কাব্যের মধ্যে তাহার সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের শৈবধর্মের প্রধান নীতি এই ছিল যে, 'যে-হাতে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি। সে'হাতে পূজিব পুনি চেঙ্গমুড়ি কাণী?' অর্থাৎ পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যে শৈবধর্ম সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়িকতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছিল—শিবকে বাদ দিয়া সেখানে অন্য কোন দেবতাকে স্বীকার করা হয় নাই; কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ইহাদের মধ্য হইতে সাম্প্রদায়িকতার এই সঙ্কীর্ণতাবোধ দূর হইয়া গিয়াছিল; রামকৃষ্ণের কাব্যের মধ্যে তাহার প্রথম ও সার্থক অভিব্যক্তি দেখা

গিয়াছে। 'রাম বল রে ভাই শিব বল', 'ভাই, বল হরি হরি, অপার সংসার-সিন্ধু রামনামে তরি'—রামকৃষ্ণ তাঁহার শিবমঙ্গল কাব্যের সর্বত্রই এই প্রকার ধূয়া বা ঘোযা ব্যবহার করিযাছেন। এতদ্ব্যতীত শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে কোথাও বিষ্ণু কিংবা শক্তিকে খর্ব করেন নাই। এই ধারাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের ভিতর দিযা গিয়া অগ্রসর হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনায় পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। রামেশ্বরের কাব্য এইভাবে বাংলার আধ্যাত্মিক সাধনার ক্রমবিকাশের ধারায় নিজের যোগ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ হিন্দুশাস্ত্রে বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন,

শুনিল দর্শন ছয় বেদ শাস্ত্রে যত কয়
অষ্টাদশ পুরাণ ভারত।

তিনি 'কাশীখণ্ড', 'হরি-বংশ', 'কালিকা-পুরাণ', 'বৃহন্নারদীয়', 'শান্তি পর্ব', 'স্কন্দ পুরাণ' প্রভৃতি পুরাণ হইতে বিবিধ শিব-প্রসঙ্গ সংকলন করিয়া তাঁহার শিবমঙ্গল-কাব্যের ভিতর দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন; কোথাও পৌরাণিক কাহিনীর ব্যতিক্রম করিয়া চিরাচরিত সংস্কারের মূলে তিনি আঘাত করেন নাই। তবে এই সকল পুরাণ হইতে তিনি নির্বিচারে যে শিব-প্রসঙ্গ সংগ্রহ করিযাছেন, তাহা নহে—এই কার্যে তাঁহার একটি উচ্চ নীতি-বোধ অত্যন্ত সজাগ ছিল, এই নীতিবোধ দ্বারাই তাঁহার কাহিনী নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এমন ব্যাপক শাস্ত্রজ্ঞান রামকৃষ্ণ কোথা হইতে লাভ করিয়াছিলেন? গুরু-বন্দনায় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,

'তবে ত বন্দিনু নিজ গুরুর চরণ।
ইহকালে পরকালে যাহার শরণ॥
গৌর শরীর তাঁর শুক্ল উপবীত।
শুক্ল বস্ত্র পরিধান পরম পণ্ডিত॥
প্রফুল্ল কমল মুখ কথা সুধাবৃষ্টি।
যাঁহার প্রসাদে মোর হৈল জ্ঞানদৃষ্টি॥'

অতএব মনে হইতে পারে যে, তিনি তাঁহার গুরুর নিকট হইতেই এই বিপুল শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু মনে হয়, এই বিষয়ে তিনি তাঁহার

সভাপণ্ডিতের নিকটও সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কাব্যে তাঁহার সম্বন্ধেও উল্লেখ করিয়াছেন—

'সভাসদ পণ্ডিতেরে আমার ভকতি।'
'কৃপা কর প্রভু এই সভার পণ্ডিতে।'

সভাপণ্ডিতের দ্বারাই সেকালে বাংলার সর্বত্র শাস্ত্রানুশীলনের ব্যবস্থা হইত। গুরুর নিকট হইতে উচ্চ জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া রামকৃষ্ণ নিজ সভাপণ্ডিতের মুখ হইতে বিস্তৃত শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

১৬৮৪ খৃস্টাব্দে কবি রামকৃষ্ণ পরলোক গমন করেন। কিন্তু এই নিষ্ঠাবান জ্ঞানতপস্বীর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত একটি মর্মান্তিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে। বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম ১৬৮৪ খৃস্টাব্দে রসপুর কবির বাটী আক্রমণ করেন। পারিবারিক দেব-বিগ্রহ অধিকার করাই সেকালে বিজয়ের নিদর্শন রূপে গণ্য হইত। বিজয়ী বর্ধমানরাজের লোকজন রামকৃষ্ণের পারিবারিক রাধাকান্ত ঠাকুরের বিগ্রহ অধিকার করিয়া লইল; তিনি ঘুঁটের গাদায় বিগ্রহটি গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানেও তাহা রক্ষা পাইল না, বিগ্রহটি বর্ধমানে নীত হইল। এই ঘটনায় মর্মাহত হইয়া বৃদ্ধ কবি প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার প্রায় ৯০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। কবির আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্বেই তাঁহার পুত্রগণ 'ধরা গলায়' বর্ধমান রাজসরকারে উপস্থিত হইয়া নূতন বিগ্রহ প্রকাশের অনুমতি ও তাহার দেবোত্তর সম্পত্তির সনদ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সকল ঘটনা-সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি কবির বংশধরদিগের গৃহে রক্ষিত আছে। এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কবি রামকৃষ্ণের ব্যাপক সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল; সেইজন্যই তাঁহার কুল-বিগ্রহ অধিকার করিয়া বর্ধমানরাজ গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছিলেন। রাজতুল্য ঐশ্বর্য-ভোগের মধ্যেই কবি রামকৃষ্ণের জ্ঞানতপস্যা এবং কবিত্বের সাধনা সার্থকতা লাভ করিয়াছিল।

রামকৃষ্ণের গ্রন্থরচনার কাল-সম্পর্কে যে সকল বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, আনুমানিক ১৫৯০-৯৫ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৬২৫ খৃস্টাব্দে বা ইহার দুই এক বৎসর পূর্বে বা পরে তাঁহার শিব-মঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত (১৩৬৩ সাল) রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন'

কাব্যে এই সিদ্ধান্ত-সম্পর্কিত বিস্তৃত অলোচনা স্থান পাইয়াছে (পৃ. ।।০-।।৶০), এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণের 'শিবায়ন' মোট ২৬টি পালায় বিভক্ত। চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলে পালা-বিভাগের যে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল, শিব-মঙ্গলের তেমন কিছু ছিল বলিয়া বোধ হয় না। রামকৃষ্ণের পালা-বিভাগ তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত। বিশেষতঃ এই ২৬টি পালার ভিতর দিয়া কাহিনীগত কোনও ঐক্যসূত্র নাই। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত শিব-মঙ্গলের মধ্যে কোনও কেন্দ্রীয় কাহিনী নাই। বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক শিব-প্রসঙ্গ একত্র গ্রথিত করিয়া শিব-মঙ্গল কাব্য রচিত হয়—সেইজন্য অধিকাংশ পালাই এখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাধীন ও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহা বিভিন্ন শিব-প্রসঙ্গের একটি সংকলন মাত্র—তবে এই সংকলনের পরিকল্পনায় শিব-কাহিনীর পারম্পর্য যে রক্ষিত হয় নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না—কিছুদূর পর্যন্ত পুরাণানুযায়ী ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করিবার পর ইহাতে কিছু কিছু লৌকিক উপাদানও অন্তর্নিবিষ্ট কবিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে পালা অনুযায়ী ইহার একটি সংক্ষিপ্ত সূচী দেওয়া হইল।

প্রথম পালা—বন্দনা ও সৃষ্টি-বর্ণনা; দ্বিতীয় পালায় শিবের জন্ম হইতে শিবের বিবাহ; তৃতীয় পালায় ব্রহ্মাবিষ্ণুর বিবাদ, কালভৈরব প্রসঙ্গ, কাশীমাহাত্ম্য বর্ণনা; চতুর্থ পালায় দক্ষযজ্ঞ উপাখ্যান; পঞ্চম পালায় সতীর দেহত্যাগ, দক্ষের পরিণাম; ষষ্ঠ পালায় ময়তারকোপাখ্যান, গৌরীর জন্ম; অষ্টম পালায় গৌরীর তপস্যা, শিবের পরীক্ষা; নবম পালায় শিবের উদ্যানে গৌরী, হরগৌরীর মিলন; দশম পালায় হিমালয়গৃহে শিব, একাদশ পালায় কুমারের জন্ম ও মহিষবধ; দ্বাদশ পালায় শিবের বিবাহ উদ্যোগ; ত্রয়োদশ পালায় শিব-বিবাহের অনুষ্ঠান, বৈদিক ও লৌকিক বিবাহাচার পালন; চতুর্দশ পালায় হরগৌরীর ফুলশয্যা, প্রহেলিকা, শিবের যোগসাধন; পঞ্চদশ পালায় পাশাখেলা, বিবিধ শিব-তত্ত্ব, কৈলাসযাত্রা; ষোড়শ পালায় মনসার উপাখ্যান; সপ্তদশ পালায় সমুদ্রমন্থন উপাখ্যান; অষ্টাদশ পালায় বলিরাজার উপাখ্যান; উনবিংশতি পালায় অগস্ত্য ও সগর রাজার উপাখ্যান; বিংশতি পালায় গঙ্গার উপাখ্যান; একবিংশতি পালায় ত্রিপুর ও তারকের উপাখ্যান; দ্বাবিংশতি পালায় দুর্গার কোন্দল; ত্রয়োবিংশতি পালায় অন্ধক উপাখ্যান; চতুর্বিংশতি পালায় অন্ধক বধ; পঞ্চবিংশতি পালায় পরশুরাম ও রাবণ উপাখ্যান; ষড়বিংশতি পালায় বাণ রাজার উপাখ্যান।

রামকৃষ্ণ রচিত শিব-মঙ্গল কাব্যের এই সংক্ষিপ্ত সূচী হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রথম হইতে পঞ্চদশ পালা পর্যন্ত কাহিনী একটি নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। ইহার পর হইতে প্রত্যেকটি পালা কাহিনীর মূল ধারার সঙ্গে কোন যোগ রক্ষা করিতে পারে নাই। এই সুদীর্ঘ কাব্যটিতে একমাত্র একটি পালা অর্থাৎ ষোড়শ পালাটি পুরাণবহির্ভূত লৌকিক উপকরণ দ্বারা রচিত। এমন কি, ইহারও শেষ অংশে মহাভারতের কিছু কাহিনী আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের শিব-মঙ্গল কাব্যের অন্যান্য লৌকিক বিষয়, যেমন, শিবের চাষ, মৎস্য ধরা, গৌরীর শঙ্খ পরা ইত্যাদি ইহার মধ্যে আদৌ নাই। অথচ শিব-সম্পর্কিত এই বিষয়গুলি যে অত্যন্ত প্রাচীন, তাহা 'শূন্যপুরাণ' ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত শিবের ছড়া হইতেও জানিতে পারা যায়। কিন্তু উক্ত লৌকিক পালাগুলি নিতান্ত গ্রাম্য রুচি ও দুর্নীতির পরিচায়ক বলিয়া কবি ইহাদিগকে তাঁহার রচনা হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্রত্যেক শিব-মঙ্গল কাব্যেরই যাহা প্রধান ত্রুটি, রামকৃষ্ণের কাব্যেরও তাহাই প্রধানতম ত্রুটি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়—তাহা কোন কেন্দ্রীয় কাহিনীর অভাব। এইজন্যই রামেশ্বরের রচনা আয়তনের দিক দিয়া বিপুল হওয়া সত্ত্বেও একটি সামগ্রিক কাব্যরূপ লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং ইহার মধ্যে কাহিনীর গুণাগুণ বিচার কিংবা চরিত্র বিশ্লেষণের বিস্তৃত কোনও অবকাশ নাই। তবে ইহার বিচ্ছিন্ন অংশের ভিতর দিয়া যে কবির কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

শিবের লৌকিক চরিত্রের উল্লেখ এই কাব্যে তত প্রাধান্য লাভ করিতে না পারিলেও, শিবের বিবাহ, হরগৌরীর কোন্দল প্রভৃতির বিষয় বর্ণনায় বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবন অপূর্ব বাস্তব রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গৌরীর বিবাহে শিবকে দেখিয়া এয়োগণ নিজেরা এই বলিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছে—

দোজ বর্যা বরে সই কিছু নহে হারা।
উর্দ্ধমুখে আছে চক্ষে দেখিবেক তারা॥
মোরা নাহি যাব কেহ বরের নিকট।
চৌদিকে চরায় চক্ষু চাহে কটমট॥
আইয় বলে হের দেখ নারদের নাট।
উঠানে দাণ্ডাল্য বর যেন ইন্দ্রকাঠ॥

বরিব বার্দ্ধক বর বল কোন সুখে।
সুতলি খুঁজিবে রাণী কোন কোন মুখে॥
কয় হাতে অঞ্জন পরাবে এক দিঠে।
হাত বাড়াইয়া পাব যদি উঠ উটে॥

হর-গৌরীর কোন্দলের বর্ণনায় নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের চিরন্তন দারিদ্র্যের চিত্রই অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটি আশাহতা দুঃখিনী পত্নীর মর্মান্তিক অন্তর্বেদনার কি অপূর্ব ব্যঙ্গচিত্র কবি এখানে রচনা করিয়াছেন,—

শয়নে তোমার পাশে নিদ্রা নাহি হয় ত্রাসে
জটায় জলের কুলকুলি।
সাপের ফোঁস ফাঁস শুনি সাত পাঁচ মনে গুণি
পালাইতে পরম আকুলি॥
হস্ত পদ যদি নাড়ি চামড়ার খড় খড়ি
শয্যে সাপ করে ইলিমিলি।
এমত সুখের শয্যা ইতে পতি পরিচর্য্যা
যদি করে নারী তারে বলি॥
ভোলানাথ, আমি যেই তেঁই সে সম্বরি।
অন্যে সহে হেন তাপ স্বামীরে বলিয়া বাপ
পলাইত হৈয়া দিগম্বরী॥
ধ্যানে যদি পাও সুখ ক্ষণপ্রায় যায় যুগ
বলদেরে না মিলে আহার।
জিয়ে পরমায় বলে ক্ষীরগুণে নাহি চলে
ভৃঙ্গি দেখ অস্থিচর্ম্ম সার॥
যাও যদি ভিক্ষাটন ঘর হয় পাশরণ
কোচের নগরে নাটগীত।
কোচিনী ভুলাও তালে নাগরালি বুড়াকালে
লোকমুখে শুনি বিপরীত॥

উদয় করিতে ভানু কার্তিক পাতিয়া জানু
খাইবারে চাহে ছয় মুখে।
গণেশ তুলিয়া শুণ্ড ধায় প্রসারিয়া তুণ্ড
নন্দি নিত্য আছে শোষে ভোখে॥

বড়াই না কর বালু পাঁচ বর্ণে আন চালু
পাঁচ মুঠা বাঁটিতে না আঁটে।
মায়ে পোয়ে ঝুলি ঝাড়ি পাই কড়া দশ কড়ি
সেহ কাণা নাহি চলে হাটে॥

দারিদ্র্য-পীড়িত সংসারের গৌরবহীন গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিষয়বুদ্ধিহীন স্বামী লইয়া এ'দেশের নারীগণ যে কি ভাবে সুখদুঃখের দিন যাপন করিয়া থাকে, রামকৃষ্ণের পার্বতী-চরিত্রেব ভিতর দিয়া তাহারই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। রামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বাস্তবতার স্পর্শ ছিল।

রামকৃষ্ণের ভাষা মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য-যুগের ভাষা, ইহা পূর্ববর্তী যুগের গ্রাম্যতা-মুক্ত হইয়া উচ্চতর কাব্য রচনার উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। রামকৃষ্ণের রচনায় বৈষ্ণব কবিতার ভাষার প্রভাবও যথেষ্ট অনুভব করা যায়। তিনি বিষয়োপযোগী করিয়া সুললিত ব্রজবুলি ভাষায়ও কতকগুলি পদ রচনা করিয়া তাঁহার কাব্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

ছন্দের মধ্যেও তাঁহার বৈচিত্র্যসৃষ্টির প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। দৃঢ়সংবদ্ধ বর্ণনাত্মক রচনার অবকাশেও তিনি মধ্যে মধ্যে এই প্রকার গীতিধর্মী সুললিত রচনার সন্নিবেশ করিয়াছেন ; মেনকা উমাকে তপস্যায় বিরত হইবার জন্য পরামর্শ দিতে গিয়া বলিতেছেন—

তনু তোর যেন কাঁচ লুনি।
রৌদ্রে মিলাবে হেন জানি॥
স্বভাবে তুমি সে কমলিনী।
হিমপাতে হারাবে পরাণি॥
তপেরে না যাইয় মা গ উমা।
গলায় বান্ধিয়া থাকো তোমা॥
আধ অষ্ট বৎসর বএসে।
বনে যাবে কেমন সাহসে॥

কি বুদ্ধি জন্মিল তোর বাপে।
কি লাগি পাঠায় তোমা তপে ॥
শিবের কঠিন বড় সেবা।
সেবাতে মানাতে পারে কেবা ॥
বর কি নাহিক ত্রিভুবনে।
তপস্যা করিবে কি কারণে ॥
বয়স দেখিয়া দিব বরে।
বসাইব অদরিদ্র ঘরে ॥

আরও একটি নিদর্শনের উল্লেখ করা যাইতেছে—

যত বিলাসিনী রচিল বেশ
বান্ধিল লোটন কুটিল কেশ
অলক তিলক অপরিশেস
চিত্র বসন ওড়নি।
কনক মুকুব বদন কাঁতি
বসন ভূষণ বিবিধ ভাতি
চলুনি বর বরটা পাতি
ভঙ্গিমা কর দোলনী ॥

ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল রচনার একশত বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে বাংলা সাহিত্যে এই কাব্যভাষার জন্ম বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। অবশ্য ইহার উপর বৈষ্ণব কবিতার ভাষার প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

কবি রামকৃষ্ণের রচনায় পরবর্তী শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবেব যে পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে, তাহা রামকৃষ্ণের নিম্নোদ্ধৃত রচনাংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যার রূপ বর্ণনার সঙ্গে রামকৃষ্ণের এই গৌরীর রূপ বর্ণনার তুলনা করা যাইতে পারে—

দেখিয়া কন্যার কেশ চমরী ছাড়িল দেশ
প্রবেশিল অরণ্য ভিতরে।
তাহাতে বিচিত্র বেণী দেখিয়া সঙ্কোচ ফণী
হস্ত পদ লুকাইল উদরে ॥

সিন্দুর তিলক ভালে যেন অবস্থিতা কালে
সীমন্তে না দেখি তার রেখা।
দেখিয়া উজ্জল বঙ্গ অরুণের উরুভঙ্গ
উড়িতে নাহিক আখা পাখা॥
অমরনাথ মালঞ্চে দেখিল কমলিনী।
কুন্দল কনক-কান্তি কুঙ্কুম কুসুম ভ্রান্তি
কি বর্ণিব সে বরবর্ণিনী।
ভ্রূযুগ কামান জনু অতনু লুকাইল ধনু
সম তাহে পাইয়া পরাভব।
নাসিকা গঠন দেখি লজ্জিত গরুড় পাখী
অভিমানে ভজিল মাধব॥
নেত্র দেখি ইন্দীবর প্রবেশিল সরোবর
কুরঙ্গিণী শৃঙ্গ নাহি বহে।
সফরী প্রবেশ জলে খঞ্জন উড়িয়া বুলে
কথো কাল নাহি দেশে রহে॥

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাব এই বর্ণনার মধ্যে কার্যকরী হইলেও ইহার ভাষায় যে পারিপাট্য দেখা দিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া মঙ্গলকাব্য সৃজনযুগ অতিক্রম করিয়া ঐশ্বর্যযুগে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এই কাব্যভাষার ধারা অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী শতাব্দীতে শব্দশিল্পী ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে।

খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের কোনও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আমরা এ পর্যন্ত লাভ করিতে পারি নাই বলিলেই চলে। দলিল কিংবা চিঠিপত্রে যে গদ্য ব্যবহৃত হইত, তাহা সাহিত্যিক ভাষার নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 'শূন্যপুরাণে'র মধ্যেও যে গদ্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও তত্ত্বমূলক ও ধর্মবিষয়ক; অতএব তাহাও সাহিত্যিক গদ্য নহে। সাহিত্যে গদ্য ব্যবহার করিবার রীতি তখনও প্রচলিত হয় নাই, অতএব সাহিত্যিক গদ্যের নিদর্শন কোথা হইতেও সন্ধান পাইবার কথাও নহে। কিন্তু রামকৃষ্ণের 'শিবায়নে'র মধ্যে মধ্যযুগের সাহিত্যিক গদ্যের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাদিগকে 'বচনিকা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পয়ার ও ত্রিপদীর অবকাশে মধ্যে মধ্যে গদ্যের সহায়তায় কোন কোন প্রসঙ্গের সূত্র নির্দেশ করা

হইয়াছে। গীত বন্ধ রাখিয়া গায়েন এই অংশ গদ্যে পরিবেশন করিত, ইহাকেই বচনিকা বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্য দিয়া প্রায়ই এক বা একাধিক পূর্ণবাক্য ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাই সে যুগের সাহিত্যিক গদ্যের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ইহাদের বিশেষ স্থান আছে বিবেচনা করিয়া ইহার সব কয়টি নিদর্শনই এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

১। ভাই রে নন্দি গিয়া শিবের সাক্ষাতে দুর্গার কেমত রূপ বলিতেছেন অবধান করহ ॥

২। মহিষ পর্বত গিয়া পূর্বকল্পেব কথা ক্রৌঞ্চকে কহিতেছেন অবধান করহ ॥

৩। ভাই রে নারদের পরিহাসে মেনকা রোদন করিতেছেন এমত সময়ে কেমন স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা সকল আসিতেছেন অবধান কবহ ॥

৪। অতঃপর তারা প্রভৃতি দেবতারা সকল শিবের তরে প্রহেলিকা প্রবন্ধে গৌরীকে সমর্পণ করিয়া কথোপ কাল পালন করি বা হবেক ইঙ্গিত করিতেছেন অবধান করহ ॥

৫। পার্বতী ভাগীরথী স্নান করিতে গেলেন এমত সময়ে শঙ্কর মনের দুঃখ নারদকে কহিতেছেন অবধান করহ ॥

শিবদুর্গার বিবাহানুষ্ঠান বর্ণনা-প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ নিজ পরিবারের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ-প্রথারই একটি বিস্তৃত ও বাস্তব বর্ণনা দিয়াছেন। নানাদিক হইতে এই বর্ণনাটি বিশেষ মূল্যবান। ইহার মধ্যে একটি অধুনা-বিলুপ্ত সামাজিক প্রথার উল্লেখ আছে, তাহা আর কোনও মঙ্গলকাব্যের বিবাহ-বর্ণনায় পাওয়া যায় না—ইহা বাসরে এয়োগণকর্তৃক বরকে প্রহেলিকা জিজ্ঞাসা। যদিও প্রহেলিকা মঙ্গল-কাব্যের একটি অপরিহার্য বিষয়, তথাপি বাসরগৃহে বরকে প্রহেলিকা জিজ্ঞাসা করিবার প্রসঙ্গ আর কোনও মঙ্গলকাব্যের কবি উল্লেখ করেন নাই। রামকৃষ্ণের এই প্রসঙ্গের উল্লেখ সুগভীর সামাজিক তাৎপর্যমূলক। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, বিবাহাচারে প্রহেলিকা জিজ্ঞাসা বাংলা ও বাংলার বাহিরে বিভিন্ন নিম্নজাতি ও উপজাতির সমাজে আজিও প্রচলিত আছে। ছোটনাগপুরের দ্রাবিড় ভাষাভাষী ওরাওঁ উপজাতির বিবাহ প্রথায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বরপক্ষ কন্যার গ্রামের সীমানায় প্রবেশ করিবার পূর্বে তাহাকে কন্যাপক্ষীয়দের কতকগুলি প্রহেলিকার উত্তর দিয়া লইতে হয়; পশ্চিমবঙ্গের বাউরীদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। বাংলার উচ্চশ্রেণীর বিবাহের লৌকিক আচারসমূহের ভিত্তি যে বাংলা ও বাংলার

প্রান্তবর্তী আদিম সমাজ, রামকৃষ্ণের এই প্রসঙ্গের অবতারণা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায়। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও কলিকাতার কোন কোন অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত সমাজের মধ্যেও বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয়দিগের মধ্যে ধাঁধার জিজ্ঞাসা ও উত্তর শুনিতে পাওয়া যাইত। অতএব রামকৃষ্ণের এই প্রসঙ্গের অবতারণা যে তাঁহার ব্যক্তিগত কৌতুকবোধের কোন ফল নহে,—বিস্তৃত সামাজিক অভিজ্ঞতারই পরিচায়ক, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বিষয়গত সমৃদ্ধি এবং উচ্চ সাহিত্যগুণ থাকা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণের শিব-মঙ্গল কাব্য যে বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়ে কোন নূতন ধারার প্রবর্তন করিতে পারে নাই, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার প্রধান কারণ, রামকৃষ্ণ আত্মকেন্দ্রিক সাধক ছিলেন—জ্ঞান-সাধনা কিংবা সাহিত্য-সাধনা এই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকা পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ব্যক্তিগত নীতি ও রুচিবোধের উপর নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার যে ব্যক্তিগত জীবনেতিহাস পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। তিনি অভিজাত বংশের সন্তান, তাঁহার নীতি ও রুচিবোধের মধ্যেও সেইজন্যই আভিজাত্যের পরিচয় গোপন থাকিতে পারে নাই। কিন্তু মঙ্গলকাব্য সাধারণ মানুষের জীবন-চিত্র—সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ আশা-নৈরাশ্য দ্বারা যেমন ইহা চিহ্নিত, তেমনই সাধারণ মানুষেরই নীতি ও রুচিবোধের অভিব্যক্তিতেই ইহা বাস্তব। অতএব যাঁহারা সাধারণ মানুষের জীবনবোধের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, তাঁহারা সার্থক মঙ্গলকাব্য রচনা করিতে পারেন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, রামকৃষ্ণ শিব-সম্পর্কিত সর্বাধিক জনপ্রিয় ও লৌকিক প্রসঙ্গ তাঁহার কাব্য হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহার পরিবর্তে ব্যক্তিগত জ্ঞান-লব্ধ ও রুচি-সম্মত বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়াই কাব্য রচনা করিয়াছেন—সেইজন্য তাঁহার কাব্য পরবর্তী কবিদিগের আদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্রের যাহা প্রধানতম বৈশিষ্ট্য, শিব-মঙ্গলের শিব-চরিত্রের মধ্যে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্র মাত্রই অত্যন্ত সক্রিয়, কিন্তু পৌরাণিক শিব-চরিত্র নিতান্ত নিষ্ক্রিয়, ভক্তের সুখদুঃখে নির্লিপ্ত ও উদাসীন। রামকৃষ্ণ এই পৌরাণিক শিবকেই তাঁহার কাব্যের আদর্শ করিয়া লইয়াছিলেন, বাংলার জলবায়ুতে তাঁহার চরিত্র স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লন নাই; সেইজন্যই ইহা বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। তারপর মঙ্গলকাব্যের

কাহিনীগত যে একটি আবেদন আছে, রামেশ্বরের শিব-মঙ্গলের তাহা নাই—কোন কেন্দ্রীয় কাহিনীর অভাবে ইহার গতি অত্যন্ত শিথিল ও মন্থর, সেইজন্য ইহার আয়তন ইহার ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। রামকৃষ্ণের পরবর্তী কালে যাঁহারা শিব-মঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার লৌকিক উপকরণগুলির বহুল সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, সেইজন্যই তাঁহাদের কাব্য যে পরিমাণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে, রামকৃষ্ণের কাব্য সেই তুলনায় তাহা কিছুই লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু রামকৃষ্ণের ভাষা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যভাষার ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

শঙ্কর কবিচন্দ্র

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একাধিক বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুর অঞ্চলের কবি শঙ্কর কবিচন্দ্র চক্রবর্তী অন্যতম। তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ ব্যতীতও দুইখানি মঙ্গলকাব্য ও একখানি পাঁচালী রচনা করিয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ অল্প কবিই রচনা করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার মঙ্গলকাব্য দুইখানির মধ্যে একখানি শিব-মঙ্গল ও আর একখানি শীতলা-মঙ্গল। শিব-মঙ্গল রচনায় তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কবি রামকৃষ্ণের পৌরাণিক ধারা অনুসরণ করিবার পরিবর্তে ইহার লৌকিক ধারাই অনুসরণ করিয়াছিলেন; সেইজন্যই তাঁহার কাব্য এই বিষয়ক তাঁহার পরবর্তী কবিদিগেরও পথ প্রদর্শন করিয়াছে।

শঙ্কর কবিচন্দ্র মল্লভূমির অধিপতি রাজা বীরসিংহের আমলে আনুমানিক ১৬৮০ খৃস্টাব্দে তাঁহার 'শিবমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। তিনি বিষ্ণুপুরের অনতিদূরবর্তী পানুয়া নামক গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের সময় নির্দিষ্ট-ভাবে জানিতে পারা না গেলেও তিনি যে খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি কবিচন্দ্র উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ভণিতায় নামের পরিবর্তে অনেক স্থলে এই উপাধিই ব্যবহার করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক জীবনেও তিনি উচ্চ মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন—বিবিধ প্রামাণ্য বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'শ্রীমদ্ভাগবতের' সার সংকলন করিয়া তিনি অনুবাদকাব্য রচনা করেন, তাহা 'ভাগবতামৃত' নামে বৈষ্ণব সমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হইত; এই সূত্রেই বৈষ্ণব সমাজে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আধুনিক কৃত্তিবাসী রামায়ণে অঙ্গদ রায়বার নামক যে অংশটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই কবিচন্দ্র শঙ্করেরই রচনা।

দ্বিজ শঙ্কর কবিচন্দ্র তাঁহার শিবমঙ্গল কাব্যমধ্যে এই প্রকার ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন,

১। বীরসিংহ মহারাজা অবনীতে মহাতেজা
সদা মতি ইষ্টের চরণে।
সংকীর্তন অভিলাষী তাহার দেশেতে বসি
দ্বিজ কবিচন্দ্রে রস ভণে॥

২। শিবের চরণ আশে শ্রীকবিচন্দ্র ভাসে
যারে কৃপা কৈল শূলপাণি।

৩। শ্রীকবিশঙ্কর গায় হরপদ আশে।
যারে কৃপা কৈলে প্রভু আসি যোগি বেশে॥

৪। সুকবি শঙ্কর গান ভাবি ত্রিলোচন।
হরি হরি বল পাপ হোক্ বিমোচন॥

৫। বাগ্দিনীর কথা শুনি প্রভু দিল সায়।
হরপদ আশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়॥

দ্বিজ শঙ্কর কবিচন্দ্রের শিব-মঙ্গল কাব্যে 'মৎস্য ধরা পালা' ও 'শঙ্খ পরা পালা' নামক যে দুইটি পরিচ্ছেদ আছে, তাহা এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য। উভয় অংশই পুরাণ-বহির্ভূত লৌকিক বিষয় মাত্র। কিন্তু তিনি তাহা নিজের কাব্যের মধ্যে গ্রহণ করিয়া ইহার একটি লৌকিক আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শিব-মঙ্গলের পরবর্তী কবিগণ তাঁহার এই ধারা অনুসরণ করিয়া বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার 'মৎস্য ধরা পালা'র বিষয়—শিব ভাগিনেয় ভীমকে সঙ্গে লইয়া মর্ত্যলোকে চাষ করিতে গিয়াছেন, আজ ছয়মাস যাবৎ তাঁহার কোন সংবাদ নাই। কৈলাসে পার্বতী আকুল হইয়া উঠিলেন; তারপর একদিন শিবকে স্বপ্নেও দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া তাঁহার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি মর্ত্যলোকে তাঁহার অনুসন্ধানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পদ্মার পরামর্শে তিনি বাগ্দিনীর রূপ ধারণ করিয়া মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইলেন; তারপর শিবের কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মাছ ধরিতে লাগিলেন। বাগ্দিনীকে দেখিয়া শিব মুগ্ধ হইলেন। তারপর বাগ্দিনী শিবকে ছলনা করিয়া কৈলাসে লইয়া আসিলেন। শঙ্খপরা পালার মধ্যে পার্বতীর শঙ্খ পরিবার সাধ ব্যক্ত হইয়াছে; এই সম্পর্কিত লৌকিক ছড়া পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।

কবিচন্দ্র শঙ্করের রচনা নিতান্ত সহজ ও সরল। বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন বিষয়েই তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য তাঁহার সহজ কবিত্ব বিকাশের পক্ষে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তাঁহার 'ভাগবতামৃতে'র ভিতর দিয়া যেমন তিনি 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র দুরূহ সংস্কৃত শ্লোকগুলি অতি সহজ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহার শিব-মঙ্গলের

মধ্যেও তিনি প্রচলিত গ্রাম্য শব্দ ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করিয়া তাঁহার রচনার সরলতা রক্ষা করিয়াছেন। শিব-মঙ্গলের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে—

> সাক্ষাতে হইলা মাতা বাগ্‌দিনী বেশ।
> সই সই বলি প্রভু হাসে ব্যোমকেশ॥
> বিরলে শিবের সঙ্গে বঞ্চিলেন নিশা।
> দেখিতে দেখিতে মূর্তি হইলা সুবেশা॥
> শ্রুতিমূলে পিঠে দোলে দুই কাণে সোনা
> কপালে সিন্দূর সাজে নাকে নাকচনা॥
> বাগ্‌দিনী বেশ করি উভ করি খোঁপা।
> ফুলমালা তাথে শোভে সুবর্ণের ঝাঁপা॥
> কান্ধেতে ঘুন্‌সিজাল ইসাদের বাড়ি।
> পরিপাটি কান্ধে সাজে মৎস্যের চুপুড়ি॥
> ঠমক করি দাণ্ডাইল শিব পড়ে ভোলে।
> সই সই বলি প্রভু করিলেন কোলে॥[১]

[১] সা-প-প ৬১, পৃ ৫০

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

শিব-কাহিনীর পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদান মিশ্রিত করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামেশ্বর চক্রবর্তী ভট্টাচার্য 'শিবায়ন' বা 'শিব-সংকীর্তন' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন।[১] শিব-মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে ইহাই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

রামেশ্বর তাঁহার রচিত কাব্যমধ্যে প্রাচীন রীতি অনুযায়ী এই ভাবে নিজের পরিচয় দিয়াছেন,—

ভট্ট নারায়ণ মুনি সন্তান কেশরকণী
যতি চক্রবর্তী নারায়ণ।
তস্য সুত কৃতকীর্তি গোবর্ধন চক্রবর্তী
তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ॥
তস্য সুত রামেশ্বর শম্ভুরাম সহোদর
সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী পতিব্রতা দুই নারী
অযোধ্যানগর নিকেতন॥
পূর্ব বাস যদুপুরে হেমংসিংহ ভাঙ্গে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকী তটে বরিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত॥

এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার কাব্যমধ্যে 'মেদিনীপুরাধিপতি' ও কর্ণগড়ের অধিবাসী রামসিংহের পুত্র যশোবন্ত সিংহের বিদ্যোৎসাহিতা ও শৌর্য-বীর্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। যশোবন্ত সিংহ রামেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যশোবন্তের আদেশেই কবি 'শিব-সঙ্কীর্তন' রচনা করেন।

রামেশ্বরের পূর্বনিবাস মেদিনীপুর জিলার মধ্যে ঘাটালের নিকটবর্তী বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রাম। হেমংসিংহ নামক কোন ব্যক্তি কর্তৃক তিনি সেই গ্রাম হইতে কোন কারণে বিতাড়িত হইয়া সেই জেলারই অন্তর্গত কর্ণগড় নামক

---

১ রামেশ্বর ভট্টাচার্য, শিবায়ন (বঙ্গবাসী, ১৩১০)

স্থানের তৎকালীন রাজা রামসিংহের আশ্রয়ে চলিয়া আসেন। অল্পকাল মধ্যেই রামসিংহ পরলোক গমন করেন, তখন যশোবন্ত সিংহ রাজা হন। বিদ্যোৎসাহী রাজা যশোবন্ত সিংহ রামেশ্বরকে শিবসংকীর্তন কাব্য রচনায় নিয়োজিত করেন। রামেশ্বর একখানি 'সত্যপীরের পাঁচালী'ও রচনা করিয়াছিলেন। যদুপুরে বাসকালীনই ইহা রচিত হয় বলিয়া জানিতে পারা যায়।

'শিব-সঙ্কীর্তন' রচনার কাল সম্বন্ধে কবি যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, পাঠ-দুষ্টির জন্য তাহার অর্থ উদ্ধার করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে ; তাহা এই,

'শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেইকালে শিবের সঙ্গীত হইল সারা।'

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন. 'রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নের ১৭৬৩ খৃস্টাব্দে লিখিত একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং শিবায়ন ঐ সময়ের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল'।[১]

কবির প্রতিপালক রাজা যশোবন্ত সিংহের সময় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ১৬৫৬ শকে বা ১৭৩৪ খৃস্টাব্দে ঢাকার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় যান।[২] এই দেওয়ানি গ্রহণের পূর্বে যশোবন্ত সিংহ মুর্শীদকুলি খাঁর অধীনে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি সহ চাকুরি করিতেন। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, মুর্শীদকুলি খাঁর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিবার পূর্বেই তাঁহার নিজ জমিদারী মেদিনীপুর বাসকালে 'শিব-সংকীর্তন' গ্রন্থ রচিত হয়। তাহা হইলে ১৬৫৬ শকের ১৫।২০ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচিত হওয়ার সম্ভাবনা। রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্তন গ্রন্থ যখন প্রায় ৮৩ বৎসর পূর্বে ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়, তখন উপরি-উদ্ধৃত পদগুলির নিম্নে তাহাদের টীকা-স্বরূপ ১৬৩৪ শকাব্দের উল্লেখ করা হইয়াছিল। অবশ্য উদ্ধৃত পদ-সমষ্টি হইতে এই কাল কি ভাবে নির্ণয় করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তবে তিরাশী বৎসর পূর্বে গ্রন্থ-সম্পাদক গ্রন্থ রচনার কাল সম্বন্ধে যে সময়ের নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি সম্ভবতঃ কোন অনুসন্ধানের ফলেই জানিতে পারিয়াছিলেন। এই ১৬৩৪ শকাব্দের সঙ্গে রাজা

---

[১] দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৩৩৪), ৬৯৩

[২] রামগতি ন্যায়রত্ন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৩৪২), ১৩০ ; কিন্তু এই তারিখ কোথা হইতে জানিতে পারা গেল, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

যশোবন্তের মেদিনীপুর বাসের পূর্বোক্ত আনুমানিক সময় তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই সময়ই অর্থাৎ ১৬৩৪ শকাব্দ (১৭১২ খৃস্টাব্দ) কিংবা তাহার সন্নিকটবর্তী কোন সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব নহে।

যশোবন্তের রাজধানী কর্ণগড় মেদিনীপুর সহর হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্তী। এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, এইখানে যশোবন্ত-প্রতিষ্ঠিত মহামায়ার মন্দির ছিল, তাহাতেই কবি রামেশ্বর যোগাসনে বসিয়া শিবমন্ত্র জপ করিতেন।

রামেশ্বরের কাব্যের প্রকৃত নাম 'শিব-সঙ্কীর্তন'। গ্রন্থমধ্যে ইহাকে কোথাও 'শিবায়ন' বা 'শিব-মঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু তথাপি ইহা মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ প্রত্যেক দিনের দুই পালা করিয়া আট দিনের ষোল পালায় স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বিভক্ত। অন্যান্য বিষয় বিচার করিলেও ইহাতে মঙ্গলকাব্যের প্রায় সকল লক্ষণই বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ মেদিনীপুর অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত এবং সেখানে সর্বত্র ইহা 'শিবায়ন' নামেই প্রসিদ্ধ। রামায়ণের প্রভাব-বশতঃ ইহার নাম 'শিবায়ন' হইয়াছে।

রামেশ্বরের 'শিবায়ন' বিগত শতাব্দীতেই বটতলায় মুদ্রিত হইয়া বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। এমন কি হরিচরণ আচার্য নামে অত্যন্ত আধুনিক কালের একজন কবিও রামেশ্বরেরই পথানুসরণ করিয়া 'শিবায়ন' নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন ; তাহাতে তিনি এই প্রকার ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন,

'শ্রীহরিচরণ করিল রচন
রামেশ্বর পদ-স্মরণে'।[১]

কবি রামেশ্বর তাঁহার কাব্যের ভণিতায় বলিয়াছেন,

'যশোমন্ত সিংহে দয়া কর হরবধূ।
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু॥'

আবার কোথাও বলিয়াছেন,

'ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর'।

কিন্তু তিনি তাঁহার নিজের রচনাকে মধুক্ষরা ও ভদ্রকাব্য বলিয়া যে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত করিয়াছেন, এই বিষয় তাঁহার কাব্যের নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

---

[১] হরিচরণ আচার্য শিবায়ন (বসুমতী, কলিকাতা, ১৩৩৮)

লেখকের সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাহারই ফলে বাংলায় অপ্রচলিত বহু সংস্কৃত শব্দ যোজনা দ্বারা তিনি কাব্য-মধ্যে বহু অনুপ্রাস সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন, এই সকল অনুপ্রাস অধিকাংশ সময়েই কষ্টসৃষ্ট বলিয়া শ্রুতিসুখাবহ হয় নাই, যেমন,—

'ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বাণ।
চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডীপানে চান॥
পদ্মাবতী পার্বতীকে প্রবোধিয়া আনে।
প্রাণনাথে প্রকারে ভেটিব সেইখানে॥
জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা।
ভণে রামেশ্বর ভবে ভাবি রাত্রিন্দিবা॥'

পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনায় অনেক স্থলেই কবি সংস্কৃত পুরাণাদি, এমন কি কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' প্রভৃতিও—বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। ভাষার দিক দিয়া এই পৌরাণিক অংশ অনেকটা আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শিবের লৌকিক কাহিনীর অংশ রচনায় কবিকে সংস্কৃত আদর্শের অভাবে সর্বত্রই নিজের মৌলিক কল্পনা ও রচনা-শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে লেখকের একটি সরস কবি-চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়; শেষোক্ত চিত্রগুলি নিতান্ত বাস্তবধর্মী বলিয়া ইহাদের মধ্য হইতে গ্রাম্যতার ভাব সম্পূর্ণ দূর হইতে পারে নাই; তাহা প্রকৃতপক্ষে শৈব কৃষকেরই গান, সেইজন্যই বলিতেছিলাম, তাঁহার রচনা যেমন 'মধুক্ষরা'ও নহে তেমনি আবার 'ভদ্রকাব্য' বলিয়াও দাবী করিতে পারে না। তবে পৌরাণিক কাহিনীর অংশ চরিত্র-সৃষ্টি ও রচনার দিক দিয়া বৈশিষ্ট্যবর্জিত হইলেও লৌকিক কাহিনীর অংশ এই সকল বিষয়ে কতকটা উল্লেখযোগ্য।

পার্বতীর গৃহস্থালী বর্ণনায় কবি একটি দরিদ্র বাঙ্গালী পরিবারের সুন্দর আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন। বাঙ্গালী কবির সহজ কবিদৃষ্টিতে দেব-চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ ভাবে দেবত্ব-বর্জিত হইয়া সাধারণ লোভক্ষুধাতুর মনুষ্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। শিবের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল রন্ধন করিয়া পার্বতী উপবাসী স্বামিপুত্রকে পরিবেশন করিতেছেন। এই চিত্রটির মধ্যে একটি চিরদরিদ্র এবং লোভী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ

পরিবারের নিত্য চিত্রই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে,—দেবমহিমার বিন্দুমাত্র অস্তিত্বও ইহাতে অনুভূত হইবে না—

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিন জন একুনে বদন হইল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার॥
তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥
দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি একপাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥
সুক্ত খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্ন আন অন্ন আন রুদ্র মূর্তি ডাকে॥
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈয হয়ে খা॥
মুনগ মায়ের বোলে মৌনে হয়ে রয়।
শঙ্কর শিখায়ে দেয় শিখিধ্বজ কয়॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেশরির পরে॥
শঙ্কর বলেন শুন নগেন্দ্রের ঝি।
সূপ হইল সাঙ্গ আন আর আছে কি॥
দড় বড় দে । এনে দিল ভাজা দশ।
খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ॥

একজন আধুনিক সমালোচক উল্লিখিত চিত্র হইতে কবির হাস্যরস সৃষ্টি-নৈপুণ্যের সন্ধান পাইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে কবির একটি অসচ্ছল গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তবচিত্র অঙ্কনের নৈপুণ্যই অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হইবে।

শি , র গৃহে নিত্য অভাব এবং এই অভাবকে কেন্দ্র করিয়াই দাম্পত্য ও নিত্য অশান্তি ঘনাইয়া থাকে। ইহাই হরগৌরীর কোন্দলরূপে কবি

প্রকাশ করিয়াছেন। দরিদ্র স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর দীনতম আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ করাও যে কত কষ্টকর কবি রামেশ্বর পার্বতীর শঙ্খ পরিধানের আকাঙ্ক্ষার লৌকিক কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া তাহা অতি সহজ সমবেদনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামীর নিকট সধবা রমণীর দীনতম দাবী এক জোড়া শাঁখা। তাহাও দরিদ্র স্বামীর যোগাইবার সামর্থ্য নাই। দুঃখ-দারিদ্র্য-পীড়িত বাংলার নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের ইহা নিত্য অনুভূতির বিষয়।

অসচ্ছল সংসারের একজন গৃহিণীর স্বামীর কাছে দুইগাছি শঙ্খ প্রার্থনার যে চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার বাস্তব নারী-চরিত্র পরিকল্পনায় সার্থকতার পরিচায়ক—

প্রণমিয়া পার্বতী প্রভুর পদতলে।
রঙ্কিনী সে রঙ্কনাথে শঙ্খ দিতে বলে ॥
গদ গদ স্বরে হরে করে কাকুর্বাদ।
পূর্ণ করি পশুপতি পার্বতীর সাধ ॥
দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটি বাই।
কৃপা কর কান্ত আর কিছু নাহি চাই ॥

তারপর পার্বতী পশুপতির নিকট তাহার জীবনের একটি অতি গোপন দুঃখের কথা প্রকাশ করিলেন, এ'কথা ত একমাত্র স্বামী ছাড়া আর কাহারও নিকট খুলিয়া বলিবার নহে, এ'যে কত বড় লজ্জা তাহা নারী ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিবেও না,—

লজ্জায় লোকের মাঝে লুকাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই ॥

হাত দুইটি শূন্য, সেইজন্য লোকের মাঝে গিয়াও হাত নাড়া দিয়া একটি কথা বলিতে পারি না। নারী হইয়া এই দুঃখ কি করিয়া সহ্য হয়?

কিন্তু ভোলানাথ পারিবারিক সুখদুঃখে নির্বিকার, তথাপি রসনার ধার তাঁহার কিছুমাত্র কম নহে। তিনি বলিলেন,

ভিখারীর ভার্যা হয়ে ভূষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ ॥
বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে ॥

অক্ষম স্বামীর মুখ হইতে এই অন্যায় গঞ্জনা লাভ করিয়া সর্বংসহা পত্নীও ধৈর্যহারা হইয়া গেলেন,

একথা ঈশ্বরী শুনি ঈশ্বরের মুখে।
শূন্য হইল সব যেন শেল মাইল বুকে॥

তিনি তৎক্ষণাৎ সন্তান দুইটিকে সঙ্গে করিয়া দুঃখে দারিদ্র্যে বাঙ্গালী বধূর শেষ আশ্রয়স্থল পিতৃগৃহে রওয়ানা হইলেন। ভোলানাথ সহসা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন, তারপর 'ভায়ের কিরা', 'বাপের কিরা' দিয়া ক্রুদ্ধা পত্নীকে কোনমতে নিজের গৃহবাসে ফিরাইয়া আনিলেন।

এই সকল চিত্রের মধ্যে কবি-চিত্তের একটি সহজ আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবের সঙ্গে এই সকল চিত্রের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; সুদূর আদর্শলোক অপেক্ষা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বাস্তব-লোকই কবির উপজীব্য ছিল। সেইজন্য বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়ও ইহা অতি সহজেই স্পর্শ করে। এই সকল দিক দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, রামেশ্বরের মধ্যে সরস কবিপ্রাণতার অভাব ছিল না, কিন্তু তাহা তাঁহার কাব্যের পৌরাণিক অংশ রচনায় আদর্শ ও ভাষা এই উভয়ের দিক দিয়াই সংস্কৃতের প্রভাবে সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হইয়া আছে এবং মৌলিক অংশ রচনায়ও সকল প্রকারে গ্রাম্যতা-মুক্ত হইতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাষার পরিচ্ছন্নতা তাঁহার রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

দ্বিজ কালিদাস

দ্বিজ কালিদাস রচিত 'কালিকা-বিলাস' কাব্যখানিও শিবমঙ্গল কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।[১] যদিও কাব্যখানির নাম 'কালিকা-বিলাস', তথাপি কালিকা কিংবা কালীর সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। সম্ভবতঃ গ্রন্থকারের নাম কালিদাস ছিল বলিয়া তাঁহার কাব্যের তিনি এই প্রকার নামকরণ করিয়াছেন।

কবির সময় সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে ইহার মধ্যে নানা বিষয়ে আধুনিকতার যথেষ্ট প্রভাব আছে। তথাপি ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্তী রচনা নহে বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার মধ্যে কবি রামপ্রসাদ সেনের প্রভাব অনুভূত হয়।

দ্বিজ কালিদাস পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচনার বহু অংশ কালিদাস রচিত 'কুমার-সম্ভবম্' কাব্যের ভাবানুবাদ বলিয়া মনে হইবে; এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত পুরাণ হইতেও বহু অংশ তিনি তাঁহার কাব্যমধ্যে অনুবাদ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের মূলে তাঁহার একটি সুগভীর সহানুভূতি ছিল, তাহাই তাঁহার আগমনী বিজয়ার গানগুলি রচনায় সার্থকতা দান করিয়াছে। বহু হস্তস্পর্শে বটতলা হইতে পুনঃ পুনঃ প্রকাশের ফলে দ্বিজ কালিদাসের অকৃত্রিমতা বহুলাংশে বিনষ্ট হইয়াছে; অতএব তাঁহার বর্তমান কোন রচনা হইতে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করা দুঃসাধ্য।

---

১ ব-সা-প ১, ১৩৭-৫৫

দ্বিজ মণিরাম

দ্বিজ হরিহরের পুত্র দ্বিজ মণিরাম 'বৈদ্যনাথ-মঙ্গল' নামক একখানি শিবমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[১] তিনি অধিকাংশ স্থলে 'সুন্দর রায়', 'সুন্দর দ্বিজ' ও একবার 'সুন্দর রাম' ভণিতা ব্যবহার কবিয়াছেন। মনে হয়, দ্বিজ সুন্দর তাঁহার নামান্তর ছিল। কোন কোন পুঁথির পাঠে 'সুন্দর রায়' স্থলে 'শঙ্কর রায়' ও 'সুন্দর দ্বিজ' স্থলে 'শঙ্কর দ্বিজ' পাঠ দেখিয়া কেহ কেহ শঙ্কর নামক একজন স্বতন্ত্র কবির অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু ইহা লিপিকর-প্রমাদ বলিযাই গৃহীত হইয়াছে, সুন্দরই লিপিকর-প্রমাদে শঙ্কর হইয়াছে, বস্তুতঃ শঙ্কর নামক 'বৈদ্যনাথ-মঙ্গল'-রচয়িতা স্বতন্ত্র কোন কবি ছিলেন না। মণিবামের কাব্যের মোট ১১ খানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৯ (নয়)খানি পুঁথিই শ্রীহট্ট জেলা হইতে আবিষ্কৃত। অতএব তিনি শ্রীহট্ট অঞ্চলেরই লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত কবির আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

মণিরাম তাঁহার কাব্যরচনার কোন কাল নির্দেশ করিয়া যান নাই। তবে তাঁহার ভাষা ও কাব্যোক্ত অন্যান্য বিষয় বিচার করিয়া তাঁহাকে খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী লোক বলিয়া মনে হয় না।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরের বৈদ্যনাথ শিবের কাহিনীই তাঁহার বর্ণিতব্য বিষয়। কিন্তু তিনি নিজে কখনও বৈদ্যনাথধামে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই,—

প্রভুর মহিমা শুনি মনে লাগে সুখ।
চক্ষু ভরি না দেখিনু হেন চন্দ্রমুখ॥

তাঁহার এই কাব্যে বৈদ্যনাথের মহিমাজ্ঞাপক মোট ছয়টি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম কাহিনীটি শিবপুরাণের অন্তর্গত 'জ্ঞান-সংহিতা'র 'বৈদ্যনাথোৎপত্তি-বর্ণন' অংশ হইতে গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য ইহার সঙ্গে কিছু কিছু প্রচলিত জনশ্রুতিরও সংমিশ্রণ হইয়াছে। ইহার পর এক কাব্যে যথাক্রমে 'মন্ত্রবীর্য' নামে এক ওঝার কাহিনী, মুনিব্রহ্ম নামক এক রাজা ও তাঁহার রোগমুক্তির কাহিনী, সন্দক নামক

১ সা-প-প ৪, ৩৩৮

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বৈদ্যনাথের বরে অর্থলাভের কাহিনী এবং সর্বশেষে এক অন্ধ ব্রাহ্মণীর বৈদ্যনাথের বরে দৃষ্টিশক্তি পুনর্লাভের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনী-গুলির মধ্যে বৈদ্যনাথের যে গুণকীর্তন করা হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রধানতঃ রোগাপহারক, একস্থলে মাত্র ধনদাতা। তিনি অন্ধতা ও কুষ্ঠরোগ দূর করিয়া থাকেন, যথা—

অন্ধরোগী জরা ব্যাধি কুষ্ঠেত বিখ্যাত।
দরশন মাত্রে মুক্ত করে জগন্নাথ॥

সাধারণ রোগ, বিশেষতঃ অন্ধতা ও কুষ্ঠ দূব করিবার ক্ষমতা একমাত্র সূর্য দেবতারই দেখিতে পাওয়া যায়, এই সম্পর্কে এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। অতএব মনে হয়, বৈদ্যনাথও পূর্বে সূর্য দেবতাই ছিলেন, পরে শৈব ধর্মের প্রভাব বশতঃ তিনি বৈদ্যনাথ বা শিবরূপেই পরিণতি লাভ করিয়াছেন।

বিবিধ কবি

দ্বিজ রামচন্দ্র প্রণীত 'হর-পার্বতীমঙ্গল' নামক একখানি কাব্য ১৮৫২ খৃস্টাব্দে শ্রীরামপুব মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়।[১] ইহা ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ছিল বলিয়া লঙ্-এর তালিকায় উল্লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত 'হরগৌরী বিলাপ' (১৮১৪), 'হরিহর মঙ্গল' (?), 'মহেশ মঙ্গল' (?) নামক আরও কয়েকটি শিবমঙ্গলকাব্য রচনা লঙ্-এর তালিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে।[২] ইহাদের মধ্যে 'হরিহর-মঙ্গলে'র একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি এসিয়াটিক সোসাইটির প্রাচীন পুঁথিশালায় সংগৃহীত হইয়াছে।[৩] ইহার রচয়িতার নাম প্রাণচন্দ্র। কবি বর্ধমানরাজ তেজেশ্চন্দ্রের আদেশে কাব্যরচনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেব-মাহাত্ম্য রচনা কাব্যের উদ্দেশ্য নহে, রাজপুত্র জয়সেন ও রাজকুমারী জয়ন্তীর প্রণয়কাহিনী বর্ণনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কুবেরের শাপে এক যক্ষ সাময়িকভাবে নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হইয়া কি ভাবে শিবকে তপস্যা দ্বারা তুষ্ট করিয়া জন্মান্তরে বিজয়নগরের রাজা বিজয়সেনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল ও তাহার পূর্বজন্মের পত্নী দীর্ঘকেশী অবন্তীরাজের গৃহে জয়ন্তী নামে জন্মগ্রহণ করিলে কি ভাবে তাহাকে এই জন্মেও পত্নীরূপে লাভ করিল তাহারই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিখানির তারিখ ১২৩৭ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৩০ খৃস্টাব্দ। মনে হয়, পুঁথিখানি ইহার অনতিকাল পূর্বে রচিত। কারণ, দেবতার উপর হইতে যখন সমাজের দৃষ্টি মানুষের উপর আসিয়া ন্যস্ত হয়, ইহা সেই যুগেরই রচনা।

এতদ্ব্যতীত 'শিবরামের যুদ্ধ' নামকও একখানি লৌকিক বিষয়ক আখ্যানকাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহার বিষয়টি এই—লক্ষ্মণ শিবের উদ্যান হইতে ফুল তুলিতে গেলে, উদ্যানের প্রহরী হনুমান তাঁহাকে বাধা দিল। লক্ষ্মণ ও হনুমানে যুদ্ধ বাধিল; অবশেষে লক্ষ্মণের পক্ষ হইয়া রাম ও হনুমানের পক্ষ হইয়া শিব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধ আর কিছুতেই শেষ হয় না—ত্রিভুবন রসাতলে যাইবার উপক্রম

[১] সা-প-প ২৭, ৩৮

[২] J. Long, Descriptive Catalogue of Bengali Works (Calcutta, 1855), III গ-স ৩৮৬০

হইল। অবশেষে পার্বতীর মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। কবিচন্দ্র[১] লক্ষ্মণ[২] ও অন্যান্য কয়েকজন কবির নামে এই কাব্য প্রচলিত আছে।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বশতঃ কালক্রমে লৌকিক শিব-চরিত্রের উপরও বৈষ্ণব প্রভাব কার্যকরী হয়। তাহার ফলে শিবকে কোন কোন স্থলে কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। 'শিব-শঙ্করীর রাস' নামক একখানি ক্ষুদ্র পুঁথিতে ইহার প্রকৃত নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাতে শিব ও পার্বতীর রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। পুঁথিখানির রচয়িতার নাম ও পরিচয় জানা যায় না।[৩]

[১] গ স ৩৬২২

[২] ঐ ৫৪৪৬

[৩] নাটোর-ভবন পুঁথি

'মৃগলুব্ধ'

শিবমঙ্গলের স্বতন্ত্র একটি ধারা বাংলার সুদূর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবর্তী অঞ্চলে এককালে উদ্ভূত হইয়া প্রধানতঃ সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল চট্টগ্রাম। ইহার অন্তর্গত বর্তমান হিন্দুতীর্থ চন্দ্রনাথ এক-কালে বৌদ্ধ তীর্থরূপেই প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু কালক্রমে সুদূর ভারতের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্তও যখন হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইল তখন এই অঞ্চলের বৌদ্ধতীর্থগুলি হিন্দুতীর্থেই রূপান্তরিত হইয়া গেল। বুদ্ধদেবতা তারানাথ হিন্দুর শিব বা চন্দ্রনাথ-এ পরিবর্তিত হইয়া গেলেন। চন্দ্রনাথ তীর্থে এখন পর্যন্তও বৌদ্ধ কীর্তির ধ্বংসা-বশেষ বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম জিলার অন্যতম প্রধান তীর্থস্থানের নাম আদিনাথ। আদিনাথ বা আদিদেব পরবর্তী বৌদ্ধধর্মের উপাস্য দেবতা ছিলেন; অতএব আদিনাথও প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধতীর্থ; চন্দ্রনাথ ও আদিনাথে এখন পর্যন্তও বৌদ্ধ উৎসবাদির সময় চট্টগ্রামের সুদূর অঞ্চল হইতে বৌদ্ধ তীর্থযাত্রিগণ আসিয়া সমবেত হইয়া থাকেন।

চন্দ্রনাথ ও আদিনাথ শৈব তীর্থে পরিণত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত শৈব পুরাণগুলিও প্রচার লাভ করে; সাধারণ জন-সমাজের মধ্যে শিব-মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য তখনই স্থানীয় কয়েকজন কবি বাংলা মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে কয়েকখানি শিবমঙ্গলকাব্য রচনা করেন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া ইহাদের সঙ্গে পূর্বালোচিত শিবমঙ্গল কাব্যগুলির কোন যোগ ছিল না; সংস্কৃত পুরাণ হইতে প্রত্যক্ষভাবে ইহাতে বিষয়-বস্তু গ্রহণ করিয়া কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্যের আদর্শে ইহারা রচিত হইয়াছিল। ইহাদের কাহিনীর মধ্যে মৃগ ও লুব্ধ (ক)-এর কথা আছে বলিয়া সাধারণতঃ ইহাদের নাম মৃগলুব্ধ বা মৃগলুব্ধ-সংবাদ। কাহিনীটি নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

হস্তিনার রাজা মুচুকুন্দ পরম শৈব। তিনি একদা সস্ত্রীক শিব-চতুর্দশী ব্রত উদ্‌যাপন করিতে গিয়া রাত্রিজাগরণ করিতেছিলেন; রাণী রাজাকে শিবের মাহাত্ম্য শুনাইতে গিয়া এই গল্পটি বলিলেন।

চিত্রসেন নামে এক বিদ্যাধর একদিন দেব-সভায় নৃত্য করিতেছিল, নৃত্য করিতে করিতে সহসা এক ব্যাধের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; ব্যাধ

একটি মৃগকে লক্ষ্য করিয়া শর সন্ধান করিতেছিল। চিত্রসেনের তালভঙ্গ হইয়া গেল। অমনি ইন্দ্র অভিশাপ দিলেন, 'মর্ত্যলোকে গিয়া ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ কর'। চিত্রসেন তাহার শাপমুক্তির উপায় জানিতে চাহিল; ইন্দ্র বলিলেন, 'ভদ্রসেন মৃগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে শাপ মোচন হইবে'।

চিত্রসেন ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করিল। পশুহত্যাই তাহার জীবিকার একমাত্র উপায় হইল। তাহার অব্যর্থ সন্ধানে বন ক্রমে পশু-শূন্য হইতে লাগিল। একদিন সে শিকারের সন্ধানে দূর বনে গমন করিল। সমস্ত দিনের সন্ধানেও কোন শিকার মিলিল না। সন্ধ্যার সময় আকাশে ঝড় উঠিল। অনাহারে ক্লান্ত ও বন্য পশুর ভয়ে ভীত হইয়া সে এক বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিল। সেই বৃক্ষটি ছিল বিল্ববৃক্ষ। রাত্রি জাগরণের জন্য এক একটি করিয়া বিল্বপত্র ছিঁড়িয়া সে নীচে ফেলিতে লাগিল; বৃক্ষের পাদমূলে এক শিবলিঙ্গ ছিল; ছিন্ন বিল্বপত্রগুলি সবই সেই শিবলিঙ্গের উপর পড়িল। শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলেন; সে মৃগয়ায় সাফল্য লাভ করিবার বর চাহিল।

প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাধ পুনরায় বনের ভিতরে প্রবেশ করিল। সেইদিন ব্যাধের জালে এক মৃগ বন্দী হইল। মৃগী স্বামীর আসন্ন মৃত্যু জানিতে পারিয়া শোকে দুঃখে কাতর হইয়া পড়িল। মৃগ তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিল, কিন্তু মৃগী ব্যাধের নিকট নিজেকে সমর্পণ করিয়া মৃগের প্রাণরক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিল। ব্যাধের নিকট মৃগী স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিল; ব্যাধকে কত ধর্ম-কথা শুনাইল। মৃগীর কথা শুনিয়া ব্যাধ জ্ঞান লাভ করিল, সে মৃগকে জাল হইতে মুক্ত করিয়া দিল। ভদ্রসেন ও রত্নাবলী মৃগ ও মৃগীরূপে পৃথিবীতে শাপভোগ করিতেছিল; তাহাদের শাপভোগ শেষ হইল, তাহারা উভয়েই শিব-লোকে চলিয়া গেল।

ব্যাধ চন্দ্রভাগা নদীতীরে গিয়া শিব-পূজা করিবার আয়োজন করিল। ব্রাহ্মণ পূজারী তাহাকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিল। পূজারীর অনুমতি লইয়া সে ব্যাসকুণ্ডে স্নান করিয়া পবিত্র হইল। এইবার তাহার শিব-পূজায় আর কোন বাধা রহিল না। ভক্তিভরে শিব-পূজা করিয়া ব্যাধ-জীবন হইতে মুক্তি পাইয়া শাপমুক্ত হইয়া সে শিব-লোকে চলিয়া গেল।

রাণীর কাহিনী শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রি প্রভাত হইল। মুচুকুন্দ মনে করিলেন, তিনিও চন্দ্রভাগা নদীতীরে শিব-পূজা সম্পন্ন করিবেন। পূজার আয়োজন

করা হইল। তিনি বিপুল আড়ম্বরে শিব-পূজা সম্পন্ন করিলেন। শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিলেন, তিনিও সস্ত্রীক শিব-ধামে চলিয়া গেলেন।

সংস্কৃত মহাভারত, শিবপুরাণ, হরিবংশ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ ইত্যাদিতে মুচুকুন্দ রাজার বিবিধ উপাখ্যান বর্ণিত আছে। মুচুকুন্দ রাজা পরম শৈব ছিলেন, কাশীধামে মুচুকুন্দেশ্বর শিবলিঙ্গ এখনও বর্তমান আছে। উদ্ধৃত কাহিনী সমগ্রভাবে কোন শিবপুরাণ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, বিবিধ পুরাণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহা বাংলা মঙ্গলকাব্যের আদর্শে রূপায়িত করিয়া লইয়া উক্ত কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে।

উদ্ধৃত কাহিনী হইতে দেখা যাইবে যে, ইহার মধ্যে লৌকিক শিব-চরিত্রের কোন প্রভাব নাই। পূর্বালোচিত আদ্যোপান্ত পৌরাণিক কাহিনীকে ভিত্তি করিয়াই ইহা রচিত। ইহার প্রধান কারণ এই যে, লৌকিক শিবের উদ্ভবভূমি হইতে বহু দূরবর্তী অঞ্চলে এই মৃগ-লুব্ধকের কাহিনী প্রচলিত হইয়াছিল, সেইজন্যই ইহার উপর লৌকিক প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

মৃগলুব্ধ নামক পুঁথির আদি রচয়িতার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহার পরবর্তী কয়েকজন কবি সম্বন্ধেও বিস্তৃত পরিচয় সহজ-লভ্য নহে। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম রামরাজা।[১] রামরাজা রচিত মৃগলুব্ধ পুঁথিতে তাহার বিস্তৃত পরিচয় কিংবা পুঁথি রচনার সম্যক্ সময় নির্দেশ কিছুই নাই। তবে, এই জাতীয় অন্যান্য পুঁথির সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে রামরাজা-বিরচিত পুঁথিকেই নানা কারণে প্রাচীন মনে হয়। রামরাজা তাঁহার পুস্তকে এই প্রকার ভণিতা দিয়াছেন,

শঙ্কর কিঙ্কর শিশু রামরাজে গাএ।
মৃগলুব্ধ গাইল প্রথম অধ্যায়॥
শঙ্কর কিঙ্কর রামরাজ ভণে।
দ্বিতীয় অধ্যায় নরক লক্ষণে॥
হরষিত হইয়া রামরাজা গাএ।
ব্যাধের গমন শুনি তৃতীয় অধ্যায়॥

এতদ্ব্যতীত তাঁহার পুস্তকে কবির আত্মপরিচায়ক আর কোন উক্তি নাই।

১ রামরাজা, মৃগলুব্ধ-সংবাদ, মুন্সী আব্দুল করিম সম্পাদিত (সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২২)

অতএব এই অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর উপকরণের উপর নির্ভর করিয়া কবির সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। কেহ অনুমান করিয়াছেন, কবি জাতিতে মগ ছিলেন। কারণ, চট্টগ্রামের বৌদ্ধ মগদিগের মধ্যে রাজ ও বড়ুয়া পদবী ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মগ কবি কেন শিব-মাহাত্ম্য সূচক কাব্য রচনা করিবেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এমনও হইতে পারে যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করিয়া শৈব বলিয়া দাবী করিতেছিলেন, নামের পদবীর মধ্যে তখনও বৌদ্ধরূপ লুপ্ত হয় নাই। যাই হউক, এই অনুমান ব্যতীত এই কবি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে।

রামরাজের রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ। সংস্কৃত পুরাণের ভাষার প্রতিধ্বনি তাঁহার রচনায় শুনিতে পাওয়া যায়। বনমধ্যে নিঃসঙ্গ ব্যাধ শিব-চতুর্দশীর ঘন অন্ধকারময় রাত্রিতে যে মহাদুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহার চিত্রটি কবিব রচনায় সুন্দর ফুটিয়াছে,—

বিজুলি চমকে মেঘ করিল গর্জন।
মুষল সমান ধার হইল বরিষণ॥
ঠাঠারের ঘায় অগ্নি পড়ে নিরন্তর।
ঘোর অন্ধকার হইল বনের ভিতর॥
দেখিয়া ব্যাধের মনে ভয় উপজিল।
তরাসে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িল॥
ভয়ে আকুল ব্যাধ চিন্তিতে লাগিল।
ঘোর অন্ধকার রাত্রি বনে ত রহিল॥
উদ্দেশ না পাইল মোর বন্ধু পরিকর।
কেমতে গোঞাইমু মুই বনের ভিতর॥
সিংহ ব্যাঘ্র জন্তু সব বৈসে সেই বনে।
এ সবার ভয় আমি এড়াইমু কেমনে॥

মৃগলুব্ধ কাব্যের অন্যতম কবির নাম রতিদেব।[১] রতিদেব রচিত কাব্যই এই জাতীয় কাব্যের মধ্যে সর্বাধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। ইহার পুঁথি সুদূর

[১] রতিদেব, মৃগলুব্ধ, মুন্সী আব্দুল করিম সম্পাদিত (সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২২)

শ্রীহট্ট জিলা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।[১] রতিদেব তাঁহার পুঁথিতে এইরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন,

পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা বসুমতী।[২]
জন্মস্থল সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি॥
জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বন্দম রাম-নারায়ণ।
ধরণী লোটাইআ বন্দম যত গুরুজন॥
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী বন্দম মহেশ শ্বশুর।
মন্ত্রগুরু দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর॥

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত পটিয়া থানার অনতিদূরবর্তী কয়েকটি গ্রাম চক্রশালা নামে এখনও পরিচিত, পটিয়া মহকুমা সহরের উপকণ্ঠে সুচক্রদণ্ডী গ্রামও বর্তমান রহিয়াছে। রতিদেব তাঁহার কাব্য-রচনার কাল সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—

রস অঙ্ক বাউ[৩] (বায়ু) শশী শাকের সময়।
তুলা মাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হএ॥
মৃগলুব্ধ পোথারম্ভ মহাদেবের পাএ।
ভব তরিবার হেতু রতিদেব গাএ॥

অতএব দেখা হইতেছে যে, ১৫৯৬ শকাব্দ বা ১৬৭৪ খৃস্টাব্দে এই কাব্য রচিত হয়।

রতিদেব সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচনার অনেক স্থলে সংস্কৃত পুরাণগুলির একেবারে ভাষানুবাদ লক্ষ্য করা যায়। এই উপলক্ষে স্কন্দপুরাণোক্ত শিবলিঙ্গের উৎপত্তি কাহিনীর সহিত তাঁহার রচনার অনুরূপ বিষয়টি তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

রতিদেবের রচনা পূর্বোল্লিখিত রামরাজের রচনা হইতে সরল এবং কবিত্বপূর্ণ। ব্যাধের জালে আবদ্ধ মৃগের সম্মুখে মৃগীর কাতরোক্তির বর্ণনাটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী,—

[১] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন পুঁথিশালায় সংগৃহীত রতিদেব রচিত মৃগলুব্ধের ৮৯১ সংখ্যক পুঁথি শ্রীহট্ট জিলা হইতে সংগৃহীত।

[২] পাঠান্তর 'মধুমতী'।

[৩] পাঠান্তর 'শর', ঢা-পত্র ২ (ক), ইহাতে সময়ের কোন ব্যতিক্রম হয় না।

কেনে কাল বনে আইলা ব্যাধ হাতে প্রাণ দিলা
মোকে বাম হইলো ভগবান।
বনে খাই তৃণ পানি অপকার নাহি জানি
কেনে বিধি এত বিড়ম্বন ॥
উঠ উঠ প্রাণ নাথ অখনে আসিবো ব্যাধ
ঝাটে উঠ চলি যাই ঘর।
মোর প্রভু সঙ্গে রঙ্গ কোন বিধি কৈল ভঙ্গ
পলকে হরিল প্রাণেশ্বর ॥

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই কাব্য সর্বাংশেই সংস্কৃত পুরাণের অনুকারী, অতএব ইহাতে বাঙ্গালী কবির সহজ কবিত্ব-স্ফূর্তির বাধা হইয়াছে। ইহাতে চরিত্র-সৃষ্টির প্রয়াস নাই, দৈব ছায়া হইতে বিমুক্ত করিয়া কোন চরিত্রের উপর জাতীয় স্বাতন্ত্র্য আরোপ করা হয় নাই। এই সকল কারণে এই জাতীয় মৃগলুব্ধ নামীয় বাংলা শিবাখ্যানকে প্রকৃতপক্ষে অনুবাদ সাহিত্যেরই অন্তর্ভূত করা সমীচীন বলিয়া বোধ হইবে।

একমাত্র চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথ ও আদিনাথের নব-প্রতিষ্ঠিত শৈব-তীর্থগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই এই সাহিত্য পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, ইহার অন্যত্র প্রসার সম্ভব হয় নাই। চট্টগ্রাম অঞ্চলের শৈবধর্ম পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ও মুসলমান ধর্মের সম্মুখীন হইয়া ব্যাপক লোকপ্রীতি হইতে স্বভাবতঃই বঞ্চিত হয়, তাহারই ফলে এই শৈব সাহিত্যও ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়ে।

পরবর্তী বাংলার সমাজে লৌকিক শৈব ধর্ম নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ক্রমে বাংলার হিন্দু সমাজে লৌকিক শিবের প্রাধান্য একেবারেই লোপ পাইতে আরম্ভ করিল। বাঙ্গালীর নৈতিক জীবনের যে স্তর হইতে লৌকিক শিবের জন্ম হইয়াছিল, তাহা হইতে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন ক্রমে অনেক উর্ধ্বে আসিয়া উপনীত হইল। সেইজন্য বাংলার প্রাচীনতম সমাজ হইতে জাত দেবচরিত্রসমূহ পরবর্তী বাংলার উন্নততর সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইল না। ইতিমধ্যে সমাজের সকল স্তরে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব কার্যকরী হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার ফলে শিবের পার্শ্বে নারায়ণের সিংহাসন স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। অতএব শিবকেও তখন এই

পুরাণাগত নারায়ণের সমমর্যাদায় উন্নীত করিতে গিয়া তাহা হইতে লৌকিক চরিত্র-কল্পিত সর্ববিধ গ্রাম্য উপকরণ পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। ক্রমে যুগোচিত সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে হরি ও হর সম্মিলিত রূপেও আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্র রায় রচিত 'অন্নদা-মঙ্গলে'র শিবকাহিনী এই আদর্শেই রচিত। ইহার মধ্যে শিবের প্রাচীনতম লৌকিক এবং মধ্যযুগের তথাকথিত পৌরাণিক এই উভয় চিত্রেরই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গলো'ক্ত শিব-কাহিনীতে কতকগুলি শৈব ও বিষ্ণুমাহাত্ম্যসূচক পুরাণের আখ্যানই অনুকীর্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিভিন্ন আদর্শোদ্ভূত দেব-চরিত্র-গুলির মধ্যে ঐক্যসন্ধান করিয়া সর্বধর্মসমন্বয়-চেষ্টার কল্যাণাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। তাহাতে এই কথাই বলা হইয়াছে যে, যে-অবিশ্বাসী এক দেবতায় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিয়া অপর দেবতার অবহেলা করে তাহার কোন দেবতার পূজাই সার্থক হয় না। পঞ্চোপাসক হিন্দু সম্প্রদায়ের ইহাই সেই যুগে ধর্মগত আদর্শ হইয়াছিল এবং ইহার উপরই ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক সর্বধর্মসমন্বয়বাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গলে' বিষ্ণুভক্ত ব্যাসকে শিব-নিন্দার জন্য বিষ্ণুই তিরস্কার করিয়া কহিতেছেন,—

যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥
শিবের প্রভাব বলে আমি চক্রধারী।
শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী॥
শিবের যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।
শিবের যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট॥

বাংলার যে মঙ্গল-সাহিত্য শিবের সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে উচ্ছেদ করিবার জন্যই সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল, পরিণামে তাহা এই শিবকেই এক স্বতন্ত্ররূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতে সর্পপূজার উৎপত্তি—বাংলার মনসা-পূজা, মনসা-মঙ্গলকাব্য—মনসা-মঙ্গলের কবিগণ

সূচনা

ভারতে শাক্তধর্মের দুইটি বিশিষ্ট ধারার মধ্যে যে ধারাটি বৈদিক আর্যধর্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহার কোন প্রভাব বাংলার জনসাধারণের সমাজ পর্যন্ত আসিয়া বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। মধ্যযুগে বাংলার জনসাধারণ তাহাদের অনার্য প্রতিবেশীদিগের সামাজিক জীবন হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিজস্ব অধ্যাত্ম-বোধ দ্বারা যে বিশিষ্ট প্রকৃতির শাক্তধর্মের আদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা আর্য আদর্শ হইতে শুধু যে স্বতন্ত্র তাহাই নহে, তাহা আর্য আদর্শের কতকটা বিরোধীও বটে। আর্যসমাজ শক্তি-দেবতার যে পরিকল্পনা করিয়াছিল তাহাতে তাঁহার সৃষ্টিশক্তির উপরই জোর দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু অনার্য-পরিকল্পনায় শক্তিদেবতার ধ্বংসাত্মক গুণের উপরই জোর দেওয়া হয়। এই উভয় আদর্শের মৌলিক বিরোধের মধ্যেই ইহাদের উদ্ভবেরও ইতিহাস যে পরস্পর স্বতন্ত্র তাহা অনুভব করা যায়।

আর্যগণ ছিল প্রকৃত শক্তিমান জাতিরই বংশধর। শক্তির সাধনা দ্বারা তাহারা চিরকালই ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে বিজয় ও কল্যাণেরই সন্ধান পাইয়াছে, সেইজন্য তাহাদের শক্তি-দেবতার পরিকল্পনায় দেবতার সৃষ্টি ও কল্যাণ-গুণেরই জয়গান শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় অনার্যদিগের ইতিহাস স্বতন্ত্র। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অরণ্যচারী অনার্য জাতি হিংস্র বন্য পশু ও অপরিজ্ঞাত-রহস্য বিশ্বপ্রকৃতির নিকট হইতে সর্বদা আতঙ্ক ও বিভীষিকাই লাভ করিয়া আসিয়াছে। সেইজন্য সেই যুগ হইতেই তাহারা আত্মরক্ষায় সচেষ্ট থাকিতে গিয়া তাহাদের অপেক্ষা শক্তিমান জীবসমূহ হইতে সর্বদা দূরে সরিয়া রহিয়াছে। তাহাদের পরিকল্পনায় মধ্যে দেবতা ছিল অনিষ্টকারী দানব-শক্তিরই প্রতীক মাত্র। হিংস্র বন্য পশু বৈষ্ণবধর্মে ভারতীয় অনার্য সমাজকে আরও একপ্রকার আধিভৌতিক শত্রুর সম্মুখীন পার্শ্বে নারায়ণে ছিল, তাহা আক্রমণকারী জাতিসমূহ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে

আরম্ভ করিয়া কত দিক হইতে যে কত জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত আক্রমণকারী জাতিসমূহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া আদিম অনার্য জাতিগুলিকে দেশের বাসোপযোগী সমতল ভূমি হইতে পর্বত ও অরণ্য প্রদেশে বিতাড়িত করিল। অধিকতর দৈহিক শক্তিসম্পন্ন এই সমস্ত আক্রমণকারী জাতিসমূহের সম্মুখীন হইতে অসমর্থ হইয়া ভারতের আদিম অনার্যগণ অরণ্য ও দুর্গম পার্বত্য প্রদেশের অভ্যন্তরে গিয়া আশ্রয় লইল। এই ভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সর্বদা বিপর্যস্ত হইয়া এ'দেশের অনার্য সমাজ হিতকারিণী শক্তির কোনই আভাস লাভ করিতে পারিল না। সেইজন্য ইহার পরিকল্পনায় শক্তিদেবতা অহিতকর অনর্থেরই মূল বলিয়া গৃহীত হইল।

বাংলাদেশে লৌকিক শাক্তধর্মের পুনরুত্থানেরও অনুরূপ ইতিহাসই লক্ষ্য করা যায়। শৈবধর্ম যখন বাংলার স্থিতিশীল নিরুপদ্রব সমাজের উপর নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার উপযুক্ত অবকাশ পাইয়াছিল তখন এ'দেশের সমাজের উপর বাহির হইতে এক বিক্ষোভের কারণ আসিয়া দেখা দিল। এ'দেশে তুর্কবিজয়ের পর জনসাধারণের রক্ষণশীল ধর্মমতের উপর যে রাষ্ট্রশক্তির জোরজুলুম কিছু চলিয়াছিল সমসাম[illegible]িক বাংলার ইতি[illegible]সে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনই নিষ্ক্রিয় শৈবধর্মের অ[illegible]দর্শ এ'দে[illegible] বিশেষ হইতে বিদায় লইল। প্রবল রাষ্ট্রশক্তির সম্মুখে সমগ্র [illegible] ভক্তিতে অসহায় বিবেচনা করিয়া তাহার কবল হই[illegible]

সমাজ নিজের পরাজয়ের গ্লানি হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্যই অদৃশ্য দেবতার কল্পিত শক্তির উদ্বোধন করিয়া জীবনে সান্ত্বনা সন্ধান করিয়া থাকে।

বাংলার রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবনের এই প্রকার বিপ্লবাত্মক যুগে এদেশে লৌকিক শাক্তধর্মের পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল। সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য দিয়া বাংলার এই বিশিষ্ট অধ্যাত্ম-চৈতন্যেরই বিকাশ হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকৃতির লৌকিক শাক্তদেবতাদিগের মাহাত্ম্যকীর্তন করাই এই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দেশ্য ছিল। মনসা-মঙ্গলও সেই উদ্দেশ্যেই রচিত।

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সহজেই অনুমিত হয় যে, মনসা-মঙ্গল কাব্যই ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন মনসা-মঙ্গলের কবির কাব্য-রচনায় আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। মনসা-মঙ্গলের বিষয়বস্তুও মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন। ব্রাহ্মণ্য সমাজের বহির্ভাগে এই কাব্যের উদ্ভব হয়। সমগ্র মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে একটিও উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণ-চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। কাহিনীর নায়ক বৈশ্য সদাগর, এমন কি এই কাব্যোক্ত চরিত্রের নামগুলির [illegible] পর্যন্ত তখনও সং[illegible]কৃত প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। 'বেহুলা', 'সোনেকা', 'লখাই', [illegible] ইত্যাদিই তাহার প্রমাণ। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-সমাজের বাহিরে এই কাব্যের [illegible] চৈতন্যদেবের [illegible]াবির্ভাবের পূর্বেই ইহা যে কেবল এক সম্পূর্ণ [illegible] সমা[illegible] ছিল তাহা নহে, ঐ সময়ের মধ্যেই তাহা [illegible]র্থ হইয়াছিল। কারণ, দেখিতে পাওয়া [illegible] এই বিষয়ক কাব্য-রচনায় [illegible]

[illegible] নিরূপণ করিতে হইলে ভারতের সর্পপূজা [illegible]ত হয়। কারণ, সমাজে সর্পপূজা আশ্রয় [illegible]য়াছিল। অতএব, সমাজে সর্পদেবতার [illegible]াস জড়িত আছে।

ভারতে সর্পপূজার উৎপত্তি

সভ্যতা উন্মেষের বহু পূর্বেই মানব-হৃদয়ের ভয় ও বিস্ময়-প্রমুখ জন্মলব্ধ প্রবৃত্তিগুলি হইতে সমাজের প্রাচীনতম দেবতাদিগের কল্পনা করা হইয়াছিল। সেইজন্য প্রত্যেক সমাজের প্রাচীনতম দেবতা প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভয় বা বিস্ময়ের বস্তু। প্রাচীন মানব জাতি সাধারণতঃ অরণ্য বা পর্বত-গুহায় বাস করিত, সেইজন্য অরণ্যচারী জীব-জন্তুর সঙ্গে তাহাদিগকে সর্বদা সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইত। অরণ্যচারী জীব-জন্তুর মধ্যে সর্প সর্বাপেক্ষা ভীষণ, ভারত-বর্ষের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহারা সংখ্যায়ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক। সম্মুখ-যুদ্ধে ইহাদিগকে পরাজিত করিবার উপায় নাই, ইহাদের সন্ধান অলক্ষ্য-গোচর; বিশেষতঃ ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি অন্যান্য জীব-জন্তু হইতে স্বতন্ত্র,—ইহারা পাদহীন অথচ দ্রুতগতি, জীর্ণ খোলস ত্যাগ করিয়া ইহারা বারবার নব জীবন লাভ করে; সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, ইহারা অ[illegible]—দীর্ঘকাল নিঃশ্বাস রোধ করিয়া নিরাহারে কালযাপন করিতে পারে,—এই সমস্ত কারণে এই বিশেষ জীবটি সম্বন্ধে প্রাক্-সভ্যতা যুগের সমাজ-ভুক্ত মানব-মাত্রেরই হৃদ[illegible] মিশ্রিত ভয়ের অস্তিত্ব ছিল। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে সর্পপূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদের আর অন্ত নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিত জে. ফার্গুসন তাঁহার *Tree and Serpent Worship* [illegible]ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলিয়াছেন, সর্পপূজা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের বাহিরে তুরাণীয় [illegible]তির মধ্যে উদ্ভূত হয়; অতঃপর তুরাণীয় জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম পথে [illegible]দেশে প্রবেশ করিয়া সর্পপূজা প্রবর্তিত করে,—সর্পপূজার সঙ্গে আর্যজাতির মৌলিক কোন সম্পর্ক ছিল না। আর্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া তুরাণী জাতির নিকট হইতে এই সর্পপূজা শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু এই সম্পর্কে আর একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'Fergusson wrote in 1869, and his use of terms presents difficulties. He employs the word Turanian in the sense of non-Aryan, the Turanians being a people who were ousted by the Aryans. Persians and settled Iranians gave the name Turanian

সমাজ নিজের পরাজয়ের গ্লানি হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্যই অদৃশ্য দেবতার কল্পিত শক্তির উদ্বোধন করিয়া জীবনে সান্ত্বনা সন্ধান করিয়া থাকে।

বাংলার রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবনের এই প্রকার বিপ্লবাত্মক যুগে এদেশে লৌকিক শাক্তধর্মের পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল। সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য দিয়া বাংলার এই বিশিষ্ট অধ্যাত্ম-চৈতন্যেরই বিকাশ হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকৃতির লৌকিক শাক্তদেবতাদিগের মাহাত্ম্যকীর্তন করাই এই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দেশ্য ছিল। মনসা-মঙ্গলও সেই উদ্দেশ্যেই রচিত।

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সহজেই অনুমিত হয় যে, মনসা-মঙ্গল কাব্যই ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন মনসা-মঙ্গলের কবির কাব্য-রচনায় আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। মনসা-মঙ্গলের বিষয়বস্তুও মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন। ব্রাহ্মণ্য সমাজের বহির্ভাগে এই কাব্যের উদ্ভব হয়। সমগ্র মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে একটিও উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণ-চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। কাহিনীর নায়ক বৈশ্য সদাগর, এমন কি এই কাব্যোক্ত চরিত্রের নামগুলির মশাও পর্যন্ত তখনও স[illegible]ান ভারতীয় সংস্কারে নাগ এব[illegible]হুলা’, ‘সোনেকা’, ‘লখাই’, ধ্বংসাত্মক গুইত্যাদিই, গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ এই শ্রেণীর কোন উপজাতিকে ঘুব্যের সাধের মধ্যেই ইহা প্রাণীটিকে বুঝাইত। এই সম্পর্কে হিন্দুদিগের নিত্যস্নানের তর্পণ-মন্ত্রটি [illegible]যোগ্য। তাহাতে নাগ এবং সর্পকে যে কেবল পরস্পর স্বতন্ত্র বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা নহে, ইহাতে ইহাদের প্রকৃতিও যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহারও আভাস পাওয়া যায়। মন্ত্রটি এই,

দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরাজলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

এখানে দেখা যাইতেছে যে, নাগকে যক্ষ গন্ধর্ব অপ্সরা ইত্যাদির সহিত এক সঙ্গে উল্লেখ করিয়া সর্পকে ‘ক্রূর’ বিশেষণ দ্বারা তাহা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করা

---

[১] W.D. Hambly, 'Serpent Worship in Africa', ***Field Museum of Nutural History***, Chicago, XXI (1931), p.13.

ভারতে সর্পপূজার উৎপত্তি

সভ্যতা উন্মেষের বহু পূর্বেই মানব-হৃদয়ের ভয় ও বিস্ময়-প্রমুখ জন্মলব্ধ প্রবৃত্তিগুলি হইতে সমাজের প্রাচীনতম দেবতাদিগের কল্পনা করা হইয়াছিল। সেইজন্য প্রত্যেক সমাজের প্রাচীনতম দেবতা প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভয় বা বিস্ময়ের বস্তু। প্রাচীন মানব জাতি সাধারণতঃ অরণ্য বা পর্বত-গুহায় বাস করিত, সেইজন্য অরণ্যচারী জীব-জন্তুর সঙ্গে তাহাদিগকে সর্বদা সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইত। অরণ্যচারী জীব-জন্তুর মধ্যে সর্প সর্বাপেক্ষা ভীষণ, ভারতবর্ষের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহারা সংখ্যায়ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক। সম্মুখ-যুদ্ধে ইহাদিগকে পরাজিত করিবার উপায় নাই, ইহাদের সন্ধান অলক্ষ্য-গোচর ; বিশেষতঃ ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি অন্যান্য জীব-জন্তু হইতে স্বতন্ত্র,—ইহারা পাদহীন অথচ দ্রুতগতি, জীর্ণ খোলস ত্যাগ করিয়া ইহারা বারবার নব জীবন লাভ করে ; সাধারণ [illegible] বাধ্যকর [illegible]—দীর্ঘকাল নিঃশ্বাস রোধ করিয়া [illegible] সর্পদেবী মনসায় রূপান্তরিত হইয়া যান। [illegible] কারণে এই বিশেষ [illegible] তৎকালীন মানব-সমাজেরই একটি স্বতন্ত্র শাখা মাত্র ছিল, [illegible] সরীসৃপ রূপ লাভ করিল। কিন্তু তথাপি এ'কথা স্বীকার করিতে [illegible] প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের সাহিত্য কিংবা ভাস্কর্য বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, এই নাগ ও সর্পের মধ্যে ব্যবধান কোনদিনই সুস্পষ্টভাবে তিরোহিত হয় নাই।

এতদ্দেশে প্রচলিত জীবিত সর্পপূজার একটি আদর্শ নাগপূজার সঙ্গে পরবর্তী কালে মিলিত হইয়াছে বলিয়াই আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় ধর্ম সংস্কারের মধ্যে নাগপূজা ও সর্পপূজার দুইটি স্বতন্ত্র ধারার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্যে একধারে নরনারীরূপ নাগনাগিনীমূর্তি ও অন্যধারে সরীসৃপরূপ সর্পমূর্তি—এই উভয়েরই অস্তিত্বের হয়ত ইহাই কারণ।

একজন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন যে, নাগ বলিতে সরীসৃপ ত দূরের কথা, কোনও দৈত্য কিংবা দানব কিছুই বুঝায় না। নাগ বলিতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বিশেষতঃ তক্ষশীলা অঞ্চলের এক জাতির লোককে বুঝায়। তাহারা সর্পফণাকে জীবক (totem) রূপে ব্যবহার করিত বলিয়াই তাহাদিগকে নাগ বলিয়া

to nomads of the steppe region of Central Asia... Fergusson, however, disregards the fundamental fact that culture elements may be borrowed without racial mixture when he claims that "eventually the worship of the serpent may become a valuable test of the presence of Turanian blood in the veins of people among whom it is found to prevail".'[১]

কেহ আবার মনে করেন, ভারতীয় নাগগণ একটি জাতি বিশেষ, তাহারা হয়ত সর্পকে জাতীয় অভিজ্ঞান (totem) রূপে ব্যবহার করিত; ইহা ছাড়া সর্পের সঙ্গে তাহাদের আর কোন সম্পর্ক ছিল না; সর্প এবং নাগ একার্থবাচক শব্দও নহে।

আবার কেহ মনে করেন, নাগ বলিতে সর্প-নর নামক একজাতীয় অর্ধনর ও অর্ধনাগ জাতীয় জীবকে বুঝায়। কেহ আবার মনে করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে জল-দেবতাকেই সর্প বলা হইত। বলা বাহুল্য, এই সকল মতবাদ এতই একদেশ-দর্শী ও অনুমানাত্মক যে ইহাদের কোনটিই সমগ্রভাবে গ্রহণ করা যায় না। তবে এ'কথা সত্য যে, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারে নাগ এবং সর্প একার্থবাচক ছিল না। নাগ বলিতে [illegible] গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ এই শ্রেণীর কোন উপজাতিকে বুঝাইত, [illegible] মধ্যে [illegible] প্রাণীটিকে বুঝাইত। এই সম্পর্কে হিন্দুদিগের নিত্যস্নানের তর্পণ-মন্ত্রটি উল্লেখযোগ্য। তাহাতে নাগ এবং সর্পকে যে কেবল পরস্পর স্বতন্ত্র বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা নহে, ইহাতে ইহাদের প্রকৃতিও যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহারও আভাস পাওয়া যায়। মন্ত্রটি এই,

দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরাজলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

এখানে দেখা যাইতেছে যে, নাগকে যক্ষ গন্ধর্ব অপ্সরা ইত্যাদির সহিত এক সঙ্গে উল্লেখ করিয়া সর্পকে 'ক্রূর' বিশেষণ দ্বারা তাহা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করা

[১] W.D. Hambly, 'Serpent Worship in Africa', *Field Museum of Nutural History*, Chicago, XXI (1931), p.13.

হইয়াছে। ক্রূর সর্পকে পুনরায় 'জিহ্মগ' অর্থাৎ নির্বিষ সর্প হইতেও স্বতন্ত্র করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; যে ভাবে ইহাদিগকে এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় না যে গোঁড়া হিন্দু সমাজে তখনও ইহাদের উপর কোনও প্রকার দেবত্বের আরোপ করা হইয়াছে। অতএব দেখা যায়, নাগ এবং সর্প সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আর্যেতর সমাজের মধ্যে সর্পপূজা প্রচলিত থাকিলেও প্রথমতঃ ইহার সঙ্গে যে আর্যসমাজের কোনই সম্পর্ক ছিল না, তাহা স্পষ্টতঃই অনুভব করিতে পারা যায়। মহাভারতের মধ্যে নাগ একটি জাতি—ইহারা আর্য-বিরোধী—আর্যদিগের সঙ্গে সর্বদা বিবাদে মত্ত। ইহারা তখনও সমাজে দেবতা বলিয়া পূজা পাইতে আরম্ভ করে নাই। ইহার পরবর্তী কালে আর্যেতর সমাজ হইতে জীবিত সর্প পূজার স্বতন্ত্র ধারাটি, খুব সম্ভবতঃ নাগ ও সর্প এই দুইটি শব্দের অর্থ-সাদৃশ্যের জন্য, নাগজাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হয়। তাহার ফলেই সমাজে নাগ-পূজার প্রবর্তন হয়। তখন হইতেই মহাভারতোক্ত নাগ জাতির অধিপতি বাসুকি সর্পরাজরূপে পূজা পাইতে থাকেন। মহাভারতের [illegible] কোন্ কোন নাগচরিত্রও সর্পরূপ লাভ করেন। এমন কি নাগরাজ বাসুকির [illegible] সম্পর্কে লক্ষ্য করা যাইতে বাংলাদেশে আসিয়া সর্পদেবী মনসায় রূপান্তরিত হইয়া যান। প্রাটো-অস্ট্রালয়েড্ বা যাহা তৎকালীন মানব-সমাজেরই একটি স্বতন্ত্র শাখা মাত্র ছিল, [illegible]গুলি মধ্য-পূর্বভাগ [illegible] সরীসৃপ রূপ লাভ করিল। কিন্তু তথাপি এ'কথা স্বীকার করিতে[illegible] [illegible]চীন হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের সাহিত্য কিংবা ভাস্কর্য বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, এই নাগ ও সর্পের মধ্যে ব্যবধান কোনদিনই সুস্পষ্টভাবে তিরোহিত হয় নাই।

এতদ্দেশে প্রচলিত জীবিত সর্পপূজার একটি আদর্শ নাগপূজার সঙ্গে পরবর্তী কালে মিলিত হইয়াছে বলিয়াই আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় ধর্ম সংস্কারের মধ্যে নাগপূজা ও সর্পপূজার দুইটি স্বতন্ত্র ধারার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্যে একধারে নরনারীরূপ নাগনাগিনীমূর্তি ও অন্যধারে সরীসৃপরূপ সর্পমূর্তি—এই উভয়েরই অস্তিত্বের হয়ত ইহাই কারণ।

একজন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন যে, নাগ বলিতে সরীসৃপ ত দূরের কথা, কোনও দৈত্য কিংবা দানব কিছুই বুঝায় না। নাগ বলিতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বিশেষতঃ তক্ষশীলা অঞ্চলের এক জাতির লোককে বুঝায়। তাহারা সর্পফণাকে জীবক (totem) রূপে ব্যবহার করিত বলিয়াই তাহাদিগকে নাগ বলিয়া

পরিচয় দেওয়া হইত। এই অনুমান আমাদের উপরোক্ত মতের কতকটা সমর্থক মহাভারতের নাগজাতি বুঝাইতে ইহাদিগকেও বুঝাইতে পারে। যাঁহারা মনে করেন, সর্পপূজা ভারতবর্ষের বাহির হইতে এ'দেশে আসিয়াছে তাঁহারা ইহার বিশেষ কোন যুক্তি দেখাইতে পারেন না। সেইজন্যই মনে হয়, ভারতীয় সর্পপূজার মূলে বহির্ভারতীয় কোন প্রভাব নাই—এ'দেশেই সর্পপূজার উদ্ভব হইয়াছিল কারণ, সর্প গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জীব, ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা মহাদেশই প্রধানতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। আদিম কাল হইতেই এই দুই দেশ অগণিত সর্পের বাসভূমি। ভারতবর্ষে সর্পের জাতি-সংখ্যা আফ্রিকা হইতেও অধিক। এই দেশে যত বিভিন্ন জাতীয় সর্পের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, পৃথিবীর আর কোথাও তত পাওয়া যায় না। এই জন্যই কেহ যথার্থই মনে করিয়াছেন যে, আদিম যুগ হইতেই সর্প এই দেশে ভয় ও পূজার পাত্র হইয়া আসিতেছে। এই জন্যই মনে হয়, জীবিত সর্পের পূজা দিয়াই এ'দেশে সর্পপূজার সূত্রপাত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, নাগপূজা অপেক্ষা সর্পপূজার [illegible] [illegible]চীনতর। সর্পপূজার বর্তমান আচারগুলি পরবর্তী[illegible] দর্শী ও অনুমানাত্মক যে ইহাদের [illegible] হয় বলিয়া ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম আচারগুলির এ'কথা সত্য যে, প্রা[illegible] পাওয়া যায় না।

নাগ [illegible] ইত্যাদিই [illegible]র পূজা খৃস্টপূর্ব শতাব্দীতেও যে উত্তর ভারত অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, [illegible] মধ্যেই [illegible]ষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীক্ বীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আসিবার সময় তাঁহার সঙ্গে যে সকল সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে এলিয়েন নামক একজন গ্রীক্ সেনাপতি লিখিয়াছেন, যখন আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া একের পর অন্য নগর ক্রমাগত অধিকার করিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি অনেক স্থানেই অন্যান্য পশুর সঙ্গে এক জাতীয় বিরাটকায় সর্প দেখিতে পান—এই সর্পকে ভারতীয়গণ পবিত্র জ্ঞান করিত এবং ইহাকে এক গিরিগুহায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ভক্তি সহকারে পূজা করিত।

ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে এখনও জীবিত সর্পের পূজা প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের বাহিরেও কোন নর কিংবা নারীর আকৃতি পরিকল্পনা করিয়া সর্পের পূজা করিবার পরিবর্তে সাধারণতঃ জীবন্ত সর্পের উদ্দেশ্যেই পূজা করা হইয়া থাকে। কেবল মাত্র মধ্য এশিয়ার মেসপটিমিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হইতে একটি সর্পদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহার দুই বাহুতে তাগার মত দুইটি

সর্প ও গলদেশে আর একটি সর্প হারের মত বেষ্টন করিয়া আছে।[1] দাক্ষিণাত্যের কানড়া প্রদেশের কোন কোন স্থানে এখনও জীবিত সর্পের পূজা হইয়া থাকে। নির্দিষ্ট দিনে সর্পের খাদ্যগ্রহণ করিয়া পূজারিগণ সর্প যে জায়গায় বাস করিতে পারে বলিয়া বিবেচিত হয়, বিশেষতঃ উই ঢিপি, সেই সমস্ত স্থানে গিয়া মন্ত্রদ্বারা সর্পকে আহ্বান করে। দাক্ষিণাত্যের বিশেষ কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ কোন কোন মন্দিরে জীবিত সর্প পালন করিয়া তাহাদিগের নিকট প্রত্যহ পূজা দেওয়া হয়। গৃহ্যসূত্রে নাগপঞ্চমী পূজার যে বিধি নির্দেশ রহিয়াছে, তাহা জীবিত সর্পের পূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভারতের প্রায় সর্বত্র, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, বাস্তসর্প বলিয়া পরিচিত এক জাতীয় গৃহবাসী সর্প গৃহস্থের নিকট পরম শ্রদ্ধা লাভ করিয়া থাকে। এখনও বাংলা দেশে ও অন্যত্র মৃত গোক্ষুর সর্পের ব্রাহ্মণোচিত পূর্ণ অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল নিদর্শনের ভিতর দিয়াই জীবিত সর্প পূজার ধারাটি আজ পর্যন্ত এ'দেশে অব্যাহত চলিয়া আসিয়াছে।

সর্পপূজা [illegible]রতের কোন্ জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে কতকগুলি বিষয় এই সম্পর্কে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, শবর প্রভৃতি প্রোটো-অস্ট্রালয়েড্ বা আদি অস্ত্রাল বলিয়া পরিচিত ভারতীয় যে আদিম জাতিগুলি মধ্য-পূর্বভা[illegible] আজও [illegible]ছে, তাহাদের মধ্যে সর্পপূজার বিশেষ কোন [illegible] হইতে পাওয়া য[illegible]কটি মৃৎপাত্রে পূর্ণ করিয়া [illegible] ভিক্ষু এবং সর্প [illegible]গমন করিয়া পূর্বে [illegible] প্রকার শ্রদ্ধা-বোধ নাই। দশদিকস্থ ও অনান্[illegible] জাতি সম্ভবতঃ ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছে। অতএব মনে হয়, ইহাদের মধ্যে কোন দিনই সর্পপূজার প্রচলন হয় নাই। ভারতীয়-মোঙ্গলীয় জাতিগুলির মধ্যে খাসি জাতির মধ্যে এক সর্পদেবতার বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নিকট এখনও নরবলি দেওয়া হইয়া থাকে বলিয়া সর্বসাধারণের বিশ্বাস। এতদ্ব্যতীত আসামের বোড়ো, মিস্‌মি প্রভৃতি জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে মধ্যযুগের অসমীয় ভাস্কর্যে সর্প পূজার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মোঙ্গলীয় জাতিও অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে উত্তর-পূর্ব পথে ভারতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। বিচ্ছিন্নভাবে ইহাদের দুই একটি জাতির মধ্যে সর্পপূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া গেলেও, সমগ্রভাবে ইহাদের মধ্যে কোনদিন সর্পপূজা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়া উঠিতে পারে নাই।

[1] উদ্দেশ্যে [illegible]eld *Museum of Natural History*, Chicago, Vol. XXI (1931), p. 62.

নেগ্রিটো বলিয়া পরিচিত ভারতের প্রাচীনতম জাতির লোকসংখ্যা বর্তমানে এত বিরল হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে আর কোন প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন অনুসন্ধান করা কঠিন। বিশেষতঃ বৃহত্তর ভারতীয় কৃষ্টির মধ্যে ইহাদের দান নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু দ্রাবিড় জাতির যে সকল বংশধর এখনও মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারত অঞ্চলে বসবাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যেই সর্প-পূজার সর্বাধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মনে হয়, সর্পপূজা দ্রাবিড়-সংস্কৃতিরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল, ইহার ব্যাপক প্রভাব বশতঃ পরবর্তী কালে আর্যসমাজও ইহা নিজ সভ্যতার মধ্যে বহুলাংশে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আর্যসভ্যতার প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে সর্প-পূজার কোন ইঙ্গিত পাওয়া না গেলেও ইহার অনতিকাল ব্যবধানে রচিত সাহিত্যিক নিদর্শনের মধ্যেই এই সর্পপূজার ব্যাপক পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল। এইজন্যই মনে হয়, আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অনতিকাল মধ্যেই সর্পপূজক দ্রাবিড়ভাষী জাতির সম্পর্কে আসিয়া তাহাব নিকট হইতে এই নূতন সংস্কারে দীক্ষা লাভ করে।

প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্য অর্থাৎ ঋগ্বেদের মধ্যে সর্পের উল্লেখ আছে সত্য, [illegible] সর্পপূজার উল্লেখ নাই। কিন্তু ইহারই পরবর্তী রচনা যজুঃ ও অথর্ব[illegible]চলিত [illegible]ধের মধ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। যজুর্বেদে সর্প-সম্পর্কিত শ্রদ্ধাবোধের [illegible]ভারতবর্ষে ছিল, [illegible] কেত পূজা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার উল্লেখ ইহা[illegible] স্বদেশে আসিবার সময় তাঁহার সঙ্গে যে সকল [illegible] অথর্ববেদে সর্প-সম্পর্কিত কতক [illegible] উল্লেখ আছে। ইহা হইতে যায় না। দুইটি বিষয় অনুমান করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ আর্যভাষিগণ ভারতবর্ষে আসিয়া প্রবেশ করিবার পুর্বে এই জীবটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। হয়ত যে দেশ হইতে তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, সেই দেশে জীবটি তেমন পরিচিত ছিল না। তাঁহারা শীত-প্রধান কোন দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, অতএব ইহা একেবারে অসম্ভব নাও হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আরও দেখা যাইতেছে যে, আর্যগণ যে পথ দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, সেই পথিমধ্যস্থ অঞ্চল হইতেও তাঁহারা সর্প সম্বন্ধে কিছু সংস্কার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অথর্ব বেদে সর্পের যে নাম পাওয়া যায়, তাহাদের সঙ্গে প্রাচীন বেবিলনিয়ার কতকগুলি সর্পের নামের ঐক্য রহিয়াছে। তারপর ভারতবর্ষে আসিয়া প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই এ'দে[illegible] জাত দুইটি

যে সকল অধিবাসীর সংস্পর্শে তাহাদিগকে প্রথম আসিতে হইয়াছিল, তাহারাই ছিল সর্পপূজক দ্রাবিড় জাতি। তাহাদের সংস্পর্শে আসিবার ফলেই অচিরকালের মধ্যে রচিত তাহাদের অন্যান্য বৈদিক সংহিতাগুলির মধ্যে ইহার উল্লেখ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি অনেকে মনে করেন, ঋগ্বেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে সর্পের উল্লেখ রহিয়াছে। ঋগ্বেদে 'অহির্বুধ্ন্য' নামক এক শক্তিমান জীবের দুই একবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। একজন ইংরেজ পণ্ডিত মনে করেন, এই অহির্বুধ্ন্য সর্পরূপী এক দেব-চরিত্র। কিন্তু প্রকৃত সর্প অর্থে অহি শব্দের ব্যবহার আরও পরবর্তী বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ মনে করেন, বৈদিক ইন্দ্রের চিরশত্রু বৃত্র অথবা অহি কোন শক্তিমান সর্প ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যাহা হউক, প্রকৃতপক্ষে অথর্ববেদের যুগেই সর্পের কতকগুলি মন্ত্র রচিত হইতে দেখা যায়। ইহা হইতেই মনে হয়, সর্পপূজা ইতিমধ্যেই ভারতীয় আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছে। বৈদিক যুগের পরবর্তী যুগ অথবা ব্রাহ্মণের যুগে 'সর্পবিদ্যা' ও 'সর্পবেদ' দুইটি জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই যুগেই সর্পপূজা আর্যসমাজে বিধিবদ্ধ হয়। গৃহ্যসূত্রের মধ্যে যে গার্হস্থ্য বিধি-আচারের [illegible]র্দেশ রহিয়াছে, তাহাতে সর্পপূজার বিস্তৃত ব্যবস্থার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আজও [illegible]ার প্রকরণ হিসাবে 'আশ্বালয়ন গৃহ্যসূত্রে' [illegible]শের আছে যে, 'কলস হইতে পাওয়া [illegible]কটি মৃৎপাত্রে পূর্ণ করিয়া [illegible] গমন করিয়া পূর্বে পার্থিব, অন্তরীক্ষস্থ, দিব্য, দশদিকস্থ ও অন্যান্য পূজ্য সর্পদেবতাগণকে স্বাহা এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া নমস্কার করিবে এবং তৎপর উপহার প্রদান করিবে।' ইহাই অধুনা প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী অনুষ্ঠিত সর্পপূজা নাগ-পঞ্চমী ব্রতের প্রাচীনতম রূপ।

গৃহ্যসূত্রে বর্ষার চারিমাস প্রত্যেক গৃহস্থেরই সপরিবারে মৃত্তিকার উপর শয়ন নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থকেই শ্রাবণ-পূর্ণিমা তিথিতে একটি অনুষ্ঠান পালন করিয়া উচ্চ শয্যায় শয়ন করিতে হইত; তারপর অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমা তিথিতে 'প্রত্যবরোহণ' নামক আর একটি আচার পালন করিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে পুনরায় ভূমিশয্যায় শয়ন করিতে হইত। শ্রাবণ-পূর্ণিমা হইতে মার্গশীর্ষী বা অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন গৃহে সর্পভয় নিবারণের জন্য সর্পের উদ্দেশ্যে ভোজ্য বা বলি নিবেদন করিতে হইত—চারিমাসের মধ্যে একদিনের

জন্যও ইহার ব্যতিক্রম করিবার উপায় ছিল না। অধুনা এই প্রথা লুপ্ত হইলেও নাগ-পঞ্চমীর অনুষ্ঠানের মধ্যে ইহার কিছু অবশেষ রহিয়া গিয়াছে।

প্রাঙ্‌মহাভারতীয় যুগে সর্প ও নাগের সুস্পষ্ট পার্থক্য সর্বত্র রক্ষিত হইয়াছে। অবশ্য বৈদিক ও তৎপরবর্তী সাহিত্যের মধ্যে মহাভারতের প্রায় সমসাময়িক কালের রচনা ব্যতীত নাগের সঙ্গে বড় একটা সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও তখনও সরীসৃপ অর্থে নাগ শব্দের ব্যবহার অপ্রচলিত ছিল।

মহাভারতের মধ্যেই নাগ একটি জাতি হিসাবে সর্বপ্রথম বিস্তৃত ভাবে উল্লিখিত হয়। সম্ভবতঃ সর্পপূজক হিসাবে তাহারা সর্পের কোন অভিজ্ঞানধারী ছিল, ক্রমে তাহা হইতেই তাহারা সর্পের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হইয়া যায়। নাগ জাতি আকৃতি এবং প্রকৃতিতে আর্য হইতে স্বভাবতঃই স্বতন্ত্র ছিল। তাহারা সর্পপূজক ছিল বলিয়া কালক্রমে তাহাদের উপর সর্প-চরিত্রের সমগ্র বৈশিষ্ট্যই আরোপ করা হয়। তাহাদের প্রকৃতি সর্পের মতই খল বলিয়া বর্ণনা করা হয়; সর্প মাটিতে গর্ত করিয়া বাস করে বলিয়া তাহাদিগকেও পাতালের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তাহারা আর্যবংশ-সম্ভূত—তাহাদের পিতা কশ্যপ মুনি ও মাতা কদ্রু বলিয়া দাবী করা হয়। মহাভারতের মধ্যে আর্যদিগের সঙ্গে তাহাদের বিবাদের [illegible]স্তৃত কাহিনী আছে, তাহা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি।

মহাম[illegible] উল্লেখ পাওয়া যায় [illegible]ী—কদ্রু ও বিনতা। কদ্রুর গর্ভে বাসুকি-প্রমুখ নাগগণ জন্মগ্রহণ[illegible] গরুড় ও অরুণের জন্ম হয়। বাসুকি নাগজাতির অধিপতি নিযুক্ত হ'ন। বাসুকির ভগিনীর নাম জরৎকারু।

যাযাবর ব্রতাবলম্বী এক ঋষিবংশে জরৎকারু নামক এক মুনি জন্মগ্রহণ করেন। সংসারাশ্রমের প্রতি তিনি আজন্ম বীতস্পৃহ ছিলেন। একদিন তীর্থভ্রমণ ব্যপদেশে তিনি এক জায়গায় আসিয়া উপনীত হন এবং দেখিয়া বিস্মিত হন যে, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ বৃক্ষশাখায় অধোমুখে লম্বমান রহিয়াছেন। পিতৃলোকের এই দুর্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, তিনি দারপরিগ্রহ ও সংসার-ধর্ম উদ্‌যাপন না করার জন্যই তাঁহাদের এই অবস্থা হইয়াছে। পিতৃপুরুষগণের অনুরোধে তিনি দারপরিগ্রহ করিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু সর্ত রহিল যে, তিনি উপযাচক হইয়া কাহারও কন্যা প্রার্থনা করিবেন না; কন্যা তাঁহার স্বীয় নামীয় হইবে; পত্নীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাঁহার থাকিবে না, এবং যেদিন ইচ্ছা সেই দিনই তিনি পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন।

প্রাচী[illegible]নের পৌত্র পরীক্ষিৎকে সর্প-দংশনের পর মহারাজ জনমেজয় সর্পসত্রের বা[illegible]ন করিয়া সর্পকুল নির্মূল করিতে উদ্যত হইলেন। পাতালে নাগকুলের ম[illegible]হা আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। কিন্তু তাহারা জানিয়া আশ্বস্ত হইল যে, বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর গর্ভে কোন মহাতপা মুনির ঔরসে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সে জনমেজয়ের এই অনুষ্ঠান পণ্ড করিবে।

এদিকে মুনি জরৎকারু একদিন মহারণ্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া একাকী চিৎকার করিয়া তাঁহার বিবাহ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন। তৎসঙ্গে তিনি তাঁহার সর্তগুলিও প্রচার করিলেন। শুনিতে পাইয়া বাসুকি নিজের ভগিনীকে লইয়া গিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

একদিন মুনি জরৎকারু তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিবার অপরাধে পত্নীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্বেই পত্নীর গর্ভে জরৎকারুর সন্তান আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। যথা সময়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, তাহার নাম হইল আস্তিক। আস্তিক অপ্রাপ্ত বয়সেই সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়া উঠিল, তাহার বিদ্যা বুদ্ধি ও কৌশলে জনমেজয়ের সর্পসত্র রহিত হইল।

জনমেজয়ের সর্পসত্রে নাগকুলের আতঙ্ক হইতেই সর্প ও নাগের অভিন্নতা সম্বন্ধে ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা সহজেই বু[illegible]কর নীচে মৃং [illegible] নাগজাতি সর্পপূজক ছিল বলিয়া সর্পকুলের বিনাশের অ[illegible]তঙ্ক নিতান্তই স্বাভাবিক, সর্পসত্র[illegible]াহাদের এই ব্যগ্রতা। [illegible] হহা সত্ত্বেও মহাভারতের পরবর্তী কাল হইতেই নাগ ও সর্প কখনও স্বতন্ত্র, কখনও অভিন্ন হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে।

মহাভারতের উক্ত কাহিনী ব্যতীতও বৌদ্ধ সাহিত্য ও ভারতীয় অন্যান্য কথা-সাহিত্যে নাগ ও সর্প বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বলা বাহুল্য, মহাভারতের কাহিনীই ইহাদেরও প্রধান অবলম্বন ছিল বলিয়া ইহাদিগের মধ্যেও নাগ ও সর্প-বিষয়ক এই অনিশ্চয়তার ভাব দূর হয় নাই।

জন্যও ইহার ব্যতিক্রম করিবার উপায় ছিল না। অধুনা এই প্রথা লুপ্ত হইলেও নাগ-পঞ্চমীর অনুষ্ঠানের মধ্যে ইহার কিছু অবশেষ রহিয়া গিয়াছে।

প্রাঙ্‌মহাভারতীয় যুগে সর্প ও নাগের সুস্পষ্ট পার্থক্য সর্বত্র রক্ষিত হইয়াছে। অবশ্য বৈদিক ও তৎপরবর্তী সাহিত্যের মধ্যে মহাভারতের প্রায় সমসাময়িক কালের রচনা ব্যতীত নাগের সঙ্গে বড় একটা সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও তখনও সরীসৃপ অর্থে নাগ শব্দের ব্যবহার অপ্রচলিত ছিল।

মহাভারতের মধ্যেই নাগ একটি জাতি হিসাবে সর্বপ্রথম বিস্তৃত ভাবে উল্লিখিত হয়। সম্ভবতঃ সর্পপূজক হিসাবে তাহারা সর্পের কোন অভিজ্ঞানধারী ছিল, ক্রমে তাহা হইতেই তাহারা সর্পের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হইয়া যায়। নাগ জাতি আকৃতি এবং প্রকৃতিতে আর্য হইতে স্বভাবতঃই স্বতন্ত্র ছিল। তাহারা সর্পপূজক ছিল বলিয়া কালক্রমে তাহাদের উপর সর্প-চরিত্রের সমগ্র বৈশিষ্ট্যই আরোপ করা হয়। তাহাদের প্রকৃতি সর্পের মতই খল বলিয়া বর্ণনা করা হয়; সর্প মাটিতে গর্ত করিয়া বাস করে বলিয়া তাহাদিগকেও পাতালের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তাহারা আর্যবংশ-সম্ভূত—তাহাদের পিতা কশ্যপ মুনি ও মাতা কদ্রু বলিয়া দাবী করা হয়। মহাভারতের মধ্যে আর্যদিগের সঙ্গে তাহাদের বিবাদের [illegible]স্তৃত কাহিনী আছে, তাহা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে কবি। সর্পপূ[illegible] [illegible] পাওয়া যায়ত্রী—কদ্রু ও বিনতা। কদ্রুর গর্ভে [illegible] প্রমুখ ধারাটি আজ পর্যন্ত [illegible] কত পূজা বলিতে যাহা বুঝা [illegible] চান ও অরুণের জন্ম হয়। বাসুকি অঞ্চলে সীজমনসাগাছের এই প্রকার বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়: ইহাকে উঃ. প্রদেশে মেহুণ্ড, থুহর ও সীজ এবং বোম্বাইয়ে নিবডুঙ্গ বা থোর বলে। গুজরাটে থোরডাং ডলিয়ো কটালী, হাতলোতরধারী, নানোপরদেশী; মহারাষ্ট্রে নিবডুঙ্গ, কাংটে নিবডুঙ্গ, ফনীচেং নিবডুঙ্গ, বিকাংডী; কর্ণাটে নিবডিংগু; তৈলঙ্গে চেংমুড় বলে। বাংলাদেশেই কেবল ইহার মনসা নাম। বলা বাহুল্য উদ্ধৃত নামগুলির কোনটিই সংস্কৃত হইতে জাত নহে, প্রত্যেকটি দেশজ শব্দ। ইহাদের মধ্যে তৈলঙ্গ দেশে প্রচলিত চেংমুড় নামটির কথা পরে আরও বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইবে। কারণ, বাংলাদেশে পূজিতা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া কল্পিত একমাত্র দেবীকে চেংমুড়ী বলিয়াও কোন কোন জায়গায় উল্লেখ করা হইয়াছে। আসামের বোডো নামক ইন্দো-মোঙ্গলীয় জাতির এক শাখার মধ্যে সীজ বৃক্ষের পূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা বাঘন ও বুড়ীমা নামক

প্র। নর্তনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে সর্প-দংশনের পর মহারাজ জনমেজয় সর্পসত্রের বাং. ন করিয়া সর্পকুল নির্মূল করিতে উদ্যত হইলেন। পাতালে নাগকুলের মধ্যে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। কিন্তু তাহারা জানিয়া আশ্বস্ত হইল যে, বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর গর্ভে কোন মহাতপা মুনির ঔরসে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সে জনমেজয়ের এই অনুষ্ঠান পণ্ড করিবে।

এদিকে মুনি জরৎকারু একদিন মহারণ্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া একাকী চিৎকার করিয়া তাঁহার বিবাহ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন। তৎসঙ্গে তিনি তাঁহার সর্তগুলিও প্রচার করিলেন। শুনিতে পাইয়া বাসুকি নিজের ভগিনীকে লইয়া গিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

একদিন মুনি জরৎকারু তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিবার অপরাধে পত্নীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্বেই পত্নীর গর্ভে জরৎকারুর সন্তান আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। যথা সময়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, তাহার নাম হইল আস্তিক। আস্তিক অপ্রাপ্ত বয়সেই সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়া উঠিল, তাহার বিদ্যা বুদ্ধি ও কৌশলে জনমেজয়ের সর্পসত্র রহিত হইল।

জনমেজয়ের সর্পসত্রে নাগকুলের আতঙ্ক হইতেই সর্প ও নাগের অভিন্নতা সম্বন্ধে ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝিতে
নাগজাতি সর্পপূজক ছিল বলিয়া সর্পকুলের বিনাশের আ
নিতান্তই স্বাভাবিক, [illegible]
যাহা হউব [illegible]

বাংলার মনসা-পূজা

বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভারত কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্যের কাল পর্যন্ত সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী কোন বিশেষ স্ত্রীদেবতা কিংবা কোন প্রধান সর্পিণী চরিত্রের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্বপ্রথম মহাভারতের মধ্যে নাগরাজ বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর উল্লেখ এবং তাহার বিস্তৃত পরিচয় আছে সত্য, কিন্তু তাহার উপরও কোন প্রকার দেবত্ব আরোপ করা হয় নাই। অবশ্য মহাভারতের মধ্যে কোন নাগ-চরিত্রেই দেবত্ব আরোপ করা হয় নাই। কিন্তু পরবর্তী কালে নাগরাজ বাসুকির উপর দেবত্ব আরোপিত হইলেও জরৎকারুর উপর কোনদিনই দেবত্ব আরোপ করা হয় নাই। অবশ্য আরও পরবর্তী কালে তিনি বাংলাদেশে মনসাদেবীর সঙ্গে অভিন্ন হইয়া গিয়া দেব-মর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী দেখিতে পাওয়া যায় যে, জরৎকারুর গর্ভ হইতে আস্তিকের জন্মের পরই জরৎকারুর প্রাধান্য এক প্রকার লোপ পাইয়া যায়। প্রাঙ্‌মহাভারত যুগের 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণের' এক স্থলে '[illegible] ...াদির উল্লেখ আছে। কিন্তু 'সর্পরাজ্ঞী' অর্থে সেখানে পৃথিবী,

[illegible] মোহেন্-জো-দারো

...দিক সঙ্গেই,

...াটে

...ঙ্গ,

...মুড়

...লের

...ধ্যে

...লেখ

...য়া

...রা

...ধ্য

নতম সংস্কারগুলি অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ আছে। দাক্ষিণাত্যে আর্য প্রভাবের ফল বাংলা ও আসাম প্রদেশ হইতে আরও অনেক অকিঞ্চিৎকর। ইহার ভাষায় ও আভ্যন্তরীণ লৌকিক ধর্মসংস্কারে আজ পর্যন্তও দ্রাবিড় প্রভাবই অক্ষুণ্ণ আছে। সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলা প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাচীনতম কতকগুলি জাতীয় সংস্কারের অধিকারী। শক্তি বা মাতৃকাপূজা তাহাদের অন্যতম। এই জন্যই বাংলাদেশ ও দাক্ষিণাত্য ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে এত অধিক সংখ্যক লৌকিক স্ত্রী-দেবতার পূজা দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাভারতোত্তর যুগে আর্য-প্রভাবিত ভারতের প্রায় সর্বত্রই সর্পকেও পুংদেবতা নাগরাজ বাসুকিরূপেই পূজা করা হইয়া থাকে—কিন্তু বাংলাদেশ ও দক্ষিণাত্যের প্রায় সর্বত্র ইহার পরিবর্তে কয়েকটি স্ত্রী-সর্পদেবতা পূজা পাইয়া আসিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে বাংলাদেশে পূজিতা মনসাদেবীই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

জীবিত সর্পের পূজার পরবর্তী অবস্থাই বিশেষ কোন বৃক্ষকে সর্পাধিষ্ঠিত বিবেচনা করিয়া সেই বৃক্ষের পূজা। বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন ও ব্যাপক। কারণ, উভয়ই উর্বরতাশক্তির প্রতীক্। দাক্ষিণাত্যে অশ্বত্থবৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করা হয়। সেইজন্য অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে মৃৎ কিংবা প্রস্তর নির্মিত নাগমূর্তি উপহার দেওয়া হয়—অপুত্রক নারীগণ সন্তান ...'s bad অশ্বত্থতলে নাগমূর্তি উপহার ... round ... পূজা করি... she ... becomes smaller and smaller and in the fourth round she finally vanishes and has returned to her own people. When the people go to look, there she is growing in her own place as fr... ever.

... করিয়াছেন।

Pieces of Cactus are put in ...ছেন। ইহার প্রকৃত each new Hopi house "to give the house roots". At Acoma during certain kachina activities, men rule themselves against the Cactus (carried by others) to attain manliness." (*Dictionary of Folklore Mythology and Legends*, Ed. Maria Leach ; New York, 1949, vol. I., p. 178.)

প্রত্যক্ষ ভাবে বৃক্ষমধ্যে সর্পপূজার পরের অবস্থাই প্রস্তরে খোদিত সর্পমূর্তির পূজা। সর্পের অধিষ্ঠাতা কোন নরাকৃতি দেবতা কিংবা দেবীর পরিকল্পনা আরও পরবর্তী। পৌরাণিক যুগে যখন বৈদিক নৈসর্গিক দেবদেবীগণ নর-নারীর প্রত্যক্ষ মূর্তি লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই আর্যসমাজবহির্ভূত অঞ্চল হইতে আগত

সংস্কৃতে পাওয়া যায়, যেমন—সেহুণ্ড, সিংহতুণ্ড, বজ্রী, বজ্রদ্রুম, স্নুধা, সমন্তদুগ্ধা, স্নুব, গুড়া ইত্যাদি—তাহাদের কতকগুলি প্রত্যক্ষভাবে দেশজ ভাষা হইতে গৃহীত ও কতকগুলি পরবর্তীকালে পরিকল্পিত। প্রত্যক্ষভাবে সর্পবিষ না হইলেও অন্যান্য গুণের মধ্যে স্নুহীবৃক্ষের বিষনাশ করিবারও গুণ আছে বলিয়া 'ভাবপ্রকাশে' উল্লিখিত হইয়াছে। 'ভাবপ্রকাশে' স্নুহীবৃক্ষের এইভাবে গুণকীর্তন করা হইয়াছে—'স্নুহী বা সীজ বৃক্ষ তীক্ষ্ণরেচক, দীপক, কটু ও গুরু। ইহা শূল, আম, অষ্টীলা, আধ্মান, কফ-গুল্ম, উদর, অলিন্দ, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, মেদ, অশ্মরী, ব্রণশোথ, জ্বর, প্লীহা, বিষ ও দূষীবিষ নাশ করে। স্নুহীক্ষীর উষ্ণবীর্য, স্নিগ্ধ, কটুরস ও লঘু। গুল্ম, কুষ্ঠ, উদর ও অন্যান্য দীর্ঘরোগে বিরেচনার্থ ইহা শ্রেষ্ঠ।' আবার কেহ কেহ মনে করেন, সীজগাছ বজ্রপাতনিবারক, সেইজন্য কলিকাতা ও বড় বড় সহরের বাড়ীর ছাতে টবের মধ্যে সীজ গাছ পুঁতিয়া রাখা হয়। মনে হয়, স্নুহীক্ষীরের বিষ-প্রতিষেধক গুণ হইতেই স্নুহীবৃক্ষের প্রতি আদিম সমাজে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়বোধের উৎপত্তি হইয়াছিল; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্যেও পালা বলিয়া পরিচিত এক শ্রেণীর অনুরূপ ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষেই সর্প ও অন্যান্য গ্রাম্য-দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে (M. N. Srinivas, *Religion and Society among the Coorgs of South India*, Oxford, 1952, p. 77)। পরে বৃক্ষমধ্যে স... ব ধারাটিও ইহার মধ্যে আসিয়া মিশ্রিত হয়। স্নুহীবৃক্ষে সর্পপূজার

আর্যভূমি হই[illegible] বাংলাদেশ[illegible] [illegible] আসিয়াছে। ভারতের বি[illegible]
[illegible] ...িক গণেই উও[illegible]
করিয়া গিয়াছিল, [illegible] [illegible]রাটে
দেখিতে পাওয়া যা[illegible] [illegible]বড়ুঙ্গ,
ভারতে আসিয়া ক্রমে [illegible] [illegible]ংমুড়
উভয়ের মধ্যে সংস্কৃতির আদান প্রদান আরম্ভ হয়। [illegible]
এদেশে আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারিত হয় বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা পরে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

পূর্ব-ভারতীয় মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাঙ্গুলী নামক এক দেবীর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। মহাযান বৌদ্ধদিগের মতে এই জাঙ্গুলী দেবী অত্যন্ত প্রাচীনা,—এমন কি ভগবান বুদ্ধ তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য আনন্দকে এই দেবী-পূজার গোপন মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, অত্যন্ত প্রাচীনকাল হইতেই পূর্ব

দেবতার সীজ বৃক্ষেই পূজা করিয়া থাকে। প্রস্তরখোদিত সীজ বৃক্ষ আসামের বোড়ো অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গে বোড়ো সংস্কৃতির দান অনস্বীকার্য। অতএব সীজ বৃক্ষে মনসা পূজা বোড়ো জাতির দান হইতে পারে। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের ভাষায় এই জাতীয় বৃক্ষকে Cactus বলে, ইহার শতাধিক 'genera' এবং প্রায় ১৩০০ species আছে। সীজ মনসার গাছ Cactus Indianis নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের বাহিরেও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। যেমন, 'The Cactus is of special religious significance among American Pueblo Indians. It is one of the plants that "give of themselves" to the people. The Zuni Cactus Society is a war Society functioning also for the control of game and the curing of wounds ; it approaches the cactus with a special beaded prayer feather. In the ritual whipping of chiefs being installed, the Cactus Societies of Zuni and Jemez both use cacti. This gives those who are whipped great power and luck in hunting and gambling. Members of the Hans Cactus Society also whipped each other with cacti to induce bravery and endurance, and to make the ground freeze so their warriors would leave no tracks. At Tewa, Cactus Grandmother is passed from hand to hand with song within the Winter Kiva. If she is dropped it portends bad luck. During this "journey" thrice round the circle she ...ক্রান্তা।
smaller and smaller and in the fourth round she ...ত নির্মাণ করিয়া
...nd has returned to her own people. When th...
...here she is growing in her own place as fr... ...ত ময়ূরভঞ্জ হইতে এই
... করিয়াছেন। মূর্তিটি ময়ূরভঞ্জের

Pieces of Cactus are put ...
house "to give the ... ...ত ছিল। ইহার প্রকৃত নাম জাঙ্গুলীতারা। ...প্রদায়ের বৌদ্ধ শ্রমণগণ এই দেবীর অর্চনা করিতেন। মূর্তিটি দ্বিভুজা, ...-মালা'য় দ্বিভুজা জাঙ্গুলী মূর্তি নির্মাণেরও বিধি আছে। এই মূর্তি ব্যতীতও ... মহাশয় ময়ূরভঞ্জে অনুরূপ আরও মূর্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ... ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

...র ধ্যান পূর্বোদ্ধৃত

জাঙ্গুলীতারার প্রভাব যে পূর্ব-ভারতের ভৌগোলিক সীমা... ...র্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট কর্তৃ... ও খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত একখানি সংস্কৃত ...

পশুদেবতাগণও তাঁহাদেরই অনুকরণে নানা প্রকার বিচিত্র দেবদেবীর রূপ লাভ করিতে আরম্ভ করিল। সিদ্ধিদাতা গণেশ ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পৌরাণিক যুগে দেবতার নর-নারী আকৃতির মূর্তি গঠনই যখন দেব-পূজার প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিল, তখন অনার্য দেবতাগণও এই আদর্শের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। সেইজন্য সর্পমূর্তির পরিবর্তে এইবার ইহাদের নরাকৃতি দেবতা ও সর্পের অধিষ্ঠাত্রী নারীরূপা দেবীরও পরিকল্পনা হইতে লাগিল। এই যুগ হইতেই সর্পমূর্তির পরিবর্তে সর্পদেবীর মূর্তি পূজিতা হইয়া আসিতে থাকিলেও এখনও ভারতের কোন কোন অঞ্চলে প্রকৃত সর্পমূর্তি পূজার প্রাচীনতর ধারাটির সঙ্গেও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে এখনও সর্পমূর্তির প্রচলন ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে অধিক।

খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ আর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও আর্যধর্ম ও সংস্কৃতি এই দেশে যে তাহার পরও কখনই সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিম ভারতে আর্যদিগের আক্রমণের পর পরাজিত দ্রাবিড়গণ সর্বপ্রথম সম্ভবতঃ গঙ্গার দুই তীর ধরিয়া পূর্বদিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতে থাকে। কারণ, দাক্ষিণাত্য তখনও নিবিড় অরণ্যাকীর্ণ ছিল। রামায়ণের কাহিনীই [illegible]হার প্রমাণ। বঙ্গদেশই উত্তর ভারতের মধ্যে দ্রাবিড়দিগের [illegible]শেষ [illegible] বহু দূরে। দেশে বহুকাল বসবাস করিয়া মহাভারত বা [illegible] আধুনিক বা[illegible]বে তাহারা যে নিজস্ব সংস্কারসমূহ পালন [illegible]র সমাজে তাহারই বহু [illegible] অদ্যাপি বর্তমান [illegible]ও তাহাদের অন্যতম। [illegible]ই দ্রাবিড়গণ পূর্ব- [illegible]হিত মিশ্রিত হয়, [illegible] এই মিশ্রণের ফলে [illegible]র নিকট হইতে

ভারতীয় বৌদ্ধ-সমাজে জাঙ্গুলীদেবীর পূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার সূত্রগ্রন্থ 'সাধন-মালা'তে এই জাঙ্গুলীদেবীর পূজার প্রকরণ ও তাঁহার মন্ত্রের সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ রহিয়াছে। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, জাঙ্গুলীর সঙ্গে বাংলার সর্পদেবী মনসা বা বিষহরীর সাদৃশ্য আছে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা অনুমান করেন যে, জাঙ্গুলী-দেবীর সঙ্গে মনসাদেবীর মৌলিক সম্পর্ক রহিয়াছে।

'সাধন-মালা'য় জাঙ্গুলীর চারি প্রকার সাধনার কথার উল্লেখ আছে। প্রথম দুই প্রকার সাধনার মন্ত্র হইতে দেবীর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, জাঙ্গুলীদেবী সর্বশুক্লা, চতুর্ভূজা, একমুখা, শুক্ল সর্প-বিভূষিতা ও বীণাপাণি,—কোন প্রাণীর উপর তাঁহার আসন সংস্থাপিত, দুই হস্তে ধৃত সর্প ও অপর হস্তে অভয় মুদ্রা। দ্বিতীয় সাধন মন্ত্রে দেবীর যে পরিচয় রহিয়াছে, তাহা অনেকাংশেই প্রথমেরই অনুরূপ, তবে ইহাতে দেবী ত্রিশূল, ময়ূরপুচ্ছ (সম্ভবতঃ লেখনী) ও সর্পহস্তা এবং অবশিষ্ট হস্তে অভয়দাত্রী।

'সাধন-মালা'য় দেবীর যে আর এক প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা একটু স্বতন্ত্র; কিন্তু তথাপি মূল প্রকৃতিতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইহাতে জাঙ্গুলীদেবী ত্রিমুখা ও ষড়্‌ভূজা। তিনি এখানে পীতবর্ণা ও সর্পের বিস্তৃত ফণাতলে আসীনা, তিনটি দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, বজ্র, বাণ ও তিনটি বামহস্তে পাশ, নীলোৎপল ও ধনু ধৃত, দেবী সর্বালঙ্কার-ভূষিতা ও উজ্জ্বল কুমারী লক্ষণাক্রান্তা। মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ এই পরিচয়-অনুযায়ী জাঙ্গুলীদেবীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিতেন। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু উড়িষ্যার অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জ হইতে এই প্রকার একটি মূর্তি আ[illegible]রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মূর্তিটি ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত হরিহরপুরের প্রাচীন দুর্গে রক্ষিত ছিল। ইহার প্রকৃত নাম জাঙ্গুলীতারা। মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ শ্রমণগণ এই দেবীর অর্চনা করিতেন। মূর্তিটি দ্বিভুজা, 'সাধন-মালা'য় দ্বিভুজা জাঙ্গুলী মূর্তি নির্মাণেরও বিধি আছে। এই মূর্তি ব্যতীতও স্বর্গীয় বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জে অনুরূপ আরও মূর্তির অস্তিত্ব সম্বন্[illegible]

[illegible]াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

[illegible] [illegible]ার ধ্যান পূর্বোদ্ধৃত

'পূ[illegible] [illegible]তারার প্রভাব যে পূর্ব-ভারতের ভৌগোলিক সীম[illegible]

[illegible] [illegible]বস্তৃত ছিল, তাহা খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট কর্তৃ[illegible]

ও খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত একখানি সংস্কৃত [illegible]

জানিতে পারা যায়। সাপুড়ে অর্থে বাণভট্ট জাঙ্গুলিক কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন।[১] নাটকখানির নাম 'কৌমুদি-মিত্রানন্দ'। ইহার রচয়িতার নাম রামচন্দ্র।[২] তিনি জৈনাচার্য হেমচন্দ্রের শিষ্য। খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গুজরাটের কাথিয়াবাড অঞ্চলে রামচন্দ্র তাঁহার এই নাটকখানি রচনা করেন। ইহা দশ অঙ্কে সম্পূর্ণ একটি শৃঙ্গার-রসাত্মক নাটক। পরবর্তী সংস্কৃত নাটকের আদর্শে ইহা রচিত। ইহাতে সর্পবিষ-নিরাকরণের জন্য জাঙ্গুলীদেবীর নিকট কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রোচ্চারণের কথা আছে।

ইহা হইতেই এই জাঙ্গুলীদেবীর পূজা যে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, তাহাই অনুমিত হয়। পালরাজদিগের সময় পযন্ত বাংলার সমাজে মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। অতএব এই সময় পর্যন্ত বাংলার সমাজেও যে এই প্রাচীন সর্পদেবী জাঙ্গুলীর প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত ব্যাপক ভাবেই প্রচলিত ছিল, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই সর্পদেবীর কল্পনার জন্য বেদের নিকট ঋণী বলিয়া কেহ অনুমান করিয়াছেন। অথর্ববেদে এক সর্পবিদ্যা-পারদর্শিনী কিরাত-কন্যার উল্লেখ আছে। এই কিরাত-কন্যা সর্পদংশনের প্রতিকার করিতে অভিজ্ঞা। কিন্তু অথর্ববেদে তাহার উপর তখন পর্যন্তও দেবত্ব আরোপ করা হয় নাই। সে সাধারণ অনার্য কিরাত-দুহিতা, তবে সে সর্পবিদ্যা সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী। তাহার চরিত্রগত এই অলৌকিকতার জন্য তাহার উপর পরবর্তী কালে দেবত্ব আরোপিত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। অথর্ববেদে বিষনাশিনী আর একটি চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। তাহার নাম ঘৃতাচী অনেকে মনে করেন, এই ঘৃতাচী ও পূর্বোক্ত কিরাত-দুহিতা অভিন্না। কিন্তু এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। অথর্ববেদে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবী সরস্বতীর একটি গুণের মধ্যে এই যে, তিনি বিষনাশিনী পূর্বে সাধনমালা হইতে জাঙ্গুলীতারার যে স্তব-মন্ত্র উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে দৃষ্ট তাঁহাকে একস্থানে 'সর্ব্বশুক্লাং শুক্লোত্তরীয়াং সিতরত্নালঙ্কার-ভূষিতাং বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অন্যত্র ময়ূরপুচ্ছ অর্থাৎ 'লেখনী- ন। জাঙ্গুলীদেবীর বাহন হংস, সরস্বতীদেবীর বাহনও হংস,

---

[১] নির্ণয়সাগর প্রেস (বোম্বাই, ৪র্থ সংস্করণ), ৪২

[২] পুণ্যবিজয় সম্পাদিত, জৈন আত্মানন্দ গ্রন্থমালা (ভবনগর, ১৯১৭)

প্রাচীন ভাস্কর্যে উভয়েই চতুর্ভুজা। জাঙ্গুলীদেবীর স্তবোক্ত সকল গুণই অধুনা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া পূজিতা সরস্বতীদেবীর উপরই প্রযোজ্য। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যজুর্বেদের যুগেই সঙ্গীতবিদ্যার মত সর্পবিদ্যাও একটি অবশ্যপাঠ্য বিশেষ বিদ্যা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। সেইজন্য সেইযুগে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পরিকল্পনার সহিত সঙ্গীতবিদ্যার প্রতীক্ বীণার সঙ্গে সরস্বতীদেবীর হস্তে সর্পবিদ্যার প্রতীকরূপে সর্পও স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু বৈদিক সরস্বতীর পরবর্তী সংস্কারে তাঁহার সর্প-সংস্রবের এই অনার্য অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছিল; তথাপি তাহাই যে আবার মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের বহির্ভাগেও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, জাঙ্গুলীতারার বৃত্তান্ত হইতে তাহাই জানিতে পারা যায়। এই ভাবে মূলতঃ এক হইয়াও জাঙ্গুলী ও সরস্বতী একজন বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজ ও অপর জন বৈদিক হিন্দু সমাজ অবলম্বন করিয়া ক্রমে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল।

উল্লিখিত জাঙ্গুলীদেবীই যে অথর্ববেদোক্ত সর্ববিষনাশিনী কিরাত-কন্যা, বৈদিক সরস্বতীর প্রাথমিক পরিকল্পনার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া তিনি পরে পূর্ব-ভারতীয় মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়া জাঙ্গুলী নামে পূজিতা হইতেন এবং আরও পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্ম বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে মনসাদেবী নামে পরিচিত হইয়াছেন, এই বিষয় এখন আরও আলোচনা করিয়া দেখান যাইতেছে। জাঙ্গুলীতারার পূর্বোদ্ধৃত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে আধুনিক কাল পর্যন্ত এতদ্দেশে প্রচলিত বিষহরী বা মনসাদেবীর ধ্যানটি তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, পূর্বোক্ত জাঙ্গুলীতারাই ক্রমে বিষহরী বা মনসাতে পরিণত হইয়াছেন। এই ধ্যান-মন্ত্রটিতে জাঙ্গুলীকেই স্পষ্টতঃ বিষহরী বা মনসা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ধ্যানটি এই,—

কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুবদনাং পদ্মাননাং শোভনাম্
নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরাং ফণীময়ীং দিব্যাঙ্গরাগান্বিতাম্।
চার্ব্বঙ্গীং দধতীং প্রসাদমভয়ং নিত্যং করাভ্যাং মুদা
বন্দে শঙ্কর-পুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গুলীম্॥

আধুনিককালে বাংলাদেশে প্রচলিত আরও একটি মনসার ধ্যান পূর্বোদ্ধৃত জাঙ্গুলীতারার বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে,

দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাম্
হংসারূঢ়ামুদারামরুণিতবসনাং সর্বদাং সর্বদৈব।

স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈ
র্বন্দেঽহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং যোগিনীং কামরূপাম্ ॥

সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, দ্বিতীয় ধ্যান-মন্ত্রটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহার মধ্যে মহাভারতের অষ্টনাগ আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। ইহাতেও মনসাদেবীকে হংসারূঢ়া বলা হইয়াছে, এই হংস জাঙ্গুলী ও সরস্বতীর বাহন। এতদ্ব্যতীত খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন মনসা-মঙ্গলের কবি বিপ্রদাস রচিত কাব্যে মনসাদেবীর এক নাম 'জাগুলি' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত ধর্মপূজা বিধানে মনসা বা বিষহরীর স্তোত্রে বিষহরীর নাম জাগুলি। অতএব বৌদ্ধতান্ত্রিক জাঙ্গুলী, এই জাগুলি ও মনসা যে সম্পূর্ণ অভিন্ন, তাহা এক রকম নিশ্চিত ভাবেই বলা যাইতে পারে। খৃস্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বাংলার সমাজে এই সর্পদেবী কোন কোন স্থানে জাগুলি নামেও পরিচিতা থাকিলেও তাঁহার মনসা নাম ইতিমধ্যেই ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। মনে হয়, তাহার অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্বে বাংলার সর্পদেবী এই জাঙ্গুলী নামের পরিবর্তে মনসা নামটির প্রচলন হয়। বৌদ্ধ পালরাজত্বের অবসানে যখন সেনরাজগণ কর্তৃক এ'দেশে হিন্দুরাজ-বংশ স্থাপিত হয়, তখন এ'দেশে যে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় হয়, সেই সময় বৌদ্ধধর্ম নানাভাবে আত্মগোপন করিতে আরম্ভ করে। বৌদ্ধধর্ম তখন এ'দেশের সমাজে সামাজিক প্রতিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট হওয়ার ফলে বৌদ্ধ দেবদেবীগণও তাঁহাদের বৌদ্ধ-পরিচয় পরিত্যাগ করিয়া নূতন পরিচয় গ্রহণ করিতে থাকেন। বাংলার বৌদ্ধ রাজত্বের অবসান ও হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠার যুগেই মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়কর্তৃক পূজিত সর্পদেবী জাঙ্গুলীর মনসা নামকরণ হয়। খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুসলমান আক্রমণের সময় বৌদ্ধদিগের উপর মুসলমানদিগের নির্যাতনের ফলে যখন এদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের ধর্মবিষয়ক সমস্ত পুঁথিপত্র লইয়া নেপালে পলাইয়া যান, তখন হইতে এ'দেশে জাঙ্গুলীতারার নাম সম্পূর্ণই লুপ্ত হইয়া যায়। সেইজন্যই পঞ্চদশ শতাব্দীতে মনসাদেবী-বিষয়ক একাধিক মঙ্গলকাব্য রচিত হইলেও তাহাদের মধ্যে একবার মাত্র জাঙ্গুলী বলিয়া মনসাদেবীকে উল্লেখ করা হইয়াছে—আর সর্বত্রই তাঁহার মনসা নামেরই পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মনসা নামটি কোথা হইতে আসিল, তাহাই এখন বিচার করিয়া দেখিতে হয়। প্রাচীন কোন সংস্কৃত অভিধানে কিংবা পাণিনি ব্যাকরণেও মনসা নামের উল্লেখ

পাওয়া যায় না। রামায়ণ-মহাভারত কিংবা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুরাণগুলিতেও মনসা নামের কোন উল্লেখ নাই। পরবর্তী কয়েকটি সংস্কৃত পুরাণ এবং অর্বাচীন কয়েকটি অভিধানে মনসা নামের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। এই সকল পুরাণ এবং অভিধান কোনটিই খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। অতএব মনে হয়, খৃস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতেই এই শব্দটি সংস্কৃত পুরাণ ও অভিধানে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু ইহা কোথা হইতে আসিল ?

অর্বাচীন সংস্কৃত অভিধানগুলিতে মনসা শব্দের যে ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হইয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক ; সেইজন্যই মনে হয়, শব্দটি ভারতীয় কোন অনার্যের ভাষা হইতে আসিয়াছে। সংস্কৃত অভিধানগুলিতে এই ভাবে ইহার ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হইয়াছে, যেমন, 'মনসা স্পষ্টা ইতি' মনসা, অলুক সমাস। ইহার ব্যাখ্যা স্বরূপ বলা হইয়া থাকে যে 'কশ্যপেন মনসা স্পষ্টা।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনসা-মঙ্গলের প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে মনসাদেবীর উৎপত্তির যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মনসাদেবী যে কশ্যপকর্তৃক তাঁহার মন হইতে স্পষ্ট তাহার আভাস মাত্র নাই। অতএব শব্দটি যে অনার্য-ভাষা হইতে আগত এই বিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ নাই। তাহা হইলে ইহা কোন্ অনার্যের ভাষা হইতে কি ভাবে বাংলা-দেশে আসিয়াছে তাহাই বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

এই বিষয় আলোচনা করিবার কালে ভারতের আর কোন কোন অঞ্চলে সর্পদেবী অর্থে মনসা কিংবা ইহার অনুরূপ কোন নাম প্রচলিত আছে কিনা তাহাও সন্ধান করিয়া দেখিতে হয়। উত্তর ভারত অঞ্চলে সর্পদেবীর পূজার প্রচলন খুব বেশী নাই। সর্বত্রই প্রায় সর্পদেবতা নাগরাজ বাসুকিরই পূজা প্রচলিত। দুই একটি স্থানে ইহার ব্যতিক্রম আছে, তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

বিহারের অন্তর্গত প্রাচীন রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষ যে স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই স্থানটির নাম রাজগীর ; খনন কার্যের ফলে এখানে একটি সর্প মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। মন্দির মধ্যে কয়েকটি নারীরূপা নাগিনীমূর্তি অক্ষত ভাবে পাওয়া গিয়াছে। মনে হয়, এই নাগিনীগণ সর্পদেবীরূপে এখানে এক কালে পূজা পাইতেন। যদিও প্রাচীন হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদিতে নাগিনী-পূজার কোন উল্লেখ নাই, তথাপি মনে হয় স্থানীয় কোন লৌকিক সর্পদেবী এই ভাবে হিন্দু কিংবা বৌদ্ধধর্মের মধ্যে গিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। মন্দিরটি খৃস্ট-পূর্ব প্রথম শতাব্দীর বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন। কিন্তু এই মন্দিরের ঐতিহ্যের ধারা কোনদিনই

একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। ইহা এখনও 'মনিয়ার মঠ' বলিয়া পরিচিত। স্থানীয় অধিবাসিগণ এখনও ইহাতে মনিয়ার নামক নাগের অর্চনা করিয়া থাকে। বিহারের জনশ্রুতি অনুযায়ী মনিয়ার নামক সর্প ই বাসর-গৃহে লখিন্দরকে দংশন করিয়াছিল। মনিয়ারের সঙ্গে মনসার উচ্চারণগত যে সামান্য সাদৃশ্যটুকু আছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া মনিয়ার শব্দ হইতেই যে মনসা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে এমন ধারণা করা অসঙ্গত হইবে। তথাপি একটি বিষয় এখানে স্পষ্ট হইয়াছে যে, পূর্ব-ভারত অঞ্চলে নারীরূপা সর্পদেবীর পূজা বহু প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে, বর্তমানে এই নাগিনীমূর্তিগুলিকে পূজা করিবার পরিবর্তে এই মঠে মনিয়ার নামক সর্পের উদ্দেশ্যেই পূজা নিবেদন করা হইয়া থাকে।

পূর্ব পাঞ্জাবের অম্বালা ও গুরগাঁও জিলায় দুইটি সর্পমন্দির আছে; মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মনসা।[১] পশ্চিম যুক্তপ্রদেশে হরিদ্বার সহরের উপর মনসা পাহাড় নামক একটি টিলা ও তদুপরি মনসাদেবীর মন্দির নামক এক ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে এক ক্ষুদ্র দেবীমূর্তি আছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সর্পের কোন সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় না। উত্তর প্রদেশে নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে এখনও অনেকের 'মনসা' নাম শুনিতে পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশের কোন জাতির মধ্যে এক পুং দেবতা অর্থে মনসা কথাটি প্রচলিত আছে; কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে সর্পের সঙ্গে তাহার কোনও সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। 'Mansa deo is also a household god, but is usually worshipped outside the home. A small platform of mud is raised by the wall just in front of the house, and on the wall some daubs (usually four) of *sendur* are put, and two small red flags are set up'. (Griffiths, W. G., *The Kol Tribe of Central India*, Calcutta, 1940, p. 146.)

দেবীর এই নামটি বাংলাদেশ হইতে সেই সুদূর পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম যুক্তপ্রদেশ অঞ্চলে নীত হইয়াছে কিংবা তাহা সেখানেই মূলতঃ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলিবার উপায় নাই। কারণ, এক কালে বাঙ্গালী সাপুড়েরা সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া জীবিকা অর্জন করিত; এখনও বহুস্থানেই তাহাদেরই বংশধরগণ তাহাদের জাত-ব্যবসায় পালন করিয়া যাইতেছে। উত্তর প্রদেশে এক

---

[১] H. A. Rose, *A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and North Western Frontier Province* (Lahore, 1919), p. 318.

শ্রেণীর সাপুড়িয়া আছে, তাহারা এখনও 'বাঙ্গালী' বলিয়া পরিচিত; কিন্তু তাহাদের মাতৃভাষা এখন হিন্দী।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত রাঁচি জিলার ওরাওঁ নামক আদিম জাতির মধ্যে সর্প-দেবীরূপে 'মনসা'র নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সাপের ওঝাকে 'নাগমতি' বলে। নাগমতি ও তাহার শিষ্যগণ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে 'মনসা'র নিকট মুরগী বলি দিয়া 'মনসা'র পূজা করিয়া থাকে। মতি ও তাহার শিষ্যগণ এই উপলক্ষে সারাদিন উপবাস করিয়া থাকে এবং সন্ধ্যার সময় নাগমতির জন্য একটি এবং তাহার প্রত্যেক শিষ্যের জন্য একটি করিয়া মুরগী বলি দেয়। সকলে মিলিয়া একসঙ্গে মনসার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া গান গাহে ও তালে তালে হাতে তালি বাজাইয়া থাকে। এই উপলক্ষে সাপের বিষ ঝাড়িবার নানা প্রকার মন্ত্র আবৃত্তি করা হয় এবং নানা জাতির সাপের নাম করা হয়। মন্ত্র দ্বারা বিষ প্রথমতঃ উপরের দিকে ও পরে নীচের দিকে চালাইয়া দেওয়া হয়। ওরাওঁদিগের মধ্যে প্রচলিত মনসার মাহাত্ম্য কথা কিংবা বিবিধ সর্পের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই, তাহা হইলে বাংলা দেশের সঙ্গে ইহার কোন যোগ আছে কিনা জানা যাইত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, মনসা নামটি বাংলাদেশ হইতেই রাঁচির ওরাওঁ অঞ্চলে গিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মানভূম ও হাজারিবাগ জিলার সংলগ্ন অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর লোক বিশেষতঃ কুর্মীদিগের মধ্যে সর্পদেবী হিসাবে মনসা নামটি সুপরিচিত। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদিগের মধ্যেও মনসার নাম পরিচিত।

সিংহভূম জিলার অন্তর্গত কল্হন অঞ্চলের হো জাতির মধ্যেও মনসা দেবীর নাম প্রচলিত আছে—সেখানেও বাংলাদেশ হইতেই যে নামটি গিয়াছে এ বিষয়ে কোন ভুল নাই। কিন্তু বাংলা দেশের মত মনসার পূজা সেখানে প্রচলিত হইতে পারে নাই, বরং মনসাকে তাহারা নিজস্ব উপজাতীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। সেখানে মনসার কোন প্রতিমা কিংবা ঘট গড়া হয় না, ক্ষুদ্র একটি মাটির ঢিপি নির্মাণ করিয়া তাহাতেই মনসাদেবীর উদ্বোধন করা হইয়া থাকে। হো যুবকগণ ওড়িয়া ওঝার নিকট হইতে সাপের মন্ত্র শিক্ষা করে; এই মন্ত্রগুলি সাঁওতাল পরগণায় ব্যবহৃত সাঁওতাল ওঝাদিগের মতই বাংলা, 'they are muttered and sung in such a sing-song tune that very few could understand that they were mostly in Bengali spoken in Oriya style.'

এমন কি দেওঘরে বৈদ্যনাথ শিবমন্দিরের আঙ্গিনায়ও একটি মনসাদেবীর মন্দির আছে, কিন্তু মন্দিরটি যে ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের পর অর্থাৎ নিতান্ত আধুনিক কালে নির্মিত তাহা বুঝিতে পারা যায়।

অতএব বাংলাদেশের বাহিরে নামটির সন্ধান পাওয়া গেলেই তাহাই বাংলায় প্রচলিত মনসা নামটির উৎপত্তির মূল বলিয়া নির্দেশ করা সমীচীন হইবে না।

বাংলার আর্য-পূর্ব সভ্যতার সহিত দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সভ্যতার অনেকাংশেই ঐক্য ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সেইজন্যই বাংলার সর্পদেবী জাঙ্গুলীর মত দাক্ষিণাত্যেও বিভিন্ন নামীয় সর্পদেবীর অস্তিত্ব ছিল এবং এখনও আছে। জাঙ্গুলী শব্দটি যেমন সম্ভবতঃ অনার্য শব্দ 'জঙ্গল' বা বন হইতে উদ্ভূত (জঙ্গল বা অরণ্যের অধিবাসিনী এই অর্থে) এই সকল সর্পদেবীর নামও অনার্যভাষা-উদ্ভূত ছিল। যেমন মুদামা, মঞ্চাম্মা ইত্যাদি। অন্ধ্রদেশে বিশেষতঃ ভিজগাপত্তন জিলার দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় নেলোর প্রভৃতি জিলায় নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে নাগম্মা বা বালনাগম্মার কাহিনী নামক এক সর্পকাহিনী প্রচলিত আছে। ইহাতে মৃত্তিকাদ্বারা একটি নারীমূর্তির উপরার্ধ গঠন করা হয় এবং তাহাই নাগম্মা নামে পরিকল্পিত হয়। পুতুলনাচ সহযোগে নাগম্মার মাহাত্ম্যসূচক কাহিনী গান করিয়া এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী (তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রী) অন্ধ্রদেশের প্রায় সর্বত্র এমন কি মাদ্রাজ সহরেও জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। তবে নাগম্মার কাহিনীর মধ্যে যে সকল ঘটনা বিবৃত হয়, তাহাদের সঙ্গে বাংলাদেশের মনসা-কাহিনীর কোন যোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। নাগিনী চরিত্রের নাগম্মা কিংবা বালনাগম্মা নামটি কোনও অধুনা-লুপ্ত তেলেগু নামের পরিবর্তে বর্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

মহীশূরে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে মুদামা নামে এক সর্পদেবী আজ পর্যন্ত পূজা পাইয়া আসিতেছেন। উচ্চতর হিন্দু সমাজের মধ্যে আর্যপ্রভাব বশতঃ পুংদেবতা নাগরাজেরই পূজা প্রচলিত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নতর সমাজে এই লৌকিক স্ত্রী-দেবতার পূজার বিশেষ প্রাধান্য লক্ষিত হয়। মহীশূরের প্রাচীন ভাস্কর্যে মুদামার বহু মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর মূর্তির নিম্নভাগ সর্পাকৃতি ও উপরের ভাগ স্ত্রী-আকৃতি। মৎস্যকন্যার মত ইহারা অর্ধনাগ ও অর্ধনারী-মূর্তিবিশিষ্ট। বহু প্রাচীনকালে মধ্য-এসিয়ার স্কাইথীয় জাতির মধ্যে এলা নামে অনুরূপ আকৃতির এক নাগকন্যা পূজিতা হইত। স্কাইথীয়গণ ভারতবর্ষে আগমন

করিবার পর তাহারা এই পূজার প্রথা ভারতবর্ষেও প্রচলন করিয়া থাকিবে। কারণ, মহাভারত ও বৌদ্ধ সাহিত্যে এলাপাত্র নামক এক নাগের বিস্তৃত উল্লেখ আছে। এই আদর্শের নাগকন্যার মূর্তি ভারতের আরও বহু অঞ্চল হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। উড়িষ্যায় ময়ূরভঞ্জে পাঁচপীরের অন্তর্গত খিচিং নামক স্থানে কিঞ্চকেশ্বরী (কঞ্চুকেশ্বরী ? কঞ্চুক—সর্পখোলস) বা খিচিঙ্গেশ্বরী নামে এক সর্প-দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত কোপ্তিপন্দা ও রায় বনিয়াতে বৈরাট-পাটঠাকুরাণী নামেও এক সর্পদেবীর সহিত পবিচয় লাভ করা যায়। ইহাদেরও আকৃতি সম্পূর্ণভাবেই মহীশূরের মুদামা মূর্তিরই অনুরূপ। এই মূর্তিগুলি দ্বিভুজা, উভয় বদ্ধমুষ্টিতে সর্পশিশু ধৃত, মস্তকোপরি বিস্ফারিত সর্পফণার ছত্র, মুখে ধ্যানভঙ্গি। দক্ষিণাপথের এই মুদামা মূর্তির আদর্শের সঙ্গে বাংলার প্রাচীন মনসা-মূর্তিগুলির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের উপরিভাগের গঠনাকৃতি প্রায় অভিন্ন। মনে হয়, ভাস্কর্যে এই প্রকার সর্পদেবী নির্মাণের একটি আদর্শ দক্ষিণাপথ হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, তবে বাংলাদেশের তদানীন্তন স্থানীয় দেবীমূর্তি নির্মাণের আদর্শের প্রভাব এই দেশীয় মূর্তিগুলির উপর কতদূর কার্যকরী হইয়াছিল.: তাহারই ফলে ইহা হইতে ইহাদের নাগসংস্রবের অংশ পরিত্যক্ত হইয়া বলিয়া এই বিষয়ে পরে বিস্তৃততর আলোচনা করা যাইতেছে। শর উপর

মাদ্রাজ সহরে প্রাদেশিক সরকারের মিউজিয়ামে বিভিন্ন রূপের কয়েকটা নাগমূর্তি রক্ষিত আছে—এতদ্ভিন্ন মাদ্রাজের সমুদ্রোপকূল অঞ্চলে ভ্রমণ করিলে অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে সরীসৃপাকৃতি নাগমূর্তি প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা দেশের নাগঘটে, পটে, মেড়ে বা করণ্ডীতে যে সকল নাগ-নাগিনী রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, ইহাদের মধ্যে তাহাদের বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না; বরং অনেক সময় নিঁখুত ঐক্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

দাক্ষিণাত্যের লৌকিক ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই মুদামা ভিন্ন অন্যান্য লৌকিক সর্পদেবীর পূজাও তথায় আজ পর্যন্তও প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে কানাড়া প্রদেশের এক স্থানের মনে মঞ্চাম্মার নাম উল্লেখযোগ্য। মনে মঞ্চাম্মা প্রকৃতপক্ষে কোন দেবদেবীর নাম নহে, ইহা একটি অদৃশ্য সর্পের নাম। তবে নামটি স্ত্রীঅর্থ-জ্ঞাপক বলিয়া এই দেব-কল্প সর্পকেও স্ত্রীসর্প বলিয়া কল্পনা করা হয়। এই সর্পিণীর উপর দেবত্ব আরোপ করা

হইয়া থাকে এবং বৎসরে এক দিন মাত্র (নাগপঞ্চমীর দিন নহে) তাহার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করা হয়। তাহার পূজা-স্থানকে 'মনে মঞ্চাম্মার স্থান' বলে, পূজাস্থানে ক্ষুদ্র একটি গৃহ আছে, তন্মধ্যে অবশ্য কোন দেব-মূর্তি নাই—বল্মীকস্তূপের আকৃতি একটি নাতিবৃহৎ স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তূপের সম্মুখে মনে মঞ্চাম্মার পূজা নিবেদন করা হইয়া থাকে। সর্প সাধারণতঃ বল্মীকস্তূপেই বাস করে বলিয়া এই অদৃশ্য সর্পিণীকে বল্মীকবাসিনী বলিয়াই কল্পনা করা হইয়া থাকে।

কেহ কেহ মনে করেন, এই মঞ্চাম্মা প্রাদেশিক উচ্চারণে 'মনচা অম্মা' অর্থাৎ 'মন্‌চা মাতা' হয়। সেখানে 'চ'-কে 'স'-র মত উচ্চারণ করা হয়। তাহার ফলেই মন্‌চা অম্মা, মনসা মা-তে গিয়া দাঁড়ায়। এই মনসা মা হইতেই বাংলার মনসা মাতা বা মনসাদেবীর উৎপত্তি হইয়াছে।[১] এই মতের সমর্থন করিতে গিয়া কেহ আবার ঐতিহাসিক নজির উল্লেখ করিয়া বলেন,—একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া বাংলা দেশে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহারা খুব সম্ভবতঃ মঞ্চাদেবীর পূজার সমর্থক ছিলেন, এদেশে তাঁহারা প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবতঃ এই মঞ্চাদেবীরও [illegible] পরিকল্পিত [illegible] পায়। এতকাল জাঙ্গুলীদেবী যে সম্মান লাভ করিয়া এক [illegible]লেন, বৌদ্ধধর্মের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে তাহা মঞ্চাদেবীর ভাগ্যে গিয়া [illegible], এই মঞ্চাদেবীই ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারদিগের হাতে পড়িয়া অনতিকাল মধ্যে মনসায় পরিবর্তিত হইয়া যায়।···এই মত সত্য হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বাংলার মনসাদেবী দ্রাবিড়, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য এই তিন স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ধর্মগত আদর্শের সঙ্কর সৃষ্টি। মঞ্চাম্মা হইতে মনসা মাতা শব্দের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু তাহা হইতেই একথা প্রমাণিত হয় না যে, কানাড়া প্রদেশের একটি গ্রাম্য সর্পদেবতা বাংলা দেশে আসিয়া মনসাদেবীতে পরিণত হইয়াছে। সেনরাজবংশের সঙ্গে মঞ্চাদেবীর সম্পর্ক কল্পনা করাও কতদূর সঙ্গত হয়, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে মনে মঞ্চাম্মার প্রকৃতি সম্বন্ধেও একটু স্পষ্ট ধারণা করিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ, কর্ণাট হইতে বাংলাদেশ পর্যন্ত যে দেবতার প্রতিষ্ঠা প্রচারিত হইয়াছে নিজের দেশে তাহার প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত ব্যাপক থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মনে মঞ্চাম্মা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, তাহার কোন মূর্তি নাই। কর্ণাটদেশের তোরিয়ার,

[১] ক্ষিতিমোহন সেন, 'বাংলায় মনসা পূজা', প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৯, পৃঃ ৩৯১

চক্র প্রভৃতি নামে পরিচিত কতকগুলি অস্পৃশ্য জাতি বল্মীকস্তূপে এই সর্পদেবতার উদ্দেশ্যে পূজা করে। সেনরাজগণ ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত; দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে যে কি সম্পর্ক তাহা সর্বজনবিদিত। অতএব সর্পদেবী মনে মঞ্চাম্মার সঙ্গে সেনরাজদিগের কোন সম্পর্ক কল্পনা করা নিতান্ত ভুল হইবে। সেইজন্য যাঁহারা মনে করেন, সেনরাজগণের আনুকূল্যে বঙ্গদেশে মনসাদেবী নামে মনে মঞ্চাম্মার পূজা প্রচারিত হয়, তাহাদের যুক্তি সমর্থন করা যায় না। অতএব সেনরাজদিগের মধ্যস্থতায় দাক্ষিণাত্যের এই মঞ্চাম্মা নামটি বাংলা দেশে আসিয়া মনসায় রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। যদি মঞ্চাম্মা হইতেই মনসা মাতার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে আরও একটি সূত্র আছে যাহার মধ্যস্থতায় এই নামটি বাংলা দেশে আনীত হইয়া থাকিতে পারে। তাহা বাঙ্গালী সাপুড়ের দল। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এক কালে বাঙ্গালী সাপুড়ের দল সাপ ধরিয়া, খেলা দেখাইয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল রিভ্রমণ করিত। বহু অঞ্চলেরই মধ্যযুগের প্রাদেশিক সাহিত্যে বাঙ্গালী সাপুড়ের খ পাওযা যায়। আইন-ই-আকবরীতেও বাঙ্গালী সাপুড়ে সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ । এতদ্ব্যতীত উত্তর ও মধ্যপ্রদেশ হইতেও গোরখনাথের শিষ্য বলিয়া পরিচিত যোগিসম্প্রদায়ভুক্ত এক শ্রেণীর সাপুড়ে প্রতি বৎসর বাংলাদেশের উপর দিয়া কামরূপ কামাখ্যা পর্যন্ত ভ্রমণ করিত। কারণ, তাহাদের বিশ্বাস, কামাখ্যা সিদ্ধপীঠ, এখানে না আসিলে সর্পমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। তাহারা বাংলাদেশ হইতে মনসা নামটি মধ্যভারতে লইয়া প্রচারের সহায়তা করিয়াছে, কিংবা মধ্যভারত হইতে তাহা বাংলা দেশে আনিয়াছে। অতএব মঞ্চাম্মা শব্দটিই যদি বাংলা দেশে আসিয়া মনসা হইয়া থাকে তবে বাঙ্গালী সাপুড়ের দলের মধ্যস্থতায়ই তাহা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেনরাজদিগের মধ্যস্থতায় তাহা কদাচ হয় নাই।

অতএব বাংলায় মনসা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া গেল। প্রথমতঃ পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশে পূজিতা সর্পদেবী মনসার প্রত্যক্ষ প্রভাব ও দ্বিতীয়তঃ কর্ণাট প্রদেশের গ্রাম্য সর্পদেবী মঞ্চাম্মার (প্রকৃত নাম মনে মঞ্চাম্মা) প্রভাব। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটিই নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য নহে।

সর্বপ্রথম সংস্কৃত পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এই কয়খানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপপুরাণে মনসা নামটির সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। উল্লিখিত পুরাণ প্রায় কোনটিই খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। এই

উপপুরাণগুলিতে মনসার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখিয়া ইহাই মনে হয়, এই দেবতার পূজা সমাজে অধিক দিন ধরিয়া প্রবর্তিত হয় নাই। তবে ইহার অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পূর্বে প্রবর্তিত হইয়াছিল, এমন অনুমান করা যাইতে পারে।

এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন বাংলার কতকগুলি ঐতিহাসিক আবিষ্কার দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে। বাংলা ও ইহার সংলগ্ন প্রদেশগুলি হইতে অসংখ্য মনসামূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের নির্মাণের সময় খৃস্টীয় দশম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বলিয়া অনুমিত হয়। বিশেষতঃ বীরভূম জিলার পাইকর গ্রামে প্রাপ্ত একটি মূর্তির নিম্নভাগে সেন বংশের প্রথম রাজা বিজয় সেনের নাম খোদিত দেখিয়া ইহার সময় সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতেছে। বিজয় সেন খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। উত্তর বঙ্গে পাহাড়পুর খননের ফলেও একটি মনসামূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাও খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। দিনাজপুর জিলার মরাইল গ্রামে প্রাপ্ত একটি মনসা-মূর্তিতেও একটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। এই লিপির ভঙ্গি দেখিয়াও বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিয়াছেন যে, ইহাও খৃস্টীয় ১০ম-১১শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ। পাইকরে প্রাপ্ত মূর্তিটির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ইহার সময় সম্বন্ধে নির্ভুল ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়াই যে ইহার মূল্য তাহা নহে, ইহার সঙ্গে সেন-বংশের রাজা বিজয় সেনের নাম জড়িত বলিয়া ইহার আরও বিশেষ একটু মূল্য আছে। ইহা দেখিয়া এমনও মনে হইতে পারে যে, এই দেবী দাক্ষিণাত্য হইতে আগত রাজবংশের পৃষ্ঠপোষিত এবং সম্ভবতঃ তাহাদিগকর্তৃকই এই দেবীপূজার প্রথা দাক্ষিণাত্য হইতে এই দেশে আনীত হয়, অথবা এমনও মনে হইতে পারে যে, এই দেবীর পূজা সেনরাজগণের স্বদেশীয় ধর্মমতের অনুকূল বলিয়া তাঁহারা ইহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। মূর্তিটির একটু বর্ণনা দিয়া ইহার সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বীরভূম জিলার অন্তর্গত পাইকর গ্রামে এই মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়। মূর্তিটির মস্তকের দিক ভগ্ন বলিয়া বহুদিন ইহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে নাই, অতঃপর ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ১৯২১-২২ সনের বার্ষিক বিবরণীতে ইহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হয়।

ইহা প্রকৃতপক্ষে একটি মূর্তি-লিপি (Imago Inscription)। মূর্তির নিম্নভাগে প্রাচীন অক্ষরে একটি লিপি খোদিত আছে। এই লিপি হইতেই মূর্তিটির সময়

নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে। প্রস্তরের একটি স্তম্ভগাত্রে এই মনসার মূর্তিটি খোদিত। মূর্তিটি দ্বিভুজা, প্রফুল্লকমলাসনা, মস্তকের দিক ভগ্ন, ডান পাশে ক্ষুদ্রাকৃতি একটি পুরুষ মূর্তি; সম্ভবতঃ ইহা জরৎকারু মুনির মূর্তি। দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ হাঁটুর উপর স্থাপিত; বাম হস্তের মুষ্টিতে একটি সর্পশিশু ধৃত। মূর্তির নিম্নভাগে প্রাচীন অক্ষরে এই লিপি খোদিত—

……রাজেন শ্রীবিজয়সে (নেন ?)

মনে হয়, লিপির প্রথম ও শেষ ভাগ বিনষ্ট হইয়াছে। উল্লিখিত এই বিজয়সেন বাংলার সেনরাজবংশের রাজা বিজয়সেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। মূর্তিটিও মনসার বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তখনও এই দেবীকে মনসা বলিয়াই অভিহিত করা হইত কিনা, তাহা জানিতে পারা যায় না। এখন প্রশ্ন এই যে, বিজয়সেনের নাম ইহার সঙ্গে কেন যুক্ত হইল? মনে হয়, যে মন্দিরের স্তম্ভগাত্রে এই দেবীমূর্তি খোদিত সেই মন্দির বিজয়সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়। মন্দিরে অন্য স্বতন্ত্র কোন প্রধান দেবমূর্তি ছিল; ইহার স্তম্ভগাত্রে নানা লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি মাত্র উৎকীর্ণ হইয়াছে, মনসার মূর্তি তাহাদের অন্যতম। প্রাচীন মন্দির নির্মাণের ইহাই সাধারণ নিয়ম। এই মনসাদেবীর সঙ্গে বিজয়সেনের প্রত্যক্ষ কোন সংস্রব না থাকিবারই কথা। কিন্তু এই বিষয়টিই ভুল করিয়া অনেকে বিজয়সেনের সঙ্গে এই মনসাদেবীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কল্পনা করিয়াছেন। সেনরাজ-দিগের আনুকূল্যে বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু ভাস্কর্যের পুনরুত্থান হইলে স্থানীয় নানা লৌকিক দেবদেবীও পৌরাণিক মর্যাদা লাভ করিয়া অভিজাত দেব-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইবার প্রয়াস পান। সেইজন্যই সেই যুগের বাংলার হিন্দু-ভাস্কর্যে অ-পূর্বপরিচিত বহু নূতন দেবদেবী রূপ লাভ করেন। মনসা তাহাদের অন্যতম।

উক্ত স্তম্ভলিপিটির প্রায় সমসাময়িক কালে বীরভূম অঞ্চলে আরও বহু মনসার মূর্তি খোদিত হয়। কারণ, বীরভূম অঞ্চলে সর্পদেবীর পূজা কেবলমাত্র যে এক অতি প্রাচীন প্রথা তাহা নহে, আজ পর্যন্ত বীরভূমেই মনসা পূজা সর্বাধিক প্রচলিত। বীরভূমের এই লোক-সংস্কৃতির ধারা বহু প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্তও অব্যাহত চলিয়া আসিতেছে। সেই অঞ্চলে হিন্দু ভাস্কর্যের পুনরুত্থান হইবার পর স্বভাবতঃই সেইজন্য সর্পদেবী ইহার প্রধান বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উক্ত বার্ষিক বিবরণীতে আর একটি পূর্ণাঙ্গ মনসা-মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার সঙ্গে অবশ্য কাহারও নাম জড়িত নাই বলিয়া

ইহার সময় সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানিতে পারা যায় না। তবে এই মূর্তিটির গঠনভঙ্গিও পাইকরে প্রাপ্ত মনসা-মূর্তির সহিত প্রায় অভিন্ন দেখিয়া ইহাই বিবেচিত হয় যে, এই উভয় মূর্তিই অনতিকালব্যবধানেই খোদিত হইয়াছিল। আলোচ্য মূর্তিটি বীরভূম জেলার অন্তর্গত মুরারৈ রেলস্টেসনের অদূরবর্তী ভাদীশ্বর নামক গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মূর্তিটি সম্পূর্ণ অক্ষত ভাবেই পাওয়া গিয়াছে। দেবীর মস্তকের উপর সাতটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া আছে, বাম হস্তের মুষ্টিতে ধৃত আর একটি সর্প। সর্পনির্মিত কাঁচুলিতে বক্ষ আচ্ছাদিত ; এক পার্শ্বে তাহার একটি সহচরী (নেতা ?), অপর পার্শ্বে পাইকর মূর্তির অনুরূপ একটি পুরুষমূর্তি, সম্ভবতঃ জরৎকারু মুনির মূর্তি। ললিতাসন ভঙ্গিতে প্রফুল্লকমলাসনে দেবী আসীনা, অঙ্গে অলঙ্কার-সম্ভার। আসনের নিম্নভাগে পূজাঘট, তাহার উপর দেবীর পদ স্থাপিত। এই মূর্তিটি প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য-শিল্পেব একটি উল্লেখযোগ্য দান বলিয়াই মনে হয়। ইহা স্তম্ভগাত্রে খোদিত নহে, পাথর কাটিয়া সম্পূর্ণ মূর্তির আকৃতিতে স্বতন্ত্র করিয়া গঠিত। এই মূর্তির গঠনাদর্শ সর্বাংশেই পাইকর মূর্তির অনুরূপ। অতএব মনে হয়, একাদশ শতাব্দীর নিকটবর্তী কোন সময়ে এই মূর্তিও নির্মিত হইয়াছিল। রাজসাহী হইতে ধাতুনির্মিত একটি মনসা মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মূর্তিটি পালরাজত্বের প্রথমভাগে নির্মিত বলিয়া অনুমিত হইলেও এই সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিতে পারা যায় না। মূর্তিটির গঠন-ভঙ্গি অনুপম, প্রস্তরমূর্তিগুলি হইতে ইহার নির্মাণ-কৌশল অধিকতর সূক্ষ্ম। ললিতাসনে দ্বিভুজা দেবী সপ্তসর্প-বিধৃত ফণাছত্রতলে আসীনা, বামাঙ্কে একটি ক্ষুদ্র শিশু, সম্ভবতঃ ইহা অষ্টম নাগ আস্তিকের নররূপ ; দেবীর দক্ষিণ হস্তের পশ্চাদ্দিকে একটি সপত্র বৃক্ষশাখা, সম্ভবতঃ ইহা সীজ-মনসার শাখা। এ'কথা সত্য যে, মনসার প্রস্তর-মূর্তিগুলি নির্মাণের এক বিশিষ্ট আদর্শ এদেশের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত ছিল, তাহার সঙ্গে ইহার পরিকল্পনার বিশেষ সামঞ্জস্য নাই—মনসা-মূর্তি নির্মাণের এক স্বতন্ত্র আদর্শের ধারা ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই ধারা পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে ইহা ষষ্ঠী দেবীর মূর্তি হওয়াও বিচিত্র নহে। কলিকাতা মিউজিয়মের পুরাতত্ত্ববিভাগে এই মূর্তিটি রক্ষিত আছে। কলিকাতা ভারতীয় প্রত্নাগার, ঢাকা প্রত্নাগার ও রাজসাহী বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রত্নাগার প্রভৃতি স্থানে মনসা ও ষষ্ঠী দেবীর বহু মূর্তি সংরক্ষিত আছে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আদর্শে গঠিত মনসা-মূর্তিও বাংলা ও তৎপার্শ্ববর্তী প্রদেশ-সমূহ হইতে একাধিক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে হস্তীর উপর আসীনা এক মনসা-মূর্তি উল্লেখযোগ্য। মূর্তিটি আসাম হইতে প্রাপ্ত। সর্প অপেক্ষা বন্য হস্তীর উৎপীড়নই আসামে অধিক। এইজন্য কিংবা হস্তীর আর এক নাম নাগ (পূর্বোদ্ধৃত একটি মনসা-ধ্যানে মনসাদেবীকে 'নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরাম্' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে), এই জন্য মনসাদেবীকে গজাসীনা করা হইয়া থাকিবে। এই মূর্তি ঢাকা প্রত্নাগারে রক্ষিত আছে। ইহা ছাড়াও শিশুক্রোড়া এক প্রকার মনসা-মূর্তি উত্তর বঙ্গ ও উড়িয্যার ময়ূরভঞ্জ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু শিশু-ক্রোড়া মূর্তিগুলিকে মনসাদেবী বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া গেলেও, তাহা প্রকৃত মনসার মূর্তি না হইয়া ষষ্ঠীদেবীর মূর্তিও হইতে পারে। প্রাচীন ভাস্কর্যে ষষ্ঠীদেবী ও মনসাদেবী প্রায়ই এক হইয়া গিয়াছেন। বর্তমান কালেও পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র মনসাতলা ও ষষ্ঠীতলা অভিন্ন স্থান। ময়মনসিংহ জিলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত রসুলপুর গ্রাম হইতে ধাতুনির্মিত একটি মনসা-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্তিটি প্রায় এক হাত উচ্চ। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার এক পার্শ্বের ঊর্ধ্বভাগে গণেশ ও নিম্নভাগে একটি নাগিনী এবং অপর পার্শ্বের ঊর্ধ্বভাগে কার্ত্তিকেয় ও নিম্নভাগে আর একটি নাগিনী মূর্তি আছে। দেবীর মস্তকের উপর সাতটি সর্প ফণাছত্র বিস্তার করিয়া আছে, তাঁহার ক্রোড়স্থিত শিশুর মস্তকটিও একটি সর্পফণায় আচ্ছাদিত। ক্রোড়স্থ শিশু যে আস্তিক তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। দেবীর দুই স্কন্ধের উপরের দিকে দুইটি সীজ-মনসাবৃক্ষের শাখা। ইহা মূর্তিটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লীলাসন ভঙ্গিতে দেবী আসীনা। পাদনিম্নে কোনও ঘট কিংবা দেবীর কোনও বাহন নাই। জরৎকারু মুনির মূর্তিও নাই। মূর্তিটির গঠন-ভঙ্গি অনুপম—এই আদর্শে নির্মিত মূর্তি বাংলাদেশের আর কোনও অঞ্চল হইতেই আবিষ্কৃত হয় নাই। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাব বশতঃই যে অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি আসিয়া ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। মূর্তিটি একাদশ শতাব্দীর পরবর্তী কালে নির্মিত হওয়া সম্ভব নহে।[১]

এই মূর্তিগুলি আবিষ্কারের ফলে কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রধান একটি এই যে, খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বেই মনসা-পূজা এই দেশের সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

---

১ ইহা কলিকাতা ৬, ল্যান্সডাউন রোড, নাটোর-ভবনে রক্ষিত আছে।

কারণ, এই সময়ের মধ্যেই ভাস্কর্যে মনসার মূর্তিগঠনের একটি বিশেষ আদর্শ স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, দেশের রাজার আদেশে নির্মিত দেবমন্দিরের স্তম্ভগাত্রে পর্যন্ত মনসাদেবীর মূর্তি খোদাই হইতেছে।

একাদশ শতাব্দীর বাংলার ভাস্কর্যে মনসা-মূর্তির ব্যাপক অস্তিত্ব হইতেই জানা যাইতেছে যে, সমাজে এই দেবী ইতিমধ্যেই রীতিমত আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইয়াছেন। সেইজন্য সমসাময়িক সংস্কৃত পুরাণগুলিতেও তাঁহার মহিমা কীর্তিত হইবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

কেহ কেহ জৈন দেবী পদ্মাবতীকে মনসার সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। বাংলাদেশে মনসার এক নাম পদ্মা বা পদ্মাবতী। মনে হয় যে, জৈন ধর্ম হইতে পদ্মাবতীর ঐতিহ্যের ধারাটি আসিয়া কালক্রমে মনসার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে ক্রমে মহাভারত হইতে জরৎকারুর কাহিনীটিও আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে।

মহাভারতের কোন স্থলেই বাসুকির ভগ্নী জরৎকারুকে সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কিংবা সর্পমাতা বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। সর্পমাতা বলিতে মহাভারতে একমাত্র কশ্যপের পত্নী কদ্রুকেই বুঝায়, জরৎকারুকে নহে। মহাভারতের নাগকুল এই জরৎকারুকে কোন জায়গায়ই যে বিশেষ কোন শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইয়াছে এমন কোথাও উল্লেখ নাই। তবে এক স্থলে মাত্র দুইটি কথায় বাসুকি কর্তৃক জরৎকারুর সম্বর্ধনা করিবার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু ইহাও ভগিনীকে দেবতা ভাবিয়া নহে, তাহার গর্ভস্থ সন্তান আস্তিক কর্তৃক জনমেজয়-অনুষ্ঠিত সর্পযজ্ঞ পণ্ড হইবে, ইহা জানিতে পারিয়া বাসুকি ভগিনীর উপর প্রসন্ন হইয়া তাহাকে কালোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিল। মহাভারতের এই একটি মাত্র শ্লোকে ইহার উল্লেখ আছে—

সান্ত্বমানার্থদানৈশ্চ পূজয়া চানুরূপয়া।
সোদর্য্যাং পূজয়ামাস স্বসারং পন্নগোত্তমঃ॥

আস্তিকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জরৎকারুর এই ক্ষণিক প্রাধান্যটুকুও লুপ্ত হইয়া গেল। অতএব বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর সহসা মনসা নাম গ্রহণ করিয়া সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া বসিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। এই অনার্যদেবী মনসা সমাজে আর্যপ্রভাব বশতঃ মহাভারতের কাহিনীর পটভূমিকায় নিজেকে স্থাপন করিয়া লইয়া আভিজাত্য লাভের প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মহাভারতের মধ্যে মনসা নামের কেবল যে কোন

উল্লেখ নাই তাহা নহে, তাহাতে অনুরূপ কোন চরিত্রের সঙ্গেই সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। মহাভারতের যুগের দীর্ঘকাল পরে পরবর্তী উপপুরাণগুলি যখন রচিত হয় তখন অনার্য সমাজ হইতে আগত এই দেবী যে আর্যসমাজে প্রবেশ লাভ করিলেন পূর্বোক্ত ভাস্বর্যের প্রমাণ ব্যতীতও কতকগুলি অর্বাচীন পুরাণ হইতেও এই বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পুরাণগুলিতে মনসার জন্ম-কাহিনী বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইযাছে এবং যাহাতে এই দেবীর আভিজাত্য কোন দিক দিয়া খর্ব না হয়, সেইজন্য নাগকুলের পিতা কশ্যপের সঙ্গেও তাঁহার সম্বন্ধ কল্পনা করা হইযাছে, যেমন,—

পুরানাগভয়াক্রান্তা বভূবুর্মানবা ভুবি।
যান্ যান্ খাদন্তি নাগাশ্চ ন তে জীবন্তি নারদ॥
মন্ত্রাংশ্চ সসৃজে ভীতঃ কশ্যপো ব্রহ্মণার্থিতঃ।
বেদবীজানুসারেণ চোপদেশেন ব্রহ্মণঃ॥
মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবীং তাং মনসাং সসৃজে ততঃ।
তপসা মনসা তেন বভূব মনসা চ সা॥

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় শৈবধর্মের প্রভাব বশতঃ মনসা-মঙ্গল-কাব্যগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনসা শিবের কন্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু সংস্কৃত উপপুরাণগুলিতে মহাভারতের প্রভাব বশতঃ তাহাকে নাগ-পিতা কশ্যপ কর্তৃক সৃষ্ট বলিয়া সর্বত্রই উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য আর একখানি উপপুরাণেও পাওয়া যায়,—

সা চ কন্যা ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী।
তেনৈব মনসা দেবী মনসা যা চ দীব্যতি॥
মনসা ধ্যায়তে যা চ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
তেন যা মনসা দেবী তেন যোগ্যেন দীব্যতি॥
জগদ্গৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী।
শিবশিষ্যা চ যা দেবী তেন শৈবী প্রকীর্ত্তিতা॥

এই ভাবে মনসার জন্ম হইলে পর তিনি বেদাদি অধ্যয়নের নিমিত্ত কৈলাসে শঙ্কর-ভবনে গমন করিলেন; সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যাদ্বারা চন্দ্রশেখরকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'মহাজ্ঞান' লাভ করিলেন; সামবেদ পাঠ করিলেন

এবং তাঁহার নিকট হইতেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা-লাভ করিয়া তাঁহারই আদেশে পুষ্করতীর্থে তপস্যা দ্বারা কৃষ্ণকে তুষ্ট করিতে গমন করিলেন,—

ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্তা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
সিদ্ধা বভূব সা দেবী দদর্শ পুরতঃ প্রভুম্॥

এই ভাবে সিদ্ধি লাভ করিবার পর কৃষ্ণ ও শঙ্কর উভয়েই মনসাকে পূজা করিলেন,—

প্রথমে পূজিতা যা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
দ্বিতীয়ে শঙ্করেণৈব কশ্যপেন সুরেণ চ॥
মনুনা মুনিনা চৈব নাগেন মানবাদিনা।
বভূব পূজিতা সা চ ত্রিষু লোকেষু সুব্রতা॥

এই ভাবে মনসাদেবী ত্রিলোকের পূজা লাভ করিবার পর পিতা কশ্যপ তাঁহাকে জরৎকারু মুনির সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিলেন,—

জরৎকারুমুনীন্দ্রায় কশ্যপস্তাং দদৌ পুরা।
অযাচিত মুনিশ্রেষ্ঠো জগ্রাহ ব্রহ্মণাজ্ঞয়া॥

এই স্থলে মনসার লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতোক্ত বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর কাহিনী আনিয়া এক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মনসা-প্রণামের প্রচলিত মন্ত্রটির মধ্যে বাসুকির ভগ্নী জরৎকারু ও মনসা এক হইয়া গিয়াছে,—

জরৎকারুমুনেঃ পত্নী ভগিনী বাসুকেরপি।
আস্তিকস্য মুনের্মাতা মনসাদেবি নমোঽস্তুতে॥

উপপুরাণগুলির মধ্যে এইরূপ মনসার যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহাতে মহাভারতোক্ত জরৎকারু ও মনসা অভিন্ন হইয়া দেখা দিয়াছে।

ক্ষর বেশে নিজের

র্শন করিয়া

জন্য

মনসা-মঙ্গলের কাহিনী

মনসার সঙ্গে মহাভারতোক্ত জরৎকারুর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাংলায় মনসার কাহিনীর মধ্যে মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত সমগ্র নাগ-কাহিনী আসিয়া সংক্ষিপ্তভাবে স্থান লাভ করিয়াছে, অবশ্য তাহা হইলেও ইহা কোন দিনই মূল কাহিনীর অঙ্গ হইতে পারে নাই।

এই স্থানে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করিয়া ইহার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে—

চাঁদ সদাগর একজন পরম শৈব। তিনি স্বর্গের অরণ্যে একদিন শিব-পূজার জন্য ফুল আহরণ করিতে করিতে গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে মনসাদেবী নাগাভরণ-ভূষিতা হইয়া আসীনা ছিলেন। চাঁদের সাড়া পাইয়া নাগগণ ভয়ে পলাইয়া গেল, মনসাদেবী নিরাবরণা হইয়া পড়িলেন, এইজন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া চাঁদকে অভিশাপ দিলেন, মর্ত্যে গিয়া মানব হইয়া জন্মগ্রহণ কর। চাঁদ বলিলেন, যদি বিনা অপরাধে আমাকে এই অভিশাপ দিয়া থাক তবে তুমিও স্মরণ রাখিও, আমি পূজা না করিলে মর্ত্যলোকে তোমার পূজা প্রচারিত হইবে না।

চাঁদ মর্ত্যলোকে গিয়া বিজয় সাধুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সনকা। চাঁদ নিত্য শিব পূজা করেন, সনকা গোপনে মনসাদেবীর ঘট পূজা করেন; একদিন জানিতে পারিয়া চাঁদ পদাঘাতে সনকার মনসার ঘট ভাঙ্গিয়া দিলেন।

মনসা ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করিলেন। নন্দন-কানন সদৃশ চাঁদের গুয়াবাড়ী ধ্বংস হইয়া গেল। রাজ্যের নরনারী সর্পদংশনে প্রাণ হারাইতে লাগিল। কিন্তু চাঁদ 'মহাজ্ঞানে'র অধিকারী ছিলেন, তাহা দ্বারা তিনি গুয়াবাড়ী পুনরুজ্জীবিত করিলেন। চাঁদের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, তাহার নাম শঙ্কর গারড়ী, সে নেতার শিষ্য; নেতার বরে তাহার দেহ অমর, অজর; সর্প-দংশনে তাহার মত ওঝা আর নাই। শঙ্কর গারড়ী সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিদিগকে পুনরায় জীবন দান করিল। মনসার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে লাগিল।

এবং তাঁহার নির্কা শঙ্কর গারড়ীর স্ত্রীর নিকট হইতে তাহার মৃত্যুর উপায় জানিয়া পুষ্করতীর্থে তপস্ব বধ করিলেন—চাঁদের দক্ষিণ হস্ত খসিয়া পড়িল। মনসা চাঁদকে ...য়া তাঁহার মহাজ্ঞানও হরণ করিলেন।

...ইবার মনসা চাঁদের ছয় শিশুপুত্রের অন্নের মধ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া ...াহাদিগকে হত্যা করিলেন। মনসা আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, আমার পূজা কর, পুত্র ফিরিয়া পাইবে, মহাজ্ঞান ফিরিয়া পাইবে। চাঁদ মনসাকে হেঁতালের লাঠি লইয়া তাড়া করিয়া গেলেন, লাঠির এক আঘাতে মনসার কাঁকালি ভাঙ্গিয়া গেল। সনকা চোখের জলে আসিয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, মনসার পূজা কর, আমার সোনার চাঁদেরা ফিরিয়া আসুক। চাঁদ তাঁহাকে অন্য কথায় সান্ত্বনা দিয়া বিদায় দিলেন।

ঝালু মালু দুই অন্ত্যজ মনসা পূজার আয়োজন করিল। সনকা গোপনে পূজাস্থানে গিয়া দেবীর নিকট স্বামীর জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। মনসা সনকাকে পুত্রবর দিলেন। কিন্তু কথা রহিল, বিবাহের রাত্রে পুত্রের সর্পদংশনে মৃত্যু হইবে। সনকা ভাবিলেন, বিবাহ না করাইলেই হইবে; আবার পুত্রমুখ দর্শন করিবেন ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়া গৃহে ফিরিলেন।

চাঁদ চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়া বাণিজ্য যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। যাত্রাকালে মনসা পুনরায় আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, আমার পূজা করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হও। চাঁদ পুনরায় তাঁহাকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। চাঁদ চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া পাটনে গিয়া পৌছিলেন, নিজের অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে বহু মূল্যবান্ দ্রব্যাদি দ্বারা চৌদ্দ ডিঙ্গা পূর্ণ করিযা দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মনসা পুনরায় আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, 'মোর তরে ফুল জল দেও একবার।' চাঁদ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, যে হাতে শিব পূজা করিয়াছি সেই হাতে চেঙ্‌মুড়ী কাণীর পূজা করিব ?

দেবীর আদেশে মাঝ সমুদ্রে অসময়ে বান ডাকিল। চারিদিকে জল উত্তাল হইয়া উঠিল। একে একে চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গা অতলে ডুবিয়া গেল। চাঁদ সমুদ্রের জলে ভাসিতে লাগিলেন। চাঁদ ডুবিয়া মরিলে মনসার পূজার প্রচার হয় না। তীরে পৌছিবার জন্য একটি আশ্রয় মনসা তাঁহার নিকট ফেলিয়া দিলেন। চাঁদ তাহা ধরিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু যখনই বুঝিতে পারিলেন ইহা মনসার দান তখনই মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তবু চাঁদ তীরে গিয়া পৌছিলেন। প্রবাসে

বার বৎসরকাল নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে ভিক্ষুকের বেশে নিজের দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দর তখন পূর্ণ যুবক। পুনরায় পুত্রমুখ দর্শন করিয়া চাঁদ সকল দুঃখ ভুলিলেন। নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া পুত্রের বিবাহের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উজানীনগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলার সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হইল। বিবাহের রাত্রে সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু লেখা আছে জানিয়া এক নিশ্ছিদ্র লৌহ-বাসর নির্মাণ করিলেন। কিন্তু নির্মম নিয়তিকে রোধ করা গেল না। বিবাহের রাত্রে লৌহ-বাসরের মধ্যেই লখিন্দর সর্পদংশনে প্রাণ হারাইল।

সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে নদীর জলে ভাসাইয়া দিবার প্রথা ছিল। লখিন্দরের দেহেরও সেই ব্যবস্থাই করা স্থির হইল। বেহুলা বলিল, সে মৃত স্বামীর অনুগামিনী হইবে, স্বর্গলোকে দেবতাদিগের নিকট হইতে তাহার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া আনিবে। আত্মীয় স্বজন তাহাকে এই দুরূহ কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিল। সে তাহাতে কর্ণপাত করিল না। মৃত স্বামীকে কোলে লইয়া গাঙ্গুরের জলে ভেলায় ভাসিয়া চলিল।

ভেলা আসিয়া গোদার ঘাটে ঠেকিল। গোদা সেই ঘাটে বঁড়শীতে মাছ ধরিত। বেহুলার রূপে মুগ্ধ হইয়া গোদা তাহাকে বিবাহ করিয়া ঘরে তুলিয়া লইতে চাহিল। বেহুলা তাহাকে অভিশাপ দিল, সে যতদিন পর্যন্ত দেবপুর হইতে ফিরিয়া না আসে ততদিন পর্যন্ত তাহার পায়ে বঁড়শী বিঁধিয়া থাকিবে। ভেলা আপু ডোমের ঘাটে আসিল। সেও অনুরূপ বাসনা জানাইল, বেহুলা তাহাকে অভিশাপ দিল, সে নদীতীরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিল। এই ভাবে বেহুলা ধোনা-মোনার ঘাটও পার হইয়া গেল। তারপর নেতা মনসার আদেশে ব্যাঘ্রের রূপ ধারণ করিয়া লখিন্দরের গলিত মাংস ভক্ষণ করিতে চাহিল। বেহুলা নিজেকে বলি দিয়া ব্যাঘ্রের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে চাহিল। নেতা চিলের রূপ ধরিয়া লখিন্দরের পাঁজর ছোঁ মারিয়া হরণ করিতে চাহিল। বেহুলা অঞ্চলে ঢাকিয়া স্বামীর পাঁজর কয়টি রক্ষা করিল।

ভেলা নেতা ধোপানীর ঘাটে পৌছিল। নেতা স্বর্গের ধোপানী, দেবতাদিগের কাপড় কাচিত। বেহুলা দেখিল, সে একটি ছোট ছেলে লইয়া ঘাটে আসিয়াছে। কাপড়ের বোঝা মাথা হইতে নামাইয়া কাপড় কাচিতে লাগিল। ছেলেটি

দুরন্তপনা করিতেছে দেখিয়া তাহাকে এক আঘাতে মারিয়া ফেলিয়া রাখিল। যাইবার সময় কানের কাছে কি মন্ত্র বলিয়া তাহাকে জীয়াইল, তারপর ঘরে লইয়া চলিল। বেহুলা বুঝিতে পারিল, এ মৃতকে প্রাণ দিতে পারে, অতএব সে তাহার স্বামীকেও বাঁচাইতে পারিবে।

পরের দিন নেতা যখন ঘাটে আসিল, তখন বেহুলা গিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। নেতা বলিল, মনসার শাপে তোমার স্বামী মরিয়াছে, আমি কিছু করিতে পারিব না। তোমাকে দেবপুরীতে গিয়া দেবতাদিগকে ধরিতে হইবে। দেবগণ যদি বলিয়া দেন তবে মনসা তোমার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া দিতে পারেন, আমার কথায় হইবে না। দেবতাগণ নৃত্য দ্বারা বড় সন্তুষ্ট হন। তুমি যদি নৃত্য দেখাইয়া দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পার তবে তোমার কার্য উদ্ধার হইতে পারে। বেহুলা বলিল, আমি তাহাই করিব। তুমি আমাকে লইয়া চল।

সমবেত দেবতাদিগের সম্মুখে বেহুলা তাহার নৃত্য দেখাইল। দেবতাগণ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মহাদেব তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, কি বর চাও? বেহুলা স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিল। মহাদেব বলিলেন, তাহাই হইবে। মনসাকে বল, আমার আদেশ—সে তোমার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া দিক। মনসা বলিল, দিতে পারি, কিন্তু চাঁদ আমার পূজা করিবে এই সর্তে। বেহুলা বলিল, তাহাই হইবে। আমার ছয় ভাসুর, স্বামী, শ্বশুরের চৌদ্দ-ডিঙ্গা সব ফিরাইয়া দাও, আমি তাঁহাকে দিয়া তোমার পূজা করাইব। মনসা সবই ফিরাইয়া দিলেন; তারপর বেহুলা ধনরত্নপূর্ণ চৌদ্দডিঙ্গা সাজাইয়া গৃহের দিকে ফিরিল। চাঁদের সাতপুত্র সহ চৌদ্দ-ডিঙ্গা আসিয়া গাঙ্গুরের ঘাটে ভিড়িল। চাঁদ উন্মাদ হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে শুনিতে পাইলেন, তাঁহাকে মনসার পূজা করিতে হইবে সেই মুহূর্তে কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। বেহুলা গিয়া কাঁদিযা তাঁহার পায়ে পড়িল, বলিল, আমার দিকে একবার তাকাও। বেহুলার মুখের দিকে তিনি তাকাইতে পারেন না, অভ্রভেদী শালতরু বুঝি একটু স্নেহকোমল দক্ষিণ বাতাসের স্পর্শেই ধরাশায়ী হয়। চাঁদের জীবনে এত বড় দ্বন্দ্ব আর কোনদিন দেখা দেয় নাই। বেহুলা বলিল, তুমি বাম হাতে মনসাকে একটি ফুল দাও, তাহা হইলেই মনসা খুসী হইবে। চাঁদ বলিলেন, আমি মুখ ফিরাইয়া দেখিব না, কাহাকে ফুল দিলাম। বেহুলা বলিল, তাহাতেই হইবে। অবশেষে চাঁদ মুখ ফিরাইয়া বাম হাতে একটি ফুল ছুঁড়িয়া দিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা পাইল,

তিনি যে হাতে শিব-পূজা করেন, মনসাকে পূজা করিয়া সে হাত কলঙ্কিত করিলেন না। ইহাতেই মনসা খুসী হইলেন। মর্ত্যে তাঁহার পূজার প্রচার হইল।

মনে হয়, মনসা-মঙ্গলের উক্ত কাহিনীর মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র লৌকিক কাহিনীর ধারা আসিয়া এক সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। একটি শঙ্কর গারড়ী-নেতার কাহিনী ও অপরটি চাঁদসদাগর-বেহুলার কাহিনী। প্রথম কাহিনীটি প্রাচীনতর, এবং ইহার সঙ্গেই আসিয়া পরবর্তী কালে চাঁদসদাগর-বেহুলার কাহিনীটি যুক্ত হইয়াছে। শঙ্কর গারড়ী-নেতার কাহিনীটিও একটি স্বতন্ত্র কাব্যের বিষয়-বস্তু হইবার যোগ্য, সম্ভবতঃ পূর্বে এই বিষয়ে লৌকিক ছড়া কিংবা লোক-গাথার আকারে স্বতন্ত্র কাহিনী লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। শঙ্কর গারড়ীর চরিত্র কতকটা লৌকিক রামায়ণ কাব্যের রাবণ-চরিত্রের অনুরূপ, খুব প্রাচীন একটি জনশ্রুতি হইতে ইহা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়। সেইজন্যই মনে হয়, লৌকিক রামায়ণের কাহিনী এই শঙ্কর গারড়ীর কাহিনী দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণার অধিবাসী সাঁওতাল জাতির মধ্যে কামরু ওঝার একটি কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা শঙ্কর গারড়ীর কাহিনীব অনেকটা অনুরূপ (*Memoirs of the Asiatic Society of Bengal*, X, 1., pp. 124-5)।

শঙ্কর গারড়ীর কাহিনীর মধ্যে যে লৌকিক দেবচরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় তাহার নাম নেতা। শঙ্কর গারড়ী নেতার শিষ্য, এবং তাহারই বরে (মনসার বরে নহে) তাহার দেহ অজর ও অমর। এই নেতাকে মনসা-মঙ্গলকাব্যের সর্বত্র রজক-কুমারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার আভিজাত্য বৃদ্ধি করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত বলা হইয়াছে, সে স্বর্গের দেবতাদিগের ধোপানী, সর্বত্রই তাহার রজক-সম্পর্ক বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। মনসা-মঙ্গল কাহিনীর প্রচারের যুগে এই রজক-কুমারী মনসা-মঙ্গল কাহিনীর একাংশে স্থানলাভ করিয়া মনসার সহচরী রূপে পরিচিতা হইয়াছেন। মনে হয়, কোন রজকের কন্যা বিষনাশকারী কতকগুলি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া কালক্রমে সাধারণ জনগণের মধ্যে দেবত্বে উন্নীত হইয়া গিয়াছিল। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা মনসা হইতে প্রাচীনতর, কারণ তাহা না হইলে মনসা-চরিত্রের সর্বব্যাপক প্রতিষ্ঠার উপর এই কাহিনীতে তাহার কোন ভাবেই স্থান পাওয়া সম্ভব ছিল না। চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনী প্রবর্তিত হওয়ার পর এই নেতা মনসার সহচরীর পদ প্রাপ্ত হইয়া মনসা-মঙ্গল কাব্যের সামান্য একটি অংশ

মাত্র অবলম্বন করিয়া টিকিয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত চাঁদ সদাগর-বেহুলার মূল কাহিনীর মধ্যে তাহার অস্তিত্বের আর কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সংস্কৃত পুরাণগুলি অগণিত লৌকিক কাহিনীতে পূর্ণ হইলেও কোন সংস্কৃত পুরাণেই মনসা-মঙ্গলের অনুরূপ কোন কাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। ইহা রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র লৌকিক কাহিনী। মনসা-মঙ্গলই ইহার মূল। ভাস্কর্যে মনসামূর্তি খোদিত হইবার পূর্ব হইতেই মনসার এই লৌকিক কাহিনী সমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ তখন লোকমুখে পল্লী-গীতিকা বা ছড়ার আকারে মনসা-মঙ্গলের সংক্ষিপ্ততম মূল কাহিনীটি লোকের মুখে মুখে গীত হইত। তারপর ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে কোন কোন ক্ষমতাবান কবির নিপুণ হস্তে পড়িয়া তাহা কাব্য-কাহিনীবদ্ধ হইয়াছে। তারপর ক্রমে লৌকিক কাহিনীর সংক্ষিপ্ততম অংশটির মধ্যে প্রথমতঃ নেতা ধোপানী, শঙ্কর গারড়ী ও পরে মহাভারতের নাগ-কাহিনীও আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। এই ভাবেই প্রকৃত পক্ষে বর্তমান মনসা-মঙ্গল কাব্যখানি এই প্রকার বিপুলায়তন লাভ করিয়াছে।

এখন বিচার করিতে হয়, এই গল্প কোথা হইতে আসিল? ইহার মূলে কোনও ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না। এই দুই প্রশ্নের মধ্যে কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া সহজ-সাধ্য নহে। বাংলার মনসা-মঙ্গলের কবিগণ প্রত্যেকেই নিজেদের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক জ্ঞানের মধ্যে এই কাহিনীর ঘটনাস্থান সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাহার ফলে বাংলা, আসাম ও বিহারের বহু স্থানই চাঁদ সদাগরের নিবাস-ভূমি বলিয়া সমান দাবী করিতেছে। বলা বাহুল্য, ইহাদের কাহারও দাবী সমর্থন করিবার পক্ষে কোন নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ নাই। সেইজন্যই ইহাদিগকে জন-শ্রুতি মাত্র বলিয়াই উড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিশ্বাস, 'চাঁদবেণের গল্পটি আগাগোড়া কল্পনা-মূলক'। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। ইহার মূলে নগণ্য হইলেও যে কোন না কোন সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, এই কাহিনীটি উদ্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা অত্যন্ত ব্যাপক লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। ইহা বাংলাদেশের রামায়ণ। সর্পপূজার জনপ্রিয়তা ইহার ব্যাপক প্রচারের অন্যতম কারণ হইলেও, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, সম্পূর্ণ একটি কাল্পনিক কাহিনী সেই যুগে বাংলা, বিহার ও আসামের

সর্বত্র কাহিনীগত ঐক্য রক্ষা করিয়া এমন প্রচার লাভ করিতে পারিত না। বিশেষতঃ সেই যুগে কোন কবিবিশেষের স্বকপোলোদ্ভাবিত কোন সম্পূর্ণ অলীক কাহিনীর সমাজে এমন সমাদর লাভ করা সম্ভব ছিল না। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টির সাহায্যে যে ইহার প্রচার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাও নহে। কারণ, এ কথা সত্য যে, চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম ও অন্নদা-মঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্রের মত প্রথম শ্রেণীর কবি-শক্তি মনসা-মঙ্গল কাব্য-রচনায় কদাচ নিয়োজিত হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও কোন মঙ্গলকাব্যই মনসা-মঙ্গলের মত এত ব্যাপক প্রচার লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহাতে উচ্চাঙ্গের চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস বহুল পরিমাণে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কোন বাস্তব আদর্শ চোখের সম্মুখে না থাকিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদ্বারা এমন চরিত্র পরিকল্পনা সম্ভব হইত বলিয়াও মনে হয় না। বিশেষতঃ ইহার চরিত্রগত আদর্শসৃষ্টি যতই উচ্চ হউক, ইহার মূলে অন্ততঃ কিছু সত্য না থাকিলে ইহা জাতির মানসক্ষেত্রে এমন সুদৃঢ় শিকড় গাড়িয়াও তুলিতে পারিত না।

তাহা হইলে এই কাহিনীর মধ্যে কতটুকু সত্য থাকিতে পারে? স্বর্গীয় ডক্টর সেন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, 'চাঁদসদাগরের উপাখ্যানের এইটুকু সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের আপত্তি নাই যে, যাঁহারা শৈবধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লৌকিক ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, চাঁদ সদাগর তাঁহাদের এক দলের নেতা ছিলেন ও শেষে তিনি মনসাদেবীর পূজা অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।' কিন্তু ইহার অতিরিক্ত আরও একটু কাহিনী স্বচ্ছন্দে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অভিষেকোৎসুক রাজপুত্রের উপর দীর্ঘ বনবাসের নিদারুণ আদেশ যেমন ভারতের এক করুণ মহাকাব্যের মূল সত্য, তেমনই বিবাহিত জীবনের আনন্দোৎসুক কোন অতুল ঐশ্বর্যবান্ নব যুবক শ্রেষ্ঠিপুত্রের বাসরগৃহেই দৈবাৎ সর্পদংশনে মৃত্যুর মত কোন মর্মান্তিক সত্য ঘটনাও হয়ত এই মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলিরও মূল সত্য। সে'দিন অপরিস্ফুট-যৌবনা বেহুলার বাসর-রাত্রেই বৈধব্যের কথা শুনিয়া বাল-বৈধব্য-পীড়িত এই হিন্দুর সমাজও হয়ত শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তরুণ-তরুণীর প্রস্ফুটনোন্মুখ জীবনের মূলে ক্রূর নিয়তির নিদারুণ এই পরিহাস যে-কোন উচ্চতর কাব্যের রস-প্রেরণা দান করিতে সক্ষম। তারপর এতদ্দেশীয় সাহিত্যিক প্রথা অনুযায়ী কাহিনীটিকে একটি মিলনান্তক রূপ দিবার জন্য ইহার অবশিষ্টাংশ কবি কর্তৃক কল্পিত হইয়াছে।

অতএব গল্পটিকে 'আগাগোড়া কল্পনামূলক' বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলেই প্রশ্ন হয়, চাঁদ সদাগর কোথাকার লোক ছিলেন? তাঁহার পরিচয়ই বা কতটুকু জানিতে পারা যায়? কাহিনী-ভাগ বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চাঁদসদাগর গোঁড়া শৈব ছিলেন। বাংলার উচ্চতর সমাজে তখন বৌদ্ধধর্ম শৈবধর্মের মধ্যেই আত্মগোপন করিতেছিল। কিন্তু সাধারণ জনসমাজের মধ্যে লৌকিক দেবদেবীর পূজার তখনও বিশেষ প্রাধান্য ছিল। বিবাহের রাত্রে চাঁদসদাগরের পুত্রের সর্পদংশনে যে মৃত্যু ঘটিল সেই জন্য সাধারণ জনসমাজ মনে করিল, শৈবধর্মাশ্রিত বৈশ্য জাতি লৌকিক দেবতা মনসার পূজা করে না বলিয়া দেবতা এইভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতেই মনসাদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা সাধারণ লেকের শতগুণ বৃদ্ধি পাইল এবং তাহা হইতেই চাঁদ সদাগরের কাহিনীটিও ক্রমে কবি-কল্পনায় পত্রপুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

তবে চাঁদ সদাগর কোথাকার লোক ছিলেন? ইতিহাসে তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় কি না। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। পূর্ববঙ্গের চন্দ্ররাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা শ্রীচন্দ্রদেবকে কেহ চাঁদ সদাগরের সঙ্গে অভিন্ন বলিযা কল্পনা করিয়াছেন। রাজা শ্রীচন্দ্রদেবের আনুমানিক কাল খৃস্টীয় ৯৭৫ অব্দ হইতে ১০০০ অব্দ। চাঁদ সদাগরের কাহিনী এই সময়ের মধ্যে উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব নহে। আবার কেহ এই বংশেরই অন্যতম রাজা হরিশ্চন্দ্রকেও হরিশ্চন্দ্রধর রূপে কল্পনা করিয়া লইয়া তাঁহাকে চন্দ্রধর বা চাঁদ সদাগরের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র নাথ-সাহিত্যের গোপীচন্দ্র কাহিনীর নায়ক গোবিন্দ-চন্দ্রের শ্বশুর। হরিশ্চন্দ্রই যে চাঁদ সদাগর তাহার আর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া এই মতবাদ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

কেহ আবার অনুমান করেন, 'চাঁদ সদাগর বাংলার লোক নহেন'। বেহুলার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর দাক্ষিণাত্যের প্রভাব অনুমিত হইয়াছে। তাহার চরিত্রে বাঙ্গালী নারীসুলভ কমনীয়তার অভাবও লক্ষিত হইয়াছে—'বেহুলার তেজ ও নির্ভীকতা বিবাহ-কাল হইতে। তাহার স্বামী সহ সমুদ্রে ভাসিয়া পড়াও কম সাহসের কথা নয়। তারপর শ্বশুরবাড়ী স্বামী সহ ডোম সাজিয়া 'যাওয়ার মধ্যে যে একটি পরিহাস-প্রিয়তা আছে, তাহা খুব স্বাধীন ভাবে চলাফেরার অভ্যাস না

থাকিলে আশা করা যায় না। দেবপুরীতে নৃত্য করিয়া দেবতা প্রসন্ন করা দেবদাসীর কাজ। তাহা বাংলাদেশের প্রথা নয়। তাহা তৈলঙ্গেরই বস্তু।'[১] কেহ আবার এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বেহুলা-চরিত্র যে বাংলাদেশের নারী-চরিত্রের প্রতিকূল নয়—তাহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন।[২] কিন্তু কাহিনীর উদ্ভব-মূলে যিনি দাক্ষিণাত্যের বা তেলেগুর দাবী উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহার এই একটি যুক্তি অত্যন্ত প্রবল যে, নৃত্যদ্বারা দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার রীতি সেই দেশেই প্রচলিত, বঙ্গদেশে নহে। অথচ সকল মনসা-মঙ্গলকাব্যেই বেহুলা-চরিত্রের এই গুণটির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে, এক হিসাবে ইহার উপরই কাহিনীর পরিণতিও নির্ভর করিয়াছে। এই যুক্তির বিরুদ্ধে ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের বলিবার কিছুই নাই; কারণ, বাংলার কোন লোক-সাহিত্যে নারীচরিত্রের এমন একটি গুণের বড় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাই হউক, বিষয়টি পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

আবার কেহ মনসা-মঙ্গলের চম্পকনগরীকে প্রাচীন মগধের রাজধানী চম্পক অনুমান করিয়া 'বিহারই এই গীতির আদিস্থান বলিয়া গণ্য' করিতে চাহেন। খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে য়ুয়াঙ চুয়াঙ ভারত-ভ্রমণে আসিয়া বর্তমান উত্তর বিহারের অন্তর্গত গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী চম্পা নামক নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সময় চম্পা নগরীতে 'there were scores of ruined convents, in which about 200 monks still continued to reside—the Brahmanical temples were many and well-frequented.' (Elphinstone, History of India, 1874, p. 294)। চম্পা বর্তমান ভাগলপুর সহরের সংলগ্ন চম্পা নগর বলিয়াই মনে হয়। খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হায়েন পাটলীপুত্র হইতে গঙ্গা নদী দিয়া চম্পা ও পরে তাম্রলিপ্ত পৌঁছিয়াছিলেন। এই চম্পা ভাগলপুরের নিকটবর্তী চম্পা হওয়াই সম্ভব।

মনসা-মঙ্গলের একজন কবি চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকাকে 'বেহারিয়া রাজার কন্যা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও একজন কবির রচনায় মনসা-মঙ্গলের নদ-নদী সম্পর্কে 'বিহারিয়া' নদীর উল্লেখ আছে। বঙ্গদেশের বাহিরে 'উত্তরে নিষধ ও দক্ষিণে কালঞ্জর'; ইহার মধ্যবর্তী স্থানে নিম্ন শ্রেণীর হালুয়া চাষী

---

১ ক্ষিতিমোহন সেন, ৩৯৪-৯৫।

২ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'মনসা-পূজা', প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৯, ৭৩৩

সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে মনসা-পূজা সর্বপ্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, একজন মনসা-মঙ্গলের কবির রচনায় তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। আর একজন মনসা-মঙ্গলের কবির রচনায় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে, লখিন্দরের নিমিত্ত কন্যা দর্শনে বহির্গত হইয়া 'বেহান পাটনে চাঁদ মিলিলেক গিয়া।' অতএব দেখা যাইতেছে, কাহিনীর ঘটনা-স্থান বিষয়ে বিহার সম্বন্ধে একটি সংস্কার সেকালের মনসা-মঙ্গলের কবিদিগের মধ্যে বর্তমান ছিল। অবশ্য এই সংস্কার যে খুব ব্যাপক ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না—মাত্র কোন কোন কবির রচনায় ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

এই বিষয়ে অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারা যায় যে, উত্তর বিহারের প্রায় সর্বত্র জনসাধারণের মধ্যে সর্পদেবী মনসার পূজার ব্যাপক প্রচলন আছে। সেখানকার অধিবাসিগণ সমস্ত শ্রাবণমাস ব্যাপিয়া রাত্রিযোগে প্রত্যেক গ্রামের এক একটি স্থানে সমবেত হইয়া লখিন্দর-বেহুলার কাহিনী গান করিয়া রাত্রি জাগরণ করে। মানভূম, হাজারীবাগ ও গয়া জিলার কেওট, কুর্মী প্রমুখ নিম্নজাতি প্রতি বৎসর শ্রাবণমাসে এখনও বাড়ী বাড়ী মনসার গীত গাহিয়া বেড়ায়। বিহার অঞ্চলেও প্রায় বাংলার মনসা-মঙ্গলের অনুরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে—দেবনাগরী অক্ষরে বিহারী ভাষায় এই কাহিনী একাধিক স্থান হইতে মুদ্রিত হইয়াও প্রকাশিত হইয়াছে।[১] তাহাতে কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

সোনাদহ নামক হ্রদে মহাদেব প্রত্যহ স্নান করিতে যান। একদিন তিনি স্নানকালে তাঁহার মাথার পাঁচটি জটা খুব রগ্‌ড়াইয়া জলে ডুব দিলেন, যখন পুনরায় ভাসিয়া উঠিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পাঁচটি জটায় পাঁচটি পদ্ম ফুটিয়াছে। মহাদেব খুসী হইয়া ফুল কয়টি তুলিয়া লইয়া গৃহে চলিলেন। একটি সাজির মধ্যে ফুল কয়টি রাখিয়া তিনি নিত্যপূজা সারিবার জন্য দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। গৌরী সাজি হইতে ফুল কয়টি হাতে লইয়া দেখিতে লাগিলেন, এমন সময় সহসা পাঁচটি কুমারী কন্যা পাঁচটি ফুল হইতে বাহির হইয়া আসিল। ইহাদের মধ্যে একজনের এক চোখ কানা। তাঁহার নাম বিষহরী বা মনসা। বিষহরী গৌরীকে বলিলেন যে তিনি তাঁহার কন্যা, মহাদেব তাঁহার পিতা। গৌরী শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন এবং এই সম্পর্ক অস্বীকার করিলেন। মনসা তথাপি তাঁহার কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। গৌরী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে

[১] বেহুলা কী কথা, হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, কলিকাতা (?) ; মনসা পূজা তথা বিষহরী চরিত্র, সালকিয়া, হাওড়া (?)

ঠেলিয়া দিলেন। মনসা নিজেকে দারুণ অপমানিত বোধ করিলেন এবং গৌরীকে দংশন করিয়া চলিয়া আসিলেন। গৌরী অচৈতন্য হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

পূজা সমাপনান্তে আসিয়া মহাদেব গৌরীকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, গৌরীকে সর্পে দংশন করিয়াছে। তিনি সত্বর একজন ওঝা ডাকাইলেন, কিন্তু ওঝা তাহার কিছুই করিতে পারিল না। অবশেষে মনসা ভগ্নীদিগকে সঙ্গে লইয়া সেখানে আসিয়া পুনরায় উপস্থিত হইলেন। তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া গৌরীর দেহ হইতে বিষ ঝাড়িয়া দিলেন। গৌরী চক্ষু মেলিয়া তাকাইলেন। মহাদেব প্রীত হইয়া মনসাকে বর দিতে চাহিলেন। মনসা বলিলেন, 'চাঁদ সদাগর যেন আমাকে পূজা করে, যদি না করে তবে তাহার উপর যে কোন প্রতিশোধ লইতে চাই—সে তোমার ভক্ত, তুমি অনুমতি না দিলে আমি তাহার কিছুই করিতে পারিতেছি না'। মহাদেব বলিলেন, 'তাহাই হউক'। মনসা ভগ্নীদিগকে সঙ্গে লইয়া চাঁদ সদাগরের নিকট গিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে বলিলেন। চাঁদ সদাগর বলিলেন, 'কে তুই ডাইনী ? দূর হ', নহিলে তোর পিঠ ভাঙ্গিয়া দিব'। মনসা বলিলেন, 'আমার কথা না শুনিলে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে'। চাঁদ বলিলেন, 'দেখি, তুই আমার কি করিতে পারিস্'। মনসা বলিলেন, 'আচ্ছা, তবে তাহাই হউক'। বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন।

চাঁদের ছয় পুত্রের সর্পদংশনে মৃত্যু হইল। অবশেষে আর এক পুত্রের জন্ম হইল, তাহার নাম লখিন্দর। একদিন লখিন্দর গঙ্গায় বঁড়শীতে মাছ ধরিতে গেল। এক বিরাট মাছ তাহার টোপ গিলিল। অতি কষ্টে ইহাকে তীরে তুলিয়া সে দেখিল যে ইহা একটি লোহার মাছ। লখিন্দর আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল। ইহা লইয়া সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। গঙ্গাদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'এই লোহার মাছ দিয়া আমি কি করিব, বলিয়া দাও'। গঙ্গাদেবী আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'মাছটি বাড়ী লইয়া যাও, যখন তোমার পিতা তোমার জন্য কন্যা সন্ধান করিতে বাহির হইবেন, তখন এই মাছটি তাঁহাকে দিয়া বলিও, যে-কন্যা ইহা স্বহস্তে কাটিয়া রন্ধন করিতে পারিবে, তাহার সঙ্গেই যেন তোমার বিবাহ ঠিক করা হয়'। লখিন্দর মাছটি লইয়া গৃহে গেল এবং মাতাপিতার কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিল।

অল্পদিনের মধ্যেই চাঁদ তাঁহার পুত্রের জন্য কন্যার সন্ধানে বাহির হইলেন। সঙ্গে করিয়া লোহার মাছটিও লইলেন। অনেক কন্যাই দেখিলেন, কিন্তু কেহই লোহার

মাছ কুটিতে পারিল না ; বঁটি ভাঙ্গিয়া গেল। চাঁদ এইবার সাহু সদাগর নামক এক বণিকের গৃহে আসিলেন। তাহার এক কন্যা ছিল, নাম বেহুলা। সে জাতিস্মর ছিল। সে লোহার মাছটি কাটিয়া ইহা দ্বারা উত্তম ব্যঞ্জন রন্ধন করিল, চাঁদ প্রসন্ন হইয়া তাহার সঙ্গেই নিজের পুত্রের বিবাহ স্থির করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

বিবাহের দিন স্থির হইল। বেহুলা পিতাকে বলিল, 'বাসরের জন্য লৌহগৃহ নির্মাণ করিতে শ্বশুরকে বলিও'। পিতা উদ্বিগ্ন হইয়া ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন। বেহুলা বলিল, 'বাসরে আমার স্বামীর সর্পদংশনে মৃত্যু লেখা আছে'। সাহু চাঁদকে একথা জানাইলেন। চাঁদ এক নিশ্ছিদ্র লৌহবাসর নির্মাণ করিবার জন্য স্থপতিকে আদেশ দিলেন। বাসর নির্মাণ করিয়া স্থপতি যখন গৃহে ফিরিতেছিল তখন মনসা তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, বলিলেন, 'যদি জীবনের মমতা কর, তবে লৌহবাসরে একটি গোপন ছিদ্র রাখিয়া আইস'। ভয় পাইয়া স্থপতি তাহাই করিল।

বিবাহের পর রাত্রি যাপন করিবার জন্য নবদম্পতি লৌহবাসরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেহুলা চারিটি নকুল সঙ্গে করিয়া লইল, নকুল চারিটি খাটের চারিটি খুরায় বাঁধিয়া নিজেও লখিন্দরের পায়ের কাছে জাগিয়া বসিয়া রহিল। রাত্রি গভীর হইতে লাগিল। মায়ানিদ্রায় বেহুলার চোখ আচ্ছন্ন হইয়া গেল, সেও পালঙ্কের উপর শুইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল ; তাহার খোলা চুল মাটিতে লুটাইতে লাগিল।

লৌহবাসরের গোপন ছিদ্রপথে মনিয়ার নামক সর্প প্রবেশ করিল। মনিয়ার দেখিল, পালঙ্কের খুরা বাহিয়া উপরে উঠিবার উপায় নাই, নকুলেরা পাহারা দিতেছে। তবে কি করিয়া উপরে উঠিতে পারা যায়? সে দেখিল, বেহুলার খোলা চুল পালঙ্ক হইতে মাটিতে পড়িয়া লুটাইতেছে—সেই চুল বাহিয়া পালঙ্কে উঠিয়া গেল ; তারপর লখিন্দরকে দংশন করিয়া চক্ষের পলকে ছিদ্রপথে অদৃশ্য হইয়া গেল। তীব্র বিষের জ্বালায় লখিন্দরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তাহার আর্তনাদে বেহুলা জাগিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণত্যাগ করিল। রাজ্যে কান্নার রোল পড়িয়া গেল।

স্থির করা হইল যে, লখিন্দরের দেহ ভেলায় করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইবে। বেহুলা জানাইল, সে স্বামীর দেহের অনুগমন করিবে। সকলে তাহাকে এই দুরূহ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বলিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না।

ভেলায় করিয়া লখিন্দরের দেহ নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। ভেলায় বসিয়া বেহুলা স্বামীর দেহ কোলে করিয়া নদীস্রোতে দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেল। ভাসিতে ভাসিতে ভেলা নেতুলার ঘাটে গিয়া ঠেকিল। নেতুলা স্বর্গের দেবতাদিগের কাপড় কাচিত। বেহুলা তাহার সহায়তায় দেবপুরে গিয়া পৌছিল। নৃত্যদ্বারা দেবতা-দিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরিয়া পাইল, কিন্তু তাহাকে শপথ করিতে হইল যে চাঁদকে দিয়া সে মনসার পূজা করাইবে। মনসা চাঁদের ছয় পুত্রের জীবনও ফিরাইয়া দিলেন। বেহুলা সকলকে লইয়া দেশে ফিরিয়া চাঁদকে দিয়া মনসার পূজা করাইল।

উল্লিখিত কাহিনী হইতে জানা যাইতেছে যে, উত্তর বিহারে প্রচলিত বেহুলার কাহিনীটি বাংলা মনসা-মঙ্গল কাব্যের মত এত জটিল ও অনাবশ্যক পৌরাণিক কাহিনীতে ভারাক্রান্ত নহে। বেহুলা-লখিন্দরের মূল কাহিনীর ধারাটি এখানে অক্ষুণ্ণ থাকিলেও ইহার মধ্যে বাংলাদেশের মনসা-মঙ্গল কাব্যের মত কবি-কল্পনার এমন উদ্দাম নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায় না। মনসা-মঙ্গলের লৌকিক কাহিনীটি আপনার পূর্ণতা ও সংযম রক্ষা করিয়াই এখানে প্রচলিত আছে। ইহার কারণ এই মনে হইতে পারে যে, কাহিনীর মূল ধারাটিই বিহারে প্রচলিত আছে এবং সে দেশের ধর্মীয় অবস্থার অনুকূল না হওয়ার জন্যই হয় ত ইহাতে অবান্তর মহাভারতীয় ও পৌরাণিক আখ্যানসমূহ আসিয়া যুক্ত হইতে পারে নাই। কিংবা এমনও মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, মনসা-মঙ্গলের এই কাহিনীটি বিহার হইতে বাংলাদেশে আসিয়া এখানকার অধিকতর কল্পনা-শক্তি-সমৃদ্ধ কবিদিগের হাতে পড়িয়া এখানে পল্লবিত হইয়াছে। তবে এ'কথা সত্য, বাংলাদেশে প্রচলিত কাহিনীটির মধ্যে যেমন চরিত্র-সৃষ্টির সার্থকতা ও কাব্যগুণ আছে, বিহারে প্রচলিত কাহিনীতে তাহা নাই।

বিহারে প্রচলিত মনসা-কাহিনীর সঙ্গে বাংলায় প্রচলিত মনসা-বিষয়ক সংস্কারের কতকগুলি অপূর্ব ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিহারে মনসা পাঁচ ভগ্নীর অন্যতম, অন্যান্য ভগ্নীরা সর্বদা তাঁহার সহচরী। বীরভূম জেলার সর্বত্র মনসা সম্পর্কিত অনুরূপ ধারণা প্রচলিত আছে। সেখানে পাঁচটি কিংবা সাতটি ঘট মনসা বলিয়া সর্বদা পূজিত হয় এবং তাহারা পরস্পর ভগিনী সম্পর্কে আবদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। মনসা-মঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতর যে একটি স্বতন্ত্র ধারার উল্লেখ করিয়াছি অর্থাৎ শঙ্কর গারড়ী ও নেতার কাহিনী, বিহারে প্রচলিত মনসা-মঙ্গলে তাহার উল্লেখ নাই—নেতুলা চরিত্রটির উল্লেখ আছে মাত্র। বাংলার মনসা-মঙ্গল কাব্যে হাসান-হোসেনের

পালা, কিংবা হাসান পর্ব বলিয়া পরিচিত একটি উপকাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু বিহারে প্রচলিত মনসার কাহিনীতে তাহা নাই। এই সকল কারণে এমন ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, বিহার হইতেই কাহিনীটি বাংলাদেশে আসিয়া প্রচারিত হইয়াছে এবং এখানে স্থানীয় কতকগুলি লৌকিক কাহিনী ইহার মধ্যে সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই মত গ্রহণ করিবার পক্ষে কিছু অন্তরায় দেখা যায়।

প্রথমতঃ, বিহারে প্রচলিত মনসা-কাহিনীর মুদ্রিত সংস্করণে পরিষ্কার বাংলায় রচিত কতকগুলি পদ পাওয়া যায়। নিম্নে একটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

ওরে পূরবে খোজিলাম বংগলা রাজ হে।
বালা জোগে কন্যা না দেখিলাম কুমারী হে॥
ওরে পছিম খোজিলাম দেব করতাল হে।
বালা জোগে কন্যা না দেখিলাম কুমারী হে॥
ওরে উত্তরে খোজিলাম মোরঙ্গ রাজ হে।
বালা জোগে কন্যা না দেখিলাম কুমারী হে॥
ওরে দক্ষিণে খোজিলাম পূর্ব জগরনাথ হে।
বালা জোগে কন্যা না দেখিলাম কুমারী হে॥

এতদ্ব্যতীত বিহারে প্রচলিত মনসার কাহিনীর মধ্যে একটি স্থান ও তাহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, এই কাহিনী ধর্মপূজার দেশ রাঢ়ভূমি হইতে বিহার প্রদেশে গিয়াছে। মনসা বেহুলাকে তাহার বিবাহের পূর্বে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, সে বিবাহের রাত্রেই স্বামীকে হারাইবে এবং ছয় মাস জলে ভাসিয়া ময়নানগরে গিয়া উপস্থিত হইবে,—সেখানে তেত্রিশ কোটি দেবতার চরণ বন্দনা করিয়া তারপর স্বামীর পুনর্জীবন লাভ করিবে। বাঁকুড়া জিলায় ধর্মপূজার পীঠস্থান ময়নাপুর বা ময়নানগরে সেই যুগে যে দুশ্চর তপস্যাদ্বারা অসাধ্য সাধিত হইত, এই কাহিনীতে তাহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। ময়নানগরের এই প্রকার উল্লেখ হইতে এই কাহিনী যে ধর্মপূজার দেশ রাঢ়ভূমি হইতে বিহারে গিয়া প্রচার লাভ করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। এতদ্ব্যতীত হুগ্‌লী জেলার ত্রিবেণী তীর্থ সম্বন্ধেও তাহাতে বিস্তৃত উল্লেখ আছে। এই সম্পর্কে আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভাগলপুর জিলার দক্ষিণস্থ সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালগণ সাপের যে ঝাড়ন মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা বাংলা। তাহারাও

মনসার পূজা করে এবং মনসাদেবীকে তাহাদের দেব-গোষ্ঠী বা 'বোঙ্গা'র সমাজে স্থান দেয়। চাঁদ সদাগরের কাহিনী তাহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই; তবে শঙ্কর গারড়ীর কাহিনীর অনুরূপ এক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ' কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, বিহার হইতেই মনসা-মঙ্গলের মৌলিক কাহিনীটি বাংলাদেশে আসিয়াছে, বাংলাদেশ হইতে বিহারে যায় নাই। মনসা-মঙ্গলের এই মৌলিক কাহিনীভাগের মধ্যে একটি সর্বজনীন আবেদন আছে, ইহার অন্যান্য অংশ লৌকিক উপাদানে ভারাক্রান্ত। মনে হয়, বেহুলা-লখিন্দরের মূল কাহিনীটি মুখে মুখে যখন বিহারে প্রচলিত ছিল, তখনই তাহা বাংলাদেশে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছিল; তারপর বাঙ্গালী ও বিহারীর মধ্যে এই বিষয়ক উপাদানের আরও কিছু আদান-প্রদান হইয়াছে। মনসা-মঙ্গলের পরবর্তী কবিদিগের বিহার সম্পর্কিত উল্লেখ হইতে কাহিনী বিহার হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছে এমন ধারণা করাই সমীচীন হইবে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কেহ মনে করিয়াছেন, চাঁদ সদাগর দাক্ষিণাত্যের কোন স্থানের অধিবাসী ছিলেন; অতএব তাঁহার মতে লখিন্দর-বেহুলার কাহিনীটি দাক্ষিণাত্য হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছে। এই মতবাদ যে-সকল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে এই—মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি গভীর ভাবে অনুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার সঙ্গে দক্ষিণ সমুদ্রের যোগ বড় নিবিড়। তেলেগু ভাষায় সিজ মনসা গাছের নাম চেংমুড। সিজ মনসা গাছের নীচেই মনসাদেবীর পূজা হয়। বাংলা মনসা-মঙ্গল কাহিনীতে চাঁদ সদাগর তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া মনসাকে চেংমুড়ী বলিয়া উল্লেখ করিতেন। বাংলায় চেংমুড়ী শব্দের কোন অর্থ নাই। অতএব অনুমিত হয়, তেলেগু হইতে চেংমুড়ী কথাটি আনীত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মনসা-মঙ্গলের সমস্ত গল্পটিই সেখান হইতে আসিয়া থাকিবে। দাক্ষিণাত্যের আধুনিক লোক-সাহিত্যে প্রায় মনসা-মঙ্গলের অনুরূপ এক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাতে শিবের সহিত অম্মবরু নামক এক লৌকিক দেবীর বিবাদের কথা আছে; এই কাহিনীটির সঙ্গে বাংলার মনসা-মঙ্গল কাহিনীর কিছু সম্পর্ক থাকিতে পারে বলিয়া মনে করা হইয়াছে। কাহিনীটি এইরূপ,—

অম্মবরু এক গ্রাম্যদেবী,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তাঁহার প্রসূত অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহাদের বাসের জন্য তিনটি পুরী নির্মাণ করিয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন, তাঁহারা যেন তাঁহাকে ছাড়া আর কাহারও পূজা না করে।

অম্মবরু জানিতে পারিলেন, তাঁহারা তাঁহার কথা অমান্য করিয়া নিজেদের পূজা প্রবর্তন করিতেছেন। দেবী ইহাতে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের পুরী ধ্বংস করিতে মনস্থ করিলেন। শৃগালে আরোহণ করিয়া সর্পরূপ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া দেবী শিবপুরীর দিকে অগ্রসর হইলেন। এক দ্বাদশ মস্তক বিশিষ্ট বিরাটকায় সর্প শিবপুরীর সিংহদ্বার রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু দেবীকে কিছুতেই রোধ করিতে পারা গেল না। তিনি পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একে একে শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা তিন জনকেই বধ করিলেন, পরে পুনরায় তাঁহাদিগকে জীবন দান করিয়া তাঁহার পূজা করিবার আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। এবার অম্মবরু দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ভক্ত এক নৃপতি শিবপূজা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে শাস্তি দিতে মনস্থ করিলেন। তিনি জরতীর বেশ ধারণ করিয়া কাঁখে একটি ফলের ঝুড়ি লইয়া রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দ্বারিগণ তাঁহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। এবার দেবী এক লিঙ্গায়তের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নগরমধ্যে সহজেই প্রবেশ করিলেন। তারপর এক তোতার রূপ ধারণ করিয়া এক স্তম্ভের উপর বসিলেন। পূজারিগণ শিব-পূজা করিতে গেল, তাহাদের হাত হইতে পূজার সামগ্রী পড়িয়া গেল। অমঙ্গলকারীর সন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক প্রেরিত হইল। তোতাবেশিনী অম্মবরু ধৃত হইয়া শিবের নিকট আনীত হইল। শিব তাহাকে নির্মমভাবে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু ঘাতকের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অম্মবরু নিজের রূপ প্রকাশ করিয়া নগরবাসীদিগকে তাঁহার পূজা করিবার আদেশ করিলেন। তাহারা স্ত্রীদেবতার পূজা করিতে অস্বীকার করিল। দেবী ইহার প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিলেন। বসন্তরোগে নগরবাসী প্রাণ হারাইতে লাগিল। কিন্তু শিবের বিভূতিস্পর্শে তাহারা সকলে পুনরায় জীবন লাভ করিল। অম্মবরু ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। একবার শিব-পূজারিগণ পূজার জন্য ফুল আহরণ করিতে তাঁহার পুরীতে আসিল, তিনি তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। এইভাবে তাঁহার প্রতিহিংসা নিবৃত্ত হইল।

এখন এই যুক্তিগুলি বিচার করিয়া দেখা যাক। একটি কথা এই সম্পর্কে বিশেষভাবে মনে রাখা কর্তব্য যে, দাক্ষিণাত্যের কোন সামাজিক আচার, কিংবা তদ্দেশীয় ভাষার কোন শব্দ বাংলার সমাজে কিংবা বাংলা ভাষায় প্রচলিত থাকিতে দেখিলেই তাহা যে দাক্ষিণাত্য হইতেই পরবর্তী কালে এ'দেশে আনীত হইয়াছে, এমন ধারণা করা সমীচীন হয় না। কারণ, দ্রাবিড় সংস্কার বাংলারও কতক নিজস্ব

প্রাচীন সংস্কার। বাংলা ভাষায় বহু দ্রাবিড় শব্দ প্রচলিত আছে ; এমন কি 'পূজা', 'পুষ্প' এই শব্দগুলিই দ্রাবিড়। অতএব ইহা হইতেও কেহ যদি মনে করেন যে, পুষ্পদ্বারা দেবতার্চন করিবার রীতি পরবর্তী কালে দ্রাবিড় দেশ হইতে আসিয়াছে, তাহা নিতান্তই হাস্যকর হইবে। বাংলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসী মালে ও মাল পাহাড়ী জাতি এখনও দ্রাবিড় ভাষাভাষী। অতএব বাংলা ভাষার প্রচলিত দ্রাবিড় শব্দগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যে দাক্ষিণাত্যের কোন অঞ্চল হইতে আসিয়াছে, তাহা অনুমান করা সমীচীন হইবে না। বিশেষতঃ যাঁহারা মনে করেন, সেনরাজদিগের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি লৌকিক সংস্কার এ'দেশে আসিয়াছে, তাঁহাদের মত কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, সেনরাজগণ ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। তাঁহাদের দাক্ষিণাত্যের লৌকিক সংস্কারগুলির সঙ্গে পরিচিত থাকিবার কোন কথাই নাই, কিংবা তাহা থাকিলেও তাঁহারা সেই সংস্কারগুলি এই দেশে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন, একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কারেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেনরাজদিগের সময় হইতেই বাংলার সমাজ নূতন আর্য-সংস্কারে দীক্ষা লাভ করিয়াছিল। অতএব যাঁহারা মনে করেন, সেনরাজদিগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার লৌকিক দেবদেবীগণও দাক্ষিণাত্য হইতে এই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের মত সমর্থনযোগ্য নহে। উদ্ধৃত কাহিনীর সঙ্গে বাংলা মনসা-মঙ্গল কাহিনীর কোন প্রকার সম্পর্ক আছে এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। ভারতের যে অঞ্চলেই প্রাচীন লৌকিক ধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে গিয়াছে, সেখানেই অনার্য দেবতার সঙ্গে আর্য দেবতার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, এই বিরোধের কাহিনী প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সংস্কৃত পুরাণ, বিশেষতঃ উপপুরাণগুলিও এই প্রকার কাহিনীতে ভারাক্রান্ত। অম্মবরুর কাহিনীও গতানুগতিক গ্রাম্য দেবতা ও পৌরাণিক দেবতার কলহের বৃত্তান্ত লইয়াই রচিত। দেবতাদিগের কলহের মধ্যে এখানে কোন মানব-মানবীর জীবনের ভাগ্যকে আনিয়া জড়িত করা হয় নাই। অতএব, বাংলা মনসা-মঙ্গল কাহিনীর উপর এই কাহিনীর প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ বাংলা মনসা-মঙ্গলের কাহিনী দাক্ষিণাত্যেই যদি সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইত, তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যের কোন না কোন অঞ্চলের লোক-সাহিত্যে এই অপূর্ব

বিষয়-বস্তুটি রক্ষা পাইত। ইহার বিষয়-গৌরবের জন্যই সাধারণের মধ্যে ইহা অতি সহজে প্রচার লাভ করিতে পারিত। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বিচিত্র ও সমৃদ্ধ লোক-সাহিত্য-সংগ্রহের কোনখানেই চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনীটির কোনপ্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং এই হিসাবে দাক্ষিণাত্য অপেক্ষা বিহারের দাবী অগ্রগণ্য।

এখন কাহিনীর উদ্ভবের মূলে রাঢ়ের দাবী সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়। বিহারে প্রচলিত মনসা-কাহিনী যে রাঢ় হইতে নীত হইয়াছে, তাহার সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনসা-মঙ্গলের প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য কবিই রাঢ় হইতে পূর্ববঙ্গে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান আক্রমণ হওয়ার পর সেনরাজগণ পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান এবং সেখানে আরও দেড়শত বৎসর কাল তাঁহারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুপরিবার তখন পশ্চিম বঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু সেনরাজগণের আশ্রয়ে পূর্ববঙ্গে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনসা-মঙ্গল কাব্যের কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবিও প্রায় সেই সময় রাঢ়দেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহারাই মুখ্যতঃ সেখানে গিয়া মনসা-মঙ্গলের কাহিনী সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের মনসা-মঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণদেব লিখিয়াছেন,—

পূর্বপুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।
রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোরগ্রামে বসতি ॥

পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাংশে বিজয়গুপ্তই মনসা-মঙ্গল কাব্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। বাখরগঞ্জ জিলার গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামে বিজয়গুপ্তের নিবাস ছিল। রাঢ়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন সংস্রবের কথা অবশ্য তিনি তাঁহার কাব্যে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার রচিত কাব্য বিশেষভাবে অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনিও তাঁহার রচনায় রাঢ়ের প্রচলিত কাহিনীব ধারাটিকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গল কাব্যে নেতার জন্ম সম্পর্কে যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শূন্য-পুরাণ বা ধর্মসাহিত্যে বর্ণিত আদ্যাশক্তির জন্মবৃত্তান্ত হইতে আসিয়াছে। শূন্য-পুরাণ বা ধর্ম-সাহিত্য রাঢ়দেশেরই বস্তু, পূর্ববঙ্গে কোথাও ইহার প্রচলন নাই। অতএব ইহা পরবর্তী কালে বিজয়গুপ্তের কাব্যে প্রক্ষিপ্ত হইবারও কথা নহে। মনে হয়, মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে রাঢ়ের এই বিশিষ্ট লৌকিক ধর্মমূলক

জনশ্রুতিটিও পূর্ববঙ্গে আসিয়া প্রচার লাভ করিয়াছে। ইহা পূর্ববঙ্গের লৌকিক ধর্মের অনুকূল না হওয়ার জন্যই পরবর্তী কবিদিগকর্তৃক তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিজয়গুপ্তের কাব্যে রায়বাঁশিয়া পাইকেরও বর্ণনা রহিয়াছে। রাঢ়-ভূমি ব্যতীত রায়বাঁশিয়া পাইকের কোথাও অস্তিত্ব নাই, পূর্ববঙ্গে ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিজয়গুপ্ত তাঁহার কাহিনী রচনায় রাঢ়ের জনশ্রুতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বরের আসনরূপে গামারিয়া পীড়ির ব্যবহার বিশেষরূপেই উল্লেখযোগ্য। গামারিয়া পীড়ি পশ্চিমবঙ্গে পূজিত লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের আসন। রাঢ় অঞ্চলে ইহার একটি বিশেষ ধর্মসম্পর্কিত মূল্য আছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে ইহার প্রচলন অজ্ঞাত। তারপর বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, শ্বেতবর্ণের কাকের মুখে বেহুলা মাতার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। শ্বেত কাক রাঢ়দেশে ধর্মঠাকুরের দ্বাররক্ষী বলিয়া উল্লিখিত হয়। পূর্ববঙ্গে এই প্রকার কোন জনশ্রুতি নাই। ইহা ছাড়াও বিজয়গুপ্ত সর্বত্র উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'ধর্মের প্রভাবে বেহুলা নিরাহারে যায়'। ইহাতেও ধর্মপূজার কৃচ্ছ্রসাধনার কথাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ধর্মপূজা পূর্ববঙ্গে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং ইহা পশ্চিমবঙ্গেরই একটি লৌকিক ধর্ম মাত্র। অতএব এই সকল বিষয়ের সঙ্গে বেহুলা ও চাঁদ সদাগরের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিচার করিয়া দেখিলে মনসা-মঙ্গলের কাহিনী যে রাঢ়েই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমগ্র বাংলা দেশের মধ্যে রাঢ়-ভূমির অন্তর্গত বর্তমান বীরভূম জিলায় আধুনিক কাল পর্যন্তও মনসা পূজার সর্বাধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বীরভূম জিলায় এমন কোন গ্রাম নাই যেখানে এক কিংবা ততোধিক মনসার 'মন্দির' নাই। এই সকল 'মন্দিরে' নিম্ন জাতির লোককর্তৃক মনসা-পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বার্ষিক পূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণও পূজা করেন। বীরভূম জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামে কোন না কোন নিম্নশ্রেণীর, বিশেষতঃ কেওট (কৈবর্ত) বা বাগ্দী জাতীয় লোকের বাড়ীতে মাটির দেওয়াল দেওয়া কোন খড়ো ঘরে মনসাদেবীর 'মূর্তি' প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। অবশ্য ইহাদিগকে মূর্তি বলা ভুল হয়, প্রকৃত-পক্ষে ইহারা মৃত্তিকা-নির্মিত ঘট। বাহিরের দিক হইতে ঘটের গায়ে কতকগুলি সর্পফণা গড়িয়া তোলা হয়। এই ঘটের শীর্ষদেশে প্রত্যহ পূজারিকর্তৃক একটি সিজ

মনসার ডাল আনিয়া স্থাপন করা হয়। প্রত্যহ এই ঘটের সম্মুখে পূজা হয়, কাহারও মানসিক থাকিলে পাঁঠা, কবুতর ইত্যাদি বলিও হয়। দশহরা, শ্রাবণ-সংক্রান্তি, ভাদ্র-সংক্রান্তি ও নাগপঞ্চমীতে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে উৎসব হয়। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ পূজা করিয়া থাকেন। জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেব-পূজিত রাধামাধব দেবতার মন্দির সমস্ত বৎসর প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে, কেবলমাত্র মাঘমাসে মেলার সময় জনসমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু রাধামাধবের মন্দিরের অদূরবর্তী এক বাগ্দীর বাড়ীতে এক মনসাদেবীর 'মন্দির' আছে। ইহা 'চিন্তামণি মনসার বাড়ী' নামে পরিচিত। চিন্তামণি মনসার বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহ সাত আট ক্রোশ দূর হইতেও লোক অজয়ের তপ্ত বালু পার হইয়া মানসিক পাঁঠা কিংবা কবুতর বলি দিয়া পূজা করিবার জন্য আসে। মন্দিরের আয়ে বাগ্দীর বৃহৎ পরিবার স্বচ্ছন্দভাবে চলিয়া যায়। জয়দেব-পূজিত রাধামাধবের মন্দির জীর্ণ ইতিহাসের পাতায় আশ্রয় লইয়াছে, কিন্তু চিন্তামণি-মনসার বাড়ী এখনও স্থানীয় অধিবাসীর নিত্য সংস্কারের মধ্যে জাগরূক আছে।[১] এই প্রকার সমগ্র বীরভূম জিলায় কত যে মনসার বাড়ী আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শিউড়ীর নিকটবর্তী কড়ে-কালীপুর নামক একই গ্রামে এমন ছয়টি মনসার বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক মনসা বাড়ীতেই নিত্যপূজা হয়। কড়ে-কালীপুরের মনসার কেওট দেয়াসিগণ মনসা-মঙ্গলের সুগায়ক। বিষম ঢাকীর (ডম্বরু জাতীয় এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) তালে ইহারা যখন মনসা-মঙ্গল গান করে, তখন প্রকৃতই মনে হয়, এই সঙ্গীত-সাধনা তাহাদের পুরুষানুক্রমিক সংস্কার, তাহা না হইলে কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন সুগভীর আবেগ ফুটিয়া উঠিতে পারে না।

বীরভূম জিলার সংলগ্ন দক্ষিণে বর্ধমান জিলার চম্পাইনগর নামক একটি গ্রাম আছে, যে নদীর তীরে এই গ্রাম অবস্থিত তাহার নাম বেহুলা। এই সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে 'বেহুলা নদীর ধারে ধারে' চম্পাইনগরে বিষহরির আটন। নাগ পঞ্চমীতে বিষহরির পূজার দিন আজও গ্রামের বধূরা শ্বশুর বাড়ীতে থাকে না,

[১] এখানে উল্লেখযোগ্য যে চিন্তামণি এক জাতীয় সর্পের নাম। বাংলা দেশে এই নামটি এখন আর কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু মালয় উপদ্বীপে এই নামটি এখনও রক্ষিত আছে (W. W. Skeat, *Malaya Magic*, London, 1900, 303)। বাংলাদেশ হইতে যে এই নামটি কোন উপায়ে মালয়ে গিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

সেদিন তাদের বাপের বাড়ী যাওয়ার ব্যবস্থা। চম্পাইয়ের বধূরা বেহুলার বাসরের কথা স্মরণ করে সেদিন চম্পাইনগর ছেড়ে চলে যায়। বাপের বাড়ীতে গিয়ে উপবাস করে, চম্পাইনগরে বিষহরির দরবারে পূজা পাঠায়।'[১]

এখনও প্রতি বৎসর বেহুলার মেলা নামে এই গ্রামে এক বিরাট মেলার অধিবেশন হয়। মেলায় চারিদিক হইতে বহু বেদের দল আসিয়া সমবেত হয়। তবে জনশ্রুতি জনশ্রুতিই—ইহাকে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না।

বীরভূমের সুবর্ণবণিকদিগের বিবাহানুষ্ঠানের একটি আচারকে 'গাছবেড়া' বলা হয়। এই আচারটি বিবাহের দিন বা বিবাহের পূর্বদিন কিংবা গাত্রহরিদ্রার দিন, সম্পূর্ণরূপে মনসাদেবীকে লইয়া অনুষ্ঠিত হয়। ইহার দুই তিন দিন পূর্বেই সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসাকে তাঁহার 'স্থান' বা মন্দির হইতে আনিয়া অষ্টমঙ্গলা পর্যন্ত বিবাহ-বাড়ীতে রাখা হয় এবং দেবীর গৃহাগমনের জন্য এই কয়েকটি দিন প্রতি সন্ধ্যায় মনসা-মঙ্গল গীত গাওয়া হয়। মূল গায়েন এবং দুইজন খাল ও দুইজন মন্দিরা-বাদক—মোট পাঁচজন দলে থাকেন, বাদক চারিজনই 'দোহারে' অংশ গ্রহণ করেন। গাছবেড়ার দিনটিতে পাত্রপাত্রীর উপবাসে থাকা কর্তব্য। এই দিন প্রভাতে কয়েকটি 'মেয়েলী আচারের' প্রথা আছে, তন্মধ্যে 'জুয়াখেলা' উল্লেখযোগ্য ইহার পর দ্বিপ্রহরে গাছবেড়া অনুষ্ঠানটি পালন করিবার জন্য একটি বিরাট মিছিল বাহির হয়। মিছিলের পুরোভাগে থাকেন চামরহস্তে মনসা-মঙ্গলের মূল গায়েন, গায়ক ও বাদ্যকারগণ এবং ইহাদের পশ্চাতে মনসাদেবী থাকেন 'দেয়াশী'র ক্রোড়ে; দেবীর পার্শ্বে পুরোহিত থাকেন। ইহার পর কয়েকজন এয়োস্ত্রী নানা অলঙ্কার ও পট্টবস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া কুম্ভকক্ষে অগ্রসর হন। দুইটি কিশোর-কিশোরী পথিপার্শ্বের জনতার উপর খৈ ছড়ায়। এয়োস্ত্রীগণের হুলুধ্বনি ও কিশোর-কিশোরীর শঙ্খধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া মিছিলটি অগ্রসর হইতে থাকে। এয়োদিগের মধ্যে বা পশ্চাতে বর-কনে চলিতে থাকে; পাত্রের হস্তে থাকে জাঁতি বা দর্পণ, পাত্রীর হস্তে থাকে কাজললতা। পাত্রী বামহস্তে একটি কাষ্ঠের নৌকা টানে ও একটি ঝুনা নারিকেল দক্ষিণ হস্ত দিয়া পথে গড়াইয়া দিতে থাকে। ইহা ব্যতীত আর একটি বাদকদল ঢাক, ঢোল, কাঁসি, সানাই বাজাইয়া ঐ মিছিলের অগ্রে কিংবা

[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নাগিনীকন্যার কাহিনী (?), পৃ. ২০৩

পশ্চাতে যাইতে থাকে। মিছিল মধ্যে মধ্যে দেবীকে লইয়া দাঁড়াইয়া জনসাধারণের জন্য মনসা-মঙ্গলের গান করে। এই অবসরে সামান্য পয়সার বিনিময়ে প্রাচীনাগণ পুরোহিতের নিকটে দেবীর ফুল বা বিল্বপত্রের জন্য প্রার্থনা জানায়, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে প্রণাম করিয়া দেবীর চরণধূলা গ্রহণ করে। এই সময়ের বিশেষ ঘটনা হইল 'ভর'—অর্থাৎ এয়োগণের মধ্যে যাহাকে দেবী 'ভর' করেন, তাহাকে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করেন যে, কোনও অপরাধ হইয়াছে কিনা। ঐ এয়োর মুখেই দেবীর উত্তর পাওয়া যায় এবং ত্রুটি হইলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান জানিতে পারা যায়। ক্রমে মিছিলটি গ্রামের প্রান্তে একটি বিশেষ অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকটে আসিয়া অল্পক্ষণ মনসা-মঙ্গল গান করে; পরে বর কনে ও এয়োগণ বৃক্ষটিকে প্রদক্ষিণ করে, এই সময় এয়োস্ত্রীগণ হুলুধ্বনি দিতে থাকে ও বৃক্ষগাত্র সূতা দ্বারা বেষ্টন করা হয়। পরে পূর্বের ন্যায় তাহারা গৃহে ফিরিয়া দেবীকে তাঁহার আসনে স্থাপন করে ও 'গাছবেড়া' আচারটি শেষ হওয়ার জন্য পুনরায় মনসা-মঙ্গল গান করা হয়।

বিষ্ণু পাল বীরভূম জেলার কবি, একমাত্র তাঁহার মনসা-মঙ্গলেই এই 'গাছবেড়া' অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়—অন্যত্র তাহা নাই। বীরভূমের সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায় আজও ইহা পালন করে এবং এই অনুষ্ঠানে তাঁহারা বিষ্ণু পালের মনসা-মঙ্গলই গান করিয়া থাকেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্যে কয়েকটি মনসা-মূর্তি বীরভূম জেলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বীরভূমের সমস্ত লৌকিক সংস্কারের মধ্যে মনসাদেবীর ব্যাপক প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি বীরভূম জিলার কোন অঞ্চলে একদিন বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল এবং সেখান হইতেই ক্রমে পূর্ববঙ্গেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এমন অনুমান করা খুব অসঙ্গত হইবে না।

বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীই যে বাংলাদেশে প্রচলিত মনসার মাহাত্ম্যসূচক একমাত্র কাহিনী তাহা নহে। মেয়েলী ব্রতকথায় মনসার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া স্বতন্ত্র এক কাহিনী রচিত হইয়াছিল। মনসার ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া বাংলার মেয়েরা সর্বত্র এই ব্রতকথা কহিয়া থাকে। এই কাহিনী অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্যহীন ব্রতকথার রীতিতে রচিত। কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে—

এক সদাগর; তাহার সাত পুত্র-বধূ। সকল বউয়ের বাড়ী হইতেই তত্ত্ব আসে, ছোট বউয়ের বাড়ী হইতে কিছুই আসে না, শাশুড়ী সেইজন্য ছোট বউয়ের

উপর বিরূপ। এক বাদ্‌লার দিনে বউয়েরা যে যাহার মনে   খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ছোট বউ গর্ভবতী ছিল, সে পান্তা ভাত দি   র টক খাইতে চাহিল। বউয়েরা সন্ধ্যার সময় পুকুরে গা ধুইতে গেল। ছোট বড় দেখিতে পাইল, জলের উপর এক ঝাঁক মাছ। সেই বনে অষ্টনাগ বাস করিত। বনে দাবানল উপস্থিত হওয়ায় তাহারাই পুকুরে মাছ্ হইয়া লুকাইয়া ছিল। ছোট বউ গাম্‌ছা ছাঁকিয়া মাছ্‌গুলি ধরিল। জায়েরা দেখিয়া বলিল, ছোট বউয়েরই সাধ পূর্ণ হইল। ছোট বউ মাছ্‌গুলি লইয়া বাড়ীতে গেল। পরদিন কুটিরে গিয়া দেখিল, তাহারা সকলে সাপ হইয়া রহিয়াছে। ছোট বউ দুধ আর কলা দিয়া সাপগুলিকে পুষিতে লাগিল। কিছুদিন পর সাপেরা স্বর্গে তাহাদের মাতা মনসাদেবীর নিকট চলিয়া গেল। ছেলেরা গিয়া মনসার কাছে ছোট বউয়ের উপকারিতার কথা বলিল। মনসা তাহাদের কথায় ছোট বউকে তাঁহার কাছে আনিতে চলিলেন। শাঁখা সিঁদুর-চুপড়ি, নোয়া, নথ পরিয়া মনসা সদাগরের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছোট বউয়ের শাশুড়ীর নিকট নিজেকে তাহার মাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহাকে কিছুকালের জন্য লইয়া যাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। ছোট বউকে লইয়া রথে চড়িয়া মনসা রওয়ানা হইলেন। রথে তুলিয়াই মনসা তাহাকে বলিলেন, 'তুমি চোখ বুজিয়া থাক, যখন চোখ খুলিতে বলিব, তখন খুলিও'। মনসা নিজের পুরীতে প্রবেশ করিয়া ছোট বউয়ের চোখ খুলিয়া দিলেন। সে দেখিল, মস্ত বড় বাড়ী। সেই খানেই সে অষ্টনাগকেও দেখিতে পাইল। মনসা তাহাকে বলিয়া দিলেন, 'তুমি রোজ আমার পূজার আয়োজন করিবে, তোমার এই আট ভাইয়ের জন্য গরম দুধ রাখিবে, আর কখনও দক্ষিণ দিকে চাহিবে না।' ছোট বউ মনে করিল, না জানি দক্ষিণ দিকে কি আছে! সে একদিন দক্ষিণ দিকে তাকাইয়া দেখিল, মনসা নাচিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে তন্ময় হইয়া গেল। ভাইদের দুধ গরম করিয়া রাখার কথা ভুলিয়া গেল। তারপর যখন মা মনসার নাচ ভাঙ্গিল, তখন তাড়াতাড়ি আসিয়া দুধ গরম করিল; গরম দুধে মুখ দিতেই অষ্টনাগের মুখ পুড়িয়া গেল। ক্রোধে অষ্টনাগ ছোট বউকে দংশন করিতে গেল, মনসা তাহাদিগকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এখানে আমার বাড়ীতে তাহাকে কাম্‌ড়াইবার প্রয়োজন নাই, বরং তাহাকে আমি মর্ত্যলোকে তাহার বাড়ীতে রাখিয়া আসি, সেখানে গিয়াই তাহাকে কাম্‌ড়াইও।' মনসা ছোট বউকে লইয়া পুনরায় মর্ত্যলোকে চলিলেন। মনসা তাহাকে বলিয়া দিলেন, 'তোমার ভাইয়েরা

তোমার উপর খুশী হইয়াছে, মর্ত্যলোকে গিয়া তুমি তাহাদের খুব সুখ্যাতি করিও, তবেই তাহারা তোমার উপর খুসী হইবে।' অর্ধেক গায় গয়না দিয়া মনসা ছোট বউকে তাহার শ্বশুর বাড়ীতে দিয়া গেলেন। সকলে দেখিয়া নিন্দা করিয়া বলিল, 'এ' আবার কি ঢং, অর্ধেক গায়ে গয়না, বাকি অর্ধেক গায়ে কিছু নাই ?' ছোট বউ বলিল, 'আমার অষ্টনাগ ভাইয়েরা বাঁচিয়া থাকুক, আমার গয়নার অভাব কি ? অর্ধেক গায়ে গয়না দিয়াছে, বাকি অর্ধেক গায়েও তাহারাই গয়না দিয়া ভরাইয়া দিবে।' অষ্টনাগ বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরিতেছিল। ছোট বউয়ের মুখে তাহাদের প্রশংসা শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত খুসী হইল এবং তাহাকে দংশন করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া গিয়া মা মনসার নিকটও তাহার প্রচুর প্রশংসা করিতে লাগিল। অষ্টনাগের ইচ্ছায় মনসা ছোট বউয়ের বাকি অর্ধেক দেহও গহনায় ভরাইয়া দিলেন। মনসা তখন স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া ছোট বউকে বলিলেন, 'আমি তোমার মাসী নই, আমি মনসা, আমি সিজ মনসা গাছে থাকি, তুমি আমার পূজা পৃথিবীতে প্রচার করিও। দশহরা, নাগপঞ্চমীর দিনে ঐ গাছ আনিয়া পূজা করিও, আর ভাদ্রমাসে অরন্ধনের দিন শুদ্ধাচারে পূজা করিয়া আমাকে পান্তা ভাতের সাধ দিও! তা' হইলে আর কখনও সাপের ভয় থাকিবে না।' এই বলিয়া মনসা অন্তর্হিত হইলেন। ছোট বউ তখন সকলকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। তখন হইতেই সকলে পরম শ্রদ্ধাভরে মনসার পূজা করিতে লাগিল। ক্রমে মর্ত্যলোকে মনসার পূজার প্রচার হইল।

কাহিনীটি পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে এই ভাবে প্রচলিত আছে, রাঢ়ে ইহার সামান্য একটু ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। কি ভাবে নাগশিশুর সঙ্গে ছোট বউয়ের সাক্ষাৎ হইল কেবলমাত্র এই অংশটুকুর মধ্যেই রাঢ়ের প্রচলিত আখ্যায়িকায় একটু ব্যতিক্রম আছে, তাহা এখানে বর্ণনা করিতেছি—সদাগরের বাড়ীতে এক রাখাল ছেলে ছিল—সে মাঠে মাঠে গরু রাখিত, একদিন সে এক গাছের নীচে দুইটি ডিম কুড়াইয়া পাইল। ডিম দুইটি তাহার পুড়াইয়া খাইবার বড় সাধ হইল, সে বাড়ীতে আসিয়া সদাগরের ছোট বৌকে ডিম দুইটি তাহাকে পুড়াইয়া দিবার জন্য বলিল। ডিম দুইটি দেখিয়া বউটির বড় মায়া হইল; ভাবিল, 'আহা কোন্ জীবের ডিম!' ভাবিয়া এক কোণে ইহাদিগকে একটি ঢাকনা দিয়া রাখিয়া দিল, রাখাল ছেলেকে কাঁঠাল-বীচি পুড়াইয়া ডিম বলিয়া খাইতে দিল। একদিন বৌটি

দেখিল, ঢাকনার নীচে কি নড়িতেছে। বৌটি ঢাকনা খুলিয়া দেখিল, দুইটি নাগশিশু। সে ইহাদিগকে ভয় না করিয়া পরম যত্নে লালন-পালন করিতে লাগিল। ইহার পর কাহিনীর আর বিশেষ কোন ব্যতিক্রম নাই।

মনসা-বিষয়ক প্রাচীন একটি সংস্কার হইতেই যে এই ব্রতকথার কাহিনী সংগ্রথিত হইয়াছে, তাহা এই কাহিনীটির বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মনসা তখন পর্যন্তও বৃক্ষেতেই পূজিত হইতেন। বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গলে যে সংস্কার হইতে মনসার 'জাগিয়া জাগুলি নাম সিজ বৃক্ষে স্থিতি' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, (পরে দ্রষ্টব্য) এই ব্রতকথার সংস্কারও তাহা হইতেই আসিয়াছে। অতএব এই কাহিনী মনসা-বিষয়ক চাঁদসদাগর-বেহুলার কাহিনীর পূর্ববর্তী সন্দেহ নাই। ব্রতকথার এই কাহিনীটি পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন—ইহা কাহিনীগত ঐক্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাংলার উভয়ত্রই প্রচার লাভ করিয়াছে। চাঁদসদাগর-বেহুলার কাহিনীর ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও ইহার মধ্যে তাহার কোনই প্রভাব অনুভব করা যায় না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যুক্ত প্রদেশের ব্রতকথার মধ্যেও এইরূপ একটি কাহিনী আছে এবং তাহা এটোয়া জেলা হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।[১] অতএব আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, কাহিনীটি পশ্চিম ভারত হইতে বাংলা দেশে আসিয়া থাকিবে।

লখিন্দর-বেহুলার কাহিনীর উদ্ভব-কাল কি হইতে পারে ? এ' বিষয়ে কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, 'নবোদিত পূজাপদ্ধতি, দেবীর মাহাত্ম্যসূচক গল্প ইত্যাদি দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই পরে গীত-রচয়িতাগণ অগ্রসর হইয়া দেবীর মাহাত্ম্যসূচক পালা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কাজেই দেবীর পূজার প্রথম প্রচার এবং তাঁহার মাহাত্ম্য বিস্তারের জন্য গীতের পালা-রচয়িতাগণের আবির্ভাবের মধ্যে ১৫০।২০০ বৎসরের ব্যবধান থাকা সম্ভবপর। এই হিসাবে খৃস্টের নবম শতাব্দে মনসাদেবীর পূজা বাংলায় প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে।' আমরা পূর্বে অনুমান করিয়াছি যে, সেনরাজবংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থানের যুগে বৌদ্ধ দেবদেবীগণ যখন নূতন পরিচয় লাভ

---

[১] মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিত বি. এ. গুপ্তে তাঁহার *Hindu Holidays and Ceremonies* (Calcutta, 1919) নামক গ্রন্থে নাগপঞ্চমীর বর্ণনা উপলক্ষে প্রায় অনুরূপ একটি ব্রতকথার উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ১৭৬-১৭৭); তবে তাঁহার কাহিনীর নায়ক শেষ বা অনন্ত নাগ, মনসা নহে—তাহাতে মনসার কোনও উল্লেখ নাই। অতএব মহারাষ্ট্র দেশেও অনুরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে বলিয়া মনে হইতেছে।

মনসা-মঙ্গলে

পাওয়া যায়

মনসা-মঙ্গলের কবিগণ

মনসা-মঙ্গল কাহিনীর আদি রচয়িতা কে ? অবশ্য এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবি বিজয়গুপ্ত হরিদত্ত নামে তাঁহার পূর্ববর্তী একজন কবির নামোল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন মঙ্গল-কাব্যের কবিদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের পূর্ববর্তী কবিদিগের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, ইহারই সূত্র অনুসরণ করিয়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির সম্বন্ধে অনেক সময় অনুসন্ধানের সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। হরিদত্ত সম্বন্ধে এ' পর্যন্ত বিজয়গুপ্তের উল্লেখ মাত্র ব্যতীত আর কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। কিছুকাল যাবৎ অনুসন্ধানের ফলে হরিদত্ত রচিত মনসা-মঙ্গলের অনেকগুলি নূতন পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই বিষয়ক একজন আদি কবির বিষয়ে অনেকটা স্পষ্ট ধারণায় আসিয়া পৌঁছান গিয়াছে।

হরিদত্ত

বরিশাল অঞ্চলের মনসা-মঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্ত হরিদত্ত সম্বন্ধে যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেই জানিতে পারা যায় যে, হরিদত্ত খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী লোক ছিলেন। মনসা-মঙ্গল রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে বিজয়গুপ্তের যতটুকু জ্ঞান ছিল, তাহাতে তাঁহার মতে হরিদত্তই এই শ্রেণীর কাব্যের আদি কবি,—

প্রথমে রচিত গীত কানা হরিদত্ত।[১]

বিজয়গুপ্ত আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহারই সময় অর্থাৎ খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেই হরিদত্তের 'গীত' লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল,—

হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।

ইহা হইতেই স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন যে, বিজয়গুপ্তের সময়ে 'যে গীত বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসর পূর্বে বিরচিত হওয়ার সম্ভাবনা।' সুতরাং তাঁহার মতে 'কানা

১ বিজয়গুপ্ত, মনসা-মঙ্গল, প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সম্পাদিত (১৩৩৭), ৪

সর্বত্র গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; ইহাতেই তাঁহার সাংসারিক অনটন কোন মতে দূর হইত। ক্রমে শুধু কবি বলিয়া নহে, সুকণ্ঠ গায়ক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কথিত আছে, একবার তিনি তাঁহার গানের দল লইয়া এক হাওরের (বিস্তৃত জলাভূমি) মধ্য দিয়া নৌকা করিয়া কোথাও গান গাহিবার জন্য যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি নরহন্তা দস্যু কেনারামের হাতে পড়িলেন। কেনারাম তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। বৃদ্ধ কবি জন্মের শেষ একবার ভাসান গাহিয়া লইবার অনুরোধ জানাইলেন, কেনারাম তাহাতে সম্মত হইল। ভক্ত কবির কণ্ঠে বেহুলার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া নরহন্তা দস্যুর হৃদয়ও বিগলিত হইল। সে হাতের খড়্গ ফেলিয়া দিয়া বৃদ্ধ কবির পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। কেনারাম দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিল।

দ্বিজ বংশীর মনসা-মঙ্গলোক্ত কাহিনীর মধ্যে একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। তাঁহার চাঁদ সদাগরের ইষ্টদেবতা শিব নহেন, বরং চণ্ডী—শিবের পত্নী। সপত্নী-কন্যা মনসার সঙ্গে চণ্ডীর বিবাদ। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক (sectarian) আবেদন লুপ্ত হইয়া গিয়া তাহার স্থলে সর্বধর্মসমন্বয়ের উদার আদর্শ স্থান লাভ করিয়াছিল। দ্বিজ বংশীদাসের মনসা-মঙ্গল এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার যুগেই রচিত হয়। অতএব তাঁহার কাহিনীতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, চাঁদ সদাগর চণ্ডীর ভক্ত হইলেও অন্য দেবতার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ নহেন —তিনি যখন সনকাকে প্রথম মনসা-পূজা করিতে দেখিলেন, তখন ক্রুদ্ধ হইলেন না; বরং চণ্ডী ও মনসা যে অভিন্না এই বলিয়া স্তব করিলেন। কিন্তু রাত্রিকালে চণ্ডী স্বপ্নে আবির্ভূতা হইয়া সপত্নী-কন্যা মনসার বিরুদ্ধে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। ইহাতে শৈব চাঁদ সদাগরের লৌকিক দেবতার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিবার কথা নাই, বরং তাহার পরিবর্তে চণ্ডী-মনসার পারিবারিক কলহের নিতান্ত মানবিক পরিচয়ের কথাই আছে। উভয়ের বিবাদের মধ্যে পড়িয়া চাঁদ সদাগরের লাঞ্ছনার একশেষ হইল। অবশেষে শিব মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন।

চাঁদ সদাগরের এই চরিত্র পরিকল্পনা মঙ্গলকাব্যের মূল আদর্শের বিরোধী। কারণ, প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে স্ত্রীদেবতার পূজার বিরুদ্ধেই কাব্যোক্ত নায়কের অভিযান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বংশীদাসের কাহিনীতে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হইয়াছে। ইহা দ্বিজ বংশীর অপেক্ষাকৃত আধুনিকত্বেরই প্রমাণ।

দ্বিজ বংশী একাধারে কবি ও সাধক। এই কাব্যের ভিতর দিয়াই তিনি

আধ্যাত্মিক সাধনার পিপাসাও চরিতার্থ করিয়াছিলেন। এই হিসাবে বাংলার আর একজন পরবর্তী কবির সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয়, তিনি রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত যেমন বাঙ্গালীর প্রাণের জিনিস, তেমনই দ্বিজ বংশীর গানও পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রিয়তম লোকসঙ্গীত। এই সম্পর্কে ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ গীতিকাব্য-সংগ্রাহক স্বর্গীয় চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের নিজের উক্তি কতক উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। তিনি লিখিয়াছেন, 'কবি দ্বিজ বংশী ছিলেন পূর্ব ময়মনসিংহের প্রাণের কবি। প্রায় তিনশত বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে, আজও ময়মনসিংহবাসী তাহাদের প্রাণের কবিকে ভুলে নাই। ঘরে বাহিরে, মনের মধ্যে, আজও তাঁহাকে দেবতার পাশে ঠাঁই দিয়া রাখিয়াছে। বিবাহে, উপনয়নে, অন্যান্য উৎসবে আজও দ্বিজ বংশীর গান তাহাদের ক্রিয়া অনুষ্ঠানাদির একটি প্রধান অঙ্গ। মেয়ের বিবাহে সোহাগ সাধিতে, তৈল রাঁধিতে, পাড়ার মেয়েরা আজও বংশীদাসের গান গাহিয়া থাকে। অধিবাসকালে বর-কন্যাকে হলুদজলে নাইয়া তোলার যে রীতি ও অন্যান্য যে স্ত্রী-আচার আছে, তাহাতে তাঁহারা বংশীদাসেরই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। মা'র নিকট হইতে মেয়ে, সেই গান, আচার অনুষ্ঠান ক্রমেই শিক্ষালাভ করিয়া চলিয়াছে। পল্লীতে পল্লীতে আজও বংশীদাসের নামে উলুধ্বনি পড়ে। আজ কোন দুর্বার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যদি বংশীদাসের সেই সুবৃহৎ পদ্মাপুরাণ সকল সমূলে নষ্ট হইয়া যায়, তবু কালের কবল হইতে একটি অক্ষরও মুছিবে না। এদেশে এমন গায়ক আজও জীবিত আছেন, যাঁহারা এই দেড় হাজার পৃষ্ঠার অতিকায় পুঁথিখানা আগাগোড়াই একদম কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন।'[১]

বংশীদাসের এই ব্যাপক লোক-প্রিয়তার কারণ, তাঁহার অনুভূতির আন্তরিকতা ও ভাষার প্রত্যক্ষতা। সহজ নিরলঙ্কার ভাষায় ব্যক্ত মনের গভীর ভাবটি পাঠকের মর্মতল স্পর্শ করে। ভক্তসাধকের দৃষ্টির সঙ্গে সহজ কবিত্বের শুচিদৃষ্টি মিলিত হইয়া তাঁহার কাব্যে মণিকাঞ্চন যোগ সৃষ্টি করিয়াছে। মনসা-মঙ্গলকাব্য যে করুণ রসের আকর, অন্তরের সহজ ভাবানুভূতি হইতে বংশীদাস তাঁহার কাব্যে তাহা উৎসারিত করিয়াছেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও কৃত্রিমতা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই ভাবানুভূতির অকৃত্রিমতাই দ্বিজ বংশীকে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর কাছে এত জনপ্রিয় করিয়া রাখিয়াছে।

[১] চন্দ্রকুমার দে, 'ময়মনসিংহের কবিকথা', ঐ।

চরিত্রসৃষ্টিতে বংশীদাস এই গতানুগতিক কাহিনীভাগের মধ্যেও কোন কোন স্থলে অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন। সমগ্র মনসা-মঙ্গলকাব্যের মধ্যে তাঁহার চাঁদ সদাগরের চরিত্রসৃষ্টি অভিনব। চাঁদের চরিত্রের কঠোরতা তিনি বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইতে দেন নাই। দুর্বার নিয়তির বিরুদ্ধে নিঃসঙ্গ সংগ্রাম করিয়াও যিনি নিজের আদর্শকে অটল রাখিয়াছিলেন, দৈবশক্তি যাঁহার পৌরুষের নিকট বারংবার সমুচ্চ মস্তক নত করিয়াছে, সেই চাঁদ সদাগরের চরিত্র সকল বাঙ্গালী কবির কল্পনাতেই যে সমান মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছে—তাহা নহে, কিন্তু দ্বিজ বংশীদাস চাঁদ সদাগরের এই দৃপ্ত পৌরুষকে আরও শতগুণ উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। বেহুলার দুঃখের চিত্র বর্ণনায় তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ কবিহৃদয়ের যে পরিচয়টুকু লাভ করা যায়, তাহাই চাঁদ সদাগরের চরিত্রের দৃঢ়তা বর্ণনা করিতে আবার সময়োচিত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, দেখিতে পাই। পদ্মার চক্রান্তে চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্র সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিল। পুত্রশোকাতুরা সনকার মাতৃহৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু চাঁদ অটল রহিলেন, মৃত পুত্রদিগকে শীঘ্র জলে ভাসাইয়া দিবার আদেশ দিয়া কহিলেন, 'কাণীর উচ্ছিষ্ট পুত্র শীঘ্র কর পার'। পদ্মার প্রতি আক্রোশ তাঁহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

চৌদ্দ ডিঙ্গি ডুবি হইবার পর ভাগ্যবিপর্যস্ত সর্বহারা চাঁদ যখন একাকী দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার অনুচরদিগের পরিবারবর্গ নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের নিধনসংবাদ শুনিয়া বিলাপ করিতে লাগিল,—

বিলাপ করয়ে লোকে স্বামীর মরণ শোকে
ফেলায় কেহ শঙ্খ সিন্দূর ॥
বাড়ী বাড়ী উঠে রোল রাজ্যময় গণ্ডগোল
এক ধাইতে সহস্রেক ধায়।
চান্দর চরণে পড়ি যায় লোকে গড়াগড়ি
স্ত্রী পুরুষে ধূলায় লুটায় ॥
চান্দ বলে প্রজাগণ কেন কান্দ অকারণ
যে করিমু শুন কহি কথা।
যত ডিঙ্গা ডুবাইছে সকলে লইব পাছে
সে কাণীর লাগ পাই যথা ॥

কিন্তু এই প্রবোধবাক্যেও যখন প্রজাবর্গ সান্ত্বনা লাভ করিল না, তখন চাঁদ

আরও দৃঢ় হইয়া উঠিলেন। কারণ, প্রজাবর্গের এই আকুল ক্রন্দনে শত্রু মনসা হাসিবে, ইহা তাঁহার অসহ্য,—

যে কান্দে আমার এথা তাহার মুড়িব মাথা
দেশে রাখি তারে নাহি কাজ।
কাতর হইলুঁ জানি হাসিবেক লঘু কাণী
সেহি মোর বড় দুঃখ লাজ॥

কালিদাস

খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবি কালিদাসের মনসা-মঙ্গল রচিত হয়।[১] কালিদাস পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার কাব্যে যে সকল স্থানের নামোল্লেখ আছে, তাহা সমস্তই বর্ধমান ও বীরভূম জিলার অন্তর্গত। নিজের পরিচয়প্রসঙ্গে কবি এই মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন,—

কহে কবি কালিদাস গৌড়দেশে যার বাস
বিরচিল মনসা-মঙ্গল।

গ্রন্থরচনার কাল সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,—

গ্রহ বিধু ঋতু শশী শকের গণনা।
এই শকে এই কাব্য করিল রচনা॥

ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৬১৯ শকাব্দ অথবা ১৬৯৭ খৃস্টাব্দে তাঁহার মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা সম্পূর্ণ হয়। কবি তাঁহার কাব্য রচনা প্রসঙ্গে দুইজনের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। প্রথমতঃ কার্ত্তিক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ; তাঁহার আদেশেই তিনি কাব্য-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন বলিয়া উল্লেখ করেন। দ্বিতীয়তঃ গোলোকনাথ। সম্ভবতঃ গোলোকনাথ তাঁহার পূর্ববর্তী কোন কবি। প্রত্যেক পদের শেষেই নিজের ভণিতার সঙ্গে তাঁহারও এই প্রকার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

গোলোকনাথের পদ-পঙ্কজ স্মরণে।
মনসা-মঙ্গল কবি কালিদাস ভণে॥

কবি কালিদাসের রচনা সরল ও পাণ্ডিত্যের দুর্ভার-মুক্ত। তাঁহার ভাষায়ও লালিত্য আছে,—চরিত্র-চিত্রণ মৌলিকতাহীন হইলেও রচনার দিক দিয়া তাঁহার

---

১ সা-প-প ৮, ৫৪; ভোলানাথ ব্রহ্মচারী, 'কবি কালিদাসের মনসা-মঙ্গল', সা-প-প ১৯, ১৩৯-৪৬

ব্রহ্মা বিষ্ণু স্থজিবা তবে শূলপাণি।
অবশেষে স্থজিবা মন . কন্যাখানি।
মনসার রূপ দেখি হবে অচেতন।
বিভা করি মনসাকে দিবে আলিঙ্গন।
লাজ পাএ শরীর ছাড়িল ধর্ম্মমতি।
তুমি হবে মৃত্যুক মনসা হবে সতী।
:হশের অঙ্গেতে করিয়া প্রবেশ।
অর্দ্ধেক হইবে ধর্ম অর্দ্ধেক মহেশ।
ব্রহ্মা যে সকল সৃষ্টি করিবে স্থজন।
ক্ষেত্রি রূপে পালন করহ নারায়ণ।
বাক্য অধিকারী হবে দেব শূলপাণি।
মনসা সুন্দরী হবে তাহার গৃহিণী।
সত্য দ্বাপর ত্রেতা কলিযুগ শেষে।
মহাপাপী অধর্ম দুর্জন হবে দেশে।

কলিযুগে ধর্মভ্রষ্ট হইয়া লোকে কিরূপ আচরণ করিবে তাহার সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—

পুত্রে না করিবে পিতা মাতার পালন।
শিষ্যে না মানিবে গুরু গর্বিতের জন।
এই বলি চারিজন দেব হইল অন্তর্ধান
সৃষ্টিতে মন তবে করিল ধর্মজ্ঞান।

ধর্ম সৃষ্টিকার্যে মনোনিবেশ করিলেন—পৃথিবী, স্বর্গ, কিন্নর, অসুর, সূর্য, চন্দ্র, ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি, পশু, প প্রাণী প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ সৃজিল তিন জন। নক করি
তিন পুরুষে করিবে পৃথিবী পালন।

প্রসঙ্গক্রমে এইস্থানে বিষ্ণুর দশ অবতারের বর্ণনা ক সা মহেশ্বর মহেশ্বর তিন ভাই পিতার চরণে প্রণাম করিয়া—

তিন ঘাটে তিন জন তপস্যা ফুল হইলেন। স্বামী বোধ
বসিলা আবেশ করি। . নিকট যাইয়া তাঁহার পিতা

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসিয়া তপস্যা করিতে লা..., বহু বৎসর অতীত হইল, ধর্ম দীর্ঘকাল পুত্রমুখ দেখিতে না পাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন—

নিশ্বাস ত নিঃস্বরিল মনসার জন্ম হইল
বসিলা উঠিয়া বাম পাশে।
মনসা সে সুন্দরি রূপে গুণে বিদ্যাধরী
চাঁচর মস্তকের কেশ।

মনসা নারীও নয়, পুরুষও নয়—'নপুংসক হইঞা হইল সৃষ্টি'।

ধর্ম তখন মনসাকে নারীরূপে সৃষ্টি করিলেন। মনসার রূপে মুগ্ধ হইয়া ধ তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মনসা বাধা দিলেন। তখন—

গোসাঞি বোলে মনসা থাকহ এই ঠাঁই।
যাবত ডাকিয়া আনি পুত্র তিন ভাই।

ধর্ম তিন পুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

কহ এক কথা তিন পুত্র মোর কাছে।
উপার্জিয়া খাইলে ফল দোষ নাহি আছে।
বাপের চরণে কথা কহে তিন ভাই।
ডাকিয়া উপার্জিয়া খাইলে ফল দোষ কিছু নাই।

া শুনিয়া ধর্ম বলিলেন—

ভগ্নি এক সৃজিলাম মনসা কুমারী।

সৃষ্টির অধি র বিবাহের ব্যবস্থা কর। তখন তিন ভাই মনসার সহিত বিবাহ দিয়া তিন ভাই পুনরায় তপস্যায় গমন করিলেন।

ধর্মের এই গর্বিত ... র্ম—

করিয়াছ, তোমাকে অ...বীর মনসা সতী সৃষ্টির অধিপতি
মড় ... চা করে প্রভু মরণ উদ্দেশ্য।
লাগি...ব অভিশাপ গুরু নিন্দা মহাপাপ
এই অভিশাপ দিয়া ধর্মকে জগ ধর্মকে ফলিল সেই ক্ষণে।
প্রথমে তনু ধরি ভাসে দেব মায়া করি
সর্গ ম... পাকায় বেষ্টিত সর্ব গায়

ধর্ম এইরূপে জলে ভাসিতে ভাসিতে প্রথমে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন—

মরা দেখি চতুর্মুখ হইঞা রহে উর্ধ্ব মুখ
ভাসাইল জলের হিন্দোলে।

তারপর বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে বিষ্ণুও—

জলের হিন্দোল দিয়া দিলো জলে ভাসাইয়া
ভাসিয়া চলিল কতদূর।

ভাসিতে ভাসিতে মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলে মহেশ্বর ধ্যানে সমস্ত জানিতে পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার মৃতদেহ উঠাইলেন—সংবাদ পাইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুও তথায় আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—

পুত্রের ক্রন্দনে ধর্মের হইল চেতন।
না কান্দো কান্দো মোর পুত্র তিনজন।
পূর্বে মোকে আছিল অনিল দেবের শাপ।
স্থজিলেক মৃত্যু পাখনা কান্দ অপার।
এক কথা কহি না করিহ উপহাস।
ধুখ মেলি সত্বরে উদরে দেহ বাস॥
মহেশ্বর বলে বাপু ইহা নাকি হয়।
ধর্ম বলে বাপু এ মিথ্যা কথা নয়।
তুমি আমি অর্ধ অঙ্গ হইব শূলপাণি।
মনসা কামিনী হবে তোমার গৃহিণী।

* * *

তখন বাপের আদেশে মুখ মেলিল শঙ্কর।
প্রবেশ করিল ধর্ম অন্তর ভিতর।

তার পর তিন ভাই মৃত পিতার দেহ—

আগর চন্দন খড়ি চাপায় অনেক করি
অনল ভেজায় তিন ভায়।
মন্ত্র পড়ে ব্রহ্মা হর অগ্নি দিলা মহেশ্বর
পুড়িয়া হইল ধর্ম ছায়।

মনসা প্রভাতে উঠিয়া গৃহে স্বামীকে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন। স্বামী বোধ হয় পুত্রের নিকট গিয়াছেন মনে করিয়া প্রথমে ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাঁহার পিতা

কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্রহ্মা বোলে পিতা নাহি আইসে মোর ঠাঁই'। বিষ্ণুর নিকটেও এইরূপ উত্তর পাইয়া মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলে মহেশ্বর বলিলেন—

মরণ স্রজিয়া বাপ তেজিল জীবন ॥
এ ঘাটে পড়িল অনাদি সুরপতি।
বাপ হইলা মরা মাগো তুমি হইলা সতী ॥

মনসা এই কথা শুনিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন—'তোমার পিতার সঙ্গে যাব অনুমৃতা।' মনসার আদেশে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর চিতা নির্মাণ করিলেন—মনসা স্নান করিয়া চিতা প্রদক্ষিণ পূর্বক চিতায় প্রবেশ করিলেন—

অনলে পুড়িয়া মরে মনসা কামিনী ॥
অনলের মধ্যে হইল শিশুকন্যা খানি।
জনম হইল কন্যা শিবের গৃহিণী ॥

এই কন্যাই গৌরী—'গৌরীর জনম হইল জানে ত্রিভুবন'। ব্রহ্মার পরামর্শে তাহারা এই কন্যাকে—'লোহার মজুসী করি সাগরে ভাসায়।' সমুদ্রতীরে ঋষি হেমন্ত (হিমালয়) তপস্যা করিতেছিলেন, ভাসিতে ভাসিতে কন্যা তথায় উপস্থিত। ঋষি কন্যা পাইয়া সন্তানহীন মেনকাকে আনিয়া দিলেন। মেনকা নিজ কন্যারূপে পরিচয় দিয়া পালন করিতে লাগিলেন।

এদিকে শিব গৌরীর জন্য ব্যাকুল, কিরূপে গৌরীর দেখা পাইবেন তাহার জন্য নারদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, নারদ বলিলেন—

বিশ্বকর্মা আনিয়া কর বৃষভ নির্মাণ।
গঙ্গা মালিনী ঘরে করহ পয়ান ॥
ব্যাল্লিস ফুলের বিচি আনহ ত্রিলোচন।
হাল বাহিঞা করহ মালঞ্চ স্বজন ॥

গৌরী সেই মালঞ্চ দেখিতে আসিবেন, তথায় মিলন হইবে। নারদের উপদেশে শিব চাষ করিয়া উদ্যান রচনা করিলেন, তাহাতে নানারূপ ফুল শোভা পাইতে লাগিল। এই স্থানে কবি কিরূপে চাষ করিতে হয় ও বীজ বপনের পূর্বে কিরূপে জমি তৈয়ার করিতে হয় তাহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন।

গৌরী দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন, শিবের মালঞ্চও নানা ফুলে সুশোভিত, তথাপি গৌরীর দেখা নাই। পুনরায় নারদের উপদেশে সমস্ত দেবতা ও ঋষিদিগকে

ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার গৃহে কন্যা আছে ? সকলেই অস্বীকার করিলেন। শিব তখন গণনা করিতে লাগিলেন—

ধর্ম খড়ি পাতি দেব হর মহেশ্বর।
খড়িতে পড়িল ধরা হেমন্ত মুনিবর॥
গোঁসাই বোলে মুনি তোমার এমনি গিয়ান।
আছে কন্যা কেনে তুমি করিলে আমান॥[১]

শিব ঋষিকে বলিলেন, 'তোমার কন্যা আমার এই মালঞ্চের ফুল তুলিবে, তাহাকে মালঞ্চে পাঠাইয়া দিবে'।

ঋষি বোলে শিশু কন্যা কেহ সঙ্গে নাই।
একেশ্বরে কি মতে আসিবে গোঁসাই।
গোঁসাই বোলে একেশ্বর অসিবে পার্বতী।
সিংহ ব্যাঘ্র করি দিব তাহার সংহতি॥

অভিশাপের ভয়ে ঋষি গৌরীকে মালঞ্চে যাইতে অনুমতি দিলেন—

সিংহের উপরে দেবী হইয়া আরোহণ।
পুষ্পের মালঞ্চ বনেতে দেবী দিল দরশন॥

গৌরী মালঞ্চে আসিয়াছেন, মালঞ্চের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া ফুল তুলিতে তুলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষের ছায়ায় ঘুমাইয়াছেন। শিবও অনুসন্ধান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত, নিদ্রিত গৌরীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। শিবের স্পর্শে গৌরীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, গৌরী সম্মুখে শিবকে দেখিয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন, শিব সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—

না চিনহ আমারে দুর্গা আমি তোমার স্বামী।
সপ্ত জন্মের কথা কহিয়া দিবো আমি॥
এক জন্মে জন্মিলা কৃষ্ণের শরীরে।
বধিলে কেউর আর মধু মহাবীরে॥
দেবতার তেজে জন মিলে আর বার।
বধিলে মহিষাসুর দেবের উপকার॥

১ আমান—অস্বীকার করা। দিনাজপুর ও রংপুর জিলায় অস্বীকার করা অর্থে 'আমান' শব্দ ব্যবহার হয়।

ভীমাদেবী বোলি নাম হইল প্রচার।
দুর্গা নামে অসুর বধিলে আর বার॥
আর বারে জনমিবে দক্ষের ভুবনে।
তোমাকে করিব বিয়া কুতূহল মনে॥
তোমার বাপ পাপিষ্ঠ করিবে অপমান।
অপমানে তুমি প্রিয়া তেজিবে পরাণ॥
তোমার শোক সন্তাপে হইবে তনু কালা।
গাঁথিয়া পড়িব তোমার তবে হাড়ের মালা॥
প্রথম জনম তোমার ঋষির ভুবন।
তোমার কারণে বিরচিল পুষ্পবন॥
তবে সে তোমার সঙ্গে হইল দরশন।
বিরচিল দ্বিজ কবি জগত জীবন॥

শিবের কথা শুনিয়া গৌরী করজোড়ে বলিলেন, শূলপাণি, তোমার প্রকৃত পরিচয় জানিলাম—

তুমি দেব আমি দেবী ত্রিভুবনে আর।
করিবে যেমত প্রভু উচিত ব্যবহার।
গোসাঞি বোলেন ভয়, দুর্গা, না করিহ মনে।
তোমাকে করিব বিভা এই পুষ্পবনে॥

সেই মালঞ্চে ঐ দিন হরগৌরীর বিবাহ হইল।

হরগৌরী দুই জনে রহিল মালঞ্চ বনে।

সিংহ গৌরীর জন্য অপেক্ষা করিল, গৌরীর বিলম্ব দেখিয়া ঋষির নিকট আসিয়া সকল বৃত্তান্ত বলিল। পরদিন গৌরী গৃহে ফিরিবেন, মাতা-পিতা সন্দেহ করিবেন, নানারূপ পরীক্ষাও করিবেন, সেজন্য শঙ্কিত হইলেন। তখন শঙ্কর বলিলেন—

যে পরীক্ষা চাহে দিবে তাহার গোচর॥
পরীক্ষাতে স্মরণ যে করিহ আমারে।
হইবে সর্বত্র জয় কহিনু তোমারে॥

কবি এই স্থানে হরগৌরীর মিলনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব কবির রাধাকৃষ্ণের মিলনদৃশ্যকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

গঙ্গা নারদের নিকট হরগৌরীর এই বিবাহ-বৃত্তান্ত জানিয়া বিলাপ করিতেছেন। ঠাকুর মহানন্দ দুই ভাই আসিয়া মাতার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—

গঙ্গা বোলে আমিত বয়সে হৈনু হীন।
বৃদ্ধকালে দিল মোরে দারুণ সোতিন॥
পুষ্পবনে আসিয়াছে হেমন্ত ঝিয়ারি।
তার সঙ্গে আছে হর রঙ্গ ক্রীড়া করি॥

গঙ্গা তাহাদিগকে বলিলেন, 'গৌরী নদীপারের জন্য নদীর তীরে আসিবে, তোমরা নৌকা লইয়া নদীর তীরে যাও—

আর যত লোক আইসে তাকে কর পার।
হেমন্ত নন্দিনীকে জলে ডুবাইয়া মার॥
মায়া নাও গঙ্গাদেবী সৃজিল সেই ঠাঁই।
আগে পাছে কান্দারি ধরিল দুই ভাই॥

গৌরী নদীতীরে আসিয়াছেন—

হেন জল বহে গঙ্গা স্থল কূল নাই।
কেমনে হইব পার নাহিক উপায়॥

এমন সময় গৌরী নদীতে নৌকা দেখিয়া পার করিতে বলিলেন; গৌরী নৌকায় উঠিলেন—

মধ্য নদীতে দুই ভাই করে চারাচারি।
মা-এর সোতিন দুর্গাক ডুবাইয়া মারি॥

গৌরী আত্মরক্ষার জন্য দশ হাতে দশ অস্ত্র ধারণ করিলেন; এইরূপ দেখিয়া ভয়ে দুই ভাই নৌকা ত্যাগ করিয়া জলে ঝাঁপ দিল, তখন গৌরী—

পঞ্চ করে বাহে নাও হস্ত ছিচে পানি।
পার হইয়া গেলত চণ্ডিকা ত্রিনয়ানী॥

গৌরী গৃহে আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঋষি বলিতেছেন—

অল্প বয়স বাছা হইলা কলঙ্কিনী।
ঋষির কুলের কাঁটা হইলা তুমি ঝি।
লাস বেস লৈয়া গেলা তাহা কৈলা কি॥

হেমন্ত ঋষির বোলে ভগবতী কোপে জ্বলে
বোলে দেবী অতি খরসান।

গৌরীর উত্তরে ঋষির সন্দেহ দূর হইল না—

ঋষি বোলে, মায়াবতি, এ মায়া শিখিলে কথি
চিত্তে আমার নাহি পাতি যায়।
অল্প বয়সে বালি হইলা সে কলঙ্কিনী
অষ্ট পরীক্ষা দিতে চাও ॥

গৌরী ক্রমে আট প্রকার পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইলেন। ইহাতেও ঋষির সন্দেহ দূর হইল না, তখন বলিলেন—

অঙ্গিকার করি আমি সভা বিদ্যমানে।
রজনী প্রভাতে দিব কয়ালিকে দানে ॥

প্রাতঃকালে শিব কয়ালির ছদ্মবেশে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে তথায় আসিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে ভিক্ষা দিতে আসিল, সকলের দানই প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন মেনকা—

সোবর্ণের থালে করি লইয়া চাইল কড়ি
আনিঞা দিলেন ঋষিয়ানি।

সে দানও প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন—

কুমারীর বিনে দান আর কেহ দেয় দান
তার দান দেয় ফিরাইয়া।
তোমার নন্দিনী বালি অকুমারী কন্যা খানি
তার হাতে দিয়া পাঠাও দান ॥

গৌরী ভিক্ষা দিতে আসিয়াছেন, ভিক্ষা লইবার সময় শিব গৌরীর অঙ্গ স্পর্শ করিলেন—

দেখিল ঋষির পুরের পড়পড়োশি।
পাড়াপরশি লোক করে চাড়াচাড়ি ॥
শুনিঞা রোষাইল ঋষি ক্রোধে কম্পবান।
ঘর হইতে বাহিরায় অগ্নির সমান ॥
কয়ালিকে ধরিয়া হেমন্ত বন্দী করে।
কয়ালিকে বন্দি করে কাচারিয়া ঘরে ॥

কয়ালিকে বন্দী করিয়া সরোবর তীরে ঋষি তপস্যা করিতেছেন, কিন্তু—

যত ফুলে পুজে ঋষি সরোবর জলে।
সে ফুল আইল কয়ালির পদতলে ॥

পূজা সমাপন করিয়া ঋষি গৃহে আসিলেন। খাইতে বসিবেন, এমন সময় বন্দীর কথা মনে পড়িল—'বন্দিয়াকে রাখি অন্ন খাইব কেমনে।' বন্দীকে আনিতে যাইয়া দেখিলেন, যে সমস্ত ফুলদ্বারা তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতাকে পূজা করিয়াছেন, সেই সব ফুল কয়ালির পদতলে। বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—

অন্তরে এমত কয় এজনা কয়ালি নয়
রূপ দেখি অতি বিপরীত।
নাহি চিন্ত পরলোক কপটে ভাঁড়িল মোক
ত্রিদেব ঈশ্বর পশুপতি।

মহাকবি ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়ম্' কাব্যে অর্জুনের পূজাও কিরাতবেশী মহাদেবের নিকটেই পৌঁছিয়াছিল। নিজ কর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ঋষি শিবের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া—

গোসায় বোলে ঋষিবর প্রাণে না করিহ ডর
অকুমারী কন্যা আছে তোর।
বিবরণ কহিনু তোকে তাকে বিভা দেহ মোকে
সেই জন রমণী আমার॥

শিবের বাক্যে ঋষি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

কন্যার ভাগ্যের ফলে তোমা হেন বর মিলে
অবশ্য করিব কন্যা দান।

আনন্দিত হইয়া শিব কৈলাসে চলিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শিব কৈলাসে আসিয়া গঙ্গাকে বলিলেন—

যাইতে মালঞ্চ বন মিলিলেক একজন
ঘরে নাহি আনি তোমার ডরে।
গঙ্গা বোলে শুন স্বামি কহিতে বুঝিনু আমি
যে ধন পাইলা গুণমণি।
বয়সে হইনু হীন রূপে হইনু নির্ঘিন
বৃদ্ধকালে দিলেন সৌতিন।
পাছে না করিহ রোষ দুই নারীর যত দোষ
নিরবধি এ দ্বন্দ্ব কাচাল।

শিব গঙ্গাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'ঋষি হেমন্ত তাহার কন্যা আমাকে দান করিবে, সেই কন্যা—

বয়সেতে শিশুজন সুবেশ বিলস হীন
তোমা হইতে নহে রূপবান।

গঙ্গা বিবাহে অনুমতি দিলেন, বিবাহ করিয়া গৌরীকে গৃহে লইয়া আসিলেন। কিন্তু প্রথম দিন হইতেই গঙ্গা গৌরীর কলহ আরম্ভ হইল।

শিব বোলে দ্বন্দ্ব তোরা কর দুই জনে!
সাজ, নন্দি, বৃষ আমি যাব পুষ্পবনে।

প্রস্থান সময়ে

সাজিয়া চলিল হর গঙ্গাকে সঁপিঞা ঘর
দুর্গা সমর্পিল গঙ্গার হাতে।

শিব মালঞ্চে চলিয়াছেন, পথে পশুপক্ষিরাও তাঁহাকে সাদরে সম্বর্ধনা করিতেছে। সরোবরে স্নানরত অপ্সরাগণ দেখিয়া তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। চাঞ্চল্যের ফলে পদ্মপত্রে রক্ষিত শিবতেজ পদ্মনাল দ্বারা পাতালে নীত হইল, তথায় পদ্মার জন্ম হইল—

পাইয়া সে বাসুকি হইলেন মহাসুখী
পুসিলেন নিজ ভগ্নী করি।
করিলেন নাড়িচ্ছেদ আর করি কর্ণভেদ
নাম থুইলেন জয় বিষহরি॥

শিব মালঞ্চে আছেন। এক বৎসর অতীত হইল। গৌরী গঙ্গাকে বলিলেন—

পুষ্পবনে বৎসরেক রহিল ব্যোমকেশ।
পুনরপি আমা সভার না করে উদ্দেশ॥
যদি আমি গঙ্গাদেবী তোমার আজ্ঞা পাই।
গোয়ালিনী রূপে শিবকে দেখিবারে যাই॥

গঙ্গা অনুমতি দিলেন। গৌরী গোয়ালিনী বেশে দধির পসরা লইয়া মালঞ্চে আসিয়াছেন। শিবের সহিত মিলন হইল। প্রাতঃকালে গৌরী 'নিদর্শন' লইয়া গৃহে ফিরিলেন। গণেশের জন্ম হইল। তারপর বার বৎসর কাটিল, শিব ফিরিলেন না—গৌরী পুনরায় কোচনী বেশে শিবকে ছলনা করিতে যাইবেন, গঙ্গার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন—

গঙ্গা বোলে যাও তুমি হেমন্ত ঝিয়ারি।
নিশান আনিহ তুমি শিবের অঙ্গুরি॥

মালঞ্চে শিবের সহিত কোচনী বেশে গৌরীর মিলন হইল। পরদিন গৌরী শিবের অঙ্গুরি লইয়া গৃহে আসিলেন, তারপর কার্ত্তিকের জন্ম হইল।

শিব মালঞ্চ হইতে গৃহে ফিরিতেছেন, পথে সরোবর তীরে পদ্মার সহিত দেখা, পদ্মার নিকট তাহার জন্মবৃত্তান্ত জানিয়া

শিব বোলে মোর কন্যা হইল পদ্মাবতী।
ফিরিয়া ধরহ তুমি আপন মূরতি।

তখন পদ্মা নানারূপ সর্পের আভরণে সজ্জিত হইলেন। পদ্মাও শিবের সহিত কৈলাসে যাইবেন শিব বলিলেন—

গঙ্গা দুর্গা সঙ্গে তোমার নাহি পরিচয়।
তুমি সঙ্গে গেলে হবে বড়ই সংশয়।

পদ্মা বলিলেন—

তোমার আজ্ঞা পিতা যদি আমি পাই।
পানের অধিক আমি পাতল হইয়া যাই॥
শিবের বচনে পদ্মা পাতল হইয়া গেলো।
করণ্ডিতে করিয়া ভোলা মহেশ্বর নিল॥

শিব কৈলাসে আসিয়াছেন—'গঙ্গা দুর্গা প্রণমিল হরের চরণে।' গঙ্গার পুত্র পিতার চরণে প্রণাম করিল। কার্ত্তিক গণেশ আসিয়া প্রণাম করিল। গঙ্গার নিকট ইহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গঙ্গা বলিলেন—

গোয়ালিনীর পুত্র দুই কার্ত্তিক গণেশ।
কোচনীর গর্ভে জন্ম কার্ত্তিক ষড়ানন॥

এই সময় গৌরীও শিবপ্রদত্ত নিদর্শনগুলি লইয়া আসিলেন, এই নিদর্শন দেখিয়া সমস্ত ঘটনা মনে পড়িল, তখন তিনি 'হস্তেতে ধরিয়া দুয় পুত্র নিল কোলে'। শিব কৈলাসে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া মুনিরা দেখা করিতে আসিয়াছেন, নারদের নিকট জানিয়া শিব মুনিদিগের নিকট চলিলেন। এই সময়ে গৌরীও কৌতূহলে ফুলের সাজি দেখিতে আসিলেন। সাজির মধ্যে পদ্মাকে দেখিয়া ক্রোধে সতীন বলিয়া গাল দিতে লাগিলেন, পদ্মা আপন পরিচয় দিলেও বিশ্বাস করিলেন না।

পদ্মাকে দেখিয়া দেবী ক্রোধে কম্পবান।
আঙ্গুলের ঘায়ে তার চক্ষু কৈল কান॥

পদ্মাও ক্রোধে গৌরীকে সর্পদ্বারা দংশন করাইলেন। গৌরীকে মৃত দেখিয়া গঙ্গা, কার্ত্তিক, গণেশ বিলাপ করিতে লাগিলেন। নারদের নিকট সংবাদ পাইয়া শিব আসিয়া শোকে কাঁদিতে লাগিলেন। দেবতারা পদ্মাকে অনুরোধ করিলে পদ্মা গৌরীকে বাঁচাইয়া দিলেন। গৌরী জীবন পাইয়া ক্রোধে শিবকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তারপর—

গঙ্গা দুর্গা দুইজনে করিয়া যুকতি।
বিদেশে চলিল তবে হরের যুবতী॥

যাইতে যাইতে তাঁহারা সমুদ্রতীরে উপস্থিত, পদব্রজেই দুইজন সমুদ্র পার হইতেছেন —সমুদ্র মধ্যে ব্রহ্মা তপস্যা করিতেছেন, গৌরীকে দেখিয়া মনোবিকারে সমুদ্রজলে তাঁহার পরিত্যক্ত তেজ ভাসিতে লাগিল, দুর্গা সেই পথেই যাইতেছিলেন, সেই তেজ স্পর্শে—'গর্ভ হৈল দুর্গার শরীর হৈল ভারি।' গঙ্গার উপদেশে বালুচরায় দুর্গা গর্ভ পরিহার করিলেন—বালুর উপরে গর্ভ হৈল দুর্বাঘাস।

গঙ্গা-দুর্গা-শূন্য কৈলাসে শিব অত্যন্ত দুঃখে দিন কাটাইতেছেন। পদ্মাকেও বনবাস পাঠাইবেন—

দুর্গার শোকেতে হর আকুল হৈল মন।
পদ্মাকে লইয়া গেল গহীন কানন।

পদ্মাকে বনে রাখিয়া শিব কৈলাসে ফিরিয়া আসিলেন। পদ্মা এক ব্রাহ্মণের বাড়ী দাসীবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। গঙ্গা দুর্গা দুইজনে সমুদ্রতীরে বাস করিতে লাগিলেন। শিবের আদেশে নারদ গঙ্গা ও গৌরীকে আনিতে যাইতেছেন—সমুদ্রতীরে উপস্থিত, সমুদ্র দুগ্ধময় দেখিয়া শিবের নিকট যাইয়া বলিলেন—

আনিবারে গেলাম মামা মামির তলাস।
অদ্ভুত দেখিলাম এক কথা উপহাস।
যাইয়া পাইলাম আমি জলনিধি তীর।
জলনিধি সাগরে সমস্ত বহে ক্ষীর।

শিব ধ্যানে জানিলেন—

মনোরথ পান কৈল সাগরের নীর।
কপিল সমস্ত সিন্ধু ভরাইল থির॥

শিবের আদেশে সমুদ্র মন্থন করা হইল; প্রথমে কৃষ্ণের নামে মন্থনে লক্ষ্মী সরস্বতী উঠিলেন, ইন্দ্রের নামে উঠিল নর্তকী, অপ্সরা, তারপর চন্দ্র, দেবতা সকলের নামে উঠিল অমৃত।

আপন নামে মথন জুড়িল মহেশ।
জন্মিয়া উঠিল তাতে কালকুট বিষ।

কালকূট বিষে জগৎ ধ্বংস হয় দেখিয়া দেবতারা চিন্তিত হইলেন—

দেবতার বিকল দেখিয়া দিগ্‌বাস।
গণ্ডুস করিয়া বিষ করিলেন গ্রাস॥
কালকুট দাবিতে না পারিল মহেশ।
টলিয়া পড়িল দেব ধরণী উপর॥

দেবতারা হায় হায় করিতে লাগিলেন। নারদের নিকট সংবাদ পাইয়া গঙ্গা দুর্গা আসিয়া সে— বিলাপ করিতে লাগিলেন। পদ্মা প্রাতঃকালে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলে ধ্যানে শিবের অমঙ্গল জানিয়া ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইয়া তথায় আসিয়াছেন- -

দেবতা সকলে বোলে পদুম কুমারী।
তুমি ত জিয়াহ বাছা দেব ত্রিপুরারি॥

পদ্মা তখন "মহামন্ত্রে ঝাড়িয়া জিয়ায় ত্রিলোচন।" শিবকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া দেবতারা আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, একমাত্র পদ্মাই বিষণ্ণ—এই আনন্দে যোগ দিলেন না! শিব তাঁহাকে বিষণ্ণ কেন জিজ্ঞাসা করিলে—

পদ্মা বোলে ত্রিপুবারি মাঙ্গিয়া খাইয়া মরি
কি কহিব দেবতা ভুবনে।
মোর প্রাণপতি নাই রহি আমি কার ঠাই
এই অভিমানে আমি মরি॥

শিব তখন বলিলেন, এই স্থানে সমস্ত দেবতা ও অসুর উপস্থিত, যাহাকে ইচ্ছা পতিত্বে বরণ কর। এই সময় বাসুকি আসিয়া বলিল, জরৎকার মুনির বিবাহ হইবে, জন্মেজয় সর্পযজ্ঞে যখন নাগকুল ধ্বংস করিবেন, তখন পদ্মার গর্ভজাত পুত্র অস্তিক নাগকুল রক্ষা করিবে। এই কথা শুনিয়া জরৎকার মুনির সহিত পদ্মার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর জরৎকার বলিলেন—

মোক যদি গরহিত করিবেক কদাচিত
এড়িয়া পলাইব তবে।

জরৎকার পদ্মাকে লইয়া গৃহে যাইতেছেন। সমুদ্রতীরে কিছুদিন বাস করিলেন, তারপর নিজ গৃহে যাইবেন। পদ্মা তাঁহার পশ্চাতে যাইতেছেন, পরিশ্রান্ত হইয়া পথে বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন—

পদ্মার উরুতে মুনি করিল শিয়র।
তরুতলে নিদ্রাতে পড়িল মুনিবর।

সন্ধ্যা বন্দনার কাল অতীত হয় মনে করিয়া পদ্মা স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করিলেন, অসময়ে নিদ্রাভঙ্গে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অরণ্য মধ্যে পদ্মাকে পরিত্যাগ করিয়া মুনি চলিয়া গেলেন। এইভাবে পরিত্যক্ত হইয়া—

মাথে হাত দিয়া দেবী করএ রোদন।
প্রাণনাথ ছাড়ি গেল কিসের কারণ॥
কান্দিতে কান্দিতে পদ্মা ক্ষেমা দিল ম[উপদে]
সন্ধ্যা আর ছিল পদ্মা গহন কাননে॥

পদ্মা বনেই বাস করে, গাছের বাকল পরে, ফলমূল খায়, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়—এই ভাবে দিন কাটে। পদ্মা অন্তঃসত্ত্বা, যথা সময়ে পদ্মার পুত্র হইল, নাম রাখিল অস্তিক। এখন পুত্রকে কিরূপে পালন করিবে, পদ্মার মনে খুব দুঃখ—

অন্যের ছাওয়াল হৈলে দুগ্ধভাতে খায়।
আমার ছাওয়াল কেনে ক্ষিধায় লালায়॥
পুত্র লইয়া যাই আমি নরলোকের পাস।
মনুষ্য ভুবনে পূজা করিব প্রকাশ॥

পুত্র-ক্রোড়ে পদ্মা যাইতেছেন, পথে রাখালদিগের সঙ্গে দেখা, তাহারা মাঠে গরু চরাইতেছে, তাহাদিগের নিকট পদ্মা পুত্রের জন্য দুগ্ধ চাহিল, তাহারা অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল।

ক্রোধ হইয়া বিষহরি চলিল ফিরিয়া।
রাখালের যত গাভি রাখিল লুকাঞা॥

রাখালেরা গরু না দেখিয়া কাঁদিতেছে, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বেশে পদ্মা তথায় আসিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে রাখালেরা তাঁহাকে বলিল, এক ব্রাহ্মণীর অভিশাপে আমাদের সমস্ত গরু হার[াইয়াছে]—

বুড়ি বোলে কি কলে ব্রাহ্মণী নহে সেই।
শঙ্কর ঝিয়ারি পূজ পাবে তবে গাই॥

বৃদ্ধার উপদেশে তাহারা বনমধ্যেই মনসা পূজা করিয়া কপোত বলি দিল—

ব্রাহ্মণী পূজিয়া ঘট দিল বিসর্জন।
হেন কালে যত গাভি দিল দরশন॥

আনন্দে গরু লইয়া তাহারা গৃহে আসিল, মনসাপূজা প্রচার করিতে লাগিল। মনসাও ঝালোমালোর নিকট আসিয়া পুত্রের জন্য মাংস চাহিলেন; তাহারা বলিল—

সাতদিন মারি মৎস্য করি পরবাস।
সপ্তদিন না পাই মৎস্যের পরকাশ॥

পদ্মা তাঁহার নাম লইয়া জাল ফেলিতে বলিলেন; প্রথম বারে নানারূপ মৎস্য উঠিল, দ্বিতীয়বারে স্বর্ণ ঘট উঠিল, মনসা সেই ঘট পূজা করিতে বলিলেন। এই [illegible]স্তে অর্জ্জ করিলে—

পুত্র হইল জালো মালোর মনসার বরে।
অচলা হইলা লক্ষ্মী জালো মালোর ঘরে॥

দেবখণ্ড এই স্থানে সমাপ্ত হইয়াছে। তারপর চাঁদ সদাগরের কাহিনী এই ভাবে আরম্ভ হইয়াছে—গৌড় নগরে বিক্রমকেশরী যখন রাজা তখন তাঁহার রাজ্যের অন্তঃপাতী চম্পাই বা চম্পানি নগরে কোটীশ্বর নামে এক ক্ষুদ্র রাজা রাজত্ব করিতেন। চন্দ্রপতি কোটীশ্বরের পুত্র। মাতুলানীর সঙ্গে লখিন্দরের কুব্যবহারের বর্ণনা করিয়া জগজ্জীবন তাঁহার রচনাকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু কে বলিবে ইহার ভিতর দিয়াই হয়ত কবি তাঁহার পারিপার্শ্বিক সমাজের রস ও রুচির পরিচয় দিয়াছেন। জগজ্জীবনের বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত শূন্যপুরাণে এবং নাথ সম্প্রদায়ের বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। এই পুথিতে ভণিতার মধ্যে কবির যে আত্মপরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পূর্বোদ্ধৃত পাঠ অপেক্ষা স্পষ্ট ও নূতন; সেইজন্য এই স্থানে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

ঘোসাল রসাল বংশে গুণান্বিত সর্ব অংশে
রূপরায় চৌধুরির পুত।
জগত জীবন নাম নানাগুণে অনুপাম
রচিল পাঁচালি অদভূত।

ঘোসাল ব্রাহ্মণ রাঢ়ি কুচিয়া মোরাতে বাড়ি
মহারাজা প্রাণনাথের দেশে।
জগত জীবন পদ রচিলেন বিদগদ
কবি দুর্গাচন্দ্র পতির দেশে।

কবি দুর্গাচন্দ্র পতি কে? তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই।

ষষ্ঠীবর দত্ত

মনসা-পূজা শ্রীহট্ট জিলায় সর্বাধিক প্রচলিত ও সর্বজনীন লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান। দুর্গোৎসব অপেক্ষাও স্থানীয় অধিবাসীর উপর ইহার প্রভাব অধিকতর।[১] এই জন্যই পদ্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গল কাব্যের প্রভাবও এই অঞ্চলে পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল হইতে অনেক বেশী। শ্রীহট্ট জিলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় মনসা-মঙ্গলের কবি নারায়ণদেব; তারপরই ষষ্ঠীবরের নাম উল্লেখযোগ্য। নারায়ণদেব তাঁহার কবিত্ব-শক্তির গুণে শুধু শ্রীহট্টবাসীদিগের মধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নাই. সমগ্র পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে তিনি পদ্মাপুরাণের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবির গৌরব [illegible]ন করিয়াছেন। কিন্তু ষষ্ঠীবরের কবিত্বখ্যাতি শ্রীহট্ট জিলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, শ্রীহট্ট জিলার কোন কোন স্থানে নারায়ণদেব অপেক্ষা ষষ্ঠীবরের কাব্যই অধিক প্রচলিত। পদ্মাপুরাণের একজন শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণদেবের সহিত প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠীবরের কাব্য যে এতকাল ধরিয়া এক বিস্তৃত অঞ্চলে লোকপ্রিয়তা রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে, ইহাই এই কাব্যের আভ্যন্তরীণ মূল্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-সন্ধানকারীদিগের মধ্যে নারায়ণদেব সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, শ্রীহট্টের একজন বিশিষ্ট জনপ্রিয় কবি ষষ্ঠীবর সম্বন্ধে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় নাই। এ পর্যন্ত দুই চারিটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, কিংবা কোন কোন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকের গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা সমস্তই ভ্রমাত্মক।[২]

[১] বিপিন চন্দ্র পাল, 'সত্তর বৎসর', প্রবাসী, ১৩৩৪, বৈশাখ, ২১-৩২

[২] শ্রীহট্টবাসিগণ এই বিষয়ে বহুদিন যাবৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থ হইতে এই বিষয়ক ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে বারবার অনুরোধ করা হয়। ১৯৩৯ সনের ২০শে [illegible] ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় শ্রীহট্ট হইতে প্রচারিত এক সংবাদে

পূর্বেই বলিয়াছি, ষষ্ঠীবরের কাব্য অদ্যাপি শ্রীহট্ট জিলার সর্বত্র প্রচলিত আছে। শিক্ষিত লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ কৃষকদিগের মধ্যে পর্যন্ত ষষ্ঠীবরের কাব্য ও তাঁহার বাসস্থানের কথা না জানে এমন লোক শ্রীহট্ট জিলায় অতি বিরল। এখনও প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত গয়গড় গ্রামে ষষ্ঠীবরের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত উমা-মহেশ্বরের শিবের বাটীতে কবির বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে স্থানীয় ও বিদেশাগত শিক্ষিত জনসাধারণ সমবেত হইয়া কবির জীবনী ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠীবর যে সময় তাঁহার কাব্য রচনা করেন, তখন তাঁহার কাব্যের প্রকৃত রূপ কি ছিল, আজ তাহা বলিবার উপায় নাই; প্রচারের ব্যাপকতার জন্য লোক-মুখে তাহার কাব্য অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে এবং এখন এত প্রাদেশিকতা-দোষ-দুষ্ট হইয়াছে যে, শ্রীহট্টের বর্তমান কথ্য-ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট অনেক সময় তাহার অর্থ পরিগ্রহ দুর্ঘট হইয়া উঠে। কাব্যের এই ব্যাপক পাঠ-বিকৃতি এবং ইহার পাঠান্তরের আধিক্য এই কাব্যের ব্যাপক লোক-প্রিয়তারই পরিচায়ক। শ্রীহট্ট হইতে পদ্মাপুরাণের যত পুঁথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহা নারায়ণদেবেরই হউক, দ্বিজ বংশীরই হউক কিংবা বাইশ কবির মনসা-মঙ্গলই হউক—তাহাতে ষষ্ঠীবরের ভণিতাযুক্ত কোন পদ নাই, এমন কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায়ও শ্রীহট্ট হইতে যে সকল প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সবগুলিতেই ষষ্ঠীবরের ভণিতাযুক্ত বহু পদ দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীহট্ট কিংবা তাহার একান্ত সংলগ্ন স্থান ব্যতীত কোন অঞ্চল হইতেই ষষ্ঠীবরের ভণিতাযুক্ত পদ্মাপুরাণের কোনও পদ আবিষ্কৃত হয় নাই।

ষষ্ঠীবরের একাধিক পুঁথি মুদ্রিত হইয়া শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ১৩৩২ সালে শ্রীহট্ট হইতে বিরজাকান্ত ঘোষ সম্পাদিত কবি ষষ্ঠীবরের 'পদ্মাপুরাণ' ও ১৩৪৩ সালে শ্রীহট্ট হইতে ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস ও গিরিশচন্দ্র দাস সম্পাদিত

দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেখানকার এক সভায় এই বিষয়ে স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ইহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদিগের ভ্রমের অনুসরণ করিয়া আমিও এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এই বিষয়ে ভ্রমে পতিত হই। শ্রীহট্টবাসিগণ এই বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ কারলে আমি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। বর্তমান আলোচনা এই অনুসন্ধানেরই ফল। এই বিষয়ক প্রচলিত ভ্রান্ত মত দূর করিবার জন্য এখানে বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ষষ্ঠীবরের 'পদ্মাপুরাণ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১] এতদ্ব্যতীত স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ষষ্ঠীবরের কাব্যের কতক নির্বাচিত অংশ ১৯১৪ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' (১ম ভাগ, পৃ. ২৫০-২৫৭) নামক সঙ্কলন গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। স্বর্গীয় ডক্টর সেন মহাশয় যে পুঁথি হইতে ষষ্ঠীবরের রচনার উক্ত অংশ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই ; তবে আমাদের পূর্ব আলোচনা হইতে ইহাও সহজেই সিদ্ধান্ত করা যাইবে যে, তাহাও শ্রীহট্ট হইতেই সংগৃহীত।

ষষ্ঠীবরের উল্লিখিত দুইখানি মুদ্রিত পদ্মাপুরাণ, স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়ে' উদ্ধৃত নির্বাচিত অংশ, কিংবা অন্য কোন হস্তলিখিত পদ্মাপুরাণের পুঁথিতে কবি কিংবা তাঁহার গ্রন্থরচনার কাল সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। উক্ত রচনাগুলি হইতে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে যৎসামান্য যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে।

কবি ষষ্ঠীবরের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, গ্রন্থের বন্দনা-ভাগে ষষ্ঠীবর তাঁহার এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—'জ্যেষ্ঠ ভাই বন্দি গাই পিতার সমান'।[২]

অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, কাব্যারম্ভের এই প্রকার বন্দনা-ভাগ সাধারণতঃ কাব্যের গায়েন কর্তৃকই রচিত হইয়া কাব্যমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তবে এই পদটি প্রক্ষিপ্ত নহে বলিয়াই মনে হয়। কারণ, একাধিক পুঁথিতে ইহা পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীতও গায়েনের প্রক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক দেব-বন্দনার পদ সাধারণতঃ যেমন লৌকিক ছন্দ ও স্থানীয় বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে, ইহা তেমন হয় নাই ; দেব-বন্দনার অংশটি বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা এবং সমগ্র কাব্যের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে হয়। অতএব এই পদটিকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া কবি ষষ্ঠীবরের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতেছি।

ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল গুণরাজ খাঁ। তাঁহার কাব্যের ভণিতায় পাওয়া

[১] এই মুদ্রিত পুঁথি দুইটি আদ্যোপান্ত ষষ্ঠীবরের খাঁটি রচনা বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। উভয় পুঁথির ভাষাই অত্যন্ত আধুনিকতা-প্রাপ্ত এবং তাহাদিগের মধ্যে স্থানে স্থানে অন্যান্য কবির রচনার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। শেষোক্ত পুঁথিটির উপর অনেক স্থলে বরিশালের কবি বিজয় গুপ্তের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য পুঁথির সম্পাদকগণ মূল ভাষার উপর কারুকার্য করিয়াছেন এবং বিভিন্ন পুঁথি মিলাইয়া কবির একটি নির্ভুল সংস্করণ সম্পাদন করিবার পরিবর্তে হাতের কাছে যে পুঁথি যে রকম পাইয়াছেন, তাহাই ছাপাইয়া দিয়াছেন।

[২] ষষ্ঠীবরের পদ্মাপুরাণ, ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস ও গিরিশচন্দ্র দাস সম্পাদিত (শ্রীহট্ট, ১৩৪৩), ১।

যায়,—'ভণে া সর্বত্র এনে কাজির বড়াই'।[১] প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গুণরাজ খানবিচার করিারী আরও কয়েকজন কবির সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। কিন্তু তাহানে লাচাইই মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। বরেরনতঃ বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কুলীন গ্রামের প্রসিদ্ধ মালাধর বসু। তিা। খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে 'শ্রীমদ্ভাগবত', দশম ও একাদশ স্কন্ধের বাংলা অনুবাদ করিয়া সম্ভবতঃ গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের নিকট হইতে 'গুণরাজ খান' উপাধি প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয়ত 'লক্ষ্মীচরিত্র' রচয়িতা শিবানন্দ কর নামক এক কবির উপাধি 'গুণরাজ খান' ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়।[২] গুণরাজ খানের ভণিতায় একটি সাধন-ভজনের পদ চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩] কবির নাম মনে হয় হরিদাস রায়, উপাধি গুণরাজ খান দেখা যাইতেছে, ইহাদের মধ্যে কেহই পদ্মাপুরাণ রচনা করেন নাই। অতএব ষষ্ঠীবরের কাব্যে পদ্মাপুরাণ বিষয়ক পদগুলিতে প্রাপ্ত এই উপাধিটি ষষ্ঠীবর ব্যতীত যে অন্য কাহারও হইতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। এই উপাধিটি ষষ্ঠীবর কাহার নিকট হইতে লাভ করেন, তিনি নিজে কোথাও তাহা উল্লেখ করেন নাই। তবে ইহা স্থানীয় কোন বিদ্যোৎসাহী রাজা কিংবা নবাব কর্তৃক প্রদত্ত হইতে পারে। মালাধর বসুর 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র অনুবাদ পুস্তক 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' বা 'গোবিন্দ-বিজয়' চৈতন্যধর্ম-প্রভাবিত শ্রীহট্ট জিলায় ব্যাপক প্রচলিত ছিল। শ্রীহট্ট হইতে ইহার অনেক পুঁথিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব মনে হয়, মালাধর বসুর নবাব প্রদত্ত গুণরাজ খান উপাধির অনুকরণেই কবি ষষ্ঠীবরকেও স্থানীয় কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি গুণরাজ খান উপাধিতে ভূষিত করেন।[৫]

---

[১] ব-সা-প ১,২৫৫ ; H.B.II., 135-36.

[২] গ-স ৪৯৫৬, গ-স ৪৭৫৬ (খ)

[৩] বা-প্রা-পু-বি ১-১, ১৭

[৪] স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গুণরাজ উপাধিবিশিষ্ট হৃদয় মিশ্র নামে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন (ঐ, ৪২৮)। কিন্তু তাঁহার কোন পরিচয় কিংবা রচনার কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে হৃদয় মিশ্র নামে কেহ কোন বিষয়ে কোন কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। এ যাবৎ প্রকাশিত অন্য কোন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও এমন কোন নাম পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পিতামহের নাম ছিল হৃদয় মিশ্র, কিন্তু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাঁহার কোন রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিংবা তাঁহার গুণরাজ উপাধি ছিল বলিয়াও জানা যায় না।

[৫] কবি ষষ্ঠীবরের বংশধরদিগের বিশ্বাস উপাধিটি গৌড়ের নবাব কর্তৃক প্রদত্ত। অবশ্য এই গৌড় শ্রীহট্টেরই অন্তর্গত।

ষষ্ঠীবর তাঁহার কাব্যের সর্বত্র শ্রীষষ্ঠীবর, কবি ষষ্ঠী স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন ভণিতাই শুধু ব্যবহার করিয়াছেন, কোথাও কোন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় করেন নাই। রজনীমোহন চক্রবর্তী সম্পাদিত একখানি 'বাইশ') নামক সঙ্কলন ষষ্ঠীবরের কতকগুলি পদ পাওয়া যায়। তাহার একস্থলে এ হইতে ষষ্ঠীবরের পাওয়া যাইতেছে— য়াছে, তাহার

শ্রীহট্টের দত্তগ্রাম হয় ষষ্ঠীবর ধাম
মাতৃদেবী অতি পুণ্যশীলা।
তার গর্ভে জনমিয়া পদ্মাপুরাণ বিরচিয়া
দত্তবংশ কীর্তি প্রকাশিলা ॥[১]

াও সহজেই কর্তৃক 'বঙ্গ- ম্নাপুরাণের

বলা বাহুল্য, এই পদটির ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গি অত্যন্ত আধুনিক। মা যায় বিংশতি শতাব্দীর ছন্দ, মাত্রা ও মিল বিষয়ে লব্ধজ্ঞান কোনও আধুনিক কবি যাহা অত্যন্ত সুপরিণত রচনা। বিশেষতঃ এই পদটি ষষ্ঠীবরের অন্য কোন মুদ্রিত হস্তলিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য এই পদটির কৃত্রিমতা হইতেই ষষ্ঠীর যে শ্রীহট্টের অধিবাসী কিংবা দত্ত বংশজ ছিলেন না, এমন প্রমাণিত হয় না। ষষ্ঠী সম্বন্ধে প্রচলিত লোকশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া অত্যন্ত আধুনিক কালে গে হয়ত এই পদটি রচনা করিয়াছেন। অতএব ইহাকে কবির নিজ প্রদ আত্মপরিচয় বলিয়া গণ্য করিলে নিতান্তই ভুল করা হইবে।

ভণিতা হইতে ষষ্ঠীবরের কোন পরিচয়, এমন কি কুলপরিচয় পর্যন্ত পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু ষষ্ঠীবরের কাব্যোক্ত ভণিতাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। লাচারী ছন্দের পদগুলির মধ্যে তাঁহার ভণিতা প্রায় সর্বত্রই অভিন্ন; যথা,

কহে ষষ্ঠীবর কবি কণ্ঠে ভারতী দেবী
সরস্বতী (কিংবা বিষহরী) যারে দিলা বর।

অভিন্ন ভণিতা ব্যবহারের রীতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আরও কয়েকজন কবি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে 'চৈতন্য-ভাগবতে'র কবি বৃন্দাবন দাস ও মহাভারতের অনুবাদকার কাশীরাম দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। অতএব অভিন্ন ভণিতা ব্যবহারের রীতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অপ্রচলিত ছিল না। ষষ্ঠীবর অন্যত্র না হউক অন্ততঃ ত্রিপদী বা লাচারী-ছন্দের পদগুলিতে ভণিতা

---

১ বটতলায় প্রকাশিত (কলিকাতা, ১৩৪৫), ২৪২

যায়,—'ভণে ' সর্বত্র এই অভিন্নতা রক্ষা করিয়াছিলেন। ষষ্ঠীবরের পদের গুণরাজ খানবিচার করিবার কালে এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখার যোগ্য; কিন্তু তাহাদে লাচারী ছন্দের পদ এই প্রকার ভণিতায় লিখিত না হইলে তাহা যায় নাই। বরের রচনা কিনা, এই বিষয়ে যথার্থ সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত বস্থ। তিনি এই যুক্তি দ্বারাও রজনীমোহন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'পদ্মাপুরাণ' বা একাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠীবরের নামে উদ্ধৃত উক্ত ত্রিপদী ছন্দের পদটিকে অকৃত্রিম বলিয়া শাহের নিক পারা যায় না। অতএব এই পদটিকে ভিত্তি করিয়া কবির বাসস্থান ও রচয়িতা শিবন্ধে কোন নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে না। কবি ষষ্ঠীবরের পারা যাগুলিত এ যাবৎ আবিষ্কৃত কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে তাঁহার বাসস্থান, কাল হইতে সম্বন্ধে কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধান পুঁথিশালায় রক্ষিত একখানি 'বাইশ কবির পদ্মাপুরাণে' ষষ্ঠীবরের একটি অন্তর শেষে নিম্নলিখিত ভণিতা পাওয়া যায়—

ষষ্ঠী শিশুমতি কবি কাণে বিক্রমখানে ভণে
কর পাটল নদীর তীরে ঘর।
নি শ্রীষষ্ঠীবর কবি কণ্ঠে ভারতী দেবী
আপনে শঙ্কর দিলা বর ॥[১]

এই বিক্রমখানই বা কে, কোন্ নদীকেই বা পাটল নদী বলা হইয়াছে, তাহা কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে ষষ্ঠীবর যে শিবের ভক্ত ছিলেন, সে সম্বন্ধে এখনও জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উমা-মহেশ্বরের মন্দিরের কথা পরে আলোচিত হইয়াছে।

একমাত্র শ্রীহট্ট অঞ্চলে ষষ্ঠীবর রচিত কাব্যের ব্যাপক প্রচার হইতেই নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, শ্রীহট্ট জিলাই কবির বাসভূমি ছিল। এই সম্বন্ধে শ্রীহট্ট জিলায় প্রচলিত জনশ্রুতি হইতে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্যের উদ্ধার করিতে হইবে। প্রাচীন সামাজিক কুলপঞ্জীগুলিও এই বিষয়ে কতক সাহায্য করিতে পারে। কবি কৃত্তিবাসের কাল ও কুল-পরিচয় উদ্ধারে সামাজিক কুলপঞ্জীগুলি যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছে। কবি ষষ্ঠীবরের পরিচয় উদ্ধারেও শ্রীহট্টের সম্ভ্রান্ত কতকগুলি পারিবারিক কুলপঞ্জী আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্যদান করিতে পারে। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, কুলপঞ্জীগুলি হইতে সর্বাংশেই নির্ভুল

ঐতিহাসিক তথ্য অনেক সময় পাওয়া যায় না, তথাপি ইহাদের সঙ্গে স্থানীয় বহুল প্রচলিত লোকশ্রুতিগুলি পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না।

'বৈদ্যজাতির ইতিহাস' প্রণেতা বসন্তকুমার সেনগুপ্ত তাঁহার প্রণীত অন্যতম পুস্তক 'চক্রপাণি দত্ত' নামক গ্রন্থে কবি ষষ্ঠীবর সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।[১] অবশ্য তাঁহার আলোচনার ভিত্তি 'বৈদ্যজাতির ইতিহাস', 'বৈদ্যকুলপঞ্জী', 'কবি কণ্ঠহার', 'চন্দ্রপ্রভা' প্রভৃতি কুলজী গ্রন্থ। তিনি 'চক্রপাণিদত্ত' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, 'ষষ্ঠীবর দত্ত শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত মৌলবীবাজার মহকুমার গয়গড় গ্রামের প্রসিদ্ধ দত্ত বংশের পূর্বপুরুষ। গয়গড়ের দত্তবংশ বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজে একেবারে অপরিজ্ঞাত নহেন। মহারাজ বল্লাল সেন দ্বারা উপদ্রুত হইয়া যে সব বৈদ্যগণ রাঢ় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বসতি স্থাপন করেন, তন্মধ্যে ষষ্ঠীবরের পূর্বপুরুষ অন্যতম। পশ্চিম রাঢ়ে বটগ্রাম নিবাসী শাণ্ডীল্যগোত্রীয় মেদিনীধর দত্ত, চক্রধর দত্ত, ধরাধর দত্ত নামক তিন সহোদর বল্লাল কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া তাঁহাদের গুরু ও পুরোহিত শুক্লাম্বর মিশ্র সহ সুদূর পূর্বাঞ্চল শ্রীহট্টে আসিয়া প্রথম ইটা পরগণায় বসবাস করেন। মেদিনীধর দত্তের বংশধরগণ গৌড়াধিপতি (এই গৌড় শ্রীহট্ট জিলার অংশ বিশেষ, প্রাচীন শ্রীহট্ট তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা—লাউড়, গৌড় ও জয়ন্তীয়া) সুবুদ্ধি নারায়ণ (প্রচলিত সুবিদ নারায়ণ) হইতে বহু ভূসম্পত্তি ও কানুনজ্ঞ (প্রচলিত কানুনগো) উপাধি প্রাপ্ত হন। উক্ত মেদিনীধর দত্তের বংশধরগণ পরে হংসখলা (প্রচলিত হাঁসখলা) হইতে উক্ত পরগণার গয়গড় মৌজায় বাস করিতে থাকেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা চক্রধর দত্ত উক্ত পরগণার নিকটবর্তী দত্তগ্রামে ও তৃতীয় ভ্রাতা ধরাধর দত্ত ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত সরাইল পরগণার কালীকচ্ছ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। আমাদের আলোচ্য কবি ষষ্ঠীবর দত্ত মেদিনীধর দত্তের অধস্তন সন্তান।'

এই গ্রন্থেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল গুণরাজ, ইহাও রাজদত্ত উপাধি। কিন্তু কোন্ গুণগ্রাহী রাজা তাঁহাকে এই উপাধিদ্বারা ভূষিত করেন, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার এই উপাধি যে তৎকালে সর্বজনবিদিত ছিল, তাহা এই উক্তি হইতেই জানিতে পারা যায়,—'ষষ্ঠীবর বা গুণরাজের কন্যা "বৈদ্যকুলপঞ্জী" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ সেনকে বিবাহ

[১] বসন্তকুমার সেনগুপ্ত, চক্রপাণি দত্ত (১৩২৬), ৫ম অধ্যায়।

করেন।'[১] অন্যান্য কয়েকখানা রাঢ়ীয় বৈদ্যজাতির কুলগ্রন্থেও গুণরাজের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—'অন্যো গুণাকরোনাম যে গুণরাজ খানকঃ'।[২] কুলপঞ্জিকাগুলি অনুসারেও দেখিতে পাওয়া যায়, ষষ্ঠীবরের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার বিষয় যে কবি গ্রন্থের প্রারম্ভিক বন্দনায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই ... অবশ্য ষষ্ঠীবর উক্ত বন্দনায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কোন নামের ... শুধু 'জ্যেষ্ঠ ভাই' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ...হার নাম পাইতেছি হৃদয়ানন্দ। ষষ্ঠীবরের কাব্যে হৃদয়ানন্দের ভণিতা ... গুলি লাচারী ছন্দের পদ পাওয়া যায়। কথিত আছে, হৃদয়ানন্দ একজন ...ক ছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার রচিত পদ সম্ভবতঃ তিনি নিজেও গান করিতেন, ইহাতেই তাঁহার নামও ষষ্ঠীবরের কতকগুলি পদে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে; ...বা তিনি নিজেই হয়ত এই সকল পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। হৃদয়ানন্দ সম্বন্ধে একটি সুন্দর জনশ্রুতি গয়গড় অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তাহা এই প্রকার—'হৃদয়ানন্দ দত্ত কানুনগো একদা এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করেন। কথিত আছে, তদনুসারে পরদিন প্রভাতে ব্রাহ্মণ ও বহু ব্যক্তিসহ স্বীয় পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া ব্রাহ্মণকে জলে নামাইলেন। ব্রাহ্মণ জলে অন্বেষণ করিতে করিতে গৌরীপাট সহ উমা-মহেশ্বরের এক পাষাণ-মূর্তি প্রাপ্ত হইলেন। তৎসহ গায়কের ব্যবহারোপযোগী 'তালচর' প্রভৃতি আরও কয়েকটি দ্রব্য ও তাম্রপত্রে লিখিত উমা-মহেশ্বরের ধ্যানাদি প্রাপ্ত হন। হৃদয়ানন্দ নিজ ভ্রাতা ষষ্ঠীবর দত্ত সহ পরামর্শক্রমে বহির্বাটিকায় এক গৃহ নির্মাণ করিয়া দেবতাকে সংস্থাপিত করেন। চৈত্রসংক্রান্তি যোগে এই দেবতার সম্মুখে চড়ক পূজা হইত।'[৩] ...ই শিব এখনও প্রতিষ্ঠিত আছেন। উমা-মহেশ্বরের শিবের বাড়ী এই অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। চড়ক পূজার সময় এখনও এখানে বড় মেলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন, ইহারই উল্লেখ করিয়া কবি তাঁহার কাব্যের কোন কোন স্থলে ভণিতায় লিখিয়াছেন—

শ্রীষষ্ঠীবর কবি, কণ্ঠে ভারতী দেবী
আপনি শঙ্কর দিলা বর।

১ 'কবিকণ্ঠহার' (২য় সংস্করণ), ১০৮ ... 'চন্দ্রপ্রভা' (?) ২০৩।

৩ অচ্যুতচরণ চৌধুরী, ৩, ২৯৫

এই সকল লোকশ্রুতির মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য যদি নাও থাকে, তথাপি ইহাদের দ্বারা কবির জনসাধারণের মধ্যে কতদূর প্রতিষ্ঠা ছিল, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। ষষ্ঠীবরের পিতার নাম ভুবনানন্দ (কোন কোন বংশলতা অনুসারে ভুমানন্দ), পিতামহের নাম পুরুষোত্তম; এই নাম হৃদয়ানন্দের বংশধর বলিয়া পরিচিত দত্তপদবীধারী গয়গড় গ্রামের অধিবাসীদিগের গৃহে রক্ষিত বংশাবলীতে পাওয়া যাইতেছে।

কেহ কেহ অনুমান করেন, ষষ্ঠীবরেরই উপাধি ছিল হৃদয়ানন্দ, তাঁহার কোন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল না। কিন্তু আমরা পূর্বেই কবির গ্রন্থারম্ভের বন্দনা-ভাগ হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, তাহাতে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উল্লেখ করিয়াছেন; অতএব ষষ্ঠীবরের একজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়। কেহ আবার অনুমান করেন, হৃদয়ানন্দও 'মনসা-মঙ্গলের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।' কিন্তু ইহাও ভুল। কারণ, এই অঞ্চলে এমন কোন জনশ্রুতি প্রচলিত নাই। তাঁহার রচিত কোন স্বতন্ত্র কাব্য, কিংবা শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রচলিত কোন বাইশাতেও তাঁহার কোন বিচ্ছিন্ন পদও পাওয়া যায় না। কেবল ষষ্ঠীবরের পুঁথিতে ষষ্ঠীবরের সঙ্গে তাঁহার ভণিতার কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, স্থানীয় জনশ্রুতি এই যে তিনি একজন সুগায়ক ছিলেন; সম্ভবতঃ তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতার রচনা নিজেও গান করিতেন, তাহারই ফলে ষষ্ঠীবরের সঙ্গে কয়েক স্থলে হৃদয়ানন্দের ভণিতাও স্থান পাইয়াছে।

ষষ্ঠীবর সম্বন্ধে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' পুস্তকে আরও বলা হইয়াছে—'ষষ্ঠীবর স্বয়ং "তালচর" হাতে লইয়া পদ্মাপুরাণ গান করিতেন। তাঁহার গান অত্যন্ত সুন্দর শুনাইত। ষষ্ঠীবর কর্তৃক মনসাদেবীর পূজার জন্য যে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরেরা বর্তমানে লংলা পরগণার "রায়ের গাঁও" নামক গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহারা অদ্যাপি পদ্মাপুরাণ গান করিয়া থাকেন।'[১] ষষ্ঠীবরের দীঘি এখন অনেকটা অসংস্কৃত অবস্থায় আছে। দীঘির নিকটেই উমা-মহেশ্বরের শিবের বাড়ী। পূজকেরা দেবোত্তর ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা পদ্মাপুরাণ রচয়িতা কবি ষষ্ঠীবর প্রতিষ্ঠিত উমা-মহেশ্বরের শিবের পূজক বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন। শ্রীহট্ট জিলায় বিশেষতঃ মৌলভীবাজার মহকুমায় কবি ষষ্ঠীবর ও তাঁহার সাধনা সম্বন্ধে আরও বহু লোকশ্রুতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

---

১ অচ্যুতচরণ চৌধুরী, ঐ

ইহা হইতেই নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, কবি শ্রীহট্ট জিলার মৌলভীবাজার মহকুমার অন্তর্গত গয়গড় গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বংশধরগণ এই গ্রামে ও এই জিলার অন্যত্র বসবাস করিতেছেন।

পূর্বোদ্ধৃত কুলপঞ্জিকার একটি উক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে, কবি ষষ্ঠীবরের এক কন্যা ছিল। 'বৈদ্যকুলপঞ্জী' প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ সেনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। ষষ্ঠীবরের আর কোন সন্তানাদি ছিল কিনা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ ছিল না ; কারণ, কুলপঞ্জীগুলিতে তাঁহার অধস্তন বংশাবলী নির্ণয় করা হয় নাই। হৃদয়ানন্দের চারি পুত্র ছিল, আধুনিকতম কাল পর্যন্ত তাঁহাদেরই বংশাবলী নির্ণীত হইয়াছে। এই জন্যই সম্ভবতঃ কেহ কেহ হৃদয়ানন্দকেই ষষ্ঠীবরের উপাধি অনুমান করিয়া আধুনিকতম কাল পর্যন্ত কবির বংশধারা যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহা দেখাইতে চাহেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, হৃদয়ানন্দ ষষ্ঠীবরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল গুণরাজ খাঁ, একজনের দুই উপাধি থাকাও এখানে সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ তিনি তাঁহার একজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা গ্রন্থ-বন্দনায় উল্লেখও করিয়াছেন। অতএব মনে হয়, ষষ্ঠীবর নিঃসন্তান না থাকিলেও অপুত্রক ছিলেন, তাঁহার কন্যার দিকেরই বংশ বর্তমান আছে।

কবি ষষ্ঠীবর তাঁহার কাব্যমধ্যে গ্রন্থ-রচনার কাল সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করিয়া যান নাই ; কাব্যের ভাষা বিচার করিয়াও কাল-নিরূপণের কোনও উপায় নাই ; কারণ, বহুল প্রচারের জন্য তাঁহার প্রায় প্রত্যেক পুঁথিরই ভাষা আধুনিকতায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কাব্যমধ্যে অন্যান্য কবির রচনাও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাঁহার কাব্যমধ্যে সমসাময়িক কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিরও নামোল্লেখ নাই। অতএব কবির আবির্ভাব-কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে কয় পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে, তাহারই একটা আনুমানিক হিসাব দ্বারা কবির সময় নিরূপণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। হৃদয়ানন্দের বংশধর-দিগের গৃহে তাঁহাদের পূর্বপুরুষের যে বংশলতা রক্ষিত আছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ষষ্ঠীবরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হৃদয়ানন্দের সময় হইতে বর্তমানে নবম পুরুষ চলিতেছে।[১] (১৩২৪ সালে লিখিত বিবরণী মতে ; সম্ভবতঃ ইহার পর হইতে বর্তমানে আরও এক পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে)। গড়ে চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যায়, খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে কবি ষষ্ঠীবর

[১] অচ্যুতচরণ চৌধুরী, ঐ, পৃঃ ২৯৬, পাদটীকা।

জীবিত ছিলেন। খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেই সম্ভবতঃ তাঁহার কাব্য রচিত হয়। তিনি 'পদ্মাপুরাণ' ব্যতীত আর কোন কাব্য রচনা করেন বলিয়া জানা যায় না।

স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত (১৯২৪) 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' প্রথম খণ্ডে কবি ষষ্ঠীবরের 'পদ্মাপুরাণ' হইতে কতক মনোনীত অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কবির পরিচয় প্রসঙ্গে ডক্টর সেন মহাশয় তথায় উল্লেখ করিয়াছেন, 'ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন ৩৫০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই প্রাচীন বঙ্গের বিখ্যাত কবি। পূর্ব বঙ্গের ৩০০ বৎসরের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে ইঁহাদের বহুসংখ্যক কবিতা পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা রামায়ণ, মনসা-মঙ্গল, মহাভারত প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহাদের জন্মভূমি বিক্রমপুর দীনারদি গ্রাম। এখন এই গ্রামের নাম ঝিনারদি।'[১] এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকেও এই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন।[২] কিন্তু এই উক্তি যে সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক, তাহা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতেই প্রতীয়মান হইবে।

পদ্মাপুরাণের যে অংশ স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় তাঁহার সংকলিত পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কোন স্থলে তাঁহার এই উক্তির সমর্থক কোন পদ পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত ষষ্ঠীবরের যে সকল মুদ্রিত কিংবা হস্তলিখিত পুঁথি ও বিচ্ছিন্ন পদ আজ পর্যন্তও প্রচলিত আছে, তাহাদের কোনটির মধ্যেই এই উক্তির সমর্থক কোনও পদ নাই। ষষ্ঠীবরের পদবী যে 'সেন' ছিল, ষষ্ঠীবরের কাব্যমধ্যে স্বর্গীয় ডক্টর সেন মহাশয় কর্তৃক উদ্ধৃত কিংবা অন্যত্রও কোন স্থলেই তাহার উল্লেখমাত্র নাই। তবে তিনি কোন্ যুক্তির মোহে এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইলেন?

দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ষষ্ঠীবর সেন নামক একজন কবি মহাভারতের কোন কোন অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত সঞ্জয়-রচিত মহাভারতের পুঁথিতে প্রাপ্ত এই পদের ভণিতাটি হইতে মনে হয়, এই ষষ্ঠীবর 'স্বর্গারোহণ পর্ব' সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং জগদানন্দ (হৃদয়ানন্দ নহে) নামক কোন ব্যক্তি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন,—

---

[১] পৃঃ ২৫০ দীনারদি বা জিনারদি গ্রাম বিক্রমপুরে নহে, ইহা ঢাকা জিলার মহেশ্বরদি পরগণায় অব [illegible]। [২] দীনেশচন্দ্র সেন, ৪২৮

অমৃত লহরী ছন্দ, পুণ্যভারতের বন্ধ, কৃষ্ণের চরিত্র শেষ পর্বে।
শ্রীযুক্ত জগদানন্দে অহর্নিশি হরি বন্দে কবি ষষ্ঠীবর কহে সর্বে ॥[১]

এতদ্ব্যতীত আরও পাওয়া যায়,—

পাঞ্চালী প্রবন্ধে পোথা রচিল সংসারে।
নারায়ণ পদতলে ভণে ষষ্ঠীবরে ॥[২]

অতএব দেখা যাইতেছে, এই ষষ্ঠীবরের ভণিতা ব্যবহারের রীতিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মহাভারতের অনুবাদকার এই ষষ্ঠীবরের পুত্রের নাম গঙ্গাদাস সেন। তিনি সংক্ষেপে রামায়ণ ও সমগ্র অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত পদ্মাপুরাণেরও তাঁহার কতকগুলি পদ পাওয়া যায়। গঙ্গাদাস সেন তাঁহার রচনার প্রায় প্রতি পত্রে তাঁহার কুল-পরিচয় দিয়া গিয়াছেন,—

পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর।
যার যশ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর ॥

কোন কোন স্থলে তাঁহার এই প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়,—

কুলপতি সেন সুত কবি ষষ্ঠীবর।
সর্বলোকে জানে তান দিনিদিপে ঘর ॥[৩]

আবার অন্যত্র পাওয়া যায়,—

পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর।
যাহার কীর্তি ঘোষে দেশ দেশান্তর ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই সত্যবান নানা বুদ্ধিমন্ত।
নানা শাস্ত্রে বিশারদ গুণে নাহি অন্ত ॥
গঙ্গাদাস সেন কহে অনুজ তাহার।
অশ্বমেধ পুণ্য কথা রচিল পয়ার ॥[৪]

গঙ্গাদাস প্রায় সর্বত্র তাঁহার ভণিতায় নিজের কৌলিক উপাধি 'সেন' ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার 'পদ্মাপুরাণে'ও একটি পদে পাওয়া যায়,—

রামকৃষ্ণ দ্বিজে কয় নারীগণে জয় জয়
গঙ্গাদাস সেনে সুরচন।[৫]

[১] পত্র সংখ্যা ৭৮৯ ; [২] বা-প্রা-পু-বি ১-১, ১৭২ ;
[৩] ঢা ৪৪৩৬, ২ (ক) ; [৪] বা-প্রা-পু-বি, ১৩৪ ; [৫] ব-সা-প, ১, ২৫৯ ;

কিংবা,—

ষষ্ঠীবর স্থত সেন পদ বন্দে সঙ্কেতেন
গঙ্গাদাসে রচিল পয়ার ।[১]

গঙ্গাদাস রচিত রামায়ণের অনুবাদেও পাওয়া যায়,—

গঙ্গাদাস সেনে কহে ষষ্ঠীবর স্থত।
সীতার চরিত্র কথা শুনিতে অদ্ভুত ॥[২]

গঙ্গাদাস সেনের সময় সম্পর্কে আমি পূর্বে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, তিনি খৃস্টীয় ১৫৫৩ অব্দে অশ্বমেধ পর্বের বাংলা অনুবাদ করেন বলিয়া নিশ্চিত জানিতে পারা যায়। পিতা ষষ্ঠীবর সেন তাহারও অন্ততঃ ৩০ বৎসরের অগ্রবর্তী অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বর্তমান ছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য নামের সামঞ্জস্য হেতু ষষ্ঠীবর দত্তকেই স্বর্গীয় ডক্টর সেন মহাশয় ষষ্ঠীবর সেন বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। তিনি কবির পরিচয়-জ্ঞাপক যে সকল পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন[৩] তাহাদের কোনটিই ষষ্ঠীবরের স্বরচিত নহে, কিংবা কোন পদ্মাপুরাণের পুঁথিতেও প্রাপ্ত নহে, তাহাদের প্রায় সমুদয়ই গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধ পর্ব হইতে উদ্ধৃত। গঙ্গাদাস আত্মকুল-পরিচয় প্রসঙ্গে পিতা ষষ্ঠীবরের নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং গঙ্গাদাসের ষষ্ঠীবর সম্পর্কিত এই উল্লেখই স্বর্গীয় ডক্টর সেনের উক্ত মত-পোষকতার একমাত্র ভিত্তি। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইতেন যে, গঙ্গাদাস সেনের পিতা ষষ্ঠীবর ও পদ্মাপুরাণ-রচয়িতা ষষ্ঠীবর পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি—বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন কালে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়া বিভিন্ন বিষয়-বস্তু লইয়া তাঁহারা কাব্য রচনা করিয়াছেন। স্বভাবতঃই তাঁহাদের পিতৃপরিচয়ও বিভিন্ন। মহাভারতের অনুবাদক ষষ্ঠীবর সেন ছিলেন স্থবর্ণ বণিক জাতীয় এবং পদ্মাপুরাণ-রচয়িতা ষষ্ঠীবর ছিলেন কুলীন বৈদ্যবংশোদ্ভূত—তাঁহার কৌলিক উপাধি ছিল দত্ত। গঙ্গাদাস তাঁহার পিতাকে সর্বত্র যশস্বী বলিয়া বর্ণনা করিলেও কোথাও 'গুণরাজ' যে তাঁহার উপাধি ছিল, তাহা বলেন নাই; মহাভারতের অনুবাদে ষষ্ঠীবর কোথাও 'গুণরাজ' উপাধি নিজেও ব্যবহার করেন নাই। জগদানন্দ নামক কোন ব্যক্তি, ষষ্ঠীবর সেনের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কিন্তু পদ্মাপুরাণে তাঁহার কোন উল্লেখ নাই। এক ষষ্ঠীবর উভয়

[১] ঐ ৬৯৩; [২] *D. C. B. M. C. U. I, 182*

[৩] দীনেশচন্দ্র সেন, ৪২৮

কাব্যের রচয়িতা হইলে উভয় স্থলেই তাঁহার নাম পাওয়া যাইত। ষষ্ঠীবর সেনের বাসস্থান জিনারদি অঞ্চলে ষষ্ঠীবর দত্তের পদ্মাপুরাণ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পূর্বেই বলিয়াছি, একমাত্র শ্রীহট্টেই ইহার প্রচার হইয়াছিল এবং বর্তমানেও আছে। অতএব শ্রীহট্টের স্থানীয় কোন কবি ব্যতীত ইহা অন্য কাহারও রচনা হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং ষষ্ঠীবর সেন নামক কোন ব্যক্তি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পদ্মাপুরাণ বলিয়া পরিচিত যে কোন কাব্য রচনা করেন নাই, তাহা এ'যাবৎ আবিষ্কৃত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিতরূপেই বলা যাইতে পারে।

স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পথ অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ মনসা-মঙ্গলের অন্যতম কবি হিসাবে গঙ্গাদাস সেনের পিতা 'ষষ্ঠীবর সেন'-এর নামোল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য তথ্যের অভাবে এই বিষয়ক আলোচনা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কেহ কেহ পদ্মাপুরাণের কবি হিসাবে ষষ্ঠীবর 'সেনে'র পরও ষষ্ঠীবর দত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, ষষ্ঠীবর সেন ও ষষ্ঠীবর দত্ত নামে স্বতন্ত্র দুইজন পদ্মাপুরাণের কবির অস্তিত্ব অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বের আলোচনা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, এই অনুমানও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

স্বর্গীয় ডক্টর সেন ষষ্ঠীবর 'সেনে'র নামে যাহা 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়', প্রথম ভাগে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাই ষষ্ঠীবর দত্তের মুদ্রিত পদ্মাপুরাণেও যে কি ভাবে পাওয়া যাইতেছে, তাহা এখানে একটু উদ্ধৃতি-সহযোগে দেখা যাইতে পারে। স্বর্গীয় ডক্টর সেনের উদ্ধৃতাংশের প্রথম দিক হইতে তাহা দেখা যাউক—

'সোনেকাতে জিজ্ঞাসা করিল সদাগর।
বিবাহ নি করিয়াছে পুত্র লক্ষীন্দর॥
সোনকাএ বলে পুত্র বিবাহ নাঞি করে।
কেমতে হইব বিহা তুমি নাহি ঘরে॥
সদাগর বোলে শুভে গো পোহাক রজনী।
কালিকা কহিব পুত্র-বধূর কারণী॥'[১] ইত্যাদি

ষষ্ঠীবর দত্তের মুদ্রিত পুঁথিতে এই স্থানের পাঠ—

'সুনুকাতে জিজ্ঞাসা করিল সদাগর।
কোথা বিয়া করাইছ পুত্র লক্ষীন্দর॥

[১] ব-সা-প, ২৫৫;

স্নুকায় বলে পুত্র বিয়া নাহি করে।
কেমতে করাইমু বিয়া তুমি নাহি ঘরে॥
চান্দে বলে শুভে শুভে পোহাউক রজনী।
কালি প্রভাত যাইমু বধূর যুড়ানী॥'[১]

এই উভয় অংশ যে একই কবির অভিন্ন রচনার দুইটি স্বতন্ত্র পাঠ মাত্র, এ বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় থাকিতে পারে না। তবে শ্রীহট্টের মুদ্রিত পুঁথিগুলি প্রায় সম্পূর্ণই বহুলাংশে আধুনিকতায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু স্বর্গীয় ডক্টর সেন যে পুঁথি হইতে তাঁহার নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে প্রাচীনতা-দ্যোতক; এই জন্য ইহাদের মধ্যে কোন কোন স্থলে সামান্য ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গিগত ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। অতএব স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ও তাঁহার পরবর্তীদিগের কল্পিত পদ্মাপুরাণের কবি ষষ্ঠীবর 'সেন'ই যে ষষ্ঠীবর দত্ত এই বিষয়ে আর কোন সংশয়ের কারণ থাকে না।

নারায়ণদেব ষষ্ঠীবর হইতে শতাধিক বৎসরের অগ্রবর্তী এবং শ্রীহট্ট অঞ্চলে নারায়ণদেবের কাব্যের ব্যাপক প্রচলন থাকা সত্ত্বেও ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, ষষ্ঠীবরের কাব্যে নারায়ণদেবের কোনই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। একমাত্র ষষ্ঠীবরের কাব্য ব্যতীত এমন কোন পদ্মাপুরাণ কাব্য এই অঞ্চলে প্রচলিত নাই যে, তাহাতে অন্ততঃ নারায়ণদেবের ভণিতাযুক্ত কোন পদ পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় ষষ্ঠীবর নারায়ণদেবের প্রভাব হইতে যে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। বিষয়ের দিক দিয়াও ষষ্ঠীবরের কাব্যে এমন সব বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, যাহাতে সহজেই মনে হয়, ষষ্ঠীবরের আদর্শ নারায়ণ কিংবা এতদ্দেশীয় অন্যান্য পদ্মাপুরাণের কবি হইতে স্বতন্ত্র ছিল। কাব্যের মধ্যে সম্ভবতঃ তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত কয়েকটি অভিনব চরিত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। প্রধান চরিত্রের মধ্যে বেহুলার মাতার নাম কমলা, প্রায় সমগ্র পূর্ববঙ্গের অন্যান্য পদ্মাপুরাণে সুমিত্রা নাম পাওয়া যায়, উত্তর বঙ্গের কোন কোন পুঁথিতে অমলা ও মেনকা নাম পাওয়া যায়। কমলা নাম এ'যাবৎ আমি অন্য কোন পুঁথিতে পাই নাই। ষষ্ঠীবরের কাব্যে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য করিবার স্থান লঙ্কা, অন্য কোন কাব্যে লঙ্কার নাম নাই; নদীর নাম গণ্ডকী, অন্যত্র প্রায় সর্বত্রই গাঙ্গুরী; ষষ্ঠীবরের কাব্যে গণ্ডকী গাঙ্গ, গণ্ডকী সাগর (এক

[১] ফণীন্দ্রনাথ দাস ও গিরীশচন্দ্র দাস সম্পাদিত ষষ্ঠীবর দত্তের পদ্মাপুরাণ, (শ্রীহট্ট, ১৩৪৩), ১০১

স্থলে গুঞ্জরী) এই সকল প্রয়োগ পাওয়া যায়। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে বেহুলার ভ্রাতার নাম নারায়ণী, ষষ্ঠীবরের কাব্যে হরিসাধু, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণেও এই নামটি হরিসাধু। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া মনে হয়, নারায়ণদেব রচিত পদ্মাপুরাণের সঙ্গে ষষ্ঠীবরের আদৌ পরিচয় ছিল না; তাঁহার কাহিনী-পরিকল্পনার স্বতন্ত্র কোন আদর্শ ছিল; কিন্তু তাহা কি, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। ইহাতে এমন মনে করা কি অসঙ্গত হইবে যে, ষষ্ঠীবরের সময় পর্যন্ত নারায়ণদেবের কাব্য পূর্ব ময়মনসিংহ হইতে শ্রীহট্ট পর্যন্ত প্রসার লাভ করে নাই ?

অবশ্য অধুনা-প্রচলিত ষষ্ঠীবরের পদ্মাপুরাণ যে ভাবে বিকৃত হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কোন ধারণাই নির্ভুল হইতে পারে না। ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস সম্পাদিত ষষ্ঠীবরের পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ষষ্ঠীবরের একটি পদ আদ্যোপান্ত বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ হইতে গৃহীত। অবশ্য এই অংশটির জন্য ষষ্ঠীবর বিজয় গুপ্তের নিকট যে প্রত্যক্ষ ভাবে ঋণী, তাহা বলিতে পারা যায় না; কারণ, তাহা হইলে ষষ্ঠীবরের উপর বিজয় গুপ্তের অন্যান্য স্থলেও প্রভাব অনুভব করা যাইত। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ষষ্ঠীবরের কাব্যে বিষয়বস্তুর দিক দিয়া কতকগুলি স্বাতন্ত্র্য আছে। এই বিশিষ্ট পরিকল্পনাগুলি ষষ্ঠীবরের মৌলিক সৃষ্টি বলিয়া বিবেচনা না করিলেও অন্ততঃ বিজয় গুপ্তের নিকট যে তাঁহার কোন ঋণ ছিল না, তাহা বেশ অনুভব করা যায়। অতএব মনে হয়, আধুনিক কালে অনুলিপিকারগণ কিংবা গায়েনগণ এইভাবে কোন কোন স্থানে একের রচনা অন্যের নামে চালাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহার ফলেই বিজয় গুপ্তের রচনা ষষ্ঠীবরের নামে মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মুদ্রিত কাব্যে অন্যান্য কবিরও প্রভাব বর্তমান রহিয়াছে।

ষষ্ঠীবরের কাব্য তিনখণ্ডে বিভক্ত,—দেবখণ্ড, বাণিজ্যখণ্ড ও স্বর্গারোহণ খণ্ড। দেবখণ্ড 'গরুড় পুরাণ', 'শিব-পুরাণ', মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত 'আস্তিক পর্ব' ও অন্যান্য লৌকিক কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত। নারায়ণদেবের মত ষষ্ঠীবরের পৌরাণিক অংশ এত অনাবশ্যক বিস্তৃত কাহিনীতে পূর্ণ নহে, এই অংশ বেশ সংক্ষিপ্ত। এই পৌরাণিক অংশের কাহিনী-পরিকল্পনায়ও অনেক স্থলেই ষষ্ঠীবর মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি সাধারণতঃ গতানুগতিকতার ক্ষেত্র পরিহার করিয়া গিয়াছেন।

বাণিজ্য খণ্ডে বিষয়ের দিক দিয়া কোন বৈচিত্র্য নাই। পদ্মাপুরাণের গতানুগতিক কাহিনীই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গারোহণ খণ্ড সংক্ষিপ্ত, ইহাতে বেহুলা-লখিন্দররূপী উষা-অনিরুদ্ধের স্বর্গারোহণের ইচ্ছা প্রকাশ ও তৎপূর্বে যোগিবেশে উজানী নগরে গিয়া বেহুলার জননী কমলাকে দর্শন দানের কথা বর্ণিত আছে। এই খণ্ডটি সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত হইলেও পদ্মাপুরাণের সমগ্র কাহিনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা করুণ। ষষ্ঠীবরও এই অংশ রচনায় স্বভাব কবিত্ব-গুণে বিষয়ের মর্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছেন। দীর্ঘকাল নিরুদ্দিষ্ট জামাতা ও কন্যা যখন যোগী ও যোগিনীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া উজানী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তখন কমলা,—

লখাই বিপুলার রূপ দেখিয়া সুন্দরী।
উচ্ছ্বাসি উচ্ছ্বাসি কান্দে ঝিউ ঝিউ করি॥
যোগিস্থানে কমলায় বিনয়ে জিজ্ঞাসে।
কহ কহ যোগী তোরা বৈস কোন দেশে॥
যোগী বলে মোদের বসতি স্থিতি নাই।
হইয়া বৈরাগী নানা দেশেতে বেড়াই॥
শুনিয়া কমলা বলে যোগীর গোচর।
তোমরা নি আইস যাও চম্পকনগর॥
যোগী বলে চম্পকনগরে নিতি যাই।
কি কারণে সেই কথা জিজ্ঞাস গো মাই॥
কমলায় বলে মুই অভাগীর ঝি।
না পাইনু বার্তা আর জিজ্ঞাসিমু কি॥
চম্পকনগরে থাকে চান্দ সদাগর।
তার পুত্রে কন্যা বিয়া কর্যাছিল মোর॥
বিয়া রাত্রি জামাই খাইল কালনাগে।
মড়ার সহিত বেউলা গেলা কোন ভাগে॥

যোগি-যোগিনী আত্ম-পরিচয় গোপন করিল। কিন্তু স্নেহময়ী জননীর নিকট বেহুলার এই প্রতারণা তাহার নিজের বিবেক-মূলে গিয়া দংশন করিল। অথচ বেহুলা নিরুপায়া, স্বর্গপুরীর চরম বিস্মৃতি-লোক হইতে তাহাদের আহ্বান আসিয়া গিয়াছে, আর তাহারা মর্ত্যের পরিচয়ে জড়াইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু

স্নেহাতুরা জননীর চোখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সন্তান এ কি প্রাণহীন অভিনয় করিতেছে ?

বিপুলায় বলে, প্রভু, চল হেথা হনে।
মায়ের করুণা মোর না সহে পরাণে ॥
আমি হনে মার কিছু না হইল সুখ।
আর না শুইমু মায়ের বুকে দিয়া মুখ ॥

এক করুণ রূপকের ভিতর দিয়া পদ্মাপুরাণের কাহিনীর পরিসমাপ্তি কল্পনা করা হইয়াছে। কোন বাস্তব-লোকে কাব্যের এই শেষাংশ সংঘটিত হইতে পারে না। ইহা কল্পলোকের স্বপ্ন-কামনা মাত্র। ইহা মনসা-মঙ্গল কাব্যের ভাব-সম্মিলন। ষষ্ঠীবরের রচনায় কাহিনীগত এই রূপকের মর্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে। কমলার স্বপ্নদৃষ্টির সম্মুখে যোগি-যোগিনীর এই স্মৃতি-অবশেষ মায়ামূর্তি মুহূর্তে কখন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বন

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি রা[illegible] বিদ্যাভূষণ তাঁহার মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন।[১] কা[illegible] [illegible] তিনি এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,

অল্প বয়স মোর দ্বিজ কুলে জাত।
পণ্ডিত না হম্ মুই কহিলু স[illegible] ॥
মনসার নাম মাত্র হৃ[illegible] ভাবিয়া।
মহাসিন্ধু খেবা দিছি উডুপ লইয়া ॥
জনক আহ্মার জান গঙ্গারাম খ্যাতি।
তাহান চরণ বন্দো করিয়া ভকতি ॥
তাহা[illegible] অনুজ বন্দো নামে নারায়ণ।
ক[illegible] রজোড়ে তান পদে করিম বন্দন ॥
[illegible] গুরুর চরণ বন্দো করিয়া ভকতি।
গ্রামেশ্বরী দেবী বন্দো যে গ্রামে বসতি ॥[২]

[illegible] ংসারিক [illegible] বিচর [illegible] তেন,— মন[illegible] ব্যতীতও তিনি 'সূর্যমঙ্গল' বা 'আদিত্য-চরিত' নামে আরও একখা[illegible] রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কথা যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। 'সূর্যমঙ্গ[illegible] ব্য তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে আরও জানিতে

১ [illegible] (১৩১০), ৯-২২, ব-প্রা-পু-বি ১, ১২০; সাহিত্য (ঐ) ১০

পারা যায় যে, তাঁহার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল।[১] তাঁহার পূর্ণ নাম রামজীবন ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ; চট্টগ্রাম জিলার বাঁশখালি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মনসা-মঙ্গল কাব্যের রচনা-কাল সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,

শর কর ঋতু বিধু শক নিয়োজিত।
মনসা-মঙ্গল রামজীবন রচিত॥[২]

তাহা হইতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৬২৫ শকাব্দ বা ১৭০৩ খৃস্টাব্দে তাঁহার মনসা-মঙ্গল কাব্য রচিত হয়। ভণিতায় তিনি তাঁহার নামের পরিবর্তে বিদ্যাভূষণ কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন; মনে হয়, তাঁহার উপাধি ছিল বিদ্যাভূষণ। পূর্বোক্ত 'সূর্যমঙ্গল' কাব্যে তিনি বিদ্যাভূষণ উপাধির কোথাও উল্লেখ করেন নাই; মনে হয়, এই উপাধি তিনি 'সূর্যমঙ্গল' রচনার পর লাভ করেন। তাঁহার কাব্যে গৌরচন্দ্র, কবিচন্দ্র ও শিবচরণ দাস নামক তিনজন স্বতন্ত্র কবি বা গায়েনের ভণি[illegible] প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। রামজীবনের মনসা-মঙ্গল কাব্যখানি পরবর্তী মনসা-মঙ্গল [illegible]গুলির বৈশিষ্ট্যহীন রীতিতে রচিত হইলেও, তাহা মধ্যে মধ্যে স্নিগ্ধ রসোজ্জ্বল; [illegible] ও পয়ারের বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে দুই একটি নূতন ছন্দ রচনারও তাঁহার সার্থ[ক] প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] কাব্যখানি বিশেষ প্রচার লাভ করিতে পারিয়াছিল বলিয়াও মনে হয় না। একমাত্র [illegible] চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশেই ইহার প্রচার হইয়াছিল। ইহা এই অঞ্চলে 'বিদ্যাভূষণী মনসা' নামে পরিচিত।

জীবন[কৃষ্ণ] মৈত্র

বগুড়া জিলার অন্তর্গত করতোয়া নদীর তী[রে]র লাহিড়ীপাড়া গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে মনসা-মঙ্গলের অন্যতম কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র জন্মগ্রহণ করেন।[৩] তাঁহার পিতার নাম অনন্ত, মাতার নাম স্বর্ণমালা,—

স্বর্ণমালা সুত কবি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
শ্রীমৈত্র জীবন গায় অনন্ত নন্দন॥

অনন্তের পাঁচ পুত্র; জীবন তাঁহাদের এই ভাবে পরিচয় দি[য়াছেন]—

সর্বাগ্রজ দুর্গারাম, তস্যানুজ আত্মার[াম]
সর্বেশ্বর প্রাণকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ। [জ]ননীর
শ্রীকবি-ভূষণ নাম বাস লাহিড়ীপাড়া গ্রাম [illegible]।
জীবন মৈত্র চতুর্থের কনিষ্ঠ॥ [illegible]

১ বা-প্রা-পু-বি ২, ৪১; ২ ঐ ১, ১২০; ৩ র-সা-প-প, ২ (১৩১৬ সাল), [পৃ]২-২০৩

জীবনের উপাধি ছিল কবিভূষণ। তাঁহার কাব্যরচনার কাল সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মনসা-মঙ্গলে নিম্নলিখিত নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন,

মহীপৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণ বিধু সমর্পিয়া
বুঝহ সনের পরিমাণ।

ইহা হইতেই জানিতে পারা যায় যে, ১১৫১ বঙ্গাব্দে বা ১৭৪৪ খৃস্টাব্দে জীবন মৈত্রের মনসা-মঙ্গল রচিত হয়। কবি নিজেকে নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের রাজ্যের প্রজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,

সে সতী পুণ্যবতী রাণী ভবানী।
মহারাণী বলি তাকে ভুবনে বাখানি॥
যার পুত্র রামকৃষ্ণ রাজা রাজ্যেশ্বর।
অপার মহিমা যশ ভুবনে যাহার॥
তাহার রাজ্যেত বাস ভিক্ষা করি খাই।
কহে কবি জীবন মৈত্র নির্দয় গোঁসাই॥

কবি সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। সেইজন্য পণ্ডিত হইয়াও নিজের প্রচার করিয়া বেড়াইতে পারিতেন না। লাহিড়ীপাড়া গ্রাম নাটোরের জমিদারি-ভুক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ জীবন মৈত্র কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের জন্য উক্ত জমিদারের নিকট হইতে যে কোন সম্মান প্রাপ্ত হন নাই, তাহা তাঁহার কাব্যপাঠেই জানা যায়। শুধু তাহাই নহে, রাজা রামকৃষ্ণের বিবাহের সময় ব্রাহ্মণ হইয়াও তাঁহার ভাগ্যে 'বেগার' খাটিবার উপক্রম হইয়াছিল,

রামকৃষ্ণ রায়ের বিভা তাত বেগার ধুম।
. লেখা ছাড়ি র'লাম পড়ি চক্ষে চাপিল ঘুম॥

কোনমতে ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া কবি সেইবার বেগার খাটিবার অপমান হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। জীবনের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল ছিল। সাংসারিক অসচ্ছলতা বিস্মৃত হইয়া থাকিবার জন্য কবি সর্বদা তাঁহার কল্পনা-কুঞ্জে বিচরণ করিতেন, কিন্তু ইহার মধ্যে কবি-পত্নী আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাদ সাধিতেন,—

তত্ত্ব দিল পুরদারা সকল বুদ্ধি হৈল হারা
পুথি বান্ধি হাটে চলি যাই।

সংসারানভিজ্ঞতার জন্য কবি জীবন মৈত্র সমাজে 'পাগ্‌লা জীবন' নামে পরিচিত ছিলেন।

জীবন মৈত্রের মনসা-মঙ্গলকাব্য দুই খণ্ডে বিভক্ত,—দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ড। দেবখণ্ডে মঙ্গলকাব্যের সাধারণ গৌরচন্দ্রিকাসমূহ, মহাভারত ও পুরাণোক্ত নাগ এবং মনসার জন্ম ও বিবাহ-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বণিকখণ্ডে চাঁদ সদাগর ও বেহুলার কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বণিকখণ্ডই প্রকৃতপক্ষে মনসা-মঙ্গলের মূল লৌকিক কাহিনী; ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বশতঃ পরবর্তী কালে দেবখণ্ড আসিয়া ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। কাহিনীর এই সুস্পষ্ট বিভাগ হইতে ইহাদের পরস্পর স্বতন্ত্র উদ্ভবই সূচিত হইতেছে।

জীবন মৈত্রের ভণিতায় 'উষা-হরণ' নামক একখানি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র কাব্য পাওয়া যায়।[১] কিন্তু 'উষা-হরণে'র বৃত্তান্ত মনসা-মঙ্গলের উক্ত দেব-খণ্ডের অন্তর্গত। কালক্রমে কোন কারণে জীবন মৈত্রের মূল মনসা-মঙ্গলের পুঁথি হইতে উক্ত অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও, ইহা তাঁহার উক্ত কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত। জীবনের কাব্যে অন্যান্য মনসা-মঙ্গল হইতে কতকগুলি বিষয়ে অনৈক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার মতে বেহুলার পিতার নাম বাহো সদাগর, মাতার নাম মেনকা, ভ্রাতার নাম শঙ্খধর, বেহুলার নাম বেললি। বাংলা দেশে প্রচলিত আর কোন মনসা-মঙ্গলে এই প্রকার নাম পাওয়া যায় না। দুই এক স্থলে তাঁহার কাব্যোক্ত কাহিনীর সঙ্গে বিহারে প্রচলিত কাহিনীর মিল দেখা যায়। জীবনের কাব্যে দুই একটি উপকাহিনীও অন্যান্য মনসা-মঙ্গল কাহিনী হইতে একটু স্বতন্ত্র। এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, বেহুলা মৃত স্বামী লইয়া কলার মান্দাসে করিয়া চলিয়াছেন, পথে বাণিজ্য-প্রত্যাগত সহোদর ভ্রাতা শঙ্খধরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। শঙ্খধর ভগিনীকে চিনিতে পারিলেন না, বরং সুন্দরী যুবতীকে নিঃসঙ্গ পাইয়া তাহার নিকট প্রণয় নিবেদন করিলেন। বেহুলা যখন আত্মপরিচয় দিল, তখন শঙ্খধরের লজ্জার আর সীমা রহিল না। তিনি কৃতকর্মের জন্য অন্তরে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং স্নেহের ভগিনীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেহুলা ভ্রাতার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া নিজের দুর্গম কর্তব্য পথে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। এই প্রসঙ্গটি জীবন মৈত্রের মৌলিক রচনা নহে—ইহা বাংলার চির

[১] সা-প-প ১৩, ১৬৩

পরিচিত রূপকথা 'কাজল রেখা'র কাহিনী হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহা লোক-কথার একটি সাধারণ বিষয় (motif)।

সংস্কৃত পুরাণ হইতে নির্বিচারে অশ্লীল অংশসমূহ গ্রহণ করিবার ফলে জীবনের কাব্য আদিরসের বর্ণনায় ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। জীবনের রচনা সর্বত্র সরল নহে, কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যই তাঁহার অধিক ছিল। তাঁহার কাব্যে সংস্কৃত অলঙ্কার ও উপমার যথেচ্ছ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দ-চয়নে কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে নীরস পাণ্ডিত্যের অবতারণা করিয়া কবিত্বস্ফূর্তির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। রচনা অনেক স্থলেই লালিত্যহীন, ক্বচিৎ কোন স্থলে তিনি পাণ্ডিত্য-মুক্ত হইয়া সহজ ভাষায়ও অন্তরের ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু সেই ভাষাও সর্বাংশে অষ্টাদশ শতাব্দীর পারিপাট্য লাভ করিতে পারে নাই। ভ্রাতা শঙ্খধর ভগিনীকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিতেছেন,—

সাধু বলে তুমি ভগ্নী সোহাগিনী মাও।
নির্দয় নিষ্ঠুর হৈয়া কোন দেশে যাও ॥
বাপ বড় দুরন্ত জানিনু এতদিনে।
তার কারণে জলে ভাসে দয়ার বহিনে।
কি দণ্ড লাগিল পিতার কোন দুঃখে মরে।
কি দেখিয়া বিভা দিল সর্পখাউকার ঘরে ॥
একখানি ভগিনী ছয় ভায়ের দুলালী।
শূন্য কৈল ঘর মায়ের কোল কৈল খালি ॥

অনেক অনাবশ্যক ও অবান্তর রচনায় জীবনের কাব্য ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে; কাহিনীর সহজ গতি ইহাতে বহুল পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। জীবন নিখুঁত চিত্রকর ছিলেন। প্রত্যক্ষ সংসারের প্রত্যেকটি বাস্তব অভিজ্ঞতা রচনায় তিনি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। সেইজন্য স্তূপীকৃত উপকরণের নীচ হইতে তাঁহার কাব্যের মূল বক্তব্য সহজে স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্য আজও প্রকাশিত হয় নাই।

দ্বিজ রসিক

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে দ্বিজ রসিক নামে একজন কবি একখানি সুবৃহৎ মনসা-মঙ্গলকাব্য রচনা করেন।[১] তাঁহার সময় সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছুই

[১] ব-সা-প ১, ২৯২-৯৯।

জানিতে পারা যায় না; তবে ভাষা বিচার করিয়া তাঁহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের লোক বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কাব্যের ভণিতা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায়,—

কবির প্রপিতামহের নাম কালিদাস, পিতামহের নাম মহেশ মিশ্র, পিতার নাম শিবপ্রসাদ। সেনভূম ও মল্লভূমের মধ্যবর্তী আখড়াশাল নামক স্থানে কবির নিবাস ছিল। কবির দুই ভ্রাতা ছিল, রাজারাম ও অযোধ্যা; এক ভগিনী, তাহার নাম সাবিত্রী। কবির দুইটি উপাধি ছিল, কবিকঙ্কণ ও কবিবল্লভ।

দ্বিজ রসিকের মনসা-মঙ্গলকাব্যে রামায়ণ ও ধর্মমঙ্গলকাব্যের সুস্পষ্ট প্রভাব অনুভব করিতে পারা যায়। রামায়ণের হনুমান চরিত্রটিকে মনসা-মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কাহিনীর অন্যান্য অংশেও রামায়ণ ও ধর্মমঙ্গলকাব্যের কোন কোন চিত্র ও চরিত্রকে অবলম্বন করা হইয়াছে, উক্ত দুই কাব্য হইতে দ্বিজ রসিক অনেক কাহিনীও তাঁহার রচনায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। দ্বিজ রসিক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচনায় কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

বিষ্ণু পাল

বীরভূম জিলায় আজ পর্যন্তও মনসা-পূজার যে ব্যাপক অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে আজও বিষ্ণু পাল নামক একজন কবির মনসা-মঙ্গলই প্রধানতঃ গীত হইয়া থাকে। এ'যাবৎ বিষ্ণু পালের একখানি সম্পূর্ণ ও একাধিক খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে,[১] কিন্তু আজ পর্যন্ত একখানি পুঁথিও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই।

পুঁথি হইতে কবির সম্পর্কে কোনই পরিচয় পাইবার উপায় নাই। তবে বীরভূম অঞ্চলের জনপ্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায় যে, 'কবি জাতিতে কুম্ভকার ছিলেন এবং তাঁহার নিবাস রাণীগঞ্জের নিকটবর্তী সেরগড় পরগণা মধ্যে কোন গ্রাম।'[২] বীরভূম জিলা ও তাহার সন্নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকদিগের মধ্যে কুম্ভকার সম্প্রদায়ের লোক মনসার বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, তাহারাই মনসার ঘট বা 'মূর্তি' নির্মাণ করিয়া থাকে। ঘট নির্মাণ করিবার জন্য তাহারা মনসাদেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। অতএব উক্ত জনপ্রবাদ-মূলে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকা অসম্ভব নহে।

ধর্মমঙ্গল সাহিত্যের অনুরূপ বিষ্ণু পালের মনসা-মঙ্গলে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দেখিয়া

[১] গ-স ১৬৩৩-৩৬, গ-স ৪৯৯৩; [২] শিবরতন মিত্র, ৪৬৭

মনে হয় যে, যখন রাঢ়দেশে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি ব্যাপকভাবে রচিত হইতেছিল, তখনই অর্থাৎ খৃস্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। অবশ্য সৃষ্টিতত্ত্বের আখ্যান পরবর্তী কালে কোন গায়েন কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হওয়াও বিচিত্র নহে। চণ্ডীমঙ্গল আট পালায় বিভক্ত করিয়া আট দিনে গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত হইত। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, মনসা-মঙ্গল সাধারণতঃ একমাসে গীত হইবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইত। আট দিনে গীত হইত বলিয়া চণ্ডীমঙ্গলকে অষ্টমঙ্গলাও বলিত। বিষ্ণু পালের মনসা-মঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল রচনার আদর্শে আট পালায় বিভক্ত হইয়া রচিত। এইজন্য ইহা মনসার 'অষ্টমঙ্গলা গান' নামে পরিচিত।

বিষ্ণু পালের ভাষা নিতান্ত আধুনিক। বীরভূম অঞ্চলে তাঁহার কাব্যের ব্যাপক প্রচারের ফলেই ভাষা আধুনিকতায় রূপান্তরিত হইয়া থাকিবে। হয়ত এইজন্যই ইহার মধ্যে বীরভূম অঞ্চলের কথ্যভাষারও নির্বিচার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য বিষ্ণু পালের সময় সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে কিছু জানিতে পারা না গেলে এই বিষয়ে কিছুই নিশ্চিত করিয়া বলিবারও উপায় নাই।

বিষ্ণু পালের রচনা দৃঢ়সংবদ্ধ নহে, ছন্দোবন্ধন অনেক স্থলেই অত্যন্ত শিথিল। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়,—

শুন শুন ওগো দুর্গা শুনগো সুন্দরী।
আজ জলে ডুবে মরিল তোমার চাঁদ অধিকারী॥
একথা শুনিয়া মায়ের প্রাণ উড়ে গেল।
পদ্মার সহিত মাতা কালীদহে আইল॥
দূর হৈতে মহামায়াকে দেখিবারে পেয়ে।
নৌকার উপরে রাজা বেড়ান নাচিয়ে॥[১]

বিষ্ণু পালের রচনায় আধুনিক স্বরবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়,—

ভালই কল্লাম সুবেশ কল্লাম এসেছিলাম জলে।
জলে এসে ভালই কল্লাম স্বামী পেলাম কোলে॥
গৌরী পূজা করেছিলাম জন্ম জন্মান্তরে।
মৃত পতি পাইলাম মা মানস সরোবরে॥

---

১ ঐ ৪৬৮

বিষহরি হরেছিলেন কোলের দণ্ডধর।
আজি নিদয় বিধি সদয় হৈলা নৌকার উপর ॥[১]

বিষ্ণু পালের কাব্যে ছন্দের এই প্রকার আরও বহু বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল রচনা পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত, কিংবা কবির নিজস্ব রচনা তাহা বলিবার উপায় নাই। যদি ইহা কবির নিজস্ব রচনাই হইয়া থাকে, তবে কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ববর্তী হইতে পারেন না।

বিষ্ণু পালের কবিত্ব খুব উচ্চাঙ্গের ছিল না, তাঁহার মধ্যে ভাষার পারিপাট্য একেবারেই নাই; পূর্বেই বলিয়াছি, ইহাতে বীরভূম অঞ্চলের কথ্যভাষার নির্বিচার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিষ্ণু পালের পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয়। তাঁহার কাব্যখানি বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীর একটি বৃহদায়তন সঙ্কলন বলা যাইতে পারে। সহজ গ্রাম্যভাষায় পৌরাণিক রস তিনি সাধারণ লোকের মধ্যে পরিবেশন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তিনি অনতিকালপূর্বে আবির্ভূত হইয়াও সমগ্র বীরভূম জিলায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি বিষয়-নির্লিপ্ত সংসার-অনভিজ্ঞ আদর্শবাদী কবি ও সাধক মাত্রই ছিলেন না, তাঁহার সমাজ-বোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এ দেশের নিরক্ষর পল্লীকবিদিগের মধ্যেও সমাজ-সচেতনতা যে কত প্রবল, ইহা তাহারই একটি নিদর্শন। মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচার করিবার জন্য বেহুলারূপে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে উষা মনসাকে দিয়া তিনটি সত্য বা শপথ করাইয়া লইতেছে—

গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে।
তোমা (তুমি) না তরাল্যে, বাছা, সেই পাপ ধরে ॥
শূদ্র না হইঞা যেবা নীল বস্ত্র পরে।
তোমা না তরাল্যে, বাছা, সেই পাপ ধরে ॥
কুইলা বলদ যেবা রাখিবে গোহালে।
তোমা না তরাল্যে, বাছা, সেই পাপ ধরে ॥

ইহাতে হিন্দু সনাতন পাপবোধের পার্শ্বে লৌকিক পাপবোধের কথা একই সঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছে। এক দিক দিয়া শাস্ত্র যেমন নিজস্ব নীতি ও ধর্ম দ্বারা সমাজকে শাসন করিতেছে, আর এক দিক দিয়া প্রত্যেক সমাজ নিজস্ব একটি

১ ঐ ৪৬৯

নৈতিক আদর্শ নিজেও রচনা করিয়া তাহার অনুশাসন স্বীকার করিয়া চলিয়াছে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ প্রায়শ্চিত্তবিধির মধ্যে লৌকিক পাপবোধকে অস্বীকার করিয়া শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথটিই অনুসরণ করিয়াছেন। এখানে উভয়কেই তুল্য মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। কবি বিষ্ণু পালের সমাজ-অভিজ্ঞতায় গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, দ্বিজের নীলবস্ত্র ধারণ[১] প্রভৃতি পাপাচরণের মতই কইলা বাছুর (২১ দিনের কম বয়স্ক) গোয়ালে বাঁধিয়া রাখাও পাপ—গুরুত্বের দিক দিয়া ইহারা সকলই সমান। মঙ্গল-কাব্যের সমাজ দর্শনের ভিতর দিয়া শাস্ত্রীয় ও লৌকিক সংস্কারকে এই ভাবে সর্বত্র সমানাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

বাণেশ্বর রায়

১৬৪১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১৯ খৃস্টাব্দে বাণেশ্বর রায় নামক একজন কবি মনসা-মঙ্গল রচনা করেন।[২] তাঁহার একখানি মাত্র অসম্পূর্ণ পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি কাব্যখানি একটি কারণে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার মত; তাহা পরে উল্লেখ করিতেছি।

বাণেশ্বর আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে কাব্যমধ্যে তাঁহার উর্ধ্বতন চারি পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন—সংরামের পুত্র আত্মারাম, আত্মারামের পুত্র বংশীরায়, বংশীরায়ের তিন পুত্র—প্রতাপ, হরিনারায়ণ ও রঘুনাথ; হরিনারায়ণের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ সদাশিব ও কনিষ্ঠ বাণেশ্বর। কবির বাসস্থান বিষয়ে ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই জানিতে পারা যায় না,—'নিবাস চম্পকপুরী জন্ম রাইপুরে'।[৩]

রচনা-কাল সম্বন্ধে কোন হেঁয়ালী না করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

মনসা-মঙ্গল ভাযে প্রথম বৈশাখ মাসে
যোল শ এক চল্লিশে।
ভাবিয়া ভবানী হর ভণে দ্বিজ বাণেশ্বর
মনসার মঙ্গল-প্রকাশে॥

[১] তুলনীয়—

সংধ্যা স্নানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
বৃথা তস্য মহাযজ্ঞা নীলীরক্তস্য ধারণাৎ॥
নীলীরক্তং যদাবস্ত্রং বিপ্রো দেহেষু ধারয়েৎ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥

—অঙ্গিরঃ স্মৃতি, শ্লোক ৩৩, ৩৫

[২] গ-স ৫৪০৫; [৩] ঐ ১৭ (ক)

বাণেশ্বরের ভাষা সুপরিচ্ছন্ন ও রচনা সুসংবদ্ধ; বেহুলার চরিত্র পরিকল্পনায় তাঁহার অভিনবত্ব আছে। সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি বেহুলার চরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে আদর্শবাদকে তিনি কোন স্থান দেন নাই। এই হিসাবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ইহা একটি বিশেষ মূল্য দাবী করিতে পারে।

লখিন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলার দুঃসাধ্য সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য ভ্রাতা সুমতি তাহাকে অনুরোধ করিয়া বলিতেছে,—

সুমতি কহেন শোকে শোন গো রোহিণী।
সলিলে ভাসিয়া কেনে যাও একাকিনী॥
পাইয়া তোমার বার্তা কি করে জননী।
বাঁচিব ভবনে পুন বল বুঝি বাণী॥
বাপের জীবন তুমি মায়ের পরাণ।
ছয় ভায়ের বোন তাহে ঘরের প্রধান॥
চাপিয়া মঞ্জুষে যায় মৃত পতি কোলে।
সলিলে ভাসিয়া তুমি যাহ কার বোলে॥
বিধির লিখন এই মনুষ্যের নহে।
মরিলে বাঁচএ পুন কেবা কোথা কহে॥[১]

ইহার উত্তরে বেহুলা বলিল,—

যে কিছু বলিলে ভাই মোরে নাহি সাজে।
ভবনে বিধবা হইয়া যাব কোন লাজে॥
যদি যাই ওরে ভাই তব সঙ্গে বাড়ী।
ধাইব বনিতা সব দেখিবারে রাঁড়ি॥
ভবনের বার্তা মোর কিছু নয় হারা।
বিষম বনিতা বড় তোমাদের দারা॥
বাজিলে কোন্দল বড় সভে দিবে গালি।
বাসরে ভাতার খালি কেন হেথা আলি॥
নারিব সহিতে ভাই সে সব বচন।
অতেব বলিএ অরে কররে গমন॥[২]

[১] ঐ ১২ (ক), [২] ঐ ১২ (খ)

ছদ্মবেশিনী মনসা গাঙ্গুরের জলে ভাসমানা বেহুলাকে যখন তাহার পরিচয় ও দুর্ভাগ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন বেহুলা বলিতেছে—

কান্দিতে কান্দিতে কন বেহুলা যুবতী।
ভুবনে আমার সম নাঞি ভাগ্যবতী॥
বিবাহ করিয়া নাথ লয়্যা আইল মোরে।
প্রভুর সঙ্গেতে ছিলাম লোহার বাসরে॥
জন্মে জন্মে কত আমি ভগ্নব্রত করি।
তাহাতে কুপিত কিবা দেবী বিষহরী॥
না জানি তাহার ঠাঁঞি হইল কোন পাপে।
যামিনীতে মোর নাথে বিনাশিল সাপে॥
পতির যতেক—চান্দ সনকা জননী।
শ্বশুর কহিল মোরে দুরক্ষর বাণী॥
বণিক-বনিতা মাঝে গালি দিল মোরে।
আপনি সাপিনী হঞা খালি বংশধরে॥
হইল আমার মনে অতি অনুতাপ।
লইয়া প্রাণের নাথ জলে দিলাও ঝাঁপ॥[১]

মৃত স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া ভেলায় ভাসিয়া স্বর্গপুরে যাত্রা করা ত বেহুলার জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করারই রূপক। এমন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা মনসা-মঙ্গলের আর কোন কবিই বেহুলা চরিত্রকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। এই বৈশিষ্ট্যের গুণে বাণেশ্বরের রচনার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে।

বিবিধ কবি

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আরও কয়েকখানি মনসা-মঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে জগমোহন মিত্রের মনসা-মঙ্গল ১২৫১ সাল (১৭৬৬ শকাব্দ) বা ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।[২] যাহাতে রচনা-কাল বুঝিবার পক্ষে কোন গোলযোগ না হয়, সে' জন্য তিনি তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়ই উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যের মধ্যে তাঁহার বিস্তৃত বংশ পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে।[৩]

অতঃপর ১২৬৭ সাল বা ১৮৬০ খৃস্টাব্দে যশোহর জিলার অন্তর্গত মল্লিকপুর

[১] ঐ ২০ (খ) ২১ (ক); [২] সা-প-প ৩, ৩২৬-২৭; [৩] ঐ।

গ্রামের দ্বিজ কালীপ্রসন্নের মনসা-মঙ্গল প্রকাশিত হয়।[১] শ্রীহট্টের রাধানাথ রায় চৌধুরী উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে একখানি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।[২] তাঁহাকেই বাংলা মনসা-মঙ্গল কাব্যের সর্বশেষ কবি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। কুচবিহার অঞ্চলে বৈদ্যনাথ নামক একজন কবির মনসা-মঙ্গলের পুঁথি একখানি পাওয়া যায়। কিন্তু কবির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। নানা কারণে পুঁথিখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মনসা-মঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন কবির সম্বন্ধে উপরে যথাসম্ভব আলোচনা করা গেল। এতদ্ব্যতীত বহু অজ্ঞাত পরিচয় কবিও মনসা-মঙ্গল রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের আলোচনা সহজসাধ্য নহে। ইহাদের মধ্যে অনেক কবিই এমন কি দুই তিন শত বৎসরের প্রাচীন ছিলেন, তাহাও স্পষ্টত বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু কোন পরিচয়ের অভাবে তাঁহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে না।[৩] অনেক কবিই তাঁহাদের রচনার মধ্যে নিজেদের কোন পরিচয় দিয়া যান নাই, কিংবা দিয়া গেলেও কালক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। কারণ, প্রাচীন বাংলার সমাজে কাব্য-বিশেষের রচয়িতার ব্যক্তিগত জীবনীর কোন মূল্য ছিল না; কাব্যগত কাহিনীই তাহার প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল। সেইজন্য অনেক কবি বহু উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াও তাহা পূর্ববর্তী কোন প্রতিষ্ঠাবান্ কবির নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। সেইজন্যই প্রত্যেক প্রাচীন ও প্রথিতযশা কবির রচনাতেই প্রক্ষিপ্ত অংশ ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছিল। অবশ্য অপেক্ষাকৃত অল্প খ্যাতি-সম্পন্ন কবিগণ এই উপদ্রব হইতে প্রায় সর্বদাই রক্ষা পাইয়াছেন। এই ভাবে জন কয়েক মুষ্টিমেয় লব্ধকীর্তি কবির বিস্তৃত পক্ষচ্ছায়ায় অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতিভাবান্ কবিদিগের পরিচয় চিরতরে প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কোন সময় অন্য প্রকার ব্যাপারও ঘটিয়াছে। মনসা-মঙ্গলের কোন কোন গায়েন আসরে গান গাহিতে দাঁড়াইয়া ভণিতার স্থলে আসিয়া কোন কোন সময় কোন বিস্মৃতপ্রায় অপরিচিত প্রাচীনতর কবির নামের পরিবর্তে তদানীন্তন কালে প্রচলিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক কোন কবির নামও সংযোগ করিয়া দিয়াছে। গায়েনদিগের খামখেয়ালীর উপর অনেক সময় অনেক প্রাচীন কবির খ্যাতি ও অখ্যাতি নির্ভর করিত। কারণ, প্রকৃত পক্ষে তাহারাই এই সকল রচনার একমাত্র প্রচারক ছিল। এইজন্য প্রাচীন

---

[১] র-সা-প-প ২, ১৮৭-৮৮; [২] অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি ৩, ২৩৩;

[৩] *D. C. B. M. C. B.* Ms. 19.

কোন রচনার উপরই নির্ভর করিয়া কোন কবিরই প্রতিভা সম্বন্ধে বিচার সম্পূর্ণ নির্ভুল হইতে পারে না।

মনসা-মঙ্গলের পদসংকলন

অসংখ্য কবি যখন মনসা-মঙ্গলের একই বিষয়বস্তু লইয়া একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কাব্য রচনা নিষ্পন্ন করিলেন, তখন হইতেই গানের আসরে কোন বিশেষ কবির রচিত একই কাহিনী আদ্যোপান্ত গীত হওয়ার রীতি লুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। তখন হইতে বৈষ্ণব পদ-সঙ্কলনের রীতি অনুযায়ী মনসা-মঙ্গলের পদ-সঙ্কলনও গ্রথিত হইতে লাগিল। এই ভাবে বিষয়বস্তুর পারম্পর্য রক্ষা করিয়া প্রত্যেক কবির রচনা হইতেই উৎকৃষ্ট অংশ আহরণপূর্বক মনসা-মঙ্গলের পদ-সঙ্কলন রচিত হইতে লাগিল। পদ-সঙ্কলনের এই রীতি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রভাবশালী হইয়াছিল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল মাত্র বৈষ্ণব কবিতা ও মনসা-মঙ্গলের ক্ষেত্রেই নহে—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদের ক্ষেত্রেও পদসঙ্কলনের রীতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।[১] প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এই পদ-সঙ্কলনের রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকার জন্যই কোন দৈব কারণে রক্ষিত না হইলে আদ্যোপান্ত একই কবির ভণিতাযুক্ত প্রাচীন কবির কোন পুঁথি আবিষ্কৃত হইতে পারে না। অতএব মনসা-মঙ্গলের পদসঙ্কলনের মধ্যে যে সকল কবির রচনা গৃহীত হয় নাই, কিংবা আদ্যোপান্ত ভণিতাযুক্ত যে সকল কবির পুঁথি পরবর্তী কালে সাধারণ পুঁথিসংগ্রহের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রচার ও খ্যাতি যে নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

মনসা-মঙ্গলের পদসংগ্রহকে বলিত 'বাইশা', 'বাইশ কবি-মনসা', 'বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল' বা 'ষট্‌কবি'। 'বাইশ কবি' অর্থে বাইশজন কবিরই যে রচনা কিংবা ষট্ কবি অর্থে ছয়জন কবিরই যে রচনা ইহাদের মধ্যে সঙ্কলিত হইত, তাহা নহে—বাইশ কিংবা ষট্ এখানে বহু অর্থে ব্যবহৃত হইত। অতএব বাইশ জনের অধিক কিংবা অনধিক কবির রচনা ইহাতে সঙ্কলিত হইত। তবে 'ষট্ কবি মনসা-মঙ্গলে' সাধারণতঃ ছয়জন কবির রচনাই স্থান পাইত—কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও হইত। এই পদসংগ্রহের রীতি অবলম্বনের ফলে অনেক অখ্যাতকীর্তি কবির নামও বিস্মৃতি হইতে রক্ষা পাইয়াছে সত্য, আবার অনেক সময় অনেক প্রকৃত খ্যাতকীর্তি কবিরও

---

[১] ব-সা-প ১, ১ (ভূমিকা)

ইহাতে ন্যায্য মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। ইহাতে সাধারণতঃ দুই-তৃতীয়াংশ রচনা একজন বিশেষ কবির কাব্য হইতে গ্রহণ করা হইত, অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশে অন্যান্য কবির রচনা সংকলিত হইত। অতএব পদ-সঙ্কলনের যথার্থ যে উদ্দেশ্য, তাহা অনেক সময়ই ইহাতে সিদ্ধ হইত না। বাইশা সঙ্কলনে একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক নীতিও অনুসৃত হইতে দেখা যায়। বরিশাল অঞ্চলে সঙ্কলিত বাইশা সমূহে একমাত্র সেই অঞ্চলের কবিদিগেরই রচনা সঙ্কলিত হইত; ময়মনসিংহ শ্রীহট্ট অঞ্চলের বাইশা সমূহ বরিশাল অঞ্চলের কবিদিগকে সাধারণতঃ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র নিজস্ব অঞ্চলের কবিদিগের রচনাই তাহাতে সঙ্কলন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাঢ় অঞ্চলে যে সকল বাইশা প্রচলিত ছিল, তাহাতে পূর্ববঙ্গের কোন কোন কবির রচনা সঙ্কলিত হইলেও কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গের কবিদিগের রচনাই অধিক পরিমাণে স্থান পাইয়াছে। ব্যবসায়ী গায়েনগণ প্রধানতঃ এই সকল বাইশার সঙ্কলয়িতা ছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, সমগ্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসা-মঙ্গল কাব্যই সর্বাধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। সর্পদেবী মনসার পূজার ব্যাপকতাই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহা নহে। ইহার চরিত্রগুলির মধ্যেই এমন আকর্ষণীয় গুণ আছে, যাহা স্বভাবতঃই বাঙ্গালীর হৃদয় হরণ করিয়াছিল। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের উপরও এই কাব্যোক্ত কাহিনী নানা দিক দিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে শ্রাবণ মাস বিবাহের পক্ষে নিষিদ্ধ। কারণ, সাধারণের বিশ্বাস, শ্রাবণ মাসে বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া বেহুলা বাসর রাত্রে বিধবা হইয়াছিল। বর্ধমান জিলার কস্‌বা চম্পকনগর গ্রামে এখনও প্রতি বৎসর সতী বেহুলার স্মৃতি-উৎসব বলিয়া পরিচিত এক বিরাট মেলার অধিবেশন হয়। বাংলার সর্বত্র সাপুড়িয়ারা সাপ খেলাইবার সময় সুর করিয়া টানিয়া টানিয়া যে গান গাহে, তাহাতেও অভাগিনী বেহুলার অকাল বৈধব্যের করুণ কাহিনীই শুনিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সমগ্র আখ্যানমূলক গীতিসাহিত্য এই চাঁদ সদাগর বেহুলার কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।

চরিত্র-বিচার

মনসা-মঙ্গলের চাঁদ সদাগর চরিত্রের মত এমন সমুন্নত পুরুষকারের আদর্শ সমগ্র মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই। এ'কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, চাঁদ সদাগরের চরিত্রের আদর্শেই পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের দেব-বিদ্রোহী নায়কদিগের

চরিত্রগুলির পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগর চাঁদ সদাগরেরই অনুকরণে সৃষ্ট চরিত্র। ধর্মমঙ্গলের ইছাই গোয়ালাও এই প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত নহে। পরম শৈব চাঁদ অবজ্ঞাভরে মনসা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

যে হাতে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি।
সে হাতে পূজিব পুনি চেংমুড়ি কাণী॥

দাক্ষিণাত্যের অম্ববরুর কাহিনীতেও অনুরূপ উক্তি শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল—'The rajas and princes all cried out, O Ammavaru we will not worship female deity; we will not lift our hands and salute a goddess; we will not chant any other name except '*Linga nama Sivaya*';[১] কারণ, সেখানেও বাংলা দেশের অনুরূপ সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতিও চাঁদ সদাগরের প্রতিধ্বনি করিয়া চণ্ডীর সম্বন্ধে অবজ্ঞাভরে বলিয়াছিলেন,

যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি॥

শীতলা-মঙ্গলের শৈব রাজা চন্দ্রকেতু চাঁদ সদাগরের আদর্শেই শীতলার প্রতি অবজ্ঞাসূচক অনুরূপ উক্তি করিয়াছিলেন,

রাজা বলে শীতলা করেছে যদি বাদ।
কদাচিৎ আমি তার না ল'ব প্রসাদ॥

অতএব দেখিতে পাওয়া যায়, পরবর্তী প্রায় সমস্ত মঙ্গলকাব্যই তাহাদের নায়ক-চরিত্র পরিকল্পনার জন্য মুখ্যতঃ মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর নিকট গভীর ভাবে ঋণী; এই বিষয়ে তাঁহাদের নিজস্ব প্রায় কোনই মৌলিকতা নাই। তৎকালীন বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর ব্যাপক প্রভাবেরই ইহা প্রমাণ।

বাংলার মধ্যযুগের অতীত অন্ধকারের মধ্যে কর্ণপাত করিয়া থাকিলে যে একটি চরিত্রের পদশব্দ সর্বপ্রথম শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই এই চাঁদ সদাগরের। যে যুগে দৈবানুগ্রহই জাতির জীবনে পরম প্রসাদ বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই যুগে দৈবানুগ্রহকেই সকল প্রকারে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র নিজের পুরুষকারের উপর এই চরিত্রটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার প্রতি প্রত্যেকেরই সুগভীর সহানুভূতি

[১] H. Whitehead, *The Village gods of South India*, Calcutta, 1921, p. 134.

সর্বপ্রথম সঞ্চারিত হয়। এই সমাজ চিরদিনই আদর্শবাদী, অন্তরের আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সংসারের কোন বিপদকেই ইহা কোনদিন বিপদ বলিয়া মনে করে নাই। নিজস্ব আদর্শের উপাসনায় লাঞ্ছিত চাঁদ সদাগর আদর্শ-পূজারী চিরলাঞ্ছিত এই সমাজের যেন মূর্ত প্রতীক্। সেইজন্য চাঁদ দেব-বিদ্রোহী চরিত্র হইয়াও সাধারণ জনসমাজের শ্রদ্ধা হইতে কোনদিন বঞ্চিত হয় নাই। সকলেই চাহিয়াছে, তাঁহার এই লাঞ্ছনার অবসান হউক, ধনে পুত্রে সুখী হইয়া পুনরায় তিনি সংসারে প্রতিষ্ঠিত হউন, তাঁহার নিজের আদর্শের প্রতি এই ঐকান্তিক নিষ্ঠার জন্য দুঃখের ভিতর দিয়াই যেন তাঁহার জীবন শেষ না হয়। এখানে আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, তাহা এই যে, মধ্যযুগের সমগ্র হিন্দু সমাজটি চাঁদ সদাগরের চরিত্রের মধ্যে রূপ লাভ করিয়াছে। মনসা অত্যাচারী রাষ্ট্র-শক্তির প্রতীক্ এবং চাঁদ সদাগর অত্যাচারিত হিন্দু সমাজের প্রতীক্। সেইজন্য দেবতা বলিয়া কল্পনা করা সত্ত্বেও যেমন এক দিক দিয়া মনসার প্রতি সমাজের ঘৃণা দুর্বার হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই অন্য দিক দিয়া অত্যাচারিত চাঁদ সদাগরের প্রতি সহানুভূতি অতলস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্যই দেখিতে পাই, মনসা-মঙ্গলের কবিগণ তাঁহাদের কাব্যের উপসংহারে চাঁদের চরিত্রে কি এক অসম্ভব পরিবর্তন কল্পনা করিয়াছেন। তথাপি চাঁদ তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন, তিনি যে হাতে তাঁহার আরাধ্য দেবতা শূলপাণির পূজা করেন, সে হাত তিনি মনসাকে ফুল দিবার কাজে নিয়োজিত করেন নাই; তিনি তাঁহার বাম হাতকেই এই কাজে নিয়োগ করিয়াছিলেন। চাঁদের বাম হস্তেও মনসাকে একটি পুষ্প দিতে স্বীকৃত হওয়ার বিবরণ তাঁহার মূল চরিত্রগত আদর্শের বিরোধী নহে—কাহিনীর উপসংহারের জন্য ইহার পরিকল্পনা অপরিহার্য ছিল।

কিন্তু চাঁদ সদাগরকে আদর্শের পূজারী বলিয়া অঙ্কিত করিতে গিয়া মনসা-মঙ্গলের কবিগণ কি তাঁহাকে রক্তমাংসের সম্পর্কহীন করিয়া কল্পনা করিয়াছেন? যদি তাহাই হয়, তবে এই চরিত্র পরিকল্পনার সার্থকতা কোথায়? কিন্তু এই বিষয়েও আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চাঁদকে যথার্থ রক্তমাংসের মানুষরূপেই মনসা-মঙ্গলের কবিগণ চিত্রিত করিয়াছেন, মানবিক সুখ-দুঃখ-আশা-নৈরাশ্য দ্বারাই তাঁহার হৃদয় মথিত হইয়াছে। লখিন্দরের মৃত্যুর পর এই একটি মাত্র কথায় মনসা-মঙ্গলের একজন কবি সন্তান-শোকাতুর পিতৃহৃদয়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন,—'স্তব্ধ প্রায় হৈল সাধু নাহি বোলচাল।' সাংসারিক ঝড়-ঝঞ্ঝায়

অবিচল-চিত্ত চাঁদ সদাগরের তৎকালীন মনের অবস্থা ইহা অপেক্ষা সার্থকভাবে বোধ হয় বর্ণনা করা অসম্ভব হইত। চৈতন্যের গৃহত্যাগের পর বৃন্দাবন দাস শচীদেবী সম্বন্ধেও এমনই সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছিলেন,—'পৃথিবী স্বরূপা হইলা শচী জগন্মাতা।' যেখানে অনুভূতি সুগভীর সেখানে বেদনা-বোধও বিমূঢ় হইয়া যায়। যে অমিত তেজস্বিতা দ্বারা চাঁদ সদাগর নিজের আদর্শগত নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, তাহা দ্বারাই তিনি এই লৌকিক পুত্রশোক জয় করিয়া লইলেন,

স্বভাবে বৈষ্ণব সাধু যোগমন্ত্র জানে।
কারণ জানিয়া শোক পাশরিল মনে॥

কাব্যের উপসংহারে চাঁদ সদাগরের যে পরাজয় বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা মানুষের নিকটই মানুষের পরাজয়—দুঃখিনী পুত্রবধূর নিকট স্নেহশীল এক পিতৃতুল্য হৃদয়ের নির্বিচার আত্মসমর্পণ। ইহা রক্তমাংসে গঠিত মানুষেরই দুর্বলতার পরিচায়ক। সেইজন্য আদর্শবাদী হইয়াও চাঁদ ধরণীর ধূলিমাটির স্পর্শ হইতে ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। ইহাই চাঁদ চরিত্রের সার্থকতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ। মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে চাঁদ সদাগরের চরিত্রের আর একটি বড় সুন্দর সার্থকতা রহিয়াছে। একদিকে তাঁহার সুদৃঢ় চরিত্র ও অপর দিকে সনকা-বেহুলার সকরুণ চিত্র—ইহাদের বিপরীতমুখী আদর্শের পরস্পর সংঘাতে মনসা-মঙ্গল কাব্য এক অপূর্ব রসরূপ ধারণ করিয়াছে,—একঘেয়ে করুণরসের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ হইয়া উঠে নাই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ন্যায় প্রাচীন বাংলা কাব্যেও 'নায়িকারই প্রাধান্য' দাবী করিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, 'কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণু মাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোন কাজের নহে।' কিন্তু মনসা-মঙ্গলের নায়ক চাঁদ সদাগর সম্পর্কে এই দাবী প্রযোজ্য নহে। এমন কি, মনসা-মঙ্গলের নারীচরিত্রগুলিও কেবল যে নিজেরাই নড়িয়া বেড়ায়, তাহাই নহে—পাঠকের চিত্তকেও নাড়া দিয়া যায়। আর চাঁদ সদাগরের ত কথাই নাই।

আদর্শবাদী সমাজের অন্যতম আদর্শ চরিত্র-সৃষ্টি বেহুলা। বেহুলা একাধারে রামায়ণের সীতা ও মহাভারতের সাবিত্রী,—দুঃখ-সহনশীলতায় সে সীতা ও মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিবার শক্তিতে সে সাবিত্রী। আমাদের সমাজের যে নিয়ম তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার দুঃখের ভাগটা অধিকাংশই নারীর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নীরবে সকল দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতাও এই নারী-

জাতির অসীম, সেইজন্য কোন ব্যবস্থাই সে কোনদিনই মাথা পাতিয়া লইতে অস্বীকার করে নাই, কোন ব্যবস্থার জন্য তাহার কোনদিন কোন প্রতিবাদও শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বেহুলার চরিত্রের মধ্যে এমন একটি গুণের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয় যে, এই নিয়মানুবর্তিতার মূলে তাহারও একটু বিদ্রোহের ভাব সুপ্ত রহিয়াছে। বিবাহ রাত্রেই লখিন্দর সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিলে পুত্র-শোকাতুরা সনকা বেহুলাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। বেহুলা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর দিল,

নাগিনী দংশিল প্রভু মোরে কর রোষ।
তোমার ছয় পুত্র মৈল সেও কি আমার দোষ॥

শোকোন্মত্তা জননী পুত্রের মৃত্যুর জন্য পুত্রবধূর দুর্ভাগ্যকে বারবার দায়ী করিতে লাগিলেন, তাঁহার বাক্যে বেহুলা অন্তরে ক্রুদ্ধ হইয়াও বাহিরে এই বলিয়া প্রতিবাদ করিল,—

সোনেকার বচনে বেহুলা কোপে জ্বলে।
যোড় হাত করিয়া শাশুড়ীর আগে বলে॥
পাপকর্মের ফলে বিধাতা পাষণ্ডী।
বিয়ার রাত্রে মৈল স্বামী হৈলাম কাঁচা রাণ্ডী॥
অভাগিনী বেহুলারে মাতা কেন কর রোষ।
কর্মদোষে মইল প্রভু নহে মোর দোষ॥

তারপর মৃত স্বামীকে কোলে করিয়া বেহুলা যখন গাঙ্গুরের স্রোতে এক অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করিল, তখন সনকা তাঁহার সকল রোষ ভুলিয়া তাহাকে গৃহে ফিরিতে বলিলেন; সনকার নিকট বেহুলা তখন আর তাঁহার পুত্রবধূ নহে, ব্যথিত মানবাত্মার প্রতীক্ মাত্র; তখন তাহার প্রতিও তাঁহার যে সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা ব্যথিত মানবতার প্রতি শাশ্বত মানবতার চিরন্তন সহানুভূতিরই অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ভ্রাতৃগণ সংবাদ পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘরে ফিরিতে বলিল; বেহুলা কাহারও অনুরোধে কর্ণপাত করিল না। কাহারও কোন অনুনয় বিনয় ও স্নেহানুরোধ তাহাকে তাহার লক্ষ্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। লৌকিক আকর্ষণ অপেক্ষা একটা অনির্দিষ্ট আদর্শের আকর্ষণই তাহার কাছে বড় হইয়া উঠিল এবং তাহার উপরই তাহার জগজ্জয়ী সতীত্বেরও প্রতিষ্ঠা হইল। আজ যদি বেহুলা শাশুড়ী ও ভ্রাতার নির্দেশ

মত সমাজের সাধারণ নিয়মানুযায়ী মৃত স্বামীর সৎকার করিয়া আসিয়া সমাজের আরও দশজন বিধবার মতই পরম নিষ্ঠার সহিত তাহার অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়া যাইত, তাহা হইলে কেমন করিয়া তাহার সতীত্বের এই দীপ্তি প্রকাশ পাইত? কিন্তু আজ সে যে এই সমাজ নির্দেশেরই প্রতিবাদ করিয়া পরিস্ফুট যৌবনেও মৃত স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া নির্মম মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে চলিয়াছে, সেই জন্যই তাহার প্রকৃত গৌরব প্রকাশ পাইয়াছে। বেহুলার দুঃখ-সহনশীলতা অপেক্ষাও তাহার নির্ভীক তেজস্বিতাই যেন সকলের মন অধিক আকৃষ্ট করে। সহনশীলতা নারীর ধর্ম। ছয় অকাল-বিধবা পুত্রবধূর গভীর মৌন বেদনা চাঁদ সদাগরের সংসারকে স্তব্ধ শ্মশানের মত নিত্য নিরানন্দ করিয়া রাখিয়াছিল। বেহুলা চাঁদ সদাগরের সংসারে যেন এই গতানুগতিক দুঃখ-সহনশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে আসিল। নির্মম মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার অসীম শক্তি লইয়াই যেন সে চাঁদ সদাগরের সংসারে পদার্পণ করিল। অত্যাচার অবিচার নীরবে মাথা পাতিয়া বহন করিয়া যাওয়াও কাপুরুষতা; আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিয়া সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করিতে জানে, সে-ই সংসারে প্রকৃত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী। অত্যাচারী দৈবশক্তি বেহুলার একাগ্র সাধনার নিকট যেন মাথা নত করিতে বাধ্য হইল।

কিন্তু কেবল মাত্র আদর্শবাদের উপরই বেহুলা-চরিত্রের প্রতিষ্ঠা নয়, ইহার মধ্যে মানবিক অনুভূতির স্পর্শও অনুভব করা যায়। লখিন্দরের মৃত্যুর পর চাঁদ সদাগর যখন বেহুলার নিকট জানিতে চাহিলেন,—

বধূর ঠাঁই জিজ্ঞাসা কর কি আছে সাহস।
লখাইর সঙ্গে পুড়িয়া মরুক ঘুচুক অপযশ॥

তখন,-

শ্বশুরের কথায় বেহুলার প্রাণে লাগে ভয়।
হস্ত যোড় করিয়া শ্বশুরের আগে কয়॥
বেহুলা বলে শ্বশুর তুমি দেবতা সমান।
অভাগিনী বেহুলার কথা কর অবধান॥
পূর্বকালের কথা কহিছে বুড়া বুড়ী।
সর্পাঘাতে মৈলে লোক অগ্নিতে না পুড়ি॥
কলার মাঞ্জুষে করি ভাসাও গাঙ্গরী।
আমি অভাগিনী যাব প্রভুর সংহতি॥

নির্মম সমাজের হৃদয়হীন ভ্রূকুটির সম্মুখে অসহায়া বালিকার এই কাতর প্রার্থনা কী করুণ! ইহার মধ্যেও প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বেহুলার প্রতিবাদের সুর প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। শ্বশুরের এই কথার পর তাহার নদীর জলে ডুবিয়া মরা ছাড়া আর কি সহজ উপায় ছিল? তাহার স্বর্গের পথে ভাসান যাত্রা জলে ডুবিয়া মৃত্যুর রূপক ছাড়া আর কি?

মনসা-মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাস্তব চরিত্রই সনকার। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দুইটি জননী-চরিত্র অনবদ্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, একটি লখিন্দর-জননী সনকা, আর একটি উমা-জননী মেনকা। ইহাদের সঙ্গে যদি চৈতন্য-জননী শচীমাতার চরিত্রটি আনিয়া যোগ করা যায়, তাহা হইলেই চিত্রটি পরিপূর্ণ হয়। এই চরিত্র কয়টি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মধ্যযুগের বাংলার কবিদিগের আদর্শনিষ্ঠা যত উচ্চাঙ্গেরই হউক, বাস্তব অনুভূতিও তাহা অপেক্ষা তাঁহাদের কোন অংশেই কম ছিল না। জননী-চরিত্র পরিকল্পনায় এ'দেশের কবিগণ বাংলার গৃহাঙ্গিনার বাস্তব পরিবেশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সাধক রামপ্রসাদও তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনার লক্ষ্য-স্বরূপিণীকে জননীরূপে কল্পনা করিয়া তাহারও বাস্তব পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন।

ছয় বিধবা পুত্রবধূ ও দেব-দ্রোহী স্বামী লইয়া সনকার নিত্য সংসার, দুঃখের মধ্যে দৈবের নিকট যে সান্ত্বনা সন্ধান করিবে তাহারও উপায় নাই। এই নারীর তাহা হইলে অন্তরের জ্বালা জুড়াইবার স্থান কোথায়? স্বামী সুখ-দুঃখে নির্বিকার, কিন্তু তিনি নারী, তাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃই মানবিক দুঃখ-বেদনার অধীন। তাঁহার দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার জন্যই তাঁহার গর্ভে অভিশপ্ত সপ্তম পুত্র লখিন্দর জন্মগ্রহণ করিল। এই পুত্রের বিবাহের দিনই তাঁহার জীবনের চরম দুঃখ লেখা ছিল। পুত্র-পুত্রবধূকে বরণ করিয়া লইবার মুহূর্তে আকাশের কোন অদৃশ্য কোণ হইতে এক নিদারুণ বজ্রাঘাত তাঁহার উপর পতিত হইল। সনকা চিরসন্তান-দুঃখিনী, কিন্তু এমন কঠিন দুঃখও কি তাঁহার সহ্য করিতে বাকি ছিল? ইহাও কি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে?

কি শুনালে সখীগণ শুনাও আরবার।
সত্য কি মরেছে আমার বালা লক্ষীন্দর॥
আলুথালু চুলে ধায় পাগলিনীর বেশে।
ত্বরিতে চলিয়া গেল বাসরের পাশে॥

তারপর তাঁহার সে কি পুত্র-শোকোন্মাদিনী-রূপ,—

কবাট করিয়া দূর বাসরে সামায়।
দেখিল সোনার তনু ধূলায় লুটায়॥

পুত্র-শোকাতুরা বাঙ্গালী জননী তারপর স্বভাবতঃই পুত্রের দুর্ভাগ্যের জন্য সদ্য-বিবাহিতা পুত্রবধূকে দায়ী করিলেন,—

সোনা বলে বধূ তুমি পরম রূপসী।
আমার বাছা খাইতে আইলা কপট রাক্ষসী॥

তারপর যখন অভিমানিনী বেহুলা মৃত স্বামীকে কোলে করিয়া গাঙ্গুরীর জলে ভাসিল, তখন তাহার জন্য সনকার মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,—

সোনা বলে বধূ তুমি আমার কথা রাখ।
লখাইব বদলে মোরে মা বলিয়া ডাক॥

কিন্তু অবিচলিত বেহুলা যখন তাঁহার নিকট চারিটি নিদর্শন রাখিয়া যাত্রার জন্য উদ্যত হইল, তখন সনকা মাতৃহৃদয়ের স্নেহোচ্ছ্বাস আর রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না; এই স্নেহগুণেই পরের গর্ভজাত সন্তানকে বাংলার মায়েরা আপনার সন্তানের সঙ্গে অভিন্ন করিয়া দেখিয়া থাকেন,—

যত্ন করি সোনেকা রাখিল নিদর্শন।
বেহুলারে কোলে করি যুড়িল ক্রন্দন॥
ধারা শ্রাবণের হেন চক্ষে বহে পানী।
চরণে পড়িয়া বেহুলা মাগিল মেলানি॥

চক্ষের পলকে মাঞ্জুস গাঙ্গুরের স্রোতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন নিজের শূন্য সংসারের দিকে চাহিয়া সনকা কী মর্মভেদী আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—

তোমারে বিদায় দিয়া খাড়া হইয়া চাই।
মা বলিয়া কে ডাকিবে হেন লক্ষ্য নাই॥

এই রিক্তা জননীর একটি সকরুণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস মনসা-মঙ্গলের সমগ্র কাহিনীটিকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে।

এই করুণ বিয়োগান্তক কাব্যের চরম অভিশপ্ত চরিত্র লখিন্দর। সে এই কাহিনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত, অথচ তাহাকে লইয়াই কাহিনী। কাহিনীর মধ্যে কোনদিন সে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই,—জননীর সতর্ক স্নেহ-দৃষ্টির ছায়ায় তাহার জীবন অলক্ষ্যগোচর রহিয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ একটি দিনের জন্য

সে কাহিনীর নায়ক হইয়া উঠিয়াছিল—সে'দিন তাহার পরম ও চরম দিন—সেই দিনই তাহার বিবাহ ও তাহার মৃত্যু। অমলিন বরসজ্জা লইয়া সেদিন সে মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিল। তাহার মুখ হইতে একবার মাত্র যে কথা বলিতে শুনিলাম, তাহাও তাহার মৃত্যুযন্ত্রণার করুণ আর্তনাদ,—

ওঠ ওঠ প্রাণেশ্বরি কত নিদ্রা যাও।
মোক খাইল কালনাগে চক্ষু মেলি চাও ॥

একটি উন্মুখ জীবন অকস্মাৎ ছিন্নমূল তরুর মত ধূলিতে লুটাইয়া পড়িল—অতৃপ্তির একটি সুগভীর হতাশা লইয়া সে এক উৎসব-দীপালোকিত জন-কোলাহলপূর্ণ রাজপুরী হইতে বিদায় লইল—তারপর এই বিয়োগান্তক কাব্যের করুণ কাহিনীর উপলক্ষ্যটুকু মাত্র হইয়া শ্মশানের দগ্ধ অঙ্গারের মত ইহার এক প্রান্তে পড়িয়া রহিল।

আর একটি চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। তিনি মনসা। মনসাকে দেবতা বলিয়াই সর্বত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন বাংলা সমাজের পরিকল্পিত নিজস্ব এই দেবতা যে কোন বিষয়েই সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই, এই চরিত্রটি আলোচনা করিলে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। মানুষের কতকগুলি সামাজিক দায়িত্ব আছে বলিয়া তাহাকে সর্বদাই সমাজের বিধি-নির্দিষ্ট গতিপথেই অগ্রসর হইতে হয়, সেইজন্য একটা নির্দিষ্ট নৈতিক মানের নীচে তাহার নামিবার উপায় নাই। কিন্তু এই তথাকথিত দেবতার তেমন কোন সামাজিক কিংবা নৈতিক দায়িত্ব নাই; সেইজন্য তাহার চরিত্রের মধ্যে যথেচ্ছাচারিতা প্রবল ভাবে প্রশ্রয় পাইয়াছে—এই দিক দিয়াই তিনি মানুষের চাইতে হীন। নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য মনসা হীনতম উপায়ে অন্নের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করিয়া চাঁদের ছয়টি শিশুপুত্রের প্রাণ নাশ করিলেন। এই শিশুহত্যার ব্যাপারে পুতনা চরিত্রের সঙ্গে তাঁহার কোন পার্থক্য নাই। সামান্য অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি হীনতম প্রতিহিংসার পথ সর্বদাই সন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছেন। এই হীন চরিত্রটিকে যথার্থই চরম কাপুরুষ বলিয়াও চিত্রিত করা হইয়াছে। যখন তিনি চাঁদ সদাগরের প্রাসাদ-বাটী বিনষ্ট করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা চাঁদ হিন্তালের যষ্টি কাঁধে করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ 'প্রাণ লইয়া পদ্মাবতী উঠি দিল রড়।'

এই তথাকথিত দেবতা বাঙ্গালী কবির কল্পনায় মানুষের সম্মুখে প্রাণভয়ে ভীত;

অতএব তিনি আদর্শের অমৃতলোক-বিহারিণী নহেন। আবার ঝালু মালুর বাড়ীতে যখন মনসা পূজা হইতেছিল, দৈবাৎ চাঁদ সদাগর সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন ; তাঁহার স্কন্ধে হিন্তালের যষ্টি দেখিয়া,—'ভয়ে চমকিত হৈল মনসার মন'।

চাঁদ সদাগর তাঁহার আরাধ্য দেবতাদিগকে পূজা করিয়া যখন বাণিজ্য-যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন মনসার একটি বড় করুণ চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে। দেবদেবীগণ যখন চাঁদ সদাগরের পূজা গ্রহণ করিতেছেন, তখন মনসা বৃদ্ধার বেশে কাঙালিনীর মত সেই পূজাস্থানের এক প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিবার জন্য চাঁদ তাঁহার ভৃত্যকে আদেশ দিলেন,

চান্দর কোপ দেখি পদ্মার ভয় অতিশয়।
যোড় হাতে কহে দেবী করিয়া বিনয়॥

মানুষের নিকট দেবতার এই যোড় হাত করিবার চিত্রটি কেবল মাত্র বাঙ্গালী কবির পরিকল্পনায়ই সম্ভব হইয়াছে। যে দেশের কবি ভগবানকে দিয়া ভক্তের 'পদ-পল্লব' মস্তকে ধারণ করাইয়াছেন, সেই দেশেরই কবি দেবতাকে মানুষের সম্মুখে এমনভাবে করযোড়ে দাঁড়াইবার কথা কল্পনা করিতে পারেন। মনসা বিনীতভাবে যোড় হাত করিয়া চাঁদ সদাগরকে বলিলেন,—

পদ্মা বলে কোপ এড সাধুর তনয়।
অবধান কর আমি হই পরিচয়॥
কোপ পরিহর সাধু আমি নাগজাতি।
মহাদেবের কন্যা আমি নাম পদ্মাবতী॥
যাত্রাকালে দেব পূজ ফুলে আর ধূপেতে।
তেকারণে আসিলাম তোমার পূজা খাইতে॥
মোর তরে কোপ এড় সাধুর কুমার।
মোর তরে ফুল জল দেও একবার॥

চাঁদ সদাগর ব্যতীত অন্য কেহ হইলে হয়ত দেবতার এই কাতর প্রার্থনায় তাঁহার মানব-হৃদয় বিগলিত হইত। কিন্তু চাঁদ ইহার কি প্রত্যুত্তর দিলেন ?

চান্দ বলে কাণী তোর লাজ নাই চিতে।
কোন্ মুখে আইলি তুই মোর পূজা খাইতে॥
যেই হাতে পূজি আমি শঙ্কর ভবানী।
সেই হাতে পূজা খাইতে চাহ দুষ্ট কাণী॥

শুধু এই পর্যন্তই নহে,—

তর্জে গর্জে চান্দ হেতাল লইয়া লাফে।
কলার বাকল হেন পদ্মার প্রাণ কাঁপে॥
দন্তে দন্তে দশনে করে কডমড।
প্রাণ লইয়া মনসা উঠিয়া দিল রড॥
ত্রাসে যায় পদ্মাবতী আলুথালু চুলি।
পাছে পাছে ধায় চান্দ ধর ধর বলি॥

দেবতার মাহাত্ম্য রচনা করিতে বসিয়াও বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণ দেবতাকে যে কি চক্ষে দেখিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাওয়া যাইবে? মনসা-মঙ্গলকাব্যে ইহাই যদি দেবতার পরিচয় হইয়া থাকে, তবে বলিতে হয়, মনসা-মঙ্গল কোন দেবমাহাত্ম্যসূচক কাব্য নহে, ইহা প্রকৃতপক্ষে মানুষেরই মহিমা-কীর্তন। ইহার একটি কারণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মনসাকে দেবতা বলিয়া কল্পনা না করিয়া তাঁহাকে মধ্যযুগের অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তির প্রতীকরূপেই কল্পনা করা হইয়াছে। সেইজন্য আত্মরক্ষায় নিরুপায় সমাজের সমগ্র ঘৃণা তাহার উপরই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। অত্যাচারিতের নিকট বার বার সেই দেবতার অপমান ও পরাজয় বর্ণনার ভিতর দিয়া লাঞ্ছিত সমাজ সে'দিন নিজের দুর্গতির মধ্যে এমনি ভাবে মানসিক সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেরই অল্লাধিক এই দাবী আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

লৌকিক চণ্ডীপূজার ইতিহাস—চণ্ডীমঙ্গলকাব্য—চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ

লৌকিক চণ্ডীপূজার ইতিহাস

বাংলার লৌকিক শক্তিদেবতাদিগের মধ্যে চণ্ডীর প্রকৃতিই সর্বাপেক্ষা জটিল। ইহার কারণ, বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিবিধ স্থানীয় অবস্থা হইতে অনেক সময় পরস্পর স্বতন্ত্র প্রকৃতির যে সকল স্ত্রীদেবতার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহাই কালক্রমে এক সাধারণ চণ্ডী নামের মধ্যে আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছে। পুরাণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, সকল শক্তি-দেবতাই কালক্রমে শিবের একমাত্র পত্নীরূপে পরিণতি লাভ করিলেও, ইহাদের উদ্ভবের ইতিহাস পরস্পর স্বতন্ত্রই ছিল। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' (প্রকৃতি খণ্ড, ৫৭ অধ্যায়) শক্তিদেবতার এই বিভিন্ন নামগুলি পাওয়া যায়,—যেমন দুর্গা, নারায়ণী, ঈশানী, বিষ্ণুমায়া, শিবা, সতী, নিত্যা, সত্যা, ভগবতী, সর্বাণী, সর্বমঙ্গলা, অম্বিকা, বৈষ্ণবী, গৌরী, পার্বতী, সনাতনী। ইহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 'the critical eye will see that they are not merely names, but indicate different goddesses who owed their conception to different historical conditions but who were afterwards identified with the one goddess by the usual mental habit of the Hindus.' [১]

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও এই প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতির লৌকিক চণ্ডীর পূজা হইয়া থাকে, যেমন, নাটাই চণ্ডী, ঘোর চণ্ডী, উড়ন চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, শুভচণ্ডী (চলিত কথায় সুবচনী), খাড়া শুভচণ্ডী, রথাই চণ্ডী, উদ্ধার চণ্ডী, রণচণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, বসন চণ্ডী, অবাক চণ্ডী, কলাই চণ্ডী, ককাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, মঙ্গল চণ্ডী,—মঙ্গল চণ্ডীর আবার কতকগুলি প্রকার-ভেদ আছে, যেমন,—বারমেসে মঙ্গলচণ্ডী বা নিত্যা মঙ্গলচণ্ডী, জয়মঙ্গলচণ্ডী, হরিষ মঙ্গলচণ্ডী, কুলুই মঙ্গলচণ্ডী,

---

১ R. G. Bhandarkar, *Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems* (1913), 143-44.

সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী, উদয় মঙ্গলচণ্ডী, ভাউত্তা মঙ্গলচণ্ডী, মঙ্গল সংক্রান্তি ইত্যাদি।[১] বর্ধমান জিলার মেমারি রেল স্টেশনের দুই মাইল দূরবর্তী কলসপুর নামক গ্রামে শিবা চণ্ডী নামে এক দেবী আছেন; তিনি শৃগালের উপর আরূঢ়া। বর্তমানে প্রস্তর নির্মিত শৃগাল মূর্তিটি স্থানান্তরিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে পূজিতা হইলেও দেবীর ধ্যানে 'বামপাদস্থ ফেরুপৃষ্ঠোপরি স্থিতাম্' বলিয়া উল্লেখ করা হয়; ইহাতে বাংলার শৃগাল পূজা যে লৌকিক চণ্ডী পূজার মধ্যে আসিয়া কি ভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

চণ্ডীকে মঙ্গল বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, চণ্ডী ভীষণা প্রকৃতির (malignant) দেবী, তাঁহার নিকট হইতে অমঙ্গলেরই আশঙ্কা বেশী—সেইজন্য তাঁহাকে প্রসন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে কিংবা তাঁহার অপ্রিয় নামটি এড়াইয়া চলিবার প্রবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ একটি বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা তাঁহার উল্লেখ করা হয়। ইহাকেই ইংরেজীতে euphemism বলে। বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে শীতলা বলিয়া উল্লেখ করিবার ইহাই উদ্দেশ্য। উপরি-উদ্ধৃত লৌকিক স্ত্রী-দেবতাসমূহ এক চণ্ডী নামের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইঁহাদের প্রকৃতি যে পরস্পর স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিক পট-ভূমিকা হইতে যে তাঁহাদের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বাংলার প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজের মধ্যে এখনও গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উল্লিখিত স্ত্রী-দেবতাদিগের অনেকেই এখনও তাহাতে অনুরূপ উদ্দেশ্যে পূজিত হইতেছেন। প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজের সঙ্গে যখন বাংলার সমাজের আভ্যন্তরীণ যোগ নিবিড়তর ছিল, তখনই তাহা হইতে এই দেবতাদিগের পরিকল্পনা বাংলার উচ্চতর সমাজেও গৃহীত হইয়াছে। আদিবাসী সমাজ হইতে যে দুই একটি এই শ্রেণীর দেবতা বা উপদেবতার পরিচয়ের এখনও সন্ধান পাওয়া যায়, নিম্নে তাহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে; বলা বাহুল্য বাংলা দেশে সংস্কৃতের প্রভাব বশতঃ এই সকল অনার্য দেবতার নাম পরবর্তী কালে এমন ভাবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের মৌলিক পরিচয়

[১] পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পূজিত কয়েকটি বিভিন্ন প্রকৃতির মঙ্গলচণ্ডী পূজার বিবরণ ও তাঁহাদের সম্ভাবিত অনার্য সংস্রব সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—Tarak Chandra Roy Chaudhuri and Sarat Chandra Mitra, 'On the Cult of the goddess Mangal Chandi in Eastern Benga.' *J. Anth. S. B.* XIII (1927), 103-112.

প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি দুই একটি ক্ষেত্রে ইঁহাদের যে সন্ধান পাওয়া যায়, সেই সম্বন্ধেই এখানে উল্লেখ করা যাইবে।

এখানে চণ্ডীর কথাই আলোচনা করা যাক। চণ্ডী বৈদিক দেবতা নহেন; রামায়ণ, মহাভারত কিংবা প্রাচীন কোন পুরাণে এই দেবতার উল্লেখ মাত্র নাই। পরবর্তী কয়েকখানি সংস্কৃত পুরাণ, যথা 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', 'দেবীভাগবত', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ', 'হরিবংশ' প্রভৃতিতে এই দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। ইহা হইতেই মনে হয়, আর্যেতর কোনও সমাজ হইতে এই দেবী কালক্রমে পূর্ব ভারতীয় আর্য সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন।

চণ্ডী শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃত, অর্থাৎ কোন অনার্য ভাষা হইতে পরবর্তী কালে সংস্কৃত শব্দকোষে স্থান লাভ করিয়াছে। চণ্ডী শব্দটি সম্ভবতঃ অস্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত। দ্রাবিড় ভাষাভাষী দৃশ্যত আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) জাতীয় ছোট নাগপুরের অধিবাসী ওরাওঁ নামক উপজাতির মধ্যে 'চাণ্ডী' নামে এক শক্তিদেবীর পরিচয় লাভ করা যায়। তাঁহার বৃত্তান্ত এই প্রকার[১]—

চাণ্ডী স্ত্রী-দেবতা, তিনি প্রসন্ন হইলে পশু-শিকারে কৃতিত্ব ও যুদ্ধে জয় লাভ করা যায়। অবিবাহিত ওরাওঁ যুবকদিগের এই দেবতাই প্রধান দেবতা। গোলাকৃতি এক খণ্ড স্বাভাবিক প্রস্তরের মধ্যে তাঁহার পূজা হয়। যখন ওরাওঁ যুবকগণ শিকারে বাহির হয়, তখন তাহারা চাণ্ডীশিলা নিজেদের সঙ্গে রাখে—তাহাদের বিশ্বাস ইহা সঙ্গে থাকিলে শিকারে ব্যর্থকাম হইবার আশঙ্কা নাই। প্রত্যেক ওরাওঁ পল্লীতে, সাধারণত কোন পর্বতের ঢালু জায়গায়, চাণ্ডী-টাঁড় নামক এক কিংবা একাধিক স্থান থাকে; সেখানে স্বাভাবিক এক খণ্ড প্রস্তরের মধ্যে চাণ্ডীর অধিষ্ঠান কল্পনা করা হইয়া থাকে। একটি বড় চাণ্ডীশিলার চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক শিলা থাকে, তাহাদিগকে চাণ্ডীর ছেলেপিলে বলা হয়। (পশ্চিম বঙ্গে শিলারূপী গ্রাম্য দেবতার চারিপার্শ্বেও এই শ্রেণীর শিলাখণ্ড থাকে, তাহা আবরণ দেবতা নামে পরিচিত।) ওরাওঁদিগের বিশ্বাস চাণ্ডীশিলা বৎসরের পর বৎসর অলক্ষ্যে বাড়িতে থাকে। চাণ্ডী সাধারণত অবিবাহিত যুবকদিগেরই দেবতা, তাহারাই প্রধানত তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।

মাঘী-পূর্ণিমাদিনে ইঁহার বাৎসরিক পূজার অনুষ্ঠান হয়। সাত আট দিন পূর্ব

[১] S. C. Ray, *Oraon Religion and Customs* (Ranchi, 1928), 60-65.

হইতেই পূজার আয়োজন করা হইয়া থাকে, তখন হইতেই ওরাওঁ যুবকগণ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সকলকে এই উৎসবের জন্য ধেনো মদ তৈরী করিবার জন্য বলিতে থাকে। হাটের দিন একটি ছাগল ক্রয় করা হয়। মাঘী-পূর্ণিমার দিন সকাল হইতেই ওরাওঁ যুবকগণ গ্রাম্য আখড়া বা নৃত্যাঙ্গিনায় সমবেত হইতে থাকে। গ্রাম্য পাহানের স্ত্রী স্থানটি পূর্ব হইতেই গোবরমাটি দিয়া পরিষ্কার করিয়া নিকাইয়া রাখে। সমবেত যুবকদিগের মধ্যে একজনকে পাহান বা সেই দিনকার অনুষ্ঠানের পুরোহিত নির্বাচন করা হয়। পাহান-যুবক সঙ্গীদিগকে লইয়া পূজা ও ভোজের উপকরণ এবং বাদ্যভাণ্ড সহ চাণ্ডীটাঁড়ে যায়। সেখানে গিয়া পাহান-যুবক চাণ্ডী-শিলায় তিনটি সিঁদূরের ফোঁটা আঁকিয়া দেয়। অন্যান্য যুবকগণ চাণ্ডী-শিলার উপর কিছু আতপ চাউল ছড়াইয়া দেয়। বলির ছাগলটিকে কিছু আতপ চাউল খাইতে দেওয়া হয়; যখন ইহা চাউল খাইতে থাকে, তখন এক কোপে ইহার শিরশ্ছেদ করা হয়। সেইখানেই ইহার মাংস রান্না করা হয় এবং তাহাদ্বারা ভোজ নিষ্পন্ন হয়। অবিবাহিত ওরাওঁ যুবক ব্যতীত অন্য কেহ এই ভোজে যোগদান করিতে পারে না। সন্ধ্যা পর্যন্ত চাণ্ডীটাঁড়ে এই প্রকার উৎসব চলিতে থাকে। সন্ধ্যার পর বাদ্যভাণ্ডসহ যুবকগণ গ্রামে ফিরিয়া আসে। যুবক ও যুবতীগণ গ্রামের আখড়া বা নৃত্যাঙ্গিনায় আসিয়া সমবেত হয়, অন্যান্য সকলে ঘরে ফিরিয়া যায়। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত যুবক-যুবতীগণ সমবেত ভাবে আখড়ায় নৃত্য করিয়া থাকে।

উল্লিখিত চাণ্ডী ব্যতীত ওরাওঁদিগের সহরুল উৎসবের সময় আর এক চাণ্ডীর পূজা হইয়া থাকে, তাঁহার নাম মূর্তি চাণ্ডী। কোন বৃক্ষের নীচে অর্ধ-প্রোথিত প্রস্তর খণ্ডে মূর্তি চাণ্ডী অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহার পূজার আচার পূর্বোল্লিখিত চাণ্ডী-শিলা পূজার আচার হইতে স্বতন্ত্র।

এখন বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে, এই চাণ্ডী বা মূর্তি চাণ্ডীর সঙ্গে বাংলা-দেশে পূজিত লৌকিক চণ্ডীর কোন সম্পর্ক আছে কি না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যে দুইটি কাহিনী আছে, তাহাদের একটির নায়ক এক অনার্য ব্যাধ-যুবক, তাহাতে চণ্ডী নামক যে দেবতার মহিমা কীর্তিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে উল্লিখিত চাণ্ডীর চরিত্রগত অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এই চণ্ডীও মৃগয়া-জীবীদিগেরই দেবতা, পশু-শিকারে সাফল্য কামনা করিয়াই তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। উক্ত চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীতে সুস্পষ্টই বর্ণিত আছে যে, এই দেবী পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং অস্পৃশ্য ব্যাধ সমাজই তাঁহার অনুগৃহীত।

তিনি ইচ্ছা করিলে শিকারীর দৃষ্টি হইতে বনের পশু লুকাইয়া রাখিতে পারেন—অতএব তিনি প্রসন্ন থাকিলেই মৃগয়ায় সাফল্য লাভ করা যায়। এই দেবতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 'some of the spirits, however, such as Chandi, the Goddess of hunting and war, are remarkable for shape-shifting which is indeed a characteristic of the spirits and deities of the Oraon pantheon.'[১] অর্থাৎ কতকগুলি উপদেবতা, যেমন, মৃগয়া ও যুদ্ধের দেবতা চাণ্ডী, বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে—ওরাওঁ দেব-সমাজের দেবতা ও উপদেবতাদিগের ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ব্যাধ-কাহিনীর দেবতা চণ্ডীও একাধিকবার রূপ পরিবর্তন করিয়া ব্যাধ-যুবককে ছলনা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ স্বর্ণ-গোধিকা ও পরে ষোড়শী যুবতী মূর্তিতে এই দেবী ব্যাধ যুবকের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ওরাওঁ সমাজের উপরি-বর্ণিত চাণ্ডী ও চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধকাহিনী-বর্ণিত চণ্ডীদেবীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই—উভয়েই অভিন্ন।

ছোটনাগপুরের মুণ্ডাভাষী মৃগয়াজীবী বীরহোড় জাতির মধ্যে মৃগয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে চাণ্ডী বা চাণ্ডীবোঙ্গা নামক এক দেবতা আছেন। তাঁহার কোন মূর্তি নাই। বীরহোড়গণ যে পর্ণকুটীরে বাস করে, তাহাব নিকটবর্তী কোনও স্থানের বৃক্ষতলে এক কিংবা একাধিক প্রস্তরখণ্ড চাণ্ডীবোঙ্গা কর্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া মনে করা হয়। গোষ্ঠীগতভাবে দল বাঁধিয়া (communally) শিকারে বাহির হইবার পূর্বে চাণ্ডীবোঙ্গার নিকট শিকারের সকল সরঞ্জাম, যথা জাল, দড়ি, কুঠার, কাঠি ইত্যাদি স্তূপীকৃত করিয়া আনিয়া রাখা হয় এবং শিকারে সাফল্যের জন্য চাণ্ডীদেবী বা বোঙ্গার নিকট মোরগ বলি দেওয়া হয়। তারপর শিকার হইতে ফিরিয়া এই 'চাণ্ডীতলা'য় আসিয়াই শিকারে নিহত পশুর মাংস ভাগ করা হয়।[২] মৃগয়া-জীবী বীরহোড় জাতির চাণ্ডীই একমাত্র মৃগয়ায় সাফল্যদাত্রী দেবতা।[৩] পালামৌ জিলার অস্ট্রিক্‌ভাষী করোয়া উপজাতির মধ্যে চাণ্ডীদেবীর নাম শুনিয়াছি।

---

[১] S. C. Roy, p. 3.

[২] S. C. Roy, *The Birhors* (Ranchi, 1925), p. 50. এই গ্রন্থে এই বিষয়ের একটি আলোকচিত্রও দেওয়া হইয়াছে।

[৩] ঐ, pp. 298-99.

বিহারের অন্তর্গত ছোটনাগপুর বিভাগের বিভিন্ন উপজাতি অঞ্চলে পূজিতা মৃগয়ার অধিষ্ঠাত্রী এই দেবীর নাম চাণ্ডী ; S. C. Roy (শরৎচন্দ্র রায়) প্রণীত ছোটনাগপুরের বিভিন্ন উপজাতির পরিচয়-মূলক গ্রন্থে ইহার নাম 'চিহ্নবর্জিত ইংরেজি অক্ষরে' লিখিত হইয়াছে Chandi। কিন্তু তথাপি ইহার উচ্চারণ চাণ্ডী—'চান্দী' কিংবা 'চণ্ডী' নহে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় নৃতত্ত্ববিৎ আজীবন ওরাওঁ অধ্যুষিত অঞ্চল রাঁচী জেলার অধিবাসী উক্ত রায় বাহাদুর স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার একটি বাংলা প্রবন্ধেও লিখিয়াছেন,—'ওরাওঁ প্রভৃতি জাতির "চাণ্ডী" নামক দেবতার সহিত হিন্দু চণ্ডীদেবীর সাদৃশ্য দেখা যায়। অর্ধরাত্রে উলঙ্গ হইয়া "চাণ্ডী"র অবিবাহিত যুবক পূজারী "চাণ্ডীস্থানে" গিয়া পূজা করে (শরৎচন্দ্র রায়, রাঁচি, 'ভারতের মানব ও মানব-সমাজ', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৫শ বর্ষ [১৩৪৫ সাল], ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২৪৭)'। এই কথা একটু বিস্তৃতভাবে বলিবার এই প্রয়োজন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত দ্বিজ মাধব প্রণীত 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে'র সম্পাদক মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, 'আমরা অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বিহার, উড়িষ্যা এবং দিনাজপুর ও মালদহ অঞ্চলের ওরাওঁগণ চান্দী নামে এক দেবীর পূজা করে বটে, কিন্তু চাণ্ডী-উচ্চারিত দেবী তাহাদের অজ্ঞাত। চিহ্ন-বর্জিত ইংরেজি অক্ষরে চান্দীকে লেখা হয় Chandi ; ইহাকে চাণ্ডী পড়া যাইতে পারে। এই ভাবেই চাণ্ডীর উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ('দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত' [১৯৫২], ভূমিকা, পৃষ্ঠা ২।/০)।' কিন্তু উক্ত স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের উক্তি হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, দেবীর নাম চাণ্ডী ; অতএব 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে'র সম্পাদক মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের ফলে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই অঞ্চলে 'চান্দো' নামক এক দেবতা আছেন, কিন্তু চান্দী নামক কোন দেবতা নাই। 'চান্দো' দেবতার প্রকৃতি স্বতন্ত্র।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, আদিবাসী ওরাওঁ সমাজ এই দেবতার পরিকল্পনা ও চাণ্ডী নামের জন্য তাহার পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু প্রতিবেশী সমাজের নিকট ঋণী, না পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু সমাজই এইজন্য তাহার এই আদিবাসী প্রতিবেশীর নিকট ঋণী। একথা সত্য যে, ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতির সমাজ বহুকাল যাবৎ হিন্দু সমাজের সঙ্গে

[১] S. C. Roy, 3.

প্রতিবেশী রূপে বাস করিবার ফলে হিন্দুধর্মেরও কিছু কিছু উপকরণ তাহার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী খৃস্টীয় দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল—সেই সময়ে এই দুই সমাজের মধ্যে সম্পর্ক বর্তমান কালের মত এত ঘনিষ্ঠ ছিল না। অতএব বর্তমানে ওরাওঁ সমাজের মধ্যে কিছু কিছু হিন্দুধর্মের উপকরণ দেখিতে পাওয়া গেলেও, ইহা দ্বারা সাত শত কিংবা আট শত বৎসর পূর্বেকার অবস্থা অনুমান করা যায় না।

চণ্ডী বৈদিক দেবতা নহেন; রামায়ণ, মহাভারত কিংবা প্রাচীন কোন পুরাণে এই দেবতার উল্লেখ মাত্র নাই। প্রাচীনতর সংস্কৃত অভিধানেও এই নামটির সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। এমন কি 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' হইতে উদ্ধৃত শক্তি-দেবতার নামের তালিকার মধ্যেও চণ্ডীর উল্লেখ নাই, অর্থাৎ 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে'ও দুর্গা, নারায়ণী ইত্যাদি নামের সঙ্গে চণ্ডী নামটি স্থান পায় নাই। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী কালে রচিত কয়েকখানি সংস্কৃত পুরাণ, যেমন 'দেবী-ভাগবত,' 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ,' 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ,' 'হরিবংশ' প্রভৃতিতে এই দেবীর নাম উল্লেখিত আছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন পুরাণ একেবারে অর্বাচীন না হইলেও, ইহাদের যে সকল অংশে চণ্ডী কিংবা চণ্ডিকার উল্লেখ আছে, তাহা যে পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহা হইতেই মনে হয়, আদিবাসী সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়াই এই দেবী কালক্রমে উচ্চতর হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। চণ্ডী শব্দটির গঠন দেখিয়াই মনে হয় যে, ইহা অনার্য ভাষা হইতে আগত। মৌলিক শব্দটি সম্ভবতঃ চাণ্ডীই ছিল—ক্রমে অর্বাচীন সংস্কৃতে তাহা চণ্ডী, চণ্ডিকা, চণ্ডেশ্বরী, চণ্ডা ইত্যাদি রূপ লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা মূলতঃ যে এক, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই চণ্ডী যে ব্যাধ ও পশুকুলেরই দেবতা, চণ্ডীমঙ্গলকাব্যগুলির একাংশ হইতে তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। 'গোহিংসক' রাঢ় ব্যাধ-সন্তান কালকেতুই তাঁহার প্রথম পূজারী। কালকেতুর বিক্রমে পরাজিত হইয়া পশুকুল এই চণ্ডীরই শরণাপন্ন হইয়াছে। শূকর মাংসের মত অস্পৃশ্য মাংসও চণ্ডীপূজারই উপকরণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই ভাবে অস্পৃশ্য ব্যাধ-সমাজে জন্ম লাভ করিয়া ক্রমে আর্য সমাজের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে এই দেবতার প্রভাব স্থাপিত হইতে লাগিল এবং ক্রমে পৌরাণিক একটি প্রসিদ্ধ স্ত্রীদেবতার চরিত্র পার্বতীর সঙ্গে এক হইয়া এই চণ্ডী পরবর্তী হিন্দুর

দেব-সমাজে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন। পরবর্তী কালে হিন্দু ভাস্কর্যে গঠিত কোন কোন চণ্ডী দেবীর মূর্তির মধ্যে পশুরাজ সিংহ, হস্তী ও গোধিকা ক্ষোদিত দেখিয়া এই দেবতা যে মূলতঃ আরণ্য কোন জাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাংলার প্রাচীন (obsolete) ঐন্দ্রজালিক (magical) ছড়ায় চণ্ডীকে হাড়ীর ঝি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মনসার উৎপত্তি সম্পর্কে বলিয়াছি যে, মনসার সহচরী নেতাকেও ধোপার ঝি বলিয়া উল্লেখ করা হইত। চণ্ডীকে হাড়ীর ঝি বলিবার তাৎপর্য কি? পশ্চিম বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর হাড়ী জাতি যে এতদ্দেশীয় কোনও আদিম অনার্যভাষী জাতির শাখা হইতে উদ্ভূত, এ' বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা হইতেও চণ্ডীর মৌলিক অনার্য সংস্রব সূচিত হয়। এখানে মনে হইতে পারে যে, কোন হাড়ী জাতীয় লোকের কন্যা তাহার কতকগুলি অলৌকিক (mystic) শক্তির জন্য নিম্নশ্রেণীর সমাজে দেবী বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে, কালক্রমে সে স্ত্রীদেবী চণ্ডীর সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পিতা হয়—সেইজন্যই চণ্ডীকে সাধারণ সমাজে হাড়ীর ঝি চণ্ডী বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

এই কথা সত্য যে, চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের মধ্যে যে দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনী আছে, তাহাদের মধ্যে কালকেতুব্যাধ-কাহিনীর চণ্ডী উক্ত ব্যাধ সমাজ হইতে আগতা হইলেও, কালক্রমে বাংলার সমাজে চণ্ডী নামটি অন্যান্য সূত্র হইতে আগত স্ত্রী-দেবতার উপরও প্রয়োগ করা হইতে থাকে। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের দ্বিতীয় কাহিনী বা ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে ব্যাধ ও পশুর সংস্রবহীন যে মঙ্গলচণ্ডীর উল্লেখ আছে, তিনি কোন্ সূত্র হইতে কবে আসিয়া বাংলার সমাজে পূজিতা হইতেছেন, তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া জানিবার উপায় নাই। এই বিষয়ে যাহা অনুমান করা হইয়া থাকে, তাহা এখানে ক্রমে ক্রমে উল্লেখ করিয়া তাহাদের যৌক্তিকতা বিচার করা যাইতেছে।

বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রে সকল স্ত্রীদেবতাকেই শক্তিরূপিণী বলিয়া কল্পনা করা হইত। তাঁহাদের মধ্যে বৌদ্ধ তন্ত্রোক্ত বজ্রতারার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকে অনুমান করেন, বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী বজ্রতারা পরবর্তী কালে বাংলার লৌকিক দেবী মঙ্গলচণ্ডীতে পরিণত হইয়াছেন।[১] কিন্তু 'সাধনমালা'য় বজ্রতারার যে সাধনার

---

[১] চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯০০

কথা আছে, তাহাতে তাঁহাকে পরিপূর্ণ শক্তিদেবতা বলিয়া কল্পনা করা হইলেও, তাঁহার মধ্যে বাংলার লৌকিক দেবী চণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডীর বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায় না। বজ্রতারার নিম্নোদ্ধৃত ধ্যান হইতেই তাহা প্রতীয়মান হইবে,—

মাতৃমণ্ডলমধ্যস্থাং তারাদেবীং বিভাবয়েৎ।
অষ্টবাহুং চতুর্বক্ত্রাং সর্বালঙ্কার-ভূষিতাম্ ॥
কনকবর্ণনিভাং ভব্যাং কুমারীলক্ষণোজ্জ্বলাম্।
পঞ্চবুদ্ধমহামকুটীং বজ্রসূর্যাভিষেকজাম্ ॥
নবযৌবনলাবণ্যাং চলৎকনককুণ্ডলাম্।
বিশ্বপদ্মসমাসীনাং রক্তপ্রভাবিভূষিতাম্ ॥
বজ্রপাশতথাশঙ্খসচ্ছরোদ্যতদক্ষিণাম্।
বজ্রাঙ্কুশোৎপলধনুস্তর্জনীবামধারিণীম্ ॥[১]

উদ্ধৃত ধ্যানে দেবীর একটিমাত্র বিশেষণে মঙ্গলচণ্ডীর একটি গুণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—তাহা অষ্টবাহু। বজ্রতারা দেবী অষ্টবাহুবিশিষ্টা। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, অষ্ট বা আট সংখ্যাটি মঙ্গলচণ্ডীর পক্ষে শুভসূচক এবং ঐন্দ্রজালিক (magic) গুণ-সম্পন্ন। অষ্ট দূর্বা-তণ্ডুল দ্বারা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিতে হয়, তাঁহার মঙ্গলগানের নাম অষ্টাহ গীত, অর্থাৎ আট দিনে তাহা গাহিয়া শেষ করিতে হয়। অতএব মঙ্গলচণ্ডীর এই একটি গুণ বৌদ্ধ বজ্রতারার পরিকল্পনা হইতেই হউক, কিংবা অন্য কোনও ক্ষেত্র হইতেই হউক আসিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। মঙ্গলচণ্ডী দেবী 'রক্তপ্রভা-বিভূষিতা'ও বটেন, তবে ইহা শক্তি দেবতা মাত্রেরই একটি সাধারণ গুণ হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত উদ্ধৃত ধ্যানে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী কিংবা মঙ্গলচণ্ডীর আর কোনও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না।

বজ্রযান বৌদ্ধসমাজে বজ্রধাত্রীশ্বরী বা বজ্রধাত্বেশ্বরী নামে এক শক্তি দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই দেবী ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ বজ্রসত্ত্বের শক্তিস্বরূপিণী। তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে এই দেবীর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বজ্রসত্ত্বের সঙ্গে তাঁহার মূর্তিও সর্বত্রই পূজিত হইত। 'সাধনমালা'য় বজ্রধাত্বেশ্বরীর যে সাধনার কথা উল্লেখ

[১] সাধনমালা, ৯৩

আছে, তাহাতে তাঁহার সহিত সর্প, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি পশুরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

বজ্রধাত্বীশ্বরীঃ মারীচীং দ্বাদশভুজাং রক্তাং ষণ্মুখীং লম্বোদরাং জ্বলৎপিঙ্গলোর্ধ্ব-কেশাং কপালমালিনীং সর্পমণ্ডিতমেখলাং ব্যাঘ্র-চর্মাম্বরধরাং···নানাবরাহাকৃষ্য-মাণরথাং···উর্ধ্বকৃষ্ণবরাহৈকমুখীং···ত্রিনেত্রাং ললজ্জিহ্বাং করালবদনামতিভয়ানকা-কারাং চিন্তয়েৎ।[১]

মনে হয়, দেবীর এই পরিকল্পনা অনার্য প্রভাব-প্রসূত, কিন্তু তথাপি ইহার সঙ্গে পূর্বোক্ত চাণ্ডীর কোনও মৌলিক সম্পর্ক আছে কিনা বলা কঠিন। তবে এ'কথা সত্য যে, ইহার সঙ্গেও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের দ্বিতীয় কাহিনীর দেবতা মঙ্গলচণ্ডীরও কোন সম্পর্ক নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই বজ্রধাত্বীশ্বরীই বাংলার লৌকিক শক্তি দেবী বাসুলী নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের মতে বজ্রেশ্বরী হইতে বাসুলী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু 'সাধনমালা'য় বজ্রেশ্বরী নামে কোন দেবীর উল্লেখ নাই, বজ্রধাত্বেশ্বরী বা বজ্রধাত্বীশ্বরীই উক্ত শাক্ত দেবীর প্রকৃত নাম। এই বজ্রধাত্বেশ্বরী দেবীর সহিত কতকগুলি হিংস্র পশুর সংস্রব দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, সম্ভবতঃ অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষী মৃগয়া-জীবীর সমাজ হইতেই এই দেবী বজ্রযান বৌদ্ধ সমাজে গিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বাসুলীর পরিচয় স্বতন্ত্র; তাহার কথা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

মধ্যযুগের বাংলার, বিশেষতঃ রাঢ়ের, সমাজে বাসুলীর বিশেষ প্রভাব বর্তমান ছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাক্‌-চৈতন্যযুগের অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীরই সেবক ছিলেন বলিয়া তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথিতে বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন তন্ত্রে বাসুলীকে মহাবিদ্যাসমূহের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি কারণে মনে হয়, বাসুলী লৌকিক গ্রাম্যদেবতা; পরবর্তী কালে ইঁহার উপর পৌরাণিক প্রভাব বশতঃ ইনি হিন্দু ও বৌদ্ধ পূজায় স্থান পাইয়াছেন। উড়িষ্যার কেওট, রাঢ় প্রমুখ জাতির মধ্যে প্রচলিত ঘোড়ামুখ বাসুলী নামক এক দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়।[২] মনে হয়, ঘোড়ামুখ বাসুলী ও বাংলার বাসুলী একই অনার্য সমাজ হইতে আসিয়াছেন। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'হয়ত ইনি প্রথমে গ্রাম্য-দেবতা ছিলেন, পরে হিন্দু দেবদেবীর পংক্তিতে স্থান পাইয়াছেন, হয়ত বা ইনি দ্রাবিড়-দেশাগতা।' এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয়।

---

[১] সাধনমালা, ১৩৬; [২] প্রিয়রঞ্জন সেন, সা-প-প ৩৫, ১০৪

সমাজে পৌরাণিক দেবতাদিগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, পৌরাণিক পার্বতী ও বাসুলী অভিন্ন হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন। তখন হইতেই বাসুলী দেবীর উপর পৌরাণিক গুণাবলী আরোপ করা হইতে থাকে এবং বাসুলীও তখন চণ্ডী নামে পরিচিত হন। খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে গিয়া যে এই মিলন কার্য সম্পূর্ণ হয়, ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গলে'র নিম্নোদ্ধৃত পদ হইতেই স্পষ্ট তাহা বুঝিতে পারা যাইবে,—

বাসুলী বলেন বাছা শুন প্রাণ জোড়া।
কোথা পাব জোয়ান আপনি ভজি বুড়া॥

বাসুলী নিজেকে বৃদ্ধ স্বামীর বা শিবের পত্নী বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, অর্থাৎ এখানে বাসুলী ও পার্বতী সম্পূর্ণ অভিন্ন। কিন্তু বাসুলীর কোন ধ্যান-মন্ত্রেই তাঁহাকে শিবের পত্নী বলা হয় নাই। কালক্রমে সমাজে হিন্দু পৌরাণিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন পৌরাণিক দেবতার আবরণে সকল লৌকিক দেবতাই আত্মগোপন করিতেছিলেন, তখন পৌরাণিক পার্বতীর মধ্যে বিভিন্ন লৌকিক শাক্তদেবীর পরিকল্পনা শেষ পরিণতি লাভ করিতেছিল। কিন্তু তাহার পূর্বে কি ভাবে যে বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে আগত পরস্পর বিপরীতধর্মী আদর্শগুলি ঐক্য সন্ধান করিতেছিল, তাহাই এখানে উল্লেখ করিব।

বাসুলীদেবীর উৎপত্তির ইতিহাস যাহাই থাকুক, তিনি যে প্রথমতঃ চণ্ডী হইতে স্বতন্ত্র দেবতা ছিলেন, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বাসুলীব সহিত চণ্ডী আসিয়া প্রথম মিলিত হন। নিম্নোদ্ধৃত বাসুলীর ধ্যান ও আবাহন মন্ত্রের মধ্যে এই উভয় দেবতারই একত্র সংমিশ্রণ অনুভব করা যায়,—

ওঁ আয়াতা স্বর্গালোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দূরাভাসসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাসুলী পাতু সা নঃ॥

ওঁ বাসুল্যৈ নমঃ।

ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্যকোটিসমপ্রভাম্॥
রক্তবস্ত্রপরিধানাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্।
অষ্টতণ্ডুলদূর্বাক্তাং অর্চ্চয়েন্মঙ্গলকারিণীম্॥

অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীম্।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ॥[১]

এই ধ্যান ও আবাহন যে মূলতঃ এক দেবতার ছিল না, তাহা উদ্ধৃত অংশ একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথমোক্ত ধ্যানমন্ত্রের উদ্দিষ্টা দেবী বাসুলী ও শেষোক্ত আবাহন মন্ত্রের উদ্দিষ্টা দেবী মঙ্গলচণ্ডী, ইঁহারা পরস্পর স্বতন্ত্র।

পুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর যে ধ্যানের উল্লেখ আছে, তাহাও উদ্ধৃত আবাহন-মন্ত্রের প্রায় অনুরূপ, কিন্তু ধ্যান-মন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত, যথা—

দেবীং ষোড়শবর্ষীয়াং রম্যাং সুস্থিরযৌবনাম্।
সর্বরূপগুণাঢ্যাঞ্চ কোমলাঙ্গীং মনোহরাম্ ॥
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং চন্দ্রকোটিসমপ্রভাম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণ-ভূষিতাম্ ॥
বিভ্রতীং কবরীভারং মল্লিকামাল্যভূষিতাম্।
বিম্বোষ্ঠীং সুদতীং শুদ্ধাং শরৎপদ্মনিভাননাম্ ॥
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং সুনীলোৎপল-লোচনাম্।
জগদ্ধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্বেভ্যঃ সর্বসম্পদাম্।
সংসারসাগরে ঘোরে পোতরূপাং বরাং ভজে ॥[২]

মনে হয়, 'ধর্মপূজা বিধান' সঙ্কলনের সময় অর্থাৎ খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাসুলী ও মঙ্গলচণ্ডী এক হইয়া গিয়া পৌরাণিক চণ্ডীর বেদীতলে আত্মবিসর্জন করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন।

কেহ কেহ অনুমান করেন, তান্ত্রিক শক্তি দেবী বিশালাক্ষী ও বাসুলী অভিন্না।[৩] কিন্তু তাহা সত্য নহে। যদিও সংস্কৃতের প্রভাব বশতঃ বাসুলীকেই বর্তমান সময়ে কোন কোন স্থানে বিশালাক্ষী বলা হইয়া থাকে, তথাপি 'ধর্মপূজা বিধানে' দেখা যায়, বিশালাক্ষী ও বাসুলী ধর্মের দুই স্বতন্ত্র আবরণ দেবতা।[৪] উক্ত পুস্তকেই বিশালাক্ষীর যে ধ্যান-মন্ত্র আছে, তাহা বাসুলীর উপরি-উদ্ধৃত ধ্যান-মন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র। দেবী বিশালাক্ষীর ধ্যান এই প্রকার,

১ রামাই পণ্ডিত, ১০২-৩ ; ২ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতি, ৪৪ ;
৩ চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯০০ ; ৪ রামাই পণ্ডিত, ৫

ওঁ প্রাতঃকালে কুমারী কুমুদ-কলিকয়া জাপ্যমালা জপন্তী
মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়রূপা বিকসিতবদনা চারুনেত্রা বিশালা।
সন্ধ্যায়াং বৃদ্ধরূপা গলিতকুচযুগা মুণ্ডমালা-পতাকা
সা দেবী হেমবর্ণা ত্রিজগত-জননী যোগিনী-যোগমুদ্রা ॥
ওঁ বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ ॥

ওঁ বিশালবদনে দেবি বিশালনয়নোজ্জ্বলে।
দৈত্য-মাংসস্পৃহে দেবি বিশালাক্ষি নমোঽস্তু তে ॥
বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ ॥[১]

ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাসুলী কিংবা পূর্বোল্লিখিত চণ্ডীর সহিত বিশালাক্ষীর কোনই সাদৃশ্য নাই। পরবর্তী চণ্ডীর মিশ্র পরিকল্পনায়ও বিশালাক্ষীর কোন প্রভাব বাসুলীর উপর পতিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

চণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাসুলী কোন দেবী নহেন, তিনি রক্তমাংসে গঠিতা মানবী, নিত্যা নামক কোন বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবীর সিদ্ধা বা ডাকিনী,—

শালতোড়া গ্রামে অতি পীঠ স্থান
নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাসুলী নিত্যা সহচরী
বসতি করয়ে তথা ॥
চণ্ডীদাস কহে সে এক বাসুলী
প্রেম প্রচারের গুরু।
তাহারি চাপড়ে নিদ ভাঙ্গিল
পীরিতি হইল স্থুরু ॥

কেহ অনুমান করেন, এই বাসুলী দ্বিজকন্যা ছিলেন। অতঃপর বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী নিত্যার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ডাকিনী হইয়া যান।[২] চণ্ডীর আবির্ভাবের পূর্বে সমাজে বাসুলীর অত্যন্ত ব্যাপক প্রভাব বর্তমান ছিল—বাংলার প্রাচীন সাহিত্য হইতেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দেবীর প্রকৃত উদ্ভবের ইতিহাস কি? এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। কারণ,

রামাই পণ্ডিত, ৯৭; [২] নব্যভারত ১২, ২৮৩

'ধর্মপূজাবিধান' হইতে তাঁহার যে ধ্যান উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা নিশ্চিতই পরবর্তী কালের রচনা, বিশেষতঃ এই ধ্যানের অনুরূপ বাসুলী মূর্তি আজ পর্যন্ত অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। চণ্ডীদাসের বাসুলী বলিয়া নান্নুরে যে দেবীর এখনও পূজা হইয়া থাকে, তাহার সহিত 'ধর্মপূজা-বিধানো'ক্ত বাসুলীর ধ্যানের কোন মিল নাই। স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, 'বোধ হয় প্রকৃত মূর্তি লুপ্ত হইয়াছে।' কিন্তু তাহা নাও হইতে পারে; হয়ত বর্তমান মূর্তিটি প্রকৃতই প্রাচীন। পরবর্তী কালে দ্বিজ চণ্ডীদাসের নান্নুরে বড়ু চণ্ডীদাসের জনশ্রুতি যখন প্রচার লাভ করিল, তখন বড়ু চণ্ডীদাসের সহিত বাসুলীর সংস্রব হইতেই স্থানীয় এই প্রাচীন সরস্বতীর মূর্তিটি বাসুলী নামেই পরিচিত হইতে লাগিল। কেহ সরস্বতীর এই মূর্তিটির বাগীশ্বরী নাম কল্পনা করিয়া তাহা হইতে বাসলী শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ করিতে চাহিয়াছেন।[১] কিন্তু কোন শব্দের কষ্টকল্পিত ব্যুৎপত্তি অনুমান করিয়া কোন মূর্তির পরিচয় সন্ধান করা যায় না। মূর্তির যথার্থ পরিচয় তাহার গঠনাকৃতিতে। পূর্বেই বলিয়াছি, নান্নুরের তথাকথিত বাসুলীর মূর্তি 'ধর্মপূজা-বিধানে'র পূর্বোদ্ধৃত বাসুলীর ধ্যানের অনুরূপ নয়; অতএব ইহা বাসুলীর মূর্তি নহে। ইহা বৈদিক সরস্বতীর মূর্তি। কিন্তু বাঁকুড়া জিলার ছাতনায় প্রাপ্ত ও বড়ু চণ্ডীদাসের পূজিত বলিয়া পরিচিত বাসুলীর মূর্তিই প্রকৃত বাসুলীর মূর্তি; ইহা পূর্বোদ্ধৃত ধ্যান-মন্ত্রেরও সম্পূর্ণ অনুরূপ। এই মূর্তির ঐতিহ্য প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়।

দাক্ষিণাত্যের মহীশূর ও কর্ণাট অঞ্চলে বিসলমরী বা বিসল মরীআম্মা নামে এক অতি শক্তিশালী গ্রাম্য-দেবতা আছেন।[২] মরী অথবা মরীআম্মা বাংলা দেশের চণ্ডী কথাটির মত দাক্ষিণাত্যের বহু গ্রাম্য স্ত্রী-দেবতার নামের পরেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব উক্ত গ্রাম্য দেবতাটির প্রকৃত নাম বিসল; বাংলায় স্ত্রী-দেবতা বুঝাইতে হইয়াছে বিসলী, অতঃপর বিসুলী, বাসুলী। ধ্বনিতত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মেই এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে তাহা বিসল মরী বলিয়া পরিচিত। উড়িষ্যাতেও এই দেবী বাসুলী বলিয়াই পরিচিত। ইনিও প্রকৃত পক্ষে একটি প্রস্তর খণ্ড মাত্র, তবে তাঁহার অনেকটা নির্দিষ্ট গঠন পাওয়া যায়। প্রস্তরটি ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া ঊর্ধ্ব দিকে উঠিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের এই বিসল মরীই যে বাংলার বাসুলী এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উড়িষ্যার অস্ট্রিক্‌ভাষী জুয়াঙ্

---

১ চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত (১৩৫৬), ৸৵০, ২ H. Whitehead, *The Village Gods of South India* (Calcutta, 1921), 29, 30, 31, 33.

নামক উপজাতির মধ্যেও বাসুলী নামক এক দেবীর পূজা হইয়া থাকে।[১] প্রতিবেশী কোন অনার্য জাতি হইতে তাহারা এই দেবীর নামটি পাইয়া থাকিবে, কিংবা ইহা তাহাদের কোনও মৌলিক দেবীও হইতে পারে। কেহ আবার অনুমান করিয়াছেন, দক্ষিণ ভারতের গ্রাম্য দেবতা সাত ভগিনীর অন্যতমা বাসুআলী দেবাই বাংলার বাসলী। কিন্তু বাসুআলী দেবার প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র; তিনি বৃষবাহনা, কিন্তু বিসল মরীর সাধারণ প্রকৃতির সঙ্গে বাংলার বাসুলীর বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বিশেষতঃ বিসলমরীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা বাসুআলী দেবা হইতে অধিক। অতএব মনে হয়, বিসলমরীই বাংলার বাসুলী, বাসুআলী দেবা বাসুলী নহেন। কেহ আবার অনুমান করেন, বাসুলের পুত্র বাসুলকুমারই বাসুলী। কিন্তু বাসুলী সর্বত্র দেবী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, অতএব এই উক্তিও গ্রহণীয় নহে। এই লৌকিক দেবতার পূজাও আদিম সমাজের প্রস্তরোপাসনার প্রবৃত্তি (fetishism) হইতেই জাত। পৌরাণিক আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এই দেশেও প্রস্তর খণ্ড রূপেই এই দেবতার পূজা হইত। দাক্ষিণাত্যের নিম্ন শ্রেণীর সমাজ ও উচ্চতর বর্ণের হিন্দু সমাজের সুদূর পার্থক্য হেতু নিম্ন শ্রেণীর সমাজে এই দেবতাটির অক্ষত স্বরূপটি আজিও রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু বাংলার সকল স্তরের সমাজেই পৌরাণিক চণ্ডীর প্রভাবের ফলে ইহার পরবর্তী পরিকল্পনায় এই লৌকিক দেবতাটি কতকটা উন্নত হইয়া গিয়াছে। তবে উভয়েই যে এক সূত্র হইতে উদ্ভূত, তাহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। বাংলার লৌকিক দেবী বাসুলী ও দাক্ষিণাত্যের লৌকিক দেবী বিসল মরীর অভিন্নতা হইতেও বাংলায় দ্রাবিড় সংস্কারের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। উড়িষ্যায় বাসুলীর অস্তিত্বও তদ্দেশে দ্রাবিড় সংস্কারেরই অস্তিত্বের অন্যতম নিদর্শন।

ক্রমে চণ্ডী নামটি দাক্ষিণাত্যে মবী বা মরী আম্মা কথাটির মত বিশেষ কোন দেবতার নাম না হইয়া স্ত্রী দেবতা মাত্রেরই প্রায় একটা সাধারণ পদবীর মত হইয়া দাঁড়াইল। অতএব, দেখা যাইতেছে, চণ্ডীর বিশিষ্ট কোন একটি পরিচয় লাভ করা দুষ্কর। ইহার কারণ, মুণ্ডা, দ্রাবিড, বৌদ্ধ, আর্য প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন শক্তি-দেবতার পরিকল্পনা এই চণ্ডীর ভিতর দিয়াই সর্বশেষ পৌরাণিক পার্বতী, অন্নদা বা অন্নপূর্ণায় পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

[১] H. H. Risley, *Tribes and Castes of Bengal*, Vol. I. (Calcutta, 1891), p. 353.

বাংলা চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

চণ্ডীর পরিচয়ের এই অনিশ্চয়তার জন্যই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবির লিখিত চণ্ডীমঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেও তাঁহার চরিত্রে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। লৌকিক কাহিনী বা কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-লহনা-খুল্লনার গল্পই প্রাচীনতম কবিদিগের বর্ণিতব্য বিষয় ছিল। কিন্তু পরবর্তী কবিগণ চণ্ডীমঙ্গলের এই লৌকিক অংশ পরিত্যাগ করিয়া মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর কাহিনীকেই মুখ্য স্থান দিয়াছেন। এই শ্রেণীর কাব্যগুলি 'দুর্গামঙ্গল' 'ভবানীমঙ্গল' বলিয়া অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর পুরাণের অনুবাদ কাব্য আমাদের বর্তমান গ্রন্থে আলোচনার বিষয়ীভূত নহে।

এই চণ্ডী নামধেয় বিভিন্ন প্রকৃতির স্ত্রীদেবতার মধ্যে বিশিষ্ট কোন স্ত্রীদেবতাই যে মঙ্গলচণ্ডী নামে অভিহিতা হইতেন, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনীর দেবতা বিশেষ করিয়াই এই মঙ্গলচণ্ডী।

তাঁহার নাম কেন যে মঙ্গলচণ্ডী হইল এই বিষয়ে কোন কোন সংস্কৃত পুরাণে পাওয়া যায়, 'মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা'।[১] যিনি ভক্তের মঙ্গল-সাধনে দক্ষ তিনিই মঙ্গলচণ্ডী। পুরাণকার যদি এই কথা বলিয়াই নিরস্ত থাকিতেন, তাহা হইলে অবশ্য এই ব্যাখ্যাই মানিয়া লওয়া যাইত, কিন্তু যেহেতু এই অর্বাচীন পুরাণগুলি রচনার বহু পূর্বেই মঙ্গলচণ্ডীর উদ্ভব ও তাঁহার দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য পুরাণগুলিও এই দেবীর সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিতে পারে নাই, এই সম্বন্ধে অনেকগুলি ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছে মাত্র! এই সম্পর্কে 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে'র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি প্রণিধানযোগ্য,—

হর্ষমঙ্গলদক্ষে চ হর্ষমঙ্গলদায়িকে।
শুভে মঙ্গলদক্ষে চ শুভে মঙ্গলচণ্ডিকে॥
মঙ্গলে মঙ্গলার্হে চ সর্বমঙ্গলমঙ্গলে।
সতাং মঙ্গলদে দেবি সর্বেষাং মঙ্গলালয়ে॥
পূজ্যে মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীষ্টদেবতে।
পূজ্যে মঙ্গলবংশস্য মনুবংশস্য সন্ততম্॥
মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃ-দেবি মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলে।
সংসারমঙ্গলাধারে মোক্ষমঙ্গলদায়িনি॥

---

১ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৪৪ অধ্যায়

সারে চ মঙ্গলাধারে পারে চ সর্বকর্মণাম্।
প্রতিমঙ্গলবারে চ পূজ্যে ত্বং মঙ্গলপ্রদে ॥
স্তোত্রেণানেন শম্ভুশ্চ স্তুত্বা মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
প্রতিমঙ্গলবারে চ পূজাং কৃত্বা গতঃ শিবঃ ॥
প্রথমে পূজিতা দেবী শিবেন সর্বমঙ্গলা।
দ্বিতীয়ে পূজিতা সা চ মঙ্গলেন গ্রহেণ চ ॥
তৃতীয়ে পূজিতা ভদ্রা মঙ্গলেন নৃপেণ চ।
চতুর্থে মঙ্গলে বারে সুন্দরীভিঃ প্রপূজিতা ॥
পঞ্চমে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষৈর্নরৈর্মঙ্গলচণ্ডিকা।
পূজিতা প্রতিবিশ্বেষু বিশ্বেশপূজিতা সদা ॥[১]

উদ্ধৃত অংশে ইহাও বলা হইয়াছে যে, মঙ্গলগ্রহ কর্তৃক পূজিতা হইয়াছিলেন বলিয়া এই চণ্ডীর নাম মঙ্গলচণ্ডী। শুধু তাহাই নহে, আরও বলা হইয়াছে যে, মঙ্গল নামে কোন নৃপতি এই চণ্ডীর পূজা করেন, সেইজন্যও তাঁহার নাম মঙ্গলচণ্ডী হইয়া থাকিবে। অথবা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানব কর্তৃক মঙ্গল বারে পূজিতা হন বলিয়াও তাঁহার নাম মঙ্গলচণ্ডী হইয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার যে ঐতিহ্য পূর্ববঙ্গ বা প্রধানতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মঙ্গল নামক এক দৈত্যকে বধ করিয়া চণ্ডী মঙ্গলচণ্ডী আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহারই অনুসরণ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ভবানীশঙ্কর দাসের 'মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা'য় উল্লিখিত হইয়াছে—

মঙ্গল নামে দনুজেক হৈয়া উতপতি।
সুরগণ হিংসা করে সেই দুষ্টমতি ॥
নির্জরা সভার ক্লেশ দেখিয়া প্রচুর।
ভয়ঙ্করীরূপে দেবী বধিলা অসুর ॥
আনন্দ হইল শক্র পাই সিংহাসন।
ভক্তিভাবে অর্চিলেক চণ্ডিকা চরণ ॥
বন্দম ত্রিজগদম্বা দেবী নারসিংহী।
মঙ্গলচণ্ডী নাম হৈল মঙ্গলাসুর হন্তি ॥[২]

১ ঐ ;

২ পৃঃ ১-২

দ্বিজ মাধব, দ্বিজ রামদেব, মুক্তারাম সেন প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের সকল কবিরই চণ্ডীমঙ্গলে এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এখানে দেখা যাইতেছে যে, মঙ্গলাসুরকে বধ করিয়া চণ্ডীর মঙ্গলচণ্ডী নাম হইয়াছে। এই আখ্যায়িকা কোনও পুরাণে নাই। সম্ভবতঃ বহু পরবর্তী কালে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কাহিনীর অনুকরণে এই গল্প রচিত হইয়াছে। কারণ, প্রাচীনতর চণ্ডীমঙ্গল, এমন কি মুকুন্দরামের চণ্ডী-মঙ্গলেও এই কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায় না। মঙ্গলচণ্ডীর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে 'শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে' নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি আছে বলিয়া 'বিশ্বকোষে' উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ভাগবতের কোন্ স্থানে শ্লোকটি আছে, তাহার নির্দেশ না থাকায় এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা গেল না। মনে হয়, ভাগবতে এই শ্লোকটি পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে,—

'সৃষ্টৌ মঙ্গলরূপা চ সংহারে কোপরূপিণী।
তেন মঙ্গলচণ্ডী সা পণ্ডিতৈঃ পরিকীর্তিতা॥'

যখন বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের মধ্যে আত্মগোপন করিতেছিল, তখন কোন কোন তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবী এই মঙ্গলচণ্ডীর মধ্যে আসিয়া আত্মগোপন করেন। মাণিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গলে' দেখিতে পাওয়া যায়, আদিদেব বা ধর্মের শক্তিস্বরূপিণী আদ্যাই চণ্ডীতে পরিণত হইয়াছেন। বিশ্বসৃষ্টি করিয়া আদিদেব ভাবিলেন, "একেশ্বর রাজ্যভার পালিব কেমনে"। তখন সেই আদিদেবের,

হাস্যেতে জন্মিয়া আদ্যা পড়ে ভূমি তলে।
উঠিঞা দাঁড়াইল আদ্যা দেখেন সকলে॥

কিন্তু তখনও তাঁহার, 'স্ত্রীর আকার নাই চণ্ডিকা হ'বে কিসে'। আদিদেব আদ্যাকে স্ত্রীরূপে সাজাইয়া দিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া আদিদেব শিবকে আদ্যার পতিরূপে নির্বাচিত করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিলেন। শিব বলিলেন, আদ্যা সপ্তবার জন্মগ্রহণ করিয়া আসিলে তারপর তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিবেন, তৎপূর্বে নহে। আদ্যাদেবী তাহাতেই সম্মত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। অতঃপর আদ্যা কর্মকার, কুম্ভকার, দক্ষরাজ প্রভৃতির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া অবশেষে এক ঋষির আশ্রমে প্রতিপালিতা হইতে লাগিলেন। একদিন শিব ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়া এক ঋষির আশ্রমে আদ্যাকে দেখিতে পাইলেন এবং বিবাহ করিয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন। শিবের পত্নী হইয়া আদ্যা চণ্ডীতে পরিণত হইলেন। কিন্তু তখনই চণ্ডী নিজের পূজা প্রচারে মনোনিবেশ

করিলেন। কলিঙ্গ নগরে দেহারা নির্মাণ করাইয়া দিবার জন্য বিশ্বকর্মারূপী হনুমানকে আদেশ করিলেন। সাঁতালি পর্বত হইতে চারিখণ্ড পাথর আনিয়া হনুমান কলিঙ্গ নগরে চণ্ডীর দেহারা তুলিয়া দিল।

এই কাহিনী হইতেই কেহ কেহ মনে করেন যে, 'বৌদ্ধ আদ্যা ক্রমশঃ হিন্দুর চণ্ডী হইয়া শিবের ভার্যা হইলেন।'[১] বৌদ্ধধর্ম যখন হিন্দু ধর্মের মধ্যে আত্মগোপন করিতেছিল, তখনই বৌদ্ধ আদ্যাকে এইভাবে চণ্ডীরূপে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস দেখা দিয়াছিল।

কোন কোন স্থলে মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকিনী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। খুল্লনাকে চণ্ডী পূজা করিতে দেখিয়া লহনা ধনপতির নিকট লইয়া গিয়া বলিতেছে,

তোমার মোহিনী বালা শিখিয়া ডাইনী কলা
নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা।

তিব্বতী ভাষায় ডাক শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান—তাহার স্ত্রীলিঙ্গ ডাকিনী। তাহা হইতেই এক সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে ডাকিনী বলিত। ডাকিনীরা নানাপ্রকার তান্ত্রিক আচার দ্বারা কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সম্পন্ন কবিতে পারিত। ইহা দ্বারাই তাহারা সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। চণ্ডীদাসের প্রেম-প্রচারের গুরু বাসুলীও যে সম্ভবতঃ এই প্রকার ডাকিনী ছিলেন, সেই সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ডাকিনীরা ক্রমে সিদ্ধিলাভ করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে প্রায় দেবত্বে অধিষ্ঠিত হইত, অতঃপর তাহারা দেহরক্ষা করিলে তাহাদের জীবনের লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে নানাপ্রকার অলৌকিক কাহিনী মিশ্রিত হইয়া তাহাদের দেবত্বকে আরও সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিত। এই সকল ডাকিনীদিগের এক এক জনের এক একটি বিশিষ্ট গুণ থাকিত এবং তাহারই সূত্র অবলম্বন করিয়া তাহাদের জীবনের অলৌকিক কাহিনীসমূহ রচিত হইত। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল ডাকিনীরাই পরবর্তী কালে নিম্নতর সমাজে দেবতায় পরিণত হইয়া গিয়া সমাজের বিশেষ প্রভাবশালী অপর কোন দেবতার সহিত একেবারে অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। বিশেষ শক্তি-সম্পন্না কোন ডাকিনীর পরবর্তী কালে মঙ্গলচণ্ডীর সহিত অভিন্ন হইয়া যাওয়াও কিছুই আশ্চর্য নহে। ডাকিনীরা তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের জন্য হিন্দু সমাজে বিশেষ নিন্দনীয় হইত। কিন্তু হিন্দুর রক্ষণশীল স্ত্রী-সমাজে তাহারা বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করিত। খৃস্টীয়

১ শূন্য পুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৩৩৬,) ৪২, ভূমিকা

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্যন্ত মুকুন্দরাম ধনপতির মুখে এই দেবতার প্রতি যে প্রকার অশ্রদ্ধা প্রকাশ করাইয়াছেন, তাহাতেও তাহার সমাজে যে কি স্থান ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। খুল্লনাকে চণ্ডী পূজা করিতে দেখিয়া ধনপতি,—

পূজা গৃহে উপনীত হৈল ধনপতি।
জয় দিয়া পূজে চণ্ডী খুল্লনা যুবতী॥
বাম পথী হইয়া করিস্ কার পূজা।
ইহা শুনি যদি মোরে ক্রোধ করে রাজা॥
পুনর্বার জ্ঞাতি বন্ধু যদি ছল ধরে।
পরীক্ষা তোমারে কত দিব বারে বারে॥
কারো ঘরে নাহি আছে হেন পাপ বধূ।
খুল্লনা গর্জিয়া তবে ক্রোধে বলে সাধু॥
এতেক বলিয়া সাধু জ্বলে কোপানলে।
লজ্ঘিয়া দেবীর ঘট ধরে তারে চুলে॥
ভূমিতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়॥
কেমন দেবতা এই পূজিস্ ঘট ঝারি।
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি॥

অতঃপর মশানে শ্রীমন্তকে রক্ষা করিয়া, কিংবা কারাগার হইতে ধনপতিকে উদ্ধার করিয়াও এই মঙ্গলচণ্ডী দেবী যে সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী সমাজে যে চণ্ডীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী নহেন, তিনি পৌরাণিক চণ্ডী। অবশ্য পরবর্তী কোন কোন চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক চণ্ডীর আখ্যানের সঙ্গে এই লৌকিক দেবতার আখ্যানও সংক্ষিপ্ত ভাবে জড়িত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু নামের সামঞ্জস্য হেতুই উভয়ের এই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, অন্য কোন কারণে তাহা হয় নাই। মঙ্গলচণ্ডীর স্থান স্ত্রী-সমাজে আজ পর্যন্তও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এখনও কোন কোন পল্লীবাসী হিন্দুর গৃহে বিশেষ কোন কোন মঙ্গলবারে অতি অকিঞ্চিৎকর উপচারে স্ত্রীলোক কর্তৃকই এই দেবতার ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে; ব্রত সাঙ্গ হইলে মেয়েলি ব্রত কথায় দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়। প্রায়ই পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না; অবশ্য পুরোহিত হইলেও

আপত্তি নাই ; অত্যন্ত সাধারণ পূজামন্ত্রেই পুরোহিত এই দেবীর পূজাকার্য সম্পন্ন করিতে পারে।

'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', 'দেবীভাগবত' প্রভৃতিতে উল্লিখিত আছে যে, এই দেবী স্ত্রীলোকেরই দেবতা,—'কৃপারূপাতি প্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্টদেবতা।' ইহা হইতে মনে হয়, অনার্য সমাজ হইতে এই দেবতা সর্বপ্রথম হিন্দু-সমাজের স্ত্রী-জাতির মধ্যেই নিজের পূজাধিকার স্থাপন করেন। ইহার অর্থ এই যে, পৌরাণিক ধর্মের প্রভাব বশতঃ যখন নবসংস্কার-দীক্ষিত পুরুষ-সমাজ লৌকিক দেবতার সহিত সমস্ত সংস্রব কাটাইয়া একমাত্র পৌরাণিক দেবতার পূজায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিল, তখনও রক্ষণশীল স্ত্রী-সমাজ তাহাদের পূর্বতন আরাধ্য দেবতাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এই দেশীয় প্রাচীনতম সংস্কারের ধারা তাহাদের মধ্যে আজ পর্যন্তও সঞ্জীবিত দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য প্রত্যেক লৌকিক দেবতাই 'যোষিতামিষ্ট-দেবতা' অর্থাৎ স্ত্রী-সমাজের দেবতা। সনকা-বেহুলা মনসার পূজা করিলেও চাঁদ সদাগর মনসার শত্রু, খুল্লনা চণ্ডীর পূজা করিলেও স্বামী ধনপতি তাহার বিরোধী। ইহার একটি গূঢ় সামাজিক তৎপর্য এই যে, বিজিত জাতির নিকট হইতেই বহিরাগত বিজয়ী জাতি স্ত্রী লাভ করিয়া থাকে। সেইজন্য স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে সংস্কারগত একটি মৌলিক পার্থক্য থাকিয়া যায়। কিন্তু এক গৃহতলে বাস করিয়া স্ত্রী-পুরুষের এই বিরোধ কালক্রমে প্রায় লঘুক্রিয়ায়ই পর্যবসিত হয় ; এই ক্ষেত্রেও পুরুষই পরাজয় স্বীকার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই এই স্ত্রী-দেবতার মাহাত্ম্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে যেমন কাহিনীগত ঐক্য আছে, চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে তেমন নাই। ইহা হইতেও মনে হয়, বিভিন্ন লৌকিক স্ত্রী-দেবতার পরিকল্পনা এই চণ্ডীর মধ্যে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, চণ্ডীমঙ্গলে দুইটি মূল কাহিনী বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। একটি কালকেতুর কাহিনী, অপরটি ধনপতি সদাগরের কাহিনী। কালকেতুর কাহিনীতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই চণ্ডী প্রকৃতই পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং ব্যাধ-জাতির আরাধ্যা। কিন্তু ধনপতির গল্পের মধ্যে চণ্ডীর এই বিশিষ্ট গুণের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে তাঁহার সহিত ব্যাধ কিংবা পশুকুলের সংস্রব নাই, এখানে

[১] ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ৪৪ অধ্যায় ; দেবী ভাগবত, ৪৭ অধ্যায়

তিনি 'যোষিতামিষ্ট-দেবতা', তিনি এখানে প্রধানতঃ হারানো জিনিস ফিরিয়া পাইবার দেবতা ; কালকেতু-ব্যাধ-কাহিনীর চণ্ডীর যেমন একটি আরণ্য (sylvan) পরিচয় আছে, ধনপতি-সদাগর-কাহিনীর চণ্ডীর তেমনই একটি গার্হস্থ্য পরিচয় আছে। মনে হয়, স্বতন্ত্র দেব-পরিকল্পনা হইতে এই উভয় কাহিনীর ভিত্তি পরবর্তী কালে আসিয়া এক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। কালকেতু কাহিনীর দেবতার নাম চণ্ডী এবং ধনপতি সদাগরের কাহিনীর দেবতার নাম মঙ্গলচণ্ডী। খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের চণ্ডীমঙ্গল রচনার ঐতিহ্য অনুসরণকারী প্রথম কবি দ্বিজ মাধব মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুকরণে মঙ্গলদৈত্যবধের একটি লৌকিক কাহিনীর ভিতর দিয়া চণ্ডীমঙ্গলের উভয় কাহিনীর দেবী-চরিত্র চণ্ডীকে মঙ্গলচণ্ডী বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইলেও, সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, কালকেতু কাহিনীর সঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীর কোনও যোগ নাই। চট্টগ্রামের ঐতিহ্য অপেক্ষা এই বিষয়ে রাঢ় ও বারেন্দ্রের ঐতিহ্য প্রাচীনতর। তাহাদের মধ্যে এই কাহিনী নাই। এমন কি চট্টগ্রামের কবিদিগের মধ্যেও কালকেতু কাহিনীর চণ্ডীর আরণ্য গুণ (sylvan quality) রক্ষা পাইয়াছে। যে সময় হিন্দু সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া এক সূত্রে মিলনের পথ অনুসন্ধান করিতেছিল, সেই সময়ই এক দেবতার নামে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন দেবতার স্বাতন্ত্র্য দূর হইয়া গিয়াছিল। মনে হয়, লোকমুখে প্রচলিত পাঁচালী বা ছড়ার আকারে যতদিন এই কাহিনীগুলি প্রচলিত ছিল, ততদিন ইহারা পরস্পর স্বতন্ত্র আকারেই ছিল। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের সৃজন-যুগে ইহারা যখন আট দিনের গানের পালার আকারে গ্রথিত হইল, তখনই এই বিভিন্ন কাহিনী দুইটি আসিয়া একত্র মিলিত হইল। এক চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে এই দুই স্বতন্ত্র কাহিনী সমাবেশের ইহাই ইতিহাস।

উপরের আলোচনা হইতে মঙ্গলচণ্ডীর উৎপত্তি সম্বন্ধে লৌকিক কিংবা পৌরাণিক কোন্ ব্যাখ্যা যে গ্রহণযোগ্য, তাহা স্থির করা যাইতেছে না। ইহা হইতেই মনে হয়, পুরাণকারদিগের মধ্যে এই সম্বন্ধে ধারণার অনিশ্চয়তা ছিল। মঙ্গলচণ্ডী পুরাণের নিজস্ব দেবতা হইলে এই অনিশ্চয়তা থাকিবার কোন কারণ ছিল না। অর্বাচীন পুরাণগুলি রচনার বহু পূর্বেই মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, ষষ্ঠী প্রভৃতি লৌকিক দেবতার প্রতিষ্ঠা সমাজে সুদৃঢ় হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য ইহাদের উৎপত্তির ইতিহাস সন্ধান করা এই পুরাণগুলির পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। অতএব

মঙ্গলচণ্ডী নামের উৎপত্তি নিরূপণ করিতে সংস্কৃত পুরাণগুলির নিকট কোন সাহায্য লাভের আশা নাই। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, অমঙ্গলকারিণী (malignant) দেবতা বলিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রকৃতির বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করিয়া (euphemistically) তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে—সেইজন্যই তাঁহার মঙ্গলচণ্ডী নাম হইয়াছে। তাঁহার এই নাম সম্বন্ধে পৌরাণিক ব্যাখ্যার অনিশ্চয়তা হইতেই এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়। কেহ মনে করিয়াছেন যে, মঙ্গলচণ্ডী বা লৌকিক চণ্ডী 'একজন তান্ত্রিক বা পৌরাণিক মিশ্র-দেবতা'। এই উক্তি অর্থহীন। বেদ-রামায়ণ-মহাভারত-মহাপুরাণ প্রভৃতিতে যাঁহার নাম মাত্র উল্লেখ নাই, তাঁহাকে পৌরাণিক দেবতা বলা যায় না। অর্বাচীন পুরাণ কিংবা উপপুরাণগুলি এই বিষয়ক কোনও প্রমাণ হইতে পারে না। সুতরাং মিশ্রই হউক কিংবা অবিমিশ্রই হউক চণ্ডীকে 'পৌরাণিক' দেবী বলা যায় না। তন্ত্র আরও অর্বাচীন। তন্ত্র কিংবা উপপুরাণ বৈদিক উপাদানে রচিত নহে। ইহাদেরও ভিত্তিমূলে অনার্য-জীবনের সাংস্কৃতিক উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং তান্ত্রিক বা পৌরাণিক দেবী বলিলেই তাঁহার অনার্য উদ্ভবের কথা অস্বীকার করা হয় না। বাংলায় যে সকল লৌকিক দেবদেবী হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগে হিন্দুভাবাপন্ন তন্ত্র বা পুরাণ কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছেন, চণ্ডী বা মঙ্গলচণ্ডী তাঁহাদের অন্যতম। সেইজন্য অর্বাচীন তন্ত্র, পুরাণ ও স্মৃতিতে নানাভাবে তাঁহার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিবার প্রয়াস দেখা যায়। ইহা ছাড়া তন্ত্রই হউক, কিংবা পুরাণই হউক, কাহারও সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক নাই।

লৌকিক চণ্ডীর পূজা কবে হইতে সমাজে প্রবর্তিত হইল? এই জাতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে দুই প্রকার প্রমাণের আলোচনা করা যায়। প্রথমতঃ সাহিত্যিক প্রমাণ, দ্বিতীয়তঃ ভাস্কর্যের প্রমাণ। সাহিত্যিক প্রমাণ এই ক্ষেত্রে প্রচুর না হইলেও ভাস্কর্যের প্রমাণ ইহাতে দুর্লভ নহে। প্রথমতঃ সাহিত্যিক প্রমাণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাউক।

চৈতন্যের সমসাময়িক নবদ্বীপের অবস্থা বর্ণনা করিতে 'চৈতন্য-ভাগবতে'র কবি বৃন্দাবন দাস ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বলিয়াছেন,

> ধর্ম কর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে।
> মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥[১]

---

[১] বৃন্দাবন দাস, ১।২

এই গ্রন্থেরই অন্যত্র উল্লিখিত আছে যে, পাতকী জগাই মাধাই একদিন,

প্রভুরে দেখিয়া বলে নিমাই পণ্ডিত।
করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত॥
গায়েন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাউ।
সকল আনিয়া দিব যথা যেই পাউ॥[১]

ইহাতে অনুমান হয়, খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই এই লৌকিক দেবতার পূজা সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, সমাজে যাঁহারা ধনে মানে বিশেষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তখন এই দেবতার পূজার প্রচলন হইয়া গিয়াছিল। দরিদ্র শ্রীধরকে শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিবা কেন তুমি।
অন্নবস্ত্রে কষ্ট পাও কহ দেখি শুনি॥
দেখ এই চণ্ডী বিষহরীরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে যত নাগরিয়া॥[২]

খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে যে দেবতা সমাজে এতখানি প্রাধান্য লাভ করিতে সক্ষম হইযাছিলেন, তাঁহার পূজা আরও অন্ততঃ তিনশত বৎসর পূর্বেও যদি সমাজে প্রথম প্রচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, কিংবা তাহারও কিঞ্চিৎ পূর্বে সর্বপ্রথম সমাজে এই পূজা প্রবর্তিত হয়—এমন অনুমান করা যাইতে পারে। ইহাতেই মনে হয়, মঙ্গলচণ্ডীর পূজা মনসা পূজা প্রবর্তিত হওয়ার কিছু পরবর্তী কালে সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার আরও প্রমাণ এই যে, চৈতন্যের পূর্বেই যেমন হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত প্রমুখ কবিগণ মনসাদেবীর মাহাত্ম্যসূচক মঙ্গলকাব্য রচনা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, প্রাক্‌চৈতন্য যুগের তেমন কোন চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কবির পরিচয় লাভ করা যায় না। ইহাতেই মনে হয়, মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির অনুকরণে পরবর্তী কালে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হয়।

খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম তাঁহার পূর্ববর্তী কবি মাণিক দত্তকে বন্দনা করিয়া লইয়া নিজের কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন,

মাণিক দত্তেরে বন্দোঁ করিয়া বিনয়।
যাহা হইতে হৈল গীত-পথ-পরিচয়॥

---

[১] ঐ, ২।১৩; [২] বৃন্দাবন দাস ১।৮

ইহা হইতেই কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, মাণিক দত্ত খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য প্রণয়ন করেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কোন কবি তাঁহার পূর্ববর্তী কোন কবির নামোল্লেখ করিলে, তাঁহার সময় তিনশত বৎসর পূর্বে নির্দেশ করা সমীচীন হয় না। বিশেষতঃ মাণিক দত্তের যে কাব্য বর্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের বহু পদ মিশ্রিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে অনতিকাল ব্যবধানে আবির্ভূত লোক বলিয়াই বিবেচিত হয়; সেইজন্য মাণিক দত্তকে পঞ্চদশ শতাব্দীর কিংবা অন্ততঃ চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বেকার লোক বলিয়া নির্দেশ করা সঙ্গত নহে। ষোড়শ শতাব্দীতে মঙ্গলচণ্ডীর গীত যে বিশেষ প্রচলন লাভ করিয়াছিল তাহা 'চৈতন্য-ভাগবত'রচয়িতার উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব, এই গীত প্রচলনের দুইশত বৎসর পূর্বেও যদি এই দেবীর পূজা সমাজে প্রথম প্রবর্তিত হয় বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই দেবী সর্বপ্রথম হিন্দু সমাজের পূজা লাভ করিতে আরম্ভ করেন। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', 'দেবীভাগবত', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' ইত্যাদিতে যে মঙ্গলচণ্ডীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও এই সমসাময়িক কালেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

মনসাদেবীর পূজার উদ্ভবকাল নির্দেশ করিতে যেমন বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্যের সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল, চণ্ডীর সম্পর্কেও তাহার সন্ধান করা যাইতেছে। পৌরাণিক চণ্ডীর মূর্তি নির্মাণের একটা বিশিষ্ট আদর্শ প্রাচীন বাংলার ভাস্কর-সমাজে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার সঙ্গেই এই লৌকিক দেবতার আদর্শও গিয়া মিশ্রিত হইয়াছিল। সেইজন্য প্রাচীন ভাস্কর্যে মঙ্গলচণ্ডীর স্বতন্ত্র কোন মূর্তি পাওয়া না গেলেও, পৌরাণিক চণ্ডীর সহিত মিশ্র অবস্থায় তাঁহার মূর্তি উদ্ধার করা কঠিন নহে। আধুনিক বাসুলীর যে মূর্তি পাওয়া যায়, পূর্বোদ্ধৃত বাসুলীর ধ্যানের সহিত তাহাদের কোন কোনটির মিল দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, গ্রাম্য-দেবতা বাসুলীর মূর্তি নির্মাণেরও বিশিষ্ট একটি আদর্শ প্রচলিত ছিল। তাহা লৌকিক চণ্ডী মূর্তি নির্মাণের আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র।

পণ্ডিত গোপীনাথ রাও তাঁহার *Elements of Hindu Iconography* (Vol. I, Part II) গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রাচীন মূর্তিশিল্প-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ 'রূপমণ্ডন' হইতে যে 'প্রতিমা-লক্ষণ' অর্থাৎ প্রতিমা নির্মাণের আদর্শ উদ্ধৃত করিয়াছেন

(পৃ: ১১৩ ও ১২০), তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন গৌরী প্রতিমার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাহা গোধাসনা হইবে,—

গোধাসনা ভবেদ্‌গৌরী লীলয়া হংসবাহনা।
সিংহারূঢ়া ভবেদ্দুর্গা মাতরস্বস্ববাহনা॥

চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই গোধারূপ ধারণ করিয়াই চণ্ডী কালকেতুর ভবনে গমন করেন। অতএব, এই গোধাসনা যে গৌরী তিনিই প্রকৃতপক্ষে কালকেতু কাহিনীর চণ্ডী। পরবর্তী কালে পৌরাণিক প্রভাব বশতঃ তিনি গৌরী নাম ধারণ করিলেও, গোধার সহিত তাঁহার এই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার এই গোধা-সংস্রবের আর কোন অর্থ হইতে পারে না।

গোধাসনা গৌরীই যে পূর্বোদ্ধৃত 'যোষিতামিষ্ট দেবতা' ও 'গৃহে পূজ্যা' প্রতিমা-লক্ষণে তাঁহার অন্যান্য পরিচয়ের সহিত ইহারও উল্লেখ রহিয়াছে, যথা,—

অক্ষসূত্রং তথা পদ্মম্ অভয়ং চ বরং তথা।
গোধাসনাশ্রিতা মূর্তি গৃহে পূজ্যা শ্রিয়ে সদা॥

শ্রী, ঐশ্বর্য বা মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় গোধাসনা যে মূর্তি গৃহে পূজিতা হয়, তাহা প্রকৃত পক্ষে মঙ্গলচণ্ডীরই মূর্তি। মনে হয়, ভাস্কর্যে গৌরী মূর্তি নির্মাণের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় ব্যাধ সমাজ হইতে আগত চণ্ডী ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের ধারা হইতে আগত মঙ্গলচণ্ডী এক হইয়া গিয়াছিলেন। উক্ত প্রতিমা-লক্ষণের অনুযায়ী অনেক মূর্তি প্রাচীন ভাস্কর্যে গঠিত হইয়াছিল। তাহা সাধারণতঃ গৌরীর মূর্তি বলিয়াই পরিচিত হইলেও তাহার সহিত এই গোধা-সংস্রবের জন্যই তাঁহাকে কালকেতু কাহিনীর চণ্ডী বলিয়া চিনিতে পারা যাইতেছে।

বাংলা দেশের বিভিন্ন মিউজিয়মে এই জাতীয় কয়েকটি চণ্ডীর মূর্তি রক্ষিত আছে। মূর্তিগুলি চতুর্ভুজা, অক্ষসূত্র-পদ্ম-অভয়-বরহস্তা, প্রসন্ন মুখ, প্রফুল্ল পদ্মপাদপীঠ, তন্নিম্নে ক্ষুদ্র গোধিকা। মূর্তিগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেই নির্মিত বলিয়া অনুমিত হয়।

যদিও স্মার্ত রঘুনন্দনের নামে প্রচলিত একখানি স্মৃতির গ্রন্থে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ঘটে, পটে বা প্রতিমায় নিষ্পন্ন করিতে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে[১], তথাপি সাধারণতঃ এই দেবতার পূজা একমাত্র ঘটেই সম্পন্ন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক

[১] তিথিতত্ত্ব, রঘুনন্দন, চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ সম্পাদিত, (১৩১৩), ১৫৭

কালেও যে মঙ্গলচণ্ডী ব্রত হইয়া থাকে, তাহাও ঘটেই নিষ্পন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে মঙ্গলচণ্ডীর প্রস্তর মূর্তি স্থাপিত আছে।

অর্বাচীন পুরাণগুলিতে বলা হইয়াছে যে, এই মঙ্গলচণ্ডী 'মূর্তিভেদেন সা দুর্গা', সেইজন্য পরবর্তী কালে দুর্গার সহিত মঙ্গলচণ্ডিকা অভিন্ন হইয়া গেলেন। অনেক স্থলেই শারদীয় দুর্গোৎসবের সময় দুর্গা প্রতিমার সম্মুখেই মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী বা চণ্ডীমঙ্গল গান করা হইত, অনেক স্থলেই এখনও তাহা হইয়া থাকে। কিন্তু পৌরাণিক চণ্ডিকা ও মঙ্গলচণ্ডীর মধ্যে মৌলিক কোনও সাদৃশ্য নাই।

মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে পৌরাণিক চণ্ডীর যেমন কোনও মৌলিক সম্পর্ক নাই, তাঁহার সঙ্গে পৌরাণিক উমারও কোন সম্পর্কের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। পৌরাণিক উমারূপের মধ্যে একটি শান্ত গার্হস্থ্য পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে; মঙ্গলচণ্ডীর মধ্যে তাহার একান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মাণিক দত্ত ও মুকুন্দরাম শিব-প্রসঙ্গ চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া হরপার্বতীর জীবনের কোন গার্হস্থ্য পরিচয় প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দ্বিজ মাধব কিংবা চট্টগ্রামের ঐতিহ্য অনুসরণকারী কোনও কবি পৌরাণিক শিব-প্রসঙ্গ তাঁহাদের চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। সুতরাং তাঁহারাও উমার সঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীর কোনও সম্পর্কের অস্তিত্ব অনুভব করেন নাই।

মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে কেহ আবার পৌরাণিক কিংবা লৌকিক কোজাগর লক্ষ্মীর সাদৃশ্য অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডী উগ্রা প্রকৃতির অনিষ্টকারিণী (malignant) দেবী, লক্ষ্মী পৌরাণিকই হউন কিংবা লৌকিকই হউন, শান্ত প্রকৃতির কল্যাণীরূপিণী দেবী—ইঁহাদের প্রকৃতি পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত; ইঁহাদের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য কল্পনার অতীত।

চণ্ডীমঙ্গলকে চট্টগ্রামের কবিগণ কোন কোন স্থলে 'সারদা-মঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করায় কেহ কেহ মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে সরস্বতীরও সম্পর্কের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু দুর্গা বা চণ্ডীরও এক নাম সারদা। উপরন্তু বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে অবলম্বন করিয়া মঙ্গলকাব্য রচনার একটি স্বতন্ত্র ধারার জন্ম হইয়াছিল—তাহার সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল ধারার কোনও যোগ নাই। প্রকৃতির দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় মঙ্গলচণ্ডী উগ্রা এবং পৌরাণিক সরস্বতী শান্ত—উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য নাই।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

এখানে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী বর্ণনা করিয়া ইহার উদ্ভবের ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, সকল মঙ্গলকাব্যেরই যেমন একটিই কাহিনী, চণ্ডীমঙ্গলের তেমন নহে; চণ্ডীমঙ্গলের দুইটি কাহিনী। এই দুইটি কাহিনী যে স্বতন্ত্র দেবতার এবং পরবর্তী কালে এক পৌরাণিক দেবতার প্রভাব বশতঃ আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে, তাহাও বলিয়াছি। কাহিনী দুইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে ইহা প্রমাণিত হইবে।

কালকেতুর উপাখ্যান

চণ্ডী মর্ত্যলোকে নিজের পূজা প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বরকেই এই কার্যের ভার দিবেন। তিনি শিবকে গিয়া বলিলেন, 'নীলাম্বরকে শাপ দিয়া মর্ত্যে পাঠাও, তাহা দ্বারাই আমার পূজা প্রচার করাইব।' শিব বলিলেন, 'বিনা অপরাধে আমি নীলাম্বরকে শাপ দিতে পারিব না।' চণ্ডী কীটরূপ ধারণ করিলেন। নীলাম্বর শিবপূজার জন্য ফুল তুলিতেছিল, কীটরূপিণী চণ্ডী ফুলের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। নীলাম্বর সেই ফুল তুলিয়া শিব পূজা করিল। ফুলের মধ্য হইতে বাহির হইয়া কীট শিবকে দংশন করিল। বিষের জ্বালায় শিব অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন, —'মর্ত্যে গিয়া ব্যাধ হইয়া জন্ম গ্রহণ কর।' চণ্ডীর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। ধর্মকেতু নামক এক ব্যাধের গৃহে কালকেতু নাম লইয়া নীলাম্বর জন্মগ্রহণ করিল। পত্নী ছায়া তাহার অনুগামিনী হইল, সে ফুল্লরা নাম লইয়া অন্য এক ব্যাধের কন্যারূপে জন্ম লইল। কালকেতু শৈশবাবধিই বীর ও বলিষ্ঠ, অমিত তাহার শক্তি, দুর্জয় তাহার সাহস। সে শশারু তাড়িয়া ধরিত, পক্ষীগুলির দিকে বাঁটুল ছুঁড়িয়া মারিত; ভল্লুক, ব্যাঘ্র লইয়া খেলা করিত।

এগার বৎসর বয়সে কালকেতু ফুল্লরাকে বিবাহ করিল। ফুল্লরা সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা,—বস্তুতঃ সর্বাংশে কালকেতুর গৃহিণী হইবার উপযুক্ত। কালকেতুব দুঃখের সংসার, কিন্তু শান্তিময়। শিকারে তাহার অদ্ভুত দক্ষতা। শিকারই তাহার জীবিকার একমাত্র উপায়। প্রতিদিন যাহা শিকার করিয়া আনে, তাহা

বাজারে বিক্রয় করিয়া যাহা পায়, তাহাতে কোন রকমে সংসার চলিয়া যায়। এদিকে বনের পশুরা কালকেতুর অত্যাচারে অস্থির হইয়া চণ্ডীর শরণাপন্ন হইল। চণ্ডী তাহাদিগকে অভয় দিলেন। একদিন চণ্ডী ছলনা করিয়া বনের পশুদিগকে লুকাইয়া রাখিলেন। ব্যাধ-দম্পতির সে'দিন আর অন্নের সংস্থান হইল না। পরদিন আবার কালকেতু ধনুক লইয়া বনে যাত্রা করিল। পথে অনেক মঙ্গলচিহ্ন দেখিল। কিন্তু হঠাৎ এক স্বর্ণগোধিকা দেখিয়া তাহার সকল আশা নির্মূল হইয়া গেল; কারণ, গোধিকা যাত্রার পক্ষে অশুভ। কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ধনুর্গুণে বাঁধিয়া লইল; মনে মনে বলিল, যদি আজ অন্য শিকার না পাই, তবে ইহাকেই পোড়াইয়া খাইব। সমস্ত বন ঘুরিয়া কালকেতু সেদিন যখন একটি শিকারেরও সন্ধান পাইল না, তখন গোধিকা লইয়া বাড়ী ফিরিল। ফুল্লরা শিকারের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল, শূন্য হস্তে স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কালকেতু গোধিকার ছাল ছাড়াইয়া ফুল্লরাকে রাঁধিতে বলিল এবং প্রতিবেশিনী বিমলার গৃহ হইতে কিছু ক্ষুদ ধার করিয়া আনিতে বলিয়া নিজে বাসি মাংসের পসরা মাথায় লইয়া বাজারে বাহির হইয়া গেল।

এদিকে গোধিকারূপিণী চণ্ডী সুন্দরী যুবতীর রূপ ধারণ করিলেন। ফুল্লরা বিমলার গৃহ হইতে ফিরিয়া দেখিল, এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতী তাহার গৃহের আঙিনায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ফুল্লরা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, কালকেতুই তাঁহাকে এখানে আনিয়াছে এবং তিনি সেই ব্যাধ-কুটিরেই থাকা স্থির করিয়াছেন। ফুল্লরার দুঃখের সংসারে তাহার স্বামিপ্রেমই ছিল একমাত্র সম্বল। চণ্ডীর মুখ দেখিয়া তাহার নিজের মুখ শুকাইয়া গেল। ফুল্লরা সীতা-সাবিত্রীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, অনেক নৈতিক বক্তৃতা দিয়া, পরগৃহবাস হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। তারপর তাহাদের সংসারের সাংবাৎসরিক দারিদ্র্যের কাহিনী শুনাইল; কিন্তু যখন কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর নিকট ছুটিল। কালকেতু গৃহে আসিয়া চণ্ডীর অপূর্ব লাবণ্যময়ী মূর্তি দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল। সেও তাঁহাকে পরগৃহবাস হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া কালকেতুর ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু যখন কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না, তখন ধনুকে শর জুড়িল। চণ্ডী এইবার স্ব-মূর্তি প্রকাশ করিলেন। চণ্ডীর অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া কালকেতু ও ফুল্লরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল। চণ্ডী তাহাদিগকে সাত ঘড়া

ধন ও একটি অঙ্গুরী দিয়া নগর-পত্তন করিতে আদেশ দিলেন। কালকেতু চণ্ডীর আদেশে গুজরাট বন কাটাইয়া নগর পত্তন করিল। সংসারে এক প্রকার লোক আছে, যাহারা পরের অনিষ্ট করিতেই আনন্দ পায়। ভাঁড়ুদত্ত সেই প্রকৃতির লোক; সে ধূর্ততার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। সে কালকেতুর নিকটে মন্ত্রীর পদ প্রার্থনা করিয়া অপমানিত হইল। এই আক্রোশে কলিঙ্গাধিপতিকে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্ররোচনা দিল। কলিঙ্গাধিপতি কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কালকেতু যুদ্ধে পরাস্ত হইল। সে বন্দী হইয়া কারাগৃহে চণ্ডীর স্তব করিল। কলিঙ্গাধিপতিকে চণ্ডী স্বপ্নে আদেশ করিলেন যে, কালকেতু তাঁহার ভক্ত—তাহাকে মুক্তি দিয়া তাহার রাজ্য ফিরাইয়া দিতে হইবে। কালকেতু মুক্তিলাভ করিল। কলিঙ্গরাজের সাহায্যে সুদৃঢ়ভাবে রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব ভোগ করিতে লাগিল; তারপর একদিন শুভ মুহূর্তে কালকেতু ও ফুল্লরা নীলাম্বর ও ছায়া রূপে স্বর্গে ফিরিয়া গেল।

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান

উজানিনগরে এক বিলাসী যুবক ছিলেন। তাঁহার নাম ধনপতি সদাগর। তিনি একদিন জনার্দন ওঝা নামক এক ব্যক্তির সহিত ক্রীড়াচ্ছলে পায়রা উড়াইতেছিলেন। ধনপতির পায়রা শ্যেন পক্ষীর তাড়ায় ভীত হইয়া অদূরে ক্রীড়াশীলা খুল্লনার বস্ত্রাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পায়রার অনুসন্ধানে ধনপতি আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ধনপতি পায়রা চাহিলেন, খুল্লনা তাহা ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করিল—সে ধনপতিকে তাহার খুড়তুত ভগিনীর স্বামী জানিয়া তাঁহার সহিত কৌতুক করিয়া পায়রা লইয়া চলিয়া গেল। খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হইয়া ধনপতি জনার্দন ওঝাকে খুল্লনার সহিত তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব করিতে পাঠাইলেন। কুলে ও ধনে শ্রেষ্ঠ ধনপতি সহজেই সম্মতি লাভ করিলেন। কিন্তু ধনপতির প্রথমা স্ত্রী লহনা সুন্দরী এই বিবাহের কথা শুনিয়া অভিমান করিয়া বসিল। ধনপতি তাহাকে অনেক প্রবোধ দিলেন, শেষে লহনা একখানি পাটশাড়ী ও চুড়ি গড়াইবার জন্য পাঁচ তোলা সোনা পাইয়া তাহাতে সম্মতি দিল। বিবাহের পর ধনপতিকে রাজাজ্ঞায় সুবর্ণপিঞ্জর আনিতে গৌড়ে যাইতে হইল। গৌড়ে যাইবার সময় ধনপতি খুল্লনাকে লহনার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন। লহনাও স্বামীর কথায় খুল্লনাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। এদিকে দুই সতীনের এইরূপ পরস্পর প্রীতিতে দুর্বলা দাসীর বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। একজনের সহিত আর

একজনের ঝগড়া বাধাইতে না পারিলে তাহার কোনরূপ সুবিধা নাই ভাবিয়া সে লহনাকে খুল্লনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য অনেক কূট পরামর্শ দিল। দুর্বলার উপদেশ কাজে লাগিল। খুল্লনাকে স্বামীর চক্ষে বিষ করিতে লহনা নানা-রূপ মন্ত্রপূত ঔষধের ব্যবস্থা করিল। কিন্তু তাহাতে যখন কোন কাজ হইল না, তখন লহনা তাহার স্বামীর এক জাল পত্র লইয়া খুল্লনার নিকট উপস্থিত করিল, পত্রের মর্ম এই—অদ্য হইতে তুমি ছাগল চরাইবে, ঢেঁকিশালে শয়ন করিবে, এক বেলা আধ পেটা আহার করিবে এবং খুঁয়া বস্ত্র পরিবে। বুদ্ধিমতী খুল্লনা বুঝিল, পত্রটি তাহার স্বামীর লেখা নহে এবং পত্রানুযায়ী কার্য করিতে সে প্রথমেই অস্বীকার করিল। তর্কবিতর্ক কলহে দাঁড়াইল এবং শারীরিক বলের প্রভাবে লহনারই জয় হইল। খুল্লনাকে বাধ্য হইয়া ছাগল চরাইতে যাইতে হইল; ঢেঁকিশালে শয়ন করিতে হইল এবং খুঁয়া বস্ত্রও পরিতে হইল। যুবতী খুল্লনা গৃহ হইতে বনের শ্যামল প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বসন্ত কালের বনের শ্যামলতা, কোকিলের কুহুরব, ভ্রমরের মধুর গুঞ্জন, প্রকৃতির তরুপল্লব দর্শন করিয়া খুল্লনার হৃদয়ে স্বামিপ্রেম উছলিয়া উঠিল; সে কোকিলকে বলিল—'সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা, এই বনে ডাক অকারণ।' একদিন পথশ্রান্তা খুল্লনা বসন্ত ঋতুর নব হিল্লোলে বনমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল। এমন সময় চণ্ডী খুল্লনাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন,—'তোর সর্বশী ছাগল শৃগালে খাইয়াছে।' স্বপ্ন দেখিয়া খুল্লনার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—জাগিয়া দেখিল সত্য সত্যই সর্বশী ছাগল নাই। লহনার তিরস্কারের ভয়ে সে ছাগল অন্বেষণ করিতে করিতে পঞ্চ দেবকন্যার দেখা পাইল। তাহারা খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা শিক্ষা দিল। খুল্লনা বনমধ্যে চণ্ডীর পূজা করিল। চণ্ডী খুল্লনাকে দেখা দিলেন। দেবী তাহাকে স্বামি-পুত্র লাভের বর দিলেন। চণ্ডী আবির্ভূতা হইয়া স্বপ্নে লহনাকে খুল্লনার প্রতি পূর্বের ন্যায় আদর যত্ন করিতে আদেশ দিলেন। স্বপ্ন দেখিয়া লহনার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাহার অনুতাপ উপস্থিত হইল। প্রভাতে যখন খুল্লনা গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন চণ্ডীর স্বপ্নাদেশের কথা স্মরণ করিয়া পূর্বের ন্যায় তাহাকে আদর যত্ন করিতে লাগিল। এদিকে ধনপতি গৌড়ে অসঙ্গত সুখে মত্ত হইয়া বাড়ীর কথা ভুলিয়া ছিলেন। সেই রাত্রে চণ্ডী ধনপতিকে স্বপ্ন দেখাইলেন যে, খুল্লনার প্রতি লহনা দুর্ব্যবহার করিতেছে। ধনপতির বাড়ীর কথা মনে হইল। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদে লহনা তাড়াতাড়ি সুন্দর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া স্বামিসন্দর্শনে গেল। এদিকে সেদিন

সাধুর গৃহে বহু লোক নিমন্ত্রিত; ধনপতি খুল্লনাকে রন্ধন করিতে বলিলেন। লহনা আপত্তি করিল এবং রন্ধন কার্যে খুল্লনার অনিপুণতার কথা তুলিয়া তাহাকে রন্ধন হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল। এই আপত্তিতে কোন ফল হইল না, খুল্লনাই রাঁধিতে গেল। চণ্ডী খুল্লনাকে বর দিলেন। রন্ধন খুব উত্তম হইল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ খুব সুখ্যাতি করিলেন। ইহার পর ধনপতির পিতৃ-শ্রাদ্ধে নানা স্থান হইতে স্বজাতিবর্গ আসিলেন। মালা-চন্দন দেওয়া লইয়া সভায় গণ্ডগোল বাধিল। খুল্লনা বনে ছাগল চরাইত—এই কলহের সুযোগে তাঁহারা খুল্লনার সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণে আপত্তি তুলিলেন এবং খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষা না হইলে তাঁহারা কেহই আহার করিবেন না কিংবা তৎপরিবর্তে ধনপতিকে এক লক্ষ টাকা দণ্ড স্বরূপ দিতে হইবে, এইরূপ দাবী করিলেন।

এই অবস্থায় ধনপতি লহনাকে তাহার কার্যের জন্য ভৎর্সনা করিলেন এবং এক লক্ষ টাকা দিয়া সভাসদ্‌দিগের মুখ বন্ধ করিবেন বলিয়া খুল্লনাকে আশ্বাস দিলেন। খুল্লনা তাহাতে সম্মত হইল না। সে জানিত যে, এক লক্ষ টাকায় বর্তমানে তাঁহাদের মুখ বন্ধ হইলেও অন্য নিমন্ত্রণ উপলক্ষে পুনরায় এই প্রশ্ন তুলিয়া তাঁহারা দ্বিগুণ চাহিবেন। সে পরীক্ষা দিতেই মনস্থ করিল। খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষা হইল। তাহাকে জলে ডুবাইতে চেষ্টা করা হইল—সর্প দ্বারা দংশন করান হইল, প্রজ্বলিত লৌহদণ্ডে বিদ্ধ করা হইল, অবশেষে তাহাকে জতুগৃহে রাখিয়া অগ্নি সংযোগ করা হইল—কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। সে সতী, সতীত্বের ধ্বজা উড়াইয়া সকল পরীক্ষায় সে জয়লাভ করিল। কিছুদিন পরে রাজ-ভাণ্ডারে চন্দনাদি দ্রব্যের অভাব হওয়ায় ধনপতির সিংহল যাত্রা করিতে হইল। খুল্লনা তখন গর্ভবতী। যাত্রার নির্ধারিত সময় অশুভ ছিল; কিন্তু ধনপতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সাত ডিঙ্গা বোঝাই করিয়া যাত্রার আয়োজন করিলেন। খুল্লনা পতির মঙ্গল কামনা করিয়া চণ্ডীপূজা করিতে বসিল।

ধনপতি ছিলেন পরম শৈব; স্বামীর চক্ষে খুল্লনাকে বিষ করাইবার জন্য লহনা ধনপতিকে খুল্লনার চণ্ডীপূজার কথা বলিল। ধনপতি ক্রোধে অন্ধ হইয়া 'ডাকিনী দেবতা' বলিয়া চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিয়া গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন। ধনপতি চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিয়াছিলেন, অকূল সমুদ্রে পাইয়া চণ্ডী ধনপতির উপর তাহার প্রতিশোধ তুলিলেন। তাঁহার ছয় ডিঙ্গা ডুবিল, স্বরূপ নষ্ট হইল; একমাত্র মধুকর ডিঙ্গা লইয়া তিনি পথে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া সিংহলে পৌছিলেন। সিংহলের

পথে চণ্ডী তাঁহাকে 'কমলে-কামিনী'র মূর্তি[১] দেখাইলেন। সিংহলরাজ ধনপতির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন। কিন্তু ধনপতির মুখে 'কমলে-কামিনী'র অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া বিশ্বাস করিলেন না। ধনপতির বারংবার উক্তিতে সিংহলরাজ তাঁহাকে অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন যে, 'কমলে-কামিনী' দেখাইতে পারিলে তাঁহাকে অর্ধেক রাজত্ব দিবেন, নতুবা ধনপতিকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিতে হইবে। ধনপতি স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু সিংহলরাজকে তিনি সে দৃশ্য দেখাইতে পারিলেন না। চণ্ডী তাঁহাকে ছলনা করিলেন। অঙ্গীকার-অনুযায়ী ধনপতিকে কারাগৃহে অবরুদ্ধ থাকিতে হইল। এদিকে খুল্লনার এক পুত্র জন্মিল। মালাধর গন্ধর্ব শিবের শাপে খুল্লনার গর্ভে শ্রীমন্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। শ্রীমন্ত ক্রমে বড় হইল; পাঠশালায় পড়িতে গেল। একদিন গুরু মহাশয়কে পরিহাস করায় গুরু রাগিয়া তাহার জন্ম সম্বন্ধে কটাক্ষ করিলেন। সেইদিনই তরুণ শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রা করিতে মনস্থ করিল। রাজার অনুরোধ, মাতার অশ্রু তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। শ্রীমন্ত সাত ডিঙ্গা সাজাইয়া সিংহল যাত্রা করিল।

শ্রীমন্তও জলরাশির মধ্যে সেই 'কমলে-কামিনী'র মূর্তি দেখিয়া সিংহলরাজকে গিয়া তাহা বলিল—এবারেও এ'কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। রাজা বলিলেন, 'যদি তুমি ইহা আমাকে দেখাইতে পার, তাহা হইলে তোমাকে অর্ধেক রাজ্য ও তোমার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব, নচেৎ দক্ষিণ মশানে তোমার শিরশ্ছেদ হইবে।' শ্রীমন্তকেও চণ্ডী ছলনা করিলেন—শ্রীমন্ত সিংহলরাজকে 'কমলে-কামিনী'র মূর্তি দেখাইতে পারিল না। রাজার লোকেরা তাহাকে মশানে লইয়া গেল। মশানে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব করিতে লাগিল। চণ্ডী মশানে আসিয়া উপস্থিত

[১] কমলে কামিনীর প্রকৃত অর্থ সমুদ্র-মরীচিকা। আধুনিক কালেও সামুদ্রিক নাবিকগণ ইহা দেখিয়া থাকেন। ১৯৫১ সনের ২৭শে জানুয়ারী রয়টারের মেলবোর্ণ হইতে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—'The Chinese crew of the 7,746-ton Australian freighter "Nankin", 70 miles off the south-west coast of Victoria looked round the open horizon today to find themselves surrounded by houses, animals and ships, some of them upside down.

"We are surrounded by mirages", the Captain radioed the Melbourne Weather Bureau, asking for an explanation.

"The mirages were caused by unevenly heated air layers bending light rays resulting in the crew seeing objects normally out of sight many miles away," the Weather Bureau replied.' (P. T. I.—Reuter)

হইলেন। রাজার সৈন্যগণ চণ্ডীর ভূতপ্রেতের হস্তে পরাজিত হইয়া পলাইল। চণ্ডী শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন। চণ্ডীর কৃপায় সিংহলরাজ অবশেষে 'কমলে-কামিনী'র মূর্তি দেখিতে পাইলেন। পিতাপুত্রের মিলন হইল—শ্রীমন্তের সহিত সিংহল-রাজকন্যা সুশীলার বিবাহ হইল। পিতাপুত্রে বাড়ী ফিরিলেন। পথে ধনপতি চণ্ডীর কৃপায় তাঁহার ছয় ডিঙ্গা ফিরিয়া পাইলেন। উজানি নগরে আসিয়া শ্রীমন্ত উজানি নগরের রাজাকে 'কমলে-কামিনী'র মূর্তি দেখাইয়া মুগ্ধ করিল এবং তাঁহার কন্যা জয়াবতীকে বিবাহ করিল। তারপর স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন।

মনসা-মঙ্গলকাব্য রচনায় যেমন সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী একটি কাহিনীগত ঐক্য সৃষ্টি হইয়াছিল, চণ্ডীমঙ্গল রচনায় কাহিনীগত ঐক্য তেমন গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। রাঢ়, বারেন্দ্র ও বঙ্গ—বাংলাদেশের এই তিনটি অঞ্চলে এই বিষয়ক তিনটি ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। তবে এ' কথা সত্য যে, লৌকিক কাহিনী অংশে ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম প্রায় কিছুই ছিল না। কাব্যের ভূমিকা-ভাগ বা সৃষ্টিতত্ত্ব দেব-বন্দনা ইত্যাদি বর্ণনায় উত্তরবঙ্গ প্রধানতঃ মালদহ অঞ্চলে যে ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই অনুসরণ করিয়াছে; তাহাতে নাথ-সাহিত্যের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। এই অংশ বর্ণনায় রাঢ়ের ঐতিহ্যে পৌরাণিক প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ববঙ্গের ঐতিহ্য প্রধানতঃ চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কাহিনীর প্রথমাংশ বর্ণনায় লৌকিক প্রভাব বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মঙ্গলদৈত্য শিবের বর লাভ করিয়া পরম শক্তিশালী হইয়া উঠিল, সে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া দেবতাদিগকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। বিপন্ন দেবগণ শিবের নিকট ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে বলিলে শিব তাঁহাদিগকে চণ্ডীর সাহায্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন। দেবতাদিগের অনুরোধে চণ্ডী রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া মঙ্গলদৈত্যকে নিধন করিলেন। মঙ্গলদৈত্যকে বধ করিয়া দেবী মঙ্গলচণ্ডী নাম গ্রহণ করিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে যে, মঙ্গলচণ্ডী নামটির একটি লৌকিক ব্যাখ্যা দিবার জন্য 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে'র চণ্ডীর আখ্যায়িকাটিকে এই অঞ্চলের কবিগণ তাঁহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত করিয়া লইয়া চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের ভূমিকা-ভাগ রচনা করিয়াছেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্য অনুযায়ী রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে রাঢ়ের ঐতিহ্যানুযায়ী রচিত বিস্তৃত শিব-কাহিনী সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গলের এই কাহিনী দুইটি কোথা হইতে আসিল? সর্পপূজা সমগ্র ভারতবর্ষময় ব্যাপক বলিয়া মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর উদ্ভব প্রকৃত কোথায় হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা যেমন দুঃসাধ্য, চণ্ডীমঙ্গলের তেমন নহে। মঙ্গলচণ্ডীর পূজা একমাত্র বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ, সেইজন্য ইহার কাহিনীও এই দেশেই উদ্ভূত হইয়াছিল, মনে করা যাইতে পারে।

খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে রচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'র একটি শ্লোকে চণ্ডীমঙ্গলের উভয় কাহিনীরই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন,—

ত্বং কালকেতু-বরদাচ্ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজং স্বসূনো
রক্ষোঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী।[১]

অনেকে মনে করেন, এই শ্লোকটি হইতে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে।[২] কিন্তু তাহা সত্য নহে। বরং প্রচলিত চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী কালে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' এই শ্লোকটি রচিত হইয়াছে। অতএব, একটি অত্যন্ত অর্বাচীন পুরাণের এই শ্লোকটির সহিত বাংলা চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর উদ্ভবের কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করা সমীচীন নহে। ইহাতে শুধু লৌকিক দেবতা মঙ্গলচণ্ডীকে একটা পৌরাণিক আভিজাত্য দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র।

এতদ্ব্যতীত দেবীপুরাণের একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে 'চণ্ডিকাখণ্ড' নামক এক স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বাংলা চণ্ডীমঙ্গলের দুইটি কাহিনীই সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে।[৩] ইহাও যে বাংলা কাহিনী হইতেই পরবর্তী কালে গিয়া সংস্কৃতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। 'দেবীপুরাণ'ও একখানি অর্বাচীন পুরাণ; তাহারও সকল পুঁথিতে চণ্ডিকাখণ্ডটি পাওয়া যায় না, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত এ'যাবৎ একমাত্র একখানি পুঁথিতেই তাহা পাওয়া গিয়াছে। অতএব ইহা যে পরবর্তী কালে মূল দেবীপুরাণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব ইহা হইতেও বাংলা চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে এমন বলিতে পারা যায় না। পূর্বেই বলিয়াছি, চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দুইটি যে শুধু পরস্পর স্বতন্ত্র তাহাই নহে, ইহাদের উদ্ভবের কালও স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে

[১] বৃহদ্ধর্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড (বঙ্গবাসী, ১৩০০), ২১০; [২] র-সা-প-প, (১৩২২), ১০৭; [৩] ঢা, ১৬১৭ক; পুঁথিটি ১৭২৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮০১ খৃস্টাব্দে অনুলিখিত বলিয়া উল্লেখ করা আছে।

কালকেতুর কাহিনীটি প্রাচীনতর। প্রত্যেক চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, কলিঙ্গদেশেই চণ্ডীপূজার প্রথম প্রবর্তন হইয়াছিল।

ইহা হইতেই অনুমিত হইতে পারে যে, এই কলিঙ্গদেশ হইতেই আসিয়া লৌকিক মঙ্গলচণ্ডীর পূজা কালক্রমে বঙ্গের সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল এবং কাহিনী দুইটিও সেখান হইতেই আসিয়া থাকিবে।

কিন্তু এই কলিঙ্গদেশ কোথায়? প্রাচীন বাংলার কবিদিগের ভৌগোলিক জ্ঞান যে খুব সুস্পষ্ট ছিল না, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অতএব, এই কলিঙ্গের উল্লেখ হইতেই প্রাচীন ভৌগোলিক বিভাগোক্ত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের কলিঙ্গ অর্থাৎ উড়িষ্যা বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। ইহা দ্বারা এইটুকু মাত্র মনে করা যাইতে পারে যে, চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ মনে করিতেন, বাংলা-দেশের বাহিরে লৌকিক চণ্ডীপূজা প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল, বাংলাদেশে তখনও ইহার বহুল প্রচলন হয় নাই। এই কাহিনীতে ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন কবিদিগের ভৌগোলিক জ্ঞান খুব স্পষ্ট ছিল না। অতএব কলিঙ্গরাজ্যে সর্বপ্রথম চণ্ডীর দেহারা নির্মিত হইয়াছিল, নির্দেশ করিয়া তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, এই দেবতা এই দেশে এখনও অপরিচিত হইলেও অন্যত্র তাঁহার বিশেষ প্রভাব বর্তমান। ইহা দ্বারা সন্দিগ্ধ লোকের মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি উৎপাদনের চেষ্টা করা হইত। অতএব, প্রাচীন কলিঙ্গের ভৌগোলিক সীমা সন্ধান করিয়া এই দেবতা ও তাঁহার সম্পর্কিত কাহিনীর উদ্ভবক্ষেত্র নিরূপণ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল।

চণ্ডীমঙ্গলের সঙ্গে যোগ-তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বহু উপাদান মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, চণ্ডীমঙ্গলের এই সৃষ্টিতত্ত্ব ও রাঢ়ের অন্যতম লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-প্রচারক কাব্য ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণ এক এবং বৌদ্ধ শূন্যবাদের অনুকূল। ইহার সহিত আবার পরবর্তী কালে নাথ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীও আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই বিষয়ে পুরাণের কোন প্রভাব ইহাদের উপর একেবারেই দৃষ্টিগোচর হয় না। অবশ্য নাথপন্থ ও ধর্মপূজা উভয়েই বৌদ্ধধর্মকর্তৃক প্রভাবিত বলিয়া উভয়ের কাহিনীমধ্যে স্বভাবতই

---

[১] সা-প-প, ১৭, ২৫৫

কতকটা ঐক্য রহিয়াছে এবং এই মঙ্গলচণ্ডীও বৌদ্ধ সমাজের ভিতর দিয়া আগত বলিয়া তাহার সহিত বৌদ্ধসমাজসম্মত সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীও সংযুক্ত হইয়া আসিয়াছে।

মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে যে সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারই ধারাটি রাঢ় এবং বারেন্দ্রের প্রত্যেক চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ভিতর দিয়া একেবারে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। ধর্মমঙ্গলেও সংক্ষিপ্ত আকারে সৃষ্টিতত্ত্বের একই বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদা-মঙ্গলেও এই সৃষ্টিপ্রকরণ বৌদ্ধধর্মসম্মত ও নাথ-সম্প্রদায়ের সাহিত্যের অনুকূল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত এই চণ্ডীর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ক পুরাণ-বহির্ভূত কাহিনী সর্বত্র প্রচলিত ছিল। অতএব ইহা হইতেও হিন্দুধর্ম-বহির্ভূত কোন অঞ্চল হইতে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও তাহার সম্পর্কিত কাহিনী এদেশে সর্বপ্রথম আসিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু নানা কারণেই চণ্ডীমঙ্গলের উভয় কাহিনীই অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। ধনপতি সদাগরের গল্পটি প্রধানতঃ মনসা-মঙ্গল কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক রীতিতে রচিত। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন, ইহার মূলেও ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে।[১] এমন কি মালদহ জিলার সরকারী বিবরণে পর্যন্ত এই বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 'In Firozpur is the Dhanchak mosque ascribed to Dhanpat Saudagar. He and his brother Chand Saudagar were the bankers of Gaur in the sixteenth century (?) and lived near the small Sagardighi east of the Lotan masjid.'[২]

বলা বাহুল্য, কোন নিশ্চিত ঐতিহাসিক প্রমাণদ্বারা সমর্থিত না হইলে কেবলমাত্র লোক-প্রবাদের উপর কোন আস্থা স্থাপন করা যায় না। বাংলা দেশে ভগ্নস্তূপের অভাব নাই এবং এই সমস্ত ভগ্নস্তূপকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালে যে যাহার প্রয়োজন মত কাহিনী রচনা করিয়া লইতেও এইদেশে লোকের কোনদিন অভাব হয় নাই। অতএব, এই মঙ্গলচণ্ডীর কাহিনীর মূলে কোন প্রকার ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া আস্থা স্থাপন করা যায় না। কালকেতু ব্যাধের

---

১ র-সা-প-প, (১৩২২), ৯৭

২ Bengal District Gazetteers—Malda, Calcutta, 1918, p. 91.

কাহিনীটি আপাতদৃষ্টিতে বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী উপজাতীয় অঞ্চলের লোক-কথা হইতে আগত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই পর্যন্ত ভারতীয় উপজাতি অঞ্চলের যে সকল লোক-কথা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া এই প্রকার কোন কাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় নাই। অতএব ইহাও কোন বাঙ্গালী কবির স্বকপোলকল্পিত বলিয়া মনে হয়।

আট দিনের ষোল পালায় ভাগ করিয়া চণ্ডীমঙ্গল যখন প্রথম বর্তমান কাব্যাকারে রচিত হয়, তখন ব্যাধ কালকেতু এবং সদাগর ধনপতির কাহিনী দুইটি একত্র আসিয়া যুক্ত হইলেও, এ'কথা সত্য যে, উভয় কাহিনী একই সময়ে সমাজে উদ্ভূত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে ব্যাধ কালকেতুর কাহিনীটি যে প্রাচীনতর, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়; মঙ্গলকাব্যের সাধারণ আঙ্গিক ইহার মধ্যে ব্যবহৃত হয় নাই। ইহার অর্থ এই যে, মঙ্গলকাব্য রচনার সুস্পষ্ট কোনও ভাবগত কিংবা বহিরঙ্গগত আদর্শের তখন জন্মই হয় নাই। অথচ ধনপতি সদাগরের কাহিনীর মধ্যে মঙ্গলকাব্য রচনার অঙ্গ ও ভাবগত আদর্শকে অনুসরণ করিবার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, ধনপতি সদাগরের কাহিনী যে মনসা-মঙ্গল কাব্যের রচনা ও তাহার প্রচারেব পরবর্তী কালে জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী মনসা-মঙ্গল কাহিনী উদ্ভবের পূর্ববর্তী, কিন্তু সদাগর ধনপতির কাহিনী মনসা-মঙ্গলের পরবর্তী। ব্যাধ কালকেতুর কাহিনীর উপর মনসা-মঙ্গল কাহিনীর কোনও প্রভাবের পরিচয় নাই, অথচ সদাগর ধনপতির কাহিনী যে মনসা-মঙ্গল কাহিনীর প্রত্যক্ষ প্রভাব-জাত, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ

এই কাহিনীর আদি রচয়িতা কে? ইহা বলাই বাহুল্য যে, পাঁচালী বা লোক-কথার ক্ষুদ্র গীতিকাব্যের আকারে ইহা বহুকাল হইতেই হয়ত সমাজে প্রচলিত ছিল। অতঃপর নিপুণ কাব্যশিল্পীদিগের হাতে পড়িয়া পরবর্তী কালে ইহা মঙ্গলকাব্যের রূপ লাভ করিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম তাঁহার পূর্ববর্তী কবিদিগের বন্দনা করিতে গিয়া বাল্মীকি, বেদব্যাস, জয়দেব, বিদ্যাপতির সঙ্গে মাণিক দত্ত ও শ্রীকবিকঙ্কণ নামক দুই কবির উল্লেখ করিয়াছেন,

জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দোঁ কালিদাস।
আদি কবি বাল্মীকি বন্দিলুঁ মুনি ব্যাস॥
মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত-পথ-পরিচয়॥
বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ।
প্রণাম করিয়া মাতা পিতার চরণ॥[১]

ইহা হইতে মনে হয়, মুকুন্দরামের মতে মাণিক দত্তই এই গীতি রচনার প্রবর্তক এবং শ্রীকবিকঙ্কণ উপাধিধারী কোন ব্যক্তি মুকুন্দরামের সঙ্গীত-শিক্ষক। কেহ কেহ মনে করেন, এই কবিকঙ্কণও মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী একজন কবি, তাঁহার প্রকৃত নাম বলরাম—মেদিনীপুর অঞ্চলে তাঁহার মঙ্গলচণ্ডীর গীত বিশেষ প্রচলিত ছিল, মুকুন্দ তাঁহার কাব্যরচনায় তাঁহা কর্তৃকও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিয়াছি। মুকুন্দরাম কর্তৃক মাণিক দত্তের এই উল্লেখ হইতেই কেহ কেহ তাঁহাকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন। মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে সৃষ্টিতত্ত্ববর্ণনা-সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেও প্রতীয়মান হইবে যে, এই দেশের সমাজে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বেই মাণিক দত্তের কাহিনী রচিত হইয়াছিল। গতানুগতিক পঞ্চদেবতার বন্দনা দিয়া মাণিক দত্তের কাব্যের আরম্ভ নহে। তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্ব-রচনার অংশ পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ও নাথ-সাহিত্য হইতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করিবারও আপাতত

১ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী (বঙ্গবাসী, ১৩৩২), ৬

কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা মাণিক দত্তের মৌলিক রচনা বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। মুকুন্দরাম নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, 'বিচারিয়া অনেক পুরাণ' তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, তখন সমাজের মধ্যে সংস্কৃত পুরাণের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল এবং এই যুগের কবিগণ তাঁহাদের পূর্বতন কবিদিগের রচনাগুলিকে এই সংস্কৃত পুরাণের আদর্শে পুনর্গঠন করিয়া ইহাদের মধ্যে এক অভিনব বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাণিক দত্তের রচনা এই যুগের এই পৌরাণিক অনুকরণের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। ইহা হইতে স্বভাবতই মনে হইবে যে, মাণিক দত্ত মুকুন্দরামের অগ্রবর্তী, তবে একেবারে তিন শত বৎসরের অগ্রবর্তী কি না, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। সে কথা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

মাণিক দত্ত

মাণিক দত্তের নামে প্রচলিত একখানি মাত্র হস্তলিখিত পুঁথির বর্তমানে সন্ধান পাওয়া যায়।[১] যদিও ইহার প্রথম অংশে একটি ও শেষদিকে কয়েকটি পাতা নাই, তথাপি পুঁথিখানিকে একপ্রকার সম্পূর্ণই বলিতে পারা যায়—ইহাতে কালকেতুর কাহিনী সম্পূর্ণ ও ধনপতি সদাগরের কাহিনীরও সামান্য শেষাংশ ব্যতীত প্রায় অন্যান্য সম্পূর্ণ অংশই আছে। কিন্তু আলোচ্য পুঁথিখানি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ, ইহাতে কালকেতুর নগর পত্তন উপলক্ষে 'ফিরিঙ্গি' শব্দেরও উল্লেখ আছে,[২]—

আইল ফিরিঙ্গি সব বসিল একত্তরে।[৩]

পুঁথির দো-ভাঁজ করা পাতার বিপরীত সাদা পৃষ্ঠায় একটি অসম্পূর্ণ জমাখরচের হিসাব লেখা আছে, তাহাতে ১১৯১ সাল তারিখটি দেওয়া আছে।[৪] পুঁথিটি ঐ সালে অর্থাৎ ১৭৮৫ খৃস্টাব্দে অনুলিখিত হইয়াছিল। ইহার অন্ততঃ একশত বৎসর পূর্বে পুঁথিটি রচিত হওয়া সম্ভব। ইহাতে সপার্ষদ চৈতন্যদেবের বিস্তৃত বন্দনা পাওয়া যায়।[৫] কতকগুলি পদে মুকুন্দরামের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, যেমন নিদয়ার গর্ভবর্ণনা উপলক্ষে মুকুন্দরামে আছে,

প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।

---

১ ক, ৬১৮৫; ২ 'ফিরিঙ্গি' শব্দটির উৎপত্তি ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—Hunter, *History of British India*, Vol. 1, p. 184.

৩ ঐ, ৬৬ (খ); ৪ ঐ, পত্রসংখ্যা ৯১; ৫ ৬০ (খ)

লক্ষপতির স্ত্রীর গর্ভবর্ণনা উপলক্ষে মাণিক দত্তে পাওয়া যায়,

এক মাসের হইল গর্ভ জানাজানি।

এই প্রকার উভয় কবিরই খুল্লনার রন্ধন বর্ণনায় প্রায় অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা হইতে মুকুন্দরাম মাণিক দত্তকে এইসব ক্ষেত্রে অনুকরণ করিয়াছেন, এমন অনুমান করা ভুল হইবে, বরং মুকুন্দরামের অনুকরণেই মাণিক দত্তের নামে পরবর্তী কালে কোন কবি কর্তৃক ইহা রচিত হইয়াছে, ইহাই মনে করা যুক্তিসঙ্গত হইবে। অতএব মনে হয়, মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবি মাণিক দত্তের কোন জীর্ণ ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই বর্তমান কাব্যখানি রচিত হইয়াছিল। যদিও ইহা হইতে মুকুন্দরাম-বন্দিত মাণিক দত্তের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাইবার উপায় নাই, তথাপি চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের ধারা যে মূলতঃ ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়—সম্ভবতঃ প্রাক্‌চৈতন্য যুগের মাণিক দত্তই এই ধারাটির প্রবর্তক।

ধর্মমঙ্গলকাহিনীর অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনাদ্বারা মাণিক দত্তের কাহিনীর আরম্ভ, —গতানুগতিক অন্য কোন দেব-বন্দনা নাই,

হস্ত নাহি পদ নাহি কন্ধ নাহি মাথা।
ধর্ম গোসাঞি জন্মিল যেন কুস্মুম্বের ফল গোটা॥
আচম্বিতে ধর্ম গোসাঞি গোলোক ধিয়াইল।
গোলোক ধিয়াইতে গোসাঞির মুণ্ড জন্মিল॥
আচম্বিতে ধর্ম গোসাঞি জুত (?) ধ্যাইল।
জুত ধিয়াইতে প্রভুর দুই চক্ষু হইল॥[১]

এইভাবে ধর্মের মুণ্ড, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ ইত্যাদি কি ভাবে সৃষ্টি হইল, তাহা পর পর বর্ণনা করিবার পর এইভাবে জলের উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে,—

মুখের অমৃত তাহার খসিয়া পড়িল।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে জল উপজিল॥
জলেত আসন ধর্মের জলেত বৈসন।
জলে ভর করিয়া ভাসেন নিরঞ্জন॥[২]

তারপর ধর্মগোসাঞি হইতে কি ভাবে আত্মার জন্ম হইল, শিবের সঙ্গে আত্মার বিবাহের ফলে প্রজাসৃষ্টি হইল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই

[১] ঐ ১ (খ)   [২] ঐ

আদ্যাই চণ্ডী। চণ্ডীর উৎপত্তি নির্দেশ করিতে গিয়াই এই বিস্তৃত সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করা হইয়াছে।

সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনার পরই চণ্ডীমঙ্গলের গতানুগতিক কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞের বর্ণনায় কবির বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মাণিক দত্তের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, প্রসূতিও শিব-নিন্দায় পঞ্চমুখ; অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ইহা পাওয়া যায় না। প্রসূতির মুখ হইতে স্বামীর নিন্দা শুনিয়া,—

অঝোরে কান্দিয়া চক্ষুর মোছে পানি।
মোর স্বামীর নিন্দা কর অধম জননী॥
যত কন্যা আছে তোমার জগত সংসারে।
কেহ দাসী কেহ দাস কি কব তাহারে॥
শক্তিরূপী দেবী যাহার সন্ধান।
বিষ্ণুরূপী বসোয়া যাহার বাহন॥
তোমার জ্ঞান—না জানিলে সে দেব কেমন।
ভূত ভূত বলি তুমি বোল কার তরে।
পঞ্চভূত আত্মা দেখ তোমার শরীরে॥
সংসারে যত দেখ তাহাতে ব্যাপন।
এমত দেবতাকে বোলে কেমনে অধম॥
যেখানে স্বামীর নিন্দা না রহিব আমি।
আজি হৈতে তোর মুখ না দেখোঁ জননী॥[১]

ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে লহনা-খুল্লনার সম্পর্কটি বর্ণনা করিতে কবি যথার্থ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়াছেন। যখন ধনপতির জাল পত্রটি খুল্লনা অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, তখন,

খুল্লনার বচনে লহনা উঠিল জ্বলিয়া।
লড় দিয়া চুলের মুঠ ধরিল চাপিয়া॥
চুলেত ধরিয়া গালেত দিল চড়।
চাপিয়া বসিল খুলনাইর বুকের উপর॥
কাড়িয়া লইল তার অষ্ট আভরণ।
পরিবার আজ্ঞা দিল খুঞিঞার বসন॥[২]

[১] ঐ, ৯ (খ); [২] ঐ, ৯৯ (ক)

তারপর হইতে খুল্লনার দুঃখের জীবন আরম্ভ হইল,—ইহার বর্ণনাটি যেমন বাস্তব, তেমনই করুণ। বনের মধ্যে খুল্লনা, 'তিক্ত মিষ্ট না বুঝে খায় বৃক্ষের ফল।' সারাদিন বনে ছাগল রাখিয়া সন্ধ্যায় ক্লান্তদেহে, 'নিজপুরে আনিয়া ছাগল গুণি দিল।' কিন্তু তখনও নিষ্কৃতি নাই, 'দুয়ারে প্রহরী থাক লহনা কহিল।' এই বলিয়া লহনা তাহাকে সাবধান করিয়া দিল, 'শৃগালে ছাগল খাইলে নাকে দিব দাও।' তারপর,

পোড়া ধোড়া অন্ন খাই রাত্রি নিশাকালে।
খুদিয়া মানের পাতে তিন দিকে পড়ে॥
ছাগলে করিল লঘ্ঘী মাথার উপর।
হরিদ্রার বর্ণ হইল গায়ের কাপড়॥[১]

ধনপতির কাহিনীটি কালকেতুর কাহিনী হইতে অধিকতর সুপরিকল্পিত, ইহার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সর্বত্র প্রশংসনীয়। কিন্তু পুঁথির রচনা সর্বত্রই অত্যন্ত শিথিলবদ্ধ, ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে সর্বত্রই দায়িত্বহীনতা দেখা যায়।

তবে মাণিক দত্তের রচনা সরল ও অনাড়ম্বর, এই রচনা সরলপ্রাণ ভক্তের মর্মস্পর্শী হইলেও সাহিত্য-রসিকের হৃদয়গ্রাহী হইবার ধৃষ্টতা রাখে না। মঙ্গলচণ্ডী পূজার বিধান নির্দেশ করিতে তিনি লিখিয়াছেন,—

ঘট স্থাপিয়া বৈসে গৌরী পার্বতী
নাট গীতে বড় হৈল রঙ্গ॥
দুয়ারে ব্রহ্মা পাতালে বাসুকি
নবগ্রহ বৈসে স্থানে স্থানে।
অষ্ট নাগকুল লৈঞা আইল মনসাদেবী
সেহ বসে এক স্থানে॥
পূজহি মঙ্গলচণ্ডিকা এক মন চিত্তে
হইয়া হরষিত মনে।
দুর্গারে পূজিলে বিঘ্ন খণ্ডিবে
লক্ষ্মী হবে পরসন্ন।
বারি অবলম্বনে নানা নাট শুভক্ষণে
অষ্টরাত্রি সপ্তদিন পূজন॥

[১] ঐ, ৯৯ (খ)

মাণিক দত্তের কাব্যে চরিত্রসৃষ্টির কোন প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে কেবল কাহিনী দুইটি পাঁচালী ও লাচারীর ছন্দদ্বারা গ্রথিত করা হইয়াছে মাত্র, তিনি ছড়া-পাঁচালীর আকারে লোকমুখে প্রচলিত কাহিনীটিকেই হয়ত একটা যৎসামান্য কাব্য-গৌরব দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অধিকাংশ রচনা তাঁহার ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত। এই সম্পর্কে তাঁহার একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

আমারে বোল ডানরে বুড়িরে আমারে বোল ডান।
কার খাইনু ভাতার পুত কার করিনু হান ॥
ডান নইরে ডান নই হইএ মুখদোষী।
দ্বারে বোসে খাইনু মুই চৌদ্দ ঘর পড়শী ॥
ডাইন বোলিঞা মোরে বোলে বার বার।
দ্বারে বোসে খাইনু মুই বুঢ়া পোদ্দার ॥
উত্তর দেশে গেনু খাইএগ আইনু কাঙ্গাল।
দুয়ারে বসিয়া খাইনু তিন লক্ষ বাঙ্গাল ॥
ডাইন বোলিয়া মোরে বোলে বার বার।
আজিকা হইনু ডান তোমা খাইবার ॥

রচনার দিক দিয়া প্রাচীন ছড়ার আদর্শ হইতে ইহা মুক্ত না হইলেও বিষয়বস্তুর দৃষ্টিভঙ্গিতে কবি এখানে সামান্য স্বকীয়তার দাবী করিতে পারেন মাত্র।

মাণিক দত্তের রচনা পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, তিনি প্রাচীন গৌড় বা মালদহ অঞ্চলের লোক। তাঁহার কাব্য এখনও মালদহ অঞ্চলেই প্রচলিত আছে। তাহাতে যে সমস্ত স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা সমস্তই মালদহ বা গৌড়ের সন্নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। চণ্ডীর চক্রান্তে মগরা নদীর জলে যখন শ্রীমন্তের সমস্ত ডিঙ্গি ডুবিল, তখন তাহাতে মহানন্দা, কালিন্দী, পুনর্ভবা ও টাঙ্গন প্রভৃতি নদীও আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। এই সমস্ত নদীই গৌড়ের সন্নিকটে অবস্থিত। অন্য কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ইহাদের উল্লেখমাত্র নাই। এতদ্ব্যতীত ধনপতি সদাগরের গৌড়ে আগমন উপলক্ষে মাণিক দত্ত এই সমস্ত স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন,

মোড় গ্রামে করি স্নান, রন্ধন ভোজন পান,
ছাত্যা ভাত্যা এড়াইল তথি।
বড় গাছা আগ্‌লা সকল গঙ্গা পার হৈলা
বুধ রাত্রে বানিয়া ধনপতি ॥

কাঞ্চন নগর আইল সদাগর
আইলে বান্ধা সন্ন্যাসী পাটন।
যায় সাধু গঙ্গাজলে স্নান করিয়া চলে
রাজদ্বারে দিল দরশন॥

মোড়গ্রাম, বড়গাছা, আগলা, কাঞ্চননগর ও সন্ন্যাসীপাটন—এই গ্রামগুলি প্রাচীন গৌড়ের ইতিহাসে নদীতীরবর্তী প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিচিত। ছেতে ভেতের বিল বা ছাত্যা ও ভাত্যার বিল গৌড়ের পূর্বদিকে অবস্থিত সুবৃহৎ বিল। বহু প্রাচীন গ্রন্থে ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ভেতে বা ভাত্যার বিল পদ্মার গর্ভ হইতে জন্মিয়াছে, প্রসিদ্ধ 'আইন-ই-আকবরি'তেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌড় হইতে বিদায় হইয়া ধনপতি সদাগর,
গৌড়েশ্বরী প্রণমিঞা গঙ্গাপুর হইল পার।
গঙ্গাস্নান করিয়া করিল ফলাহার॥

গৌড়েশ্বরীর মন্দির গৌড়েই অবস্থিত, কবি সেই অঞ্চলের লোক না হইলে এই গৌড়েশ্বরীর উল্লেখ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। মাণিক দত্ত শ্রীমন্তের চৌতিশায় ভগবতীকে দ্বারবাসিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, এখন পর্যন্তও প্রাচীন গৌড়ের নিকটবর্তী চণ্ডীপুর গ্রামে দ্বারবাসিনী গৌড়েরই বিশিষ্ট দেবতা।

চণ্ডীর রূপ বর্ণনায় মাণিক দত্ত বলিয়াছেন,

মাজাখানি দেখি তোর কেন্দুয়ার নালা।

এই কেন্দুয়ার নালাও মালদহ জেলায় অবস্থিত।

মাণিক দত্ত তাঁহার পুঁথিতে যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিবাস ফুলুয়া নগর। এই ফুলুয়া নগর মালদহ জিলার বর্তমান ফুলবাড়ী বলিয়া অনেকে সন্দেহ করেন। কবির উল্লেখিত স্থানসমূহ ফুলবাড়ীর চতুষ্পার্শ্বেই অবস্থিত বলিয়া এই ধারণা অনেকটা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। *

মাণিক দত্তের আত্মবিবরণী হইতে জানা যায়, তিনি কানা ও খোঁড়া ছিলেন; দেবীর অনুগ্রহে তাঁহার এই উভয় দোষই ঘুচিয়া যায়। চণ্ডী তাঁহাকে অষ্টমঙ্গলার পুঁথি রচনা করিতে স্বপ্নাদেশ করেন। দেবীর প্রসাদে তিনি কবিত্বশক্তি লাভ করেন। এই পুঁথি পাইয়া তিনি গানের দল বাঁধেন। তাঁহার দুইজন দোহার ছিল।

তাহাদের নাম রঘু ও রাঘব। তাহাদিগকে লইয়া তিনি নানা জায়গায় বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে চণ্ডীর গান গাহিয়া বেড়াইতেন,

রঘু রাঘব 'পাইল' দিনু সহিতি করিয়া।
বায়েন তাম্বুর দিনু সম্প্রদা গোছায়া॥
তিন চারি জনে সবে সম্প্রদা হইয়া।
দুর্গার মণ্ডপে সবে উত্তরিল গিয়া॥

কথিত আছে যে, মাণিক দত্তের গানে কলিঙ্গরাজের উল্লেখ থাকাতে তৎকালীন কলিঙ্গরাজ তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজের রাজ্যে ধরিয়া আনেন ও কারাগারে নিক্ষেপ করেন। চণ্ডীর কৃপায় কবি মুক্তিলাভ করেন। কলিঙ্গরাজও চণ্ডীর মাহাত্ম্য দর্শনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিজেও তাঁহার পূজার অনুষ্ঠান করেন। এইভাবে কলিঙ্গরাজ্যে চণ্ডীর পূজা প্রচলিত হয়।

মাণিক দত্ত বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তৎকালীন গৌড়ীয় সমাজে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। মঙ্গলচণ্ডী দেবী যে এই বৌদ্ধ-ধর্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি, সেইজন্য এই হিন্দু পুরাণ-বহির্ভূত বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বের আখ্যান ইহাতে আসিয়া স্থানলাভ করিয়াছে। মালদহে প্রচলিত জগজ্জীবনের মনসার পাঁচালীতেও অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নতুবা অন্য সমস্ত পদ্মাপুরাণেই সৃষ্টির কাহিনী স্বতন্ত্র।

এত প্রাচীন একজন কবির একেবারে খাঁটি রচনার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা দুষ্কর। এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীর বহুল প্রচারের জন্য পরবর্তীকালে এই মাণিক দত্তের কাব্যেও মুকুন্দরামের অনেক পদ আসিয়া প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। পরবর্তী গায়েনগণ মাণিক দত্তের পদের মধ্যে মুকুন্দরামের পদেরও যোজনা করিয়া লইত, তাহাতেই মাণিক দত্তের পুঁথির মধ্যে অনেক স্থলেই মুকুন্দরামের পদের সহিত পরিচয় ঘটে। মাণিক দত্তের কাব্যে একটি পদ পাওয়া যায়,—

মাণিক দত্ত রচিয়া মাণিক দত্ত কৈল।
রঘুর রচনা কবিকঙ্কণ হইল॥

ইহার অর্থ এই হয় যে, মাণিক দত্তের রচিত পদ মাণিক দত্ত নিজে গান করিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে রঘু নামক কোন গায়েন কবিকঙ্কণের রচনা সংযোগ করিয়া দিল। অবশ্য এই পদটিও যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা

হইতেও মূল কবির রচনা-বিকৃতিতে গায়েনদিগের যথেচ্ছাচারিতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

একমাত্র সৃষ্টিতত্ত্বের আখ্যান ব্যতীত মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আর কোন বিষয়ে নূতনত্ব নাই। ইহাতেও দুইটি কাহিনী,—কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ও ধনপতি সদাগরের কাহিনী। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে, পরবর্তী কালে মুকুন্দরামের ব্যাপক প্রভাবের ফলে এই কাহিনীগত সমগ্র অনৈক্য একপ্রকার বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল। অতএব মাণিক দত্তের মূল গ্রন্থের সন্ধান যতদিন না পাওয়া যায়, ততদিন তাঁহার এই সম্পর্কে বৈশিষ্ট্যের কথা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। একমাত্র তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্ব রচনাটিই কালের দুর্জয় পরীক্ষা উপেক্ষা করিয়াও বর্তমান রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বর্ধমানের কবি মুকুন্দরামের নিকট ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগেও মাণিক দত্তের নাম অপরিচিত না হইলেও, তৎপরবর্তী যুগেই তাঁহার প্রচার একমাত্র তাঁহার নিজের অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

দ্বিজ মাধব

সুস্পষ্ট সনতারিখযুক্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বপ্রথম পুঁথি যাঁহার আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহার নাম দ্বিজ মাধব।[১] প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি মাধবাচার্য বা মাধব আচার্য নামে পরিচিত, কিন্তু তাঁহার এই পরিচয় ভ্রমাত্মক, তাহা পরে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে। হস্তলিখিত পুঁথিগুলির প্রারম্ভিক বন্দনা-ভাগের মধ্যে তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়,—

পঞ্চগৌড় নামে এক গ্রামের প্রধান।
একাব্বর অধিকারী অর্জুন সমান॥
প্রতাপে তপন সম জ্ঞানে বৃহস্পতি।
কলিযুগে তার তুল্য রাজা নাহি ক্ষিতি॥

[১] ঢা ৫৫৯এ, ব ১৯১১, ক ২৩১৬; একখানি পুঁথি মুদ্রিত হইয়াও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা নির্ভরযোগ্য নহে—ইহাতে পুঁথির সম্পাদক ইচ্ছামত নূতন পদ যোজনা ও প্রাচীন ভাষার পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' এই কাল্পনিক নাম দিয়া ইহার আর একখানি পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে (কলিকাতা, ১৯৫২)।

সেই পঞ্চ গৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।[১]
ধরায় ত্রিবেণী গঙ্গা বহে নিরন্তর ॥[২]
সপ্তদ্বীপ মাঝারে নদীয়া এক স্থান।
ব্রহ্ম ক্ষেত্রি বৈশ্য শূদ্র অনেক প্রধান ॥
পরাশর সুত হয় মাধব তার নাম।
কলিযুগে ব্যাস তুল্য গুণে অনুপাম ॥[৩]

বিভিন্ন পুঁথিতে উদ্ধৃত অংশে পাঠের কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে, তবে এই বিষয়-সম্পর্কে সকল পুঁথিতেই এক মত দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাধব পঞ্চগৌড়ের অধীন সপ্তগ্রামের অধিবাসী পরাশরের পুত্র। কিন্তু নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সপ্তগ্রামের অধিবাসী পরাশরের পুত্র মাধব স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তিনি 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামক 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র একখানি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন[৪] এবং কোন উপায়ে তাঁহারই এই পরিচয় নাম-সামঞ্জস্যের জন্য দ্বিজ মাধব রচিত চণ্ডীমঙ্গলের এই প্রারম্ভিক বন্দনাভাগের মধ্যে আসিয়া প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। /

'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা দ্বিজ মাধব কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যে নহে, প্রাচীন বাংলার বৈষ্ণব সমাজেও অত্যন্ত সুপরিচিত। তাঁহার কাব্যের কোন কোন ভণিতা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন ও তাঁহার সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যে তাঁহার পিতার নাম পরাশর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত দ্বিজ মাধবের একখানি 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র পুঁথিতেও পাওয়া যায়—

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার।
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥[৫]

এই পরাশরের পুত্র মাধবের বংশধারা আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। তাঁহার বংশধরগণ বর্তমানে ময়মনসিংহ জিলার সদর মহকুমায় গোঁসাই চান্দুরা গ্রামে ও

[১] ব ১৯১১ পুঁথিতে পাঠ, 'সেই পঞ্চগৌড় সম দ্বিজ সমসর'। কিন্তু এই পাঠ ভুল। অন্য পুঁথি হইতে বর্তমান পাঠ লওয়া হইয়াছে।

[২] ইহার পর কোন কোন পুঁথিতে আরও দুইটি পদ পাওয়া যায়,—'মর্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু। ধার্মিক আচারে রাজা বুদ্ধি সুরগুরু ॥' বা-প্রা-পু-বি ১।১, ১৩৯।

[৩] ব ১৯১১, ২য়-৩ক।' [৪] গ-স ৫৪৪৭, গ-স ৩৬০৭ [৫] বা-প্রা-পু-বি ৩।৩, ৭৭

কিশোরগঞ্জ মহকুমায় যশোদল গোঁসাইগঞ্জ গ্রামে বসবাস করিতেছেন। সম্ভবতঃ ইঁহাদের সম্পর্কিত কোন জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়াই স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিজ মাধবের পরিচয় সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন, 'কথিত আছে, "মাধবাচার্য" ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনা নদীর তীরস্থ নবীনপুর (ন্যানপুর) গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই ন্যানপুর এখন গোঁসাইপুর নামে পরিচিত'।[১] বলা বাহুল্য, তিনি এখানে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা দ্বিজ মাধবকে চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজ মাধবের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া ভুল করিয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা দ্বিজ মাধবের বংশধরদিগের গৃহে 'মাধব-বংশ-তত্ত্ব' নামক একখানি কুলপঞ্জিকার পুঁথি আছে —তাহা হইতে নিশ্চিত ভাবে জানিতে পারা যায় যে, গঙ্গাতীরবাসী পরাশরের পুত্র মাধব ময়মনসিংহ জিলার মেঘনা নদীর তীরবর্তী নবীনপুর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন—মাধবের একমাত্র পুত্র জয়রাম গোস্বামী, এই কুলপঞ্জিকাতে পরাশরের ঊর্ধ্বতন পুরুষেরও নামোল্লেখ আছে।[২] গোঁসাই চান্দুরা ও গোঁসাইগঞ্জ গ্রামের অধিবাসী মাধবের বংশধর গোস্বামিগণের স্বধর্মনিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের ধারা আজ পর্যন্তও অক্ষুন্ন আছে। এইজন্য তাঁহারা এখন পর্যন্ত বাংলার বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সম্মানিত স্থান অধিকার করিয়া আছেন। উভয় গ্রামেই এখন পর্যন্ত প্রতি বৎসর তাঁহাদের মধ্যে শ্রাবণী অমাবস্যা তিথিতে আবির্ভাব উৎসব এবং পৌষ অমাবস্যা তিথিতে মাধবের তিরোধান উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে—এই উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী উৎসব হয়, উৎসব উপলক্ষে দ্বিজ মাধব রচিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' পাঠ, কীর্তন ও পূজাদি হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই মাধব চৈতন্যদেবের শ্যালক মাধবাচার্য নহেন; কারণ, তাহা উক্ত বংশলতা দ্বারা কিংবা এই গোস্বামীদের কৌলিক জনশ্রুতি দ্বারাও সমর্থিত হয় না। উক্ত গোস্বামিগণ রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কিন্তু চৈতন্যদেবের শ্যালক মাধবাচার্য বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত। অতএব উক্ত উদ্ধৃত অংশে যে একাব্বর নামক রাজার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যদি দিল্লীশ্বর আকবরই হয়, তাহা হইলেও এই মাধব তাঁহার সমসাময়িক লোক হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। এই মাধবের বংশধরদিগের মধ্যে তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' গ্রন্থরচনার

১ দীনেশচন্দ্র সেন ৩৬০, ২ পুঁথিখানির সন্ধান দিবার জন্য গ্রন্থকার স্বর্গগত সীতানাথ গোস্বামী ভক্তিভূষণ মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। পুঁথিখানি বর্তমানে শ্রীমুরারিমোহন গোস্বামী কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট রক্ষিত আছে; তাঁহারা উভয়েই মাধবের বংশধর এবং উক্ত গোঁসাইগঞ্জ গ্রামের অধিবাসী।

কথা প্রচলিত থাকিলেও তিনি যে কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ কোন ঐতিহ্য একেবারেই প্রচলিত নাই। শুধু তাহাই নহে, চণ্ডীমঙ্গলের মত বিষয়বস্তু রচনা ইঁহাদের কৌলিক সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহারা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব এবং কোন শাক্ত পূজাচার আজিও তাঁহাদের কুলক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। অতএব পরাশরের পুত্র মাধবের সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের কবি দ্বিজ মাধবের কোন সম্পর্ক কল্পনা করা যায় না—তাঁহারা পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁহারা উভয়ে প্রায় সমসাময়িক কালেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং উভয়েই তাঁহাদের স্বরচিত বিভিন্ন বিষয়ক কাব্যে দ্বিজ মাধব ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া পরবর্তী কালে এই নামটি লইয়া অনুলিপিকার ও গায়েনদের মধ্যে গোলযোগ (confusion) সৃষ্টি হওয়ার ফলেই দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র দ্বিজ মাধবের নাম আসিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথির যে অংশে ইহার কবির এই তথাকথিত আত্মবিবরণীটি পাওয়া গিয়াছে, তাহা পুঁথির প্রারম্ভিক বন্দনার অংশ,—এই অংশ সাধারণতঃ গায়েন কর্তৃকই রচিত কিংবা তাহার ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তিত হইয়া থাকে—মূল পুঁথির অন্য কোন স্বাধীন তথ্যদ্বারা ইহার বিষয়সমূহ সমর্থিত না হইলে তাহা কবির নিজস্ব রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বিশেষতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বিজ মাধবের কাব্যের এই প্রথমাংশে দুইটি গণেশ-বন্দনা আছে। একই মঙ্গলকাব্যে দুইটি গণেশ-বন্দনা থাকিবার কোনও কারণ নাই, এ'রকম কোনও নিদর্শন বাংলার আর কোন মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, অতিরিক্ত গণেশ-বন্দনাটি গায়েন কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—সুতরাং গায়েনের হস্তক্ষেপের যে ক্ষেত্রে অন্য প্রমাণও রহিয়াছে, সেখানে এই অংশও যে গায়েনেরই হস্তক্ষেপের ফল, তাহা কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে না। যে পুঁথি আসরে গীত হইয়া থাকে, সেই পুঁথির রচয়িতা সম্বন্ধে আসরে দাঁড়াইয়া একটা পরিচয় দেওয়া মঙ্গলগানের গায়েন মাত্রেরই একটি সাধারণ রীতি (convention)। অতএব মনে হয়, এই অংশ রচনায় গায়েন 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা দ্বিজ মাধবের সুপরিচিত নামটির সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাকর্তৃক গীত চণ্ডীমঙ্গলের গৌরব বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। কাব্যমধ্যে দ্বিজ মাধবের মূল রচনা, 'না আছিল রবি শশী, সন্ন্যাসী তপন, না আছিল হে মেরুমন্দার'[১]—এখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

[১] ব ১৬১১ ৩ (ক)

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, চণ্ডীমঙ্গলের বিভিন্ন পুঁথিতে কবির এই আত্মপরিচায়ক পদগুলির মধ্যে বহু পাঠভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের কবি দ্বিজ মাধবের পরিচয় সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট ধারণা তৎকালীন সমাজে প্রচলিত থাকিলে ইহার পাঠের এত ব্যতিক্রম থাকিবার কথা ছিল না। অতএব একমাত্র চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাঁহার পুঁথি অধিক আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক বলিয়া অনুমান করা ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন নিশ্চিত পরিচয় পাওয়া যায় না।

পূর্বেই বলিয়াছি, চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিজ মাধব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাধারণতঃ মাধবাচার্য বা মাধব আচার্য নামে পরিচিত। তাঁহার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থে যে আত্মবিবরণীটি প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে এই দুইটি পদ পাওয়া যায়,

তাহার তনুজ আমি মাধব আচার্য।
ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' এই মুদ্রিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই দ্বিজ মাধবের আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উদ্ধৃত অংশ হইতে কবির মাধব আচার্য বা মাধবাচার্য নামই অধিক প্রচার লাভ করিয়াছে। মনে হয়, মুদ্রিত পুঁথির সংস্কর্তা বৈষ্ণব সমাজের মাধবাচার্যের সঙ্গে এই চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতার নামের গোলযোগ করিয়া এখানে তাঁহারও মাধব আচার্য নামই কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে উক্ত পদ দুইটি দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং মূল কাব্যমধ্যেও কবি কোথাও মাধব আচার্য কিংবা মাধবাচার্য বলিয়া ভণিতা ব্যবহার করেন নাই। চণ্ডীমঙ্গলের মাধব সর্বত্র দ্বিজ মাধব, মাধবানন্দ, দ্বিজ মাধবানন্দ এই প্রকার ভণিতাই ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব উপরি-উদ্ধৃত পদ দুইটি অপ্রামাণিক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডীমঙ্গলের কবির নাম দ্বিজ মাধব বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত।

কেহ কেহ মনে করেন, দ্বিজ মাধব আচার্য উপাধিধারী গ্রহবিপ্র ছিলেন; কারণ, সূর্য-বন্দনা দিয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। এ'কথাও স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না; কবির স্বহস্তলিখিত কিংবা সমসাময়িক কালে প্রচলিত পুঁথি যখন আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া কেহই দাবী করেন না, এই অবস্থায় সূর্য-বন্দনায় তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে তাহা বলা যায় না, তাঁহার প্রাচীনতম পুঁথিও তাঁহার সময় হইতে প্রায় এক শত বৎসর ব্যবধানে অনুলিখিত। বিশেষতঃ তাঁহার মুদ্রিত

গ্রন্থের এই বন্দনা-ভাগে বিভিন্ন অংশ যে ভাবে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাতে ইহার কোনও অংশ কবির মৌলিক রচনা বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। তবে সূর্যের বন্দনা দিয়া তাঁহার কোন কোন পুঁথি (সকল পুঁথি নহে) আরম্ভ হইয়াছে, এ'কথা সত্য। দেখিতে পাওয়া যায় যে, চট্টগ্রাম হইতে আবিষ্কৃত একখানি অতি প্রাচীন পূর্ণাঙ্গ পুঁথিতে সূর্য-বন্দনার পরিবর্তে গতানুগতিক গণেশ বন্দনা ও সরস্বতী বন্দনা দিয়া, এই ভাবে তাঁহার পুঁথি আরম্ভ হইয়াছে, যথা,—

'নমো গণেশায় ! নমো সরসৈত্য নমোঃ।
নমো ২ নমো দেবি নমো নারাঅনি।
প্রসিদ্ধ চণ্ডিকা মাতা বিপদ নাসীনী ॥'[১] ইত্যাদি

বিশেষতঃ অনুলিপিকার কর্তৃক লিখিত ও গায়েন কর্তৃক ব্যবহৃত কোন পুঁথির বন্দনা-ভাগ হইতে মূল পুঁথির রচয়িতার ধর্মবিশ্বাস-সম্পর্কিত কোন পরিচয় পাইবার উপায় নাই। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, এইপ্রকার বন্দনা রচনা পুঁথির গায়েনদিগের ব্যক্তিগত ধর্মবোধ দ্বারা সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে,—তাহারা তাহাদের নিজেদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী নূতন দেবতার বন্দনা ইচ্ছামত যোজনা ও পুরাতন বন্দনা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব চণ্ডীমঙ্গলের কোন কোন পুঁথি যদি সূর্য-বন্দনা দিয়াই আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে সেই গ্রন্থের মূল কবি আচার্য ব্রাহ্মণ ছিলেন এ'কথা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় না। বিশেষতঃ এ'যাবৎ আবিষ্কৃত সকল পুঁথিতেই যখন সূর্য-বন্দনার পদ পাওয়া যায় না, তখন এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করিবারও অবকাশ নাই। পূর্ববঙ্গে মঙ্গলগানের গায়েন-বৃত্তি প্রধানতঃ আচার্য ব্রাহ্মণ কিংবা ভাট ব্রাহ্মণগণেরই কাজ, কোন কোন পুঁথিতে এই সূর্য-বন্দনা পুঁথির মালিক কোন আচার্য ব্রাহ্মণ শ্রেণীর গায়েন কর্তৃকই সংযোজিত হইয়া থাকিবে। অতএব ইহা দ্বারাও দ্বিজ মাধবের মাধবাচার্য বা মাধব আচার্য নাম সমর্থনীয় হয় না। বিশেষতঃ সূর্য পঞ্চোপাসক হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম নিত্য উপাস্য দেবতা, অতএব উচ্চবর্ণের হিন্দু গায়েন কর্তৃক সূর্য-বন্দনা রচিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে। তারপর সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিজ মাধব রচিত কোন কোন পুঁথির প্রারম্ভিক বন্দনা-ভাগ ব্যতীত, তাঁহার মূল কাব্যের মধ্যে আর এমন কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহা দ্বারা এই

[১] ব ১৬১১, ১ (ক)

কাব্যের কবি আচার্য ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ছিলেন বলিয়া দাবী করা যাইতে পারে। দ্বিজ মাধব পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়, চট্টগ্রাম অঞ্চলেই তাঁহার পুঁথি অধিক আবিষ্কৃত হইয়াছে, দুই একখানি পুঁথি কুচবিহার ও রংপুর অঞ্চলেও পাওয়া গিয়াছে, পশ্চিম বঙ্গে তাঁহার কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। এই সমস্ত কারণেই মনে হয়, তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন।[১] ইহার অতিরিক্ত তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা যায় না।

দ্বিজ মাধব তাঁহার কাব্যমধ্যে ইহার রচনার কাল সম্পর্কে এই ভাবে নির্দেশ দিয়াছেন,—

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধব গায় সারদা চরিত॥[২]

এই পদ দুইটি তাঁহার সকল পুঁথিতেই পাওয়া যায়, অতএব ইহা নিঃসন্দেহে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই পদ অনুসারে হিসাব করিয়া পাওয়া যায় যে, ১৫০১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৯ খৃস্টাব্দে দ্বিজ মাধব তাঁহার কাব্য রচনা করেন।

দ্বিজ মাধব তাঁহার কাব্যকে কোন কোন স্থলে 'সারদা-চরিত' বলিয়া উল্লেখ করিলেও, 'সারদা-মঙ্গল' বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

সারদা-মঙ্গল দ্বিজ মাধবে রস গায়।[৩]
দ্বিজ মাধবে গায় সারদা-মঙ্গল॥[৪]

কবি যে ক্ষেত্রে তাঁহার কাব্যের নাম সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে তাঁহার প্রদত্ত নাম পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত কোনও নাম যদি তাঁহার গ্রন্থের কোনও সম্পাদক গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার সে কার্য কিছুতেই সমর্থন করিতে পারা যায় না। ইহাতে কবির প্রতি অশ্রদ্ধা এবং নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। সুতরাং দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের নাম 'সারদা-চরিত' অথবা 'সারদা-মঙ্গল'—ইহা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব ইহার দ্বিতীয় মুদ্রিত সংস্করণের সম্পাদক যে ইহার 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' এই নামকরণ করিয়াছেন, তাহা সমীচীন হয় নাই।

১ কুচবিহার অঞ্চলের 'চণ্ডিকার ব্রতকথা' নামক এই বিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র কাব্যের লেখকের নাম মাধবচন্দ্র (*DCBMCB* 29); ইহার সঙ্গে দ্বিজ মাধবের কোন সম্বন্ধ নাই।

২ ব ১৬১১; ১০২ (ক) ৩ ঐ ৭০ (ক) ৪ ঐ ১০৬ (ক)

দ্বিজ মাধবের অধিকাংশ ভণিতাই প্রায় এই প্রকার,—

সারদার চরণ-সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধব তথি অলি হৈয়া শোভে॥

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর কবি বলিতে কেবল মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্রকেই বুঝায়। দ্বিজ মাধবকে যদিও একজন প্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না, তথাপি আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পূর্ণাঙ্গ চরিত্র-সৃষ্টির এমন মৌলিক প্রয়াস তাঁহার পূর্বে আর খুব বেশী কবি দেখাইতে পারেন নাই। এ'কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাংলা সাহিত্যে তখনও মুকুন্দরামের আবির্ভাব হয় নাই—অতএব তাঁহার আদর্শের সুযোগ গ্রহণ করা তাহা দ্বারা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং এই বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব প্রশংসনীয় বলিতেই হইবে। কালকেতুর কাহিনীর মধ্যে ব্যাধ নায়ক ও তাহার পত্নীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যটুকু বিকাশ করিয়া তোলা একমাত্র কবিত্ব-গুণ থাকিলেই যে সম্ভব হয় তাহা নহে, তাহার মধ্যে সেই অনার্য জীবনের প্রতি সহানুভূতি-মূলক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন। দ্বিজ মাধবের যে সেই অভিজ্ঞতা ছিল, তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহা না থাকিলেও তাঁহার মানব-চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা এত নিপুণ ছিল যে, তাহা দ্বারাই তিনি নিজের সমাজ-বহির্ভূত এই অনার্য জীবনের চিত্রটিকে বাস্তব ও সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তথাপি এ'কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, এবং একান্ত ব্রতকথাধর্মী হইয়া আছে। নিরলঙ্কারা ভাষা ও অনাড়ম্বর ভাববর্ণনার গুণে এই চিত্রগুলি সংক্ষিপ্ত হইলেও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাধশিশু কালকেতুর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন,

বাড়ে হে বীরবর, যেন মত্ত করিবর
গজশুণ্ড জিনি দুই কর।
আখেটির সুত সব, তারা সব পরাভব
খেলায় জিনিতে নাহি পারে॥
বাঁটুল বাঁশ লৈয়া করে পশু বধিবার তরে
তার ঘাও বৃথা নাহি যায়।
কুঞ্চিত করিয়া আঁখি ডাকিয়া পড়য়ে পাখী
ঘুরি ঘুরি পড়য়ে তথায়॥[১]

---

[১] ঐ ১০ ক

বর্ণনার স্বাভাবিকত্বই দ্বিজ মাধবের বিষয়বস্তুকে কতকটা বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। কালকেতুর কাহিনীর মত ধনপতি সদাগরের কাহিনীও তাঁহার সমাজের ব্যক্তি-চরিত্রে গভীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। লহনা খুল্লনার বিবাদে সপত্নী-বিদ্বেষের যে শোচনীয় চিত্রখানি কবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা এই বহুবিবাহ-পীড়িত বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবনের কলঙ্ক রূপে চিরদিন অম্লান হইয়া থাকিবে। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া অতিক্রান্ত-যৌবনা পত্নী যুবতী সতিনীর উপর যে নির্যাতন করিতেছে, তাহার এই চিত্রখানি কেবল স্বাভাবিক বলিয়াই মর্মস্পর্শী,—

খুল্লনা বসিলা ছেলী থুইয়া অজাশালে।
মানের পাতে লহনায় ক্ষুদের অন্ন বাড়ে॥
অল্প অন্ন দিল ছেছা পোড়া বহুল।
পাট শাক রান্ধি দিল পাকা কলার মূল॥
ভাঙ্গা নারিকেলে জল দিল সুবদনী।
ভোজন করিতে বৈসে খুলনা বাণ্যানী॥
অন্ন লইয়া লহনায় দুহাতে ধরে পাত।
খুলনারে দিল নিয়া ঢেঁকিশালে ভাত॥
ছেছা পোড়া অন্ন দেখি নাড়ি চাড়ি চায়।
ক্ষুধার কারণে রামা তাহা কিছু খায়॥
ঘৃণা জন্মিল শেষে পিপীলিকা দেখি।
অন্ন ত্যজিয়া তখন উঠে চন্দ্রমুখী॥
দুই হাতে ধরি পাত্র পেলাইল অন্তরে।
থুইঞা বাস পরিয়া শুইল ঢেঁকিশালা ঘরে॥
অপমান পাইয়া বিধিরে পাড়ে গালি।
ক্ষুদের গন্ধে কামড়ায় খুদিয়া পিপড়ি॥
সমস্ত যামিনী রামা কান্দি গোয়াইল।
প্রভাত সময়ে মাত্র কিছু নিদ্রা হইল॥
বিভাবরী অস্ত গেল উদিত অরুণি।
চৈতন্য পাইয়া উঠে লহনা বাণ্যানী॥
জাগিয়া দেখিল রামা ছেলী আছে ঘরে।
খুলনা খুলনা বলি ঘন ডাক ছাড়ে॥

নিদ্রার কারণে কিছু না শুনে খুলনি।
মুখেতে ঢালিয়া দিল ছুয়া ঝারির পানি॥
আস্তে ব্যস্তে উঠে রামা ভয়েত আকুল।
কাপড় টানিয়া পরে ভিরে বান্ধে চুল॥
লহনায় বলে শুন খুলনা রূপসী।
এতক্ষণ ছেলী মোর রৈছে উপবাসী॥
খুলনায় বলে দিদি গায়ে মোর জ্বর।
হস্ত দিয়া চাহ মোর ললাট উপর॥
অবসাদ মাত্র দেয় আজি না যাইমু।
কালিকা প্রভাতে দিদি ছেলী লইয়া যাইমু॥
লহনায় বলে বিটি লজ্জা নাই তোর গায়।
আপনা গৌরব রাখি ছেলী লইয়া যায়॥
লহনার বাক্যে রামা সহিতে না পারে।
ছাগল লইয়া চলে কানন ভিতরে॥[১]

ইহাতে রচনার পারিপাট্য নাই, উন্মাদিনী কবি-কল্পনার লাস্য নৃত্যও নাই, একমাত্র অনাড়ম্বর ভাব ও ভাষার ভিতর দিয়া একান্ত প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যের সহানুভূতিপূর্ণ সহজ বর্ণনা আছে; সুনিপুণ বস্তুবিশ্লেষণ গুণের সঙ্গে এখানে কবিমনের সহজ সমবেদনাটুকু যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু বর্ণনার সংক্ষিপ্ততার জন্য এবং কেবলমাত্র গতানুগতিক পথ অবলম্বন করিবার জন্য তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন বিশিষ্ট স্থান লাভ করিতে পারেন নাই।

দ্বিজ মাধবের অন্যতম প্রধান গুণ, যতই সংক্ষিপ্ত হউক তিনি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বাঙ্গালী জীবনের বিচিত্র বাস্তব পটভূমিকার উপর একটি গার্হস্থ্য চিত্র বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন। এই চিত্রটি বর্ণনার মধ্যে তাঁহার যে বস্তুনিষ্ঠা ও সহজ সাবলীলত্বের ভাব সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সেই যুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম বিস্ময়। দ্বিজ মাধবের কাব্যেই সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায় যে, কবি তাঁহার বর্ণিতব্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নহেন, একটি পরম সহানুভূতি-সজাগ হৃদয় লইয়া তিনি ইহার মধ্যে নিজেও লিপ্ত হইয়া গিয়াছেন। পরবর্তী কবি মুকুন্দরামের সঙ্গে তাঁহার একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, মুকুন্দরামের কাব্যে তাঁহার

---

১ ঐ, ৫১খ-৫২খ

ব্যক্তিগত জীবনের বহু ছায়াপাত হইয়াছে এবং সেই সূত্রেই তিনি তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে গ্রথিত, কিন্তু দ্বিজ মাধবের সঙ্গে তাঁহার কাব্য-বর্ণিত বিষয়ের ব্যক্তিগত কোন যোগ ছিল না, তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতি-প্রবণতা কিংবা মানব-চরিত্র সৃষ্টির কৌশলই তাঁহার এই বিষয়ে সার্থকতা দান করিয়াছে। দ্বিজ মাধবের ভাঁড়ু দত্ত চরিত্র তাঁহার সৃষ্ট অন্যান্য চরিত্রের মত সংক্ষিপ্ত নহে—সেইজন্য ইহার মধ্যে তাঁহার বাস্তব জীবন দর্শন সর্বাপেক্ষা সার্থক হইয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মাধবের রচনার মধ্যে বিশেষ পারিপাট্য নাই, সহজ ভাবে তিনি ঘরের কথা বলিয়াছেন; তবে তাঁহার রচনার সর্বত্র একটি অনাড়ষ্ট ও সাবলীল ভাব আছে, তাহাই কাহিনী দুইটিকে সহজ ভাবে শেষ পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। দুই এক জায়গাতে তিনি ছন্দেরও কিছু কিছু বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—

ভাল হইল আসিয়া এথায়।
দোষগুণ বিচার সভায় ॥
ছেলী রাখে সাধুর আরতি।
হয় না হয় পড়ি চাও পাতি ॥
আপনার কপাল নহে ভাল।
তে কারণে তুমি মন্দ বল ॥
শরীর পোড়এ এই বিষে।
এই জ্বালা ঘুচাইব কোন দেশে ॥
দ্বিজ মাধবে এই ভণে।
হাসে কাম লহনা বচনে ॥[১]

দ্বিজ মাধবের কবি-যশ যে তাঁহার পরবর্তী কবি মুকুন্দরাম হরণ করিয়া লইয়াছেন, এ'কথা সত্য নহে। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুকুন্দরাম দ্বিজ মাধবকে আদর্শ করিয়া কাব্য রচনা করেন নাই, তাঁহার আদর্শ ছিল মাণিক দত্ত। যে অঞ্চলে দ্বিজ মাধবের কাব্য প্রচলিত ছিল, সেই অঞ্চলে মুকুন্দরামের কাব্য অপরিচিত এবং যে অঞ্চলে মুকুন্দরামের কাব্য প্রচলিত ছিল সেই অঞ্চলে দ্বিজ মাধবের কাব্য অপ্রচলিত ছিল। দুই কবি মধ্যযুগে বাংলার দুই অঞ্চলে আবির্ভূত হইয়া পরস্পর দুইটি স্বতন্ত্র অঞ্চলে নিজেদের কাব্যের প্রচার করিয়াছিলেন।

১ ঐ, ৫৪ (ক)

চণ্ডীমঙ্গল রচনার মূল ধারাটি উভয়েই অনুসরণ করিলেও পরস্পর পরস্পর দ্বারা যেমন প্রভাবিত হন নাই, তেমনই একজনের কাব্যও আর একজনের কাব্যকে লুপ্ত করিয়া দিতে পারে নাই। দ্বিজ মাধবের কাব্য পূর্ববঙ্গ প্রধানতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিদিগের যেমন আদর্শস্থানীয় ছিল, মুকুন্দরামের কাব্যও রাঢ়ের কবিদিগের তেমনই আদর্শস্থানীয় ছিল। দ্বিজ মাধবের সঙ্গে মুকুন্দরামের তুলনামূলক কোনও আলোচনার অবকাশ নাই। কারণ, দ্বিজ মাধব চট্টগ্রামের ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, মুকুন্দরাম রাঢ়ের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াছেন। কাহিনীর দিক দিয়া অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে ইঁহাদের পরস্পরের সঙ্গে পার্থক্য আছে। একই ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া উভয়েই কাব্য রচনা করিলেও ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে তুলনার সুযোগ পাওয়া যাইত, এই ক্ষেত্রে তাহা পাওয়া যায় না। তবে আপাত দৃষ্টিতে ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিতে বেগ পাইতে হয় না।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়া রচিত চণ্ডীমঙ্গলগুলির মধ্যে বৈষ্ণব-পদাবলীর অনুরূপ কতকগুলি গীতি-রচনা স্থান পাইয়াছে। দ্বিজ মাধব ইহাদিগকে বিষ্ণুপদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ দ্বিজ মাধবই এই রীতির প্রবর্তক। ইহা দ্বারা সে যুগের মঙ্গলকাব্যের উপর বৈষ্ণব প্রভাব যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনই আখ্যানমূলক কাব্যরচনার অন্তরালেও মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের যে গীতি-প্রাণতার ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাও অনুভব করিতে পারা যায়। তবে সকল বিষ্ণুপদই যে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ রচনা করিতেন, তাহা নহে—অনেক সময় সমসাময়িক কালে প্রচলিত কোনও সুপরিচিত বৈষ্ণব পদও এই অঞ্চলের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিষ্ণুপদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অনেক সময় এই সকল বিষ্ণুপদ গায়েন কর্তৃক সংযোজিত হওয়াও অসম্ভব নহে। দ্বিজ মাধবের পুঁথিতে দ্বিজ মাধব, দ্বিজ মাধবানন্দ ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত বিষ্ণুপদ ব্যতীতও দ্বিজ লক্ষ্মীনাথ, দ্বিজ কামদেব, দ্বিজ পার্বতী, রায় অনন্ত ও অনন্ত দাসের ভণিতাযুক্ত বিষ্ণুপদও পাওয়া যায়। তাঁহার একটি বিষ্ণুপদে কবীরের একটি দোঁহার বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়। তবে এই অনুবাদটি কে করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। দ্বিজ মাধবের পুঁথির অনেক বিষ্ণুপদে কাহারও ভণিতা পাওয়া যায় না—ইহারাই যে কাহার রচনা, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। দ্বিজ মাধবের পুঁথিতে ব্যবহৃত বিষ্ণুপদগুলি মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর কতকগুলি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোন বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহে

দ্বিজ মাধবের বিষ্ণুপদগুলি স্থান লাভ করিতে পারে নাই। মনে হয়, বৈষ্ণব বিষয়ক পদ হওয়া সত্ত্বেও ইহারা 'মহাজন' কর্তৃক রচিত নহে বলিয়াই বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। এই দ্বিজ মাধব যদি পরাশর-পুত্র রাঢ়ীয় গোস্বামী শ্রেণীভুক্ত কিংবা চৈতন্যপার্ষদ বৈদিক শ্রেণীভুক্ত মাধবাচার্য হইতেন, তবে এই পদগুলি নিঃসন্দেহে বৈষ্ণব-পদ-সঙ্কলনে স্থান লাভ করিত।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী বর্ণনা-প্রসঙ্গে যখন কৃষ্ণ-লীলার অনুরূপ কোনও প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইত, তখনই সেইখানে একটি অনুরূপ বিষয়ক বিষ্ণুপদ রচিত হইত। বিষ্ণুপদ রচনায় দ্বিজ মাধব সর্বতোভাবে বৈষ্ণব পদাবলীকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। খুল্লনার বাসরে গমন বর্ণনায় ভূমিকারূপে এই বিষ্ণুপদটি রচিত হইয়াছে—

কহ কহ কলাবতী কাহারে পয়ান।
ও রূপ বাজল যেন পঞ্চবাণ॥
রূপে ডগমগ গোরিয় গাতে।
অঙ্গের সৌরভ গগনে স্থজাতে॥
নাসা নিরমল কনক বেশরী।
অঞ্জনে রঞ্জিত খঞ্জন-যুড়ি॥
ভুরুর ভঙ্গিমা চাহনি ছান্দে।
ধনু-শর পেলাইয়া মদন কান্দে॥
হাসে আধ আধ মধুর বোল।
গাহে মাধব কেশ খসি পড়ে ফুল॥

দ্বিজ মাধবের এই প্রকার বিষ্ণুপদ ব্যবহারের রীতি চট্টগ্রাম অঞ্চলের তাঁহার পরবর্তী কবিগণও অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু রাঢ় কিংবা বরেন্দ্র ভূমির চণ্ডীমঙ্গলের কবিদিগের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত হইতে পারে নাই।

কেহ কেহ মনে করেন, মুকুন্দরামের পূর্বে বলরাম কবিকঙ্কণ নামক একজন কবি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন—মেদিনীপুর অঞ্চলে তাঁহার কাব্য প্রচলিত ছিল।[১] কিন্তু এই বিশ্বাসের যে কোন ভিত্তি নাই, তাহাও বহু পূর্বেই দেখান হইয়াছে।[২] কবিকঙ্কণ উপাধিধারী প্রত্যেক কবিই মুকুন্দরামের অনুকরণেই এই

[১] দীনেশচন্দ্র সেন, ৩৫৯; বিশ্বকোষ ১২, ৬৭৭; চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ৯০৫

[২] সা-প-প, ২, ১০৮-১০

উপাধি ধারণ করিয়াছেন, মুকুন্দরামের প্রচার হইতেই এই উপাধিটিরও এত প্রচার হইয়াছিল যে অসমীয়া ভাষায়ও একজন কবি কবিকঙ্কণ ভণিতায় কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।[১]

মুকুন্দরাম

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।[২] তিনি তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তাঁহার গ্রন্থোৎপত্তির যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, নানা দিক দিয়াই তাহা অত্যন্ত মূল্যবান্। সেইজন্য তাহা আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিতেছি,—

শুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ,
এই গীত হৈল যেন মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র দেশে
চণ্ডিকা বসিল আচম্বিতে ॥

সহর সিলিমাবাজ তাহাতে সজ্জন রাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণু পদাম্বুজ-ভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ ॥

উজির হ'লো রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥

সরকার হইলা কাল খিলভূমি লেখে লাল,
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥

---

[১] P. Goswami, 'Assamese Phakars and Riddles', *The Journal of the Assam Research Society*, XII (1942), 13.

[২] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী (কলিকাতা, বঙ্গবাসী, ১৩৩২)।

ডিহিদার অবোধ খোজ, কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥
পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হৈল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়ালি,
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, চণ্ডী বাটী যার গাঁ
যুক্তি কৈলা মুনিব খাঁর সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রমানাথ ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে ॥
ভেঠনায় উপনীত রূপ রায় নিল বিত্ত
যদু কুণ্ডু তিলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা ॥
বহিয়া গোড়াই নদী সদাই স্মরিয়ে বিধি
তেউট্যায় হইলুঁ উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি পাইল বাতন-গিরি
গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত ॥
নারায়ণ পরাশর এড়াইল দামোদর
উপনীত কুচট্যা নগরে।
তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান করিলুঁ উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে ॥
আশ্রম পুখরি আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া
পূজা কৈলুঁ কুমুদ-প্রসূনে।
ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
হাতে লইয়া পত্রমসী আপনি কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।'

যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য ॥
দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ ছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়া যাই
আড়রায় হইলুঁ উপনীত ॥
আড়রা ব্রাহ্মণ-ভূমি ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী সম্ভাষিনু নৃপমণি,
পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান ॥
সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
গুরু করি করিল পূজিত ॥
সঙ্গে দামোদর নন্দী যে জানে স্বরূপ সন্ধি
অনুদিন করিত যতন।
নিজে দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়েনেরে দিলেন ভূষণ ॥
বীর মাধবের সুত রূপগুণে অদভুত
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান্।
তার সুত রঘুনাথ, রাজগুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান ॥

[১] বর্ধমান জিলার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে কবির পৈতৃক বাসস্থান ছিল। ডিহিদা[র] মাহমুদ সরিপের অত্যাচারে তিনি সাত পুরুষের বাসস্থান পরিত্যাগ [করিয়া] মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত আড়রা গ্রামের পালধি বংশজাত ব্রাহ্মণ [রাজা] বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে গমন করেন। বিদ্যোৎসাহী রাজা বাঁকুড়া রা[য়] নিজের পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার জীবিকা[র ব্যবস্থা] করিয়া দেন। বাঁকুড়া রায় অল্পকাল মধ্যেই দেহত্যাগ করেন, nal of the তাঁহার পুত্র রঘুনাথ রাজা হন। রঘুনাথেরই সভাসদ্‌রূপে ক

তাঁহারই অভিলাষে মুকুন্দরাম তাঁহার প্রসিদ্ধ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তিনি বলিয়াছেন,—

রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত, রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ, রুচি চারুপদ, শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

বর্তমান সময়ে রাজা রঘুনাথের বংশধরগণ আড়রা গ্রামের চারি মাইল দূরবর্তী সেনাপতি নামক গ্রামে অত্যন্ত দীন অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন; তাঁহাদের জমিদারীর সর্বস্ব বর্ধমানরাজের জমিদারিভুক্ত হইয়াছে। তাঁহারা বর্তমানে রঘুনাথ রায় হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ।

মুকুন্দরামের বংশধরগণ বর্তমানে বর্ধমান জিলার অন্তর্গত রায়না থানায় ছোট বৈনান গ্রামে বাস করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। কেহ বলেন, মুকুন্দরামের বংশধরগণ বর্তমানে তিন স্থানে বসবাস করিতেছেন,—কবির পৈতৃক বাসস্থান দামুন্যায়, মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত বীরসিংহে ও হুগলী জিলার অন্তঃপাতী রাধাবল্লভপুরে। তাঁহারাও বর্তমানে কবিকঙ্কণ হইতে অধস্তন একাদশ কিংবা দ্বাদশ পুরুষ।

মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্য-মধ্যে নিজের পরিচয় সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন,

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতা হৃদয় মিশ্র, জ্যেষ্ঠ সহোদর কবিচন্দ্র; সম্ভবতঃ কবিচন্দ্র উপাধি, নাম নহে। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে কবিচন্দ্র উপাধি-বিশিষ্ট বহু কবির সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, ইঁহাদের মধ্যে মুকুন্দরামের গ্রজ যে কে, তাহা নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না। কবি তাঁহার পরিচয়-আরও উল্লেখ করিয়াছেন,

কয়্যরি কুলেতে জাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে পূজিল গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর মন্ত্র জপি দশাক্ষর
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল॥

কবির পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, কয়্যরি গাঞি।

দেখা যাইতেছে যে, তিনি কবিত্ব-বর লাভ করিবার জন্য সাত্ত্বিক বৈষ্ণবাচারে দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে উপাসনা করিয়াছিলেন। কবির পিতা হৃদয় মিশ্রকেও কবি গুণিরাজ মিশ্র বলিয়া ভণিতায় উল্লেখ করিয়াছেন; মনে হয়, গুণিরাজ হৃদয় মিশ্রের উপাধি ছিল। কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে পুত্র, পুত্রবধূ ও কন্যা-জামাতার জন্যও চণ্ডীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন,

উর মা কবির কামে, কৃপা কর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে।

তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম শিবরাম, কন্যার নাম যশোদা, পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা ও জামাতার নাম মহেশ। গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে গ্রন্থের মধ্যে যে সমস্ত নির্দেশ রহিয়াছে, তাহা হইতে এই বিষয়ে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইবার উপায় নাই। তবে আনুমানিক একটা সময় সম্বন্ধে ধারণা করিয়া লইতে বেগ পাইতে হয় না।

মুকুন্দরামের কাব্যের কোন কোন মুদ্রিত পুঁথির শেষভাগে এই দুইটি পদ দেখিতে পাওয়া যায়,—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

কোন হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিতেই এই পদ দুইটি পাওয়া যায় না। ইহা হইতে গ্রন্থ রচনার একটা সময়ের নির্দেশ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু কতকগুলি কারণে এই পদটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাহা ক্রমে উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ এই পদ দুইটি বিশ্লেষণ করিলে ইহাদের এই অর্থ হয় যে, ১৪৯৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃস্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়। কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত কবির আত্মবিবরণীতে কবি রাজা মানসিংহকে গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার ইতিহাস হইতে প্রামাণ্যভাবে জানিতে পারা যায় যে, মানসিংহ ৪ঠা মে ১৫৯৪ খৃস্টাব্দ হইতে ১৬০৬ খৃস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলার সুবাদার বা শাসনকর্তা ছিলেন।[১] অতএব ১৫৭৭ খৃস্টাব্দে গ্রন্থ-রচনা সম্পন্ন করিয়া মুকুন্দরাম মানসিংহের উল্লেখ করিতে পারেন না। শুধু তাহাই নহে, মানসিংহকে গৌড়, বঙ্গ

---

১ H. B. II., 211-15; কাহারও হিসাবে ৫ই মে হইতে, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 'প্রতাপাদিত্যের কথা', ভারতবর্ষ, ফাল্গুন (১৩৩৯), ৩৫৯-৬০

ও উৎকল বা উড়িষ্যার অধিপ বলা হইয়াছে। জানিতে পারা যায় যে, ওসমান্ মোগলের হস্ত হইতে ১৬০০ খৃস্টাব্দে উড়িষ্যা পুনরধিকার করিয়া লন।[১] অতএব ১৫৯৪ খৃস্টাব্দ হইতে ১৬০০ খৃস্টাব্দের পূর্বে কোন সময়ে এই কাব্য-রচনা সম্পন্ন হইয়াছে বলিতে হয়।

অনেকে মনে করেন, 'ঐ ১৪৯৯ গ্রন্থের আরম্ভ কালের শক,—সমাপ্তি-কালের শক নহে। ঐ শকে তিনি আড়রা নগরে অবস্থানপূর্বক চণ্ডী রচনার আরম্ভ করিয়া ১২।১৪ বৎসর পরে অর্থাৎ যখন মানসিংহের আধিপত্য দেশমধ্যে সুবিদিত হইয়াছিল, তৎকালে রচনার শেষ করিয়া থাকিবেন এবং এখনকার গ্রন্থকারেরা যেরূপ রচনা সমাপ্তি করিয়া শেষে ভূমিকা লিখিয়া থাকেন, বোধ হয় তিনিও সেইরূপ গ্রন্থ রচনা সমাপনের পর পরিশেষে "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" শীর্ষক সূচনা-ভাগটি লিখিয়া গ্রন্থের প্রথমভাগে যোজনা করিয়া দিয়াছেন।'[২]

কিন্তু যে স্থলে সাধারণতঃ গ্রন্থ রচনার উপরি-উদ্ধৃত সময়-নিরূপক পদ দুইটি পাওয়া যায়, সেই স্থলটি পূর্বাপর একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় হয় যে, তাহা মুকুন্দরামের রচনা নহে; স্থানটি একটু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে,—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥
অভয়া-মঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ।
আসোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ॥
কলি কালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ।
যার যেবা মনোরথ পূরে তার আশ॥
ব্রাহ্মণ শুনিলে ধর্মশাস্ত্রের ভাজন।
যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিবে ক্ষত্রিগণ॥

ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এই অংশ প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীমঙ্গলের শ্রবণ-মাহাত্ম্য। এই শ্রেণীর মাহাত্ম্য কীর্তন সাধারণতঃ পুস্তকের শেষ ভাগে গায়েন কর্তৃক সংযোজিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ উদ্ধৃত পদভাগের ভাষা দেখিয়াও মনে হয়, ইহা স্বতন্ত্র হস্তের রচনা, মুকুন্দরামের মত নিপুণ কবির রচনা নহে,—ইহা মুকুন্দরামের সুপরিচিত রচনাশৈলীরও অনুগামী নহে। পরবর্তী কালে কোন গায়েন

---

১ ঐ ৩৬০ রামগতি ন্যায়রত্ন ৯০, দীনেশচন্দ্র সেন ৩৬৬

হয়ত সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া একটা সময়জ্ঞাপক পদ রচনাপূর্বক এই গ্রন্থের শেষ ভাগে জুড়িয়া দিয়াছেন। অতএব এই পদটিকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বিশেষতঃ মুকুন্দরামের মত সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি 'রস' শব্দের অর্থ ছয় ধরিয়া ইহার একটা নিতান্ত ব্যবহারিক অর্থ করিবেন, এমনও মনে হয় না; অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে 'রসে'র সংখ্যা নয়। মুকুন্দরাম তাহা জানিতেন, একস্থানে নিজেই লিখিয়াছেন,—

প্রবেশিলে একাদশে মদন হৃদয়ে বসে
নব রস হয় এক স্থানে।

অন্যত্রও পাই,—'যশ অপযশে কাব্য নবরসে আপনি তুমি প্রমাণ'।

অথচ 'রস' অর্থে নয় ধরিয়া লইলে উপরি-উদ্ধৃত সময়জ্ঞাপক পদ দুইটির কোন সঙ্গত অর্থ হয় না।

এই পদ দুইটির অপ্রামাণিকতা প্রমাণ করিতে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাও এইস্থলে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। তিনি বলিতেছেন, 'এই শ্লোকটি কিরূপে কোথায় পাওয়া যায়, অগ্রে তাহাই বলা কর্তব্য। কলিকাতা বটতলার মুদ্রাকরগণ, এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হইবার পর হইতে অনেকগুলি বাংলা পুঁথি মুদ্রিত করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ইংরেজি ১৮২০ অব্দে যে চণ্ডীকাব্য সর্বপ্রথম মুদ্রিত করেন, তাহাতেই এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর বটতলার চণ্ডীকাব্যের পুনঃ পুনঃ যে সকল সংস্করণ হইয়া আসিতেছে, তাহা প্রথম সংস্করণেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র, তবে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় চণ্ডীকাব্যের যে একটি সংস্করণ প্রচারিত করেন, তাহার পাঠ অনেকটা নির্ভরযোগ্য বটে, সেরূপ অনেক পুঁথিই আমরা এতদঞ্চলে দেখিয়াছি। তৃতীয় সংস্করণ গ্রন্থখানি বঙ্গবাসীর পূর্বতন স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ৺ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজ মহাশয় দ্বারা প্রকাশিত, তাহা দামুন্যা গ্রামের একখানি পুঁথির আদর্শে মুদ্রিত। আমরা দামুন্যা গ্রামের তিন মাইল দূরে অবস্থিতি করি, এ অঞ্চলের অনেকেরই বাড়ীতে হস্তলিখিত চণ্ডী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় পঞ্চাশ ষাট খানি পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাদের কোন খানিতে বা অক্ষয় বাবুর ও বঙ্গবাসীর মুদ্রিত পুস্তকে আমরা উপরি-উক্ত শ্লোক দেখিতে পাই নাই। অধিকন্তু কবির জন্মভূমি দামুন্যা গ্রামস্থ বর্তমান বংশধরগণের নিকট তাঁহার স্বহস্তলিখিত যে পুঁথিখানি আছে ও কবির আশ্রয়দাতা মেদিনীপুর জিলার আরড়া

ব্রাহ্মণ ভূমির নরপতি ৺রঘুনাথ দেবরায়ের বর্তমান বংশধরগণ কবির হস্তলিখিত বিশ্বাসে যে পুঁথিখানি যত্নপূর্বক রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এতদুভয়ের কোন খানিতেই উক্ত কাব্যের শেষাংশ না থাকায় ঐ শ্লোকের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না।'[১]

মুকুন্দরামের চণ্ডী প্রকৃত যেখানে সম্পূর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ অষ্টমঙ্গলা যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে কাব্যের রচনাকাল নির্দেশক এইরূপ একটি পদ কোন কোন পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—

অষ্টমঙ্গলা সায়, শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
অমর সাগর মুনিবরে।[২]

'অমর' শব্দে চৌদ্দ ধরিয়া লইলে এই পদ হইতে পাওয়া যায় যে, ১৪৭৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৫৫ খৃস্টাব্দে এই কাব্য রচিত হয়। অবশ্য ইহাতেও মানসিংহের সময় পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু একই গ্রন্থে দুই জায়গায় দুই প্রকার সময় নির্দেশ দেখিয়া উভয় পদেরই প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। অতএব ইহা হইতেও পুস্তক রচনার কোন নির্দিষ্ট সময়ের সন্ধান পাওয়া যায় না।

এখন একমাত্র আনুমানিক কালের উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায় নাই। কবির প্রতিপালক রাজা রঘুনাথ দেবের রাজত্বকাল ১৪৯৫ শকাব্দ হইতে ১৫২৫ শকাব্দ বা ১৫৭৩ খৃস্টাব্দ হইতে ১৬০৩ খৃস্টাব্দ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।[৩] অবশ্য এই অনুমান সত্য হইলে মানসিংহের সময়েই কবির কাব্য-রচনার কাল নিরূপিত হয়; তবে ইহাতে কোন নির্দিষ্ট সময়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই অনুমান সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়াও কিছু বলিবার প্রমাণাভাব রহিয়াছে; অতএব ইহার উপর নির্ভর করাও সমীচীন নহে। যে কুলপঞ্জী অনুসারে এই সময় নিরূপণ করা হইয়া থাকে তাহা নির্ভরযোগ্য নহে বলিয়াই কেহ কেহ মনে করেন।[৪]

কবির পুত্র শিবরাম বাংলার তদানীন্তন সুবাদার কুতুব খাঁর নিকট হইতে এক জায়গীরের সনন্দ প্রাপ্ত হ'ন। এই সনন্দের তারিখ ১৫২৮ শক অথবা ১৬০৬ খৃস্টাব্দ। তখন মুকুন্দরাম নিশ্চিতই জীবিত ছিলেন না। ইহা হইতে অনুমান করা ভুল হইবে না যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে তাঁহার মৃত্যু

---

১ সা-প-প ১৩, ১১৫, ২ মুকুন্দরাম, ৩০৪; ৩ দীনেশচন্দ্র সেন, ৩৮০।

৪ *J. D. L.* Vol XVI (1927), 22 f. n.

হইয়াছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তিনি গ্রন্থমধ্যে তাঁহার জামাতা পুত্রবধূ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন; লহনার ঔষধ-প্রকরণ দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, 'বুড়ারে না করে গুণ মোহন ঔষধ।' অতএব মনে হয়, মানসিংহ বাংলার শাসনভার গ্রহণ করার অব্যবহিত পরে, কিংবা অন্ততঃ সমসাময়িক কালে তাঁহার কাব্য রচিত হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬০ বৎসর বয়স হইয়া থাকিলেও তিনি অন্ততঃ ১৫৪০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এমন একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছান যাইতে পারে। কবির জন্ম ও রচনাকাল সম্বন্ধে অনেকেই অনেক অনুমান করিয়াছেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুমান, মুকুন্দরাম ১৫৩৭ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১] স্বর্গীয় হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন, '১৫৪৭ খৃস্টাব্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হন'।[২] স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মনে করেন, ১৫৭৫ খৃস্টাব্দে মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যের রচনা আরম্ভ করেন, ১৬০৩ খৃস্টাব্দে সম্পূর্ণ করেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ১৫৯৪ কিংবা ১৫৯৫ খৃস্টাব্দে মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যরচনা শেষ করেন।[৩] এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়; কারণ ইহা মানসিংহের সমকালীন।

মুকুন্দরামের জীবন সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। কেহ মনে করেন, শিবরাম ব্যতীত মুকুন্দরামের আর এক পুত্র ছিল এবং গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণে 'শিশু কান্দে ওদনের তরে' এই পদে শিবরামের কনিষ্ঠকেই মনে করা হইয়াছে।[৪] তাহা হইলে কাব্যমধ্যে এই পুত্রেরও উল্লেখ থাকিবার কথা ছিল, বিশেষতঃ যে ব্যক্তি জামাতা পুত্রবধূর উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহার নিজের শিশুপুত্র না থাকাই সম্ভব মনে হয়, এই শিশু শিবরামের পুত্র ও কবির পৌত্র। কোন পুঁথিতে কবির পৌত্রেরও এই প্রকার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে,—'শিবরাম বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর, রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান।'[৫]

লহনা ও খুল্লনার কলহ বর্ণনা-প্রসঙ্গে একস্থলে কবি বলিয়াছেন,

এক জন সহিলে কোন্দল হয় দূর।
বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্তী ঠাকুর॥

---

[১] দীনেশচন্দ্র সেন, ৩৬৭ [২] হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক (বঙ্গবাসী), ১৪৯

[৩] *J. D. L.* Vol. XVI (1927), 22. [৪] সা-প-প, ১২, ১১০

[৫] চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯১০

ইহাতে মনে হয়, তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। লহনা-খুল্লনার জীবনবর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি নিজের গার্হস্থ্য জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেও কতক সাহায্য পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ধর্মমত সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। 'চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী' প্রণেতা স্বর্গীয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত এই যে, তিনি বৈষ্ণব-মতাবলম্বী ছিলেন।[১] শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিয়া বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, 'Kavikankan Mukundaram Chakrabarti was neither a Vaisnava, nor a Sakta, nor Saiva nor a Ganapata; but he was everything. In other words he was a believer in all the deities of the Smarta cult.'[২] মুকুন্দরামের কাব্যে সমস্ত দেবতার সম্বন্ধেই সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখিতে পাইয়া ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয় যে, তিনি পঞ্চোপাসক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। পঞ্চোপাসক অর্থে পাঁচটি প্রধান দেবতার উপাসক। এই পাঁচ দেবতা কাহারও মতে 'সূর্যো বহ্নিঃ শিবো দুর্গা ততো বিষ্ণুশ্চ পঞ্চমঃ', আবার কাহারও কাহারও মতে 'গণেশঃ সবিতা বিষ্ণুঃ শিবো দুর্গা ইতি ক্রমাৎ'। তবে কবির ভণিতা হইতে জানিতে পারা যায়, তাঁহার পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র বহুকাল মীন-মাংস পরিত্যাগ করিয়া গোপালমন্ত্রে উপাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কৌলিক ধর্ম পরিত্যক্ত নাও হইতে পারে। বস্তুতঃ সেকালের গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চণ্ডীর মাহাত্ম্য রচনা করিবার মত এত ঔদার্য ছিল না। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' হইতে এই বিষয় জানিতে পারা যায়।

মূলতঃ মাণিক দত্তের চণ্ডীকে অবলম্বন করিয়াই মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্য-রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও মাণিক দত্তের ঋণ এই বিষয়ে স্বীকার করিয়াছেন। ইতিপূর্বে মঙ্গলকাব্য রচনার বিশিষ্ট একটি রীতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল; সেইজন্যই দেখিতে পাই, তিনি যদিও রাজা রঘুনাথের আদেশেই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি গতানুগতিকতা অনুসারে তাঁহার কাব্য-রচনার মূলে অতিপ্রাকৃত দেবতার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, কাব্যের

১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং, পৃঃ ২৪

২ I. H. Q. (1928), 482

বহিরঙ্গ গঠনের মধ্যে তাঁহার মৌলিক কোন কৃতিত্ব নাই। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণাদি হইতে অশেষ বস্তু আহরণ করিয়া তাঁহার কাব্যকে সৌষ্ঠব মণ্ডিত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি নিজেও লিখিয়াছেন,

গুণিরাজ-মিশ্র-সুত সঙ্গীত কলায় রত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামুন্যা নগরবাসী সঙ্গীত অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান ॥

তাঁহার জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতা ও এই শ্রমলব্ধ পাণ্ডিত্যই তাঁহার কাব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

মুকুন্দরামের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির গুণে পৌরাণিক প্রভাবদ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়াও লৌকিক চণ্ডীর কাহিনীটি বাংলার বিশিষ্ট জাতীয় একটি জীবনবাণী প্রচার করিয়াছে। প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্যকে তাঁহার কাব্যে তিনি নিজের স্বকীয় উপলব্ধি দ্বারা অনুভব করিয়া লইয়াছিলেন। আভিজাত্যের গৌরবহীন সাধারণ বাঙ্গালী জীবন হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যে সাহিত্যিক চরিত্রসৃষ্টি সে যুগেও সম্ভব হইত, মুকুন্দরামের রচনা পাঠ করিলে তাহাই জানিতে পারা যায়। তাঁহার পরিকল্পিত কালকেতু-ফুল্লরা তাহারই প্রমাণ। প্রাচীন সাহিত্যে দেবদেবী কিংবা অভিজাত চরিত্রই কাব্যের নায়ক-নায়িকার স্থান গ্রহণ করিত; কারণ, সমগ্রভাবে সমাজের দৃষ্টি তাহাদেরই উপর ন্যস্ত থাকিত। কিন্তু মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যের এই দুইটি নায়ক-নায়িকাকে সর্বপ্রকার আভিজাত্য হইতে দূরে রাখিয়াও ইহাদের মধ্যে যে অপূর্ব মানবিক গৌরব দান করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পরম বিস্ময়।

মুকুন্দরাম তাঁহার ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাকে কাব্যের অঙ্গীভূত করিয়া ইহাকে এক অপূর্ব রসরূপ দিয়াছেন। এই হিসাবে মুকুন্দরামের কাব্য তাঁহার নিজস্ব জীবনালেখ্য। তাঁহার এই কাব্যের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ইতিহাস ব্যক্ত হইয়াছে, সেইজন্যই ইহা আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। অত্যাচারী ডিহিদার মাহ্‌মুদ সরিপ কর্তৃক তিনি নিজের জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন; অতএব গৃহ হইতে নির্বাসনের যে কি দুঃখ, তাহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন; সেইজন্যই গুজরাট নগর-পত্তন উপলক্ষে তাঁহার কালকেতু গৃহহীন বুলান মণ্ডলকে বলিতেছে—

শুন ভাই বুলান মণ্ডল। শ্যা

আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর

কানে দিব সোনার কুণ্ডল ॥

আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ

তিন সন বহি দিও কর ॥

হাল পিছে এক তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা

পাট্টায় নিশান মোর ধর ॥

খন্দে নাহি নিব বাড়ি রহে বসে দিও কড়ি

ডিহীদার নাহি দিব দেশে।

সেলামী বাঁশগাড়ী নানাভাবে যত কড়ি

না লইব গুজরাট বাসে ॥

মানবচরিত্র সম্পর্কে মুকুন্দরামের যে সুগভীর ও সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহা অভিনব। এইজন্যই তাঁহার কাব্যের মধ্যে সুপরিণত চরিত্রসৃষ্টি সার্থক হইয়াছে। মুকুন্দরামের ফুল্লরা, মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্ত তাঁহার এই জটিল মানবচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার ফল।. মুকুন্দরাম গৃহস্থধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া গার্হস্থ্য জীবনের অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সকল দিক হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তাহার দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন ছিলেন; তাঁহার কাব্যে তাঁহার নিজস্ব ও ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণভাবে বিচার করিতে গেলে মুকুন্দরামকে কবি হিসাবে বস্তুতান্ত্রিক বলিয়া মনে হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে একটি কথা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারা যায় না যে, তিনি সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত হইয়া বাস্তব জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। অথচ বস্তুতান্ত্রিকতার ইহাই বিশিষ্ট লক্ষণ। মুকুন্দরাম বাস্তব জীবনকে [illegible]িত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু যে জীবন তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতার [illegible] ইহা ছিল, যাহার সুখ দুঃখ তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করিয়া নিজে হাসি[illegible]ভার সম্পাদিয়াছেন, তাহাই তাঁহার রচনায় জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মুরারি শীল [illegible]ভৃত ব্যক্তিগত জীবনও একটি কাব্যের বিষয়। [illegible] মঙ্গলকাব্যের [illegible]ার 'শাইলক' বাদ দিলে যে সকল ক্ষেত্রে মুকুন্দরামের চিত্র ও চরিত্রগুলি [illegible]টি অঙ্গুরী ভা[illegible]জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্র মুকুন্দরামের নিজস্ব [illegible]সে মাংসের [illegible]। তাহা হইলে এ'কথা সহজেই মনে হইতে পারে, নিজস্ব

বহির্জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁহার বাস্তব জীবনবোধ সীমায়িত। সুতরাং তাঁহার বাস্তববোধ সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত নহে—বরং কতকটা আত্মভাবপরায়ণ (subjective)। দ্বিজ মাধবের বাস্তববোধের সঙ্গে এইখানেই তাঁহার পার্থক্য। এই দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে মুকুন্দরামকে পুরাপুরি বস্তুতান্ত্রিক বলিতে পারা যায় কিনা, তাহা বিবেচনার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। একান্ত নিজস্ব জীবনের বিশেষ অনুভূতি দ্বারা যিনি বাস্তব জীবনকেই রূপায়িত করিয়াছেন, তাঁহাকে পুরাপুরি রোমাণ্টিকও যেমন বলিতে পারা যায় না, তাঁহাকে পুরাপুরি বস্তুতান্ত্রিকই যে কি ভাবে বলা যাইতে পারে, তাহাও বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। বৃহত্তর জাতীয় কাব্য অপেক্ষা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনকাব্য হইয়া উঠিয়াছে বলিলে খুব বেশি ভুল করা হয় না। গতানুগতিক বিষয় পরিবেশনের ভিতর দিয়াও আত্মনিবেদনের সুচতুর শিল্পকৌশল মুকুন্দরামের পূর্ণায়ত্ত ছিল, তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল তাহারই পরিচয়ে সার্থক।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত কবি বলিতে মাত্র দুইজন,—এক মুকুন্দরাম ও দ্বিতীয় ভারতচন্দ্র। মুকুন্দরাম বাংলার ঘরের কবি, ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি। ঘরের মধ্যে জীবনের ভালমন্দ সকল উপকরণই বিশৃঙ্খল হইয়া থাকে, রাজসভায় কেবলমাত্র মনোরম বস্তুগুলিই সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা হয়; ঘরের মধ্যে প্রয়োজনের কাজ, রাজসভায় শোভাবর্ধনের কাজ। ঘরের মধ্যে মনের বিকাশ হইয়া থাকে, রাজসভার মধ্যে ঐশ্বর্যের পরিচয় প্রকাশ পায়। গার্হস্থ্য পরিবেশের মধ্যেই বাঙ্গালী জীবনের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, রাজসভার মধ্যে তাহার ঐশ্বর্যের দিকটাই ক্ষণে ক্ষণে চোখ ঝল্‌সাইয়া দিয়াছে। একটি অন্তরের জিনিস, অপরটি বাহিরের জিনিস। মুকুন্দরামের দৃষ্টি অন্তর্মুখী, অন্তরের বিচিত্র সৌন্দর্য উদ্ধার করিয়া লইয়া তাহা দিয়া তিনি কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য রচনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র বাহিরের জগৎ [illegible]তে উপাদান সংগ্রহ করিয়া একটি শব্দের তাজমহল রচনা করিয়াছেন। ব্যক্তি[illegible]ই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'রাজকণ্ঠের মণিমালা—যেমন তাহার উজ্জ্বল ইহা অমনই তাহার কারুকার্য।' ভারতচন্দ্রের রচনা মণিমালা, মুকুন্দরামের র[illegible] নিজের জন্মভূমি[illegible] রাজকণ্ঠে শোভা পাইবার যোগ্য, আর একটি ব্রীড়ানতা প[illegible] যে কি দুঃখ, তাহা একটি অনুভূতিসাপেক্ষ, আর একটি দৃষ্টিসাপেক্ষ। মুকুন্দ[illegible] উপলক্ষে তাঁহার মিটাইবার কবি, ভারতচন্দ্র দেহের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবা[illegible]

লোকালয়ের ভক্তিশ্রদ্ধায় আপ্লুত, আর একজন রাজসভার অভিনন্দন লাভ করিয়া গৌরবান্বিত।

কবির ব্যক্তিগত সুখদুঃখ-বেদনা সাহিত্যের মধ্য দিয়া যথার্থ রূপ লাভ করিয়াও তাহা যে সর্বজনীন হইয়া উঠিতে পারে, বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরামই তাহা সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে মুকুন্দরাম আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদিগের অগ্রদূত; মুকুন্দরামের কাব্য-প্রেরণার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বীজ নিহিত ছিল। অতএব যাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহার এই মৌলিক বনিয়াদটির কথা বিস্মৃত হন। সাহিত্যিক প্রেরণা কোন জাতির মধ্যে কেবলমাত্র বাহির হইতে আসিয়া জুড়িয়া বসিতে পারে না। জাতির নিজস্ব রসচৈতন্যের মধ্যে যদি তাহার প্রেরণা না থাকে, তবে তাহার মূলে যতই সত্য থাকুক, তাহা বাহির হইতে আসিয়া জাতির সৃষ্টি-প্রেরণার মধ্যে এমন শক্তিসঞ্চার করিতে পারে না। জয়দেবের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব-কবিতা ও মঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়া তাহা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত হইয়া আসিয়াছে—উনবিংশ শতাব্দীতে তাহা পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সংস্পর্শে আসিয়া এক নূতন রূপ লাভ করিয়াছে মাত্র। যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আনুপূর্বিক ধারাটির সঙ্গে পরিচিত নহেন, তাঁহারাই কেবল উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনাকে এক বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিক কীর্তি বিবেচনা করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মুকুন্দরামকে আধুনিক বাংলার বস্তুতান্ত্রিক ঔপন্যাসিকদিগেরও অগ্রদূত বলা যায়। উপন্যাসের প্রধান দাবী চরিত্রসৃষ্টি। মুকুন্দরামের কাব্য এই দাবী কতদূর মিটাইতে পারে, তাঁহার সৃষ্ট কয়েকটি চরিত্র বিচার করিয়া দেখা যাউক এই সম্পর্কে মুকুন্দরামের মুরারি শীলের চরিত্রটির কথা সর্বপ্রথম মনে হইবে। এই চরিত্রটি আনুপূর্বিক মুকুন্দরামের নিজস্ব সৃষ্টি। মাধব কিংবা তাঁহার পূর্ব কবির রচনাতে ইহা নাই। অতএব ইহার পরিকল্পনার মধ্য দিয়াই স্বকীয় প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পা[রে]

মুরারি শীল জাতিতে বেণে—সে 'লেখা জোখা করে টাক[া] [ত]াার 'শাইলক'। সরল প্রকৃতির নিরক্ষর ব্যাধসন্তান কালকে[তু] [এক]টি অঙ্গুরী ভাঙ্গাইতে লইয়া গেল। তাহার সঙ্গে মুরারির পূ[র্ব]... সে মাংসের জন্য 'দেড় বুড়ি' কালকেতুর নিকট ধারিত।

পাইবা মাত্র, সে এই দেড় বুড়ি ধার শোধ করিতে হইবে ভয়ে বাড়ীর ভিতরে পলাইয়া গেল। বাণ্যানীটিও যে তাহারই উপযুক্ত পত্নী এই বিষয়টিও কবির দৃষ্টি এড়ায় নাই ; কারণ, ইহা যে এই জাতিরই বৈশিষ্ট্য। সে মিথ্যা করিয়া বলিল,

ঘরেতে নাহিক পোতদার।
প্রভাতে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতক-পাড়া
কালি দিব মাংসের উধার ॥
আজি কালকেতু যাহ ঘর।
কাষ্ঠ আন্য একভার, একত্র শুধিব ধার,
মিষ্ট কিছু আনিহ বদর ॥

বাণ্যানীর এই কথাগুলির মধ্যে তাহার দেড় বুড়ি ধার শোধ দিবার আপাতত অনিচ্ছাটিকে যে কি কৌশলে ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইহাতে বুঝিতে কোনই বেগ পাইতে হয় না যে, বাণ্যানী জ্বালানি কাষ্ঠের অভাবের জন্য তাঁহারই মুখ চাহিয়া বসিয়া ছিল না, কিংবা 'মিষ্ট বদরে'র জন্যও তাহার তেমন কোন ব্যগ্রতা নাই। ইহা শুধু উপস্থিত তাগিদ্‌দারকে এড়াইবার জন্য একটি চিরাচরিত ও মুখ্য কৌশল। 'একত্র শুধিব ধার' কথাটি এখানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যে ব্যক্তি ধারে মাংস খাইয়া, তাহার 'দেড় বুড়ি' মাত্র শোধ দিবার ভয়ে ভিতর বাড়ীতে গিয়া আত্মগোপন করে, সে এই দেড় বুড়ি সহ, এক ভার কাষ্ঠের ও তৎসহ কিছু মিষ্ট বদরের মূল্য একত্র শোধ করিবে তাহা কল্পনারও অতীত। ইহাও উপস্থিত ধার শোধ করিতে অনিচ্ছার একটি গতানুগতিক উপায় মাত্র। (সে নিজে এক ধূর্ত মহাজনের স্ত্রী—অতএব ধার না শুধিবার বাচনিক আঙ্গিকসমূহে সেও সুপরিচিত। কারণ, এই ব্যবহার তাহার মহাজন স্বামীও খাতকের নিকট হইতে নিত্য লাভ করিয়া থাকে।) কিন্তু এই নারীর কথাগুলির জীবনালে এই পরিবারটির ব্যবসায় ও বৃত্তির একটি যে পরিচয় পাওয়া গেল, তাহা করিয়া এৎতার সঙ্গে আর কি উপায়ে প্রকাশ করা যাইত তাহা কল্পনাও করিতে বলিয়াছেন, । উচ্চাঙ্গের পর্যবেক্ষণগুণ থাকিলে একমাত্র ভাষা দ্বারাই বিষয়কে যে কারুকার্য।' রিয়া তোলা যায়, ইহাই তাহার প্রমাণ। কালকেতু এ'কথা শু রাজকণ্ঠে শোভা

একটি অনুভূতি শুন গো খুড়ি, কার্য কিছু আছে ডেড়ি
মিটাইবার করি অঙ্গুরী ভাঙ্গায়্যা নিব কড়ি।

আমার জোহার খুড়ি, কালি দিহ বাকি কড়ি
যাই অন্য বণিকের বাড়ী ॥

কালকেতু যেন মুরারির ছলনাটুকু বুঝিতে পারিয়াছে এবং মুরারি গৃহমধ্যে আছে এই কথা নিশ্চিত জানিয়াই সে তাহাকেই শুনাইবার উদ্দেশ্যেই যেন কৌতুক করিয়া মাত্র বলিয়াছে, 'যাই অন্য বণিকের বাড়ী'। কিন্তু যাইবার জন্য তাহার আর ব্যগ্রতা দেখা গেল না। এইখানে মুকুন্দরাম রিয়ালিস্ট নহেন, নিজস্ব মনোভাব এই চিত্রটির উপর আরোপ করিয়া ইহাকে একটু আত্মভাবমূলক করিয়া তুলিয়াছেন। 'যাই অন্য বণিকের বাড়ী'—ইহা কালকেতুর কথা নহে, মুকুন্দরামের কথা,—সরলবুদ্ধি ব্যাধসন্তানের পক্ষে ইহা অসম্ভব। যাই হোক, ইহা শুনিয়া,

ধনের পাইয়া বাস আসিতে বীরের পাশ
ধায় বেগে খিড়কীর পথে।
মনে বড় কুতূহলী কান্ধেতে কড়ির থলি
সাপ্‌ড়ি তরাজু লইয়া হাতে ॥

এই বর্ণনাটির মধ্যে মুরারি শীলের চিত্রটি যেন জীবন্ত হইয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল ;—ন্যুব্জপৃষ্ঠ, কোটরগত ক্ষুদ্র চক্ষুতে কুটিল দৃষ্টি একটি প্রৌঢ় আমাদের কল্পনা-চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এইবার তাহার নিজের কণ্ঠোচ্চারিত ভাষাটি যেন কানে শুনিতে পাইতেছি—

বেণে বলে ভাই পো, এবে নাই দেখিতো,
এ তোর কেমন ব্যবহার।

নম্রকণ্ঠে একটু মৃদু স্নেহ-তিরস্কার। এইবার কালকেতুর উত্তরটি একান্ত স্বাভাবিক হইয়াছে, এখানে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সে মুরারির পূর্ব ছলনা বুঝিতে পারে নাই, সে তাহার কথা ও আচরণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে—

খুড়া, প্রভাতে পরিয়া ধড়া শরাসনে দিয়া চড়া
হাথে শর চারি পর ভ্রমি।
ফুল্লরা পসার করে সন্ধ্যাবেলা আস্যে ঘরে
এই হেতু নাহি আসি আমি ॥
খুড়া, ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।
হয়্যা মোরে অনুকূল, উচিত করিবে মূল,
বিপদ সমুদ্রে যেন তরি

ধূর্ত মুরারি হাতের মুঠির মধ্যে একটি মূল্যবান্ অঙ্গুরী পাইয়াছে, অতএব তাহার আচরণ এখন বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিবার মত। মুকুন্দরামের বর্ণনায় এখানে মুরারির যেন একটি চলচ্চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে লোভ ও আনন্দ গোপন করিবার জন্য বাহিরে সংগ্রাম করিতেছে; অঙ্গুরীটির মধ্যে যে কোন রকম বিশেষত্ব নাই, ইহা যে নিতান্ত একটি সাধারণ জিনিস, তাহার কথা ও আচরণে এই ভাবই প্রকাশ করিতে ব্যগ্র। তারপর অত্যন্ত শান্ত ও সংযত কণ্ঠে মৃদু তিরস্কারের স্বরে সে কালকেতুকে বলিল,

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু কর্যাছ উজ্জ্বল॥

এই কথা কয়টি যেন ধূর্ত বেণের নিজের কণ্ঠ হইতে শুনিতে পাইলাম। স্থানোপযোগী শব্দের যথার্থ যোজনা দ্বারা যে রসের ব্যঞ্জনা কত উচ্চ গ্রামে উঠিতে পারে, ইহা তাহারই প্রমাণ। এখানে যে শব্দ কয়টি প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা বাদ দিয়া অন্য কোন শব্দ দ্বারা এই ভাবটি এমন সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। পর পর শব্দগুলির একটিকেও এখান হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়া, তাহা অন্য যে কোন প্রতিশব্দ দ্বারা পূরণ করিলেও চিত্রটির অঙ্গহানি হয়। কথাগুলি একটানা সুরের মত পরস্পর এমন ভাবে মিশিয়া আছে যে, একটি হইতে আর একটিকে বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নাই। ইহার নামই রচনা-শৈলী বা স্টাইল—তাহার কথা পরে বলিব। (এই কথাগুলির ভিতর দিয়াই *ধূর্ত বণিকের গোপন দুরভিসন্ধির ইঙ্গিতটি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। সে এই বিষয়ে* যেন সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ—এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই কালকেতুকে এই বিষয়ে মুহূর্ত ভাবিবার অবকাশ মাত্র না দিয়া ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ইহার একটা মূল্য হিসাব করিয়া ফেলিল,—

রতি প্রতি হয় যদি দশ গণ্ডা দর।
দুই ধানের কড়ি তায় পাঁচ গণ্ডা ধর॥
অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
মাংসের পিছিলা ধার ধারি দেড় বুড়ি॥
একুণে হইল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি।
চাল খুদ কিছু লহ কিছু লহ কড়ি॥

কিন্তু কালকেতু জানে যে, ইহা দৈব-প্রদত্ত ধন; অতএব মুরারির কথা সত্য

হইতে পারে না, কিংবা এই দৈব ব্যাপার যদি ইহা হ... ধনু ও তিনখানি মাত্র যায়, তথাপি বুঝিতে পারা যায় যে, হয়ত পরীক্ষা করিয়া দেখি...নী ফুল্লরা হাটে হাটে সে বলিল, 'খুড়া, মূল্য নাহি চাই। যে জন দিয়াছে বস্তু দিব তার ঠাই।' এইখানে মুকুন্দরামের রোমান্টিক প্রেরণাও কিছু কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। মুরারি অঙ্কুরীটি হাতছাড়া হইয়া যায় দেখিয়া আরও 'পঞ্চবট' ইহার মূল্য বাড়াইল। তারপর কালকেতুর পিতার সঙ্গে তাহার কি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্বন্ধ ছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া কালকেতুর অতিরিক্ত বিষয়বুদ্ধির জন্য মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—

ধর্মকেতু দাদা সনে কৈলুঁ লেনাদেনা।
তাহা হৈতে ভাইপো হয়্যাছ সিয়ানা॥

কিন্তু পিতা ধর্মকেতুর সঙ্গে যে অন্যান্য বিষয়ে 'লেনাদেনা' হইলেও কোন দিন কোন মূল্যবান অঙ্গুরী লইয়া কোন 'লেনাদেনা' হইবার কোন কারণ হয় নাই, তাহা কালকেতুও বুঝিল। সে এই কথায় কর্ণপাত মাত্র করিল না, পিতার নামোল্লেখে মুরারির প্রতি তাহার কোন শ্রদ্ধাবোধও জন্মিল না; সে সহজ ভাবেই বলিল, 'অঙ্গুরী লইয়া আমি যাব অন্য পাড়া।' কালকেতুর এই দৃঢ়তায় মুরারি যেন চম্‌কাইয়া উঠিল, অথচ সে প্রকৃত ব্যবসায়ী, অঙ্গুরীটির মূল্যও সে যথার্থ বুঝে—সেইজন্য সে ইহা হাতছাড়াও করিতে চাহে না। সে তখন সমস্ত মুখ ভরিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'এতক্ষণ পরিহাস কৈলুঁ ভাইপোরে'। যেন ভাইপো তাহার কতই না পরিহাসের পাত্র। মনে হয়, এই ধূর্ত বণিক্ ও তাহার সহধর্মিণীকে যেন চিনি, তাহারা আমার প্রতিবেশী। মুকুন্দরামের কাব্য পাঠ করিয়া আমার পরিচিত প্রতিবেশীদিগের সঙ্গে নূতন করিয়া পরিচয় হইল।

মঙ্গলকাব্যের ধরা-বাঁধা কাহিনীর মধ্যে কবি-মনের ব্যক্তি-প্রতিভা বিকাশের অবকাশ খুব বেশী নাই। তথাপি মুকুন্দরাম তাঁহার প্রবল সৃজনী প্রেরণার বশবর্তী হইয়া তাহার মধ্যেও যে দুই একটি অবকাশ নিজে হইতে সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহার মধ্যেই তাঁহার স্বকীয় কবি-প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। মুরারি শীলের চরিত্রের পরিকল্পনা তাহাদেরই একটি

এই সম্পর্কে ইহার পরই মুকুন্দরামের ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। ইহার পরিকল্পনায় মুকুন্দরাম এমন সূক্ষ্ম মানব-চরিত্র-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, যাহা আধুনিক লেখকগণের মধ্যেও খুব সুলভ নহে। ভাঁড়ুদত্ত নিঃস্ব ও নীচাত্মা, শঠ ও ধূর্ত,—থাকিবার মধ্যে একমাত্র আছে তাহার আত্মাভিমান, তাহার মত

ধূর্ত মুরারি হাতের ন্যস্ত স্বাভাবিক। অতএব সে জাত্যভিমানী। সংসারে তাহার আচরণ এখনমত যাহার কিছুই নাই, সেই নিজের জাতি লইয়া অভিমান করিয়া থাকে। কালকেতু নীচ জাতি এবং নিতান্ত দীন অবস্থা হইতে সে রাজ্য লাভ করিয়াছে—এই বিষয়ে সে সর্বদা সজাগ। কালকেতু ছোট হইতে বড় হইল, আর তাহার নিজের দুরবস্থা কিছুতেই ঘুচিল না,—এই জন্য বাহিরে কালকেতুর সঙ্গে সে যে আচরণই করুক, ভিতরে তাহার প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার ভাব কিছুতেই গোপন করিতে পারিল না। প্রতি মুহূর্তেই এই বিষয়টি যেন তাহার মনের মধ্যে খোঁচা দিতেছে। কুলে শীলে সে কত মহৎ, এই কথাই বার বার কালকেতুর কানে তুলিয়া তাহার নিকট নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। কিন্তু কালকেতু অনার্য ব্যাধ, সে তথাকথিত উচ্চ জাতির মর্যাদা দিতে শিখে নাই; অতএব তাহাকে দিয়া তাহার এই বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইল না। সে কালকেতুর কানের কাছে নিজের বংশমহিমা কীর্তন করিয়া গিয়াছে, কিন্তু কালকেতু তাহাতে স্বভাবতই নির্বিকার রহিয়া গিয়াছে। তারপর প্রজার সঙ্গে কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, এই বিষয়েও যখন সে কালকেতুকে গায়ে পড়িয়া পরামর্শ দিতে লাগিল,

যখন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষম দ্বন্দ্ব
দরিদ্রের ধানে দিবে নাগা।

তখনও তাহার পরামর্শে কালকেতু নির্বিকার।

অতএব ভাঁড়ুকে কালকেতু গোড়া হইতেই চিনিয়া লইয়াছিল। ভাঁড়ুদত্তের আচরণ সমূহ এত প্রত্যক্ষ যে তাহাকে চিনিয়া লইতে কাহারও বেগ পাইবার কথা নহে। যখন হাটুরিয়াগণের উপর অত্যাচার করিবার জন্য কালকেতু ভাঁড়ুদত্তকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, তখনই ভাঁড়ুর প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাইল,—মনের মধ্যে যে ঈর্ষাগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, তাহা অনুকূল অবসর পাইয়া দপ করিয়া এইবার বাহিরে জ্বলিয়া উঠিল। সে কালকেতুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার মনের একান্ত গোপন কথাটি এইবার সুস্পষ্ট অথচ সংযত ভাষায় এইভাবে প্রকাশ করিয়া বলিল,

পাঁচ
খুড়া, তিন গোটা শর ছিল একখান বাঁশ।
হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাস॥
দৈববশে যদি আমি ছিলাম কাঙাল।
দেখিয়াছি, খুড়া হে, তোমার ঠাকুরাল॥

এইখানেই ভাঁড়ুদত্তের জ্বালা। কালকেতুর একখানি ধনু ও তিনখানি মাত্র শর সম্বল ছিল; তাহা লইয়া বনে শিকার করিত, তাহার পত্নী ফুল্লরা হাটে হাটে মাংসের পসরা দিত। কালকেতু ভাঁড়ুর মতই দরিদ্র ছিল, কিন্তু দৈববলে সে বড় হইয়া গেল, আর সে যেমন ছিল তেমনই পড়িয়া রহিল। শুধু তাহাই নহে, সে আজ বড় হইয়া উঠিয়া তাহাকেই শাসন করিতেছে, ইহা ভাঁড়ু কি করিয়া সহ্য করিবে? রক্তমাংসের মানুষ হইয়া ইহা কেই বা সহ্য করিতে পারিবে? ভাঁড়ুদত্তের মনের ভাবটি প্রকাশ করিতে মুকুন্দরাম উদ্ধৃত পদগুলির ভিতর দিয়া কি অপূর্ব রচনাকৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। রাজসভার মাঝখানে তিরস্কৃত ও অপমানিত ভাঁড়ু, নিজের অবস্থার প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ, সংযত কয়েকটি বাক্য দ্বারা কি তীব্রভাবে এখানে কালকেতুকে আক্রমণ করিল! ভাঁড়ুদত্তের শক্তি রসনায়, তাহা এখানে কি তীব্র হইয়া উঠিয়াছে! 'দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরাল'—ব্যঙ্গমিশ্রিত এই বক্রোক্তি কি জ্বালাময়ী! চিত্রটি একান্ত বাস্তব বলিয়াই এখানে এত শক্তিশালী।

এইবার ভাঁড়ুদত্তের অন্য পরিচয় প্রকাশ পাইল—কালকেতুর প্রতি যে মনোভাব এতদিন সে গোপন করিয়া চলিয়াছিল, আজ তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। তাহার সেই জাত্যভিমান ও কালকেতুর প্রতি ঈর্ষা এইবার প্রকাশ্য রূপ লাভ করিল। সে ঘোষণা করিল,

হরিদত্তের বেটা হঙ্ জয় দত্তের নাতি।
হাটে যদি বেচাঙ্ বীরের ঘোড়া হাথি ॥
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা।
পুনরপি হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা ॥

একটি অপ্রধান চরিত্রও পূর্বাপর কি অপূর্ব সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এখানে পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মুকুন্দরাম ভাঁড়ুদত্তকে একটি আদর্শ চরিত্র হিসাবে কল্পনা করেন নাই। যে মুহূর্তে কবির মনে ভাঁড়ুদত্তের চিত্রটি উদিত হইয়াছিল, সেই মুহূর্তেই তিনি তাহাকে একটি স্বকীয় রক্তমাংসের রূপ দিয়া লইয়াছিলেন, সেইজন্য ইহার সঙ্গে যতই ঘনিষ্ট হই, তাহার বিশিষ্ট রূপটির সঙ্গে ততই পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠে,—কেবলমাত্র নাম শুনিয়াই তাহাকে সবটুকু চিনিতে পারি না।

তারপর কলিঙ্গরাজ গুজরাট আক্রমণ করিলেন। বিভীষণরূপী ভাঁড়ুদত্তের

এখানে আর এক নূতন পরিচয় প্রকাশ পাইল। সে ফুল্লরাকে চিনিত, কেবলমাত্র চিনিতই নয়, খুব ভাল করিয়াই চিনিত। যখন ফুল্লরা হাটে হাটে মাংসের পসরা দিত, তখন হইতেই সে তাহাকে চিনিত। অতএব এই চেনায় তাহার ভুল হইতে পারে না। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এইবার সে ফুল্লরার নিকট গিয়া কৌশলে কালকেতুর সন্ধান জানিতে চাহিল। ফুল্লরা বুদ্ধিমতী, কিন্তু নারী বুদ্ধির কতকগুলি নিজস্ব ক্ষেত্র আছে—তাহার বাহিরে নারী শিশুর মত নির্বোধ। ভাঁড়ুদত্তের কৌশলের নিকট ফুল্লরা তেমনই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিল। অতএব ভাঁড়ুদত্তের কৌশল ব্যর্থ হইল না, কালকেতু বন্দী হইল। তারপর কালকেতু যখন দেবীর বরে মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ভাঁড়ুদত্ত নিজের দোষ গোপন করিয়া আসিয়া তাহার নিকট বলিল,—

খুড়া তুমি হৈলে বন্দী অনুক্ষণ আমি কান্দি,
বহু তোমার নাহি খায় ভাত।

মুকুন্দরামের বর্ণনা-গুণে ভাঁড়ুদত্তের এই কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনের চিত্রটি যেন চোখের উপর ভাসিতেছে। চরিত্রসৃষ্টির ইহা অপেক্ষা বড় সার্থকতা আর কি হইতে পারে?

এইবার মুকুন্দরামের ফুল্লরা চরিত্রটি সম্বন্ধে কিছু বলিব। মুকুন্দরামের ফুল্লরা সুন্দরী, কিন্তু এই সৌন্দর্য সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রানুমোদিত পদ্মিনী নারীর সৌন্দর্য নহে। কৃষ্ণপ্রস্তরে গঠিত নারীমূর্তির যে সৌন্দর্য, ইহা তাহাই। কোন অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহার বর্ণনা পাওয়া যাইবে না—তাহার সম্বন্ধে কোন গতানুগতিক বর্ণনা রীতি প্রবর্তিত হয় নাই; অতএব এই বিষয়ে বাঁধাধরা পথে চলিবার কবির কোন উপায় ছিল না। সেইজন্য এইখানেই মুকুন্দরামের মৌলিকতার স্বাধীন বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ফুল্লরা বন্যা নারী। সঞ্জীবচন্দ্র বলিয়াছেন, 'বন্যেরা বনে সুন্দর'। মুকুন্দরাম এই বন্য পরিবেশের মধ্যেই ফুল্লরাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া তাহার যথার্থ সৌন্দর্যের প্রকাশ হইয়াছে। এখানেই মুকুন্দরামের প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রতিবেশী অনার্য জীবনকে গভীর মমতার সহিত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার সমগ্র রস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই নারী-চরিত্রটি এখানে চিত্রিত করিয়াছেন। তবে কবির নিজস্ব শুচি দৃষ্টি এই অনার্য নারীকে স্পর্শ করে নাই এমন নহে। ইহার নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে ইহাকে তিনি সর্বত্র নিঃসঙ্কোচ ও স্বাধীন গতিবিধির অধিকার দিতে পারেন নাই—এইজন্য

এই চরিত্রটি সকল দিক এত জীবন্ত হইয়া উঠে নাই।) ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে নিজের কুটিরের সম্মুখে একাকিনী দেখিয়া যেখানে ফুল্লরা রামায়ণ মহাভারত হইতে পাতিব্রত্যের নজির গাহিতেছে, সেখানে তাহার প্রকৃত পরিচয় কিংবা মুকুন্দরামেরও মৌলিক প্রতিভার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না—অর্থাৎ সেখানে ফুল্লরা ফুল্লরাই নহে, কিংবা সেই ফুল্লরা কবি মুকুন্দরামের সৃষ্টি নহে, সেখানে সমগ্র সমাজনীতি যেন একটি কৃত্রিম যন্ত্রের মুখ দিয়া হিতবাণী প্রচার করিতেছে—এই তথাকথিত ফুল্লরা সমাজের সৃষ্টি, মুকুন্দরামের নহে। মঙ্গলকাব্য রচনা করিতে গিয়া মুকুন্দরামকে কতকগুলি সামাজিক দাবীও মিটাইতে হইয়াছে,—এখানে তাঁহার লেখনী দিয়া ব্যক্ত কতকগুলি সামাজিক দাবীই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহারও মধ্যে কবি মুকুন্দরামের সৃষ্ট ব্যাধ-নারী ফুল্লরা মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। সতিনীর জ্বালায় চণ্ডী স্বামীর গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে শুনিয়া যেখানে ফুল্লরা তাঁহাকে বলিতেছে,

সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি।
কোপে করি বিষ পান আপনি ত্যজিবে প্রাণ
সতিনের কিবা হবে হানি॥

এইখানেই ফুল্লরা ফুল্লরা, উপরে এই ফুল্লরার কথাই বলিতেছিলাম। মুকুন্দরামের রচনার মধ্য হইতে কেবলমাত্র সজাগ রসদৃষ্টি দ্বারা ইহাকে চিনিয়া লইতে হইবে। নতুবা মঙ্গলকাব্যের গণ-সম্মেলনের মধ্যে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

ফুল্লরার বারমাসীটির কথা এখানে উল্লেখ করিব। মঙ্গলকাব্যে বারমাসী দুই প্রকার—সুখের বারমাসী ও দুঃখের বারমাসী। মুকুন্দরাম ফুল্লরার বারমাসীটিকে সুস্পষ্টভাবে দুঃখের কিংবা সুখের, কিছুই বলা যায় না। কারণ সুখেরই হউক, দুঃখেরই হউক, বারমাসী মাত্রেরই ভিতর দিয়া নারীহৃদয়ের অকপট অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হওয়াই উদ্দেশ্য। কিন্তু ফুল্লরা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহার এই বার মাসের দুঃখের গান গাহিতেছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে কি নিতান্তই অকপটতা ও স্বতঃস্ফূর্তি আশা করা যায়? তাহার এই দুঃখ কি তাহার জীবনে একান্তই সত্য? ফুল্লরার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিলে তাহা কিছুতেই সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে না। বিশেষতঃ মুকুন্দরাম নিজেই এখানে বলিয়াছেন, 'হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা'; অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ফুল্লরার মনে এক ও মুখে আর।

কবি এখানে ফুল্লরার মনে এক অপূর্ব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার সংসার, তাহার স্বামী,—তাহা যেমনই থাকুক, তাহা একান্ত তাহারই। বারমাসী নায়িকার নিজস্ব মনোদর্পণ—তাহার জীবনের সুখদুঃখের অনুভূতির চিত্রগুলি সেখানে একান্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, ইহা তাহার নিভৃত আত্মবিশ্লেষণ মাত্র। ইহার কোন শ্রোতা থাকে না, থাকিলেও সেই শ্রোতা নায়িকার প্রিয়তম ও একান্ত বিশ্বাসভাজন ব্যতীত আর কেহই হইতে পারে না। ইহার মধ্যে শত দুঃখ থাকিলেও নারী কদাচ ইহা অন্যের কাছে এ'ভাবে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। বিশেষতঃ তাহা তাহার প্রণয়-ভাগিনী বলিয়া আশঙ্কিতা তাহারই সমবয়সী ও তাহা হইতে সুন্দরী এক যুবতীর নিকট কদাচ খুলিয়া বলিবার নহে। ইহাতে নারীত্বের অপমান আছে। অতএব এখানে সে যাহা বলিতেছে, তাহা তাহার প্রকৃত অবস্থার একটি বিভ্রমোৎপাদী চিত্র ছাড়া আর কিছুই নহে—সেইজন্য ইহা একটানা অতিরঞ্জিত দুঃখের সুরে বাঁধা। এই বর্ণনা দ্বারা সে ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে তাহার পতির প্রতি কোন আসক্তি পোষণ করিতে নিবৃত্ত করিতে চাহিতেছে। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে ফুল্লরার পতিপ্রেমই বৃথা! একটি বিষয় এখানে এই সম্পর্কে আরও লক্ষ্য করিয়া দেখিবার মত আছে যে, ফুল্লরা তাহার দুঃখের জন্য ভগবানকে বার বার অভিসম্পাত দিলেও, এমন কি মৃত্যু কামনা করিলেও, সেইজন্য তাহার স্বামীকে এতটুকুও সে দায়ী করে নাই। স্বামীর ও স্বামীর সংসারের প্রতি যথার্থ প্রেম আছে বলিয়াই তাহা সে কদাচ করিতে পারে না। নারীদিগের পতিনিন্দা যে মঙ্গলকাব্যের অন্যতম লক্ষণ, তাহারই নায়িকা হইয়া ফুল্লরাকে এই বিষয়ে অটুট সংযম রক্ষা করিতে দেখিয়া তাহার এই দুঃখের জীবনের মধ্যেও স্বামিপ্রেম যে কত গভীর ছিল, তাহাই অনুমিত হয়। অতএব স্বামিপ্রেম যেখানে সত্য, সেখানে ব্যবহারিক দুঃখ এক ব্যাধ-নারীর কাছে কিছুই নহে।

মুকুন্দরাম অতি কৌশলে এখানে ফুল্লরাকে দিয়া এই অপূর্ব অভিনয়টি করাইয়াছেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ'কথাও স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই অভিনয়ের মধ্যে ফুল্লরার অবচেতন মন হইতে যে দুই একটি কথা অলক্ষিতে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র তাহাতেই তাহার আন্তরিকতার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অতএব ইহা নির্জলা দুঃখেরও বারমাসী নহে, নিরবচ্ছিন্ন সুখেরও বারমাসী নহে—ইহা ফুল্লরার এক সাময়িক অশুভ আশঙ্কাজাত

অন্তর্দ্বন্দ্বের বহিরভিব্যক্তি মাত্র। মুকুন্দরাম ইহাতে অপূর্ব কৌশলে ফুল্লরার এই মনোভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন—অতএব ইহাকে গতানুগতিক বারমাসীর সংজ্ঞায় ফেলিয়া বিচার করা ভুল হইবে, ইহার মধ্যেও মুকুন্দরামের ঔপন্যাসিক চরিত্র-সৃষ্টির কৌশলই প্রকাশ পাইয়াছে।

কালকেতুর চরিত্র-পরিকল্পনার ভিতর দিয়াও মুকুন্দরামের অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার জীবনে তাহার সহজাত ব্যাধ-সংস্কারের সঙ্গে উচ্চতর কোনও জীবনাদর্শের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় নাই—সেইজন্য তাহার চরিত্রটি নিতান্ত সহজ ও সরল। মুকুন্দরাম এক কথায় তাহার পরিচয়টি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,

শয়ন কুৎসিৎ বীরের ভোজন বিটকাল।
গ্রাসগুলি তুলে যেন তে-আঁটিয়া তাল॥

মানবজীবনের আদিম সংস্কারসুলভ বৃত্তিগুলির মধ্যেই তাহার জীবন সীমায়িত, ইহার মধ্যে কোনও কৃত্রিম-সমাজ-সুলভ লৌকিকতা প্রবেশ করিতে পারে নাই। সে অরণ্যচর ব্যাধ, সুতরাং অরণ্য-প্রকৃতির সঙ্গে তাহার একটা সহজ সংযোগ আছে। প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার জীবনেও তাহারই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সে বীর, কিন্তু বীরত্ব তাহার কৃত্রিম অনুশীলনের বিষয় ছিল না, ইহা তাহার জন্মলব্ধ গুণ মাত্র ছিল। সেইজন্য বীরত্ব সম্পর্কিত কোনও সমাজ-নির্দিষ্ট আদর্শকে সে স্বীকার করে নাই, এই বিষয়ে সে তাহার জন্ম-সংস্কারকেই অনুসরণ করিয়াছে। তাহার চরিত্রের এই গূঢ় তাৎপর্যটি বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সে যে পত্নীর পরামর্শে ধান্যগৃহে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহাতে তাহার চরিত্রটি অস্বাভাবিক হইয়াছে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, আর্য বা ক্ষাত্র বীরত্বের আদর্শ ও অনার্য বীরত্বের আদর্শ এক নহে। ক্ষত্রিয়গণ বীরত্ব সম্পর্কিত যে উচ্চ নৈতিক আদর্শ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, ব্যাধ যুবক কালকেতুর পক্ষে তাহা লাভ করা সম্ভব হয় নাই। তাহার বীরত্ব তাহার আত্মরক্ষার ধর্মের অন্তর্নিবিষ্ট একটি গুণ। সে আত্মরক্ষার জন্য পশু বধ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে এবং আত্মরক্ষার জন্যই বিজয়ী শত্রুর নিকট হইতে পলাইয়া আসিয়া ধান্যগৃহে আত্মগোপন করে। সে অনার্য, সুতরাং তাহার বীরত্ব কাপুরুষতামিশ্র, আত্মরক্ষার ধর্ম তাহার জীবন-ধর্ম—সুতরাং ক্ষাত্র বীরত্বের আদর্শ তাহার সম্মুখে স্থাপন করিলেই বরং তাহার চরিত্রটি অস্বাভাবিক হইয়া উঠিত।

চরিত্র-পরিকল্পনায় এই সকল সার্থকতার জন্যই বলা হইয়াছে যে, 'মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে, স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তব-চিত্রে, দক্ষ চরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনা সন্নিবেশে, ও সর্বোপরি, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত-সম্বন্ধ স্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎ কালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি। মুকুন্দরাম কেবল সময়ের প্রভাব অতিক্রম করিতে, অতীত প্রথার সহিত আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে, অলৌকিকতার হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই একজন খাঁটি ঔপন্যাসিক হইতে পারেন নাই। দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।'[১]

গদ্যই হউক পদ্যই হউক, উচ্চাঙ্গের রচনামাত্রেরই একটি বিশিষ্ট রচনাশৈলী বা স্টাইল আছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ইহা খুব সুলভ নহে, মুকুন্দরামের মধ্যে ইহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। সেইজন্য মুকুন্দরামের রচনা গভীরভাবে যিনি অনুশীলন করিয়াছেন, তিনি অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার নামে প্রচলিত কাব্যের মধ্যে কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত ও কোন্ অংশ কবির নিজস্ব রচনা—মুকুন্দরামের কাব্যের প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রমাণ করিবার জন্য অন্য কোন ঐতিহাসিক প্রমাণের প্রয়োজন করে না। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাঁহার পরবর্তী আর মাত্র দুই তিন জন কবি সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে—তাঁহারা ঘনরাম ও ভারতচন্দ্র। তবে মুকুন্দরামই বাংলা সাহিত্যে ইহার আদি স্রষ্টা।

রচনাশৈলী কবির মৌলিক প্রতিভার একটি বিশিষ্ট গুণ। সৃজনী প্রতিভা মৌলিক না হইলে ইহার বিকাশ অসম্ভব। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অধিকাংশ কবিই পুচ্ছগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের কাহারও মধ্যে রচনার এই বিশিষ্ট মৌলিক গুণটি প্রকাশ পাইতে পারে নাই। কিন্তু মুকুন্দরামের প্রতিভা অন্য স্তরের। মৌলিক সৃজনী প্রতিভা বিকাশের যেখানে অবকাশ আছে, গতানুগতিকতার মধ্যখানেও মুকুন্দরাম তাহার যথার্থ সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু স্টাইল বা রচনাশৈলীর প্রয়োগ কেহ যে সজ্ঞানে করিয়া থাকেন তাহা নহে, তাহা প্রকৃত প্রতিভাবান লেখকের রচনায় অজ্ঞাতেই সৃষ্ট হইয়া থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্য বিষয়টি সুপরিস্ফুট হইবে।

'ভাব ও শব্দার্থের ঐকান্তিক সারূপ্য' যদি রচনাশৈলীর একটি লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ

[১] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯), ১৫

করা যায়, তাহা হইলে মুকুন্দরামের এই পদ দুইটি ইহার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়—

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু কর্যাছ উজ্জ্বল ॥

এই পদ দুইটির মধ্যে বাক্য এবং অর্থের যে অপূর্ব মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে, তাহা পূর্বে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি; কেবলমাত্র বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির জন্য নহে, রচনাগুণেও এই পদ দুইটি মুকুন্দরামের মৌলিক প্রতিভার পরিচায়ক।

ভাষার মধ্য দিয়াই রচনাশৈলীর পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে—ভাষার সুস্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা ইহার অন্যতম প্রধান গুণ। মুকুন্দরামের নিম্নোদ্ধৃত রচনার মধ্যে ভাবের সঙ্গে শব্দার্থের সারূপ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সুস্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা কি রকম রূপ পাইয়াছে, দেখুন। পশুগণ কালকেতুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে চণ্ডীর নিকট নালিশ করিতেছে। প্রত্যেক চণ্ডীমঙ্গলের কবিই এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। মুকুন্দরামের রচনায় হস্তী বলিতেছে—

বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর।
লুকাইতে নাহি ঠাঁই বীরের গোচর ॥
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তরি।
আপনার দন্ত দুটা আপনার অরি ॥
শুণ্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন।
এত অপমান মাতা সহে কোন জন ॥

ভালুক বলিতেছে,

উইচারা খাই পশু নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক ॥

'বড় নাম, বড় গ্রাম, বড় কলেবর'—হস্তীর দেহের বিপুলত্ব বুঝাইতে পর পর এই তিনটি 'বড়' শব্দের প্রয়োগ এমন[illegible] হইয়াছে যে, এখানে বিশালবপু হস্তীটি যেন চোখের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখানে পর পর তিনটি 'বড়' কথার আদ্য বর্ণে যে ধ্বনি-সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা যেন এই বিপুলকায় হস্তীটিরই তিনটি পদধ্বনি। কয়েকটি যথাযথ নির্বাচিত সহজ সরল কথাদ্বারা এখানে একটি অপূর্ব বস্তুরস সৃষ্ট হইয়াছে। অথচ বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ ভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। দ্বিতীয় উদ্ধৃত পদ দুইটিও তাহাই। ফল-মূলাহারী বনের ভালুক, সে কাহারও কিছুতে

নাই—এই ভাবটি প্রকাশ করিতে 'নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক' কথা কয়েকটির সার্থকতা বিস্ময়কর। প্রত্যক্ষভাবে কথাটি এখানে বলা হয় নাই—বিষয়টি প্রকাশ করিবার এখানে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি বা কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে, ভাবপ্রকাশে এইপ্রকার বিশিষ্ট ভঙ্গির প্রয়োগ মুকুন্দরামের একটি বিশিষ্ট গুণ—এখানেই তাহার নিজস্ব রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নোদ্ধৃত পদ দুইটির সুস্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা আরও প্রত্যক্ষ,—

শাশুড়ী ননদী নাই নাই তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কইলি রাতা ॥

ইহাতে অনেক কথা বলা হইল; এমন কি, বাঙ্গালী বধূ-জীবনের সমস্ত পরিবেশটি চোখের সামনে যে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল, কিন্তু সংক্ষেপে, কত সহজে এই কাজটি সম্পন্ন হইল! জীবনের প্রতি দৃষ্টি কত গভীর ও রচনাশৈলী কত উচ্চাঙ্গের হইলে যে ইহা সম্ভব হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সব ক্ষেত্রে কবি বিষয়কে প্রত্যক্ষ বর্ণনা দ্বারা না বুঝাইয়া পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিত দ্বারা তাহা আপনা হইতেই আপনি ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ দিয়াছেন। মুকুন্দরামের রচনা হইতে এই প্রকার আরও বহু পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে।

পূর্বেই বলিয়াছি মুকুন্দরামের কাব্য তাঁহার নিজস্ব জীবন-রসে রসায়িত। ইহাতে বুলান মণ্ডলের গুজরাট আগমন উপলক্ষে, লীলাবতীর ঔষধ-করণ সম্পর্কে, লহনা-খুল্লনার সপত্নী-বিবাদ উপলক্ষে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাই যে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের স্বীকৃতি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত ফুল্লরার দুঃখের বারমাসী বর্ণনাতেও হয়ত তাঁহার নিজের অসচ্ছল ব্যবহারিক জীবনের ছায়াপাত হইয়া থাকিবে। হয়ত 'চালু সেরে বান্ধা দিলুঁ মাটিয়া পাথরা' তাঁহার নিজেরই অভাবগ্রস্ত জীবনের একটি দিনের করুণ অভিজ্ঞতার কথা। তাহা না হইলে, এই কথাকয়টির ভিতর দিয়া এম[illegible]র্মান্তিক বেদনার স্পর্শ এত সহজ-ভাবে অনুভূত হইত না। চণ্ডীমঙ্গল কা[illegible] তাহা কাহিনী-মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র রচনার যে বিস্তৃত অবকাশ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সবখানি জুড়িয়াই হয়ত কবি, তাঁহার নিজস্ব পারিবারিক জীবনের চিত্রটিই অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রথম কাহিনীটির মধ্যে দুঃখিনী ফুল্লরার যে অসচ্ছল সংসারটির চিত্র এত জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা হয়ত তাঁহার নিজেরই অসচ্ছল জীবনের চিত্র—দ্বিতীয় কাহিনীটিতে লহনা-খুল্লনার সপত্নী-বিবাদের মধ্যে যে নিজেরই দাম্পত্য জীবনের চিত্র প্রতিফলিত

হইয়াছে, তাহা ত তিনি নিজেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের তিনি যে এত সুনিপুণ স্রষ্টা, তাহার কারণ হয়ত ইহাই। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে নারীচরিত্রের সবগুলি দিক হয়ত তিনি সুনিপুণভাবে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। যে কবি এতখানি জীবন-রস-রসিক তিনি প্রত্যক্ষ জীবনকে অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইতে পারেন না। সেইজন্য তাঁহার কাব্য লঘুভার কল্পনার পক্ষবিহারী না হইয়া বাস্তব জীবনের গুরুভারে মন্থরগামী হইয়াছে। কাব্যের সঙ্গে জীবনের এমন নিবিড় যোগ ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় নাই—এমন কি সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়া তাঁহার পরবর্তী কালেও আর কোন কবির রচনায়ও তাহা প্রকাশ পায় নাই। ভারতচন্দ্রের সঙ্গে মুকুন্দরামের এইখানেই স্থূল পার্থক্য।

মুকুন্দরাম দুঃখবর্ণনার কবি, কিন্তু দুঃখবাদী কবি নহেন; তাঁহার 'অভয়া-মঙ্গল' পরম আশাবাদীর জীবন-সঙ্গীত। মনসা-মঙ্গলের মত চণ্ডীমঙ্গল আনুপূর্বিক দুঃখ-ভারাক্রান্ত এবং বিয়োগান্তক কাব্য নহে সত্য, কিন্তু তথাপি জীবনের খণ্ড খণ্ড দুঃখের কাহিনীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ভারাক্রান্ত। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে দুঃখের ভিতর দিয়াই ইহার কোনও জীবনেরই সমাপ্তি নির্দেশ করা হয় নাই, ইহাতে দুঃখ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া সুখের আস্বাদন লাভের কথাও আছে। নিজের জীবনের দুঃখ-কাহিনীর বর্ণনা দিয়াই মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্য রচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। তাঁহার সাতপুরুষের ভিটা ত্যাগ করিয়া যাইবার দুঃখ-কাহিনী লইয়া এই কাব্যরচনার আরম্ভ। ব্যক্তিজীবনে এই সুকঠিন দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াও তাঁহার অনুভূতিশীল কবি-হৃদয় তাহার অবশিষ্ট জীবন ব্যাপিয়া সেই দুঃখ-স্মৃতিরই যে রোমন্থন করিয়াছে, তাঁহার সমগ্র কাব্য তাহার প্রমাণ। পশু-কুলের দুঃখ নিবেদনের মধ্যে তদানীন্তন সমাজের সঙ্গে নিজের অসহায় অবস্থার কথা বর্ণিত হইয়াছে। ফুল্লরার দুঃখজীবনের মধ্যে তাঁহার নিজের অভাবগ্রস্ত জীবনের ছায়াপাত হইয়াছে, এমন কি সমৃদ্ধ সদাগরের পরিবারেও খুল্লনার যে দুঃখ আকস্মিক বিপৎপাতের মত একদিন উদয় হ[illegible]র হইয়া গিয়াছিল, তাহাও তাহার ব্যক্তিগত জীবনের ছা[illegible]টিছে। মুকুন্দরামের রচনায় দুঃখ-বর্ণনা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার [illegible] দুঃখেই দুঃখের শেষ নহে, দুঃখ উত্তীর্ণ হইবার পরম আশ্বাসবাণীও ধ্বনিত হইয়াছে।

আন্তরিকতাই মুকুন্দরামের কাব্যের প্রাণ। যে কোন একটি চিত্র নিখুঁতভাবে

নটী—এক করিতে পারিলেই যে তাহার সার্থকতা, তাহা নহে, তাহার সহিত কবি-হৃদয়ের একটু সহানুভূতিও মিশ্রিত হওয়া প্রয়োজন। মুকুন্দরামের হৃদয়ে সহানুভূতির অভাব ছিল না। ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ-বর্ণনায় যখন তিনি বলিয়াছেন,—

বৈশাখে অনল সম বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পায় পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন॥
নিযুক্ত করিল বিধি সভার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥

তখন ব্যাধ-জীবনের মূলে তাঁহার যে শুধু নিবিড় অভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহার ভিতর হইতে একটি দুঃখ-কাতর কবিমন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। এই নিপুণ সামাজিক অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতা লইয়াই মুকুন্দরামের কবিত্ব।

মধ্যযুগের কবিদিগের মধ্যে মুকুন্দরামের সম্বন্ধেই ইদানীং কিছু আলোচনাও হইয়াছে, সেইজন্য তাঁহার সম্বন্ধে অধিক মন্তব্য প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি; কেবল একজন সমালোচকের মত উদ্ধৃত করিয়া এই অংশের উপসংহার করিব।

এই কাব্য সম্বন্ধে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, 'Its most remarkable feature is its intense reality. Many of the incidents are superhuman and miraculous, but the thoughts and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with a fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali literature.'[১]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উপকরণ অত্যন্ত নগণ্য ছিল। ঘটনাগুলির কেন্দ্রীয় ঐক্য ও চরিত্রগুলির কার্যাবলীর পাওয়া গিয়াছে, তাহভাবে সমগ্রভাবে তাঁহার কাব্যের মধ্যে কোন সংহত সৌন্দর্য ফুটীবনের চিত্রটিই আছে। কিন্তু এই ত্রুটি মুকুন্দরামের নহে। কাহিনীগত গতানুগতিকতা যথেচ্ছ লঙ্ঘন করিয়া, নিজের রসরুচি ও উচ্চতর কাব্যাদর্শের প্রেরণায় নূতন করিয়া কাহিনী গঠনের মুকুন্দরামের কোনই

[১] R. C. Dutt, *Literature of Bengal* (Calcutta, 1895), 116.

ক্ষমতা ছিল না। কারণ, ইতিপূর্বেই ইহার এই বিশিষ্ট কাহিনী একপ্রকার বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। আট দিনের যোলটি পালায় এই দুইটি কাহিনী সংবদ্ধ করিতে হইত—তাহার ফলে বিষয়বস্তুর বর্ণনায় কোন সংযম অবলম্বন করিবারও তাঁহার অধিকার ছিল না। নির্দিষ্ট পালার মধ্যে নির্দিষ্ট কাহিনীভাগ বা বিষয়টিকে শেষ করিতে হইত,—অতএব কোন বিশেষ পরিবেশ বা চিত্রের প্রতি কবির নিজস্ব সহানুভূতি থাকিলেও তাহা নানা দিক হইতে সংযত করিয়া চলিতে হইত। কিন্তু মুকুন্দরামের অপূর্ব ক্ষমতাগুণে কাহিনীর এই অসংলগ্ন চিত্রগুলিও স্বতন্ত্রভাবে হইলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীকে সমগ্রভাবে বিচার না করিয়া ইহার চিত্র ও চরিত্রগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিলেই কবির উপর মর্যাদা দান করা হইবে।

রাঢ়ভূমিতে মুকুন্দরামের কাব্যের প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, পরবর্তী সমস্ত মঙ্গলকাব্যের কবিরই একপ্রকার এই মুকুন্দরামই আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। বিষয়-বর্ণনায় ও ভাব-কল্পনায় মুকুন্দরামের পরবর্তী রাঢ়ভূমির মঙ্গলকাব্যগুলি এক বিশিষ্ট রীতির সন্ধান পাইয়াছিল। এই প্রভাবের ফলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্র পর্যন্ত এই বিধি-নিয়মের বৈচিত্র্যহীন গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার অন্নদা-মঙ্গলের কাহিনীকেও আনিয়া স্থাপন করিলেন।

মুকুন্দরামের কাব্যের প্রকৃত নাম 'অভয়া-মঙ্গল' বলিয়াই মনে হয়। কোন কোন স্থানে ইহাকে তিনি 'অম্বিকা-মঙ্গল' নামেও অভিহিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, দুই এক জায়গায় 'গৌরী-মঙ্গল' ও 'চণ্ডিকা-মঙ্গল' নামও পাওয়া যায়, তবে 'অভয়া-মঙ্গল' নামই অধিক ব্যবহার করিয়াছেন। অন্ততঃ কালকেতুর কাহিনীতে চণ্ডীর অভয়া রূপই অধিকতর প্রত্যক্ষ।✓

দ্বিজ রামদেব

চণ্ডীমঙ্গল রচনার চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়া যে সকল কাব্য রচিত হয়, তাহাদের মধ্যে দ্বিজ রামদেবের 'অভয়া-মঙ্গল' কাব্যখানি অন্যতম। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কবির পরিচয় এ' যাবৎ অজ্ঞাত ছিল, মাত্র কিছুদিন পূর্বে তাঁহার দুইখানি পুঁথি ত্রিপুরা অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি কাব্যখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।[১] গ্রন্থমধ্যে কবি মধ্যযুগের

১ আশুতোষ দাস সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭)

মঙ্গলকাব্য রচনার সাধারণ প্রথা অনুসরণ করিয়া কোনও আত্মবিবরণী দিয়া যান নাই; কিংবা তিনি দেবীর স্বপ্নাদেশের কথাও কিছু উল্লেখ করেন নাই। ভণিতায় তিনি কেবলমাত্র নিজের পিতার নামটি এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,

দেবীপদ দ্বন্দ্ব নিন্দিয়া অরবিন্দ
আনন্দ-কন্দ মনোহর।
কবি বিধুসুত ভাবিয়া অবিরত
রোপিত মনোসরোবর॥

প্রায় সর্বত্রই ভণিতায় তিনি নিজেকে 'কবি বিধুসুত' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার পিতার নাম কবিচন্দ্র ছিল, এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাঁহার কাব্যের উপসংহারে তিনি একটি পদে কাব্যরচনার কাল নির্দেশ করিয়াছেন,

ইন্দু বাণ ঋষি বাণ বেদ মণজিত (?)।
রচিলেক রামদেবে সারদা-চরিত॥

এখানে প্রথম পদটির কোনও সুস্পষ্ট অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরবর্তী আলোচনা হইতে দেখা যাইবে, দ্বিজ রামদেব পদে পদে দ্বিজ মাধবের অনুকরণ করিয়াছেন। অতএব দ্বিজ মাধবের কাব্য-রচনার কাল-নির্দেশক পদের অনুকরণে তিনিও তাঁহার কাব্য রচনার কাল নির্দেশ করিয়াছিলেন। দ্বিজ মাধব নিজের কাব্য রচনার কাল সম্পর্কে লিখিয়াছেন,

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় সারদা-চরিত॥

দ্বিজ রামদেবও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন,

ইন্দু বাণ ঋষি বাণ শক নিয়োজিত।
রচিলেক রামদেব সারদা-চরিত॥

'শক নিয়োজিত' পাঠটিই লিপিকর-প্রমাদে 'বেদ মণজিত' হইয়াছে। তাহা হইলেও আরও একটি বিষয়ের মীমাংসার প্রয়োজন আছে। মঙ্গলকাব্যের রচনা-কাল-নির্দেশক পদ হইতে যে সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়, তাহাদিগকে বামদিক দিয়া পড়িতে হয়। ইহাকেই 'অঙ্কস্য বামা গতি' বলে। দ্বিজ মাধব এই নিয়ম রক্ষা করিয়াই তাঁহার কাব্য-রচনার কাল-নির্দেশক পদটি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু দ্বিজ রামদেবের উক্ত পদটির রচনায় এই নিয়ম রক্ষা পায় নাই—তাঁহার রচিত পদটি

হইতে যে সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়, তাহাদিগকে বামদিক দিয়া হিসাব করিয়া গণনা করিলে ইহার কোনও সঙ্গত অর্থ হয় না। তবে এই রীতির ব্যতিক্রম করিয়া যদি ডানদিক হইতে সংখ্যাগুলি পড়া যায়, তবে ইহাতে ১৫৭৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৫৩ খৃস্টাব্দ পাওয়া যায়। শেষ যুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যখন ইহাদের রচনাগত আদর্শের মধ্যে নানাপ্রকার শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল, তখন ইহাদের কাল-নির্দেশক পদ-রচনায় সর্বদাই যে 'অঙ্কস্য বামা গতি'র রীতিটি রক্ষা পাইত, তাহা নহে—দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও মঙ্গলকাব্য রচনার আদর্শ নিতান্ত শিথিল ভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। তবে তাঁহার 'অভয়া-মঙ্গল' ১৬৫৩ খৃস্টাব্দে রচিত—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে কোনও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না।

গ্রন্থমধ্যে কালকেতুর নগর-পত্তন উপলক্ষে মগ-ফিরিঙ্গিদের আগমনের কথাও উল্লেখিত হইয়াছে, দ্বিজ মাধবে ইহাদের উল্লেখ নাই,

ফেরাঙ্গি বান্ধিল টঙ্গি গোলন্দাজ তার সঙ্গী
মগ তেলঙ্গ ত্রিপুরার ঠাট।
দ্বিজ রামদেবে ভণে সারদা ভাবিয়া মনে
নগর পত্তন গুজরাট॥

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দ্বিজ বংশীদাসের কাল নিরূপণ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া মগ-ফিরিঙ্গিদিগের বাংলাদেশে বসতিস্থাপনের সময় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি।[১] তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পূর্ববর্তী কালে তাহা সম্ভব হয় নাই। একমাত্র এই তথ্যটি ব্যতীত গ্রন্থের কাল-নিরূপণের আর কোনও আভ্যন্তরিক প্রমাণ নাই। তবে দ্বিজ রামদেব খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই তাঁহার 'অভয়া-মঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, রামদেব সকল বিষয়েই যে ভাবে দ্বিজ মাধবকে পদে পদে অনুসরণ করিয়াছেন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এমন ভাবে পূর্ববর্তী কবিকে অনুসরণ করিবার রীতি সুলভ নহে। রামদেব তাঁহার কাব্যমধ্যে নিজের কোনও পরিচয় দিয়া যান নাই; তবে তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত চণ্ডীমঙ্গল রচনার ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াছেন এবং সর্ববিষয়ে দ্বিজ মাধবকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলেরই লোক

[১] পৃষ্ঠা ২৫৫ দ্রষ্টব্য

ছিলেন, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। অবশ্য পুঁথিতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত কিছু কিছু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়াই তাঁহাকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া স্থির করা সমীচীন হয় না; কারণ, তাঁহার যে দুইখানি মাত্র পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের একখানিও কবিকর্তৃক স্বহস্তলিখিত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই; অতএব চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি প্রাদেশিক শব্দ স্থানীয় লিপিকার কর্তৃকও প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে।

এখন দ্বিজ মাধবের রচনার সঙ্গে দ্বিজ রামদেবের রচনার ঐক্যের বিষয় আলোচনা করিয়া ইহার প্রকৃত তাৎপর্য কি তাহা বিচার করিতে হয়। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, দ্বিজ মাধব তাঁহার কাব্যকে 'সারদা-চরিত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, দ্বিজ রামদেবও কোন কোন স্থলে তাঁহার কাব্যের নাম 'সারদা-চরিত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভণিতা রচনা করিবার দ্বিজ মাধবের বিশিষ্ট একটি রীতি ছিল—পয়ারে সর্বদাই তিনি প্রায় এই প্রকার ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন,

সারদার চরণ-সরোজ মধু লোভে।
দ্বিজ মাধব তথি অলি হইয়া শোভে॥

তাঁহাকে অনুকরণ করিয়া দ্বিজ রামদেবও পয়ারে প্রায় সর্বত্র এই প্রকার ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন—

দেবীপদ সরোজ সৌরভ অতিশয়।
দ্বিজ রামদেব তথি অলি হইয়া রয়॥

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনেক কবিই যে ভণিতা ব্যবহার করিবার বিশিষ্ট একটি ভঙ্গি গ্রহণ করিতেন, নারায়ণ দেবের আলোচনা সম্পর্কেও তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রকার নারায়ণ দেব, ষষ্ঠীবর, বৃন্দাবন দাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস প্রভৃতি কবির ভণিতা ব্যবহার করিবার বিশিষ্ট এক একটি নিজস্ব ভঙ্গি ছিল—তাহাদের সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের পাঠক মাত্রই পরিচিত আছেন। দ্বিজ রামদেব দ্বিজ মাধবের এই বিষয়ক নিজস্ব রীতিটি অনুকরণ করিয়াছেন, নিজে কোনও রীতি গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, দ্বিজ মাধবের অধিকাংশ পুঁথি সূর্যবন্দনা দিয়া আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিজ রামদেবের পুঁথিও সূর্যবন্দনা দিয়া আরম্ভ হইয়াছে। গণেশ-বন্দনার পরিবর্তে সূর্যবন্দনা দিয়া পুঁথি আরম্ভ হইবার জন্য দ্বিজ মাধবকে কেহ কেহ

আচার্য ব্রাহ্মণ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। সেই অনুসারে দ্বিজ রামদেবও আচার্য ব্রাহ্মণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারেন।

দ্বিজ মাধবের পুঁথিতে দুইটি গণেশ-বন্দনা আছে, ইহা মঙ্গলকাব্যের রীতি-বিরুদ্ধ। একই আখ্যায়িকা-কাব্যের মধ্যে একই দেবতার পর পর দুইটি বন্দনা থাকিবার কোনও সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না, কোনও মঙ্গলকাব্যেই এই রীতি প্রচলিত নাই। যে কোনও কারণেই হউক, দ্বিজ মাধবের পুঁথিতে এই বিষয়ক একটি ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। দ্বিজ রামদেবের পুঁথিতেও দ্বিজ মাধবের এই ভ্রান্তি অনুসরণ করিয়া কাহিনীর সূত্রপাতেই দুইটি গণেশ-বন্দনার স্থান দেওয়া হইয়াছে। যেখানে পূর্ববর্তী কবির রচিত পুঁথির ভুলগুলিও পরবর্তী কোনও কবির রচনায় অনুসরণ করিতে দেখা যায়, সেখানে পরবর্তী কবির কৃতিত্ব সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। দ্বিজ মাধবের পুঁথির দুইটি গণেশ-বন্দনার ভ্রান্তিটিই যে দ্বিজ রামদেব অনুকরণ করিয়াছেন, তাহাই নহে—তিনি এই বিষয়ে দ্বিজ মাধবের ভাষা এবং রচনার আঙ্গিকটি পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন। প্রথম গণেশ-বন্দনায় দ্বিজ মাধব লিখিয়াছেন,

প্রণমোহ গণপতি গৌরীর নন্দন।
ভকত-বৎসল দেব বিঘ্ন-বিনাশন॥

দ্বিজ রামদেব লিখিয়াছেন,

প্রণমহু গণাধীপ গৌরীর নন্দন।
স্মরণে আপদ খণ্ডে বিঘ্ন-বিনাশন॥

দ্বিতীয় গণেশ-বন্দনায় দ্বিজ মাধব যেখানে লিখিয়াছেন,

হেরম্ব মহাশয় হইয়া সদয়
ঘটেতে কর অধিষ্ঠান।
বিঘ্ন করয়ে নাশ রক্ষয়ে নিজ দাস
সুচারু হউক মোর গান॥

দ্বিজ রামদেব লিখিয়াছেন,

বন্দহু লম্বোদর সিন্দুরে সুন্দর
ঘটেতে কর অধিষ্ঠান।
সৃজিয়া মধু বৃষ্টি নায়কেরে কর দৃষ্টি
গায়নেরে কর অবধান॥

বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় দ্বিজ রামদেব যে কেবল দ্বিজ মাধবের এই প্রকার ছন্দেরই অনুকরণ করিয়াছেন, তাহাই নহে—দ্বিজ রামদেব অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিজ মাধবের ভাষা পর্যন্ত অনুকরণ করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কাহিনীকে বিভিন্ন পালায় ভাগ করিতে গিয়া দ্বিজ মাধব কাহিনীর যেখানে আসিয়া এক এক-দিনের দিবা কিংবা রাত্রি পালা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, দ্বিজ রামদেবও সেখানেই আসিয়া তাঁহারও এক একদিনের দিবা কিংবা রাত্রি পালা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দ্বিজ মাধব যে ভাবে তাঁহার কাহিনী শেষ করিয়াছেন, দ্বিজ রামদেবও সম্পূর্ণ সেই ভাবেই তাঁহারও কাব্যের সমাপ্তি নির্দেশ করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্য রচনায় পুচ্ছগ্রাহিতা কিংবা পরানুবর্তনের যে নিদর্শনই পাওয়া যা'ক না কেন, এই প্রকার অনুকরণের দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ এই দুইজন কবির সময় সম্পর্কে পূর্বালোচিত সিদ্ধান্তই যদি গ্রহণ করিতে হয়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উভয়ের গ্রন্থ-রচনার কালের মধ্যে প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের ব্যবধান। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দ্বিজ মাধবের প্রতিষ্ঠা সমাজের মধ্যে স্থাপিত হইবার পর, তাঁহারই রচনার ভাব এবং অঙ্গগত আদর্শ অনুকরণ করিয়া দ্বিজ রামদেব তাঁহার কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হ'ন —কোনও মৌলিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়া তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করেন নাই। সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রধানতঃ চট্টগ্রাম এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও দ্বিজ মাধবের কাব্য প্রচার লাভ করিলেও, দ্বিজ রামদেবের পুঁথি চট্টগ্রামে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই; অথচ চট্টগ্রামের ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়াই এই পুঁথি রচিত হইয়াছিল। যে অঞ্চলে চণ্ডীমঙ্গল রচনার বিশিষ্ট কোনও ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, সেই অঞ্চল হইতেই নিতান্ত সাম্প্রতিক কালে তাঁহার মাত্র দুইখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব পশ্চিম এবং উত্তর বঙ্গ হইতে বাংলা প্রাচীন পুঁথির এ যাবৎ ইতিপূর্বে যে বিস্তৃত সংগ্রহ হইয়াছে, তাহার মধ্যে দ্বিজ রামদেবের কোনও পুঁথির সন্ধান, কিংবা তাহার নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। দ্বিজ মাধবের তুলনায় দ্বিজ রামদেবের কাব্য যে একেবারেই প্রচার লাভ করিতে পারে নাই, ইহার কারণ, অধিকতর কাব্যগুণসমৃদ্ধ দ্বিজ মাধবের রচনা দ্বিজ রামদেবের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম যেমন তাঁহার রচনা-গুণে তাঁহার পূর্ববর্তী চণ্ডীমঙ্গলের কবিদিগের যশ লুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন, দ্বিজ রামদেবের সেই প্রতিভা

ছিল না বলিয়া তাঁহার পূর্ববর্তী কবি দ্বিজ মাধবের যশ লুপ্ত করিয়া দিতে পারেন নাই, বরং তাঁহার নিজেরই পরিচয় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে পূর্ব হইতেই দ্বিজ মাধবের প্রতিষ্ঠার ফলে তিনি নিজে কোনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই—তাঁহার একখানি পুঁথিরও সেই অঞ্চলে সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার রচনার মৌলিক কাব্যগুণ থাকিলে দ্বিজ মাধবের পার্শ্বে তাঁহারও পরিচয় রক্ষা পাইত।

মুকুন্দরামের পরবর্তী কালে আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও দ্বিজ রামদেব যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এমন বোধ হয় না। কারণ, মুকুন্দরামের কোনও প্রভাব তাঁহার রচনায় অনুভব করা যায় না। কিন্তু দ্বিজ রামদেবের বণিক চরিত্রটি এখানে এই সম্পর্কে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। দ্বিজ রামদেব যদিও সর্বত্র দ্বিজ মাধবকেই পদে পদে অনুসরণ করিয়াছেন, তথাপি কালকেতু কাহিনীর বণিক চরিত্রটি সম্পর্কে তিনি একটু ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবে বণিকের নাম পাওয়া যায় সোম দত্ত, মুকুন্দরামে মুরারি শীল। দ্বিজ রামদেব ইহাদের একটি নামও গ্রহণ না করিয়া বণিকের নাম দিয়াছেন সুশীল। তবে তিনি দ্বিজ মাধবের অনুকরণে অঙ্গুরির মূল্য 'ছয় অযুত ধন' বলিয়াই নির্ধারণ করিয়াছেন। বণিক মুরারি শীলের চরিত্র সম্পর্কে স্বভাবতঃই মুকুন্দরাম উল্লেখ করিয়াছিলেন, 'বেণে বড় দুঃশীল'; এবং তাহার দুঃশীলতার একটি বাস্তব চিত্র কাব্যের মধ্য দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। মুকুন্দরামের এই 'দুঃশীল' কথাটি কি কোন দিক দিয়া দ্বিজ রামদেবের বণিক চরিত্রের সুশীল নামকরণের কারণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? কারণ, রামদেব হয়ত মনে করিয়া থাকিবেন, দেবী-প্রদত্ত অঙ্গুরি লইয়া মানুষ এইরূপ প্রতারণা করিতে পারে না, সেইজন্য মুকুন্দরামের 'ত্রুটি' সংশোধন করিতে গিয়া তাঁহার 'দুঃশীল' বণিককে তিনি 'সুশীল' রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। মুকুন্দরামের তুলনায় দ্বিজ রামদেবের বাস্তব জীবন-বোধের যে কত অভাব ছিল, ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

দ্বিজ মাধবের অনুকরণে দ্বিজ রামদেবও তাঁহার কাব্যে বিষ্ণুপদ ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবের বিষ্ণুপদগুলির মধ্যে যেমন কিছু কিছু পদ তাঁহার স্বরচিত এবং কিছু কিছু অন্যের রচনা হইতে গৃহীত, তেমনই দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও কয়েকটি বিষ্ণুপদ তিনি নিজে রচনা করিয়া যোজনা করিয়াছেন। কিন্তু

তাঁহার রচিত বিষ্ণুপদগুলির মধ্যে খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব-পদাবলী-সুলভ গীতি-মাধুর্যের প্রকাশ যে খুব সার্থক হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। নিম্নের কয়েকটি দৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ। নিম্নোদ্ধৃত বিষ্ণুপদটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা বর্ণনা-ধর্মী, গীত-ধর্মী নহে—

ভাই রে মধুবনে আর ভয় নাই।
আনন্দে বিহরে তথা রাম কানাই॥
আজু আপনি মাঠেতে আইলে নন্দের তুলাল।
না ধাইঅ না ধাইঅ বোলে রঙ্গিয়া রাখোয়াল॥
দেখনা কদম্বতলে ও দীন দয়াল।
আনন্দে বিহরে রঙ্গে নন্দের তুলাল॥
রামদেবে বোলে আজু ধন্য হইল ক্ষিতি।
গোধন রাখিতে আইল গোকুলের পতি॥

নিম্নোদ্ধৃত বিষ্ণুপদটির মধ্যে বৈষ্ণব-পদাবলীর সামান্য একটু ক্ষীণ স্বর শুনিতে পাওয়া যাইবে মাত্র,

কালিন্দীকূলে কি লাগি আইলুম।
সজল জলদ শ্যাম বারেক না দেখিলুম॥
দেখিব দেখিব কালা মনে ছিল আশা।
কালিন্দীর কূলে আসি হইলুম নিরাশা॥
রামদেবে বলে আশা মনে মাত্র সার।
আশারে ভরসা করে সকলি সংসার॥

বিষ্ণুপদ-রচনায় দ্বিজ রামদেব দ্বিজ মাধবকে কোন দিক দিয়া অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের যে প্রভাব স্থাপিত হইয়াছিল, দ্বিজ রামদেবের রচনা তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। সেইজন্যই ব্যাধ কালকেতুর মুখে ছদ্মবেশিনী চণ্ডীর এই রূপ-বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়,—

মাতা তোমারে জিজ্ঞাসম বারে বারে।
স্বরূপে পরিচয় দে আম্হারে॥
তোম্হারে কে বিধি করিছে এত রূপে।
হেরিতে হরের মন ভোলে॥

তোহ্মার মুখের নিছনি হেমকর।
নয়ান নিন্দিছে ইন্দিবর॥
এ রূপ মজ্জিত (?) বারে বারে।
কমল অস্থির হইছে ভালে॥
সর্বথাএ মানুষ তুহ্মি নহয়।
কোন পাপে ব্যাধের আলয়॥
বীর জিজ্ঞাসিয়া না পায় উত্তর।
ক্রোধে বীর জোড়ে গণ্ডিশর॥
দ্বিজ রামদেবে এই গায়।
সেবক সম্বোধে সারদায়॥

কালকেতু কাহিনী রচনায় দ্বিজ রামদেব যেমন কোনও মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, ধনপতি-সদাগরের কাহিনী রচনায়ও তাঁহার মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না; সেখানেও তিনি মুকুন্দরাম কিংবা দ্বিজ মাধব কাহাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। ধনপতির খুল্লনাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাবটি উভয় কবি প্রায় অভিন্ন ভাষায় লহনার নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। যেমন, দ্বিজ মাধব লিখিয়াছেন,

ধনপতি বোলে প্রিয়া শুন মোর বাণী॥
তোহ্মার আজ্ঞা পাইলে বিহা করিব খুলনী॥
যেন মাত্র কৈল সাধু বচন প্রকাশ।
লহনার মুণ্ডে যেন পড়িল আকাশ॥

দ্বিজ রামদেব সেখানে লিখিয়াছেন,

ধনপতি বোলে প্রিয়া শুনিছ কাহিনী।
বিবাহ করিমু তোমার খুলনা ভগিনী॥
এই মাত্র শুনে রামা সাধুর বচন।
লহনার মুণ্ডে যেন ঠেকিল গগন॥

অনুকরণ-জাত রচনায় যে স্বাভাবিক ত্রুটি ও দৌর্বল্য দেখা যায়, এখানেও তাহাদের পরিচয় আছে। দ্বিজ রামদেব খুল্লনার বাৎসল্যরসের চিত্রগুলি দ্বিজ মাধব অপেক্ষা বিস্তৃততর করিয়া লইয়াছেন। গুরুর গঞ্জনায় বালক শ্রীমন্ত

আত্মগোপন করিয়া থাকিলে তাহার অনুসন্ধানরত খুল্লনার বাৎসল্যরসের অভি-ব্যক্তির বর্ণনায় যেখানে দ্বিজ মাধব এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন,

খুলনায়ে বোলে দিদি করোঁ নিবেদন।
কথায়ে দেখিলা তুহ্মি ঐ চান্দ-বদন॥
গঞ্জনা ছাড়িয়া দিদি লক্ষ লাথি মার।
দাসী করি রাখ ঘরে দিয়াত কুমার॥

দ্বিজ মাধবের খুল্লনার এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্য দিয়া তাঁহার সন্তানস্নেহের গভীরতার কোনও অভাব বোধ না হইলেও, দ্বিজ রামদেব খুল্লনার এই উক্তিটিকে সামান্য একটু বিস্তৃততর করিয়া লইয়া বিষয়টি স্পষ্টতর করিয়া লইয়াছেন—দ্বিজ রামদেব এই অংশে লিখিয়াছেন,

খুলনাএ বোলে দিদি করম জোড় হাত।
গঞ্জনা ছাড়িয়া মোরে কর পদাঘাত॥
না দেখি ছিরার মুখ খাইছি আপনা।
কুলশীল লাজ মোর কি আর বাসনা॥
জনম অবধি দুঃখ যতেক পাইলুম।
দেখিয়া ছিরার মুখ সব পাসরিলুম॥
কাল ছিরা হৈল মোর পরাণের বৈরী।
তিলেক বিচ্ছেদে প্রাণ ধরাইতে নারি॥

কিন্তু এ'ক্ষেত্রেও দ্বিজ মাধবই যে তাঁহার ভিত্তি তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই ভাবেই দ্বিজ রামদেব দ্বিজ মাধবকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার রচনার শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার রচনায় কোনও মৌলিকতা প্রকাশ পায় নাই।

মুক্তারাম সেন

চণ্ডীমঙ্গলের অন্যতম প্রধান কবির নাম মুক্তারাম সেন।[১] তাঁহার কাব্যের প্রকৃত নাম সারদা-মঙ্গল। এই সম্বন্ধে কাব্যমধ্যে তাঁহার এই প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

শুন শুন সর্বলোক সারদা-মঙ্গল।
একচিত্ত হইয়া শুন না হইয়া চঞ্চল॥

[১] মুক্তারাম সেন, সারদা-মঙ্গল, আব্দুল করিম সম্পাদিত (সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৪)।

ইহা 'অষ্টমঙ্গলার চতুস্প্রহরী পাঞ্চালী' নামেও পরিচিত।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম (বর্তমানে আনোয়ারা) নামক গ্রামে কবি মুক্তারাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জ্ঞাতিবংশীয়েরা অদ্যাপি সেই গ্রামে বসবাস করিতেছেন। কবির এই বংশ চট্টগ্রামের মধ্যে বিশিষ্ট কুলীন বলিয়া সম্মানিত। কবি তাঁহার কাব্যে এই প্রকার আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন,—

চাটেশ্বরী রাজ্যে বন্দোম্ পশ্চিমে সাগর।
বাড়ব আনল পূর্বে তীর্থ মনোহর॥
তাহার উত্তরে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ হর।
চন্দ্রশেখর যাতে বসতি শঙ্কর॥
মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রি দেশ অধিকারী।
সিংহ সম রণে দ্বিজগণ প্রতিকারী॥
ধার্মিক শরীর দানে অকাতর নাম।
তেন মত প্রতি সৈন্য লালা নন্দরাম॥
চাটীগ্রামে রাজ্যেতে বন্দোম নিজ গ্রাম।
বন্দহুঁ জনম ভূমি দেবগ্রাম নাম॥
আদ্যগোত্র আদ্য সেন ভেষজে বিশ্রাম।
বসতি জাহ্নবী কূলে রাঢ়া হেন নাম॥
স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্বাপর।
বেদের উদ্ভব বৈদ্য পঞ্চম প্রবর॥
আদ্য অত্রি অর্জুন গার্গব বার্হস্পত্য।
স্বকীয় বিদ্যাতে পর উপকারী চিত্ত॥
তথা হৈতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইয়া।
বাড়ব্যাখ্যা চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিয়া॥
সে বংশে প্রপিতামহ রাঢ় জয়দেব।
তান পুত্র নিধিরাম স্যাগত পারগ॥
পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি।
তিন পুত্র লৈয়া কৈল দেয়াঙ্গ বসতি॥
সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম।
সদাএ ভবানী পদে মানস বিশ্রাম॥

কবির জ্ঞাতিবংশীয়দের নিকট যে বংশ-পত্রিকা রক্ষিত আছে তাহাতে একটি সংস্কৃত শ্লোক লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও কবির সংক্ষিপ্ত বংশ-পরিচয় পাওয়া যায়,—

শাকে চৈব বিয়দ্বেদবাণ চন্দ্রামীতে পুরা।
আদ্য গোত্রোদ্ভবো পঞ্চ প্রবরো বৈদ্য সত্তমঃ॥
শ্রীযুক্ত যাদব রায়ঃ শম্ভুদর্শনকাম্যয়া।
সার্দ্ধং শ্রীমন্ত ভৃত্যেন চট্টলে চন্দ্রশেখরে॥
যশোহরাৎ সমায়াতঃ কালিয়া গ্রামতঃ খলু।
তদ্‌ভ্রাতা মাধবরায়স্তথৈবাত্মপুরোহিতৈঃ॥
নাম্না শ্রীলক্ষ্মীকান্তোহসৌ ন্যায়ালঙ্কারসংজ্ঞকঃ।
যাদবেন সহায়াতৌ তীর্থদর্শনমানসৌ॥[১]

ইহা হইতে কবির পূর্বপুরুষ যাদব রায় সম্বন্ধে জানিতে পারা যায় যে, ১৫৪০ শকাব্দ (১৬১৮ খৃঃ) ফাল্গুন মাসে (সম্ভবতঃ শিবচতুর্দশী উপলক্ষে) তিনি সহোদর মাধব রায়, নিজের কুল-পুরোহিত লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার ও শ্রীমন্ত নামক ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পূর্ব বাসস্থান যশোহর জিলার অন্তর্গত কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণ ব্যপদেশে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও চন্দ্রশেখরাধিষ্ঠিত স্বয়ম্ভূশিব দর্শনের জন্য আগমন করেন।

সম্ভবতঃ চন্দ্রশেখর দর্শনের পর তাঁহারা আর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন নাই, চট্টগ্রামেই বসতি-স্থাপন করেন। এইভাবে সেকালে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য বংশ আসিয়া চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

মুক্তারামের পূর্বপুরুষ যাদব রায়ের চট্টগ্রামে বসতি-স্থাপন সম্বন্ধে এই কাহিনী প্রচলিত আছে,—যাদব রায় ও মাধব রায় যখন চন্দ্রনাথ দর্শনে আসিয়াছিলেন, তখন চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মরণচাঁদ চৌধুরী সপরিবারে চন্দ্রনাথ আসিয়াছিলেন। যাদব রায় ও মাধব রায়ের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হয় এবং যাদব রায়ের বিদ্যা ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার হস্তে নিজের কন্যা সম্প্রদান করেন এবং ঘরজামাই করিয়া দেবগ্রামে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন। অতঃপর মাধব রায় জানিতে পারেন, মরণচাঁদ চৌধুরী বৈদ্যবংশ-সম্ভূত নহেন, আইচ দাস উপাধিধারী কায়স্থ বংশীয়।

---

[১] মুক্তারাম সেন, ভূমিকা।৵০

মাধব রায় ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া অবশেষে ভ্রাতৃবধূকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়া গোপনে পলায়ন করেন। মরণচাঁদ কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ এক বিরাট দীঘি খনন করাইয়া দেন, ইহা এখনও 'আইচের ঝির পুনী' নামে খ্যাত।

অতঃপর যাদব রায় পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেন, এবং তাহাতেই কবি মুক্তারামের পিতামহ নিধিরামের জন্ম হয়। নিধিরামের পুত্র মধুরাম হইতেই গোবিন্দরাম, ব্রজলাল ও কবি মুক্তারামের জন্ম হয়। মুক্তারাম চিরকুমার ছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দরামের বংশ অদ্যাপি বর্তমান আছে। অবশ্য উল্লিখিত কাহিনীর মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে কিনা জানা যায় না।

কবি মুক্তারাম সাধক পুরুষ ছিলেন। তিনি বিষয়-নিস্পৃহ হইয়া তীর্থ পর্যটন ও সাধুসঙ্গ দ্বারাই জীবন অতিবাহিত করিতেন। সারদা-মঙ্গলই তাঁহার একমাত্র কাব্যগ্রন্থ।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কবির প্রপিতামহ যাদব রায় ১৫৪০ শকাব্দ বা ১৬১৮ খৃস্টাব্দে চট্টগ্রামে আগমন করেন। অতএব আনুমানিক কবিকে ইহার একশত বৎসর পরবর্তী বা ১৭১৮ কিংবা তন্নিকটবর্তী কোন সময়ের লোক বলিয়া ধরিতে পারা যায়।

কবির আত্মবিবরণীর মধ্যে 'দেশ অধিকারী' বলিয়া মহাসিংহের নামোল্লেখ রহিয়াছে। ইতিহাসে তিনি দেওয়ান মহাসিংহ নামে পরিচিত, তিনি চট্টগ্রামে মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেওয়ান ছিলেন, পরে তিনি নায়েবের পদেও অধিষ্ঠিত হন। এই মহাসিংহের সময় সম্ভবতঃ খৃস্টীয় ১৭৪১ অব্দ হইতে ১৭৫৯ অব্দ। অতএব, কবি মুক্তারাম এই সময়ের মধ্যে বর্তমান ছিলেন বলা যাইতে পারে।

মুক্তারামের কাব্যমধ্যে দুই স্থলে গ্রন্থ-রচনার সময় নির্দেশক দুইটি পদ দেখিতে পাওয়া যায়,—

গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী॥

'কাল' শব্দে তিন ধরিলে ইহার অর্থ ১৩৬৯ শকাব্দ বা ১৪৪৭ খৃস্টাব্দ হয়।[১] কিন্তু এই সময়ের সঙ্গে গ্রন্থোক্ত অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্যের সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় না। অতএব, এই কাল শব্দটিকে কেহ 'কায়' ধরিয়া ইহার অর্থ ছয় করিতে

১ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এইভাবে হিসাব করিয়া কবির কাল নির্ণয় করিয়াছেন। ব-সা-প ১,৩০২

চাহেন ; এই ধারণাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়, সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদে 'কায়' 'কাল' হইয়া থাকিবে।[১] অতএব কবির নিজের উক্তি অনুসারেও দেখা যাইতেছে, যে, ১৬৬৯ শকাব্দ বা ১৭৭৪ খৃস্টাব্দে তিনি তাঁহার গ্রন্থ-রচনা সম্পন্ন করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, চট্টগ্রাম অঞ্চলে দ্বিজ মাধবের চণ্ডী বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। এই দ্বিজ মাধবের কাব্যকে আদর্শ করিয়া মুক্তারামের কাব্য রচিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার কাব্যে দ্বিজ মাধবের প্রভাবের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। মুক্তারামের রচনা অনেকটা প্রাচীন পাঁচালীরই উন্নত এবং আধুনিক সংস্করণ বলিয়া মনে হইতে পারে।

মুক্তারামের কাব্যেরও দুইটি ভাগ,—প্রথম ভাগে কালকেতুর কাহিনী, দ্বিতীয় ভাগে ধনপতি সদাগরের কাহিনী। উভয় কাহিনীই সংক্ষিপ্তভাবে রচিত। চণ্ডীর নিকট পশুদিগের কালকেতুর বিরুদ্ধে অভিযোগের বৃত্তান্তটি এই প্রকার সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে,—

এই মত কথ কাল যদি নির্বাহিল।
পশুগণে দুর্গাস্থানে কান্দিয়া কহিল॥
তিষ্ঠিতে না পারি বনে কালকেতুর শরে।
পুত্র দারা এক্ষ স্থানে রহিতে নারি ঘরে॥
বোলে তাহে মহামাএ না কর ক্রন্দন।
তোর হেতু কালকেতু লভিবেক ধন॥
সুখমনে পশুগণে যাও নিজালয়ে।
তার ঠাঁই আমি যাই না করিয় ভয়ে॥
তদন্তরে নারায়ণী গোধিকা হইলা।
অরণ্যের পন্থ মুখে আগুছি রহিলা॥

হরিরাম

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যের প্রত্যক্ষপ্রভাব-প্রণোদিত যে কয়খানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়, তাহাদের মধ্যে দ্বিজ হরিরামের কাব্যখানি উল্লেখযোগ্য।[২] সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হরিরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। হরিরাম তাঁহার কাব্যমধ্যে শোভাসিংহ নামক এক ব্যক্তির নামে চণ্ডিকার প্রসাদ ভিক্ষা

১ সা-প-প, ৪০, ১৬৬ ২ ব-সা-প ১, ৩১০-২০

করিয়াছেন। এই শোভাসিংহ মেদিনীপুর জিলায় ঘাটালের অন্তর্গত চিতুয়া ও বরদাবাটী পরগণার অধীশ্বর ও কবির আশ্রয়দাতা বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। শোভাসিংহের মৃত্যুর কাল জানিতে পারা যায়, তিনি ১৬৯৬ খৃস্টাব্দে পরলোক গমন করেন বলিয়া বিশ্বাস। অতএব মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কবি শোভাসিংহের আশ্রমে বাসকালীন এই কাব্য রচনা করেন। দ্বিজ হরিরামের কাব্যের যে পুঁথিখানা পাওয়া গিয়াছে তাহা সুপ্রাচীন, ইহা ১০৮০ সালে অনুলিখিত। অতএব পুঁথিখানিকে কবির প্রায় সমসাময়িক বলা যাইতে পারে।

হরিরামের কাব্যে চণ্ডীমঙ্গলের দুইটি কাহিনীই অর্থাৎ কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী ও ধনপতি-খুল্লনার কাহিনী এই উভয়েরই সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। হরিরামের রচনায় কবিত্বের পরিচয় পাওয়া না গেলেও তাহাতে ভাষার পারিপাট্য লক্ষ্য করিবার বিষয়; গতানুগতিক উপায়ে সহজ বর্ণনায় লেখক সরলভাবে কাহিনীটি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, রচনায় কিংবা চরিত্র-পরিকল্পনায় কোথাও আন্তরিকতার স্পর্শ লাভ করা যায় না; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিত্র ও ভাষায় মুকুন্দরামের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। তবে প্রায় সর্বত্রই তাঁহার ভাষা গ্রাম্যতা-মুক্ত হইয়া আসিয়া যুগোচিত পরিমার্জনা লাভ করিয়াছে। কাব্যখানি বিশেষ প্রচলিত ছিল না বলিয়া ইহার ভাষা পরিবর্তিত হইতে পারে নাই; অতএব ইহার ভাষার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া ইহা যে মুকুন্দরামের পরবর্তী রচনা তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।

ভারতচন্দ্র রায়

[১] মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগে ভারতচন্দ্র রায়ই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।[২] শুধু তাহাই নহে, ভারতচন্দ্র তাঁহার অসাধারণ শক্তিদ্বারা মঙ্গলকাব্যের বিধিনিয়মের গণ্ডীর মধ্যেও যে ইহার সর্বাঙ্গে এক অপূর্ব লাবণ্য সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের সমগ্র কাব্যসাহিত্যের মধ্যে আর নাই। বৈষ্ণব কবিতার রসসিঞ্চন দ্বারা মঙ্গলকাব্যের রূপে এক অপূর্ব দীপ্তি দান করিয়া ভারতচন্দ্র নিতান্ত সাম্প্রদায়িক প্রেরণা-মূলক একটা বৈশিষ্ট্যহীন সাহিত্যের ভিতর হইতে উচ্চতর সাহিত্য-সৃষ্টির উপযোগী এক অপূর্ব ভাষার সন্ধান করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দশ বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া অন্যান্য প্রাচীন কবিদিগের সঙ্গে ভারতচন্দ্রেরও জীবন-কাহিনী সঙ্কলিত করিয়া

[১] বা-সা-প ১,৩১০-২২; [২] ভারতচন্দ্র রায়, গ্রন্থাবলী (বসুমতী), ১৪শ সং।

তৎসম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। কতিপয় প্রামাণ্য লোকের কথাই প্রধানতঃ এই সমস্ত বৃত্তান্তের উপকরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ যাবৎকাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বিবরণ সঙ্কলন করিবার কালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রদত্ত বিবরণীর উপরই নির্ভর করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত অন্যান্য দিক হইতেও বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে এবং সেই প্রচেষ্টা সম্প্রতি কিছু কিছু আরম্ভও হইয়াছে।

আনুমানিক খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান বর্ধমান জিলার ভুরস্থট বা ভূরিশ্রেষ্ঠ পরগণায় এক ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠাতার নাম রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। ইনি ফুলিয়ার মুখটি-বংশজাত। যে বংশে বাংলার আর এক প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজা কৃষ্ণ রায় সেই বংশেরই সন্তান। রাজা কৃষ্ণ রায়ের মূল বংশে রাজা প্রতাপনারায়ণ নামে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভুরস্থট পরগণায় তিনটি প্রধান গড় ছিল। ইহাদের মধ্যে ভবানীপুরের গড়ই প্রাচীনতম এবং রাজবংশের প্রধান শাখা এখানেই বাস করিতেন। ভুরস্থট রাজ্যের দ্বিতীয় গড় ছিল পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রামে। রাজা কৃষ্ণরায়ের দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্র রায় ও তাঁহার পর তাঁহারই বংশধরগণ এই গড়ের অধিকারী ছিলেন। জানিতে পারা যায় যে, সমগ্র ভুরস্থট রাজ্যের ৵৹ আনা অংশের ইঁহারা মালিক ছিলেন। ভুরস্থট রাজ্যের তৃতীয় গড় দোগাছিয়ায় অবস্থিত ছিল। ইঁহারাও ৵৹ আনা অংশের মালিক ছিলেন। রাজা কৃষ্ণ রায়ের তৃতীয় পুত্র মুকুট রায় হইতে এই শাখার উৎপত্তি। রাজবংশের যে শাখা ভুরস্থট রাজ্যের দ্বিতীয় গড় পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রামে অবস্থিত ছিল, সেই শাখাতেই কবি ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষের পরিচয় সম্বন্ধে এক কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়,—

'রাজা কৃষ্ণরায়ের পুত্র দ্বিতীয় মহেন্দ্র রায়, তৎসুত গোপী রায়, তৎসুতাঃ ভূপতিরায়-শ্যাম-জগজ্জীবন-প্রাণবল্লভ-নরোত্তম-জনার্দন-মধুসূদনাঃ ভূপতিরায়সুতাঃ সদাশিব-চাকু-রাজবল্লভ-কিশোর-কন্দর্প-বাণেশ্বরাঃ। সদাশিবসুতাঃ নরেন্দ্র-বংশী-কাশী-রসিক-শুকদেবাঃ। নরেন্দ্রসুতাঃ চতুর্ভুজ-অর্জ্জুন-দয়ারাম-ভারতচরণাঃ। সাং পাণ্ডুয়া ভূরস্থট্ট'[১]

১ ঢা $\frac{M3/38}{7+8}$, ৩১৫ (খ)

উদ্ধৃত কুলগ্রন্থে প্রদত্ত ভারতচন্দ্রের এই কুল-পরিচয় প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।[১] অতএব ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, ভুরস্থট রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণরায়ের প্রপৌত্র সদাশিব রায়ের পৌত্র ও নরেন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ভারত রায় জন্মগ্রহণ করেন।

ভারতচন্দ্রের জন্মকাল সম্বন্ধে মতবিরোধ দেখা যায়। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১১১৯ সন বা ১৭১২ খৃস্টাব্দ ভারতচন্দ্রের জন্মকাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতচন্দ্র-রচিত সত্যপীরের কথার রচনাকাল ১১৩৪ সন[২] বা ১৭২৭ খৃস্টাব্দ ; কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত এই হিসাবটিতে একটি ভুল করিয়াছিলেন এবং এই ভুলটিই এই যাবৎ কাল বিনা পরীক্ষায় প্রায় সকলে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। শুদ্ধ হিসাবে উক্ত সত্যপীরের কথার রচনা-কাল হয় ১১৪৩ সাল বা ১৭৩৬ খৃস্টাব্দ। ঈশ্বর গুপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন যে, কতিপয় প্রামাণ্য লোকের কথানুসারে সত্যপীরের কথা রচনার সময়ে ভারতচন্দ্রের বয়স ছিল পনর বৎসর। কিন্তু ইহাও ঠিক নহে ; কারণ, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুকালে বা ১৭৬০ খৃস্টাব্দে,—যাহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায়,—তাঁহার বয়স হয় মাত্র ৩৯ বৎসর। অথচ তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সে যে 'নাগাষ্টক' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] এই সমস্ত কারণে ঈশ্বর গুপ্তের উক্তির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া নিরপেক্ষ বিচারে তাঁহার জন্মকাল স্থূলতঃ ১৭০৫ খৃস্টাব্দ হইতে ১৭১০ খৃস্টাব্দ মধ্যে নির্দেশ করা হইয়াছে।[৪] এই বিষয়ক সর্বশেষ প্রামাণ্য আলোচনা হইতে জানা যায় যে, ভারতচন্দ্র ১১১৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭০৭ খৃস্টাব্দে পাঁড়ুয়া ওরফে রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৫]

সেই সময়ে বর্ধমানের রাজা ছিলেন কীর্তিচাঁদ। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে জানিতে পারা যায়, ভুরস্থট রাজ্যের মূল শাখার তদানীন্তন রাজা লছমীনারায়ণের সহিত কীর্তিচন্দ্রের সদ্ভাব ছিল না ; কীর্তিচন্দ্র কয়েকবার লছমীনারায়ণের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু লছমীনারায়ণ অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহা

---

[১] দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'ভারতচন্দ্র ও ভুরস্থট রাজবংশ,' সা-প-প ৪৮, ১৮৯-২০০ ; নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষে (৪,৩৩৬) এই কুলপঞ্জীর একটি স্বতন্ত্র পাঠ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহা যে ভুল তাহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে (দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯২)।

[২] 'সনে রুদ্রচৌগুণা' (ভারতচন্দ্র, ১৮৬) ইহার অর্থ—রুদ্র ১১, চৌ ৪ ও গুণ ৩, অর্থাৎ ১১৪৩ বাংলা সাল, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহাকে ১১৩৪ সন ধরিয়া ভুল হিসাব করিয়াছেন ; [৩] ভারতচন্দ্র, ১৮৭ ; [৪] দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯০, [৫] সা-প-প ৫৯, পৃ. ৫২

প্রতিহত করেন। তদবধিই কীর্তিচন্দ্র ভুরস্থট রাজ্য জয় করিবার স্থযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার 'রসমঞ্জরী'তে উল্লেখ করিয়াছেন,—

রাজবল্লভের কার্য, কীর্তিচন্দ্র নিল রাজ্য।[১]

এই রাজবল্লভ ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্র রায়ের পিতৃব্য বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। মনে হয়, এই রাজবল্লভ জ্ঞাতি-শত্রুতার বশবর্তী হইয়া কীর্তিচন্দ্রের সহায়ক হন; তাহারই ফলে ১৭১৩ খৃস্টাব্দে বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদ ভুরস্থট আক্রমণ করিয়া ভবানীপুরের গড় অধিকার করেন। ভুরস্থট রাজ্যের অধিকৃত পাণ্ডুয়া বা পেঁড়োও কীর্তিচন্দ্রের রাজ্যভুক্ত হয়। নরেন্দ্ররায় হৃত-সর্বস্ব হইয়া পড়েন। ভারতচন্দ্র ১৭১৭ খৃস্টাব্দে মঙ্গলঘাট পরগণার অধীন গাজিপুরের নিকটবর্তী নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে পলাইয়া যান। তথায় বাসকালীন তিনি নিকটবর্তী তাজপুর গ্রামে এক সংস্কৃত টোলে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করেন এবং মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাজপুরের নিকটবর্তী সারদা গ্রামের কেশরকুণি আচার্যদের একটি বালিকা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পাঠাভ্যাসও সমাপ্ত হয়, তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সেকালে পারসী শিক্ষা না করিলে সামান্য কর্মও কেহ লাভ করিতে পারিত না। তিনি একমাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অগ্রজগণ তাঁহাকে অনুযোগ দেন। তাহার উপর অভিভাবকগণ তাঁহার বিবাহের জন্যও অপ্রসন্ন ছিলেন। সেইজন্যও নানা ভাবেই তাঁহার উপর তাঁহারা বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে অভিমানাহত হইয়া ভারতচন্দ্র একদিন বাটী হইতে পলাইয়া যান এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর বাটীতে আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার নিকট পারসী শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। রামচন্দ্র মুন্সী জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, তিনি বালকের আগ্রহ দেখিয়া স্বগৃহে রাখিয়া তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন মুন্সীর গৃহে সত্যনারায়ণের পুজা উপলক্ষে ভারতচন্দ্রকে পাঁচালী পড়িবার জন্য বলা হইল।[২] ভারতচন্দ্র তাহাতে স্বরচিত পাঁচালী পাঠ করিয়া

---

[১] ভারতচন্দ্র, ১৭০

[২] ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুর বাসকালীন সত্যনারায়ণের উপর দুইটি পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন (হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, ২০৪)। প্রথমটি চৌপদী ছন্দে রচিত, দ্বিতীয়টি ত্রিপদী ছন্দে রচিত। প্রথমটির রচনাকালে তাঁহার 'নায়ক' অর্থাৎ আশ্রয়দাতা ছিলেন, হীরারাম রায়; দেবানন্দ পুরের মুন্শী-বংশেই হীরারাম রায় নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম রচনাটিতে তাঁহারই নাম রহিয়াছে, দ্বিতীয় রচনাটিতে রামচন্দ্র মুন্শীর নাম উল্লেখিত হইয়াছে। (দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সা-প-প ৪৯, পৃ. ৪৯)

সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। ইহাই তাঁহার সর্বপ্রথম রচনা। তাহাতে এইভাবে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন,

ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ,
সদা ভাবে হতকংশ, ভুরস্থটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের স্থত, ভারত ভারতীযুত
ফুলের মুখুটি খ্যাত, দ্বিজপদে স্থমতি॥
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়
হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী॥
সবে কৈল অন্থমতি সংক্ষেপে করিতে পুঁথি
তেমনি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয়, হরি হোন্ বরদায়,
ব্রত কথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা॥

১১২৪ বঙ্গাব্দ হইতে ১১৪৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭১৮ খৃস্টাব্দ হইতে ১৭৩৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতচন্দ্র পঠদ্দশায় অতিবাহিত করেন। ১৭৩৮ খৃস্টাব্দে পারসী ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া ভারতচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অগ্রজেরা এইবার তাঁহার যথোপযুক্ত বিদ্যালাভ হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, তাঁহাদের সম্পত্তি-সম্পর্কিত কোন ব্যাপারের তদ্বির করিবার জন্য তাঁহাকে বর্ধমান রাজসরকারে প্রেরণ করিলেন। এই কার্য উপলক্ষে তিনি ১৭৩৯-৪২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধমানে বাস করেন। কিন্তু এই কার্যে কোন গোলযোগের জন্য বর্ধমানরাজ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়া ভারতচন্দ্র কারাগার হইতে পলাইয়া যান এবং একেবারে বর্ধমানরাজের রাজ্যের সীমানার বাহিরে উড়িয়্যার অন্তর্গত কটকে গিয়া উপস্থিত হন। তখন তাঁহার একমাত্র সঙ্গী এক নাপিত ভৃত্য, তাহার নাম রঘুনাথ। ১৭৪২ খৃস্টাব্দ হইতে ১৭৪৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উড়িয়্যা ভ্রমণ করেন। কটকের তদানীন্তন মহারাষ্ট্র স্থবাদার শিবভট্ট তাঁহাকে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া বাস করিবার অন্থমতি প্রদান করেন। শ্রীক্ষেত্রে তিনি এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতে থাকেন। একদা এই সন্ন্যাসীর দলের সহিত তিনি বৃন্দাবন যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে হুগলী জিলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে

উপস্থিত হইলেন। সেই গ্রামেই তাঁহার শ্যালিকা-পতির নিবাস ছিল। তাঁহারা ভারতচন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া অনেক অনুরোধ দ্বারা তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করাইলেন। ১৭৪২ খৃস্টাব্দ হইতে ১৭৪৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অজ্ঞাত-বাস করেন। অতঃপর, তিনি শ্বশুরালয়ে গিয়া তাঁহার পত্নীকেও দেশ হইতে আনাইয়া কিছুকাল সেখানেই বাস করিলেন। তারপর পত্নীকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া কর্মের সন্ধানে বাহির হইলেন। ফরাসডাঙ্গায় তখন প্রসিদ্ধ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ফরাসী সরকারের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তিনি ভারত-চন্দ্রের কবিত্ব-গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার কাব্যালোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র নবদ্বীপাধিপতি ১১৫৩ বঙ্গাব্দ বা ১৭৪৭ খৃস্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ৪০৲ টাকা বেতন নির্ধারণ করিয়া দিয়া তাঁহার সভাকবি নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারই আদেশে ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রসিদ্ধ 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে 'গুণাকর' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। এতদ্ব্যতীত গঙ্গাতীরবর্তী মূলাযোড় গ্রাম তাঁহাকে সামান্য খাজানায় প্রথমতঃ ইজারা দেন; পরে মূলাযোড়ের ১৬ বিঘা ভূমি ও তাহার সন্নিকটবর্তী গুস্তে গ্রামের ১০৫ বিঘা জমি তাঁহার নামে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দান করেন। ১১৫৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৫০ খৃস্টাব্দে ভারতচন্দ্র মূলাযোড় গ্রামে বসবাস করিবার উদ্দেশ্যে বাটী নির্মাণ করেন। বর্ধমানের মহারাণীর অনুরোধে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মূলাযোড় গ্রাম রামদেব নাগ নামক এক ব্যক্তিকে পত্তনি দেন। রামদেব নাগ রাজস্ব আদায়ে বড়ই কঠোরতার পরিচয় দিতেন, প্রজার উপর নানা রকম অত্যাচার করিতেন। রামদেব নাগের অত্যাচারের কথা বিবৃত করিয়া ভারতচন্দ্র ১১৫৭ বঙ্গাব্দ বা ১৭৫১ খৃস্টাব্দে 'নাগাষ্টক' নামক দ্ব্যর্থবোধক এক কাব্য রচনা করেন এবং তাহা কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার প্রদান করেন। কৃষ্ণচন্দ্র ইহার লিপি-কৌশলের উচ্চ প্রশংসা করেন এবং ইহার অর্থ উপলব্ধি করিয়া রামদেব নাগের অত্যাচার নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করেন। ৪০ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গমন করেন ও ১১৬৭ বঙ্গাব্দ বা ১৭৬০ খৃস্টাব্দে বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে; তন্মধ্যে প্রথম পরীক্ষিৎ রায়, দ্বিতীয় রামতনু রায় ও কনিষ্ঠ ভগবান রায়। প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রের বংশ লোপ পাইয়াছে, তৃতীয় পুত্রের বংশধরগণ অদ্যাপি মূলাযোড় গ্রামে বসবাস

করিতেছেন। তাঁহাদের অবস্থাও বেশ সচ্ছল। ভারতচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে পারা যায় না।

ভারতচন্দ্র যখন বাংলা দেশে আবির্ভূত হন, তখন খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পুরাতন যুগকে বিদায় দিয়া নূতন যুগে পদার্পণ করিতেছে; এই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কাব্যে যুগের রূপটি ধারণ করিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশ হইতে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিল। সাগর পার হইতে আগত বিদেশী বণিক বাংলার শাসনভার অধিকার করিবার সময় আসন্ন হইল। মুসলমান আমলের চাকচিক্যময় বিলাসী সমাজ-সভ্যতার পতনের শেষ ক্ষীয়মাণ দীপ্তি তৎকালীন সমাজের উপর আপনার বিলীয়মান প্রভাবের অন্তিম প্রহর ঘোষণা করিল। অপর পক্ষে ইংরেজ বণিকের অনুগ্রহ-পুষ্ট হইয়া দেশে এক নূতন অভিজাত ধনি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগল। সমাজে তখনও পুরাতন ধারার রেশ রহিয়াছে, কিন্তু ভাঙনের মুখে সমাজের শাসন নাই, চারিদিকে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রবৃত্তির অবারিত উন্মত্ততা রাজত্ব করিতেছে। প্রবৃত্তির এই নিম্নাভিমুখী গতি ভারতচন্দ্রকে গ্রাস করিয়াছিল। কবি তাঁহার অপূর্ব ক্ষমতা মহত্তর প্রয়োজন সাধনে নিয়োগ করিতে পারিলেন না। তৎকালীন সমাজরুচিকে আশ্রয় করিয়াই তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন।

'অন্নদা-মঙ্গল' রচনার পূর্বেই ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি পরিণত বয়সে ১১৫৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫৩ খৃস্টাব্দে 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্য রচনা সম্পূর্ণ করেন,—

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্য তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই তিন খণ্ড তিনটি স্বতন্ত্র কাব্য, মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীর অনুকরণে ভারতচন্দ্র প্রথম খণ্ড রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহারই নাম অন্নদা-মঙ্গল বা অন্নপূর্ণা-মঙ্গল। দ্বিতীয় খণ্ডে কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কথা অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহের বাংলা আক্রমণ ও প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে 'অন্নদা-মঙ্গলের' একমাত্র প্রথম খণ্ডই আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে।

অন্নদা-মঙ্গলের প্রথম খণ্ডে প্রথমেই পঞ্চদেবতা ও লক্ষ্মী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণার

বন্দনা, গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-বর্ণনা, সতীর দক্ষালয় গমনোদ্যোগ, সতীর দক্ষালয় গমন, শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ, শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা, দক্ষযজ্ঞনাশ, প্রসূতির স্তবে দক্ষের পুনর্জীবন লাভ, একান্ন পীঠের বর্ণনা, শিব-বিবাহের মন্ত্রণা, নারদ কর্তৃক শিবের বিবাহ-সম্বন্ধ, শিবের ধ্যানভঙ্গ ও মদনভস্ম, রতি-বিলাপ, রতির প্রতি দৈববাণী, শিবের হিমালয় যাত্রা, শিবের বিবাহ, শিব-নিন্দা, শিবের মোহিনী-মূর্তি ধারণ, সিদ্ধি-উদ্ঘাটন, সিদ্ধি-ভক্ষণ, হর-গৌরীর কথোপকথন, হর-গৌরীর রূপ, কৈলাস-বর্ণন, হর-গৌরীর বিবাদ-সূচনা, হর-গৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ, সখী জয়ার উপদেশ, দেবীর অন্নপূর্ণা মূর্তিধারণ, শিবের ভিক্ষা যাত্রা, ভিক্ষুক শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ, শিবকে অন্নদান, অন্নপূর্ণা-মাহাত্ম্য, শিবের কাশী-বিষয়ক চিন্তা, বিশ্বকর্মার প্রতি পুরী নির্মাণের অনুমতি, অন্নপূর্ণার পুরী নির্মাণ, দেবগণের নিমন্ত্রণ, শিবের পঞ্চতপ, ব্রহ্মাদি দেবগণের তপ, অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান, শিবের অন্নদাপূজা, অন্নদার বরদান, ব্যাসের পরিচয়, বেদব্যাস কর্তৃক শিবপূজা নিষেধ, শিব-স্তোত্র, ঋষিগণের কাশীযাত্রা, হরি-সঙ্কীর্তন, ব্যাসের শিবনিন্দা, ব্যাসের ভিক্ষা বারণ, কাশীবাসী লোকের প্রতি বেদব্যাসের শাপ, অন্নদার মোহিনী রূপ, শিব ও ব্যাসের কথোপকথন, ব্যাসের দ্বিতীয় কাশী নির্মাণের উদ্যোগ, গঙ্গাকর্তৃক ব্যাসের অভ্যর্থনা, ব্যাসের কৃত গঙ্গার তিরস্কার, গঙ্গাকৃত ব্যাসের তিরস্কার, বিশ্বকর্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা, ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন, ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য, অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসকে ছলনা, ব্যাসের প্রতি দৈববাণী, কুবেরের পুত্র বসুন্ধরের প্রতি অন্নদার শাপ, বসুন্ধরের বিনয়, অন্নদার শাপে বসুন্ধরের মর্ত্যলোকে জন্ম, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, হরিহোড়ের প্রতি অন্নদার দয়া, হরিহোড়ের প্রতি বর দান, বসুন্ধরার জন্ম, কুবেরের অন্যতম পুত্র নলকুবেরের প্রতি অন্নদার শাপ, মর্ত্যলোকে নলকুবেরের ভবানন্দ মজুমদার রূপে জন্ম, অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা ইত্যাদি বিষয় ক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর অনুকরণেই অন্নদা-মঙ্গলের প্রথম খণ্ড রচিত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর পৌরাণিক অংশ ও অন্নদা-মঙ্গলের পৌরাণিক অংশ প্রায় অভিন্ন, কিন্তু উভয় কাহিনীর লৌকিক অংশে পার্থক্য রহিয়াছে। অন্নদা-মঙ্গলের লৌকিক অংশ কাব্যের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অপ্রধান অংশ মাত্র। ইহাতে হরিহোড়ের প্রতি চণ্ডীর অহৈতুকী দয়া, তাহাকে বরদান ও পরে তাহাকে অন্যায় ভাবে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব-

পুরুষ ভবানন্দ মজুমদার ভবনে যাত্রা ইত্যাদির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই লৌকিক কাহিনীটুকু কাব্যের যে অল্পপরিসর স্থান গ্রহণ করিয়া আছে, তাহার মধ্যে চরিত্রসৃষ্টি যেমন সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই, তেমনই কাহিনীও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই।· 'অন্নদা-মঙ্গল' প্রথম খণ্ডের এই লৌকিক অংশটুকুই কাহিনীর দিক দিয়া একটু মৌলিকতা দাবী করিতে পারে, কিন্তু তাহাও চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতুর কাহিনীর দ্বারা এতখানি প্রভাবিত যে, তাহার জন্য কোন সত্যকারের কৃতিত্ব ভারতচন্দ্রকে দেওয়া যাইতে পারে না।

মুকুন্দরামের প্রায় সমসাময়িক কাল হইতেই মঙ্গলকাব্যগুলির উপর সংস্কৃত পুরাণগুলির প্রভাব ব্যাপকভাবে আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। মুকুন্দরাম নিজেও 'বিচারিয়া অনেক পুরাণ' তাঁহার কাব্য-রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার মূল কাহিনীকে পৌরাণিক প্রভাব দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই।

ভারতচন্দ্রের উপরও এই সংস্কৃত পুরাণগুলির বিশেষ প্রভাব বর্তমান ছিল। এই সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবের ফলেই মুকুন্দরামের চণ্ডী ভারতচন্দ্রের অন্নদায় পরিণত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বাংলার লৌকিক শক্তি-দেবতাদিগের ভয়ঙ্করী (malignant) প্রকৃতি কালক্রমে শুভঙ্করী (beneficent) প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হইয়া যায়। বাংলা কাব্যের উপর পরবর্তী কালে পৌরাণিক প্রভাব ইহার অন্যতম কারণ। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল হইতে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গলে' যে সমস্ত জায়গায় কাহিনীর দিক দিয়া স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়, তাহাদের সমস্তই তাঁহার এই সংস্কৃত পৌরাণিক অভিজ্ঞতা-জাত। ভারতচন্দ্রের এই বিষয়ে কোন মৌলিকতা নাই। লৌকিক মঙ্গলচণ্ডীর আখ্যায়িকার অসংলগ্ন চিত্রগুলি ইতিপূর্বেও সমাজে গভীর রেখাপাত করিতে পারে নাই; সেইজন্য সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া ভারতচন্দ্র অতি সহজেই তাহাদের অস্তিত্ব এই সমাজ হইতে মুছিয়া দিবার প্রয়াস পাইলেন।

ভারতচন্দ্র তাঁহার সংস্কৃত-জ্ঞান সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন,

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক।
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী।

ভারতচন্দ্র তাঁহার এই বহুমুখী জ্ঞান অন্নদা-মঙ্গলকাব্য রচনায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তথাপি এই কাব্য-রচনায় কয়েকটি সংস্কৃত পুরাণের ঋণ তিনি

বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছেন,—প্রথমতঃ তিনি একান্ন পীঠ বর্ণনায় 'মন্ত্র চূড়ামণি-তন্ত্রে'র সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,

একমত না হয় পুরাণমত যত।
আমি কহি মন্ত্র চূড়ামণিতন্ত্র মত॥

ব্যাসের শিবনিন্দার কাহিনী মুকুন্দরামের চণ্ডীতে নাই। এই অংশ রচনায় তিনি স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীর মাহাত্ম্যসূচক অংশ 'কাশীখণ্ড' হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,—

শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥

খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীর মাহাত্ম্যসূচক 'কাশীখণ্ড' নামক 'স্কন্দপুরাণের' অংশবিশেষের কতকগুলি বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্য-রচনায় এই সমসাময়িক প্রভাবকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের এই সর্বতোমুখী জ্ঞান তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ কবিত্ব-গুণের সহিত সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই রচনার আভ্যন্তরীণ মৌলিকতার অভাব সত্ত্বেও তাঁহার কাব্য বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তবে এই কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, 'অন্নদা-মঙ্গলে'র প্রথম খণ্ড কৃত্রিম পৌরাণিক আবহাওয়ার মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ইহার মধ্যে বাস্তব চরিত্রসৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে দুই একটি অতি সাধারণ চরিত্রের মধ্যে একটু বাস্তবতার সম্পর্ক আছে। কিন্তু তাহাদের কেহই প্রধান চরিত্র নহে; তাহারা কাব্যের সামান্য অংশ মাত্র অধিকার করিয়া আছে। তাহাদের একটি ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্র। এই চরিত্রটিই সমগ্র কাহিনীর মধ্যে একটু বাস্তবধর্মী, কিন্তু এই চরিত্রটি মূল কাহিনীর মধ্যে যেমন অতি সামান্য অংশ অধিকার করিয়া আছে, তেমনই ইহা মূল কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়াও ইহার বাস্তব-পরিকল্পনা দ্বারা সমগ্রভাবে কাব্যের কোন মর্যাদা বৃদ্ধি পায় নাই।

অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত কথায় গভীরতম ভাবদ্যোতক প্রবচনের মত এক একটি পদ রচনা করিতে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের তুলনা নাই। ভাষার উপর কতখানি অধিকার থাকিলে ভাবপ্রকাশ এত সংক্ষিপ্ত ও সরল হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গলে'র নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি খনার বচনের মত শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিত্য ব্যবহার্য হইয়া রহিয়াছে; প্রাচীন কি আধুনিক, সমগ্র

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন গৌরব আর কেহ লাভ করিতে পারেন নাই। 'অন্নদা-মঙ্গলের' প্রথম খণ্ড হইতে আমি মাত্র কয়েকটির দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

১। নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ?

২। বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে

৩। হাবাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়

৪। বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।

৫। খুঞা তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত।

৬। মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে

৭। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। ইত্যাদি

'ইহা হইতে ভারতচন্দ্রের কাব্যের লোক-প্রিয়তারও কতক আভাস পাওয়া যাইবে। ভারতচন্দ্রের ভাষার ঐশ্বর্য অতুলনীয়। সংস্কৃত, পারসী ও প্রাকৃত বাংলার সুন্দর সমন্বয় দ্বারা তিনি ভাষার যে শুধু লাবণ্যই বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা নহে—তাঁহার অপূর্ব শব্দবিন্যাস-নৈপুণ্য দ্বারা তাহার মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ গতিবেগ দান করিয়াছেন,—তাহা যেন নিজের কাকলিতে নিজেই মুখর। এইজন্যই তাঁহার রচনার কোন অংশই জড়তাপ্রাপ্ত হইয়া কাব্যদেহকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে নাই। ভারতচন্দ্রের এই সুমার্জিত ভাষাই রাজসভার উপযুক্ত ভাষা হইল; বঙ্গভাষা সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ গ্রাম্যতামুক্ত হইয়া উচ্চতর সাহিত্যিক ভাষার উপযোগিতা লাভ করিল; বহিরঙ্গ-গঠনে সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য উচ্চতর রূপগরিমা লাভ করিল। মুকুন্দরামের কবিকল্পনা বাংলার ধূলিমাটিতে সমাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু ভারতচন্দ্র সেই ধূলিমাটির উপাদান লইয়া তাজমহল রচনার স্বপ্ন দেখিলেন।

ভারতচন্দ্রের ভাষার মূলে বৈষ্ণব কবিতার দান কখনই উপেক্ষণীয় নহে। বাংলা ভাষা সর্বপ্রথম বৈষ্ণব কবিতার ভিতর দিয়াই সুমার্জিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহা হইতেই ভারতচন্দ্রের ভাষায় তাহার পরিণতি অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের অসীম পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃত বাংলার সুন্দর এবং সহজ শব্দগুলিকে তিনি তাঁহার কাব্য রচনা-কালে উপেক্ষা করেন নাই। এই শব্দগুলি নৈপুণ্যের সহিত মধ্যে মধ্যে তিনি এমনভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা ভাষায় গ্রাম্যতা সৃষ্টি করা দূরে থাকুক, বরং ভাব প্রকাশ আরও প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অপূর্ব শব্দ-যন্ত্রী ভারতচন্দ্র রতি-বিলাপের মধ্যে সংস্কৃত শব্দগুলিকেও এমন ভাবে সাজাইয়াছেন যে, তাহা পড়িতে পড়িতে একটি

বীণার ঝঙ্কার কানের নিকট বাজিয়া উঠিতে শোনা যায়। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য যে, তাহা কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিতে পারে না,—

শিব শিব শিব নাম, সবে বলে শিবধাম, বামদেব আমার কপালে।
একের কপালে রহি, আরের কপালে দহি, আগুনের কপালে আগুন।
চরণ রাজীব-রাজে, মনঃশিলা পাছে বাজে, হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া।

যে সংস্কৃত শব্দ রামপ্রসাদ প্রমুখ কবিদিগের রচনার ভার স্বরূপ এবং কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতিপ্রবাহের মধ্যে দুস্তর বাধার সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সংস্কৃত শব্দেরই শুধু প্রয়োগ-কৌশলদ্বারা ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে অপরূপ সৌষ্ঠব দান করিয়াছেন, মৌলিকতাহীন কাহিনীর আশ্রয় লইয়াও নিজের রচনাবৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গলে' মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। শুধু কাহিনী কেন— স্থানে স্থানে ভাষার দিক দিয়াও মুকুন্দরামের নিকট ভারতচন্দ্রের যে অসীম ঋণ রহিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইবার উপায় থাকে না। তবে পার্থক্যের মধ্যে এই যে, অত্যন্ত সহজ ও নিরলঙ্কারা ভাষায় মুকুন্দরাম যে কথাটি প্রকাশ করিতেন, ভারতচন্দ্র তাহাই নিজের পাণ্ডিত্য দ্বারা সুমার্জিত করিয়া লইতেন মাত্র। অনেকে মুকুন্দরামের নিকট ভারতচন্দ্রের এই ঋণের মাত্রা এত অধিক মনে করেন যে, তাঁহারা ভারতচন্দ্রকে তাঁহার কাব্যের জন্য প্রায় কোন মর্যাদা দান করিতেই কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন। মনীষী ৺ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, 'গুণাকর পত্রে পত্রে কবিকঙ্কণের নিকট ঋণী। কবিকঙ্কণের কবিত্ব পত্রে পত্রে নকল করিয়াছেন, কবিকঙ্কণের স্বাভাবিক সুন্দর বর্ণনাগুলি অলঙ্কার দিয়া কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। কবিকঙ্কণের কাব্য সরল, স্বাভাবিক ও সুখপাঠ্য; গুণাকরের কাব্য অধিকতর সুললিত, কিন্তু অস্বাভাবিক এবং স্থানে স্থানে অপাঠ্য'।[১]

ভারতচন্দ্র যে ভাবে মুকুন্দরাম হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন দেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করি।

সতী দক্ষালয়ে যাইবার নিমিত্ত পতির নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন; মুকুন্দরাম এই সম্পর্কে অত্যন্ত সহজ কথায় প্রকাশ করিয়াছেন,

অনুমতি দেহ হর, যাইব বাপের ঘর
যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে। ইত্যাদি

---

১ সা-প-প ১, ১৫৫

পত্নীর এই প্রার্থনায় স্বামীর নিকট স্বাভাবিক আব্দারই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য সহকারে এই স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন,—

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব পিতার ভবন।

দক্ষের শিব-নিন্দায় মুকুন্দরাম যেথানে বলিয়াছেন,

পরিধান বাঘ ছাল, গলায় হাড়ের মাল
বিভূতি ভূষিত যার অঙ্গে।
শ্মশানে যাহার স্থান, তার কেবা করে মান
প্রেতভূত চলে যার সঙ্গে॥

ভারতচন্দ্র সেথানে বলিয়াছেন,

সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥

দক্ষযজ্ঞনাশ বর্ণনায় মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন,

লয়ে নানা রুদ্র ক্রুদ্ধ বীর ভদ্র
চলে যজ্ঞ নাশিবারে।

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।

ব্যাধ-ভবনে মুকুন্দরামের চণ্ডী আত্মপরিচয়চ্ছলে যেথানে কহিতেছেন,

কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা
স্বামী যারে ধরয়ে মস্তকে।

ভারতচন্দ্র তাহাই অন্নদার আত্মপরিচয়চ্ছলে অপূর্ব কবিত্ব সহকারে প্রকাশ করিতেছেন,

গঙ্গা নামে মোর সতা তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সেই স্বামীর শিরোমণি।

মুকুন্দ যেথানে বলিতেছেন,

বিষকণ্ঠ মোর স্বামী সহিতে না পারি আমি
পঞ্চমুখে দেয় গালাগালি।

ভারতচন্দ্র সেখানে বলিতেছেন,

কু কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥

এই প্রকার বহু স্থলে ভাব ও ভাষায় মুকুন্দরামের সহিত ভারতচন্দ্রের অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক অনুভূত হয়।

মুকুন্দরাম ব্যতীতও ভারতচন্দ্র তাঁহার পূর্ববর্তী আর একজন কবির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কাব্যেই ভারতচন্দ্রের স্বর যেন অধিক ধ্বনিত হইয়া উঠিতে শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি ধর্মমঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। তাঁহার সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই স্থলে ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্য হইতে কোন্ কোন্ অংশ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই শুধু উল্লেখ করিব।

ধর্মমঙ্গলের 'আখড়া-পালা'য় ছদ্মবেশিনী পার্বতী লাউসেনের নিকট কৌশলে আত্ম-পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে কহিতেছেন,

মমতা না করে পিতা পাষাণ শরীর।

ভারতচন্দ্রের অন্নদার আত্ম-পরিচয়ে পাই,

না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।

ঘনরামের পার্বতী এই প্রসঙ্গেই বলিতেছেন,

যে ডাকে আদর ভাবে যাই তার কাছে।

আবার অন্যত্র ছদ্মবেশী হনুমান কামরূপরাজের নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে বলিতেছেন,

যে ডাকে কাতর হয়ে যাই তার কাছে।

ভারতচন্দ্রে আছে,

যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই।

ঘনরামের পার্বতী পতির পরিচয়-সম্বন্ধে কহিতেছেন,

ভিক্ষুক ভক্ষণ ভাঙ্গ ভস্মগুলা গায়।

ভারতচন্দ্রে পাই,

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ঈশ্বরী পাটনীর নিকট অন্নদার আত্ম-পরিচয় সম্পর্কে কবি যে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহা মুখ্যত মুকুন্দরামের বর্ণিত

ব্যাধগৃহে চণ্ডীর ছলনাময় আত্মপরিচয়-দানের উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইলেও, এই সম্পর্কে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নিকটই তাঁহার ঋণ বিশেষ ভাবে অনুভূত হইবে। কিন্তু ঈশ্বরী পাটনীর এই চিত্রটির জন্য ভারতচন্দ্র সর্বতোভাবে যে মনসা-মঙ্গলের কবিদিগের নিকট ঋণী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রায় প্রত্যেক মনসামঙ্গল-কাব্যেই পাই, স্বামীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া চণ্ডী এক খেয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই খেয়া ঘাটে চণ্ডী নামে এক ডোমনী পাটনী ছিল,—

ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবী মনে মনে পাঁচে।
হাসিতে হাসিতে গেলা ডোম্‌নীর কাছে॥
কপট করিয়া সাচা মিছা কথা কই।
এক নাম জানিয়া তাহারে বলে সই।[১]

ভারতচন্দ্রের অন্নদা খেয়া পাটনীর নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥

এই প্রসঙ্গে মনসা-মঙ্গলে পাওয়া যায়,—

চণ্ডী বলে সখী মোর দুঃখের নাহি ওর।
বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পর নারী চোর॥

ভারতচন্দ্রও লিখিয়াছেন,—

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥

ভারতচন্দ্র তাঁহার ঈশ্বরী পাটনীর চিত্রটি পরিকল্পনার জন্য মনসা-মঙ্গলের নিকট যে মুখ্যতঃ দায়ী, তাহা স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

ভারতচন্দ্রকে তাঁহার এই কাহিনীগত মৌলিকতার অভাবের জন্য কতখানি দোষী বিবেচনা করা যায়, এক্ষণে তাহাই বিচার করা কর্তব্য। এ' কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই যুগে মঙ্গলকাব্যগুলির নির্দিষ্ট গতানুগতিক

[১] বিজয়গুপ্ত, ১১

কাহিনীগত ধারা অবলম্বন না করিয়া কোন কবিই মঙ্গলকাব্য রচনা করিতে পারিতেন না। আমাদের এই রক্ষণশীল সমাজের মধ্যে প্রাচীন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা এতই অধিক ছিল যে, তাহার কোন প্রকার সংস্কার কেহ সহজে স্বীকার করিত না। সেই জন্যই যত বড় কবিশক্তি লইয়াই কেহ জন্মগ্রহণ করুন না কেন, সেই প্রাচীনকেই ভিত্তি করিয়া তাঁহার নূতন কাব্যসৌধ গড়িয়া তুলিতে হইত। ভারতচন্দ্রকেও ইহার ব্যতিক্রম করিবার উপায় ছিল না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ইতিপূর্বেই সমাজে এত প্রচলিত ছিল যে, শত কবিত্বগুণে গরীয়ান্ হইলেও ইহার ব্যতিক্রমটি সাধারণতঃ কেহই গ্রহণ করিতে চাহিত না। ভারতচন্দ্র চরমপন্থী ছিলেন না, সেই জন্য পুরাতনের উপরই দৃষ্টি রাখিয়া নিজের কাব্য রচনা করিয়াছেন।

যে রুচি-দোষের জন্য ভারতচন্দ্রের সাধারণতঃ নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়, 'অন্নদা-মঙ্গলের' প্রথম খণ্ডে তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। কৃষ্ণচন্দ্রের আরাধ্য দেবতার সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করিয়া কবি তাঁহার কাহিনী রচনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের 'কালিকা-মঙ্গল' বা বিদ্যাসুন্দরের কথা আলোচনা সম্পর্কে কবির এই নৈতিক দৃষ্টি সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ভারতচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ শব্দশিল্পী, তাঁহার 'কবিতার প্রধান রস তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য'। কাব্যের ইহা যত বড় গুণই হউক, তাহা ইহার বহিরঙ্গগত পরিচয়। অবশ্য যথার্থ সার্থক যে কাব্য, তাহার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা নাই, অন্তঃসৌন্দর্যের জ্যোতিতে ইহার বহিরঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে ; অতএব এক হইতে আরকে বিচ্ছিন্ন করিবার কল্পনাও করিতে পারা যায় না। কিন্তু কাব্যের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের এই যে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা আধুনিক রোমান্টিক কাব্যের সম্পর্কে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারা গেলেও, গতানুগতিক একই বিষয়বস্তু লইয়া রচিত মঙ্গলকাব্য শ্রেণীর আখ্যায়িকা-কাব্য সম্পর্কে তাহা কতদূর প্রযোজ্য হইবে, তাহা বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। যেখানে কাব্যের অন্তরঙ্গের পরিকল্পনায় কবির নিজস্ব প্রতিভা-বিকাশের অন্তরায় ছিল, কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ধরাবাঁধা উপকরণকেই কাব্যের অন্তর্বস্তু রূপে প্রত্যেক কবিকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এবং তাহার ফলে কবির মৌলিক প্রতিভাবিকাশের পদে পদেই অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে কাব্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের পার্থক্য কিছুতেই দূর হইতে পারে না।

উপরের আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ভারতচন্দ্র তাঁহার সমগ্র কাব্যের ভিত্তিভূমির জন্য তাঁহার পূর্ববর্তীদিগের নিকট গভীরভাবে ঋণী। বিশেষতঃ ভারতচন্দ্রের মধ্যে একটি যুগ আসিয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; তাঁহার কাব্যসৃষ্টির উপকরণসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে তাহাদের মধ্যে সুদীর্ঘ একটি যুগের পরিণত সাহিত্য-সাধনার বহু উপাদানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যাইবে। ভারতচন্দ্র যুগস্রষ্টা নহেন, বরং যুগেরই সৃষ্টি। তাঁহাকে লইয়া একটি যুগ আরম্ভ হয় নাই, বরং তাঁহার মধ্যেই একটি যুগ পরিণতি লাভ করিয়াছে; এই যুগের পটভূমিকা হইতে ভারতচন্দ্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিচার কবিবার উপায় নাই। তাঁহার কাব্য সমগ্রভাবে তাঁহার একান্ত ব্যক্তি-প্রতিভার সৃষ্টি বলিয়া দাবী করা ভুল হইবে—এই সৃষ্টির মূলে দীর্ঘ যুগের একটি পরিণত-প্রায় সাধনাও কার্যকরী হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যের যুগ রাজনৈতিক যুগের ন্যায় নহে—নূতন রাজনৈতিক যুগের সূচনায় যেমন কোনও রাজবংশ পূর্ববর্তী রাজবংশকে সম্পূর্ণ নির্মূল করিয়া দিয়া নিজের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, সাহিত্যের যুগে তাহা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। সাহিত্যে পূর্ববর্তী যুগের ভিত্তির উপরই নূতন যুগের সৌধ স্থাপিত হয়। এইজন্য ভারতচন্দ্রের মধ্যে বাঙ্গালীর একটি সুদীর্ঘ রস-সাধনার যুগ সমাহিত হইলেও, তাহার পরবর্তী যুগও তাঁহারই সাধনার ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। সেই জন্যই বলা হইয়াছে যে, 'ভারতচন্দ্রের কাব্যোৎকর্ষ কেবল তাঁহার কাব্য-প্রসাধন কলা বা রাজসভা-সুলভ রুচি-বৈদগ্ধ্যের উপর নির্ভর করে না, পরন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে তাঁহার অন্নদা-মঙ্গল ভাবীযুগের সাহিত্যিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার অস্ফুট বার্তা বহন করে।'

ভারতচন্দ্রের কাব্যে সন্নিবিষ্ট গীতি-কবিতাগুলি খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতি-কবিতার উৎস খুলিয়া দিয়াছিল। বৈষ্ণব পদাবলী হইতে ক্রমাগত রস আহরণ করিবার ফলে বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ক্রমে রচনাগত শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল—কাহিনীর নিবিড়তা বিনষ্ট হইয়া গিয়া ইহাদের মধ্যে মধ্যে গীতি-সুরের ঝঙ্কার ধ্বনিত হইতেছিল। ভারতচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া মঙ্গলকাব্যের প্রচ্ছন্ন গীতি-সুরটি স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। যে গীতি-সুর ও গীতি-রস ইতিপূর্বে মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া তাহাই স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন পরিচয় লাভ করিল। ইতিপূর্বে কোন কোন অঞ্চলের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনায় বিষ্ণুপদ ব্যবহারের যে রীতি ছিল, ভারতচন্দ্র তাহাই অধিকতর রস এবং শিল্প-সুষমায়

মণ্ডিত করিয়া নিজের রচনার মধ্যে গ্রহণ করিলেন। বিষ্ণুপদগুলির আপাত ধর্মীয় আবেদন ইহাদের মধ্যে আর রক্ষা পাইল না—ইহারা মানবিক অনুভূতি-সমৃদ্ধ হইয়া যথার্থ গীতি-সাহিত্য রচনার উপযোগিতা লাভ করিল। ভারতচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত গীতিপদগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবজাগরণের অগ্রদূত মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র ভিত্তিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে—

(১)

ওহে বিনোদ রায়, ধীরে ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥
নব জলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীতধড়া বিজলীতে ময়ূরে নাচাও হে॥
নয়ন চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর,
মুখ-সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে॥
নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত যেমত চাহে সেই মত চাও হে॥

(২)

কি বলিলি মালিনি, ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল॥
শিহরিল কলেবর তনু কাঁপে থর থর
হিয়া হৈল জর জর আঁখি ছল ছল।
তেয়াগিয়া লোক-লাজ কুলের মাথায় বাজ
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল॥
রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিত্ত না ধৈরয ধরে পিক কল-কল।
দেখিব সে শ্যামরায় বিকাইব রাঙা পায়
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল-ঢল॥

(৩)

আলো আমার প্রাণ কেমন লো করে,
কি হৈল আমারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥
লুকায়ে পিরিত কৈনু কুলকলঙ্কিনী হৈনু
আকুল পরাণ মোর অকূল পাথারে।
সুজন নাগর পেয়ে আগু পাছু নাহি চেয়ে
আপনি করিনু প্রীতি কি দুষিব তারে॥
লোকে হৈল জানাজানি সখীগণে কানাকানি
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।
যায় যাক জাতি কুল কে চাহে তাহার মূল
ভারত সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে যারে॥

(৪)

কারে কব লো যে দুঃখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার॥
বাঁধা আছি কুলফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয় সঙ্গা কলঙ্কিনী কয়
পাপ ননদিনী-ভয় কত সব আর॥
শ্যাম অখিলের পতি তারে বলে উপপতি
পোড়া লোক পাপমতি না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম শ্যাম সে পুরুষোত্তম
ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার॥

(৫)

মোর পরাণ-পুতলী রাধা।
সুতনু তনুর আধা॥
দেখিতে রাধায় মনে সদা ধায়
নাহি মানে কোন বাধা।

রাধা সে আমার আমি সে রাধার
আর যত সব বাধা ॥
রাধা সে ধেয়ান রাধা সে গেয়ান
রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে কভু নাহি টলে
রাধা কৃষ্ণপদে বাঁধা ॥

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী কিংবা কোন কোন অঞ্চলের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ব্যবহৃত বিষ্ণুপদের সঙ্গে উদ্ধৃত পদগুলির প্রধান পার্থক্য কেবলমাত্র যে বহিরঙ্গগত তাহাই নহে, ভাবগতও বটে। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী ও বিষ্ণুপদ প্রধানতঃ ভক্তি-রসাশ্রয়ী, গৌড়ীয় অধ্যাত্ম দর্শন অনুযায়ী একটি শুদ্ধা ভক্তির ভাব ইহাদের মধ্যে নিবিড়তা লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু ভারতচন্দ্র রচিত উদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে ভক্তিরসের নিবিড়তা নাই, অধ্যাত্ম-দর্শন নিরপেক্ষ একটি সহজ মানবিক রসানুভূতি ইহাদের মধ্যে নিতান্ত তরলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতচন্দ্রের যুগে সমাজের জীবন-দৃষ্টি ইহার গভীরতম স্তর পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র উপরি-স্তরে লঘুভাবে বিচরণ করিয়াছে। রসিকের চিত্তাকাশে ধারাবর্ষী ঘন মেঘসঞ্চারের পরিবর্তে তখন জলভারহীন শারদীয় শুভ্র মেঘের উদয় হইয়াছিল। সেই জন্য উদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ভারতচন্দ্রেরই ব্যক্তিমানসের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই, বরং তাহার সঙ্গে তদানীন্তন সমাজের অন্তরগত পরিচয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র সমাজের চিত্তাকাশ এইভাবে আশ্রয় করিয়াছিল বলিয়া ভারতচন্দ্রের এই গীতি-রচনাগুলি বাংলা কাব্যসাহিত্য যতদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সাধনার মধ্যে নূতন আদর্শের সন্ধান লাভ করিতে পারে নাই, ততদিন আপনার প্রভাব অব্যাহত রাখিয়াছে। ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের আকাশে প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপিয়া যে অন্ধকার বিরাজ করিয়াছিল, তাহা ভারতচন্দ্রের এই গীতিগুলির অক্ষম অনুকরণ-জাত রচনার খদ্যোতালোকে মধ্যে মধ্যে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে মাত্র—কবিগান, পাঁচালী, টপ্পা, কথকতা ইত্যাদির ভিতর দিয়া নানাভাবে ভারতচন্দ্রের এই গীতিসুরটিই সেই যুগে অনুরণিত হইয়াছে। এমন কি, বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের প্রথম প্রত্যূষে ঈশ্বর গুপ্ত এবং রঙ্গলাল আঙ্গিকের দিক হইতে ভারতচন্দ্রকেই অনুকরণ করিয়াছেন; মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের' অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে ভারতচন্দ্রের প্রভাব অবিসংবাদিত।

ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা কাব্যরচনার ক্ষেত্রে সচেতন ভাবে শিল্পরীতির অনুসরণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে বাংলা কাব্যদেহ অলঙ্করণের যে রীতি প্রচলিত ছিল, তাহা একদিক দিয়া যেমন সংস্কৃতের অন্ধ অনুকরণ-জাত ছিল, তেমনি অন্য দিক দিয়া অনেক কবিরই অনায়াসলব্ধ ছিল। কিন্তু সচেতন ভাবে কাব্যদেহ শিল্প-সুষমামণ্ডিত করিবারও কবির যে একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে, তাহা ভারতচন্দ্রের পূর্বে গভীর ভাবে কেহই অনুভব করেন নাই। ভারতচন্দ্র কাব্য রচনার মধ্যে 'রস'-এর প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন—

'যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে।'

এই আদর্শ অনুযায়ীই তাঁহার কাব্যরচনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সচেতন শিল্পিমানসের রস-সৃষ্টির প্রয়াস তাঁহার কাব্যে সার্থক হইয়াছে। বাংলা কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে ইহা এক নূতন দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছিল।

ভারতচন্দ্রের ব্যবহৃত ছন্দের অন্ত্যানুপ্রাসগুলি একেবারে নির্ভুল। বাংলা কাব্য রচনায় ইতিপূর্বে এই প্রকার নির্দোষ অন্ত্যানুপ্রাস আর কেহ ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এই বিষয়েও তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সচেতন শিল্পী। ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে নানাবিধ ছন্দের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হ'ন। ছন্দই তাঁহার মৌলিক সৃষ্টি। পয়ার এবং ত্রিপদীকে ভিত্তি করিয়াও যে বাংলা ছন্দে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে, ছন্দও যে বাংলা কাব্যদেহ গঠনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, তাহা তিনিই সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দ অনুকরণেরই বা কি সম্ভাবনা, তাহাও তিনি নানাদিক হইতে পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারই অনুশীলনের সূত্র ধরিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বৃত্রসংহারের কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য ভারতচন্দ্রের এই বিষয়ক প্রয়াস যে সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না—তথাপি এই বিষয়ে তিনি যে কেবলমাত্র গতানুগতিক পথেই বিচরণ না করিয়া দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সে যুগের বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। অপরিসর পয়ারের মধ্য দিয়া তিনি যে 'মিতাক্ষর-গাঢ়তা' বা বাক্‌সংযমের পটুতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে অতি সরল সহজ ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট ক্লাসিক্যাল স্টাইলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।'

সাধারণভাবে তাঁহার পরিচয় এই যে তিনি অশ্লীল। এই অশ্লীলতা তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যের একটিমাত্র অংশ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা

'বিদ্যাসুন্দর' বা 'কালিকা-মঙ্গল'। বিদ্যাসুন্দর কাব্য আশ্রয় করিয়া অশ্লীলতা ইতিপূর্বেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহার নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল—ভারতচন্দ্র সেই ধারাই অনুবর্তন করিলেও অশ্লীলতার মধ্যে তাঁহার একটু স্বকীয় বিশেষত্ব ছিল। ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবিগণ অশ্লীলতাকে প্রাকৃত জীবনের সহজাত বা nature হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অশ্লীল বিষয়ও যে শিল্প-সৌষ্ঠবের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে, ভারতচন্দ্র তাহা অনুভব করিয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহার অশ্লীল স্থানগুলি ভাষার দীপ্তি ও রসের ঔজ্জ্বল্যে বিদগ্ধ মনের নিকট সার্থক আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার যাবতীয় অলঙ্কার, ভাষার চাতুর্য সবই এই অশ্লীল স্থানগুলির বর্ণনাতেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাষাগত অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা ভারতচন্দ্রে একেবারেই নাই, তাঁহার মধ্যে যে অশ্লীলতা আছে, তাহা ভাব বা অর্থগত অশ্লীলতা; তাহারও প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষতা (directness) ছিল না। অশ্লীলতা যে সাহিত্যিক শিল্প-সাধনার বিষয়, তাহা ভারতচন্দ্রের রচনাতেই প্রথম বুঝিতে পারা গেল। সুতরাং তথাকথিত অশ্লীলতার জন্য তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যের যে ত্রুটিই প্রকাশ পা'ক না কেন, ইহার একটি অভিনব শিল্প-পরিচয় দিতে গিয়া তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মূল্য কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারা যায় না।

ভারতচন্দ্র হাস্যরসের কবি। সামাজিক কুপ্রথার প্রতি বক্রোক্তিই তাঁহার হাস্যরসের মূল। দাসু বাসুর বর্ণনায় ও কোটালের ভীতিতে তদানীন্তন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের কাপুরুষতার প্রতিই তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন। অথচ ইহাই তাঁহার হাস্যরসের অবলম্বন। তাঁহার মধ্যে ভক্তিভাবের একান্ত অভাব, ভক্তির স্থান গ্রহণ করিয়াছে ব্যঙ্গ ও অবিশ্বাস। খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে সর্বসংস্কারমুক্ত যে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গপ্রধান রচনার ভিতর দিয়াই তাহার প্রথম সোপান রচিত হইয়াছিল। মধ্যযুগের সমাজের বুকে যে ভক্তিভাব তাহার অচল আসন স্থাপন করিয়াছিল, ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গভাবের ফুৎকারে সেই আসন বিচলিত হইয়াছিল। তাঁহার ব্যঙ্গের কাষাঘাত হইতে দেবতারাও রক্ষা পান নাই। বাংলা সাহিত্যে দেব-ভক্তির মধ্যে এই প্রথম শৈথিল্য দেখা দিয়া ইহাতে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত জাতির আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপযোগী করা হইয়াছিল। এই ভাবে মঙ্গলকাব্যের ভক্তিবাদকে পদদলিত করিয়া দূর করা হইয়াছে। এতকাল মঙ্গলকাব্যের ধারা ঝরণার

ধারার মত স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উৎসারিত হইতেছিল, ভারতচন্দ্র তাহাতে সর্বপ্রথম নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ দিয়া তাহাকে পাথরের গাঁথা কুণ্ডে পরিণত করিয়া তাহার গতিপথ রুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তিহীন ব্যঙ্গোক্তি, তাঁহার সর্বব্যাপী ও সুগভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রভৃতির ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যে তাঁহার ব্যক্তি-প্রতিভার ছাপ মুদ্রিত করিয়া দিয়া তিনি মঙ্গলকাব্যের যুগাবসান ঘটাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষত্বগুলি তাঁহার ঐহিক প্রীতির নিদর্শন রূপে গণ্য হইবার মর্যাদা লাভ করিয়া তাহাকে আধুনিক যুগেরও অগ্রদূত বলিয়া নির্দিষ্ট হইবার যোগ্যতা দান করিয়াছে।

স্বাভাবিক নিয়মেই সাহিত্যে ভাবযুগের পর শব্দযুগের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব কবিতায় যে ভাবের প্রবাহ বহিয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ শান্ত সমুদ্রবক্ষের মত স্থিতিলাভ করিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার বক্ষের উপর মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহে তরঙ্গধ্বনির সৃষ্টি হইল। সেইজন্যই ভারতচন্দ্রের ভাষা, 'কলকল ছলচ্ছল টলটল তরঙ্গা।'

চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়া 'অন্নদা-মঙ্গলে'র প্রথম খণ্ডে একমাত্র ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্রটিই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার চরিত্র ও পরিবেশটি ভারতচন্দ্রের মৌলিক কল্পনার ফল নহে—মনসা-মঙ্গল কাব্য হইতে তাহা গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও ভারতচন্দ্র ইহাকে এক অভিনব রূপ দিয়াছেন—ভারতচন্দ্রের মৌলিক সৃষ্টি-প্রতিভাকে অবলম্বন করিয়া, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরী পাটনী জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে—এমনটি ইহার আগে আর কখনও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মনসা-মঙ্গল কাব্যে খেয়া পারাপারকারিণী ডোম্‌নীর মধ্যে যে মানসিক পরিচয়টি তখনও প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, ভারতচন্দ্রের পরিকল্পনার মধ্যে তাহারই পূর্ণাঙ্গ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরী পাটনীর মধ্যে একান্ত মানবিকতার সন্ধানই ভারতচন্দ্রের একমাত্র কৃতিত্ব।

বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরাম বড় কবি, না ভারতচন্দ্র বড় কবি, এই বিষয় লইয়া বিভিন্ন সমালোচকদিগের মধ্যে বহুকাল যাবৎই মতানৈক্য চলিতেছে। এই বিষয়ে মতবিরোধের কোন দিন অবসান হইবে, এমনও মনে হয় না। কারণ, এই উভয় মতাবলম্বিগণ দুই স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ হইতে এই দুইজন কবির রচনা বিচার করিয়া থাকেন। মুকুন্দরামের অনুভূতি-গুণ ও ভারতচন্দ্রের শিল্প-গুণ—ইহারা কাব্যের দুইটি বিপরীতমুখী গুণ। এই দুইটির একত্র সমন্বয়দ্বারা কাব্য অপূর্ব হইয়া

উঠে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এই দুইটি গুণের একত্র সমন্বয় সাধন এ'যাবৎ কেহই করিতে পারেন নাই। অনুভূতি-গুণে মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠ, শিল্প-গুণে ভারতচন্দ্র শ্রেষ্ঠ—অতএব একজন অপর হইতে বড়, ইহা বলা সঙ্গত হয় না। অনুভূতি ও প্রকাশ-কৌশল উভয়ই কাব্যের মধ্যে সমান অপরিহার্য—ইহাদের কোন্‌টি ছোট, কোন্‌টি বড়, তাহা বলা কঠিন। অতএব এই দিক দিয়া মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্র কে বড় কবি, তাহার কোন মীমাংসা করা যায় না। ভারতচন্দ্রের নাম শুনিবামাত্র বিগত শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত সমালোচকই নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন—বলা বাহুল্য, তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের তথাকথিত অশ্লীলতার জন্যই সে যুগের ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে তাঁহার সম্বন্ধে এই মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারই ফলে সমাজের নীতিবাগীশ সাহিত্য-সমালোচকদিগের নিকট ভারতচন্দ্র অপাঠ্য ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন। বর্তমানে নিরপেক্ষ সাহিত্যিক বিচারের দিক হইতে ভারতচন্দ্রের কিছু আলোচনা হইয়াছে, ফলে তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে পুনর্বিচার আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা এই বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতচন্দ্রকেই মঙ্গল-কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া দাবী করিয়াছেন—মুকুন্দরামের প্রতিভা তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এই শ্রেণীর সমালোচকদিগকে লক্ষ্য করিয়াই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন, কবিকঙ্কণের ঋষভস্বর কে শোনে?'[১] উপরে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে স্পষ্টতই অনুমিত হইবে যে, ভারতচন্দ্র ছিলেন শিল্পী; মুকুন্দরাম ও তাঁহার পরবর্তী কবিদিগের প্রতিষ্ঠিত ভাব ও ভাষার ভিত্তির উপর তিনি তাঁহার নিজের সৌধ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সৌধ শিল্পীর নির্মাণ-কৌশলগুণে তাজমহল হইয়া উঠিয়া বাহির হইতে দর্শকের চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়াছে, কিন্তু ইহার ভিত্তিমূলে যে একটি অমর প্রেমের কাহিনী গোপন রহিয়াছে, তাহা ভুলিলে চলিবে কি করিয়া? তেমনই দীর্ঘ যুগের বাংলা সাহিত্যের একটি প্রচ্ছন্ন অমর সাধনা ভারতচন্দ্রের সমগ্র কাব্য-সৃষ্টির অবিস্মরণীয় উৎস হইয়া রহিয়াছে। কবি হিসাবে জয়দেব ও ভারতচন্দ্র স্বজাতি, মৈথিল বিদ্যাপতি তাঁহাদেরই সগোত্র; সেইজন্যই বিদ্যাপতির এক উপাধি 'অভিনব জয়দেব'। এই উপাধি ভারতচন্দ্রেরও প্রাপ্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এক প্রান্তে জয়দেব ও অপর প্রান্তে ভারতচন্দ্র—সূর্য-

[১] কমলাকান্তের দপ্তর (বসুমতী), ২০

করোজ্জ্বল তুষার শৈলের দুই সমুন্নত স্বর্ণশৃঙ্গ, একটি উদয়াচলে অপরটি অস্তাচলে সংবদ্ধ। এই দুই উন্নত গিরিশৃঙ্গের পাদমূলে তৃণাস্তীর্ণ শ্যামল উপত্যকায় যে স্বচ্ছন্দ জীবনের কলনিস্যন্দিনী ধারা প্রবাহিত, তাহারই নিভৃত তীরে মুকুন্দরামের পর্ণকুটীর বিরাজিত।

ভারতচন্দ্রকে রাজসভার কবি বলিতে কেহ কেহ রাজকবি বলিয়া ভুল করিয়াছেন। রাজসভার কবি ও রাজকবি এক কথা নহে, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। সভা সমাজের প্রতিনিধি—রাজসভাও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি। অতএব ভারতচন্দ্রকে রাজসভার কবি বলিতে তাঁহাকে সমসাময়িক নাগরিক রস ও রুচির প্রতিনিধি বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়া থাকে, রাজার ব্যক্তিগত রস ও রুচিবোধের দাস বলিয়া মনে করা হয় না,—এই বৃত্তি রাজকবির কাজ, রাজসভার কবির নহে।

কেহ কেহ ভারতচন্দ্রকে যুগসন্ধির কবি বলিয়াও ভুল করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার মধ্যে একটি যুগ সম্পূর্ণ সমাহিত হইয়াছে, তাঁহার পরবর্তী যুগ-সূর্যোদয়ের জন্য তিনি আর অপেক্ষা করেন নাই। ১৭৬০ খৃস্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মাত্র তিন বৎসর পূর্বে ইংরেজগণ পলাশীতে জয়লাভ করিয়া রাজ্যের কর্তা হইয়াছেন—ইহার পূর্বেই ভারতচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন শেষ হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই যুগসন্ধির কবি, ভারতচন্দ্র নহেন। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর একশত বৎসর পর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই যুগ-সন্ধি দেখা দিয়াছিল। এই সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, '১৮৫৯।৬০ সন বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়'। অতএব ইহার একশত বৎসর পূর্বে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাকে যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি বলিয়া ভুল করিবার কোন কারণ নাই।

জয়নারায়ণ সেন

ভারতচন্দ্রের পরবর্তী আর একজন চণ্ডীমঙ্গলের কবির নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নাম লালা জয়নারায়ণ সেন।[১] তিনি বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত জপসা গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে জয়নারায়ণের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; তবে তিনি 'হরিলীলা' নামক সত্যপীরের

---

১ জয়নারায়ণ সেন, ব-সা-প ১, ৩৭৭-৭৮; সা-প-প ৭, ১-২৪; ঐ ১৫২-৬২; গ-স ৪৩৪৮

কাহিনী অবলম্বন করিয়া আর একখানি পাঁচালী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[১] তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, হরিলীলা কাব্য ১৬৯৪ শকাব্দ বা ১৭৭২ খৃস্টাব্দে রচিত হয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ইহার পূর্বে রচিত হয় বলিয়া অনুমিত হয়।

আধ্যাত্মিক সাধনা, পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের খ্যাতিতে জয়নারায়ণের বংশ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই বংশের পূর্বপুরুষ বেদগর্ভ সেন যশোর জিলার ইত্না গ্রাম হইতে বিক্রমপুরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। অতঃপর কয়েকখানি গ্রাম ভূসম্পত্তিস্বরূপ অর্জন করিয়া বিলদায়িনীয়াতে নিবাস স্থাপন করেন। রাজা রাজবল্লভ বেদগর্ভ সেনেরই অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ।[২] এই বংশেরই এক শাখায় দেওয়ান কৃষ্ণরাম জন্মগ্রহণ করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দেওয়ান কৃষ্ণরাম বিক্রমপুরের অন্তর্গত চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি পরগণার রাজস্ব আদায় করিতেন। দেওয়ান কৃষ্ণরামের দ্বিতীয় পুত্রের নাম রামপ্রসাদ। তাঁহার স্ত্রীর নাম সুমতী দেবী। ইহাদের পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করে; রামগতি, জয়নারায়ণ, কীর্তিনারায়ণ, রাজনারায়ণ ও নরনারায়ণ। প্রথম পুত্র রামগতি পরম সাধক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাংলায় 'মায়াতিমির-চন্দ্রিকা' ও সংস্কৃতে 'যোগকল্প-ললিতা' গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত 'ভবকলহ-ভঙ্গিকা' নামে আরও একখানি কাব্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

গ্রন্থে আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন—

ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পূর্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার॥
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদ্‌জ্ঞানী বিস্তর॥
বিশিষ্ট অম্বষ্ঠ শ্রেণীর বসতির স্থান।
জপসা নামেতে গ্রাম তথায় প্রধান॥
শ্রীরামপ্রসাদ রায় বিখ্যাত তাহাতে।
বৈদ্যশ্রেষ্ঠ লালা খ্যাতি যাঁর নিজামতে॥
জপসা উত্তম গ্রাম বসতি আলয়।
রামগতি নামে তাঁর প্রধান তনয়॥

---

[১] দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮২৮);

 [২] দীনেশচন্দ্র সেন, ৫০৭।

রামগতি শেষ জীবনে প্রথমতঃ কালীঘাট ও অতঃপর কাশীধামে গিয়া ধর্মজীবন যাপন করেন ; অতঃপর ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কাশীতেই দেহরক্ষা করেন।

রামপ্রসাদের দ্বিতীয় পুত্র জয়নারারণ; তিনিই 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' ও 'হরিলীলা'র প্রণেতা। চতুর্থ পুত্র রাজনারায়ণ 'পার্বতী-পরিণয়' নামক একখানি সংস্কৃত কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। জয়নারায়ণ তাঁহার চণ্ডীকাব্যের একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন,

অনুজ তাহার দিব্য সুকাব্য রচিছে।
পার্বতীর পরিণয় নাম রাখিয়াছে ॥

জয়নারায়ণ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও রামগতি রায়ের কন্যা আনন্দময়ীও কবিত্বের খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি 'হরিলীলা' কাব্য-রচনায় পিতৃব্যকে প্রচুর সাহায্যই যে কেবল করিয়াছিলেন, তাহা নহে—স্বরচিত বহু পদও তিনি তাহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

জয়নারায়ণের চণ্ডীকাব্যে অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের মত দুইটি আখ্যায়িকা, অর্থাৎ কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনা, এই উভয়ের সহিতই সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। অতএব তিনি কাহিনীর দিক দিয়া ভারতচন্দ্রের অনুবর্তন না করিয়া প্রাচীনতর প্রথারই অনুবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু রচনার আদর্শের দিক দিয়া তিনি ভারতচন্দ্রের নিকট মুখ্যতঃ ঋণী বলিয়া অনুভব করা যাইতে পারে। আদিরসের বর্ণনায় জয়নারায়ণ ভারতচন্দ্র হইতে কতকটা সংযত, কিন্তু তথাপি তাহা সমসাময়িক সমাজের রুচির সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। স্থানে স্থানে এই বিষয়ে ভারতচন্দ্রের সমকক্ষতা যে তিনি লাভ না করিয়াছেন, তাহাও বলিবার উপায় নাই।

জয়নারায়ণ সংস্কৃত সাহিত্যে পরম পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন : চণ্ডীকাব্য তাঁহার সংস্কৃত কাব্য ও সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রাদিতে পাণ্ডিত্য অর্জনেরই ফল। চণ্ডীকাব্যের প্রথম অংশে শিব-প্রসঙ্গ বর্ণনায় তিনি কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' হইতে স্থানে স্থানে অনুবাদের এমন সাফল্য দেখাইয়াছেন, যাহা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে খুব সুলভ নহে।

ভারতচন্দ্রের মত ভাষার পারিপাট্য ও লাবণ্য জয়নারায়ণের কাব্যের অন্যতম বিশেষত্ব। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব অবশ্য ইহাতে সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। তবে ভারতচন্দ্র রচনা-শক্তির মৌলিকতা-গুণে সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের ভাষাকে যেমন অপূর্ব কৌশলে নিজস্ব করিয়া লইয়া তাহার মধ্যে অদ্ভুত

গতিবেগ দান করিয়াছিলেন, জয়নারায়ণ তেমন পারেন নাই। অনেক স্থলেই তাঁহার ভাষার রূপ সুমার্জিত, কিন্তু তথাপি এই গতিবেগের অভাবে তাহা যেন চাকচিক্যবিহীন। বিশেষতঃ পদের মিলের দিক দিয়া (rhyming) ভারতচন্দ্র যে অপূর্ব নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন, জয়নারায়ণ তাহা দেখাইতে পারেন নাই; অনেক স্থলেই ক্রিয়াপদের সহিত ক্রিয়াপদের মিল দেওয়াতে তাঁহার রচনা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইতিপূর্বেই বাংলা কাব্যের ভাষায় বৈষ্ণব গীতিকাব্যের ভাষা ও রচনার প্রভাব দেখা দিয়াছিল; জয়নারায়ণ তাঁহার চণ্ডীকাব্যে তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

তথাপি এ'কথা বলিতে হয় যে, জয়নারায়ণের মধ্যে প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় খুব সুলভ নহে; পাণ্ডিত্যই তাঁহার রচনাকে যাহা কিছু গৌরব-দান করিয়াছে সত্য, কিন্তু কবিত্বের সন্ধান করিতে গেলে সেখানে ব্যর্থকাম হইতে হইবে। বিষয়বস্তু পরিকল্পনার মূলে আন্তরিকতা সেই যুগে এক প্রকার লোপ পাইলেও, ভারতচন্দ্রের মধ্যে মানব-চরিত্র চিত্রণ-বিষয়ে যে দক্ষতা দেখিতে পাওয়া যায়, জয়নারায়ণের কাব্যে তাহারও বিশেষ পরিচয় নাই। তাঁহার চরিত্রসৃষ্টি কৃত্রিম ও নিতান্তই গতানুগতিক,—কোথাও সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই।

চণ্ডীমঙ্গলের আখ্যায়িকা দুইটি ব্যতীতও জয়নারায়ণের কাব্যে আরও একটি স্বতন্ত্র আখ্যান আছে। তাহা মাধব-সুলোচনার উপাখ্যান। কবির ভাগিনেয়ী গঙ্গা ও ভ্রাতুষ্পুত্রী দয়াময়ীর অনুরোধে তিনি উক্ত আখ্যায়িকাটি চণ্ডীকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেন বলিয়া নিজেই কাব্যমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

ভবানীশঙ্কর

ভারতচন্দ্রের পরও যে কয়েকখানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ভবানীশঙ্কর দাসের কাব্যখানি উল্লেখযোগ্য।[১] ইহার রচনা-কাল সম্বন্ধে কবি তাঁহার কাব্যশেষে উল্লেখ করিয়াছেন,

ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে।
ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে॥

ইহা হইতেই জানা যায় যে, ১৭০১ শক বা ১৭৭৯ খৃস্টাব্দে ভবানীশঙ্কর তাঁহার মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা রচনা সমাপন করেন। তাঁহার এই কাব্য 'জাগরণের পুঁথি' ও 'চণ্ডীমঙ্গল গীত' নামেও পরিচিত।

---

[১] ভবানীশঙ্কর দাস, মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা, রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত (সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৩)।

কবি আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে গ্রন্থমধ্যে যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি আত্রেয় গোত্রীয় নরদাসের বংশধর ও কুলীন কায়স্থ কুলোদ্ভব। এই আত্রেয় গোত্রীয় নরদাস বাংলার সমাজে কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠাতা বল্লালসেনের কুল-নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া বারেন্দ্র সমাজে চলিয়া যান এবং বারেন্দ্র সমাজেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। এই প্রতিপত্তি দ্বারাই ক্রমে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া লন। নরদাসের বংশধরগণ কালক্রমে বরেন্দ্র ও বঙ্গে ছড়াইয়া পড়েন।

কবির পূর্বপুরুষ নরদাসের বংশধর কৃষ্ণানন্দ ও হৃদয়ানন্দ চট্টগ্রামের অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্তী দেবগ্রামের অনতিদূরে বটতলী গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর তাঁহাদের বংশধর মধুসূদন বটতলী হইতে চক্রশালার অন্তর্গত ছনহারা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই মধুসূদন কবির পিতামহ। কবি ভবানীশঙ্করের পিতার নাম শ্রীমন্ত। ছনহারা গ্রামেই ভবানীশঙ্করের জন্ম হয়, তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম কৃষ্ণকিঙ্কর। অদ্যাপি কবির বংশধরগণ চট্টগ্রামের নানা স্থানে বসবাস করিতেছেন। পূর্বে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় কবির বাটীতে তাঁহার কাব্যখানি গীত হইত। ইদানীং তাঁহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

ভবানীশঙ্করের কাব্যখানি আকারে সুবৃহৎ। ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কবি হইলেও ভারতচন্দ্রের কোন প্রভাব তাঁহার উপর দেখিতে পাওয়া যায় না; কারণ, তখনও ভারতচন্দ্রের প্রভাব এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, মুকুন্দরামের কাব্যও চট্টগ্রাম অঞ্চলে অপ্রচলিত ছিল, সেইজন্য তাঁহারও কোন প্রভাব এই কবির উপর দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ দ্বিজ মাধবের কাব্য হইতে তিনি কাহিনীর মূল অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত পুরাণগুলির অনেক কাহিনী তিনি নানা উপায়ে তাঁহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার রচনা সংস্কৃত শব্দ, উপমা ও অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত। অনেক সময় সংস্কৃত সন্ধি-সমাসের নিয়ম পর্যন্ত তিনি তাঁহার বাংলা রচনার কার্যে নিয়োগ করিয়াছেন, যেমন,—

কি বর্ণিব মায়ের রূপ ময়াধম দীনে।
যাহার রূপেরাভায় ত্রিভুবন জিনে॥
প্রাতরর্করাভা জিনি শোভে পদতল।
পদোপরে অলঙ্কারে করে ঝলমল॥ ইত্যাদি

সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য তাঁহার কাব্য-কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি পদে পদে প্রতিহত করিয়াছে, নতুবা তাঁহার মধ্যে সত্যকার কবি-দৃষ্টি ছিল বলিয়া অনুভব করা যায়। কবি এইভাবে ফুল্লরার বারমাসী বর্ণনা করিয়াছেন,

ফুল্লরায়ে বলে বাক্য শুন রূপবতী।
যত ক্লেশে প্রভু সঙ্গে করিয়ে বসতি॥
মেষ রাশি মধ্যে ভাস্করোদয় হয়ে যবে।
যত ক্লেশ ক্রমে আহ্মি বঞ্চি এই ভবে॥
আতপ প্রতাপ হয়ে ধনঞ্জয় সমা।
হেন সমে মাংস লৈয়া ভ্রমি আহ্মি বামা॥
দিবাকর বৃষস্থ হয়েন যেই মাসে।
আহ্মার বিপত্তি দেখি শত্রু সর্ব হাসে॥ ইত্যাদি

এই সকল রচনায় কবিত্ব অপেক্ষা লেখকের পাণ্ডিত্যই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

অকিঞ্চন চক্রবর্তী

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল' রচনার পরও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচনার ধারাটি যে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কবি অকিঞ্চনের চণ্ডীমঙ্গল। ইঁহার পুঁথিখানি আজিও প্রকাশিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই, কিংবা বাংলা সাহিত্যের কোন ইতিহাসলেখক এই পর্যন্ত এই পুঁথিখানির বিষয় কোন উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। সম্প্রতি ইঁহার একখানি পুঁথি আমার হস্তগত হইয়াছে,[১] এখানে তাহার বিষয়ই উল্লেখ করিব।

পুঁথিখানি দুইটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে—প্রথম খণ্ডে কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ও দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতি সদাগরের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; বর্ণনা কোথাও সংক্ষিপ্ত নহে—সর্বত্রই মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ন্যায়ই দীর্ঘ। ষোলটি পালায় দুইটি কাহিনী সম্পূর্ণ হইয়াছে; প্রত্যেক পালায় নূতন করিয়া পত্রাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। পুঁথিখানি কোথাও একই পাতার দুই পৃষ্ঠায়, কোথাও বা দো-ভাঁজ করা দুই পাতার এক পৃষ্ঠায় লিখিত। পুঁথিখানির অবস্থা ভাল, লিপি সুন্দর

[১] মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার বেঙ্গরাল গ্রামনিবাসী কবির বংশধর শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী বি. এ. মহাশয়ের সৌজন্যে পুঁথিখানি আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। পুঁথিখানির বিষয়ে পূর্বে আমি নিজেও কিছু অবগত ছিলাম না।

ও সহজপাঠ্য, তবে একাধিক হস্তে লিখিত। অক্ষরের ছাঁদ দেখিয়া খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পুঁথিখানি লিখিত বলিয়া মনে হয়। ভণিতায় কবি এই ভাবে নিজের নাম উল্লেখ করিয়ছেন,—

চণ্ডিকার চরণ চিন্তিয়া অনুক্ষণ।
রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন॥
আজ্ঞা পায়্যা অপাঙ্গিনী আরম্ভে রন্ধন।
রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ কবির নাম অকিঞ্চন চক্রবর্তী, তাঁহার উপাধি কবীন্দ্র। ভণিতার অনেক স্থানে কেবলমাত্র তাঁহার উপাধিটি ব্যবহার করিয়াছেন,—

চণ্ডীর আদেশ পায়্যা কবীন্দ্র কহেন গায়্যা
দূর কর আমার কলুষ।

অকিঞ্চন তাঁহার বাসস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন,—

বসতি বরদা বদনে সারদা
চণ্ডিকা দেবীর আদেশে।
নূতন মঙ্গল শ্রবণে কুশল
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণে ভাষে॥

মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বরদা একটি পরগণার নাম। প্রায় সমসাময়িক আর একজন মঙ্গলকাব্যের কবি তাঁহার কাব্যে এই বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি শিবায়নের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য। অকিঞ্চন রামেশ্বরের পরবর্তী কবি, সেই কথা পরে আরও বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করা যাইবে। বর্তমান কবির বংশধরগণ এই বরদা পরগণার অন্তর্গত বেঙ্গরাল নামক গ্রামে বসবাস করিতেছেন। কবির বংশধরদিগের গৃহে প্রাপ্ত একটি ব্রহ্মোত্তরের দলিলে কবির তিন পুত্র—রামচাঁদ, রামদুলাল ও শিবানন্দকে এই বেঙ্গরাল গ্রামেরই অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দলিলখানি ১২০৯ সালে লিখিত। কবি সেই সময় জীবিত ছিলেন না, তবে তিনিও বেঙ্গরাল গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পুঁথির মধ্যে তিনি কোথাও নিজের গ্রামের নামটি উল্লেখ করেন নাই। বরং তাঁহার পিতা আটঘরা নামক গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

বিপ্রকুলোৎপতি আটঘরা স্থিতি
ঠাকুর পুরুষোত্তম
তাহার নন্দন কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ
রচে কাব্য মনোরম ॥

আটঘরা-শ্রীরামপুর গ্রাম মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল মহকুমাতেই অবস্থিত। কবি স্বয়ং কিংবা তাঁহার পুত্রগণই সর্বপ্রথম আসিয়া ইহার অনতিদূরবর্তী বেঙ্গরাল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় না। কবি বর্ধমানের অধিপতি কীর্তিচন্দ্রের দেশে বাস করিতেন বলিয়া বার বার তাঁহার নাম কাব্যমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

মহারাজ চক্রবর্তী কীর্তিচন্দ্র কৃতকীর্তি
ইন্দ্রের সমান বর্ধমানে।
নিবাস তাঁহার দেশে নূতন মঙ্গল ভাষে
ব্রাহ্মণ কবীন্দ্র অকিঞ্চনে ॥
চিত্রসেনের তাত কীর্তিচন্দ্র নরনাথ
রাজা জগৎরায়ের নন্দন।
বসিয়া তাঁহার দেশে নূতন মঙ্গল ভাষে
শ্রীযুত কবীন্দ্র অকিঞ্চন ॥

কিন্তু তিনি কীর্তিচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন না; কারণ, তিনি পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন,—

ভূপতি তিলকচন্দ্র বর্ধমানে যেন ইন্দ্র
তেজচন্দ্র তাঁহার নন্দন।
নিবাস তাঁহার দেশে চণ্ডিকা মঙ্গল ভাষে
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ অকিঞ্চন ॥

মনে হয়, তিনি যখন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন, তখন মহারাজ তিলকচন্দ্রের পুত্র মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বর্ধমানের অধিপতি ছিলেন। তেজশ্চন্দ্রের রাজ্যকাল খৃস্টাব্দ ১৭৭০ হইতে ১৮৩২। তবে মনে হয়, খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই কাব্যখানি রচিত হয়। মহারাজ তিলকচন্দ্রের কথাও তিনি যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি তিলকচন্দ্রের রাজ্যকালের শেষ ভাগ হইতে তেজশ্চন্দ্রের রাজ্যকালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। এই বিষয়ে আরও

একটি প্রমাণ আছে, তাহা পরে উল্লেখ করিব। পুঁথিখানিতে ইহার রচনা-কাল-জ্ঞাপক নির্দিষ্ট কোন তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায় না; অতএব ইহা অপেক্ষা এই বিষয়ে আর কিছু নির্দিষ্ট করিয়া বলা অসম্ভব।[১]

পুঁথিখানির নাম কবি এক জায়গায় 'পার্বতীর সঙ্কীর্তন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অন্যত্র সর্বদাই তিনি ইহাকে চণ্ডীর 'নূতন মঙ্গল' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রামেশ্বরের 'শিব-সঙ্কীর্তনে'র অনুকরণেই একবার ইহাকে 'পার্বতীর সঙ্কীর্তন' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; যেমন,—

পালা পূর্ণ হল্য পার্বতীর সঙ্কীর্তন।
বিরচিল কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন॥

অকিঞ্চন বৃদ্ধ বয়সেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; কারণ, ইহাতে তাঁহার তিন পুত্রেরই উল্লেখ আছে, যেমন,—

শ্রীরামদুলালে রামচন্দ্র শিবানন্দে।
কল্যাণে করিবে রক্ষা গঙ্গাপদদ্বন্দ্বে॥

এইবার কাব্যখানির আভ্যন্তরিক একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। মুকুন্দরামের বসতিস্থানের অনতিদূরবর্তী অঞ্চলে বাস করিয়া কবি অকিঞ্চন যে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না, তাহা স্বভাবতঃই মনে করা যাইতে পারে। যদিও বহুলাংশে অকিঞ্চন মুকুন্দরাম দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছেন, এ' কথা সত্য, তথাপি কাহিনী ও চরিত্র পরিকল্পনায় তিনি কোন কোন স্থানে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার ভাঁড়ুর চরিত্রটি যদিও মুকুন্দরামের ভাঁড়ুর ছায়াতলেই অঙ্কিত, তথাপি ইহার কতকটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন,—

মধ্যেতে মণ্ডপ করে স্বভাবের ঘর।
ভাঁড়ু দত্ত বৈসে তায় ভণ্ডের ঈশ্বর॥
কড়ি সাধে কিঙ্করে করিয়া আটম্বরী।
হাট ঘাট হইল ভাঁড়ুর আজ্ঞাকারী॥

১ কবির বংশধরদিগের গৃহে যে বংশলতা রক্ষিত আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, হরিনারায়ণের পুত্র পুরুষোত্তম, তাঁহার পুত্র কবি অকিঞ্চন, তাঁহার তিন পুত্র—রামচাঁদ, রামদুলাল ও শিবানন্দ,—রামচাঁদের পুত্র রামজীবন, রামজীবনের পুত্র বেণীমাধব, তাঁহার পুত্র মাখন ও তৎপুত্র তারাপদ। অকিঞ্চন হইতে তারাপদ পর্যন্ত পঞ্চম পুরুষ চলিতেছে। চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরিবার নিয়ম, তাহা হইলে দেখা যায়, মাত্র ১২৫ বৎসর পূর্বে অকিঞ্চন বর্তমান ছিলেন।

কাপড়্যার কাপড় কিনিয়া আনে ছলে।
কড়ি নাঞি দেই তারে কলমের বলে॥
ধূর্ত বুদ্ধ্যে ধান কিনে ধার নাহি সুধে।
মাগিলে মালের টাকা মার্যা প্রাণ বধে॥
কুমারের কুম্ভ লেই সরা ভাণ্ড হাঁড়ি।
ভাঁড়ুর ভগিনী তারে নাঞি দেই কড়ি॥
দুটি বেটা দেই দেখা দোকানের কাছে।
লুট কর্যা লাড়ু খায় লাঙ্গট হয়্যা নাচে॥
জলে যায় যুবতী জঞ্জাল করে ঘাটে।
বাটুলে কলসী ভাঙ্গে খাদ খুলে বাটে॥
পথে পাঁক পেল্যা পাঁশ ঢাকা দিয়া তায়।
হেরি যুবতীর মুখ হাস্যা পাক খায়॥
প্রবল প্রতাপ ধরে একটি জামাই।
মার্যা ধর্যা লিহ্(?) লেই মানা শুনে নাই॥
দধি দুগ্ধ দেখিলে দোকান শুদ্ধ লুটে।
বীরের দোহাই দিলে বল কর্যা পিটে॥
পথে যায় পথিক প্রতাপে গালি পাড়ে।
দোষ বিনা দ্বন্দ্ব করে দণ্ড কর্যা ছাড়ে॥
নগরের লোক যত নানা দুঃখ পায়।
বিষাদ করিয়া বীরে জানাইতে যায়॥
বুলন মণ্ডল সঙ্গে বাইশ বাজার।
কান্দিতে কান্দিতে বীরে করিল জোহার॥
চণ্ডিকার চরণ চিন্তিয়া অনুক্ষণ।
রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন॥

ভাঁড়ুর ভগিনী, পুত্র কিংবা জামাতার অনুরূপ বৃত্তান্ত মুকুন্দরামে নাই। উৎপীড়িত গুজরাটবাসী কালকেতুর নিকট ভাঁড়ুর নামে যে অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন, তাহার চিত্রটি বাস্তব ও করুণ,—

মহাবীর, নগর নিবাসে নাঞি সাদ।
শুন বীরশিরোমণি, নিবাসে বসিল ফণী
ভাঁড়ু দত্ত পাড়িল প্রমাদ॥

তোমার আশ্বাস পায়্যা সর্বে ছিনু সুখী হৈয়া
অন্ন বস্ত্রে পরম কল্যাণে।
নাঞি ছিল রাজকর অপর আপদ ডর,
তোমার চরণ-কৃপাদানে॥
তোমার নগরে আসি আশ্বাসে সভাই বসি
প্রজা মোরা সুখের পায়রা।
যথা অপন্যায় নাঞি সর্বে বসি সেই ঠাঁঞি
খুঁজি বড় বৃক্ষের ছায়রা॥
রাজার জয়ার্থ কড়ি দিতে নাঞি করি দেরী
সেই বাটপাড় নগরের।
হিসাবি খাজনা লেয় ফারখতি লিখিয়া দেয়
চরণে বিদায় মাগি তোর॥

* * *

প্রজাগণ যত বলে শুনি বীর কোপানলে
ভাঁড়ুরে আনাইল দিয়া লোক।
অভয়া করিয়া ধ্যান কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ গান
সেবকে চণ্ডিকা দিবে সুখ॥

অকিঞ্চনের চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সদাগরের কাহিনীটিও সুরচিত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত মগরা নদীতে ঝড়বৃষ্টির বর্ণনাটির মধ্যে কবির বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইবে,—

দেখি মগরার পানী বলে সাধুশিরোমণি
উপায় চিন্তহ কর্ণধার।
বুঝি বড় অমঙ্গল রাখ ডিঙ্গা যথাস্থল
বিষম সঙ্কটে কর পার॥
আসিতে মগরা নদে কোন দেবতার বাদে
ঝড় বৃষ্টি হৈল উপস্থিত।
তাল সম পড়ে শিলা বিদরে নৌকার খিলা
পবনে প্রবল হৈল শীত॥
অঙ্গে জল পড়ে বেগে দশনে দশন লাগে
শীতে অঙ্গ হৈল কম্পমান।

বারিদ বরিখে বারি ত্রিভাগ ডুবিল তরী
আজি মোর সংশয় পরাণ ॥
প্রলয় হইয়াছে বা ঘুরে মুকুরলা (?)
ঝলকে ঝলকে উঠে জল।
কাণ্ডারী হৈল ভাঁড় বাহিতে না পারে দাঁড়
বুঝি ডিঙ্গা যায় রসাতল ॥
দেখে বুহিত্রের পাশে মকর কুম্ভীর ভাসে
ভয়ঙ্কর বিস্তার বদন।
দুকূলে পড়িছে হানা রাশি রাশি ভাসে ফেনা
লহ লহ করে অহিগণ ॥
অবনী ডুবিয়া জলে বুঝি গেল রসাতলে
বিপাক পড়িল আমা লয়্যা।
উপরে পশিতে জল সতীপতি করে বল
কিরূপে নগরে যাব বায়্যা ॥
উদ্ধার করিতে বাপে বিমাতার অভিশাপে
ধনে প্রাণে মজিলাম আমি।
বলিও আমার মায় ছিরা মৈল মগরায়
যদি দেশে যাতে পার তুমি ॥
কর্ণধার বলে সাধু, পূজহ শঙ্করবধূ
বিপদখণ্ডনী মহামায়া।
ভকতবৎসলা চণ্ডী রাখিব দুর্জন দণ্ডি
দিয়া পদপঙ্কজের ছায়া ॥

* * *

কাণ্ডারের কথা শুনি চিন্তে সর্বস্বরূপিণী
পূজে সাধু চণ্ডীর চরণ।
দুর্গম মগরা মাঝে রক্ষ চণ্ডী পদরজে
বিরচিলা দ্বিজ অকিঞ্চন ॥

করুণ রসের বর্ণনায় অকিঞ্চনের যথার্থ দক্ষতা ছিল; এই বিষয়ে তিনি যে কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্যের বাঁধা পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা নহে—ইহার

মধ্যে তিনি কতকটা মানবিকতার স্পর্শও দান করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শ্রীমন্তের সঙ্গে বিবাহান্তে সিংহলরাজ-দুহিতা সুশীলার পতি-গৃহযাত্রার চিত্রটি বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে,—

কন্যার গমনে রাণী করে হায় হায়।
ধৈরজ না ধরে ধরে ধনপতির পায়॥
বৈবাহিক হৈলে তুমি বিধির ঘটনা।
পাইলে পাষণ্ড হৈতে প্রচুর যন্ত্রণা॥
যত কাল জীব প্রাণে যাবে নাঞি খেদ।
কৃষ্ণচন্দ্র করিলেন কন্যার বিচ্ছেদ॥
রাখিল ঝিয়ের খোঁটা রাজা দুরাচার।
মোর কন্যা ইবে হৈল তনয়া তোমার॥
কন্যাভাব করিবে কহিবে নাঞি কিছু।
মোর ঝিয়ে আগে ডাক্য নিজ ঝিয়ে পাছু॥
রাণীর রোদনে কাঁদে ধনপতি সাধু।
আমার চক্ষের তারা ওই পুত্রবধূ॥
দৈবে দুঃখ দিল মোরে কি করিবে তুমি।
দেখিয়া শ্রীমন্তে সর্ব বিসরিনু আমি॥
শ্রীমন্তে সঁপেন কন্যা রাণী প্রিয় বোলে।
মোর বাঞ্ছা ছিল তুমি থাকিবে সিংহলে॥
প্রাণের অধিকা কন্যা তুমি লয়্যা যায়।
যতনে পালিবে ঝিয়ে মোর মাথা খায়॥
দশ দোষ ক্ষমা দিবে দোষ না লইবে।
হেরিয়া বদনচাঁদে হাসিয়া ডাকিবে॥
মা বাপে দেখিতে আছে বাসনা সভার।
আমার মাথার কিরা আস্য একবার॥
দশ দিন দেখা দিয়া দেশে পুন যাবে।
শাশুড়ীর অন্ন খাইলে পরমাই বাড়িবে॥
সে দেশের রাজা যদি ধনে করে বল।
তুরিত গমনে আস্য তোমার সিংহল॥

খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের সকল বিষয়েই যে রুচিদুষ্টির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, অকিঞ্চনের কাব্যখানি তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। অকিঞ্চনের রুচিবোধ উন্নত ছিল; পরিচ্ছন্ন রচনার ভিতর দিয়া তাঁহার এই উন্নত রুচিবোধের বিকাশ হইয়াছে। খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমগ্রভাবেই যে বাংলা সাহিত্য নৈতিক দুর্গতির চরম সীমায় গিয়া পৌছিয়াছিল, তাহা অকিঞ্চনের কাব্য পাঠ করিয়া কিছুতেই মনে হইতে পারে না। অচলা দেব-ভক্তি লইয়াই তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের মত দেবদেবীকে লইয়া অহেতুক কৌতুক করেন নাই।

বিষয়-বিন্যাসে মুকুন্দরামের প্রভাব অকিঞ্চনের উপর অনস্বীকার্য হইলেও ভাষার দিক্ দিয়া তাঁহার উপর তাঁহার স্বদেশবাসী একজন কবির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। পূর্বে তাঁহার কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি, তিনি শিবমঙ্গল বা শিবায়নের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য। পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যে ভাব-যুগের পর শব্দযুগেরই আবির্ভাব হইয়া থাকে; ভারতচন্দ্র শব্দযুগেরই কবি এবং শব্দশিল্পী হিসাবেই তাঁহার কৃতিত্ব। রামেশ্বর বিচিত্র ধ্বনিসংযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহার কাব্যদেহে এক সুলভ অলঙ্কার পরিধান করাইয়াছিলেন, যেমন,—

ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বাণ।
চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডী পানে চান॥
পদ্মাবতী পার্বতীকে প্রবোধিয়া আনে।
প্রাণনাথে প্রকারে ভেটিব সেইখানে॥ ইত্যাদি।

অকিঞ্চন রামেশ্বরের নিকট হইতে এই সহজ অনুপ্রাস ব্যবহারের কৃত্রিম রীতিটির অন্ধ অনুকরণ করিয়াছিলেন; যেমন,—

পুলোমজা পুরন্দরে প্রবোধিয়া দুর্গা।
অবিলম্বে অবনী আইলা অপবর্গা॥
বিশ্বমাতা বীরবরে বলেন মধুর।
কান্তা সহ কালকেতু চল স্বর্গপুর॥
বিমানে বসিল বীর বনিতা লইয়া।
যায় যমালয় পথে জয় জয় দিয়া॥
দুর্গা বল্যা দুর্গাদূত দুন্দুভি বাজান।
সদনে শমন শব্দ শুনিবারে পান॥ ইত্যাদি।

ইহা রামেশ্বর ও অকিঞ্চনেরই যে কেবল বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা নহে ; ইহা যুগেরই বৈশিষ্ট্য ছিল। এই শব্দবিন্যাসের কৃতিত্বের উপরই ভারতচন্দ্রেরও প্রতিভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ; তবে ভারতচন্দ্রের এই বিষয়ে যে শিল্পবোধ ছিল, ইঁহাদের তাহা ছিল না ; ইঁহারা শব্দ দ্বারা কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র, ভারতচন্দ্রের মত কলগুঞ্জন সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।

অকিঞ্চন একখানি 'শীতলা-মঙ্গল'ও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'শীতলা-মঙ্গল' শীতলা পূজা উপলক্ষে ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও গীত হইয়া থাকে। ইহার একখানি পুঁথি কবির বংশধরদিগের গৃহে রক্ষিত আছে, তাহাতে কবি বর্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র তেজশ্চন্দ্রের কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, 'শীতলা-মঙ্গল'খানিই অকিঞ্চনের প্রথম রচনা, ইহার পর তিনি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ও গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াও অকিঞ্চন 'গঙ্গামঙ্গল' শ্রেণীর একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রচনার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া মনে হয়, ইহা তাঁহার সর্বশেষ রচনা।

এখন পর্যন্ত যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অকিঞ্চনই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশেষ কবি। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের ধারাটিকে তিনি খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ সীমা পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। এই সময় হইতেই নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার সংস্কৃতি এক নূতন রূপ লাভ করিতে আরম্ভ করে ; চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মৌলিক ধারাটি ইহার সম্মুখীন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়—ইহার ক্ষেত্রে নাগরিক রস ও রুচির অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিনিধি ভারতচন্দ্র একাধিপত্য স্থাপন করেন।

জনার্দন

বঙ্গদেশের, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের, বহুস্থান হইতে জনার্দনের চণ্ডী নামক ব্রতকথার ন্যায় একখানি ক্ষুদ্র কাব্য পাওয়া গিয়াছে। এই জনার্দনের কোন পরিচয় কিংবা তাঁহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার পুঁথির বহুল প্রচার দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, তিনি আধুনিক কবি নহেন।[১]

[১] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায় ইঁহার অনেকগুলি খণ্ডিত ও সম্পূর্ণ পুঁথি সংগৃহীত।

স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার একখানা পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা 'প্রায় ২৫০ শত বৎসরের প্রাচীন' বলিয়া তিনি অনুমান করেন।[১]

জনার্দনের চণ্ডীরও দুইটি অংশ; প্রথম অংশে কালকেতু ব্যাধের কাহিনী, দ্বিতীয় অংশে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। উভয় কাহিনীই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কাহিনীর এই সংক্ষিপ্ততা হইতেই ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও কেহ কেহ নিঃসন্দিগ্ধ হইতে চাহেন।[২] তাঁহাদের বিশ্বাস, এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিই ক্রমে মাধব, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবির হাতে পড়িয়া মঙ্গলকাব্যের রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা খুব নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। কারণ, দেখা যাইতেছে যে, মাধব, মুকুন্দরাম প্রভৃতির প্রচারের পরও এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি শুধু যে আত্মরক্ষা করিয়াই টিকিয়া ছিল, তাহা নহে—ইহার প্রচার কিছুমাত্রও হ্রাস পায় নাই। জনার্দনের চণ্ডীর মত ব্রতকথার আকারের ক্ষুদ্র রচনা প্রাচীন কালে কত যে রচিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং এখনও বটতলার কল্যাণে ইহাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অতএব মনে হয়, পাঁচালীর উদ্ভব প্রাচীনতর হইলেও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ইহাদের সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ ঘটে নাই। ইহারা ইহাদের পথে নিজেদের কার্য সাধন করিয়াছে। মঙ্গলগান উচ্চতর সমাজে উৎসবে অনুষ্ঠানে আড়ম্বরের সহিত গীত হইত, পাঁচালী সাধারণ গৃহস্থের নিত্য পূজায় পঠিত হইত, উভয়ের ক্ষেত্র এক নহে এবং একে অন্যের স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারে নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, মঙ্গলকাব্যের আকার বিরাট হইবার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনই ব্রতকথার আকারের ক্ষুদ্র পাঁচালীরও প্রয়োজন রহিয়াছে। পদ্মাপুরাণ কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সমাজে (বিশেষতঃ স্ত্রীসমাজে) স্বতন্ত্র মনসার ব্রতকথার প্রচলনও এই কারণেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কাহিনীর সংক্ষিপ্ততা হইতেই জনার্দনকে মাধব-মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী বলিবার উপায় নাই। তবে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, জনার্দনের পাঁচালীর কাহিনীর মত সংক্ষিপ্ত কোন কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল, —তবে তাহা জনার্দনেরই রচিত কাহিনী অবলম্বনে কিনা বলা যায় না।

জনার্দনের চণ্ডীর রচনা-কাল জানা না গেলেও, তাঁহার ভাষা যে আধুনিক তাহা স্বীকার করিতে হয়। এমন কি ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে-পুঁথিখানিকে ২৫০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করেন, ইহার ভাষা দেখিয়া

[১] দীনেশচন্দ্র সেন, ১৮৪; [২] ঐ।

ইহাকে এত প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। তবে নিতান্ত অল্প কালের মধ্যে একখানি সাধারণ ব্রতকথা বা পাঁচালীর পুঁথির এমন বিস্তৃত প্রচার হওয়াও সম্ভব নহে। অবশ্য ভাষা কালক্রমে আধুনিকতা প্রাপ্ত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। এই সব নানা কারণে জনার্দনকে ২৫০।৩০০ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া নির্দেশ করিতে আপত্তি থাকিতে পারে না। জনার্দনের রচনা সরল, কাহিনীর স্বচ্ছন্দ বর্ণনা থাকিলেও তাহা কবিত্ব-বর্জিত। মৃগয়া হইতে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন কালে কবি কালকেতুর এই বর্ণনা দিয়াছেন,—

মৃগয়া না পাইয়া ব্যাধ হইল চিন্তিত।
স্বর্ণ গোধিকা পথে দেখে আচম্বিত॥
স্ববর্ণ গোধিকা পাইয়া হরষিত মনে।
ধনুর অগ্রে তুলি লইল তখনে॥
মনে মনে ভাবে ব্যাধ ধীরে ধীরে হাঁটে।
সত্বর গমনে গেল বাড়ীর নিকটে॥

বিবিধ কাব্য

খৃস্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডী-আখ্যানের অসংখ্য অনুবাদ কাব্য রচিত হয়; ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতেই সমাজে পৌরাণিক আদর্শ সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে; তাহার ফলে লৌকিক চণ্ডীর আখ্যান ক্রমে লোকপ্রিয়তা হইতে বঞ্চিত হইতে থাকে। এইজন্য এই সময়ে লৌকিক চণ্ডীর আখ্যান লইয়া কাব্য রচনাও হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। লৌকিক চণ্ডীর মৌলিক আখ্যানের মধ্যে বাংলার জাতীয় চরিত্রের বিকাশ এতদিন দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল, কিন্তু পৌরাণিক চণ্ডীর আখ্যায়িকা রচনার অনুবাদ দ্বারা সেই পথ রুদ্ধ হয়, তাহার ফলে বাঙ্গালীর কবিত্বের মৌলিক প্রতিভা বিকাশের আর সুযোগ পাওয়া যায় না।

মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডী-আখ্যায়িকার অনুবাদ-কাব্যগুলি 'কালিকা-পুরাণ,' 'দেবী-মাহাত্ম্য' বা 'দেবীমঙ্গল', 'চণ্ডিকা-বিজয়', 'চণ্ডী-বিজয়', 'গৌরী-মঙ্গল', 'ভবানী-মঙ্গল', 'দুর্গাপুরাণ', 'দুর্গাবিজয়', 'দুর্গালীলা', 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী', 'দুর্গা-মঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'অভয়ামঙ্গল' প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই শ্রেণীর একখানি কাব্যের মধ্যে মাত্র অতি সংক্ষেপে কালকেতুর কাহিনীটি পাওয়া যায়। তাহা শিবচরণ সেনের 'গৌরীমঙ্গল'।[১] এই সকল অনুবাদ-কাব্যের মধ্যে দাস হরিদত্তের

[১] বিশ্বকোষ ১৮, ৬১-৬২

ভণিতাযুক্ত 'কালিকা-পুরাণ'খানি[১] সপ্তদশ শতাব্দীরও পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয়। নারায়ণ দেবের ভণিতাযুক্ত 'কালিকা-পুরাণে'র একটি খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[২] ইহা যদি পদ্মাপুরাণের কবি নারায়ণ দেবের রচনা হইয়া থাকে, তবে ইহাও সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী রচনা। এই দুইখানি সন্দেহজনক পুঁথি ব্যতীত আর এই শ্রেণীর যত পুঁথিই আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সমস্তই সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা।

এতদ্ব্যতীত বাংলা রামায়ণোক্ত শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের কাহিনী লইয়াও কয়েকখানি চণ্ডীমাহাত্ম্যসূচক কাহিনী বাংলায় রচিত হয়। তাহাও মঙ্গলকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত নহে বলিয়াই আমাদের বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত। শিবচন্দ্র সেন প্রণীত এই শ্রেণীর একখানি পুস্তকের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার নাম 'সারদা-মঙ্গল'।[৩] প্রকৃতপক্ষে ইহা লৌকিক রামায়ণেরই কাহিনী, কেবলমাত্র রামচন্দ্রের চণ্ডীপূজার উল্লেখ হইতেই ইহার এই নামকরণ করা হইয়াছে।

বাসুলী-মঙ্গল

মধ্যযুগের বাংলার মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত 'বাসুলী-মঙ্গল' নামক একখানি পুঁথির কেহ কেহ উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে এই পর্যন্ত কোনও পরিচয় কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। এই পুঁথিখানি কে কবে রচনা করিয়াছিলেন, ইহার বিষয়-বস্তুই বা কি ছিল, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান-কারীদিগের নিকট এই সকল বৃত্তান্ত একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি বর্ধমান জিলার চকদীঘি গ্রামের 'রাঢ় মিউজিয়মে' ইহার একখানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। পুঁথিখানির কোন বিবরণ আজ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।[৪] নানা কারণে ইহার বিষয় একটু বিস্তৃত ভাবে উল্লেখযোগ্য।

পুঁথিখানির রচয়িতার নাম মুকুন্দ; রচনার মধ্যে তিনি এই প্রকার ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন,—

মুকুন্দ ইতি ভারতী
পদ কমল সারথী
যাচয়তি বর পিনাকিনী।

---

[১] ঢা. কে. ১০৯, স-স ৩৬০২, [২] ব ৯০৬; [৩] সা-প-প ৫, ২০৩

[৪] বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার উপর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত শুভেন্দু সিংহ রায়ের সম্পাদনায় শীঘ্রই পুঁথিটি প্রকাশিত হইবার কথা শুনিতেছি।

অথবা

মুকুন্দ রচিল বাসুলী মঙ্গল

ত্রিপুরাচরণাম্বুজে।

মুকুন্দ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারণ, তিনি কোন কোন ভণিতায় নিজের নামের সঙ্গে দ্বিজ কথাটিও যুক্ত করিয়াছেন, যেমন,—

চণ্ডীপদ সরসিজে

সেবিয়া মুকুন্দ দ্বিজে

বিরচিল সরস মঙ্গল।

তাঁহার উপাধি ছিল কবিচন্দ্র; কারণ, কোন কোন ভণিতায় তিনি তাহা এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—

ত্রিপুরা পদারবিন্দ

মকরন্দচয় ভৃঙ্গ

কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ ভণে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দ নামক ব্রাহ্মণ কবির অভাব নাই। তিনি তাঁহাদেরই কেহ কি না, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, তিনি তাঁহাদের কেহ নহেন, তিনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বিষয়টি একটু বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দ নামক ব্রাহ্মণ কবিদিগের মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। বাসুলীমঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজ কবিচন্দ্র মুকুন্দ যে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, ইহা উভয়ের ব্যবহৃত ভণিতার তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বাসুলীমঙ্গল-রচয়িতা নিজেকে মুকুন্দ বলিয়া উল্লেখ করিলেও কোথাও মুকুন্দরাম বলেন নাই, কিংবা দ্বিজ বলিয়া বার বার উল্লেখ করিলেও চক্রবর্তী পদবীর ব্যবহার করেন নাই। তিনি কবিচন্দ্র উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু কবিকঙ্কণ ব্যবহার করেন নাই। অবশ্য মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল কবিচন্দ্র, কিন্তু বাসুলী-মঙ্গলের ভণিতায় কবিচন্দ্র স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তির নাম নহে, ইহা মুকুন্দের উপাধি। অতএব কবিচন্দ্র মুকুন্দ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম হইতে স্বতন্ত্র একজন কবি। কবিচন্দ্র মুকুন্দ তাঁহার কাব্যমধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়াছেন; তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার পিতামহের নাম দেবরাজ মিশ্র, পিতার নাম বিকর্তন মিশ্র, মাতার

নাম হারাবতী, সহোদর ভ্রাতার নাম গদাধর মিশ্র ও তিন পুত্রের নাম রমানাথ, চন্দ্রশেখর ও সনাতন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পরিচয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব মুকুন্দরামের নামে পরবর্তী কালে কেহ এই কাব্যখানা রচনা করিয়াছে, এমন ভুল করিবারও কোনও কারণ নাই।

মধ্যযুগে দ্বিজ মুকুন্দ নামক একজন কবি 'জগন্নাথ-বিজয়' বা 'জগন্নাথ-মঙ্গল' নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি মুকুন্দ ভারতী নামে পরিচিত। তাঁহার কোন পরিচয় উক্ত দ্বিজ কবিচন্দ্র মুকুন্দের পরিচয়ের অনুকূল নহে। অতএব ইঁহারাও যে পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিজ মুকুন্দ নামক আর একজন কবি 'অর্জুন-সংবাদ' বা 'বৈষ্ণবামৃত' নামক একখানি গীতার অনুবাদজাতীয় কাব্য রচনা করেন। তিনি নিজেকে মুকুন্দদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কবিচন্দ্র মুকুন্দ কোথাও নিজেকে মুকুন্দদাস বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ, একজন বৈষ্ণবজাতীয় কাব্য ও আর একজন শাক্ত কাব্য রচনা করিয়াছেন। অতএব ইঁহারাও উভয়ে পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাসুলীমঙ্গল-প্রণেতা কবিচন্দ্র মুকুন্দ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত পরিচয় ব্যতীত কবির আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

আলোচ্য পুঁথিখানি বর্ধমান জিলার মণ্ডলঘাট পরগণার আমুরিয়া গ্রামে অনুলিখিত হইয়াছিল বলিয়া পুঁথিখানিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। কবি এই অঞ্চলেরই অধিবাসী হইতে পারেন। বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্র রায়ের রাজত্বকালে ১৬৫৭ শকাব্দ বা ১১৪২ সাল পুঁথিখানির লিপিকাল বলিয়া উল্লেখিত আছে। ইহাতে ১৭৩৫ খৃস্টাব্দ পাওয়া যায়। ইহা কবির স্বহস্তলিখিত পুঁথি নহে; কারণ, ইহাতে লিপিকরের নাম পাওয়া যায় শ্রীকিশোরদাস মিত্র (মিশ্র ?)। অতএব কবি ইহার পূর্বেই বর্তমান ছিলেন, কিন্তু কত পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহা বলা সহজসাধ্য নহে। পুঁথিখানির রচনাকাল সম্পর্কে ইহাতে এই প্রকার উল্লেখ আছে,—

> শাকে রস রথ (রস ?) বেদ শশাঙ্ক গণিতে।
> বাসুলিমঙ্গল গীত হৈল সেই হতে॥

সকলেই অবগত আছেন যে, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকৃত চণ্ডীমঙ্গলের বঙ্গবাসী-সংস্করণে ইহার রচনাকাল-জ্ঞাপক এই দুইটি পদ দেখিতে পাওয়া যায়—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

কিন্তু ইহা তাঁহার আর কোন মুদ্রিত সংস্করণ কিংবা হস্তলিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গবাসী কর্তৃক ব্যবহৃত মুকুন্দরামের পুঁথির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অতএব এমন মনে করা যাইতে পারে কি যে, নামসামঞ্জস্যের জন্য বঙ্গবাসীর মুকুন্দরামকৃত চণ্ডীমঙ্গল-সম্পাদক কবিচন্দ্র মুকুন্দকৃত বাসুলী-মঙ্গল রচনার কালনির্ণায়ক পদ দুইটি মুকুন্দরামের পুঁথি সম্পর্কেই ব্যবহার করিয়াছেন? তাহা না হইলে উক্ত পদ দুইটি বঙ্গবাসী-প্রকাশিত মুকুন্দরামের পুঁথিতে কোথা হইতে আসিল? এই পদ দুইটি যে মুকুন্দরামের পুঁথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এই বিষয়ে ত আর এখন কাহারও সংশয় নাই! যদি এই পদ দুইটি কবিচন্দ্র মুকুন্দের বাসুলী-মঙ্গল হইতেই আসিয়া থাকে, তবে দেখা যাইতেছে যে, বাসুলী-মঙ্গলের রচনাকাল ১৪৯৯ শকাব্দ বা ১৫৭৭ খৃস্টাব্দ। তাহা হইলে কবিচন্দ্র মুকুন্দ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম হইতে পূর্ববর্তী কবি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যাইতে পারে না। ইহার দুইটি কারণ; প্রথমতঃ, কবিচন্দ্র মুকুন্দের ভাষায় প্রাচীনত্বের কোনও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, মুকুন্দরাম তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই, বরং মাণিক দত্তকে 'সঙ্গীত আদ্য কবি' বলিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। তবে ইহার উত্তরেও বলা যাইতে পারে যে, সম্ভবতঃ কবিচন্দ্রের পুঁথি পরবর্তী কালে লিপিকর কর্তৃক আধুনিকতায় পরিবর্তিত হইয়াছে এবং মুকুন্দরামের বিষয়বস্তু কতকটা স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া কিংবা তিনি স্বতন্ত্র অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া কবিচন্দ্রের বিষয় ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার কাব্যে কিছু উল্লেখ করেন নাই, অথবা তাঁহার বিষয় তিনি কিছুই অবগত ছিলেন না। কিন্তু কবিচন্দ্র মুকুন্দের বাসুলী-মঙ্গল কাব্যের আর কোন পুঁথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এই সকল বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। কবিচন্দ্র মুকুন্দরচিত বাসুলী-মঙ্গলের বিষয়বস্তু কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম-রচিত অভয়া-মঙ্গলের বিষয়বস্তু হইতে কতকটা স্বতন্ত্র। বাসুলী-মঙ্গলের কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ:

দক্ষের কন্যা সতী হিমালয়ের গৃহে মেনকার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে যথারীতি ভিখারী শিবের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। শূলপাণি মদনমোহন রূপ ধারণ করিয়া বিবাহ-সভায় উপস্থিত

হইলেন, তাঁহার রূপ দেখিয়া সমবেত এয়োগণ নিজেদের পতিদিগের নিন্দা করিতে লাগিল। মেনকা প্রসন্নচিত্তে জামাতাকে বরণ করিয়া লইলেন। বিবাহের পর শিব পার্বতীকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসে ফিরিয়া আসিলেন। যথাসময়ে তাঁহাদের দুই পুত্র হইল। সংসারে অসচ্ছলতা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। গৌরীর তাড়নায় শিব ভিক্ষায় বাহির হইলেন। কিন্তু ইহাতেও দুঃখ দূর হয় না। চণ্ডী মর্ত্যে নিজের পূজা প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন। এদিকে রাজা সুরথ রাজ্যপাট হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মেধস মুনির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈশ্য সমাধিও ধনপুত্রহীন হইয়া ইতিপূর্বেই সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মেধস মুনি তাঁহাদের অবস্থার বিপর্যয় দেখিয়া তাঁহাদিগকে দেবী মহামায়ার শরণ লইতে বলিলেন। মেধস আখ্যানচ্ছলে মধু-কৈটভ, শুম্ভ-নিশুম্ভ ও মহিষাসুরের বিষয় বিবৃত করিলেন। এই অসুরগণ অমিতবিক্রমশালী হইয়া দেবগণের উপর উৎপীড়ন করিলে দেবী মহামায়া কি ভাবে তাহাদিগকে বিনাশ করেন, মেধস সেই বৃত্তান্ত তাহাদিগকে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। এই দেবীই বিশাল-লোচনী বা বিশালাক্ষী নামে পরিচিত হইয়াছেন। সাধু ধুসদত্ত 'লক্ষ ঘর দ্বীপে' বাস করেন। তিনি সতত শিবকেই পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট হইতে বিশাললোচনীর পূজা পাইবার ইচ্ছা হইল। নিয়তির বিধানে ইন্দ্রের সভায় এক নটী নৃত্যে তালভঙ্গ করাতে দেবতার অভিশাপে নারায়ণ দত্ত বণিকের স্ত্রী কনকাবতীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে—তাহার নাম হয় রুক্মিণী। রুক্মিণীর সহিত ধুসদত্তের বিবাহ হইল। বিবাহের পর ধুসদত্তের উপর দেবী বিশাললোচনীর পূজার জন্য প্রত্যাদেশ হইল—তখন তিনি বাণিজ্যের জন্য বিদেশযাত্রা করিয়াছেন। ধুসদত্তের অবর্তমানে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী সত্যবতী সতীন রুক্মিণীর সহিত অসদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলে, রুক্মিণী, দেবীর অনুগ্রহে, সতীনের নির্যাতন হইতে রক্ষা পান। তৎপরে ধুসদত্ত গৃহে আসেন ও স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলে রুক্মিণী গর্ভবতী হন। ধুসদত্ত পুনরায় বাণিজ্যে যাত্রা করেন। এই সময়ে গ্রহের ফেরে বাণিজ্যতরী বিপদে পড়ে। সেখানে তিনি 'মায়াদহের পুলিনে' দেবীর দর্শন পান। এই কথা তিনি বর্ধমানের অধীশ্বর সুরথের নিকট বিবৃত করেন। কিন্তু ইহা সুরথের নিকট মিথ্যা বোধ হওয়ায়, ধুসদত্ত বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ক্রমে দিন যায়—ধুসদত্ত অনেক দিন গৃহে অনুপস্থিত। এদিকে তাঁহার স্ত্রী রুক্মিণীর গুণদত্ত নামে এক পুত্র জন্মে। গুণদত্ত

বড় হইয়া পিতাকে গৃহে না দেখিয়া ডিঙ্গা লইয়া 'পাটনে' পিতার অনুসন্ধানে বাহির হন। পথে মায়াদহে গুণদত্ত ভগবতীর দর্শন পান। দেবী-পূজা করিলে পিতার সন্ধান পাইবে, ইহা মানত করিয়া গুণদত্ত বর্ধমানে রাজা সুরথের রাজ্যে যান। ক্রমে মায়াদহে গুণদত্ত যে মহামায়ার দর্শন পাইয়াছেন, তাহা তিনি বিবৃত করেন; কিন্তু যথাস্থানে এই মহামায়ার সন্ধান রাজাকে দিতে না পারার জন্য, গুণদত্তকে মশানে লইয়া কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দেওয়া হয়। তখন গুণদত্ত দেবী বাসুলীর আরাধনা করিলে দেবী আবির্ভূতা হইয়া গুণদত্তকে রক্ষা করেন। দেবীর ইচ্ছায় রাজা কন্যা বিদ্যা এবং অর্ধ রাজ্য ও বিবিধ যৌতুক সহ গুণদত্তকে জামাতৃ পদে বরণ করেন। জামাতার অনুরোধে ধুসদত্ত প্রভৃতি বন্দীদিগের মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়। এইখানে তিনি পিতার সহিত মিলিত হন। ইহার পর গুণদত্ত পিতা ধুসদত্ত ও পত্নী বিদ্যা সহ দেশে প্রত্যাবর্তনকালে পথে মায়াদহে দেবীর অর্চনা করেন। বাটীতে ফিরিয়া সাধু ধুসদত্ত সপরিবারে দেবী বাসুলীর পূজা করেন। ইহার পর দেশে বাসুলী দেবীর পূজার প্রচার হয়।

কবিচন্দ্র মুকুন্দের রচনা দ্বাদশ পালায় বিভক্ত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পুঁথি ষোল পালায় বিভক্ত। কবিচন্দ্র মুকুন্দের পুঁথিতে সাতটি পালায় মূল মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অবলম্বনে অষ্ট মন্বন্তরকথা, সুরথ রাজার উপাখ্যান, মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ, শুম্ভনিশুম্ভ বধ প্রভৃতি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট পাঁচটি পালায় বর্ধমানের ধুসদত্ত সদাগরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। দেবী বিশালাক্ষী বা বাসুলীর পূজা প্রত্যাখ্যান করায় সদাগর ধুসদত্ত বাণিজ্য উপলক্ষে পাটনে গিয়া দ্বাদশ বৎসর বন্দী থাকিবার পর পুত্র গুণদত্ত কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হন। অতএব চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগরের কাহিনীর সঙ্গে ইহার কাহিনীগত বিশেষ অনৈক্য নাই। তবে কালকেতুর কাহিনীটি ইহাতে নাই।

ধুসদত্তের কাহিনী কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের সমসাময়িক কালে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, মুকুন্দরাম তাঁহার 'অভয়া-মঙ্গল' বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

বর্ধমানে ধুসদত্ত যার বংশে সোমদত্ত
মহাকুল বেণ্যার প্রধান।
বাসুলীর প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বাদশ বৎসর বন্দী
বিশালাক্ষী কৈল অপমান॥

মুকুন্দরাম ধনপতি সদাগরকে ধুসদত্তের মামাত ভাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খুল্লনার পরীক্ষা-গ্রহণকালে ধুসদত্ত আসিয়া তাহাকে 'জোঘর' বা জতুগৃহ করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন,—

তুমি মামাইত ভাই অবশ্য কল্যাণ চাই
কহিতে মানহ পাছে রোষ।
তোমারে কহিলুঁ সাধু জোঘর করুক বধূ
তবে সভে করিব নির্দোষ॥

মুকুন্দরামের পরবর্তী কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দও ধুসদত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—

বর্ধমান হৈতে আল্য ধুসদত্ত বাণ্যা।

অতএব কবিচন্দ্র মুকুন্দ যদি মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবিও হন, তাহা হইলেও তাঁহার পক্ষে ধুসদত্ত বণিকের কাহিনী বর্ণনা করা কিছুই অসম্ভব ছিল না।

কবিচন্দ্র মুকুন্দের ভাষা সম্পূর্ণ গ্রাম্যতামুক্ত। তাঁহার উপর সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই জন্য ভাষা হইতে তাঁহার কাল-বিচার করা সম্ভব নহে। নিম্নে তাঁহার রচনার যে সকল আদর্শ উল্লেখ করা যাইতেছে, তাহা হইতেই তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইবে। শিবের বর্ণনায় তিনি লিখিতেছেন,—

শিরোপরি গঙ্গ গৌরী আধ অঙ্গ
ত্রিশূল দিণ্ডিম ভুজে।
পেখি দিগম্বর মহিলা মণ্ডল
বদন লুকাঅহি লাজে॥

বরবেশী শিবের বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

জামাতা লাঙ্গট দেখিয়া বিকট
সর্বহু ভাবহুঁ দুঃখ।

শিবস্তোত্রে লিখিয়াছেন,—

একানেকা লঘুগুরু ব্যক্তাব্যক্ত তনু।
ধেয়ানে না জানে ব্রহ্মা নারায়ণ স্থাণু॥
শ্রবণ পবন নিজ শ্রমজলহরা।
মধুগন্ধ লোভে মন্দ চপল ভ্রমরা॥

কুমতিদহনদক্ষ ভবভয়হারী।
নিয়ত দুরিত দুঃখ জগদুপকারী॥
নব শশী শিরে শোভে শরীর সুছান্দ।
মৃদঙ্গ বাদল পর পুনমিক চান্দ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দমধুলুব্ধমতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥

বাসুলী-মঙ্গলের কাহিনী চণ্ডীমঙ্গল শ্রেণীর কাহিনীর অন্তর্গত; বাসুলীই কালক্রমে চণ্ডীতে পরিণতি লাভ করিয়াছেন; এই দিক্ দিয়াও বাসুলী-মঙ্গল কাব্যখানি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল হইতে প্রাচীনতর হওয়া সম্ভব। তবে, পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার আরও দুই একখানি পুঁথির সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত ইহার রচনাকাল সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোন ধারণা করিতে পারা যাইবে না।

গোসানী-মঙ্গল

প্রধানতঃ খৃস্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি স্থানীয় লৌকিক দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াও কয়েকখানি মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে বিষয়গত বৈচিত্র্য থাকিলেও রচনার কোনই মৌলিকতা ছিল না। এই শ্রেণীর একখানি মঙ্গলকাব্যের নাম 'গোসানী-মঙ্গল'।[১] কুচবিহার জিলার মহকুমা সহর দিনহাটা হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে গোসানীমারী গ্রাম, তাহাতে গোসানী দেবীর এক প্রাচীন মন্দির আছে। খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই মন্দির নির্মিত হয় বলিয়া জানিতে পারা যায়। কিন্তু গোসানী দেবী তাহারও পূর্ববর্তী কাল হইতে সেই গ্রামে পূজিত হইতেছেন। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে লৌকিক ও গ্রাম্য দেবদেবীর যে বিশেষত্ব, এখানেও গোসানী দেবীর সেই বিশেষত্ব রক্ষা পাইয়াছে। দেবীর কোনও মূর্তি নাই; রূপার কৌটায় আবদ্ধ একটি কবচ গোসানী দেবী বলিয়া কল্পিত হয়। এই দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া গোসানীমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে। রচনা-কালের দিক হইতে ইহা নিতান্ত আধুনিক—কুচবিহারের মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইহা রচিত হয়। রচয়িতার নাম রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী। কাব্যখানি আকারে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র। মঙ্গলকাব্য

---

১ অমূল্যরতন গুপ্ত, 'একখানি অপরিচিত মঙ্গলকাব্য', দেশ, ১৩৫৬ সাল, পৃ. ৩২০-২৩, ইহার পুঁথি ১৩০৬ সালে ব্রজচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

রচনার সাধারণ রীতি অনুসরণ করিয়া কবি রাধাকৃষ্ণ তাঁহার কাব্যরচনার মূলে দেবতার আদেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,

হরেন্দ্র নারায়ণ রাজা বেহারে পালেন প্রজা
যাঁর যশ ঘোষে সর্বজন।
সেই রাজ্যে করে ঘর শুধু সে করুণাকর
পরম বৈষ্ণব গুণধাম॥
তাহার তনয় এক পাইয়া চৈতন্য ভেক
চিন্তে হরিচরণ-কমল।
তাহে আদেশিলা দেবী কহে রাধাকৃষ্ণ কবি
সুমধুর গোসানী-মঙ্গল॥

গোসানী-মঙ্গলের কাহিনীটি এইরূপ ঃ

"কুচবিহারে জামবাড়ি নামক গ্রামে ভক্তীশ্বর নামে এক শিবভক্ত ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল অঙ্গনা; এক রাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে স্বপ্ন দেখিলেন যে, চণ্ডীদেবী তাঁহাদিগকে পূজা দিতে বলিতেছেন এবং অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তাঁহাদের একটি পুত্র জন্মিবে ও সেই পুত্র 'রাজ্যের ঈশ্বর' হইবে। তাঁহারা পরদিন মহাসমারোহে চণ্ডীপূজা করিলেন ও পুত্রবর লাভ করিলেন। যথাসময়ে অঙ্গনার একটি অতি রূপবান্ পুত্র জন্মিল; তাহার নাম রাখা হইল কান্তেশ্বর। এই কান্তেশ্বর শাপভ্রষ্ট দেবভৃত্য; ইনি ছিলেন চণ্ডীদেবীর দ্বারী কান্তনাথ; ইহাকে মর্ত্যে পাঠাইয়া চণ্ডী বা গোসানী দেবীর পূজা প্রচার হইবে।"

সুতরাং 'গোসানী-মঙ্গল' কাব্যে দেখিতেছি, চণ্ডীদেবী স্বীয় কন্যা পদ্মাকে ডাকিয়া কহিতেছেন—

শুন শুন পদ্মা মা কুমারী বিষহরি।
কান্তনাথ রাজা হবে গ্রাম জামবাড়ি॥
কোচ রাজ্য মধ্যে কান্তা সুপবিত্র স্থান।
আমিও তথায় গিয়া হব অধিষ্ঠান॥
কান্তনাথ হতে হবে পূজার প্রচার।
মনে মনে এই যুক্তি করিয়াছি সার॥
চন্দ্রনাথ কামাখ্যাদি যত পীঠস্থান।
তাহার সমান ইহা কভু নহে আন॥

কান্তনাথ প্রিয় ভক্ত মম দ্বারী ছিল।
শাপেতে হইয়া ভ্রষ্ট ভূমিতলে গেল ॥
কিছুকাল রাজ্য ভোগি আসিবে কৈলাস।
এই ত বৃত্তান্ত তার জানিবে নির্যাস ॥

অতি রূপবান্ পুত্রের জন্মে মাতাপিতা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। যথাকালে পুত্রের জাতকর্মাদি করান হইল এবং পাঁচ বৎসর বয়সে তাহার বিদ্যারম্ভ হইল। বালক অল্পকাল মধ্যেই বাঙলা, সংস্কৃত প্রভৃতি শিখিয়া ফেলিল এবং কাব্য-ব্যাকরণাদিতে পাণ্ডিত্য অর্জন করিল। কিন্তু সংসারে শীঘ্রই দারুণ দুর্বিপাক দেখা দিল; মাত্র তিন দিনের অসুখে ভক্তীশ্বর দেহত্যাগ করিলেন; বালক পুত্র লইয়া বিধবা মাতা অকূলে পড়িলেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ কান্তেশ্বরকে গোরুর রাখালরূপে নিযুক্ত করিলেন এবং বিনিময়ে মাতাপুত্রের ভরণ-পোষণের ভার লইলেন। কান্তেশ্বর ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিয়া দিবসে বনে গোরু চরাইত এবং রাত্রে মাতার নিকট ফিরিয়া আসিত। গোরু চরাইতে চরাইতে ক্লান্ত কান্তেশ্বর প্রত্যহই এক বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইত এবং যখন তাহার মুখে আসিয়া রৌদ্র পড়িত, দুইটি বিষধর সর্প ফণা তুলিয়া তাহার মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখিত; এই সর্প দুইটি চণ্ডীর আদেশে পদ্মাদেবী কর্তৃক প্রেরিত হইত। এদিকে কান্তেশ্বরের নিদ্রাকালে গোরুগুলি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কৃষকদের শস্যের ক্ষতি করিত; তাহারা আসিয়া ব্রাহ্মণের নিকট নালিশ করিলে ব্রাহ্মণ কান্তেশ্বরকে শাস্তি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদিন তিনি যষ্টি হস্তে কান্তেশ্বরের অনুসন্ধানে যাইয়া দেখেন, কান্তেশ্বর বৃক্ষতলে নিদ্রিত এবং এক বিষধর সর্প ফণা দ্বারা তাহার মস্তক আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে; ব্রাহ্মণ আরও লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, কান্তেশ্বরের হস্তে ও পদে রাজলক্ষণ চক্র-চিহ্ন বর্তমান; কান্তেশ্বর নিদ্রোত্থিত হইবামাত্র সর্প পলায়ন করিল। ব্রাহ্মণ নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন যে, কান্তেশ্বর ভবিষ্যতে রাজা হইবেন; তিনি তাঁহাকে গো-চারণ কর্ম হইতে অবসর দিয়া তাঁহার ও তাঁহার মাতার ভরণ-পোষণের ভার লইলেন এবং কান্তেশ্বরকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, রাজা হইলে কান্তেশ্বর তাঁহাকে রাজগুরু করিবেন। কবির ভাষায়—

এতেক শুনিয়া তবে বলে দ্বিজবর।
তুমি যদি কদাচিৎ হও দণ্ডধর ॥

মম স্থানে মন্ত্র তুমি করিবা গ্রহণ।
রাজগুরু বলি যেন ঘোষে সর্বজন ॥

ইহার কিছুকাল পরে কান্তেশ্বর শেষরাত্রে এক স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নে চণ্ডীদেবী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন যে, তিনি অবশ্যই রাজা হইবেন। চণ্ডীদেবী তাঁহাকে প্রাতঃকালে কাজিলীকুড়া নামক নিকটবর্তী জলাশয়ে স্নান করিতে আদেশ দিলেন। স্নানান্তে তিনি জলাশয় হইতে 'ভয়ঙ্কর তিন মূর্তি' উঠিতে দেখিবেন; স্বয়ং দেবীই পর পর মকর, কুম্ভীর ও সর্পরূপ ধারণ করিয়া কান্তেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন; কান্তেশ্বর যদি কোনরূপ ভয় না করিয়া মকর মূর্তিকে ধরিয়া ফেলেন, তাহা হইলে কান্তেশ্বরের বংশ চিরকাল রাজ্যভোগ করিবে; মকর ধরিতে না পারিয়া যদি তিনি কুম্ভীর ধরেন, তাহা হইলে তাঁহার বংশ বৃদ্ধি হইবে; তাহাও না পারিয়া যদি তিনি সর্প স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তিনি নির্বংশ হইবেন। দেবীর আদেশ অনুসারে পরদিন সকালে কান্তেশ্বর কাজিলীকুড়ায় স্নান করিয়া পর পর দেবীর তিন মূর্তি দেখিতে পাইলেন; ভয়ে তিনি মকর ও কুম্ভীর স্পর্শ করিতে পারিলেন না; সর্প দেখিয়াও ভয় পাইলেন এবং সর্প যখন অন্তর্ধান করিতে উদ্যত, তখন তাহার লেজমাত্র স্পর্শ করিলেন। তখন—

হাসিয়া কহিলা দুর্গা সর্পরূপ ছাড়ি।
বংশ নাশ কৈলা কান্ত কেন ভ্রম করি ॥
মকর-কুম্ভীর ছাড়ি ধর সর্পবর।
এক পুরুষের তরে হবে দণ্ডধর ॥
মুখ বক্ষঃ না ধরিলা ধর লেজ শেষ।
অল্পকাল রাজ্য ভোগি দুঃখ পাবে শেষ ॥

তখন কান্তেশ্বর দেবীর অনেক স্তবস্তুতি করিলেন; দেবী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে, কান্তেশ্বরের রাজ্য এক পুরুষ মাত্র স্থায়ী হইলেও কান্তেশ্বর যদি রাজ্যে কোনরূপ অন্যায় বা অবিচার না করেন, তাহা হইলে সুখে-থাকিবেন। কিন্তু দেবীর বাক্য অন্যথা করিলে 'আপনার দোষে তুমি আপনি মজিবে।' চণ্ডীদেবী কৈলাসে ফিরিয়া বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করিলেন এবং বিশ্বকর্মা এক রাত্রির মধ্যে অপূর্ব কামতাপুর নগর নির্মাণ করিলেন। পরদিন প্রভাতে চণ্ডীর পূজা করিয়া কান্তেশ্বর রাজা হইলেন; তাঁহার নাম পূর্বে ছিল কান্তনাথ, এখন চণ্ডীর আদেশে নাম হইল কান্তেশ্বর (অর্থাৎ কামতা ঈশ্বর)। পূর্বপ্রভু ব্রাহ্মণ রাজগুরু হইলেন এবং

শুভলগ্নে নূতন রাজার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। রাজ্যের সমস্ত লোক রাজা পাইয়া আনন্দে মগ্ন হইল; চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া বিভিন্ন দেশ হইতে নানা জাতি আসিয়া কামতা রাজ্যে বাস করিতে লাগিল; বহু সৈন্যসামন্তে, অস্ত্রশস্ত্রে রাজ্য গমগম করিতে লাগিল। চণ্ডীর আদেশে শশিবর নামক এক ব্রাহ্মণ কান্তেশ্বরের মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। রাজা হইবার পাঁচ দিন পরে কান্তেশ্বরের মাতা অঞ্জনার মৃত্যু হইল এবং রাজা যথোচিত ক্ষত্রিয় আচারে মাতার অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলেন।

রাজা হইবার কিছুকাল পরে কান্তেশ্বর স্বনামে কান্তেশ্বরী মোহর প্রচলন করিলেন এবং স্বপ্নে চণ্ডীদেবীর আদেশ পাইয়া বিরল গ্রামের বিনন্দ নামক প্রজার পঞ্চকন্যা বিবাহ করিলেন। পাঁচ রাণীর মধ্যে জ্যেষ্ঠা সুশীলা হইলেন পাটরাণী, কিন্তু কনিষ্ঠা বনমালাই হইলেন রাজার সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্রী। একদিন রাজা মৃগয়া যাইবার আয়োজন করিলে গণকাচার্য রাজাকে নিষেধ করিলেন; তিনি আগে রাজাকে মৎস্য ধরিবার আয়োজন করিতে বলিলেন—মৎস্য ধরিয়া রাজা যেন শিকারে যান, নতুবা শিকার সফল হইবে না। রাজা জেলে আনিয়া কাজিলীকুড়ায় মৎস্য ধরিবার আদেশ দিলেন; রাজদূত কোথাও জেলে পাইল না; অবশেষে মধু জালী নামক এক দরিদ্র জেলেকে ধরিয়া আনিল; মধুর স্ত্রী সীতা স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে আসিল। মধু জালী কয়েক ক্ষেপ জাল ফেলিয়াও কোন মাছ ধরিতে পারিল না; রাজা বুঝিলেন, ইহা চণ্ডীমায়া; তিনি চণ্ডী স্মরণ করিয়া জালীকে পুনরায় জাল ফেলিতে বলিলেন; তখন এক প্রকাণ্ড শোল মাছ উঠিল। কাজিলীকুড়ার তীরে এক শিমুল বৃক্ষ ছিল; এক ভয়ঙ্কর চিল সেখান হইতে নামিয়া ছোঁ মারিয়া জালীর হাত চিরিয়া মৎস্য লইয়া গেল। কিন্তু চিল মৎস্য রাখিতে পারিল না; মৎস্য সীতার নিকটে মাটিতে পড়িয়া গেল; ইহা দেখিয়া সীতা হাসিয়া উঠিল। মধু জালী ভাবিল সীতা তাহাকে উপহাস করিল, কিন্তু তাহা নহে; রাজার আদেশে সীতা পূর্ব-ইতিহাস ও গোসানী-কবচের কাহিনী বিবৃত করিল। সীতা প্রথমেই বলিল যে, সে তাহার স্বামীকে উপহাস করে নাই, চিলকে দেখিয়াই হাসিয়াছিল; এই চিলের এক কাহিনী আছে। পূর্বে বেহারে (কুচবিহার অঞ্চলে) শ্রীবৎস রাজা ছিলেন; শ্রীবৎসের পর বহুকাল রাজ্য অরাজক ছিল; তৎপরে ভগদত্ত রাজা হইলেন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে ভগদত্ত কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; অর্জুন ভগদত্তের মস্তক ছেদন করেন। ভগদত্তের এক হাতে চণ্ডীর কবচ ছিল, অর্জুন

সকবচ সেই হাতও কাটিয়া ফেলেন ; এক চিল ছোঁ মারিয়া সেই হাত মাটি হইতে তুলিয়া লইয়া বেহারে আসে এবং এই শিমুল বৃক্ষের উপরে বসিয়া তাহার মাংস পেট ভরিয়া খাইয়া হাত মাটিতে ফেলিয়া দেয়, কালক্রমে সেই হাত মাটির মধ্যে তলাইয়া যায়। সেই বহু পূর্বের চিলই আজ মধু জালীর হাত হইতে শোল মৎস্য ছোঁ মারিয়া লইয়াছিল। সীতা চিলকে চিনিতে পারিয়াই হাস্য করিয়াছিল। সীতার কথার সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য রাজা শিমুল বৃক্ষের গোড়া খনন করাইলেন এবং এগার হাত তলায় 'অস্থিমাত্র সার' এক বাহু পাওয়া গেল। ইহার সহিত সংলগ্ন একটি চমৎকার কবচ দেখা গেল ; কবির ভাষায়—

চন্দ্র-সূর্য জিনিয়া কবচ গোটা জ্বলে।
বহুদিন গত তবু আছয়ে উজ্জ্বলে ॥
দেখিয়া কবচ ভাতি হরে মন প্রাণ।
স্ফটিক নির্মিত সবে করে অনুমান ॥

শুধু ইহাই নহে, কবচের উপর সুন্দর অক্ষরে 'গোসানী কবচ' কথাটি লেখা ছিল। কাজিলীকুড়ার জলে কবচ ধৌত করা হইল এবং ইহার ভাতি দ্বিগুণ বাড়িল। সীতার কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। রাজার অনুরোধে সীতা তাহার পূর্বজন্মের কাহিনী বলিল এবং কোন্ অপরাধে বর্তমানে হীনবংশে জন্মিয়াছে, তাহাও বলিল। রাজা মহাসমারোহে গোসানী দেবীকে স্থাপন করিলেন ও তাঁহার নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গোসানী দেবী কামতা রাজের প্রকৃত অধীশ্বরীরূপে পূজিত হইতে লাগিলেন ; তাঁহার নাম হইল কান্তেশ্বরী (অর্থাৎ কান্তা বা কাম্‌তার ঈশ্বরী)। কবির ভাষায়—

কান্তেশ্বর হ'ল গোসানীর অধিকারী।
সেই হেতু তাঁর নাম হ'ল কান্তেশ্বরী ॥

কান্তেশ্বর গোসানী দেবীর অধিকারী বা সেবায়েতরূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ইহার পর রাজা কান্তেশ্বর মৃগয়ায় বাহির হইয়া নানা স্থানে গেলেন এবং বহু দেবমন্দির নির্মাণ ও দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করিলেন ; তন্মধ্যে কোটেশ্বর, বিদ্বেশ্বরী, বাণেশ্বর, জল্পেশ্বর প্রভৃতির নাম 'গোসানী-মঙ্গলে' পাওয়া যায়। রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পথে রাজা মন্ত্রী শশিবরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং শশিবরের পরম রূপবান্ পুত্র মনোহরকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। গৃহে ফিরিয়া রাজা প্রিয়তমা পত্নী বনমালার নিকট মনোহরের রূপ বর্ণনা করেন ; বনমালা বর্ণনায় আকৃষ্ট হইয়া

গুপ্তভাবে মনোহরের দর্শন-আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করেন। পরে উভয়ে উভয়কে দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট হন এবং 'কালিকা-মঙ্গল কাব্যে'র সুন্দরের ন্যায় প্রত্যহ সুড়ঙ্গপথে বনমালার সঙ্গে মিলিত হন। রাজা ইহার জন্য মনোহরের উপর কঠিন শাস্তিগ্রহণ করিলেন, মৃত অবস্থায় সুড়ঙ্গমধ্যে মনোহর ধৃত হয়, তাহার মাংস রন্ধন করিয়া তাহার পিতা শশিবরকে খাওয়ান হয়। শশিবর ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া মুসলমানের পক্ষে মিলিত হন এবং তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়া কান্তেশ্বরের রাজ্য আক্রমণ করান। কান্তেশ্বর পরাজিত ও নিহত হইলেন। মৃত্যুর সময় কান্তেশ্বর গোসানী দেবীর দর্শনলাভ করিলেন। কামতাপুরের রাজ্য বহুদিন অরাজক রহিল। অবশেষে নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইল।"

'গোসানী-মঙ্গল' কাব্যের একটি ক্ষীণ ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকিলেও ইহাতে কোচবিহারের প্রাচীন রাজবংশ সংক্রান্ত বিভিন্ন জনশ্রুতির নির্বিচার সংমিশ্রণ হইয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গলের চরিত্র-বিচার

কাব্য হিসাবে চণ্ডীমঙ্গলের সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি এই যে, ইহার কাহিনীর মধ্যে কেন্দ্রগত ঐক্যের অভাব রহিয়াছে। এই কাব্যের চরিত্র ও ঘটনাগুলি বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রমুখী না হওয়ার ফলেই ইহা দ্বারা উচ্চতর কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয় নাই। একেই ইহার মূল কাহিনী দুইটি স্বতন্ত্র, তাহাদের মধ্যেও কাহিনী ও চরিত্রগত ঐক্য নাই; তদ্ব্যতীত এই মূল কাহিনী দুইটিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিলে ইহাদের মধ্যেও অন্তর্বিরোধ প্রকাশ পায়।

ব্যাধ কালকেতুকে চণ্ডী কেন সহসা দয়া করিলেন, তাহার কোন সঙ্গত কারণ অনেকেই অনুমান করিয়া বাহির করিতে পারেন নাই, কিন্তু পশুকুলকে রক্ষা করিবার জন্যই যে চণ্ডী ব্যাধকে রাজ্য দান করিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই ব্যাধের জীবনে চণ্ডীর দয়া প্রকৃতই দয়া না অভিশাপ, তাহা বলা যায় না। মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে স্বাধীনভাবে কোন মানব-চরিত্র বিকাশ লাভ করিতে পারিত না, তাহার এতটুকু মনুষ্যত্ব বিকাশের মূলেও দেবতার অযাচিত করুণা আসিয়া স্থান জুড়িয়া বসিত। যতদিন কালকেতুর সঙ্গে চণ্ডীর সাক্ষাৎকার হয় নাই, ততদিন এই অরণ্যচারী ব্যাধ যুবকের জীবনটি মন্দ কাটিতেছিল না। ফুল্লরার বারমাসের দুঃখের কাহিনীও ব্যাধজীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই

চলিয়াছিল। কিন্তু যেই মুহূর্তে ব্যাধদম্পতি এই ছলনাময়ী দেবতার নিতান্ত অকারণ সুখের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইল, সেই মুহূর্তেই তাহাদের জীবনের এই স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও চলিয়া গেল। ব্যাধকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস কবিত্বের দিক দিয়া যেমন ব্যর্থ হইয়াছে, বাস্তবতার ক্ষেত্রেও তাহা তেমনই নিরর্থক। ব্যাধকে ব্যাধরূপেই যদি শেষ পর্যন্ত দেখিতে পাইতাম, তবে বোধ হয় ইহা অপেক্ষা অধিক সুখী হইতাম, কাব্যেরও মর্যাদা রক্ষা পাইত। এই সামঞ্জস্যের অভাবেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রস বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, ঘন সন্নিবিষ্ট হইবার সুযোগ পায় নাই। এই সম্পর্কেই একজন সমালোচক বলিয়াছেন, 'এই কাব্যে সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আর্টের উদ্গম আছে, বিকাশ নাই; আকরে খাঁটি স্বর্ণের পার্শ্বে ঈষৎ স্বর্ণে পরিণত লোষ্ট্রখণ্ড যেরূপ দেখায়, তেমনি এই কাব্যে কবিত্বের ও সৌন্দর্য-সৃষ্টির আশে পাশে বহু অপরিণত ও অস্ফুট বর্ণনা দেখিতে পাই।'

সমগ্রভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, ধনপতির কাহিনীটির কাব্যগুণ অধিক। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই কাহিনীটির মধ্যে বিশেষ মৌলিকতা নাই; পদ্মাপুরাণের চাঁদ সদাগরের চরিত্রের উপর দৃষ্টি রাখিয়া, ধনপতির চরিত্রটি কল্পনা করা হইয়াছে; খুল্লনার পরীক্ষা প্রভৃতির কাহিনীও বেহুলার পরীক্ষার কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত। এতদ্ব্যতীত খুল্লনার দুঃখ-বর্ণনার অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন অত্যন্ত পীড়াদায়ক। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক নির্দেশ অনুযায়ী ইহা আদ্যোপান্ত রচিত। বিষয়বস্তু সুগ্রথিত ও সুমার্জিত নহে, কোন উচ্চতর কাব্যের সৃষ্টি-উপাদানও ইহাতে নাই। ইহাকেই ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্র' বলিয়াছেন।

মূল কাহিনীগত ঐক্যের অভাবেই চণ্ডীমঙ্গলের বিশেষ কোন চরিত্রসৃষ্টিই সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। এই কাহিনীতে বিভিন্ন সংস্কারের একত্র সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়াই, চরিত্রগুলির কার্যকারিতাও অনেক স্থলেই পরস্পর সামঞ্জস্যহীন। কেবলমাত্র অসামান্য প্রতিভাবলে মুকুন্দরাম কালকেতু কাহিনীর কয়েকটি চরিত্রের পরিকল্পনায় অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। চরিত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে ধরিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

উভয় কাহিনীতেই যে উল্লেখযোগ্য একটি প্রধান চরিত্র পাওয়া যায়, তাহাই চণ্ডীর চরিত্র। চণ্ডীকে দেবতা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে; কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্রে কোন দেবত্ব দূরের কথা বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্বেরও সাক্ষাৎকার লাভ করা

যায় না। মনসার চরিত্র সমালোচনা সম্পর্কে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র-বিচার করিতে গিয়া প্রথমেই চণ্ডীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। সমগ্র কাব্যটির মধ্যে তাঁহাকে অভিন্ন চরিত্র বলিয়া বিবেচনা করিলে তাঁহার মধ্যে পূর্বাপর সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই বিষয়টি ভুল করিয়াই স্বর্গীয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'চণ্ডীর চরিত্র-চিত্রণে কবিকঙ্কণ কিছুমাত্র কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।' কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ঐতিহ্যের ধারা হইতে আসিয়া কালক্রমে একত্র মিলিত হইয়াছে। চণ্ডীর চরিত্র বিচার করিবার কালে, এই বিভিন্ন অংশগুলিকে স্বতন্ত্র রাখিয়া বিচার করাই কর্তব্য।

চণ্ডীর চরিত্রের প্রথম অংশ পুরাণ হইতে আসিয়াছে। এই অংশ রচনায় চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ প্রধানতঃ পুরাণকে অবলম্বন করিলেও, তাহারও কোন কোন স্থলে তাঁহারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও প্রমাণিত করিয়াছেন। কাহিনীর প্রথম অংশে এই দেবী প্রকৃত সতী ও উমা—চণ্ডী নহেন। উমার সঙ্গে শিবের বিবাহের পর, তাঁহাদের হিমালয়-গৃহ হইতে কৈলাস গমনের সঙ্গেই ইহার এই পৌরাণিক অংশ শেষ হইয়াছে—তারপর হইতে এই দেবী আর পৌরাণিক সতী, উমা কিংবা গৌরী নহেন। তখন হইতে তাঁহার চরিত্রের দ্বিতীয় অংশের আরম্ভ—ইহাকেও স্বতন্ত্র-ভাবে বিচার করা কর্তব্য। কালকেতু ব্যাধের কাহিনীতে এই দেবী-চরিত্রের দ্বিতীয় অংশের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। এখানে তিনি চণ্ডী—উমাও নহেন, মঙ্গলচণ্ডীও নহেন। ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে তাঁহার চরিত্রের তৃতীয় অংশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়—সেখানে তিনি মঙ্গলচণ্ডী, ইহাও তাঁহার এক স্বতন্ত্র পরিচয়, অতএব ইহাকেও অন্যান্য অংশ হইতে স্বতন্ত্র রাখিয়াই বিচার করা কর্তব্য।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গলে' তাঁহার আর একটি পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা একটি স্বতন্ত্র পৌরাণিক কাহিনীর ধারা হইতে আসিয়াছে, সেখানে তিনি উমাও নহেন, চণ্ডীও নহেন কিংবা মঙ্গলচণ্ডীও নহেন, সেখানে তিনি অন্নদা। তাহাও স্বতন্ত্রভাবে আলোচ্য। এখন চণ্ডী চরিত্রের এই বিভিন্ন অংশগুলি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ সতী। তিনি দেবাদিদেব স্বামীর গৌরবে গৌরবান্বিতা। তাঁহার এই স্বামি-অভিমানই তাঁহার দেহত্যাগের কারণ। কিন্তু তাঁহার মধ্যেও বাঙ্গালী কবিগণ

বাঙ্গালী নারীসুলভ দুর্বলতার সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি পিতৃগৃহে যজ্ঞের কথা শুনিয়া স্বামীর নিকট এই বলিয়া পিতৃগৃহ-যাত্রার অভিলাষ জানাইতেছেন,

এক তিল কোথা যাই জুড়াইতে নাহি ঠাঁই
বিধাতা করিল জন্মদুখী।
পর্বত কাননে বসি নাহি পাশ পড়শী
সীমন্তে সিন্দূর দিতে সখী॥
সুমঙ্গল সূত্র করে আইলাম তোমার ঘরে
পূর্ণ হৈল বৎসর পাঁচ সাত।
দূর কর বিবাদ পূরহ আমার সাধ
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥

সতী শিবকে এখানে বলিতেছেন, তোমার সংসারে আসিয়া অবধি এমন এক নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছি যে সিঁথির সিঁদুরটি পরাইয়া দিবার পর্যন্ত একটি প্রতিবেশিনী নাই, আজ বহুদিন পর মায়ের রান্না ভাত খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, সেইজন্য পিতৃগৃহে যাইবার জন্য তোমার অনুমতি চাহিতেছি। বাঙ্গালী কবির আত্ম-সচেতনতা সর্বত্রই এত প্রবল যে, সুনিবিড় পৌরাণিক পরিবেশের মধ্যেও তাহার নিজের গৃহের চিত্রকেও সে কিছুতেই ভুলিতে পারে না। সীমন্তে সিঁদুর পরাইয়া দিবার জন্য প্রতিবেশিনী সখী ও মায়ের রান্না ভাত খাইবার জন্য কৈলাসেশ্বরীর এই কাঙ্গালপনার চিত্র একমাত্র বাঙ্গালী কবির কল্পনায়ই সম্ভব; বর্ণিত পরিবেশের সঙ্গে যে ইহা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই, সেই বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্যমাত্র নাই।

এই সতী দেহত্যাগ করিয়া গৌরী বা উমারূপে হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন,—বাঙ্গালী কবির কল্পনায় এই উমা কন্যারূপিণী,

হিমালয়ে বাঢ়েন চণ্ডিকা।
আন বেশ দিনে দিনে, শোভা অলঙ্কার বিনে
দেখি সুখী হইল মেনকা॥

স্নেহশালিনী কন্যারূপে কল্পিতা উমার এই রূপ বাঙ্গালী কবির কল্পনায় অপূর্ব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী কবি তাঁহার নিজ গৃহের ছায়াতলে বসিয়া এই কন্যারূপিণী উমামূর্তি গড়িয়াছেন বলিয়া, ইহা তাঁহার একান্ত অন্তরের স্পর্শে এমন স্নেহ-কোমল হইয়াছে,—

আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে।
ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে॥

উমা-চরিত্রের এই দিকটিই কালক্রমে গিয়া আগমনী-বিজয়া গানের ভিতর দিয়া রসস্ফূর্তি লাভ করিয়াছে, এই গৌরী বা উমার সঙ্গে আগমনী-বিজয়ার উমারই যোগ রহিয়াছে,—চণ্ডী কিংবা মঙ্গলচণ্ডীর কোন যোগ নাই।

(এইবার কালকেতু ব্যাধ-কাহিনীর চণ্ডীর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা একটি স্বতন্ত্র চরিত্র—পূর্ববর্তী সতী, উমা, কিংবা পরবর্তী মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে ইহার কোন যোগ নাই। অতএব ইহাকে স্বতন্ত্র রাখিয়াই বিচার করা সঙ্গত।

এই চণ্ডী পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পশুদিগকেই ব্যাধের আক্রমণ হইতে ত্রাণ করিবার জন্য তিনি মৃগয়াজীবী ব্যাধকে রাজ্য ও ধন দিয়া অন্য জীবিকার সংস্থান করিয়া দিলেন—তাহাতেই তাঁহার আশ্রিত পশুকুল নিরাপদ হইল। অতএব কালকেতুর প্রতি চণ্ডীর কৃপাকে 'অহেতুক' বলা চলে না।

এই চণ্ডী প্রকৃতপক্ষে অনিষ্টকারিণী (malignant) দেবী নহেন, বরং তিনি অভয়া,—বিপন্ন পশুকুল তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হইলে, তিনি তাহাদিগকে অভয় দিলেন—যাহার অত্যাচারে তাঁহার আশ্রিত পশুকুল ধ্বংস হইতে চলিয়াছে, তাহাকেও তিনি বিনাশ করিলেন না, বরং তাহার অবস্থার আরও উন্নতি বিধান করিয়া দিলেন,—

আইলাম পার্বতী তোমারে দিতে বর।
লহ বর কালকেতু ত্যজ ধনুঃশর॥
মাণিক অঙ্গুরী লহ সাত রাজার ধন।
ভাঙ্গায়্যা বসাহ রাজ্য গুজরাট বন॥)

মঙ্গলকাব্যের দেবতা-সুলভ তাঁহার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে সামান্য যাহা কিছু আছে, তাহা ধনপতি-কাহিনীর চণ্ডীর প্রভাব বশত তাহাতে আসিয়া থাকিবে। এই চণ্ডীরই যথার্থ নাম অভয়া; এখানে তাঁহার কল্যাণী (beneficent) রূপই অধিকতর স্পষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ধনপতি সদাগরের কাহিনীর দেবতা মঙ্গলচণ্ডীই প্রকৃত ভয়ঙ্করী (malignant) দেবী। ধনপতি তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছিলেন, সেইজন্য কমলে কামিনীর মায়া পাতিয়া তিনি ধনপতিকে ছলনা করিলেন; কিন্তু শ্রীমন্ত তাঁহার নিকট কোন

কারণে অপরাধী নহে, বরং তাহার জননী খুল্লনা পুত্রের মঙ্গলের জন্য সর্বদা তাঁহার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতেছে—ইহা সত্ত্বেও তিনি কমলে কামিনীর মায়া পাতিয়া তাঁহাকেও ছলনা করিলেন, ফলে সিংহলরাজের নিকট সে কথা রক্ষা করিতে পারিল না—এইজন্য তাহার শিরশ্ছেদের আদেশ হইল। কিন্তু মশানে শ্রীমন্তের চৌতিশাস্তব শুনিবামাত্র তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। অকারণ নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করাই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার দৃষ্টির মধ্যেও উদারতা নাই, ধনী সদাগরের পুত্র নিজ ঐশ্বর্যের পরিচয় দিবার জন্য মাথা হইতে স্বর্ণটোপর খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিল, কিন্তু চণ্ডী তাহা সহিতে পারিলেন না,

লক্ষ তঙ্কা ধন নষ্ট হৈবে অকারণ
ইহা চক্ষে দেখিব কেমনে।

অতএব তিনি সেই টোপরখানি মুখে করিয়া তুলিয়া লইয়া উজানীতে খুল্লনার নিকট দিয়া আসিবার জন্য আকাশে উড়িয়া চলিলেন।

সিংহলের মশানে শ্রীমন্তকে রক্ষা করিবার কালে তাঁহার যথার্থ ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে চণ্ডীর এই ভয়ঙ্কর রূপ সামান্য একটু নমনীয় হইয়া আসিল। তখন ভক্তগণ তাঁহাকে ভয়হরা অভয়া বলিয়াও নিজেদের অন্তরে সান্ত্বনা সন্ধান করিয়াছে। সেইজন্য কারারুদ্ধ শ্রীমন্তের চৌতিশা স্তব শুনিয়া তিনি তাহাকে সঙ্কট হইতেও ত্রাণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভক্তের এই সঙ্কট-তারণ ও ভয়-নিবারণ গুণের উপরই চণ্ডীর দেবত্বের সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে প্রকৃত পৌরুষের অভাব থাকিলেও উৎকৃষ্ট রমণী-চরিত্র বিরল নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, 'কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণু-মাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোন কাজের নহে।' ইহার কারণস্বরূপও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, 'বাঙ্গালীর জীবন মানস-প্রধান, কার্য-প্রধান নহে; মানস-জগতে স্ত্রীলোকের প্রভাব অধিক, কার্য-জগতে পুরুষের প্রভুত্ব।'[১] ব্যাধ কালকেতু কিংবা সমুদ্র-বাণিজ্যরত ধনপতি সদাগরের জীবনে কার্যের অভাব না থাকিলেও বাঙ্গালী কবির জাতীয়তা-সুলভ অন্তর্দৃষ্টিতে তাহাদের জীবনের কর্মের এই দিকটা একেবারেই পরিস্ফুট হইতে পারে নাই, মানস-প্রধান

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিচিত্র প্রবন্ধ (১৩৩৪), ১৬৪-৬৫

স্ত্রীচরিত্রগুলিই তাঁহাদের কাব্যে সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া ফুটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ফুল্লরার চরিত্রই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

ফুল্লরার পরিচয়, সে 'কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পশরা।' মৃগয়াজীবী ব্যাধের পত্নীর ইহা অপেক্ষা আর উল্লেখযোগ্য গুণ কিছুই থাকিতে পারে না। তাহার নামটিও ফুল্লরা, অর্থাৎ ফুল্ল বা স্পষ্ট রা বা রাব, কণ্ঠস্বর যাহার। মাথায় লইয়া পসরা করিতে হইলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিতে হয়, সেইজন্য পসারিণীর ফুল্ল রা বা সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন। তাহার তাহা ছিল বলিয়াই সে ফুল্লরা। বাংলার কোন্ অজ্ঞাত পল্লীকবি তাঁহার পসারিণী নায়িকার এই অপূর্ব সার্থক নামটি রাখিয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ ব্যাধ-পত্নীর গুণটির উল্লেখের পরিবর্তে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রানুমোদিত যে এখানে তাহার এক বিস্তৃত রূপ-বর্ণনার অবতারণা করেন নাই, তাহা তাঁহাদের এই চরিত্রটি সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতারই পরিচায়ক বলিতে হইবে। কারণ, সে অনার্য ব্যাধের পত্নী, রূপের কথা তাহার আসেই না, তাহার শুধু গুণের কথা। সেই গুণের প্রধান গুণই হইতেছে যে, সে বুদ্ধিমতী পসারিণী; ইহা দ্বারাই তাহার জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়। অনার্য ব্যাধ-পত্নীকে চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ নিজেদের অন্তরের মমতা দিয়া গড়িয়াছেন, তাহার মধ্যেও স্বাভাবিক মানবিক স্নেহমমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,—তাহাকে কিছু একটা স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করেন নাই। সে ব্যাধ স্বামীর উপযুক্ত পত্নী, বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতিও তাহার সেবা-যত্নের ত্রুটি নাই, তাহারা তাহাকে বধূরূপে পাইয়া তাহাদের জীবন সার্থক বলিয়া বিবেচনা করে। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর ফুল্লরা এই ক্ষুদ্র সংসারখানির গৃহিণী পদে অধিষ্ঠিতা হইল। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সাংসারিক কর্তব্য পালনের ভিতর দিয়া তাহার জীবন কাটিতে লাগিল।

সংসারে নিত্য অভাব,—স্বামী যেদিন শূন্যহাতে বন হইতে ফিরিয়া আসে, সেদিন উপবাস; ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর, তায় তালপাতার ছাউনী,—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের খরা মাথার উপর দিয়া যায়, একখানি খুঞার বসন মাথায় আঁটিয়া পরা যায় না; বর্ষার ধারা মাথায় ধরিতে হয়,—এইভাবে শীত ও বসন্ত কাটে। কিন্তু দিনের পর দিন এই সব সহিয়া যায়, ইহাকেও কোন দিন দুঃখ বলিয়া মনে হয় না। যেদিন ছলনাময়ী চণ্ডী তাহার গৃহাঙ্গিনায় আসিয়া মোহিনী মূর্তি ধারণ করিলেন, সেই দিনই ফুল্লরার জীবনের সর্বাপেক্ষা দুঃখের দিন। স্বামীর প্রতি তাহার অগাধ শ্রদ্ধা ও

ভক্তি বুঝি আর রক্ষা পায় না! অথচ এমন নিষ্ঠুর সত্যকেই বা কি ভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া যায়! সে ঊর্ধ্বশ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে গোলাহাটে গিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল।

কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। কালকেতু দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, এমন ত আর কোনদিন দেখে নাই; সে জিজ্ঞাসা করিল,

শাশুড়ী ননদী নাই, নাই তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা॥

শাশুড়ী ননদীই বাঙ্গালী বধূর সংসারের জ্বালা, তাহারাই যদি ফুল্লরার নাই, তবে কে তাহাকে কাঁদাইল? ফুল্লরার কান্না কালকেতুর বিস্ময়! তাহাদের দাম্পত্য জীবনের পরম শান্তির ইহা অপেক্ষা আর কি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকিতে পারে?

তারপর চণ্ডী আবির্ভূত হইয়া যখন কালকেতুকে একটি মূল্যবান অঙ্গুরী দান করিলেন,

বীর হস্তে দিল দেবী মাণিক অঙ্গুরী।
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী॥
এক গোটা অঙ্গুরীতে হবে কোন কাম।
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম॥

কিন্তু চণ্ডী এ'কথা বলা সত্ত্বেও যে, 'এই অঙ্গুরীর মূল্য সাত কোটি টাকা', তথাপি 'ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ করে বাঁকা।' ধনে যেন তাহার কেমন অনাসক্তি, বিশেষতঃ এক যুবতীর হাত হইতে যখন তাহার স্বামী এই ধন পাইতেছে, তখন কে জানে ইহাতে কি আছে? দেবতার মাহাত্ম্য ত সে বুঝে না, বুঝিবার কথাও নহে। দেবতা ত এতদিন পর্যন্ত তাহার জীবনে এতটুকুও প্রসাদ দান করিলেন না; দুঃখের বারমাসীই যাহার জীবন-সঙ্গীত, সে কি করিয়া আজ অকস্মাৎ এই অকারণ দেবতার প্রসাদ লাভ করিয়া ভক্তি-গদ্গদ হইয়া উঠিতে পারে? সে অনার্য ব্যাধ-বধূ, দেবতার প্রতি তাহার ভক্তি নাই, আছে অবিশ্বাস; সেইজন্য আকস্মিক দৈবানুগ্রহকে সে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। পর্ণকুটীরবাসিনী পসারিণী ফুল্লরাকে যেমনটি দেখিয়াছি, রাজান্তঃপুরে পাশাখেলারতা বিলাসিনী ফুল্লরাকেই আর তেমনটি পাইলাম না। যে একদিন গ্রীষ্মের খর রৌদ্রে পসরা মাথায় করিয়া ধূলি-ধূসরিত পল্লীপথে বিচরণ করিয়াছে, তাহাকে কোন ভাবেই যেন রাজান্তঃপুরের বিলাস-জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না।

এইজন্য চণ্ডীমঙ্গল কবিদিগের তাহার সম্পর্কিত এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। দ্বিজ মাধব ফুল্লরাকে একটু দুর্বিনীতা ও মুখরা করিয়া আঁকিয়াছেন, মুকুন্দরামের দৃষ্টিতে তাহার চরিত্র একটু নমনীয় হইয়া আসিয়াছে। মুকুন্দরামের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, কলিঙ্গরাজের নিকট পরাজিত হইয়া ফুল্লরার নির্দেশে কালকেতু 'ধান্যঘরে' গিয়া লুকাইয়া রহিল। ইহার মধ্যে উভয়েরই চরিত্রে নীচ জাতি-সুলভ সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়।

ধনপতির কাহিনীতে খুল্লনার চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। জীবনের কঠোরতম দুঃখের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াও সে তাহার স্বামি-প্রেম মুহূর্তের জন্যও ম্লান হইতে দেয় নাই। পরকে বিশ্বাস করিয়া, তাহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই যেন এই চরিত্রটির ধর্ম। সেইজন্য স্বামীর প্রেমে তাহার যত বিশ্বাস, কুচক্রী দাসীকর্তৃক প্ররোচিত সপত্নীর কথায়ও তাহার তেমনই বিশ্বাস। আত্মশক্তি যেখানে দুর্বল, দেবতায় বিশ্বাস সেখানে স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তিব তাড়নায় খুল্লনা কোন কার্যেই আত্ম-নিয়োগ করে না; আত্মশক্তিতে সে বিশ্বাস করে না, সেইজন্যই সর্বতোভাবেই দেবতার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। খুল্লনার চরিত্রে পদ্মাপুরাণের বেহুলা-চরিত্রের একটু প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায়।

লহনার চরিত্রটিও একেবারে মন্দ চিত্রিত হয় নাই। সরল বিশ্বাস ও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি তাহারও কোন অংশেই কম নহে। এমন কি, স্বামীর কথায় সপত্নীকেও পর্যন্ত সে গৃহে বরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু দাসী দুর্বলা যখন তাহাকে সপত্নীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়া দিল, তখন তাহার মনে স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। উদার সংস্কার দ্বারা তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধি মার্জিত ছিল না বলিয়াই, সে সামান্য দাসীর প্ররোচনায় অসহায় একটা বালিকার এমন দুঃখের কারণ হইয়া পড়িল। একবার বিদ্বেষবুদ্ধিতে আহুতি পড়িলে, তাহা আর নির্বাপিত করা যায় না, অন্ততঃ তাহা করিবার মত মানসিক শিক্ষা লহনার মত চরিত্রের ছিল না। সেইজন্য খুল্লনার প্রতি তাহার ব্যবহারে আর কোন পরিবর্তন সাধিত হইল না।

পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে কালকেতুর চরিত্রটির একটু বিশেষত্ব আছে। ব্যাধ-জীবনোচিত সংস্কার একদিক দিয়া যেমন তাহার প্রবল, তেমনই আদর্শ সামাজিক চরিত্র হইবার উপযুক্ততারও তাহার অভাব নাই। তাহার নৈতিক জ্ঞান অত্যন্ত

সূক্ষ্ম, সামাজিক বিচার ন্যায্য, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস অপরিমেয় ও পত্নীর প্রতি তাহার প্রেম কর্তব্যের সংযম দ্বারা শাসিত। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ এই চরিত্রটিকে রাজসিংহাসনারূঢ় ও রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া শেষ কালে একেবারে হত্যা করিয়াছেন, পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, ধনপতির চরিত্রে কোন মৌলিকতা নাই, পদ্মাপুরাণের চাঁদ সদাগরের চরিত্রের অনুরূপ তাঁহার পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

যে একটি চরিত্র-চিত্রণে চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ একটু সামাজিক বুদ্ধিবিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। আর কোন মঙ্গলকাব্যে এমন জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ কোন চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। ইহার পরিকল্পনা প্রত্যক্ষ ও বাস্তব সমাজ-চরিত্র-অভিজ্ঞতার ফল। মাধব ও মুকুন্দ তাঁহাদের বিশিষ্ট প্রতিভা অনুযায়ী চরিত্রটির পরিকল্পনা করিলেও ইহার মূল বৈশিষ্ট্য উভয়ের সৃষ্টিতেই অক্ষুণ্ণ আছে।

ভাঁড়ু দত্ত ধূর্ততার প্রতীক। একান্ত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তাহাকে এই ধূর্ততার আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক কার্যেই তাহার স্বার্থপরতার উদ্দেশ্য বাহিরের লোকের নিকট এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত যে, সে পদে পদে ধরা পড়িয়া গিয়া তাহার জন্য নির্যাতন ভোগ করিত। তাহার সংসারে নিত্য অসচ্ছলতা, অন্তরে কদর্যতা, কিন্তু তাহা গোপন করিবার জন্য বাহিরে 'ফোঁটা-কাটা মহাদম্ভ'। গর্ব করিবার একমাত্র বিষয় তাহার কুল,

ঘোষ বসুর কন্যা   দুই জায়া মোর ধন্যা
মিত্রে কৈলুঁ কন্যা সমর্পণ।

সে কালকেতুর পাত্র-পদের প্রত্যাশী হইয়া তাহার নিকট গেল। সরল প্রকৃতির কালকেতু তাহার মত ধূর্ত ব্যক্তির ছলনা বুঝিতে না পারিয়া তাহার আবেদন মঞ্জুর করিল। কিন্তু স্বভাব-দুর্বৃত্ত ভাঁড়ু উচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াও নিজের প্রকৃতি ভুলিতে পারিল না। চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ চরিত্রটির এই সঙ্গতি অপূর্ব কৌশলে রক্ষা করিয়াছেন। কালকেতুর নিকট ভাঁড়ুর নামে প্রজাগণ আসিয়া দলে দলে অভিযোগ করিতে লাগিল। তাহার কি অপরাধ ?—'টাকা সিকা নিত্য খায় ধুতি।' হাটুরিয়া লোকের নিকট হইতে সামান্য ঘুষ খায়, অন্যায্য ভাবে তোলা দাবী করে, না দিলে তাহার উপর অত্যাচার করে। টাকা ভাঙ্গাইয়া পরে

কড়ি দিবে বলিয়া বিনামূল্যে পসরা করিয়া বেড়ায়। ভাঁড়ুর প্রকৃতি যেমন নীচ, তাহার দৃষ্টিও তেমনই নীচ—সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধারণ লোকের সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়া দেয়। রাজার পাত্র বা মন্ত্রী হইবার মত তাহার উচ্চ গুণ নাই। সেইজন্য কালকেতু তাহাকে এই বলিয়া বিদায় করিয়া দিল, 'আপনি করিলে দূর আপন মহত্ত্ব'। ভাঁড়ু চরম অপমান বোধ করিল, বিশেষতঃ তাহার স্বার্থসিদ্ধির পথ বন্ধ হইয়া গেল দেখিয়া একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। লোভ, স্বার্থপরতা, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা—তাহার মধ্যে কোন দুর্গুণেরই অভাব ছিল না। এইবার এই অপমানের জন্য সে কালকেতুর উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। সে কলিঙ্গরাজকে কালকেতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে চলিল। কলিঙ্গরাজ ভাঁড়ুর প্রদর্শিত পথে কালকেতুর গুজরাট আক্রমণ করিলেন, পূর্ব-পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া ভাঁড়ু সরলা ফুল্লরার নিকট হইতে কালকেতুর সন্ধান জানিয়া তাহা শত্রুপক্ষের কোটালকে জানাইল। কালকেতু বন্দী হইল। কিন্তু দেবীর অনুগ্রহে সে মুক্তি-লাভ করিয়া যখন স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিল, তখন সে পুনরায় কালকেতুর সম্মুখে আবির্ভূত হইল; তাহার চিরাচরিত কপটতা অবলম্বন করিয়াই বলিল,

যে জন আপন হয় সেই কভু পর নয়
আপন জানিবে ভাঁড়ু দত্তে।

সে-ই যে কলিঙ্গরাজকে বলিয়া কি ভাবে তাহার মুক্তিবিধান করিয়াছে, বার বার তাহাই বলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার আচরণ ও ব্যবহারের মধ্যেই তাহার প্রকৃতি এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, সরল ব্যাধ-সন্তানেরও তাহা দৃষ্টি এড়াইল না। কালকেতু বলিল, 'ভাঁড়ুরে নিজ দোষে খোয়ালে আপনা'। বলিয়া তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া রাজ্য হইতে বিদায় করিয়া দিল।

নীচ, স্বার্থান্বেষী, অকৃতজ্ঞ, ধূর্ত, খল, একটি চরিত্র হিসাবে ভাঁড়ু দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কবিদিগের একটি সার্থক সৃষ্টি। বিশেষ কাল ও বিশেষ সমাজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা চিরন্তন মানব-চরিত্রের বিশেষ একটা দিকের পরিচয় ইহাতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অনুরূপ পরিবেশে সর্বদেশে সর্বকালেই সম্ভব হইতে পারে। মানব মনের স্বাভাবিক দুষ্প্রবৃত্তিগুলিকে এখানে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অপূর্ব কৌশলে প্রকাশ করা হইয়াছে। মধ্যযুগে দেবমহিমা-মূলক কাব্য-রচনার মধ্যেও যে প্রকৃত মানব-চরিত্র সম্পর্কেও কবিদিগের দৃষ্টি কত সজাগ ছিল এই চরিত্রটি তাহার প্রমাণ।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিণতি—শাক্ত পদাবলী

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের স্থান বর্তমানে দুর্গামঙ্গলই অধিকার করিয়া লইয়াছে। শারদীয় দুর্গোৎসবের সময় অনেক গৃহেই প্রাচীন প্রথার রক্ষাকল্পে পূর্বে চণ্ডীমঙ্গল গান গাওয়া হইত। কিন্তু তাহার সহিত পৌরাণিক চণ্ডীর পরিকল্পনার সুদূর পার্থক্য-হেতু, তাহা অচিরে পৌরাণিক চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ দুর্গামঙ্গল দ্বারা স্থানচ্যুত হইয়াছে। যে দেবীকে প্রতিমাময়ীরূপে সম্মুখে দেখিতেছে তাহারই মহিমা দুর্গামঙ্গল কাব্যে শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া, ব্যাধ ও সদাগরের কাহিনীতে কাহারও মন তুষ্টিলাভ করিতে পারিল না। এখন ক্ষুদ্র পাঁচালীর আকারেই মঙ্গলচণ্ডীর কাহিনী বর্তমান থাকিয়া স্ত্রীসমাজ কর্তৃকই পঠিত হইতেছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে এখনও চণ্ডীমঙ্গলের গান শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গে তাহা দুর্গামঙ্গল বা দুর্গাপুরাণের প্রভাবে একেবারেই লোপ পাইয়া গিয়াছে। দুর্গাপুরাণের কবিগণ অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের অধিবাসী।

মঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়া আখ্যায়িকা কাব্য-রচনার ধারাটি খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়া পরিণামে তাহা খণ্ড গীতিকাব্য রচনার মধ্যে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। বৈষ্ণব গীতিকাব্যগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাবই ইহার একমাত্র কারণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগেই বৈষ্ণব গীতি-কবিতার প্রভাব অব্যাহত হইয়া উঠে। এমন কি, সমসাময়িক কালে রচিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল' যদিও আখ্যায়িকা-মূলক কাব্য, তথাপি ইহার আভ্যন্তরিক গীতিসুর-প্রবণতার কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। সেই যুগেই শাক্ত আখ্যানমূলক কাব্যগুলি এই খণ্ড গীতির প্রভাবের বশবর্তী হয়, —তাহার ফলেই সেই যুগে ইহাদের বিষয়বস্তুর কোন কোন অংশ লইয়া যুগোচিত কতকগুলি খণ্ড গীতি-কবিতা রচিত হয়, তাহাই শাক্ত পদাবলী নামে পরিচিত। শাক্ত পদাবলীর দুইটি ধারা—একটিতে চণ্ডী কন্যারূপিণী উমাতে ও অপরটিতে মাতৃরূপিণী কালিকাতে পরিণতি লাভ করিয়াছেন। সাধক কবি রামপ্রসাদ এই উভয় ধারারই প্রতিষ্ঠাতা হইলেও তাঁহার পরবর্তী কাল হইতেই এই দুইটি ধারা স্বতন্ত্র ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। একটির মধ্যে গার্হস্থ্য সুর প্রবল হইয়া উঠে, আর একটির মধ্যে আধ্যাত্মিক সুরই প্রবলতর হয়। ইহার প্রথম ধারাটি আগমনী-বিজয়াগান ও দ্বিতীয় ধারাটি শ্যামাসঙ্গীত নামে পরিচিত।

বাঙ্গালীর গৃহস্থ জীবন নানা স্নেহ-সম্পর্কের দ্বারা বিজড়িত। এই সমাজের

মাতাপিতা নিজেদের শিশু কন্যাকে গৌরীদান করিয়া যে ভাবে পরের সংসারে পাঠাইয়া দিতেন, তাহাতে তাঁহাদের অতৃপ্ত সন্তানস্নেহ অন্তরের মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া থাকিত। তারপর কোন অনুকূল অবস্থা পাইলেই তাহা সহস্র ধারায় বিগলিত হইয়া পড়িত। বাংলার আগমনী-বিজয়া গানগুলি এই স্তম্ভিত অশ্রুনির্ঝরের মুক্তি-সঙ্গীত। অপরিণত-বুদ্ধি শিশু-কন্যাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্বামি-গৃহের অদর্শনে পাঠাইয়া দিয়া এই সমাজের জননীগণ বাৎসল্যরসের অতৃপ্তি-জাত যে আশঙ্কা ও উদ্বেগাকুল জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালীর আগমনী-বিজয়া গানে তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর গৃহ-সংসার চির-দারিদ্র্যের লীলা-নিকেতন। দরিদ্রের সংসারে দুঃখেরও অন্ত নাই; সেইজন্য বৎসরান্তে কিংবা যে কোনদিন এই সন্তান-বিচ্ছেদের অবসানে স্নেহাতুর মাতৃহৃদয়ে তাহার সন্তান-সম্পর্কে এই অশুভ দারিদ্র্যের শঙ্কাই সর্বপ্রথম জাগিয়াছে,—

কেমন করে হরের ঘরে
　　ছিলি উমা বল্ মা তাই।
চিতাভস্ম মাখি অঙ্গে,
জামাই ফিরে নানা রঙ্গে,
তুই নাকি মা তারি সঙ্গে
　　সোনার অঙ্গে মাখিস্ ছাই॥

খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন সমগ্র বাংলার ভাব-লোক বৈষ্ণব কবিতার বন্যায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, সেই যুগেই বিশেষ করিয়া এই আগমনী-বিজয়া গানগুলি রচিত হয়। পূর্বে যে বিস্তৃত শৈব ও শাক্ত সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কোথাও এই জাতীয় খণ্ড কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব ইহা পূর্বোল্লিখিত লৌকিক কিংবা পৌরাণিক কোন সাহিত্যেরই অন্তর্ভূত নহে, খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে ইহাদের পরিকল্পনার আভাসমাত্রও পাওয়া যায় না।

এই শ্রেণীর খণ্ড কবিতা বাঙ্গালী চরিত্রের বিশিষ্ট উপাদান অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী কবির মৌলিক সৃষ্টি। ইহাদের মধ্যে যে একটি ক্ষীণতম কাহিনীর সূত্র আছে, তাহা পৌরাণিক কাহিনীর ছায়াতলে পরিকল্পিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহা বাঙ্গালীর গৃহস্থ জীবনের নিত্য অভিজ্ঞতার চিত্র। এই খণ্ড গীতিগুলির রচনায় বাহিরের আর কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। মৈথিল

কবি বিদ্যাপতি-রচিত হরগৌরীবিষয়ক কতকগুলি পদ আছে ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে আগমনী-বিজয়ার বিষয়বস্তুটি নাই। বাঙ্গালীর জাতীয় ভাব-প্রবণতার গুণের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক অতি নিবিড়। বৈষ্ণব কবিতায় ব্যক্তি-হৃদয়ের খণ্ড অনুভূতিগুলি আত্মকেন্দ্রিক হইয়া রসস্ফূর্তি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু আগমনী-বিজয়া গানে তাহাই আত্মসম্পর্কিত গার্হস্থ্য জীবনকে কেন্দ্র করিয়া রসরূপ লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে আত্মধর্মই প্রবল, কিন্তু আগমনী-বিজয়া গানে গৃহধর্মকেই বড় করা হইয়াছে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের উপর বৈষ্ণব গীতিকবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাবের জন্যই বাংলা সাহিত্যে এই অনবদ্য খণ্ড গীতিকাগুলির জন্ম হইয়াছিল। মঙ্গল-কাব্যের দীর্ঘ কাহিনীকে খণ্ড খণ্ড গীতি-কবিতার রূপে প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী কবি কাব্য-রচনায় এই ভাবে প্রাচীন সংস্কারের আদর্শ-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিল। বাংলার চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ পরিণতি এই ভাবে সম্পাদিত হইল।

আগমনী-বিজয়া গানের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সাধারণ। ইহার মধ্যে একটি ক্ষীণতম কাহিনীর সূত্র থাকিলেও মঙ্গলকাব্যগুলির মত কাহিনী বর্ণনা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে,—অন্তরের একটি শাশ্বত স্নেহবোধকে সঙ্গীতের সুরে প্রকাশ করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। এই জন্য যে ক্ষীণতম কাহিনীটি এখানে অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক আখ্যানের উপরই পরিকল্পিত, লৌকিক আখ্যানের উপর নহে। কাহিনীটি নিম্নে বর্ণনা করা যাইতেছে—

গিরিরাজ হিমালয় ভিখারী শিবের নিকট নিজের কন্যা উমাকে সম্প্রদান করিয়াছেন। রাজকন্যা উমা ভিখারী স্বামীর নিত্য অভাব-পীড়িত সংসারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সন্তানের বিচ্ছেদে মহিষী মেনকা এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পাইতেছিলেন না, তাঁহার ঐশ্বর্যভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল। অবশেষে শারদীয়া পূজার প্রাক্কালে মেনকা একদিন শেষরাত্রে ভিখারী স্বামীর গৃহিণী তাঁহার দুঃখিনী উমাকে স্বপ্নে দেখিলেন। দেখিয়া তিনি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না—স্বামীর নিকট গিয়া একবার কন্যাকে আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে তাঁহার পিতৃভবনে আনাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন।

এদিকে উমাও জননীকে স্বপ্নে দেখিয়া সহসা ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। মাতাপিতাকে এতকাল পর একবার দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীর নিকট হইতে মাত্র তিন দিনের জন্য সময় ভিক্ষা করিয়া লইয়া পিতৃগৃহে যাত্রা করিলেন।

ভিখারীর পত্নী তিন দিনের জন্য মাত্র গিরিরাজ পিতার গৃহে অতিথি। মেনকার এই আনন্দ-মিলন দেখিতে দেখিতে বিজয়ার বিদায়-বেদনায় ঘনাইয়া উঠিল। তিন দিন পর পিতৃগৃহ আঁধার করিয়া উমা পুনরায় ভিখারী স্বামীর সংসারে চলিয়া গেলেন—মেনকার চক্ষে পাষাণপুরী অন্ধকার হইয়া গেল।

খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই আগমনী-বিজয়া গান কবিওয়ালা ও ভাটদিগের মুখে মুখে গীত হইলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কোন পদ কিংবা পদ-রচয়িতার কোন পরিচয় সংগৃহীত হয় নাই। সেই জন্যই সাধারণতঃ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনকেই আগমনী-বিজয়া গানের প্রথম কবি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার পদাবলী রচনা করেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।[১]

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত অন্যান্য রচনা খণ্ড গীতি-কবিতারই সমষ্টি। সহজ ভাষায় গভীর ভাব ও ভক্তিমূলক খণ্ড কবিতা রচনায়, সেই যুগে রামপ্রসাদের সমকক্ষ আর কেহই ছিল না। আগমনী গানে রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক ভাব-দীপ্ত সংসার-অনাসক্ত সাধকের হৃদয় সহসা যেন গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি করুণ সমবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সন্তান-স্নেহাতুরা মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা বর্ণনা করিয়া ভক্ত কবি কি অপূর্ব সংসার-চরিত্র অভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন,—

আজ শুভ নিশি পোহাইল তোমার,
এই যে নন্দিনী আইল—বরণ করিয়া আন ঘরে॥
মুখ-শশী দেখ আসি দূরে যাবে দুঃখ রাশি
ও চাঁদমুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে।
শুনিয়া এ শুভ বাণী এলোচুলে ধায় রাণী
বসন না সম্বরে॥
গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে অমনি কাঁদে গলা ধরে॥
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া,
চুম্বে অরুণ-অধরে।
বলে, জনক তোমার গিরি, পতি জনম-ভিখারী
তোমা হেন সুকুমারী দিলাম দিগম্বরে॥

[১] কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের কাল ও পরিচয় সম্বন্ধে পরে 'কালিকা-মঙ্গলে'র আলোচনা দ্রষ্টব্য।

চোখের কোণে মিলনের আনন্দাশ্রু শুকাইতে-না-শুকাইতে বিজয়ার বেদনাশ্রু জমিয়া উঠে। নির্মম সংসারের নিয়মকে নিঃশব্দে মাথা পাতিয়া লইয়া অন্তরের স্নেহ-প্রবৃত্তিগুলিকে অসাড় করিয়া রাখা ছাড়া আর উপায় কি? রামপ্রসাদের বিজয়া-গানে গিরিরাণীর প্রাণের অনুভূতি যেন পাষাণের মত স্পন্দনহীন ;—

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,
ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার ॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল
বেরোও গণেশ মাতা, ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদায় ॥
তনয়া পরের ধন বুঝিয়া না বুঝে মন
হায় হায় একি বিড়ম্বন বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেন নিরাশা সুধার ॥

রামপ্রসাদের পরই উল্লেখযোগ্য আগমনী-বিজয়া গানের কবির নাম রামচন্দ্র বসু—রামবসু নামেই তিনি অধিকতর পরিচিত। ১৭৮৮ খৃস্টাব্দে হাওড়ার নিকটবর্তী সালকিয়ায় তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালেই কলিকাতায় তিনি তাঁহার এক পিতৃব্যের আশ্রয়ে আসিয়া প্রতিপালিত হন। তরুণ বয়স হইতেই তাঁহার কবিতা রচনার অভ্যাস ছিল। কথিত আছে যে, যখন তিনি কলিকাতা জোড়াসাঁকোর কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন, তখন তালপাতায় স্বরচিত কবিতা লিখিয়া তাহা বাহিরে পথের উপর ফেলিয়া দিতেন। একদিন ভবানী বেণে নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি তালপাতাগুলি কুড়াইয়া লইয়া কবিতাগুলি পাঠ করিয়া ইহাদের রচনাগুণে আকৃষ্ট হইলেন। তিনি ইহাদের রচয়িতার সন্ধান লইয়া তাঁহাকে নিজের কবি-দলের সঙ্গীত-রচনার কার্যে নিয়োজিত করিলেন। বহুকাল পর্যন্ত তিনি ভবানী বেণের কবির দলের জন্য গান রচনা করিয়া, অবশেষে নিজেই স্বাধীনভাবে এক কবির দল খুলিলেন। একদা যখন নিজের গানের দল লইয়া পূজা উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ

কাশিমবাজারের রাজবাটিতে গান করিতে যান, তখন সেখানেই তিনি রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৪২ বৎসর।

রামপ্রসাদের পরবর্তী প্রায় প্রত্যেক কবিই আগমনী-বিজয়া গান রচনায় প্রধানতঃ রামপ্রসাদকেই আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইতেন। সেইজন্য অধিকাংশেরই রচনায় বিশেষ কোন মৌলিকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি রামবসুর রচনার বৈশিষ্ট্য সহজেই অনুভব করা যায়। স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির গুণে তাঁহার রচনায় সহজ রস-স্ফূর্তির অভাব হয় নাই।

রামবসুর মেনকায় বাঙ্গালীর শাশ্বত জননীর রূপ দেখিতে পাই। সংসার-অনভিজ্ঞা কন্যার জন্য তাঁহার স্নেহবোধ নিতান্ত বাস্তব বলিয়া মনে হয়। তাঁহার গানে মেনকা তথাকথিত রাজরাণীর সমগ্র কল্পিত আভিজাত্য উত্তীর্ণ হইয়া বাঙ্গালীর চিরন্তনী জননীর রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

দীর্ঘ সন্তান-বিরহিণী জননী, স্বামীর নিকট গিয়া অনুনয় করিতেছেন,—

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী
উমা কেমনে রয়েছে।
আমি শুনেছি শ্রবণে নারদ বচনে
মা মা উমা কেঁদেছে॥

কিন্তু স্বামী তাঁহার প্রার্থনা-বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে অন্য কথায় প্রবোধ দিতে চাহিতেছেন, কিন্তু মেনকার হৃদয় হইতে তাঁহার উমার চিন্তা কিছুতেই মুছিয়া দিতে পারিতেছেন না,—

তুমি যে কত দিন গিরিরাজ আমায় কয়েছ কত কথা,
সে কথা আছে শেল সম আমার হৃদয়ে গাঁথা।
আমার লম্বোদর নাকি উদরের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়া'ত।
হয়ে অতি ক্ষুধার্তিক, সোনার কার্তিক ধূলায় পড়ে লুটা'ত॥

তারপর যখন মেনকা পুনরায় তাঁহার উমাকে ফিরিয়া পাইলেন, তখন তাঁহার চক্ষের বিষাদের অশ্রু আনন্দাশ্রুতে পরিণত হইয়া গেল,—

গৌরী কোলে করে নগেন্দ্রাণী করুণ বচনে কয়,
উমা আমার সুবর্ণলতা, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।

মরি জামাতার খেদে তোমার বিচ্ছেদে
প্রাণ কাঁদে দিবানিশি।
আমি অচল নারী চলিতে নারি,
পারি না যে দেখে আসি।
আছি জীবন্মৃত হয়ে আশাপথ চেয়ে
তোমায় না হেরিয়ে নয়ন ঝরে,
কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা
ভিখারী হরের ঘরে॥

আগমনী-বিজয়া গানগুলি প্রধানতঃ কবিওয়ালাদ্বারাই রচিত ও প্রচারিত হইত।[১] এতদ্ব্যতীত ভাট ও কবি বলিয়া পরিচিত এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী গায়ক, শারদীয়া পূজার প্রারম্ভে বাংলার গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া সম্পন্ন গৃহস্থদিগের বাড়ীতেও এই সকল গান গাহিয়া বেড়াইত। এই ভাবে এই গানের প্রচার হইত। মুখে মুখে প্রচারিত এই সকল গানের বিস্তৃত সংগ্রহ কোন দিন মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শাক্ত পদাবলীর আর একটি ধারার মধ্যে আধ্যাত্মিক সুরটি প্রবলতর। অবশ্য এই আধ্যাত্মিক সুরটির মধ্যেও বাঙ্গালী সাধকের স্বকীয়তারই পরিচয় মূর্ত হইয়া রহিয়াছে; ইহার উদ্দিষ্টা দেবী মাতৃরূপিণী, কিন্তু তাঁহার মাতৃরূপ গার্হস্থ্য পরিবেশের মধ্যে সংস্থাপিত নহে—পরিদৃশ্যমান প্রকৃতি-জগতের মধ্য দিয়া সেই অদ্বিতীয়া শক্তিরূপিণীর বহুমুখী বিচিত্র বিকাশ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহা লীলাচঞ্চল বিশ্বের মূলীভূত শক্তি (force); তাঁহার এক হাতে সৃষ্টি, আর এক হাতে ধ্বংস,—তাঁহার রূপ কালিকা। ইহাকেই মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া সাধক-কবি ইহার সঙ্গে ঐকান্তিক সাযুজ্য কামনা করিয়াছেন; কবি রামপ্রসাদের মধ্য দিয়া এই সাধনার উন্মেষ ও তাঁহার পরবর্তী শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হইয়াছে। দেবতার সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে ইহা মঙ্গলকাব্যের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিরই যথার্থ উত্তরাধিকারী।

[১] কবিওয়ালা ও তাহাদের রচিত আগমনী-বিজয়া গানের বিস্তৃততর আলোচনার জন্য S. K. De, *History of Bengali Literature in the 19th Century* (Calcutta, 1919), 309-316 দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মপূজার ইতিহাস—ধর্মমঙ্গলকাব্য—ধর্মমঙ্গলের কবিগণ

ধর্মপূজার ইতিহাস

বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতেই পশ্চিম বাংলার একটি লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের উপর এ'দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়—তাহা ধর্মঠাকুরের পূজা।[১] পশ্চিম বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে, বিশেষতঃ ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটনাগপুরের অরণ্যভূমি পর্যন্ত, এই লৌকিক দেবতার পূজার এখনও ব্যাপক প্রচলন আছে। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই এই বিষয়ে আলোচনার উদ্বোধন করেন। তিনি ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সর্বপ্রথম এই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[২] উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলিতে চাহেন যে, ধর্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বুদ্ধদেবতা। ইহার পর তিনি আরও দুই তিনখানি প্রবন্ধ লিখিয়া বিস্তৃততর যুক্তি ও তথ্য সহযোগে তাঁহার এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পান। তখন হইতেই তাঁহার এই মতবাদ বিভিন্ন লেখক কর্তৃক নানাদিক হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখা আরম্ভ হয়। ইহার ফলেই এই বিষয়ের আলোচনা একটু ব্যাপকতা লাভ করে। বলা বাহুল্য, তখনও বাংলাদেশের অন্যান্য লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে এ'দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনারই সূত্রপাত হয় নাই। অতএব এই ভাবে ধর্মঠাকুরের বিষয় সেই সময় হইতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া, তাঁহার এই মতবাদ গঠন করিয়াছিলেন, তাহা বর্তমানে এই সম্পর্কে আবিষ্কৃত তথ্যাদির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বলিতে হইবে; অতএব

---

[১] দ্রষ্টব্য Asutosh Bhattacharyya, 'The Dharma-cult', *Bulletin of the Department of Anthropology, Government of India*, Vol. I (1952), pp. 117-153; 'Dharma Worship in West Bengal', *Census* 1951, *West Bengal*, '*The Tribes and Castes of West Bengal*' (Calcutta, 1953), pp. 351-360.

[২] *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, December*, 1894, 136, প্রবন্ধটি *Discovery of Living Buddhism in Bengal* নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও পরে প্রকাশিত হয় (Calcutta, 1897)।

বর্তমানে নবাবিষ্কৃত তথ্যাদির সহযোগে তাঁহার এই মতবাদকে সকল দিক দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতবাদের প্রধান ত্রুটি এই যে, কেবল মাত্র স্থানীয় অভিজ্ঞতাই ইহার ভিত্তি—ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত বিশ্বাস পূর্ব ভারতের যে বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া বিভিন্নরূপে প্রচলিত আছে, তাহার কেবল মাত্র একাংশের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার এই মতবাদ গঠিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের পরবর্তী কালেও এই বিষয় লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রধানতঃ তাঁহারই অনুকরণ করিয়া সেই একই অঞ্চলে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়েরই মতবাদের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,—সেইজন্য আজ পর্যন্তও এই সম্পর্কিত আলোচনা পূর্ণাঙ্গ লাভ করিতে পারে নাই।

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, ধর্মঠাকুরের পূজা পশ্চিম বঙ্গের যে অঞ্চল রাঢ় বলিয়া পরিচিত, সেই অঞ্চলেই উদ্ভূত হইয়া একমাত্র সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ আছে। এই ধারণার প্রধান কারণ এই যে, এই অঞ্চলে খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, এই বিশিষ্ট দেবতাটিকে অবলম্বন করিয়া কতকগুলি উচ্চাঙ্গের মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল। এই মঙ্গলকাব্যগুলির উপর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাকারীদিগের দৃষ্টি প্রথম হইতেই আকৃষ্ট হওয়ার ফলে, প্রসঙ্গতঃ তাহাদিগের উপজীব্য এই ধর্মঠাকুরের বিষয়ও আলোচনা করিবার ইঁহাদের প্রয়োজন হয়। তাঁহাদের এই বিষয়ক জ্ঞান এই মঙ্গলকাব্যগুলি কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ; বলা বাহুল্য, মঙ্গলকাব্যগুলি স্বভাবতই এই অঞ্চলেরই বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত ছিল এবং উচ্চবর্ণের শিক্ষিত কবিদিগকর্তৃকই প্রধানতঃ রচিত হইয়াছিল। অতএব ইহাদিগকে ভিত্তি করিয়া ধর্মপূজার মত ব্যাপক একটি ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কোন মতবাদ গঠনই নির্ভুল হইতে পারে না ; কিন্তু স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের আমল হইতে আজ পর্যন্ত যাঁহারা এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই এই ভুলের বশবর্তী হইয়াছেন। ইহাই যথাসম্ভব নিরসন করিবার জন্য বর্তমান অধ্যায়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইতেছে।

প্রাচীন কালে পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্য ভূমি—এই সীমানা বেষ্টিত বিস্তৃত ভূভাগ রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। ইহা উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় নামে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এই রাঢ় ভূমির দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি ও উত্তর-পূর্বে পৌণ্ড্রবর্ধন নামক অঞ্চল অবস্থিত ছিল। এই

বিস্তৃত অঞ্চল বর্তমানে হুগলি, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ (কান্দি মহকুমা) প্রভৃতি জিলায় বিভক্ত হইয়াছে। বাংলাদেশের মধ্যে পৌণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলে সর্বপ্রথম আর্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়া ক্রমে তাহা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসার লাভ করা সত্ত্বেও, উক্ত রাঢ় অঞ্চল বহুকাল পর্যন্ত আর্যসভ্যতার বহির্ভূত ছিল। এক প্রবল অনার্যজাতি এই অঞ্চলে বসবাস করিত, তাহারা আদি-অস্ত্রাল বা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড্ জাতির এক কিংবা একাধিক শাখাভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। যদিও পরবর্তী কালে এই রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসিগণ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতি অনুরাগী হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়, তথাপি খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত লিখিত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রামাণিক কোন গ্রন্থে, এই অঞ্চল সম্পর্কে কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং 'আচারাঙ্গসূত্ত' নামক একখানি জৈন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, মহাবীর কেবল-জ্ঞানলাভ করিবার পূর্বে নানা তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন, এই ভ্রমণ-ব্যপদেশে তিনি রাঢ়দেশে আসিয়া উপনীত হন। তখন এই রাঢ়দেশের অধিবাসিগণ অত্যন্ত অসভ্য ছিল, তাহারা তাঁহার গায়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল ও অন্যান্য নানাভাবে অপমান করিয়াছিল।[১] 'মহাবীরের সময় বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল ছিল অসভ্য, সুতরাং সে প্রদেশে সে সময়ে জৈনধর্ম প্রসারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। বস্তুতঃ জৈন সাহিত্যে সে সমস্ত প্রাচীন গণ, শাখা ও কুলের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার কোনটির সঙ্গেই এ অঞ্চলের কোন স্থানীয় নামের সম্বন্ধ দেখা যায় না।[২] খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত এই অঞ্চলের লোক-সাহিত্যে রাঢ়দেশের অধিবাসী সম্বন্ধে অনুরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ইহাদের সম্বন্ধে এই প্রকার পরিচয় দিতেছেন,—

অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়॥[৩]
ব্যাধ গোহিংসক রাঢ় চৌদিকে পশুর হাড়।[৪]

খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁহার ধর্মমঙ্গলকাব্যে লিখিয়াছেন, 'ডোম, রাঢ় চোয়াড়'।[৫] তিনি অন্যত্র তাঁহার একটি খল চরিত্রের এই প্রকার পরিচয় দিয়াছেন,—'জাতি রাঢ় আমিরে করমে রাঢ় তুঁ'।[৬]

খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীনদেশের পরিব্রাজক ফা-হায়েন বাংলাদেশে ভ্রমণ

১ H. B. 121-22 প্রবোধচন্দ্র বাগচি, 'বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারম্ভ', সা-প-প ৪৬, ২
৩ মুকুন্দরাম ৭৩; ৪ ঐ ৭০ ৫ ঘনরাম ২৩৪; ৬ ঐ

করিতে আসেন, তিনি রাঢ়দেশেরই সংলগ্ন দক্ষিণ অঞ্চল সুহ্ম-প্রদেশের রাজধানী তাম্রলিপ্তির উল্লেখ করিলেও, রাঢ় কিংবা তাহার অভ্যন্তরস্থ কোন অঞ্চলের উল্লেখ করেন নাই। ইহার পর সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীনদেশীয় পরিব্রাজক য়ুয়ান্-চুয়াঙ্ বাংলাদেশে আসেন। তিনিও রাঢ়দেশ, কিংবা তাহার অন্তর্গত কোন স্থানের কোন উল্লেখ করেন নাই; ইহাতে মনে হয়, য়ুয়ান্-চুয়াঙের সময় পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চল কোন ভাবেই বিদেশী পরিব্রাজকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই,—আর্যসংস্কার ইহার মধ্যে তখনও প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। মনে হয়, খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর পৌণ্ড্রবর্ধন হইতে বৌদ্ধধর্ম ক্রমে ক্রমে রাঢ় অঞ্চলে গিয়া প্রবেশলাভ করে। যদিও রাঢ় অঞ্চল প্রত্যক্ষভাবে কোন দিনই পাল-সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই, তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাল রাজগণ বার বার সেই অঞ্চল আক্রমণ করিয়া সেখানে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। পাল-রাজত্বের অবসানের সময়ে এই রাঢ় অঞ্চলেই সেন রাজগণ এক স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমে সমগ্র বাংলা দেশ অধিকার করেন। পালরাজদিগের সময় হইতেই রাঢ়ে বৌদ্ধধর্মের প্রসার আরম্ভ হইলেও সেন-রাজত্বের সময়েই এই অঞ্চলের সহিত বাংলা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের যোগ নিবিড়তর হয়। ইহার পূর্বে ভারতের কেন্দ্রীয় আর্যসভ্যতার ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার ফলে এই অঞ্চল নিজস্ব লৌকিক আর্যেতর সংস্কারেরই পরিপোষক ছিল। প্রাগ্-আর্য, এমন কি প্রাগ্-দ্রাবিড় এক প্রবল জাতি এই অঞ্চলে বসবাস করিত, তাহাদের ধর্ম ও আচারগত জীবনে বহুকাল পর্যন্ত বহিরাগত কোন প্রভাব কার্যকরী হইতে পারে নাই; ধর্মপূজা মূলতঃ ইহাদের মধ্যেই উদ্ভূত হইয়া কালক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভাবের সম্মুখীন হয়।

ধর্মঠাকুর, ধর্মরাজ ঠাকুর বা ধর্ম নামক এক দেবতা এই অঞ্চলের সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীদিগের মধ্যে আজিও বিপুল আড়ম্বরে পূজিত হইয়া থাকেন। এই অঞ্চলের অধিবাসী উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণও কোন কোন স্থানে বর্তমানে এই দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। দেবতার এই নামটির উদ্ভব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পুরাতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, এই ধর্ম শব্দের অর্থ বুদ্ধ। অমরকোষে বুদ্ধদেবের এক নাম ধর্মরাজ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা, 'সর্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজস্তথাগতঃ'।[১]

[১] 'অমরকোষ' শিবদত্ত সম্পাদিত (বোম্বাই, ১৯৪৪), ১.২০.৪০২

নৃতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় মনে করেন যে, প্রাচীন হিন্দুসাহিত্যে সূর্যের এক নাম ধর্ম।[১] কিন্তু ইহা ঠিক নহে; যমের এক নাম ধর্মরাজ হইলেও ধর্ম বলিতে কোন দিন সূর্য বুঝায় না। ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন যে, ধর্ম শব্দটি কূর্মবাচক প্রাচীন অস্ট্রিক শব্দের সংস্কৃত রূপ।[২] কিন্তু ধর্মঠাকুর হিন্দু পৌরাণিক প্রভাবে আসিবার পর কূর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট হন, মূলতঃ ইহার সঙ্গে কূর্মের কোন সংস্রব ছিল না—এই বিষয় নীচে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। নৃতত্ত্ববিদ্ শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, ধর্মঠাকুর বৈদিক দেবতা বরুণের আধুনিক সংস্করণ মাত্র।[৩] বরুণের নিকট নরবলি দেওয়া হইত, ধর্মঠাকুরের নিকট যে লুয়ে ছাগ বলি হয়, তাহা বর্তমানে সেই নরবলির স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে, ধর্মঠাকুরের পূজা যদি বৈদিক দেবতা বরুণেরই পূজা, তবে তাহা কেবল মাত্র একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে আবদ্ধ থাকিবে কেন? বিশেষতঃ যে ডোম জাতি এই ধর্মঠাকুরের পূজারী, তাহার সঙ্গে ত বৈদিক ধর্মের কোনও সম্পর্ক নাই; তবে তিনি যে বলিয়াছেন, লুয়ে পাঁঠা বলি (পরে দ্রষ্টব্য) নরবলির স্থান গ্রহণ করিয়াছে, এই বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ধর্মঠাকুর যিনিই হউন, পূর্বে যে তাঁহার নিকট নরবলি দেওয়া হইত, ইহা নিশ্চিত বলিয়াই মনে হয়। এই দেবতার বর্তমান পূজারিগণও ইঁহার পরিচয় সম্বন্ধে একমত নহেন। পূজারিগণও তাঁহাকে কোথাও বিষ্ণু, কোথাও শিব, কোথাও যম, আবার কোথাও সূর্য বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন।[৪] পরিচয়ের এই বিভিন্নতার জন্য কোন কোন স্থানে এই দেবতা ধ্যানমন্ত্রে 'বহুরূপ' বলিয়াও উল্লিখিত হন।

ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি নাই। তাহার পরিবর্তে এক খণ্ড স্বাভাবিক প্রস্তরই এই নামে পূজিত হয়। কোন কোন স্থানে এই প্রস্তরখণ্ডের গায়ে টুক্‌রা টুক্‌রা চাঁচ বা পিতলের পেরেক পরাইয়া দেওয়া হয়,—তাহাই ধর্মঠাকুরের চক্ষু। কোন ভক্ত চক্ষুরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া দেবতাকে তাহা উপহার দিয়া থাকে। কালক্রমে কোন কোন অঞ্চলে একটি রীতি প্রবর্তিত হইল যে, ধর্মঠাকুর

১ S. C. Ray, *The Kharias* (Ranchi, 1937), 321.

২ *B. C. Law Volume* 1., (Calcutta, 1945), 79-80.

৩ *JRASB* VIII (1942), 132-33.

৪ বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার মন্দিরে একটি ধর্মমূর্তিকে সূর্য বলিয়া পূজা করা হইয়া থাকে।

কচ্ছপাকৃতি হইবে। বলা বাহুল্য, হিন্দুধর্মের প্রভাবের ফলে ধর্মঠাকুর যে অঞ্চলে বিষ্ণুরূপে পূজিত হন, কেবল মাত্র সেখানেই তাঁহাকে বিষ্ণুর অন্যতম অবতার কূর্মরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। সেই জন্যই সকল ধর্মঠাকুরই প্রকৃত কচ্ছপাকৃতি নয়, অধিকাংশই সুগোল কিংবা ডিম্বাকৃতি। কোন কোন মন্দিরের ধর্মঠাকুর একটি বস্ত্রখণ্ডদ্বারা সর্বদা আচ্ছাদিত থাকেন, বাহির হইতে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। ধর্মঠাকুরের মন্দিরে কোন কোন সময় দেবতার পার্শ্বে একাধিক শিলাখণ্ড থাকে, তাহা ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা বলিয়া পরিচিত। কোন কোন সময় তাহাদের স্বতন্ত্র কোনও নামও থাকে। ধর্মরাজ ঠাকুরের অন্য কোন প্রতিমা নাই।

বর্তমানে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে কচ্ছপের সম্পর্ক বিষয়ে কেহ কেহ অতিরিক্ত জোর দিতেছেন।[১] বিষয়টি সম্পর্কে ইতিপূর্বেই বিস্তৃতভাবে অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে।[২] তথাপি সংক্ষেপে এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, ধর্মঠাকুরের সুনির্দিষ্ট কোন রূপ নাই। অতএব কূর্মমূর্তির সঙ্গে তাঁহার ঐক্য নির্দেশ করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্মঠাকুরের সর্বত্র প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাঁহার সঙ্গে কূর্মমূর্তির কোনই সম্পর্ক নাই। মন্ত্রটি সর্বত্রই এই প্রকার—

> যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণৌ নাস্তিকায়ো ন নাদঃ।
> নাকারো নৈবরূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মাদি যস্য॥
> যোগীন্দ্রৈর্ধ্যানগম্যং সকলজনময়ং সর্বলোকৈক নাথম্।
> ভক্তানাম্ কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্তিম্॥

ইহাতে ধর্মঠাকুরকে স্পষ্টতঃই করচরণহীন নিরাকার ও অরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কূর্মমূর্তির পরিবর্তে বরং ধর্মঠাকুরকে এখানে শূন্যমূর্তি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, উক্ত ধ্যানমন্ত্রটি বৌদ্ধ প্রভাবিত সমাজে পরিকল্পিত হইয়াছিল বলিয়া স্পষ্ট অনুভব করা যায়। ইহাতে ধর্মঠাকুরের কূর্ম-পরিকল্পনার আভাস মাত্র নাই।

---

[১] দীনেশচন্দ্র সরকার, 'প্রাচীন বঙ্গে ধর্মপূজা', প্রবাসী, ভাদ্র (১৩৫৬), *J. R. A. S. B.* XV (1949), 101-18.

[২] আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'ধর্মঠাকুর ও কূর্মমূর্তি', প্রবাসী, অগ্রহায়ণ (১৩৫৬), ১৭৩-১৭৫; 'পশ্চিম বাংলার ধর্মঠাকুর', মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ (১৩৫৭); ২০৪-২০৬।

বৌদ্ধ ও হিন্দু-প্রভাবিত সমাজের বাহিরেও পশ্চিম বঙ্গে ধর্মঠাকুর কূর্মমূর্তি নহেন। রিজ্‌লী তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Tribes and Castes of Bengal*-এ উল্লেখ করিয়াছেন, 'পশ্চিম বঙ্গের ডোমগণ মৎস্যপুচ্ছ-বিশিষ্ট নরাকৃতি ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে'।[১] বলা বাহুল্য, ইহাও কূর্মমূর্তি হইতে পারে না। রিজ্‌লী প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে তাঁহার এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তখন তিনি ডোমদিগের মধ্যে এই আচার লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অতএব কূর্মাকৃতি ধর্মঠাকুরের পূজা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল, এখন লুপ্ত হইয়াছে, এমন কথাও বলা যাইতে পারে না। অতএব এই রীতি পূর্বেও যে প্রচলিত ছিল না, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, 'আজকাল প্রস্তর খোদিত কূর্মমূর্তিকে ধর্মঠাকুররূপে পূজা করা হয়।' কিন্তু এ'কথা সত্য নহে। (প্রস্তর খোদিত বলিতে পাঠকের মনে এই ধারণা হয় যে, সাধারণ প্রস্তরনির্মিত মূর্তির মতই বুঝি পাথর কাটিয়া ধর্মঠাকুরের মূর্তিও নির্মাণ করা হয়। কিন্তু ইহা ধর্মপূজার মৌলিক সংস্কারের বিরোধী।) (ধর্মমূর্তি স্বাভাবিক শিলাখণ্ড মাত্র, ইহার আকৃতির কোন স্থিরতা নাই;) এক এক স্থানে ইহার এক এক রূপ। পূর্বেই বলিয়াছি, সেইজন্যই ইঁহাকে বহুরূপ বলিয়াও সম্বোধন করা হইয়া থাকে (তুলনীয়ঃ 'নমস্তে বহুরূপায় যমায় ধর্মরাজায়'[২])। বাঁকুড়া জিলার বেলিয়াতোড় গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মঠাকুরটি শালগ্রাম শিলার ন্যায় সুগোল, তবে শালগ্রামের মত গায়ে কোন ছিদ্র নাই। আসানসোলের নিকটবর্তী ডেম্‌রা গ্রামের তিনটি ধর্মঠাকুরই ডিম্বাকৃতি। কেহ কেহ বলেন যে, 'ধর্মশিলা ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ।' ইহার নির্দিষ্ট কোন আকার আছে বলিয়া দাবী করিতে না পারায় আবার কেহ বলিয়াছেন, ধর্মশিলা 'মোটামুটি কচ্ছপ আকার।'

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলের প্রারম্ভে রাঢ়ের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ধর্মশিলার নামোল্লেখ আছে। তাহাতে একটি ধর্মশিলাকে এইভাবে বন্দনা করা হইয়াছে, 'গোপালপুরের কাঁকড়া বিছায় বন্দি তারপর'[৩]। বলা বাহুল্য, গোপালপুর গ্রামের ধর্মশিলাটি দেখিতে কাঁকড়া বিছার আকৃতি ছিল বলিয়াই ইহা কাঁকড়া বিছা ধর্মঠাকুর নামে পরিচিত ছিল। ধর্মঠাকুরের মূর্তির কোন স্থিরতা ছিল না বলিয়া তিনিও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার 'স্থানে স্থানে মূর্তিভেদ' আছে।

১ H. H. Risley, *Tribes and Castes of Bengal* (1891) 1, 241.

২ সা-প-প ১৪, ১১৬; ৩ মাণিকরাম, (পরে দ্রষ্টব্য) ৬

ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার আদিম অধিবাসিগণ ধর্মঠাকুর বা 'ধরম দেওতা' বলিতে সূর্য দেবতা ভিন্ন আর কিছুই বুঝে না।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে কচ্ছপের উল্লেখ মাত্র নাই। শূন্য পুরাণে কূর্মের যে একবার মাত্র অতি সামান্য উল্লেখ আছে, তাহা দ্বারাও ইহার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের কোন মৌলিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। শূন্য পুরাণে কূর্মের এই প্রকার উল্লেখ আছে —ধর্মের বাহন উলূক (কূর্ম নহে) তাঁহার ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, তিনি প্রথমে হংসকে তাঁহার ভার বহন করিবার জন্য সৃষ্টি করিলেন। হংস অল্পকাল মধ্যে ধর্মঠাকুরকে ফেলিয়া পলাইয়া গেল, অবশেষে তিনি কূর্মকে সৃষ্টি করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আসন করিলেন ; কূর্মও অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার ভারে ক্লান্ত হইয়া তাঁহাকে ফেলিয়া পলাইয়া গেল। তাহার আর দেখা পাওয়া গেল না। শূন্য পুরাণের মতে ইহাই ধর্মঠাকুরের সঙ্গে কূর্মের সম্পর্ক। ইহার অতিরিক্ত আব কিছুই নহে। অতএব কচ্ছপকে ধর্মঠাকুরের প্রতীকরূপে কিছুতেই মনে করা যাইতে পারে না।

তবে ধর্মঠাকুরের সম্পর্কে কূর্মের কথা আসিল কোথা হইতে? পূর্বেই বলিয়াছি যে, যে-অঞ্চলে ধর্মপূজা হিন্দুধর্ম দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছে, সেই অঞ্চলে ধর্মশিলাকে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে। সেই অঞ্চলেই ধর্মশিলাকে বিষ্ণুরূপে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আকার সাদৃশ্যবশতঃ ইহাকে বিষ্ণুর অন্যতম অবতার কূর্মের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। বাংলার সুপ্রসিদ্ধ লোক-সংস্কৃতিবিৎ পণ্ডিত স্বর্গত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও ধর্মঠাকুরের কূর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার ইহাই একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করেন।[১] বাংলা দেশের ধর্মকর্মে কূর্ম অপরিচিত নহে,—বিষ্ণুর এক অবতার কূর্ম, যমুনার বাহন কূর্ম, 'কূর্মপুরাণ' নামকও একটি সংস্কৃত পুরাণ আছে। অতএব হিন্দুধর্ম-প্রভাবিত অঞ্চলে ধর্মপূজায় কূর্মের প্রভাবের মধ্যে বিস্ময়ের কিছুই নাই। ভগ্ন যমুনা মূর্তির এই কূর্মরূপী পাদপীঠকে হিন্দু প্রভাবিত অঞ্চলে ধর্মঠাকুর বলিয়া পূজা করা হইয়া থাকে।[২] কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রভাব-বহির্ভূত অঞ্চলে ধর্মশিলার কূর্মরূপ সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস প্রচলিত থাকিতে জানা যায় না। শালগ্রাম শিলার মত ধর্মশিলার পূজাও আদিম বস্তুপূজার প্রবৃত্তি (fetishism) হইতে জাত। ইহার সঙ্গে 'কূর্মবাদে'র (tortoise-cult)

১ *J. A. S. B.*, XI, 451-3

২ প্রবাসী, বৈশাখ (১৩৫৭), ৮৭ পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য।

কোন সম্পর্ক কল্পনা করা যায় না। ধর্মপূজার মধ্য দিয়া বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী উপজাতীয় অঞ্চল হইতে যদি এই 'কূর্মবাদ' বাংলা দেশে আসিয়া থাকিত, তাহা হইলে সেখানে ধর্মঠাকুর বলিতে সূর্যদেবতা বুঝাইত না। এই সম্পর্কে এই কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাংলার প্রতিবেশী কোন উপজাতীয় অঞ্চলেই কূর্মোপাসনা প্রচলিত নাই।

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ হইতে ধর্মঠাকুরের একটি প্রতিমার সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা বুদ্ধ ও পৌরাণিক বিষ্ণুর মিশ্র আদর্শে গঠিত কোনও স্থানীয় লৌকিক দেবতার মূর্তি,—ইহাকে ধর্মঠাকুরের মূর্তি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে, এমন কোন প্রমাণ নাই। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গের ডোম জাতির ধর্ম আলোচনা সম্পর্কে রিজ্‌লী লিখিয়াছেন যে, ডোম জাতি মৎস্যপুচ্ছবিশিষ্ট ধরম অথবা ধর্মরাজ নামক এক দেবতার পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু আমি এই বিষয়ে বহু অনুসন্ধানের ফলেও পশ্চিমবঙ্গের ডোমদিগের মধ্যে মৎস্যপুচ্ছবিশিষ্ট কোন দেবতার সন্ধান পাই নাই ;—তাহারা পূর্ব-বর্ণিত প্রস্তরখণ্ডেই এখন ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই প্রথা তাহাদের মধ্যে পূর্বে প্রচলিত ছিল, এখন লুপ্ত হইয়াছে।

সাধারণতঃ এই সকল প্রস্তররূপী ধর্মঠাকুরগণ পল্লীর কোন নির্জন বৃক্ষমূলে অবস্থান করিয়া থাকেন, অনাবৃষ্টির সময় কিংবা কোন মানসিক পূর্ণ করিবার সময় গ্রামবাসিগণ বৃক্ষমূলে গিয়াই তাঁহার পূজা দিয়া থাকে। কোন কোন সময় সিদ্ধাভীষ্ট কোন ভক্ত বৃক্ষের সংলগ্নই তাঁহার জন্য মন্দির গড়িয়া দেন—ভক্তের সঙ্গতি অনুযায়ী এই মন্দির মাটি, খড় কিংবা ইটের কোঠাও হইতে পারে। বর্তমানে কোন কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারেও শালগ্রাম শিলার মত ধর্মশিলা নিত্য পূজা পাইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, পৌরাণিক বিষ্ণুর সঙ্গে তখন তাঁহার আর কোন পার্থক্য থাকে না,—বিষ্ণুর মন্ত্রেই তাঁহার পূজা নিবেদন করা হয়। এই অঞ্চলে হিন্দুধর্ম বিস্তৃতির পূর্বে যখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিল, তখন বুদ্ধের সঙ্গে অভিন্নরূপে এই ধর্মশিলা পূজিত হইতেন বলিয়া মনে হয়।

এক এক জায়গায় ধর্মঠাকুরের এক এক নাম। যেমন—কালু রায়, বুড়া রায়, কৌতুক রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, বাঁকুড়া রায় ইত্যাদি। রায় কথাটি প্রায় প্রত্যেক

১ *Archaeological Survey of Mayurbhanj* (1911), XCVI.

নামের সঙ্গেই যুক্ত রহিয়াছে। ধর্মমঙ্গলের একজন কবি তাঁহার পরিচিত বিভিন্ন স্থানের ধর্মঠাকুরদিগের এই প্রকার নামোল্লেখ করিয়া বন্দনা করিয়াছেন,

প্রথমে বন্দিব জয় জয় পরাৎপর।
স্থানে স্থানে মূর্তিভেদ মহিমা বিস্তর॥
বেলডিহার বাঁকুড়া রায় বন্দি এক মনে।
অসংখ্য প্রণতি শীতল সিংহের চরণে॥
ফুল্লরের ফতে সিং বৈতলের বাঁকুড়া রায়।
শুদ্ধ ভাবে বন্দি দোঁহে নত হয়ে কায়॥
পাণ্ডুগ্রামের বুড়া ধর্মে বন্দিয়া সাদরে।
শ্যাম বাজারের দলু রায়ে দিয়ে জয় জয়কারে॥
দেপুরে জগৎ রায়ে জোড় করি কর।
গোপালপুরের কাঁকড়া বিছায় বন্দি তারপর॥
সিয়াসের কালাচাঁদে ঞিদাসের বাঁকুড়া রায়।
বন্দিব বিস্তর নতি করে নত কায়॥
গোপুরের স্বরূপ নারায়ণ স্বর্ণ সিংহাসনে।
বন্দিয়া বন্দিব মঙ্গলপুরের রূপ নারাণে॥
পশ্চিম পাড়ার যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়া তাহায়।
বড়ুজা গ্রামের বন্দিব মোহন রায়॥
গুড়ুছা গ্রামের বন্দি শীতল নারায়ণে।
আলগুড়চিন্নার খুদিরায়ে বন্দি সাবধানে॥
আকুটিকুল্লার মাল্লার ধর্মের করিয়া স্তবন।
বন্দিপুরের শ্যামরায়ের বন্দিয়া চরণ॥
জাড়াগ্রামে কালুরায়ে কামিন্যা সহিত।
জাজপুরের দেহারা বন্দি দার্ঢ্য করি চিত॥[১]

(ধর্মঠাকুরের নিকট নিঃসন্তান গ্রামবাসিগণ সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানায়। লোকের বিশ্বাস, অনাবৃষ্টির কালে ধর্মঠাকুরের পূজা দিলে অবিলম্বে সুবৃষ্টি হয়) (কুষ্ঠরোগ হইলে ধর্মঠাকুরের পূজা মানসিক করিতে হয়,—পূর্বজন্ম কিংবা ইহজন্মকৃত

[১] মাণিকরাম গাঙ্গুলি, 'ধর্মমঙ্গল', হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৯০৬), ৬

কোন পাপের জন্য ধর্মঠাকুরই কুষ্ঠরোগ দিয়া থাকেন বলিয়া বিশ্বাস। চক্ষুরোগেও ধর্মঠাকুরের পূজা মানসিক করিতে হয়। মৃতবৎসার সন্তাননাশ নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যেও ধর্মঠাকুরের পূজা দেওয়া হইয়া থাকে।

পশুবলি ধর্মপূজার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান হিন্দু-প্রভাবিত অঞ্চলে ছাগ ও কবুতর বলিরই বিধি। সাদা রঙের ছাগের অভাবে কালো রঙের ছাগ বলি দিতে হয়। কোন কোন অঞ্চলে সাদা রঙের পশু কিংবা পক্ষী বলি দেওয়াই একমাত্র রীতি। কিছুকাল পূর্বেও এই উপলক্ষে এই অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শূকর বলি দিত; মানভূম জিলার বাউরি জাতীয় লোকেরা এখনও এই উপলক্ষে শূকর ও মুরগী বলি দিয়া থাকে। অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে দেবতাকে মাটির ঘোড়াও উপহার দেওয়া হয়। ধর্মঠাকুর হইতেই দেবতাকে মাটির ঘোড়া উপহার দিবার প্রথা এই অঞ্চলের অন্যান্য লৌকিক দেবতাতেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।[১] সাধারণের বিশ্বাস ধর্মঠাকুব সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ান। কেহ আবার তাঁহার নিকট মাটির ঘোড়া উপহার দিয়া আশা করেন, ধর্মঠাকুর তাহার আহ্বানে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া সাড়া দিবেন। 'কেহ কেহ মনে করেন, ঘোড়া দিলে শিশুপুত্র খট্ খট্ করিয়া চলিয়া বেড়াইবে।'

যাঁহারা ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ নহেন,—ডোম জাতিভুক্ত লোকই প্রধানতঃ এই দেবতার পূজারী হইয়া থাকেন। পূজারীদিগের উপাধি পণ্ডিত, তাঁহারা দেয়াসী বা দেবাংশী বলিয়াও পরিচিত।[২]

[১] দেবতাকে মাটির ঘোড়া উপহার দিবার প্রথা বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের প্রায় সকল আদিম জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। W. G. Archer, *The Vertical Man*, London, 1947, plate XXIX., Verrier Elwin, *Muria and Their Ghotul*, Bombay, 1947, 208. দাক্ষিণাত্যের আয়েনার নামক লৌকিক দেবতার নিকটও মাটির ঘোড়া উপহার দিবার রীতি প্রচলিত আছে। (See H. Whitehead, op. cit. plate II.)

[২] কেহ কেহ মনে করেন, শব্দটি সংস্কৃত দেববাসী শব্দ হইতে জাত; কিন্তু মনে হয়, ইহা দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত, কারণ ত্রিবাঙ্কুরে প্রায় অনুরূপ অর্থে শব্দটি অদ্যাপি ব্যবহৃত হয় (Thurston, *Castes and Tribes of Southern India*, II, Madras, 1909, 121.) Risleyর প্রাগুক্ত *Tribes and Castes of Bengal* গ্রন্থে (Vol. I, p. 216), দেয়াসী ও দেবাংশী সম্পর্কে নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—'Deasi—a synonym for Lohar Maiyhi; Debangsi—a title of upcountry and Uriya Brahmins; Debansi—a sub-tribe of Rajputs in Chota Nagpur, to which the Rajas of Bishnupur, in Bankura, profess to belong; Debansi—a class of Tiyars who are fishermen'. ইহাদের কাহারও সঙ্গে বাংলার ধর্মঠাকুরের পূজারী দেয়াসীর যে সম্পর্ক আছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

যে গ্রামে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, সেখানে বাৎসরিক পূজানুষ্ঠানের সময় বর্তমানে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি দেয়াসীরাও দেবতার উপর নিজেদের কর্তৃত্ব ত্যাগ করেন না। দেবতার নামে তুকতাক্ ঔষধ ও মাদুলী দেয়াসীই দিয়া থাকেন,—একমাত্র পূজা করা ব্যতীত ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দেবতার উপর আর কোন অধিকার নাই। দেয়াসী সাধারণতঃ দেবতার সাংবাৎসরিক সেবক ও তত্ত্বাবধায়ক রূপেই কার্য করিয়া থাকেন। ডোম ব্যতীতও বর্তমানে কোন কোন জায়গায় অন্যান্য অস্পৃশ্য শ্রেণীর লোকও ধর্মঠাকুরের দেয়াসী হইয়া থাকেন। কিন্তু ডোম পণ্ডিতদিগেরই এই কার্যে বিশেষ অধিকার আছে বলিয়া মনে করা হয়। মানভূম জিলায় একটি প্রচলিত কথা আছে,—'আর কোথাও জায়গা পেলে না, শেষে ডোমের বাড়ীতে উঠলে গিয়ে ধর্মরাজ ঠাকুর!' ব্রাহ্মণগণ যেমন উপবীত ধারণ করেন, তেমনই ধর্মঠাকুরের ডোম পূজারিগণ তাম্র ধারণ করেন। তাম্র ধারণ অর্থে, বাহুতে তামার তাগা ও হাতে তামার আংটি ধারণ করা। তাম্র ধারণ না করিলে কেহই ধর্মঠাকুরের পুরোহিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের তাম্রদীক্ষার প্রয়োজন হয় না। ধর্মপণ্ডিতগণ লোকের অসুখে বিসুখে, বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগ, নানা চর্মরোগ ও স্ত্রীলোকের বন্ধ্যারোগে নানা টোটকা ঔষধ দিয়া থাকেন। ইহা হইতেই তাঁহাদের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধার আকর্ষণ হয়। ধর্মঠাকুরের পূজা সাধারণতঃ তিন প্রকার প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ক্রমে এই তিনটি প্রণালীরই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ নিত্যপূজা। যাহাদের গৃহে পারিবারিক ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাদের গৃহে নিত্যপূজা ব্যতীত অন্য কোন অনুষ্ঠান সাধারণতঃ দেখা যায় না। পারিবারিক নিত্যপূজায় কোন ঘটা হয় না, তবে যদি পূজাসম্পর্কিত বিশেষ কোন দৈব কিংবা জনশ্রুতিমূলক নির্দেশ থাকে, তবে তাহা সতর্কতার সঙ্গে পালন করা হয়। যেমন বলা যাইতে পারে যে, বর্ধমান জিলার খুদকুড়ি গ্রামের আগুরি বাড়ীতে যে একটি ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে প্রত্যহ এক সের সিদ্ধ চাউলের নৈবেদ্য ভোগ দেওয়া হয়। তবে এই নিত্যপূজা উপলক্ষেই কোন কোন সময়ে পারিবারিক ধর্মশিলার নিকটও বিশেষ পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। যেমন গৃহকর্তা কোন মোকদ্দমায় জয়লাভ করিলেন, তিনি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ধর্মঠাকুরকে একদিন পরমান্ন বা পায়স ভোগ দিলেন এই মাত্র। গৃহে কোন উৎসব অনুষ্ঠানের দিনও তাঁহার নিত্যপূজার বরাদ্দের অতিরিক্ত ও অন্য কোন উপকরণ দ্বারা তাঁহার ভোগ দেওয়া

হইবে ইত্যাদি। নিত্যপূজায় পারিবারিক ধর্মশিলার নিকট সাধারণতঃ কোন পশু বলি দেওয়া হয় না। তবে পরিবারস্থ কাহারও এই বিষয়ে মানসিক থাকিলে তাহা অবশ্য পালন করা হইয়া থাকে। পারিবারিক নিত্যপূজা সাধারণতঃ দিনে দুইবার হয়—প্রথমতঃ দ্বিপ্রহরে ধর্মশিলাটিকে শয্যা হইতে তুলিয়া স্নানাদির পর পূজা করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ রাত্রিকালে ইহাকে বৈকালী নৈবেদ্য দিয়া পুনরায় শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখা হয়। এই বিষয়ে শালগ্রাম শিলা পূজার সঙ্গে ইহার কোনই ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্মঠাকুরের নিত্যপূজা আরও একভাবে হইয়া থাকে। যে গ্রামে বারোয়ারী ধর্মতলা বা ধর্ম-মন্দির আছে এবং তাহাতে নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে, সেখানে ধর্মঠাকুরের নিত্য-পূজায় ইহা হইতে একটু বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই সকল ক্ষেত্রে ঠাকুরের যথা-নির্দিষ্ট পূজা ও ভোগের উপর প্রায়ই অতিরিক্ত মানসিক পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে। যেমন অনেকে পুত্রকন্যা কিংবা নিজের অসুখে-বিসুখে বিশেষ এক গ্রামের ধর্মঠাকুরের নাম করিয়া মানসিক করিয়া থাকে যে রোগমুক্তির পর যেদিন সম্ভব হইবে সেদিন ধর্মঠাকুরের নিকট বিশেষ কিছু ভোগ কিংবা বলি দিয়া তাঁহার পূজা দিবে। বিশেষ কোন গ্রামের ধর্মঠাকুরের খ্যাতি যদি দূরবর্তী গ্রামসমূহেও ছড়াইয়া পড়ে অর্থাৎ তাঁহার দেয়াসী প্রদত্ত ঔষধ ও মাদুলী যদি কার্যকরী বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে গ্রামান্তর হইতেও এই প্রকার মানসিক পূজা আসিয়া থাকে। কোন গ্রামে যদি ধর্মতলা কিংবা ধর্মমন্দির থাকে এবং তাহাতে নিত্যপূজার ব্যবস্থাও থাকে, তবে সেই গ্রামের অধিবাসী সাধারণতঃ গ্রামান্তরে গিয়া পূজা দেয় না। কিন্তু ইহার সুনির্দিষ্ট যে কিছু নিয়মও আছে, তাহা নহে। এই সকল মানসিক উপলক্ষে সাধারণতঃ পাঁঠা, হাঁস কিংবা কবুতর বলি দেওয়া হয়। বর্তমানে সাধারণতঃ এই সকল মন্দিরে একজন নিযুক্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও নিম্নশ্রেণীর অন্য একজন তাঁহার সহায়ক থাকে, মন্দিরের আয়ের ভাগ সেও পায়। মনে হয়, এই নিম্নশ্রেণীর সহায়কই পূর্বে দেবতার পূজারী ছিল, ক্রমে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের প্রভাববশতঃ সেই অধিকার ক্রমে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। কিন্তু ডোমজাতীয় সহায়ক বড় দেখিতে পাওয়া যায় না; মনে হয়, তাহারা ব্রাহ্মণের নীচস্থ হইয়া ধর্মঠাকুরের পূজায় সহায়তা মাত্র করা অপেক্ষা মন্দিরের সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই শ্রেয় মনে করিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের ডোমদিগের চরিত্র যাঁহারা ভাল জানেন, তাঁহারা এ কথা সমর্থন করিবেন। কিন্তু কোন কোন গ্রামে বিশেষতঃ বাঁকুড়া

ও মেদিনীপুর জিলার উত্তরাংশে কোন কোন গ্রামে ডোম পুরোহিত মন্দিরের পূর্ণ কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করেন নাই। যে সকল গ্রামে ব্রাহ্মণের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হইতে পারে নাই, সেই সকল গ্রামে ডোম পূজারীই এখনও বারোয়ারী ধর্মমন্দিরে নিত্যপূজা করিয়া থাকেন। অধিকাংশ বারোয়ারী ধর্মমন্দিরের নিত্য ও বার্যিক পূজার ব্যয় নির্বাহের জন্য হিন্দু জমিদারগণ প্রদত্ত দেবোত্তর জমি আছে। মন্দিরের পূজারীই সেই সকল জমি তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। যে সকল হিন্দু জমিদার এই উপলক্ষে দেবোত্তর জমি দিয়া থাকেন, তাঁহারা, বিশেষতঃ তাঁহাদের হিন্দু কর্মচারিগণ, এই সকল মন্দির পরিচালনা সম্পর্কেও অনেক সময় কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার এক বারোয়ারী ধর্মমন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বার্ষিক পূজার সময় গ্রামের অধিবাসীদের পরিবর্তে কেবলমাত্র জমিদারের নামেই 'সঙ্কল্প' করা হয়, অর্থাৎ পূজা কেবল মাত্র জমিদারের ব্যয় ও চেষ্টায় একক তাঁহারই মঙ্গল কামনায় অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহাই ইহার উদ্দেশ্য। এই সকল উচ্চশ্রেণীর জমিদার কিংবা তাঁহাদের অনুরূপ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন কর্মচারিগণ, ডোমজাতীয় লোক দ্বারা মন্দিরে পূজা করাইতে স্বভাবতঃই পছন্দ করিতেন না। এইজন্য বহু স্থানেই বর্তমানকালে ডোমজাতীয় লোক মন্দিরের সম্পর্ক ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। কোন কোন স্থলে তাঁহারা বারোয়ারী মন্দিরের নিত্যপূজা করিবার অধিকার রক্ষা করিলেও এই সকল মন্দিরে যখন বাৎসরিক পূজার আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তখন প্রায় সর্বত্রই ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত করা হয়। গ্রামের অবস্থা সচ্ছল না হইলে নিত্যপূজা সাধারণতঃ হয় না—ধর্মতলা সারা বৎসর পরিত্যক্ত হইয়া থাকে; গ্রাম্য পাঠশালা, জমিদারের খাজনা আদায়ের কাছারী, কিংবা ভবঘুরের আড্ডারূপেই তখন ইহা ব্যবহৃত হয়। দেবতার কোন প্রস্তর-প্রতীক্ থাকিলেও তাহা অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকে। কেবলমাত্র বার্ষিক পূজার কয়েকদিন পূর্ব হইতে ইহার উপর গ্রাম্য লোকের সজাগ দৃষ্টি পড়ে। যে সকল ধর্মঠাকুরের সচ্ছল দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, সুপ্রতিষ্ঠিত মন্দির আছে ও পূজার জন্য নির্দিষ্ট পুরোহিত আছে, কেবলমাত্র তাঁহাদিগের ব্যতীত বারোয়ারীতলায় অন্য কোন ঠাকুরের সাধারণতঃ নিত্যপূজা হয় না।

তারপরই বার্ষিক পূজা। পারিবারিক ধর্মশিলার বার্ষিক কোন বিশেষ পূজানুষ্ঠান হয় না। তবে পরিবারের কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কিংবা কাহারও মানসিক পালন করিতে হইলে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হইতে পারে—তাহাকে বার্ষিক পূজা বলা

যায় না। কেবলমাত্র বারোয়ারী ধর্মঠাকুরেরই আড়ম্বরপূর্ণ বার্ষিক পূজা হইয়া থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি, যে ধর্মঠাকুর সারা বৎসর অনাদৃত হইয়া বারোয়ারী মন্দিরে পড়িয়া থাকেন, বার্ষিক পূজার প্রাক্কালে তাঁহার মন্দিরের চারিদিক উৎসবের আয়োজনে মুখর হইয়া উঠে। যে সকল মন্দিরে নিত্যপূজা হয়, সে সকল মন্দিরের ত আর কথাই নাই।

বারোয়ারী ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজা চৈত্র পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা—যে কোনদিন অনুষ্ঠিত হইতে পারে। বোলপুরের তিন মাইল উত্তরে ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম গোয়ালপাড়া; এখানে চৈত্র পূর্ণিমা তিথিতে বাৎসরিক ধর্মপূজার অনুষ্ঠান হয়। এখানকার ধর্মপূজার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এই অঞ্চলের সমস্ত ডোম বাদ্যকর আপনা হইতেই এখানে আসিয়া সমবেত হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে পূজা উপলক্ষে ঢাক বাজায়। কারণ, তাহারা বলে, ধর্মঠাকুরের পূজায় তাহাদের কোনও পারিশ্রমিক লইতে নাই। এই সম্পর্কে প্রত্যেক মন্দিরেরই একটি প্রথা আছে, সেই অনুযায়ীই পূজার তারিখ পূর্ব হইতেই স্থির হইয়া থাকে। এই বিষয়ে কাহারও কাহারও একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, ধর্মঠাকুরের বার্ষিক পূজা কেবলমাত্র বৈশাখী পূর্ণিমাতেই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সত্য নহে। চৈত্র পূর্ণিমা হইতে আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্যন্ত চারিটি পূর্ণিমা তিথি পড়ে। ধর্মঠাকুরের বার্ষিক পূজা এই চারিটি পূর্ণিমা তিথির একটিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনাবৃষ্টির চারি মাসই তাঁহার পূজা হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে অনাবৃষ্টির প্রকোপ সর্বাধিক প্রকাশ পায় বলিয়া এই দুই মাসই ধর্মঠাকুরের বার্ষিক পূজা সর্বাধিক হইয়া থাকে। মুর্শিদাবাদ জিলার কান্দী মহকুমায় জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজা হয়।[১] ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, অন্ততঃ নিম্নলিখিত স্থানসমূহে জ্যৈষ্ঠী কিংবা আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে ; যথা, ঘুটিতোড়া (মানভূম), বেলিয়াতোড় (বাঁকুড়া,) কেন্দুলী (বীরভূম), সুরুল (বীরভূম), সিউড়ী (বীরভূম) ইত্যাদি। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন পশ্চিম বঙ্গের ডোমগণ ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে বলিয়া রিজ্‌লি উল্লেখ করিয়াছেন।[২] সম্ভবতঃ তিনি যখন অনুসন্ধান কার্য করিয়াছিলেন, তখন এই সময়ই ডোমগণ ধর্মঠাকুরের পূজা করিত। এখন অবশ্য তাহাদেরও উক্ত তিন

---

১ সা-প-প ১৪, ৪২

২ **Risley, p. 241**

মাসের মধ্যে কোন না কোন পূর্ণিমা তিথিতেই ধর্মঠাকুরের পূজার অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। তবে এ'কথা সত্য যে, বৈশাখী পূর্ণিমাতেই বার্ষিক পূজা অধিক হয়।

বর্ধমান জিলায় আসানসোল সহর হইতে তিন মাইল দূরবর্তী দামোদর নদের তীরে ডেমড়া নামে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। এই গ্রামে বিভিন্ন জাতীয় লোকের বাস—ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাউরী—প্রায় সকল জাতির লোকই এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। গ্রামের সর্বপ্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানই বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মের গাজন। দুর্গা পূজা কিংবা কালী পূজা এই গ্রামে কদাচিৎ অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু এই গ্রামের ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক গাজন উপলক্ষে যে উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গে আর কাহারও তুলনা হয় না।

গ্রামে একটি সুগঠিত ইষ্টক নির্মিত ধর্মরাজ ঠাকুরের মন্দির আছে—তাহার চারিদিক ঘিরিয়া বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, মন্দিরের সম্মুখে একটি অতি প্রাচীন তেঁতুল গাছ। সহজেই বুঝিতে পারা যায়, ধর্মঠাকুরের জন্য মন্দির নির্মিত হইবার পূর্বে তিনি বৃক্ষতলেই অবস্থান করিতেন। এখনও পশ্চিম বঙ্গের বহু গ্রামে ধর্মশিলা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কিংবা বৃক্ষতলেই অবস্থান করিয়া থাকেন। মন্দির-প্রাঙ্গণের এক কোণে ষাট্‌তলা বা ষষ্ঠীতলা নামক একটি স্থান আছে। সেখানে সিন্দূরলিপ্ত দুইখণ্ড প্রস্তর পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ষষ্ঠীর দিন গ্রামের মেয়েরা এখানে সমবেত হইয়া ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিয়া থাকে। বার মাসে যে বার রকমের ষষ্ঠীর পূজা হয়, তাহাদের প্রত্যেকটি উপলক্ষেই যে তাহারা এখানে পূজা লইয়া আসে, তাহা নয়—কেবল বিশেষ কোন পূজা উপলক্ষে তাহাদিগকে এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। সেইজন্য স্থানটি অনাদৃত ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতেই বৎসরের বেশীর ভাগ সময় পড়িয়া থাকে।

ধর্মরাজ মন্দিরটি বড় সুন্দর। এমন সুদৃঢ় ও সুগঠিত মন্দির এই অঞ্চলে আর নাই। পঞ্চকোটের কাশীপুররাজপ্রদত্ত দেবোত্তর জমির উপর এই মন্দির পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রামবাসিগণ কাশীপুররাজের বদান্যতার কথা এখনও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিয়া থাকে। তারপর কি ভাবে যে সেই কাশীপুররাজ সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী সিপাহীদলের নেতৃত্ব করিবার ফলে অন্যান্য বহু মৌজার সহিত তাঁহার এই অঞ্চলের মৌজাটিও হস্তচ্যুত হয়, সে কথাও গ্রামবাসী আজও বিস্মৃত হয় নাই। বর্তমানে এই মন্দিরটি কাশীমপুরের জমিদারীভুক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির অন্তর্গত। কি ভাবে যে কাশীপুররাজের নিকট হইতে এই অঞ্চল কাশীমপুরের জমিদার পরিবারের হস্তগত হইল, সে সম্পর্কে বিভিন্ন লোক-শ্রুতি

এখনও এই অঞ্চলে শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল লোক-শ্রুতির মূলে ঐতিহাসিক উপাদান থাকা কিছুই বিচিত্র নহে। ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজায় পূর্বে কাশীপুররাজের নামে সঙ্কল্প হইত, এখন কাশীমপুররাজের নামেই সঙ্কল্প।

মন্দিরের মধ্যস্থ 'সিংহাসনে' তিনটি ধর্মশিলা পাশাপাশি অবস্থান করিয়া থাকেন। তিনটিই ডিম্বাকৃতি, কূর্মাকৃতি নহে। প্রত্যেকটি ধর্মশিলার উপরিভাগ শ্বেত চন্দন দ্বারা লিপ্ত থাকে। ঠাকুরের মাথা যাহাতে স্নিগ্ধ থাকে, সেইজন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, ধর্মশিলা সূর্যদেবতার প্রতীক্। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে সূর্যতেজ প্রশমিত করিয়া কৃষিকার্যের সহায়ক জলবায়ু সৃষ্টি করিবার জন্য এই লৌকিক প্রথার উদ্ভব হইয়াছে। এই ব্যবস্থাকেই ইংরেজিতে Sympathetic magic বলে। শিলাখণ্ডের উপরিভাগ শ্বেত চন্দনে লিপ্ত, কিন্তু নিম্নভাগ রক্তচন্দন দ্বারা লিপ্ত। রক্তবর্ণ সূর্যতেজের প্রতীক্। ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে নানাভাবে রক্ত বর্ণের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক কল্পনা করা হইয়াছে। যাই হউক, তিনটি শিলাখণ্ডের তিনটি নাম—বাঁকুড়া রায়, বুড়া রায় ও কালা রায়। এই তিনটি ধর্মশিলার উৎপত্তি সম্পর্কে তিনটি স্বতন্ত্র জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহা উল্লেখ করিতেছি। বাঁকুড়া রায় নামে ধর্মশিলাটিকে আঁকড় (আকন্দ ?) গাছের নীচ হইতে কুড়াইয়া পাওয়া যায়। সেইজন্যই ইহার সম্পর্কে বলা হয়, 'আঁকড়া তলার বাঁকড়া রায়।' কিন্তু কে কবে কোথাকার আঁকড়া নামক অপরিচিত কোন গাছের নীচ হইতে ইহা কুড়াইয়া পাইয়াছিল, সত্যই কেহ কোনদিন পাইয়াছিল কি না, তাহা সঠিক এখন আর কেহই বলিতে পারে না। দ্বিতীয় ধর্মশিলার নাম বুড়া রায়। এই ধর্মশিলাটি ৮।৯ মাইল দূরবর্তী আখলপুর নামক এক গ্রামে পূজিত হইত। একবার বাৎসরিক গাজনের সময় ডেমড়া গ্রামের ধর্মঠাকুরের কলুজাতীয় দেয়াসীর উপর স্বপ্নাদেশ হইল যে বুড়া রায়কে আখলপুর গ্রাম হইতে যেন ডেমড়া গ্রামে লইয়া আসা হয়। সেই অনুসারে তাহাকে ভক্ত্যারা গিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু গাজনের পর যখন আখলপুরের গ্রামবাসী তাঁহাকে ফিরাইয়া লইতে আসিল, তখন তাহারা শুনিল যে, পূর্বদিন রাত্রে স্বপ্নাদেশ হইয়াছে, তিনি এ' গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না। তদবধি ডেমড়াবাসিগণ তাঁহাকে নিজেদের গ্রামে রাখিয়া দিয়া নিজেদের ধর্মশিলার সঙ্গে তাঁহারও নিয়মিত দৈনিক ও বাৎসরিক পূজা করিতেছে—ধর্মশিলাটিকে আর কোনদিন

আখলপুর যাইতে দেয় নাই। আখলপুরের অধিবাসিগণ আর কোনও দিন তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য কোনও আগ্রহ দেখায় নাই।

তৃতীয় ধর্মশিলাটির নাম কালু রায়। ইনি এক মাইল দূরবর্তী চেলাই নামক গ্রামে নিয়মিত পূজিত হইতেন। কিন্তু ক্রমে গ্রামের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইতে থাকে, বহু লোক কর্মের সন্ধানে গ্রামত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া যায়। অবশিষ্ট গ্রামবাসী ইহার পূজা আর চালাইতে পারিতেছিল না; তারপর একদিন ইহাকে মাথায় করিয়া আনিয়া ডেমড়া গ্রামের ধর্মমন্দিরে রাখিয়া যায়, আর কোনদিন ফিরাইয়া লইতে আসে নাই। অগত্যা ডেমড়া গ্রামের অধিবাসিগণ ইহাকেও নিজেদের ঠাকুরের সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে স্থান দিয়া নিয়মিত পূজা করিয়া আসিতেছে। একজন গ্রামবৃদ্ধ বলিলেন, এক বছর আগে চেলাই গ্রামের অধিবাসিগণ মহা ধূমধাম করিয়া ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়াছে, কিন্তু তাহারা ধর্মশিলা কোথা হইতে পাইল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না—তাহাদের নিজেদের গ্রামের ধর্মশিলা তাহারা এই উপলক্ষেও ফিরাইয়া লইতে আসে নাই।

এই সকল কাহিনী সত্য বলিয়া মনে করা কঠিন। তিনটি ধর্মশিলাই দেখিতে সম্পূর্ণ অনুরূপ। বুড়া রায় আকারে একটু ক্ষুদ্র হইলেও গঠনভঙ্গিতে অভিন্ন। বাঁকুড়া রায় ও কালা রায় আকৃতিতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। বিভিন্ন গ্রাম হইতে বিভিন্ন সময়ে আনীত ধর্মশিলা হইলে ইহাদের আকৃতি ও গঠনভঙ্গিতে এমন ঐক্য থাকিবার কথা নহে। মনে হয়, তিনটি ধর্মশিলার এক সঙ্গেই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তিন সংখ্যার একটি ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে বলিয়া পৃথিবীর বহু আদিম জাতিই বিশ্বাস করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। এই বিশ্বাস হইতেই তিনটি ধর্মশিলার এখানে প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বৌদ্ধ ত্রিশরণের পরিকল্পনাও তিনসংখ্যা সম্পর্কিত এই আদিম সংস্কারেরই ফল—অতএব এই তিনটি ধর্মশিলার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মুখ্য কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

ডেমড়া গ্রামে উক্ত তিনটি ধর্মশিলারই নিত্য পূজা হয়। নিত্য পূজায় পশু বলি হয় না; মানসিক অনুসারে বাৎসরিক পূজায় প্রতিবৎসর শতাধিক পাঁঠা বলি হয়। যে নিত্য পূজা করে, তাহাকে দেয়াসী বলা হয়। দেয়াসী কলু জাতির লোক। বর্তমানে এই গ্রামে কলুদের বংশ লোপ পাইয়াছে, দুই এক ঘর শেষ পর্যন্ত ছিল, তাহারা নিকটবর্তী অন্য এক গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। দেয়াসী সেখান হইতেই নিত্য যাতায়াত করিয়া দেবতার পূজা করিয়া থাকে। গ্রামের

কোনও ব্রাহ্মণ যদি পূজা দিতে আসে, তবে কলু দেয়াসীর পরিবর্তে হাজরা উপাধিধারী গ্রামের একজন আগুরি জাতীয় হিন্দু পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু কলু দেয়াসী তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হয় না ; কারণ, এ পূজায় যে তাহারই আইনত অধিকার, তাহা কেহ অস্বীকার করে না ; কলু দেয়াসীকে তাহার প্রাপ্য না দিলে পূজার ফল পাওয়া যাইবে না বলিয়া সকলেই মনে করিয়া থাকে। সরকারী কাগজ পত্রে কলুদেরই দেবতার সেবাইত বলিয়া উল্লেখ করা আছে। তাহারাই দেবতার নামে প্রদত্ত জমি বা দেবোত্তর জমি ভোগ করিয়া থাকে। দেবতার নামে বহু জমি আছে—বার্ষিক খাজনাব বিনিময়ে কতক জমি ইজারা বিলিও করা হইয়াছে। বাৎসরিক গাজনের সময় ইজারা জমির খাজনা আদায় করা হয়।

ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজায় বিশেষ আড়ম্বর হইয়া থাকে। বার্ষিক পূজার নির্দিষ্ট দিন বৈশাখী পূর্ণিমা। পূর্বে পূর্ণিমার নয় দিন পূর্বেই 'ভক্ত্যা কামান' হইত। 'ভক্ত্যা কামান' শব্দের অর্থ পূজায় মানসিক করিয়া যাহাবা ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসী হয় তাহাদের ব্রত উদ্‌যাপনের সূত্রপাত। ব্রত আরম্ভ করিলেই কেবলমাত্র ফলমূল ও দুগ্ধ পান করিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে এই সকল জিনিস দুর্মূল্য ও দুস্প্রাপ্য হইবার ফলে পূজার নয়দিন পূর্বে ভক্ত্যা হইবার রীতিও পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন ৫।৬ দিন পূর্ব হইতে 'ভক্ত্যা কামান' হইয়া থাকে। যেদিন হইতে ভক্ত্যাদিগের ব্রত পালন আরম্ভ হয়, সেদিন প্রথমই তাহাদের ক্ষৌরকার্য করিয়া লইতে হয়। সেইজন্যই এই অনুষ্ঠানের নাম ভক্ত্যা কামান। যাই হউক, সেইদিন ভক্ত্যাগণ মন্দিরপ্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া তাহাদের সঙ্কল্প দেয়াসীর নিকট ব্যক্ত করে। জাতিবর্ণনির্বিশেষেই ভক্ত্যা হইবার অধিকার আছে—যতদিন পর্যন্ত তাহারা ভক্ত্যার ব্রত পালন করে, ততদিন দেবকার্যে সকলেরই সমানাধিকার স্বীকৃত হয়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকল জাতিই ভক্ত্যা হইয়া থাকে—সৎগোপ ও বাউরী ভক্ত্যা হইলে সমপর্যায়ভুক্ত হয়। ভক্ত্যাদিগকে প্রথমদিনেই মন্দির হইতে এক একগাছি করিয়া সূতা দেওয়া হয়, ইহাকে উতুরী বা উত্তরীয় বলে। ভক্ত্যাগণ ইহা মালার মত করিয়া গলায় পরিয়া থাকে। বাঁকুড়া জিলার ধর্ম কিংবা শিবের গাজনে এই উপলক্ষে প্রত্যেক ভক্ত্যার হাতেই একগণ্ড বেত দেওয়া হয়। এখানে সে রীতি প্রচলিত নাই। উতুরী ধারণ করিলে প্রত্যেক ভক্ত্যাই ব্রাহ্মণের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। তাহারা দেবতাকে স্পর্শ করিয়া থাকে এবং অন্যান্য দেবকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার পায়। যেদিন ভক্ত্যা কামান হয়, সেদিন হইতেই ভক্ত্যাদিগের

হবিষ্যি আরম্ভ হয়। মাতৃপিতৃদশায় যেমন হবিষ্যি পালন করিবার রীতি প্রচলিত আছে, ইহাতেও তাহাই পালন করিতে হয়। পূজার আগের দিন হবিষ্যি ত্যাগ করিয়া ফল দুধ খাইতে পায়।

পূজার দিন অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে সন্ধ্যার পূর্বেই গ্রাম-গ্রামান্তরের অধিবাসিগণ দেবতার নিকট প্রদীপোপহার লইয়া আসে। সন্ধ্যার পর মন্দিরের মধ্যে গ্রামবাসীর প্রদত্ত প্রদীপগুলি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। আলোকমালায় মন্দিরের অভ্যন্তর ঝলমল করিতে থাকে। পূজার দিনে প্রত্যেক গ্রামবাসী ধর্মঠাকুরের নামে উপবাস পালন করিয়া থাকে, প্রত্যেকের গৃহ হইতেই সেই দিন পূজোপকরণ মন্দিরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়—তৎসঙ্গে এক বা একাধিক তৈল ও সলিতা সহ মাটির প্রদীপও থাকে। ধর্মরাজঠাকুরকে প্রদীপোপহার দেওয়ার রীতি সর্বত্র প্রচলিত নাই। এই মন্দিরের ইহা একটি অত্যন্ত প্রাচীন রীতি বলিয়া মনে হয়। ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতার প্রতীক্, প্রদীপগুলিও সূর্যতেজের প্রতীক্ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পূজার তিন চারিদিন পূর্ব হইতেই ধর্মশিলা তিনটিকে একবার করিয়া মন্দির হইতে বাহির করিয়া সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বেদীর উপর স্থাপন করা হয়। পুনরায় প্রত্যহই ইহাদিগকে মন্দিরের ভিতরে সিংহাসনে রাখা হয়। ইহাকে 'বারাম' বলে। 'বারামে'র ঢাকের শব্দে গ্রামবাসী মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া প্রতিদিন সমবেত হয়। কাজটি নিতান্ত সহজ নহে। লোকের বিশ্বাস, দেবতা মন্দির ছাড়িয়া বাহির হইতে চাহেন না এবং যাহাতে কেহ তাঁহাকে মন্দির হইতে বাহির করিতে না পারে, সেজন্য তিনি ওজনে ভারি হইতে থাকেন। 'অতি কষ্টে' ভক্ত্যা তাঁহাকে কোলে লইয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করে, কিন্তু আসিবার পথেও বার বার দেবতা পিছনের দিকে মন্দিরের ভিতরে চলিয়া যাইতে চাহেন। ভক্ত্যা তাঁহাকে লইয়া যদি এক পা অগ্রসর হয়, তখনই আবার দুই পা পিছাইয়া যায়। এই অভিনয় বহুক্ষণ চলিতে থাকে। সমবেত জনতা করযোড়ে মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই 'দেব-লীলা' প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। উচ্চরবে আট দশখানি ঢাক বাজিতে থাকে। ঢাকের শব্দে দামোদরের অপর তীর পর্যন্ত প্রকম্পিত হইতে থাকে।

বাৎসরিক পূজার পূর্বদিন মন্দিরে একটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়—তাহার নাম 'লাপ্‌ড়া ভাঙ্গা'। বাঁকুড়া ও মানভূম জিলার অনেক ধর্মমন্দিরেই ইহা পালন করা হইয়া থাকে। বিষয়টি একটু বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে। ভক্ত্যাগণ

পূর্ব হইতেই বড় বড় কন্টিকারি (এক প্রকার সকণ্টক বৃক্ষ)-র ঝাড় মন্দির-প্রাঙ্গণে আনিয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে প্রত্যেকে দুই হাতের মুঠিতে দুইটি ঝাড় লইয়া পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া পরস্পরকে তাহার দ্বারা আঘাত করিতে করিতে ঢাকের তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে। ইহা একটি কৃত্রিম যুদ্ধ বা mock-fight-এর রূপ ধারণ করে। ঢাকের তালে তালে নৃত্যপর ভক্ত্যাদের উত্তেজনা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতে থাকে; অতএব অনেক সময় তাহারা দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রতিপক্ষকে আঘাত করে—আঘাতের ফলে কোন কোন সময় ভক্ত্যাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তাহা হইতে রক্ত ঝরিতেও দেখা যায়। কিন্তু দেবকার্য বিবেচনা করিয়া ভক্ত্যাগণ দৈহিক যন্ত্রণার প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্রও করে না। এইভাবে বহুক্ষণ ধরিয়া নৃত্য চলিতে থাকে; সমবেত জনতা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া ভক্ত্যাদের এই দেব-লীলা পরম ভক্তিভবে প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। ঢাকের শব্দে চারিপাশের পাঁচ ছয়খানি গ্রাম প্রকম্পিত হইতে থাকে। নৃত্য শেষ হইয়া গেলে ভক্ত্যাগণ কাঁটার ঝাড়গুলি মন্দিরের সম্মুখে আনিয়া গদির মত করিয়া সাজাইয়া রাখে। তারপর পাট ভক্ত্যা বা প্রধান ভক্ত্যা তাহার উপর দিয়া নগ্নগাত্রে একবার গড়াগড়ি দিয়া চলিয়া যায়। অন্যান্য ভক্ত্যারাও একজনের পর একজন করিয়া তাহাকে অনুসরণ করে। সমবেত জনতা চারিদিক ঘিরিয়া করযোড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এক একজন ভক্ত্যা কাঁটার গদির উপর দিয়া গড়াইয়া চলিয়া যাইবামাত্র তাহারা ধর্মরাজঠাকুরের নাম উল্লেখ করিয়া এক একবার উল্লাস-ধ্বনি করিয়া উঠে। উল্লাস-ধ্বনির সময় ঢাকের শব্দ মৃদুতর হয়, সমবেত মনুষ্যকণ্ঠের জয়ধ্বনি তখন আকাশ-ভেদী হইয়া উঠে। এই অনুষ্ঠানেরই নাম 'লাপ্‌ড়া ভাঙ্গা'।

ধর্মশিলার স্নানোৎসব ধর্মরাজঠাকুরের বাৎসরিক পূজানুষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বাৎসরিক পূজার নির্দিষ্ট দিনে ভক্ত্যাগণ একটি ধর্মশিলাকে পাল্‌কিতে স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে স্নান করাইবার জন্য গ্রামের একটি পুকুরে লইয়া যায়। গ্রামের বিশেষ একটি পুকুর এই কার্যের জন্য নির্দিষ্ট আছে—গ্রামের অন্যান্য পুকুরের অবস্থা ইহা হইতে অনেক ভাল হইলেও যে পুকুরটি এই উদ্দেশ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সেই পুকুর ব্যতীত এই কার্য নিষ্পন্ন হইবার উপায় নাই। অতএব মনে হয়, এই পুকুরটিই গ্রামের প্রাচীনতম পুকুর এবং একদিন ইহাই সমগ্র গ্রামের লক্ষ্যস্থল ছিল। তিনটি ধর্মশিলার মধ্যে যদি বাঁকুড়া

রায়কে স্নানার্থ মন্দির হইতে বাহির করা হয়, তবে তাঁহাকে পুকুরঘাটে লইয়া যাওয়ার পরিবর্তে অদূরবর্তী দামোদর নদে লইয়া যাওয়া হয়। ইহার কারণ সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে যে, বাঁকুড়া রায় দামোদর নদ হইতেই উঠিয়াছিলেন, সেইজন্য বৎসরে একবার করিয়া তাঁহাকে দামোদরের জলে স্নান করাইয়া আনা হয়। কিন্তু দামোদর নদ গ্রাম হইতে একটু দূরবর্তী এবং সেখানে যাতায়াত একটু কষ্টসাধ্য বলিয়া গ্রামের পক্ষ হইতে বিশেষ কোন দাবী না থাকিলে বাঁকুড়া রায়কে মন্দির হইতে স্নানার্থ বাহির করা হয় না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বাঁকুড়া রায়ই এই গ্রামের আদি ধর্মশিলা এবং গ্রামে যখন কোন পুকুর কিংবা বাঁধ ছিল না, তখনই বাঁকুড়া রায়ের প্রতিষ্ঠা এবং পূজার সূত্রপাত হয়। তারপর জনবসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে পুকুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কালক্রমে নূতন ধর্মশিলা আসিয়া মন্দিরে স্থান লাভ করিয়াছে, তখন হইতেই নূতন প্রথার প্রবর্তন হইয়াছে।

যাহা হউক, যে ধর্মশিলাকেই স্নানার্থ মন্দির হইতে বাহির করা হয়, তাহারই পশ্চাতে বিরাট বাদ্যভাণ্ড অগ্রসর হইতে থাকে। পাল্‌কির মধ্যে ধর্মশিলাটিকে স্থাপন করিবার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। একটি বাঁশের ঝুড়ির মধ্যে কিছু আতপ চাউল রাখা হয়, আতপ চাউলের উপর ধর্মশিলাটি স্থাপন করিয়া ঝুড়ি ও আতপ চাউল সহ তাহা পাল্‌কির মধ্যে স্থাপন করা হয়। তারপর ভক্ত্যাগণ পাল্‌কি কাঁধে করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। পুকুরঘাটে আসিয়া পাল্‌কি হইতে ঝুড়িটি নামাইয়া ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী তাহা ধরাধরি করিয়া লইয়া মধ্য পুকুরের দিকে অগ্রসর হয়। মন্দিরের পুরোহিতের সহকারীকে ধামাৎকন্নি বলে, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মন্দিরের যে প্রধান সেবায়েৎ তাহাকেই দেয়াসী বলা হয়। ধামাৎকন্নি, দেয়াসী এবং পুরোহিত সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হইয়া মন্দিরের দেব-সেবায় নিজেদের অধিকার স্থাপন করিয়াছে। এই মন্দিরের ধামাৎকন্নি অস্পৃশ্য হিন্দু, দেয়াসী কলুজাতীয় এবং পুরোহিত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। মন্দির হিন্দু জমিদারের পৃষ্ঠপোষিত হইবার ফলে তাহাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অধিকার জন্মিলেও পূর্ববর্তী কালে ইহার উপর যাহাদের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের বংশধরগণও ইহার উপর হইতে তাহাদের দাবী পরিত্যাগ করে নাই। দেব-শিলা স্পর্শ করিবার অধিকার পর্যন্ত তাহারা এখনও অক্ষুন্ন রাখিয়া চলিয়াছে। পশ্চিম বাংলার যে সকল গ্রামে ব্রাহ্মণের অধিকার অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে

ব্রাহ্মণেতর নিম্নজাতি গ্রাম্য দেবতার মন্দিরের কর্তৃত্ব করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে ব্রাহ্মণ হইতে গ্রামের নিম্নতম জাতি পর্যন্ত দেব-মন্দিরের সঙ্গে যে সমান সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

যাই হউক, ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী ঝুড়িটি লইয়া মধ্য পুকুরের দিকে অগ্রসর হয়। তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম—বৈশাখী পূর্ণিমা ; অতএব পুকুরের গভীরতম অংশেও বুক জলের বেশী জল থাকে না। ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী ঝুড়িটি ধরিয়া লইয়া সেইখানে গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়ায়। যখন ইহারা উভয়ে ঝুড়িটি পাল্কি হইতে নামাইয়া লইয়া পুকুরের জলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ে। এই অঞ্চলের সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ধর্মঠাকুরের স্নানজলের 'প্রথম বিন্দু' যদি কোনও বন্ধ্যা নারী নিজের মাথায় ধারণ করিতে পারে, তবে সেই নারী সেই বৎসরের মধ্যে অবশ্যই সন্তানসম্ভবা হইবে। ডেমড়ার ধর্মঠাকুরের এই মাহাত্ম্যের কথা কেবলমাত্র যে এই গ্রামের মধ্যেই প্রচারিত আছে, তাহা নহে—আশে পাশের দশ বারোখানি গ্রামের লোক ডেমড়া গ্রামের ধর্মঠাকুরের এই মাহাত্ম্যের কথা অবগত আছে। সেইজন্য সেই সকল গ্রামের বিভিন্ন বয়সের বন্ধ্যা নারীগণ এই গ্রামের ধর্মঠাকুরেব বাৎসরিক পূজার দিন আসিয়া এখানে সমবেত হয়। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ধর্মঠাকুব স্থর্যদেবতার প্রতীক্—আদিম সমাজে স্থর্যই উৎপাদন শক্তির মূল উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়—এই উৎপাদন অর্থে পৃথিবীর শস্যোৎপাদনও যেমন বুঝায়, নারীর সন্তানোৎপাদনও তেমনই বুঝায়। পৃথিবী এবং নারী উভয়েই স্থর্যের শক্তি দ্বারাই একজন শস্যোৎপাদন ও আর এক জন সন্তানোৎপাদন করিয়া থাকে বলিয়া বিশ্বাস। বাংলা দেশে বিশেষতঃ ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে হিন্দুপ্রভাব বশতঃ আদিম সমাজের এই স্থর্য দেবতাই শিব-রূপে পরিণতি লাভ করিয়াছেন ; সেইজন্য এই অঞ্চলের কুমারী মেয়েরা শিবপূজা করিয়া নারীজীবনে সার্থকতার উপায় সন্ধান করিয়া থাকে। যাই হউক, ডেমড়া গ্রামের ধর্মঠাকুরের স্নানোৎসবটির মধ্যে আদিম সমাজের ধর্মবোধের যে কিছু পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী যখন ধর্মশিলা সহ ঝুড়িটি লইয়া পুকুরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন সমবেত জনতা হইতে বন্ধ্যা নারীগণ তাহাদের অনুসরণ করিয়া জলে নামিয়া পড়ে। ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী মধ্য পুকুরের দিকে

যখন অগ্রসর হইয়া যায়, তাহারাও তখন মধ্য পুকুর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়া ঝুড়িটি ঘিরিয়া দাঁড়ায়। মাতৃত্বের কাঙ্গালিনী শত শত বন্ধ্যা নারী ধামাৎকন্নি ও দেয়াসীকে বার বার অনুরোধ করিতে থাকে যে, ঝুড়িটি জল হইতে উঠাইবা মাত্র যেন তাহাদের দিকে আগাইয়া দেওয়া হয়। সকলেই একসঙ্গে এই অনুরোধ জানাইতে থাকে—অতএব কোলাহল ব্যতীত তাহাতে আর কিছুই শুনা যায় না। তারপর ধর্মঠাকুরের নামে জয়োল্লাস করিয়া ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী যখন ঝুড়িটি জলে চুবাইবার উদ্যোগ করে, তখন বন্ধ্যা নারীগণ পরস্পরকে ঠেলিয়া ঝুড়িটির নিকটে আসিয়া মাথা পাতিয়া রাখে। এই ঠেলাঠেলিতে ঝগড়াবিবাদের যে সৃষ্টি না হয়, তাহা নহে—অনেক সময় গ্রাম্য ভাষায় পরস্পর পরস্পরকে নীচ গালাগালি করিতে শুনা যায়; ধর্মঠাকুর যদি পাষাণরূপী না হইতেন, তাহা হইলে এই গালাগালি শুনিয়া তাঁহাকে দুই হাতে কান রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইত।

যাই হউক, বহু আয়োজন উদ্যোগের পর ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী এইবার ধর্মশিলা ও পূর্বোক্ত আতপ চাউল সহ ঝুড়িটি মুহূর্তের জন্য মাত্র পুকুরের জলে চুবাইয়া ধরে—আবার সেই মুহূর্তেই তাহা জল হইতে উপরে উঠাইয়া লয়। ঝুড়ি হইতে সহস্র ধারায় জল নীচে ঝরিয়া পড়িতে থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে সন্তানলোভাতুরা বন্ধ্যা নারীগণ সেই ঝুড়ির নীচে মাথা পাতিয়া দিয়া ধর্মঠাকুরের 'স্নানজলের' আশীর্বাদ মাথা ভরিয়া গ্রহণ করিতে থাকে। ধামাৎকন্নি ও দেয়াসীকে চারিদিক হইতে অতি কষ্টে এই জনতার বেগ রোধ করিতে হয়, তীরে দাঁড়াইয়া গ্রামবৃদ্ধগণ নানাপ্রকার সতর্ক উপদেশবাণী বর্ষণ করিতে থাকেন, কিন্তু বিভিন্ন বয়সী বন্ধ্যা নারীদের ঝগড়াবিবাদ ও কোলাহলের মধ্যে সকলই কোথায় তলাইয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রামবাসীদের বিশ্বাস ধর্মঠাকুরের স্নানজলের 'প্রথম বিন্দু' যে মাথায় ধারণ করিতে পারিবে, সেই নারী এক বৎসরের মধ্যেই সন্তানবতী হইবে। কিন্তু স্নানজলের এই 'প্রথম বিন্দু' যে ঝুড়ির কোন্ ছিদ্রপথে কখন উধাও হইয়া যায়, তাহার কেহই সন্ধান পায় না। তথাপি তাহারই প্রত্যাশায় বৎসরের পর বৎসর অসংখ্য বন্ধ্যা নারী এখানে আসিয়া সমবেত হয়। প্রতি বৎসরই তাহাদের নিরাশ হইতে হয়, তথাপি একটি আশা লইয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকে যে, একদিন এই ধর্মঠাকুরের স্নানজলের 'প্রথম বিন্দু'র প্রসাদ তাহারা লাভ করিবে। প্রতাপচন্দ্র মিশ্র গ্রামের একজন প্রবীণ ব্যক্তি; ৭৬ বৎসর বয়সেও তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট রহিয়াছে। তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, প্রায় চতুর্দশ পুরুষ

যাবৎ তিনি এই গ্রামের অধিবাসী। তিনি নিঃসন্তান, তিনি নিজের মুখেই বলিলেন, তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা। তাঁহার স্ত্রী কোনদিন ধর্মঠাকুরের স্নানজলের এই 'প্রথম বিন্দু' লাভ করিবার জন্য কোন রকম চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রশ্নটি এড়াইয়া যাইবার জন্য সংক্ষেপে বলিলেন,— 'মেয়েদের কথা মেয়েরা বলিতে পারে, আমরা তাহাদের কথা কেমন করিয়া বলিব ?' তিনি তাঁহার স্ব-গ্রামের ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যবোধ সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ থাকিলেও নিজের জীবনের সন্তানহীনতার জন্য দেবতাকে দায়ী করিতে চাহেন না।

বন্ধ্যা নারীদের মাথায় ঠাকুরের স্নানজল বিতরণের পালা চলিবার সঙ্গে সঙ্গে 'নিয়ম কলসী' পূর্ণ করা হয়। একটি নূতন মাটির কলসী পুকুরের জলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে কয়েক বিন্দু ধর্মঠাকুরের স্নানজল মিশ্রিত করা হয়। তাহাকেই নিয়ম কলসী পূর্ণ করা বলে। মন্দিরে দেবকার্যে এই জল সংবৎসর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'নিয়ম কলসী' স্নানজলে পূর্ণ করিবার একটি বিশেষ রীতি আছে। পাট ভক্ত্যা পূর্ব হইতেই কলসীটি পুকুরের জলে পূর্ণ করিয়া বন্ধ্যা নারীদের সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের মধ্যে ধর্মশিলার অনুগমন করে। তারপর যখন ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী ধর্মশিলাকে ঝুড়িতে চুবাইয়া উপরে তুলিয়া ধরে, সেই সময় বন্ধ্যা নারীদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করিয়া পাটভক্ত্যা ধর্মঠাকুরের স্নানজলের কয়েকটি বিন্দু কলসীতে পূর্ণ করিয়া লয়। স্নানজলের 'প্রথম বিন্দু' কলসীতে পূর্ণ করা তাহারও লক্ষ্য ; কারণ, তাহা হইলে 'নিয়ম কলসী'র জল বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে বলিয়া মনে করা হয় এবং স্নানজলের 'প্রথম বিন্দু'-ধৃত 'নিয়ম কলসী'র জল বন্ধ্যা নারীর সন্তানোৎপাদন শক্তির অধিকারী হয়। যাই হউক, 'নিয়ম কলসী'তে স্নানজল-বিন্দু মিশ্রিত করিবা-মাত্র পাট ভক্ত্যা কলসীটি লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে পুকুর ঘাট হইতে ধর্মঠাকুরের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার কারণ, পথিমধ্যে কোনও অপদেবতার দৃষ্টি পড়িলে সেই জল ঐন্দ্রজালিক (magic) শক্তি হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে। দেব-মন্দিরে আসিয়া প্রবেশ করিলে সে ভয় আর থাকে না। পাট ভক্ত্যা বলিল, অপদেবতার দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া আজকাল বড় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য 'নিয়ম কলসী'র জলে পূর্বের মত আর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, পূর্বে এই জলে চোখ ধুইলে অন্ধেরও দৃষ্টি ফিরিয়া আসিত।

স্নানের পালা শেষ হইবার পর পুনরায় ধর্মশিলা ও ধৌত আতপ চাউল সহ ঝুড়িটি পাল্‌কিতে আনিয়া তোলা হয় এবং ভক্ত্যাগণ তাহা কাঁধে করিয়া ধীরে ধীরে

মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বাদ্যভাণ্ড পূর্ববৎ পশ্চাদনুসরণ করে। পূর্ব হইতেই শত শত গ্রামবাসী মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। তাহাদের অধিকাংশেরই হাতে এক বা একাধিক প্রদীপোপহার, সঙ্কল্প করিবার জন্য সিদ্ধ ধানের চাউল এবং নৈবেদ্যের জন্য আতপ চাউলের এক একটি পুঁটুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত আছে—একটি প্রদীপোপহার ও অপরটি সঙ্কল্পের জন্য সিদ্ধ ধানের চাউল ব্যবহার। হিন্দুর দেবপূজায় দেবতাকে ধূপ ও প্রদীপোপহার দিবার রীতি প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু বারোয়ারী পূজায় গ্রামবাসীদের প্রত্যেকের এক বা একাধিক প্রদীপ দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া দিবার রীতি অন্যত্র প্রচলিত নাই। যদিও ধর্মঠাকুর সর্বত্রই সূর্যদেবতার প্রতীকই ছিলেন এবং সেই সূত্রেই সূর্যের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহার নামে প্রদীপ উপহার দিবার প্রথার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তথাপি বর্ধমান জিলার এই অঞ্চলে আর একটি ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথাও কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না—তাহা জৈন ধর্মের প্রভাব। এ কথা সকলেই জানেন, জৈন তীর্থঙ্করদিগের নির্বাণ লাভের তিথিটিকে জৈনধর্মাবলম্বিগণ আলোকোৎসব রূপেই পালন করিয়া থাকেন। এই উপলক্ষে জৈন মন্দিরগুলি আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। বর্ধমান জিলার যে অংশের কথা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইতেছে, সেই অংশে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষাও প্রবলতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দামোদর নদের দুই তীরবর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবমন্দির-গুলিই তাহার প্রমাণ। তাহা ছাড়াও জৈন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বহু পরিচয় এই অঞ্চলের বিস্তৃত ধর্মমন্দিরগুলির ভিতর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব এ'কথা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ডেমড়া গ্রামের ধর্মঠাকুরের মন্দিরে দেবতার নামে প্রদীপোপহার উৎসর্গ করিবার রীতিটি যে এত ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার মূলে জৈনধর্মেরই প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে। দ্বিতীয় বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ—তাহা দেবতার নামে সঙ্কল্প করিতে সিদ্ধ চাউলের ব্যবহার। সকলেই জানেন, দেবকার্যে সিদ্ধ চাউল কদাচ ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ, হিন্দুর সংস্কার ও বিশ্বাস অনুযায়ী ধান সিদ্ধ হইলেই অপবিত্র হইয়া যায়। অতএব আতপ চাউল দেবকার্যে সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্মঠাকুরের পূজায় দুই এক জায়গায় ইহার ব্যতিক্রম আমি নিজেই লক্ষ্য করিয়াছি। বর্ধমান সহর হইতে দামোদর নদের অপর তীরে ক্ষুদকুড়ি নামে একটি গ্রাম আছে, সেই গ্রামে

এক উগ্রক্ষত্রিয়ের বাড়ীতে একটি ধর্মশিলা নিত্য পূজিত হইয়া থাকে—প্রতিদিন তাহাকে এক সের সিদ্ধ ধানের চাউলের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষের নিকট ধর্মঠাকুরের এই প্রকারই স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল যে, ধর্মঠাকুর আতপ চাউল আহার করিয়া তৃপ্তি পান না, তাঁহাকে যেন সিদ্ধ ধানের চাউলেরই নৈবেদ্য দেওয়া হয়—সেই অনুসারে এই রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এ'কথা আজকাল সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই প্রকার স্বপ্নাদেশ সম্পূর্ণ অর্থহীন, ইহার ভিতর কোন নিগূঢ় সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। বাঙ্গালী সিদ্ধ চাউলের অন্নভোজী, অতএব বাঙ্গালীর নিজস্ব ঘরের দেবতাকে সে আতপ চাউল ভোজন করাইয়া তৃপ্তি পায় না ; নিজে সে যাহা আহার করে, তাহাই সে দেবতাকে নিবেদন করে—নিজে যাহা আহার করে না, যাহার স্বাদ জানে না, দেবতাকে তাহা উপহার দিয়া সে প্রবঞ্চনা করিতে চাহে না। অতএব এই আচারটির ভিতর বাঙ্গালীর অধ্যাত্মবোধের একটি পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

যাই হউক, ধর্মশিলাকে পাল্‌কিতে করিয়া মন্দিরে লইয়া আসিবার পর ভক্ত্যাগণ কৃচ্ছ্রসাধনার নানা পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। সমগ্র গ্রামবাসীর পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হইয়া দাঁড়ায়। দেবকার্যে কত যে অসাধ্য সাধন হইতে পারে, নিরক্ষর গ্রামবাসী তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পরম বিস্ময় বোধ করিয়া থাকে। ধর্মঠাকুরের পাল্‌কিটি লইয়া যখন জনতা ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন একদল ভক্ত্যা জনতার অগ্রবর্তী হইযা পুকুরঘাট হইতে মাটিতে গড়াইতে গড়াইতে মন্দিরের দ্বার পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছায়। মাটিতে লুটাইয়া এই দুরূহ কার্যটি সাধন করিতে হয় বলিয়া ইহাকে 'লোটন' বলে। যে সকল ভক্ত্যা ইহাতে অংশ গ্রহণ করে, তাহাদিগকে লোটন ভক্ত্যা বলে। তাহাদের সর্বাঙ্গের ধূলি লইয়া গ্রামবাসিগণ নিজেদের গায়ে মাখে, জাতিবর্ণনির্বিশেষে তাহাদের স্পর্শকেও সকলেই পরম পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি, ভক্ত্যাগণ অস্পৃশ্য জল-অনাচরণীয় জাতি হইতেই অধিক সংখ্যায় আসিয়া থাকে ; কিন্তু এই দেবকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের অস্পৃশ্যতা দূর হইয়া যায়, সেই সময়ের জন্য তাহারা উচ্চতম বর্ণের মর্যাদা লাভ করে। বাংলাদেশের সুদূর পল্লী অঞ্চলে বর্ণাশ্রমধর্ম যে আপনার সমুচ্চ আদর্শ সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই, এই সকল লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠান হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ নিজের জাত্যভিমান ভুলিয়া গিয়া অন্ত্যজের অঙ্গের ধূলি পরম পবিত্রজ্ঞানে নিজের দেহে মাখিয়া লয়।

'লোটন' শেষ হইলেই সাধারণতঃ 'ফুলখেলা' আরম্ভ হয়। যাঁহারা আনুপূর্বিক গাজনের অনুষ্ঠান কোনদিন লক্ষ্য করেন নাই, তাঁহারা ফুলখেলা বলিতে কি বুঝায়, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন না। চোখে না দেখিলে বিষয়টির গুরুত্ব কেবল লিখিয়া বুঝাইতে পারা যাইবে না। তথাপি বিষয়টি সম্পর্কে একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিতেছি। মন্দির-প্রাঙ্গণের এক অংশে কতকগুলি কাঠের অঙ্গারে আগুন জ্বালিযা বহুক্ষণ যাবৎ হাওয়া দিয়া রক্তবর্ণ করা হইয়া থাকে। ভক্ত্যাগণ মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দেবতাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়ায়। একটি লোহার চিম্‌টা করিয়া এই জলন্ত অঙ্গারগুলি ভক্ত্যাদের এক হাতের তালুতে তুলিয়া দেওয়া হয়। এক হাতের তালুতে জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি হাত পাতিয়া লইবা মাত্র ভক্ত্যাগণ অপর হাতের তালুতে তাহা বৃত্তাকারে ফেলিয়া দেয়—পুনরায় তাহা প্রথম হাতের তালুতে লুফিয়া লয়। এইভাবে কেবলমাত্র দুই হাতের তালুর সাহায্যে জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি এক হাত হইতে অপর হাতে, অপর হাত হইতে পুনরায় সেই হাতে লইতে থাকে। অন্ততঃ বিশ পঁচিশখানি বৃহদায়তন ঢাক দামোদরের দুই কূল প্রকম্পিত করিয়া বাজিতে থাকে। ভক্ত্যাগণ তাহাদের তালে তালে নাচিতে নাচিতে এইভাবে জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি এক হাত হইতে অপর হাতের তালুতে লুফিয়া লুফিয়া লইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার সময় কোন অঙ্গারখণ্ড যদি নিভিয়া যায় অর্থাৎ ইহার ভিতর হইতে জ্বলন্ত অগ্নিকণা নিঃসৃত হইতে যদি দেখিতে না পাওয়া যায়, তবে ভক্ত্যা নিজেই সেই অঙ্গারগুলি মাটিতে ফেলিয়া দেয়, এবং তৎক্ষণাৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়া তাহার করতল পুনরায় পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। নৃত্যের তালে তালে অঙ্গারগুলি হইতে জ্বলন্ত অগ্নিকণা চারিদিকে তুবড়ীর আলোর মত ছড়াইতে থাকে, কখনও চলমান অঙ্গারগুলির মধ্য হইতে আগুনের কণা একটি অর্ধবৃত্তাকার রেখার মত ফুটিয়া উঠে। দৃশ্যতঃ ইহার 'ফুলখেলা' নামটি পরম সার্থক। দূর হইতে দাঁড়াইয়া দেখিলে মনে হয় যেন কোনও অগ্নিবর্ণ পুষ্প চারিদিকে নিজের রঙিন দলগুলি বিকীর্ণ করিতেছে। এইভাবে ভক্ত্যাগণ একবার, তিনবার কিংবা সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। বয়স এবং অভ্যাসের তারতম্য অনুসারে ইহার সংখ্যার পার্থক্য হইয়া থাকে। এই কার্যের পর ভক্ত্যাদিগের হাতের তালু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইহাতে

তাহাদের কোনই ক্ষতি হয় নাই। যাহারা সর্বদা হাতের কাজ করিয়া থাকে, তাহাদের হাতের চামড়া যথেষ্ট পুরু থাকে সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারাই যে কি ভাবে প্রায় অর্ধঘণ্টাকালীন অগ্নিস্পর্শের প্রতিক্রিয়া তাহারা বাঁচাইয়া চলে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ভক্ত্যাদিগের বিশ্বাস যথাবিধি নিয়ম পালন করিয়া এই দেবকার্য করিলে কাহারও কোনও অনিষ্ট হইতে পারে না।

তারপর ধর্মঠাকুরের মাথায় 'ফুল চাপানো'র পালা আরম্ভ হয়। 'ফুল চাপানো'র অর্থ দেবতার 'মাথায়' পদ্মফুল স্থাপন করা। গ্রামবাসিগণ এক একটি শ্বেতপদ্ম পুরোহিতের হাতে দিয়া তাহাদের নামে তাহা দেবতার মাথায় স্থাপন করিতে বলে। এক একটি উদ্দেশ্য লইয়া এক একটি ফুল চাপানো হইয়া থাকে। চাপাইবা মাত্র যদি ফুলটি পড়িয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, যে-ব্যক্তি যে-উদ্দেশ্যে ফুল চাপাইয়াছে, তাহা অবশ্য সিদ্ধ হইবে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মঠাকুর একটি শিলাখণ্ড মাত্র—'মাথা' বলিয়া তাহার কিছু নাই। ইহার উপরিভাগটিকে যদি মাথা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে তাহা এত সঙ্কীর্ণ যে তাহাতে পদ্মফুলের মত একটি বড় জিনিস রাখিলে তাহা তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইতে বাধ্য। ফুলটি পড়িয়া গেলে পুরোহিতের পক্ষেও লাভ এই যে গ্রামবাসী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আশানুরূপ দক্ষিণা দিবে; অতএব ফুল চাপাইবা মাত্রই পড়িয়া থাকে, কোনদিন আটকাইয়া থাকিতে শুনা যায় না।

সমাজের একটি নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক কার্যেও ফুল চাপানোর রীতিটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রামে কাহারও ঘরে কোনও জিনিস চুরি গেলে, যদি কাহাকেও সন্দেহ হয়, তবে তাহার নাম করিয়া ফুল চাপানো হয়—যদি ফুল পড়িয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নির্দোষ—দোষী হইলে ফুল পড়িবে না। পূর্বেই বলিয়াছি, ফুল কখনও আটকাইয়া থাকিতে শুনা যায় না, অতএব ইহা দ্বারা দোষী নির্দোষ নিরূপণ করা সম্ভব হয় না, তবে ফুল চাপানোর ভয়ে যে ব্যক্তিকে সন্দেহ করা হয়, সে প্রকৃতই দোষী হইলে তৎক্ষণাৎ অপহৃত দ্রব্য ফিরাইয়া দিয়া যায়—এ'রূপ ঘটনা গ্রামে অনেক ঘটিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

বাৎসরিক পূজার পরের দিন দুপুরের দিকে তিনটি ধর্মশিলাকেই গ্রামের প্রান্তবর্তী একটি পুকুরে পুনরায় স্নানার্থ লইয়া যাওয়া হয়। এই স্নানের তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে উৎসব উপলক্ষে জনসাধারণ ধর্মশিলা কয়টিকে স্পর্শ করিয়া যে 'অপবিত্র' করিয়াছে, স্নান দ্বারা তাহাদের শোধন করা হয়। কারণ, এইবার সর্ব-সাধারণকে ধর্মশিলার সন্নিকটবর্তী হইতে দেওয়া হয় না, কিংবা জনসাধারণও সেদিন

ধর্মশিলা স্পর্শ করিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াও মনে করে না। কিন্তু সেদিন ধর্মশিলা কয়টিকে স্নানার্থ লইয়া যাইবার স্বতন্ত্র একটি প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া থাকে; তাহা এই—দুইটি ধর্মশিলা দুইটি রাধাচক্রের মত নির্মিত 'যন্ত্রে' স্থাপন করিয়া দুইজন ভক্ত্যা ইহাদিগকে বুকের উপর লইয়া বসে; অন্যান্য ভক্ত্যাগণ রাধাচক্রারূঢ় ধর্মশিলাধারী ভক্ত্যা দুইজনকে কাঁধে করিয়া লইয়া পুকুর-ঘাটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া যায়। আর একজন ভক্ত্যা, সাধারণতঃ পাটভক্ত্যা, আর একটি ধর্মশিলা বুকের উপর স্থাপন করিয়া পাট বা কাঠের উপর বিদ্ধ লৌহ-শলাকার উপর শয়ন করে, অন্যান্য ভক্ত্যাগণ পাটশুদ্ধ ভক্ত্যাকে কাঁধে করিয়া পুকুরঘাট পর্যন্ত লইয়া যায়। পশ্চাতে বাদ্যভাণ্ড চলিতে থাকে, খর রৌদ্রে দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতা দূর করিয়া বাদ্যধ্বনি দামোদরের অপর তীরে গিয়া প্রতিহত হয়। পুকুর পাড়ে গিয়া সমবেত জনতার সম্মুখে একদিকে ধামাৎকন্নি ও পুরোহিত ধর্মশিলা কয়েকটিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্নান করাইতে থাকে, অপর দিকে ভক্ত্যাগণ বাণফোড়া জিভফোড়া প্রভৃতি দেখাইতে থাকে। বহুক্ষণ যাবৎ এই অনুষ্ঠান চলিতে থাকে, গ্রীষ্মের বেলা অবসন্ন হইয়া আসে। তখন ভক্ত্যাগণ ধর্মশিলা কয়টিকে পূর্ববৎ মন্দিরের দিকে লইয়া রওনা হয়। কেহ কেহ পায়ে ঘুঙুর বা নূপুর পরিয়া জনতার সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হয়। মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া পৌঁছিয়া ধর্মশিলা কয়টিকে সোজাসুজি মন্দিরের ভিতর লইয়া আসিয়া বেদীর উপর স্থাপন করা হয়—বৎসরের মধ্যে তাহাদিগকে আর মন্দিরের বাহিরে আনা হয় না। ইতিপূর্বেই মন্দির-প্রাঙ্গণে এক বিরাট মেলার অধিবেশন হয়, চারিপাশের পঁচিশ ত্রিশখানি গ্রামের লোক তাহাতে আসিয়া সমবেত হয়, তাহাতে আজকাল নানা রকম সস্তা বিদেশী জিনিস কেনা বেচা হয়। সেইদিনই ভক্ত্যাদের 'উতরী' খুলিয়া দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 'নিয়ম-ভঙ্গ' হয়, অর্থাৎ তাহাদিগকে আর কোনও নিয়ম পালন করিতে হয় না, তাহাদের দেব-কার্যে আর কোনও অধিকার থাকে না। কিন্তু অনুষ্ঠান সেইদিনই সম্পূর্ণ শেষ হইয়া যায় না, পরদিনের জন্যও একটি অনুষ্ঠান অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম 'ধর্মযজ্ঞ'। তাহা এই—সে'দিন ভক্ত্যাগণ মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া ধর্মরাজ ঠাকুরের নামে দুইটি পাঁঠা বলি দেয়, তারপর গ্রামের সম্পন্ন লোকদিগের নিকট হইতে নগদ চাঁদা কিংবা চাউল ও বাঁধের মাছ সংগ্রহ করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণেই উনুন কাটিয়া রান্না করে। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতেও সে'দিন অনেকে আসিয়া সেখানে সমবেত হয়। ব্রাহ্মণ পাচক রান্না করে,

—'যার পাত, তার ভাত' এই নীতি অনুযায়ী আব্রাহ্মণ সকল জাতি পাতা পাড়িয়া বসিয়া এক সঙ্গে আহার করে, ভোজনে কোনও পংক্তি বিচার হয় না। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বাৎসরিক অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, ডেমড়ার ধর্মরাজ ঠাকুরের বিস্তৃত দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। এই দেবোত্তর সম্পত্তি যাহারা ভোগদখল করে, তাহারা তাহার বিনিময়ে ধর্মরাজ ঠাকুরকে বাৎসরিক একটা খাজনা দিয়া থাকে। এই খাজনা আদায় করিবার প্রণালীর মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজার এক মাস পূর্ব হইতেই মন্দিরসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ, কিংবা সে বছর যাহারা ভক্ত্যা হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহারা, প্রতি সন্ধ্যায় একটি পাট মাথায় করিয়া যাহারা ধর্মঠাকুরের জমি ভোগদখল করে তাহাদের গৃহের প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হয়, পাটটি মাথা হইতে মাটিতে নামাইয়া রাখে। গৃহস্থ বধূগণ ধূপ দীপ জ্বালিয়া পাটটির পূজা করে এবং গৃহস্থগণ যে যাহার দেয় খাজনা তাহার নিকট আনিয়া রাখে। এই খাজনার কোনও দাখিলা কিংবা রসিদ দিতে হয় না, পুরুষানুক্রমিক এই রীতি চলিয়া আসিতেছে, কোনদিন এই লইয়া কোনও বিবাদ-বিসম্বাদও হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। এই ভাবে যে খাজনা আদায় হয়, তাহাই বাৎসরিক পূজার ব্যয়ের মূল ভিত্তি। গ্রামবাসী এই উপলক্ষে যে চাঁদা দিয়া থাকে, তাহা তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়; বর্তমান অর্থনৈতিক দুর্গতির দিনে তাহাদের নিকট হইতে ইহার বেশী কিছু আশাও করা যায় না।

বাৎসরিক পূজা ব্যতীতও মন্দিরে যে নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে, তাহার জন্য মন্দিরের দৈনিক প্রণামীর উপরই নির্ভর করিতে হয়। নিত্যপূজা দেয়াসী ও ধামাৎকন্নি কোনমতে নির্বাহ করে। ডেমড়ার ধর্মমন্দিরে ধামাৎকন্নি একজন হাজরা পদবীবিশিষ্ট উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরি। তাহার প্রধান কাজ, বার্ষিক পূজা উপলক্ষে জল-অনাচরণীয় যে সকল জাতি মন্দিরে পূজা লইয়া আসে, তাহাদের নিকট হইতে পূজা লইয়া দেবতার বেদীর উপর স্থাপন করা, তারপর তাহাদের ভোগনৈবেদ্য তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া। কলুজাতীয় দেয়াসী নিত্যপূজা করিয়া থাকে, যেদিন দেয়াসী আসিতে পারে না, সেদিন ধামাৎকন্নিই পূজা নির্বাহ করিয়া দেয়। কাহারও মানসিক বিশেষ পূজা থাকিলে কোন কোন সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরও আবির্ভাব হয়—নতুবা সমস্ত বৎসর মন্দিরে তাঁহার আর দেখা পাওয়া যায় না।

চড়ক ধর্মপূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ; কারণ, চড়ক আদিম সূর্য পূজারই একটি

আচার। ডেমড়ার অধিবাসিগণ বলিয়া থাকে যে, পূর্বে ধর্মপূজা উপলক্ষে এখানেও চড়ক হইত; কত পূর্বে যে তাহা হইত, তাহা কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারে না; কেহ যে তাহা কোনদিন দেখিয়াছে, তাহাও মনে হইল না; তথাপি গ্রামের সকলেই বলিয়া থাকে যে একদিন এই মন্দির-প্রাঙ্গণে চড়ক হইত, শত শত ভক্ত্যা প্রতি বৎসর চড়কে উঠিয়া চক্রাকারে শূন্যে ঘুরিত। কিন্তু একবার একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর হইতে তাহা বন্ধ হইয়াছে। একবার যখন নিয়মিত চড়কের অনুষ্ঠান হইতেছে এবং সেই উপলক্ষে একজন ভক্ত্যা চড়কে উঠিয়া শূন্যমার্গে চক্রাকারে দ্রুতবেগে ঘুরিয়া যাইতেছে, সেই সময় সহসা চড়কগাছের উপরকার যে একটি সরু কাঠি লম্বমান বৃহত্তর কাষ্ঠখণ্ডটিকে ধরিয়া রাখে, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়—ফলে তৎক্ষণাৎ সেই ভক্ত্যার মৃত্যু হয়। গ্রামবাসীর বিশ্বাস এই ভক্ত্যা যথারীতি নিয়ম পালন না করিয়াই চড়কগাছে আরোহণ করিয়াছিল, সেইজন্যই ধর্মঠাকুর তাঁহাকে এই শাস্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, তারপর হইতেই ডেমড়ার ধর্মরাজ মন্দিরে চড়ক বন্ধ হইয়াছে। ইহার পুনঃপ্রবর্তনের জন্য কোনও প্রয়াস আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ঘটনাটি যতদিন পূর্বেই সংঘটিত হউক না কেন, ইহার মূলে যে সত্যতা আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়; কারণ, অনুরূপ ঘটনার পর পশ্চিম বঙ্গের বহু ধর্মমন্দিরেই চড়ক বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চড়কের অনুষ্ঠানে কৃচ্ছ্রসাধনার উপর যে জোর দেওয়া হয়, তাহা হইতেই নানা দুর্ঘটনারও সৃষ্টি হইয়া থাকে—একবার কোনও দুর্ঘটনা হইলে অনুরূপ অনুষ্ঠান দেবতার অভিপ্রেত নহে বলিয়াও মনে করিয়া অনেক গ্রামবাসী তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

হিন্দুধর্মে ছুৎমার্গ এই সকল গ্রামাঞ্চলে যে কি ভাবে কার্যকরী হইয়া থাকে, তাহারও একটি পরিচয় এই অনুষ্ঠান হইতে পাওয়া যায়। পূর্বে যে 'নিয়ম কলসী'র কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার জল একজন জল-অনাচরণীয় জাতির লোক বিতরণ করিয়া থাকে। এই জলের ঐন্দ্রজালিক শক্তি (magic power) আছে, বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রামের ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাউরী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকই সমানভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে—হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্মের ছুৎমার্গ নীতি এখানে কোনও দিক দিয়া কার্যকরী হয় না। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণগণ যে সকল অঞ্চলে নিম্নতম জাতির সংস্রবে আসিয়াছেন, সেখানে দুইটি নীতি সাধারণতঃ অবলম্বন করিয়াছেন —প্রথমতঃ ব্রাহ্মণেতর সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেদের চারিদিকে এক

নিশ্ছিদ্র প্রাচীর রচনা করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণেতর সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণগণ প্রথমোক্ত এবং বাংলার পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ দ্বিতীয়োক্ত সমাজের অধিবাসী। ধর্মঠাকুরের 'নিয়ম কলসী'র জলের সঙ্গে দেবতার ভোগরূপে প্রদত্ত চিনি ও বাতাসা মিশ্রিত করিয়া জল সর্বসাধারণের মধ্যে প্রধানতঃ কলু দেয়াসীই বিতরণ করিয়া থাকে—দেবতার মন্ত্রপূত জল বিবেচনা করিয়া সকলে তাহা পান করিয়া মস্তকে ধারণ করে—সেই দেবতা কে, কোন্ মন্ত্র দ্বারা তাহা কে পবিত্র করিয়াছে, এই সকল প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না।

পূর্বে বলিয়াছি যে, বৎসরের মধ্যে দেবতাকে আর কোনদিন মন্দিরের বাহির করা হয় না। বিশেষ কারণে ক্বচিৎ তাহার ব্যতিক্রমও হয়—তবে সে রকম কারণ গ্রামে সচরাচর বড ঘটিতে দেখা যায় না। অনাবৃষ্টিই কৃষিজীবী পল্লীবাসীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুর্বিপাক। অনাবৃষ্টির সময় কোন কোন বৎসর ধর্মঠাকুরের নিকট জুড়িভোগ দেওয়া হয়, কোন কোন অঞ্চলে ধর্মঠাকুরকে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে আনিয়া কিছুকাল রাখিয়া যে শাস্তিভোগ করান হয়, এখানে সে রীতি প্রচলিত নাই। জুড়িভোগ অর্থে পায়েস ভোগ। এই পায়েস মন্দির-প্রাঙ্গণেই উনুন কাটিয়া রান্না করা হয়; তারপর দেবতাকে তাহা নিবেদন করার পর মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত লোকদিগের মধ্যেই বিতরণ করা হয়। ব্রাহ্মণ পাচক তাহা রান্না করে এবং ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জাতিই মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়া তাহা দেবতার প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

বীরভূম জেলায় 'ভাঁড়ার খেলা' নামক একটি বিষয়ও ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাহা এই প্রকার—ভক্ত্যাগণ মাথায় করিয়া এক একটা মাটির হাঁড়ি লয়। হাঁড়িটা ফুল দিয়া সাজান হয়। প্রত্যেক গ্রামের বাহিরে একটি নির্দিষ্ট পুষ্করিণীর তীরে শুঁড়িরা দেশী মদ মিশ্রিত জলে উক্ত মাটির ভাঁড় পূর্ণ করিয়া দেয়। বীরভূম জিলার প্রায় সর্বত্রই ধর্মপূজা উপলক্ষে পচাই বা দেশী মদের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। পূজা উপলক্ষে পচাইর ভাঁড় আনয়ন একটি বিশিষ্ট আচার। ভাঁড়ার মাথায় লইলে দেবতার 'ভর' হয়—ভক্ত্যা মাথা দুলাইতে থাকে, দেবতা তাহার উপর আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া সকলে বিশ্বাস করে। ভক্ত্যাগণ ভাঁড় মাথায় লইয়া মন্দিরের দিকে আসিতে থাকে, সেই সময় রোগের ঔষধ প্রত্যাশায় রোগীর আত্মীয়স্বজন, কোন কোন সময় রোগী

নিজেও, এবং বন্ধ্যা নারীগণ তাহাদের সম্মুখে মাটিতে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়ে এবং যে যাহার প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করে—কোন একটা জবাব না পাওয়া পর্যন্ত পথ ছাড়িয়া দেয় না। ভক্ত্যাগণ প্রত্যেককেই এক একটা উপায় বলিয়া দেয়, তারপর নিজেরা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হয়। মন্দিরের সম্মুখে আসিয়াও ভাঁড়ার মাথায় লইয়া কিছুক্ষণ নৃত্য চলিতে থাকে, ভক্ত্যাগণ নৃত্য করিতে করিতে মন্দির প্রদক্ষিণও করিয়া থাকে। অতঃপর ভাঁড়ারগুলি মন্দিরের বারান্দায় নামাইয়া রাখা হয়, ভাঁড়গুলি কোন গাছের নীচে ঢালিয়া দেয়। ইহাকেই 'ভাঁড়ার খেলা' বলে। বীরভূম ব্যতীত এই 'ভাঁড়ার খেলা' অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না —অতএব ইহা বীরভূমের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বলিয়াই মনে হয়।

তৃতীয় প্রকারের ধর্মপূজার নাম 'ঘর-ভরা'। ইহাকে শুদ্ধ করিয়া 'গৃহভরণ'ও বলা হইয়া থাকে। রোগমুক্তি কিংবা অন্যান্য কারণে ব্যক্তিবিশেষের নামে মানসিক করিয়া ধর্মপূজার যে আড়ম্বরপূর্ণ বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা হইয়া থাকে, তাহারই নাম ঘর-ভরা। ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, এবং ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া বহুলোকের সহায়তায় ইহা অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র নিতান্ত সচ্ছল ব্যক্তি ব্যতীত কেহই এই পূজা মানসিক করিতে পারে না—সেইজন্য ইহা বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। তবে ইহা বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলায় এখনও অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া জানিতে পারা যায়—বীরভূম ও বর্ধমানে ইহার প্রচলন এখন আর নাই বলিলেই চলে।[১] এই উৎসব ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ—এই কয়মাসের যে কোন মাসে শুক্লপক্ষের তৃতীয়ায় আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমায় সমাপ্ত হয়। বারদিন ব্যাপিয়া এই অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষে বারটি ধর্মশিলার প্রয়োজন হয় —পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে বারটি ধর্মশিলা সংগ্রহ করিয়া এক একটি করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পূজাস্থানে আনয়ন করা হয়। তারপর তাহাদের সকলের এক সঙ্গে পূজা হয়। কোন কোন প্রাচীন মন্দিরে বারটি কিংবা তাহার কিছু কম সংখ্যক ধর্মশিলা স্থায়িভাবেও রাখা হয়। তাহাদের অন্যত্র হইতে ধর্মশিলা ধার করিয়া আনিবার প্রয়োজন হয় না। 'ঘর-ভরা' অনুষ্ঠানে বারজন ভক্ত্যা ও চারিজন আমিনী (স্ত্রী বা বালা ভক্ত্যা)র প্রয়োজন হয়—এতদ্ব্যতীত প্রত্যেকটি বারটি

[১] বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত 'ঘর-ভরা' উৎসবের বিস্তৃত বিবরণের জন্য যথাক্রমে দ্রষ্টব্য বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'ময়ূর ভট্টের শ্রীধর্মপুরাণ' (কলিকাতা, ১৩৩৭) পরিশিষ্ট ; K. P. Chattopadhyaya, 'Dharma-worship', *JRASB*, Vol. VIII (1942), pp. 99-135.

করিয়া এই সকল উপকরণেরও প্রয়োজন হয়, যেমন—বার জাতির ফুল, বলির জন্য বারটি পাঁঠা, বারটি 'পাট', বারগাছি দূর্বা, বারটি সুপারি, বারটি উত্তরীয় ইত্যাদি। ধর্মপূজার সঙ্গে দ্বাদশ সংখ্যাটি যুক্ত হইবার তাৎপর্য পরে ব্যাখ্যা করিয়াছি। বর্তমানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলে যে ঘর-ভরা উৎসব হয়, তাহাতে বারজন ভক্ত্যা সকল সময় পাওয়া সম্ভব হয় না, সেইজন্য ইহা অপেক্ষা কম ভক্ত্যা লইয়াই অনুষ্ঠান পালন করা হইয়া থাকে—অর্থনৈতিক কারণের জন্য বলির বারটি পাঁঠা সংগ্রহ করিবার রীতিও পরিত্যক্ত হইয়াছে—এখন তুইটি পাঁঠাতেই এই কার্য সম্পন্ন হয়—সে কথা পরে বলিতেছি।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্দিরের সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অস্থায়ী মণ্ডপ নির্মাণ করা হয় এবং তাহাতেই সকল অনুষ্ঠান পালন করা হয়, স্থায়ী মন্দিরের মধ্যে কিছুই করা হয় না। তৃতীয়া তিথি হইতেই ঘর-ভরা উৎসবের আচারসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হইতে আরম্ভ হয়। ঐ দিন ডোমজাতীয় পুরোহিত একটি মাটির ঘট মাথায় লইয়া একটি নির্দিষ্ট 'আকাটা' পুকুর হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে জল ভরিয়া আনিতে যায়। যে পুকুর কাটা হয় নাই, আপনা হইতেই হইয়াছে, অর্থাৎ natural reservoirকেই 'আকাটা' পুকুর বলে, এই পুকুরের জলই পূজার সকল আচারের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূজার পূর্বদিন হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ কার্যের জন্য কেহ এই পুকুরের জল ব্যবহার করিতে পারে না। ঘট জলপূর্ণ করিয়া মণ্ডপের মধ্যে লইয়া আসা হয় এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত হিন্দু আচারে ইহাকে মন্দিরের মণ্ডপের মধ্যে যথারীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। তারপর বারটি ধর্মশিলাকেই পূজা করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দির হইতে বাহির করিয়া আনিয়া মণ্ডপে স্থাপন করা হয়। বারটি ধর্মশিলার মধ্যে একটি ধর্মশিলাকে প্রধান বলিয়া মনে করা হয় এবং তাহার সম্মুখেই ঘট স্থাপন করা হয়। সেইদিন ঘটভরা হইতে আরম্ভ করিয়া উৎসব শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি অনুষ্ঠান পালন করিবার সময় বাদ্যভাণ্ড বাজিতে থাকে, এই বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটি সুবৃহৎ ঢাক থাকে, ইহাদের বাদ্যে চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলিও কয়দিন ব্যাপিয়া উচ্চকিত হইতে থাকে। দ্বিপ্রাহরিক পূজা শেষ হইলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত সংস্কৃত চণ্ডীপাঠ করেন ও ডোম পুরোহিত সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ক কতকগুলি বাংলা ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকেন। তারপর ডোম পুরোহিত 'জল পাবন', 'টীকা পাবন', 'পুষ্প পাবন', ইত্যাদি বিষয়কও কতকগুলি ছড়া বলিয়া থাকেন। এই ছড়াগুলি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

ঘর-ভরা উৎসবেও তৃতীয়া তিথি হইতেই ভক্ত্যাগণের আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করিবার কথা। কিন্তু যে কারণে বাৎসরিক গাজন উপলক্ষে তৃতীয়া তিথি হইতে আজকাল আর আনুষ্ঠানিক ভাবে ভক্ত্যাগণ যোগদান করে না, সেই কারণেই ইহাতেও ভক্ত্যাগণ পূর্ণিমার পাঁচ সাত কিংবা নয় দিন পূর্বে আসিয়া যোগদান করে। বাৎসরিক ধর্মপূজার মতই ভক্ত্যাগণ ইহাতেও জাতিবর্ণনির্বিশেষে পৈতা ধারণ করিয়া পূজার সকল কার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সমানাধিকার লাভ করে। কোন কোন অঞ্চলে বালা ভক্ত্যা (স্ত্রীভক্ত্যা)-গণও 'পৈতা' ধারণ করে, তাহাদের সঙ্গেও পুরুষ ভক্ত্যাদিগের কোন পার্থক্য থাকে না, স্ত্রী বলিয়া পূজার কোন আচারে অংশ গ্রহণ করিতে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হয় না।

তৃতীয়া তিথিতেই সর্বপ্রথম সন্ধ্যার পর এক পালা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক ধর্মমঙ্গল গান হয়। ধর্মমঙ্গল গান বার দিনের চব্বিশ পালায় বিভক্ত। প্রত্যহ দুই পালা গীত হইয়া ইহা বার দিনে সমাপ্ত হইবার কথা। তবে প্রথম দিনে সন্ধ্যার পর ইহার এক পালা ও পূর্ণিমার পরের দিন সর্বশেষ পালা গীত হইয়া ইহার উপসংহার হয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এখানে ধর্মমঙ্গল গান গাহিবার প্রণালী সম্পর্কে সামান্য উল্লেখ করা যাইতেছে।

মন্দির-প্রাঙ্গণের উন্মুক্ত স্থানে, কখনও কখনও বা উপরে চাঁদোয়া টানাইয়া তাহার নীচে ধর্মমঙ্গল গানের আসর বসিয়া থাকে। ইহাতে একজন মূল গায়েন থাকে, সে পায়ে নূপুর ও হাতে চামর লইয়া নাচিয়া নাচিয়া অঙ্গভঙ্গি সহকারে ইহার আখ্যান-মূলক (narrativo) পদগুলি গাহিয়া যাইতে থাকে। তৎসঙ্গে সামান্য কিছু বাদ্যের ব্যবস্থা থাকে এবং দুই চারিজন দোহারও থাকে—তাহারা কোন কোন পদের ধুয়া ধরে। এইভাবে প্রতিদিন বৈকালে এক পালা ও রাত্রে এক পালা গীত হয়। কোন কোন অঞ্চলে প্রথম দিন রাত্রে মাত্র এক পালা এবং সর্বশেষ দিন দিনে মাত্র এক পালা গীত হয়। সর্বশেষ রাত্রির পালাটি দীর্ঘতম, বিষয়ের দিক দিয়াও গুরুত্বপূর্ণ, সেইজন্য ইহা গাহিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যায়। সেইদিন পূর্ণিমা তিথি থাকে এবং উৎসবের শেষদিন বলিয়া শ্রোতাগণও উৎসাহের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গান শুনিয়া থাকে, এইজন্য এই পালাটির নাম জাগরণ পালা।

সেইদিনই সন্ধ্যাকালে ধর্মঠাকুরকে পায়েস রন্ধন করিয়া ভোগ দেওয়া হয়—তাহাকে 'মনুই ভোগ' বলে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত সংস্কৃত মন্ত্রদ্বারা দেবতাকে ভোগ

নিবেদন করিবার পর ডোম পুরোহিত বা পণ্ডিত—একটি বাংলা ছড়া বলিয়া সেই ভোগ দেবতাকে নিবেদন করিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রে স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণের প্রভাব এই অঞ্চলে বিস্তৃত হইবার পূর্বে ডোম পণ্ডিতগণই এই সকল বাংলা ছড়া বলিয়া ইহার পৌরোহিত্যের সকল দায়িত্ব পালন করিতেন।

'মন্থই ভোগে'র পর আর একটি ছড়া বলিয়া ডোম পুরোহিত ধর্মঠাকুরকে ছোলাভাজা নিবেদন করিয়া দেন। ভোগ নিবেদন করা হইলে পর ভক্ত্যাগণ মন্থই রন্ধনের হাঁড়িটিকে সেই রাত্রেই বাদ্যভাণ্ড সহকারে জলে ভাসাইয়া দিয়া আসে।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ চতুর্থী তিথিতে ভোর বেলাতেই ডোম পুরোহিত ধর্মঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ বিষয়ক ছড়া আবৃত্তি করেন, দ্বিপ্রহরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে ধর্মঠাকুরের পূজা করেন। পূর্বদিনের মতই অন্যান্য আচার পালন করা হয়। তবে এইদিন হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রত্যহ বৈকালে একপালা ও রাত্রে একপালা করিয়া ধর্মমঙ্গলগান গীত হয়। এইরূপভাবে কয়েকদিন চলিবার পর আনুষ্ঠানিকভাবে কামিন্যা আনয়ন করিতে হয়। কামিন্যা ধর্মঠাকুরের পত্নী, তাঁহাকে ভিন্ন ধর্মঠাকুরের পূজা সম্পূর্ণ হয় না। তবে তাঁহার কোন মূর্তি কিংবা প্রতীক্ নাই, সাধারণ মৃন্ময় পূজা-ঘটেই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পঞ্চমী হইতে একাদশীর মধ্যে যে কোনদিন কামিন্যা আনয়ন করা যাইতে পারে। যেদিন কামিন্যা আনয়ন করিতে হইবে সেইদিন সন্ধ্যাকৃত্য সমাধা হইবার পর রাত্রের গান আরম্ভ হইলে, পূজার উপচার সহ ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত ভক্ত্যাগণকে সঙ্গে লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহ পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট একটি পুষ্করিণীর তীরে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে ছোট একটি মাটির ঘরে ব্রাহ্মণ কিংবা ডোম পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া তারপর কামিন্যা-ঘটে কামিন্যার আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, অধিবাস, কামিন্যা ও কামিন্যার আবরণ দেবতাদের পূজা করিয়া সেখানেই একটি ছাগ কিংবা মাগুর মাছ বলি দিয়া থাকেন। তারপর পাটভক্ত্যা বা প্রধান ভক্ত্যা মস্তকে কামিন্যা-ঘট লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে মণ্ডপে আসিয়া পৌঁছায়। এই কামিন্যা ঘট প্রধান ধর্মশিলাটির বামভাগে স্থাপন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়।

কামিন্যা আনিবার পরদিনই মণ্ডপের পার্শ্বে হিন্দোলা কাষ্ঠদ্বয় (swinging poles) পুঁতিয়া রাখিতে হয়। সেইদিন হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে ভক্ত্যাগণ ইহার নীচে ধুনা জ্বালাইয়া মাথা নীচের দিকে করিয়া দোল খায়। দোল খাইবার পূর্বে হিন্দোলা কাষ্ঠদ্বয়কে ডোম পুরোহিত আনুষ্ঠানিক ভাবে পূজা করিয়া

থাকেন। ডোম পুরোহিত এই উপলক্ষেও কতকগুলি ছড়া আবৃত্তি করেন। সেইদিন হইতে প্রত্যহ ভক্ত্যাগণ দ্বাদশ প্রকারে ধর্মঠাকুরের সেবা করিয়া থাকে, যেমন, প্রণাম সেবা অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ প্রণাম, বেতচালা অর্থাৎ স্বহস্তে স্বগাত্রে বেত্রাঘাত ইত্যাদি। ইহাকে দ্বাদশ সেবা বলে, তারপর ভক্ত্যাগণ সকলে একটি সারি দিয়া বসিয়া থাকিবে, তাহাদের কাঁধের উপর পা রাখিয়া একজন ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইবে; এইরূপ সেবা করিলে দ্বাদশ সেবায় কোন অঙ্গহানি হইলে তাহা পূর্ণ হয়।

ইহার পর প্রধান অনুষ্ঠানের নাম মুক্তা আনয়ন, মুক্তা কথাটির মুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক আছে মনে করিয়া কেহ কেহ ইহাকে এখন মুক্তি আনয়নও বলিয়া থাকেন। মুক্তা বলিতে মুক্তাহার ধান্যের আতপ চাউল বুঝায়, এই চাউলের উপরে মুক্তাদেবী বা মুক্তিদেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, আবাহন, অধিবাস, পূজা, ধর্মপূজা ইত্যাদি সম্পন্ন করিয়া সেই চাউল একটি পাত্রে স্থাপন করিয়া তাহা বাদ্যভাণ্ড সহকারে পূজার মণ্ডপে লইয়া আসা হয়। কেহ কেহ মুক্তা বা মুক্তিদেবীকে ধর্মঠাকুরের পত্নী বলিয়া মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি কৃষিব্রতের আচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেখান হইতে প্রতি বৎসর মুক্তা আনয়ন করিতে হয়, তাহা একটি নির্দিষ্ট স্থান এবং সেইস্থান পূর্ব হইতেই ইহার জন্য স্থির করা হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্বদিন বরের গৃহ হইতে যে রকম তৈলহরিদ্রা ও অধিবাস প্রভৃতি পাঠাইবার রীতি আছে, মুক্তা আনয়নের পূর্বদিনও ধর্মপূজার মণ্ডপ হইতে সেই প্রকার তৈলহরিদ্রা ও অধিবাস পাঠান হইয়া থাকে। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, মুক্তাদেবী বা মুক্তামালা ধান্যকে ধর্মঠাকুরের পত্নীরূপে কল্পনা করা হয় এবং এই পূজা উপলক্ষে তাহাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

যেদিন মুক্তা আনয়ন করিতে হইবে, সেইদিন সন্ধ্যার পর রাত্রের পালা ধর্মমঙ্গল গান আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত ভক্ত্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া একটি সুসজ্জিত চতুর্দোলায় ধর্মঠাকুরের পাদুকা প্রতীককে স্থাপন করিয়া বিবাহের সকল রকম উপকরণ, যথা মুকুট ইত্যাদি লইয়া বাদ্যভাণ্ড-সহকারে নির্দিষ্ট স্থানে গমন করে। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 'বরযাত্রী'রূপে তাহার অনুগমন করে। সেখানে উপস্থিত হইলে তত্রত্য ব্যক্তিগণ, তাহাদিগের উপযুক্ত অভ্যর্থনা দ্বারা সকলের মান্য রক্ষা করে এবং সকলকেই উপযুক্তভাবে জল খাওয়াইবার ব্যবস্থা করে। পরে তাহাদের ব্রাহ্মণ কিংবা ডোম পুরোহিত মুক্তাহার ধান্যের উত্তম আতপ চাউল পাঁচ সের একটি পাত্রে স্থাপন করিয়া ধর্মঠাকুরের দোলার নিকট আনিয়া স্থাপন করে। তখন ব্রাহ্মণ

পুরোহিত চাউলকে মুক্তাদেবী বলিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় ডোম পুরোহিত 'মুক্তা মঙ্গলা' ও ধান্যের জন্ম-বিবরণ নামক ছড়া পাঠ করেন। পরে ধর্ম ও মুক্তাকে চতুর্দোলায় স্থাপন করিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে পূজা মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হয়। মণ্ডপে আনিয়া 'মুক্তাদেবী'সহ ধর্মের দোলা যথাস্থানে স্থাপন করা হয়। এইসব কার্যে প্রায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যায়। ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মমঙ্গল গানও চলিতে থাকে।

ত্রয়োদশী তিথিতে দিনের সকল কৃত্য শেষ করিয়া বৈকাল বেলা আনুষ্ঠানিকভাবে (ceremonially) গাম্ভারী বৃক্ষ ছেদন করিতে যাইতে হয়। ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত ভক্ত্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া বাদ্যভাণ্ডসহকারে নিকটস্থ কোন গাম্ভারী বা গামার বৃক্ষের নীচে উপস্থিত হয়। বৃক্ষতলে ঘট স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ পঞ্চদেবতা, ধর্মঠাকুর, তাহার কামিন্যা ও গাম্ভারীবৃক্ষের অধিবাস, পূজা ইত্যাদি যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তারপর ডোম পুরোহিত 'গাম্ভারী মঙ্গলা' নামক এক বাংলা ছড়া আবৃত্তি করেন। তারপর প্রধান ভক্ত্যা আবার কতকগুলি বাংলা ছড়া বলিয়া কুঠার দিয়া গাম্ভারী বৃক্ষের একটা বড় ডাল ছেদন করে। সেই ডাল লইয়া সকলে কর্মকারের (blacksmith) গৃহে যায়, কর্মকার সেই ডাল দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাটা প্রস্তুত করে, প্রত্যেকটা পাটার উপর ৫।৭টা লোহার কাঁটা সংযুক্ত করিয়া দেয়। পূর্ণিমার দিন ইহার উপর ভক্ত্যাগণ ঝাঁপাইয়া পড়ে, সেইজন্য ইহার নাম ঝাঁপকাঁটা।

চতুর্দশী তিথিতেও দিনের বেলা নিয়মিত ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। পূজা শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত ভক্ত্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহযোগে সেই গ্রামের কিংবা তৎসংলগ্ন অন্য কোন গ্রামের নির্দিষ্ট গৃহস্থের বাড়ীতে যায়—সেখানে গিয়া সকলে গৃহস্থের জয়ধ্বনি করিতে থাকে এবং ভক্ত্যাগণ তাহার জয়গান করে। গৃহস্থগণ ধর্মপূজার জন্য কিছু কিছু করিয়া নগদ অর্থ দান করেন। যে সকল গৃহস্থের বাড়ীতে এই উদ্দেশ্যে যাওয়া হয়, তাহাদিগকে 'রাজা' বলে, এবং তাহাদের নিকট এইভাবে অর্থের জন্য আবেদন করাকে 'রাজা ভেটা' বলে। গৃহস্থগণ ইহাতে তাঁহাদের ইচ্ছামত অর্থ দিয়া থাকেন, ইহাতে কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

'ঘরভরা' উৎসবে ছাগবলি একটি বিচিত্র ব্যাপার। এই উপলক্ষে যে ছাগ বলি দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা উৎসবের দুই তিন বৎসর পূর্ব হইতেই ধর্ম-ঠাকুরের নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত ছাগ পূর্ব হইতে

এই ভাবে ছাড়িয়া দিবার রীতি রাঢ় অঞ্চলের বহু স্থানেই প্রচলিত আছে।[১] তবে ধর্মের ছাগ সম্পর্কে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহার সম্মুখের এক পায়ের খুরের উপর একটি লোহার বেড়ী বা ডাঁড়ুকা পরাইয়া দেওয়া হয়। ইহা দেখিয়াই ইহাকে ধর্মের ছাগ বলিয়া চিনিতে পারা যায়। কোন কোন অঞ্চলে ধর্মের ছাগকে লুযা বা লুয়ে বলে।

ঘরভরা অনুষ্ঠানে যে দুইটি পাঁঠা বলি হয়, তাহাদের মধ্যে যেটি প্রধান তাহার নাম লুয়ে। লুয়ে বলি দিয়া ইহার ছিন্ন মুণ্ডটি একটি হাঁড়ির মধ্যে পূরিয়া সারারাত সেই হাঁড়িটি কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলে বন্ধ্যা নারী পুত্র লাভ করে বলিয়া বিশ্বাস। এই উপলক্ষে কোন না কোন বন্ধ্যা নারী আপনা হইতে আসিয়া লুয়ের হাঁড়ি ধরিবার জন্য প্রার্থী হয়। বর্তমানে কোন কোন সময় এই প্রকার নারী অনুসন্ধান করিয়াও আনিতে হয়। যে ব্যক্তির স্ত্রীর লুয়ের হাঁড়ি ধরা স্থির হয়, সেই ব্যক্তি সস্ত্রীক চতুর্দশী তিথি হইতেই হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদের লুয়েকে স্নান করাইয়া আনিতে হয়, তারপর একটি হলুদবর্ণের নূতন কাপড়ে পঞ্চশস্য প্রভৃতি বাঁধিয়া তাহা লুয়ের গলায় বাঁধিয়া দিতে হয়। গ্রামের স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ সেইদিনে উপবাসী থাকিয়া ধর্মকে দীপদান করে। অনেক মেয়ে এই সময়ে মাথায় ও বক্ষে জ্বলন্ত ধুনার মালসা রাখিয়া ধুনা পোড়ায়।

ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত কর্তৃক ধর্মঠাকুরের সেইদিনের মত নির্দিষ্ট পূজা সম্পন্ন হইলে পর এই উভয় পুরোহিত সমভিব্যাহারে ভক্ত্যাগণ ঝাঁপকাঁটা, শাল-বাণ, বাণ, পূজার উপচার লইয়া ধর্মঠাকুর ও তাহার পত্নী মুক্তাকে চতুর্দোলায় চাপাইয়া লুয়ে হত ছাগকে সঙ্গে করিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে নির্দিষ্ট পুকুর বা নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথায় ডোম পুরোহিত মুক্তাতণ্ডুলগুলিকে কতকগুলি বাংলা ছড়া উচ্চারণ করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করায়। তারপর বাণ, শালবাণ, জিহ্বাবাণ, লুয়ে ছাগ, ঝাঁপকাঁটা ইত্যাদিকেও আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করাইয়া স্ত্রী ও পুরুষ ভক্ত্যাগণও স্নান করিয়া থাকে। তারপর বাদ্যভাণ্ড

---

[১] দাক্ষিণাত্যের তামিল অঞ্চলের কোন কোন লৌকিক দেবতার পূজায় পশুবলি উপলক্ষে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। যেমন,—'The buffaloes devoted for sacrifice are generally chosen sometimes beforehand by people who make vows in sickness or trouble, and then allowed to roam about the village at will.' (H. Whitehead, op. cit., p. 107.)

সহকারে সকলে পুনরায় মণ্ডপে ফিরিয়া আসে। ফিরিয়া আসিয়া ডোম পুরোহিত মুক্তাদেবীকে বসাইবার জন্য এক মণ্ডল চিত্রিত করেন, তথায় ডোম পুরোহিত মুক্তার পূজা করিয়া থাকেন। মুক্তিপূজার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান করিয়া রঙ রাখা হয়—সেই স্থানটি ধর্মঠাকুরের মণ্ডপের মধ্যেও হইতে পারে, কিংবা একটি স্বতন্ত্র চালাঘর বাঁধিয়া তাহার মধ্যেও হইতে পারে। ইহাকে মুক্তামণ্ডপ বা মুক্তি-মণ্ডপ বলে।

ডোম পুরোহিত মুক্তা তণ্ডুল ও প্রধান ভক্ত্যাকে লইয়া মুক্তিমণ্ডপে যান, সেখানে নানা দেবতার পূজা করিবার পর ডোম পুরোহিত প্রধান ভক্ত্যার দুই হাতে দুই মুষ্টি মুক্তিতণ্ডুল দিয়া, নূতন গামছা দিয়া তাহার দুইচোখ বাঁধিয়া দেন, তারপর ডোম পুরোহিত কতকগুলি ছড়া আবৃত্তি করেন। ছড়াগুলি আবৃত্তি করা শেষ হইয়া গেলে প্রধান ভক্ত্যা বা পাটভক্ত্যা সেই দুই মুষ্টি চাউল মাটিতে রাখিয়া দিয়া বাহিরে গিয়া চক্ষুর বাঁধন খুলিয়া দেয়। ডোম পণ্ডিত সেই দুই মুষ্টি চাউল লইয়া মুক্তিমণ্ডল অঙ্কিত করেন—এই মুক্তিমণ্ডলের মধ্যে ধর্মের পাদপদ্ম, কূর্ম, অনন্ত ও বাসুকিনাগ, হস্তী, দ্বারপাল, দিক্‌পাল, ইত্যাদি অঙ্কিত হয়। ইহার অভ্যন্তরস্থ কোন কোন চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য রঙিন গুঁড়ি (powder)ও ব্যবহৃত হয়। যদি কোন নারী পুত্রকামনায় এই মণ্ডল স্পর্শ করিতে চায়, তবে ডোম পুরোহিত তাহাকে দিয়া কতকগুলি বাংলা ছড়া আবৃত্তি করাইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে তাহাকে ইহা স্পর্শ করাইয়া দেন। সেই নারীকে তাহার স্বামীর সঙ্গে নিরাহারে ও অনিদ্রায় পরদিন মুক্তা বিসর্জন পর্যন্ত মুক্তামণ্ডপে বসিয়া থাকিতে হয়। ডোম পণ্ডিত ভিন্ন অপর কেহ মুক্তামণ্ডপে প্রবেশ করিতে পারে না। এমন কি ব্রাহ্মণ পুরোহিতও নয়। ডোম পুরোহিত সর্বদা মণ্ডপ বন্ধ করিয়া রাখেন।

পূর্ণিমার দিন প্রত্যূষ হইতেই ভক্ত্যাগণ ধর্মের নাম করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে থাকে। পূর্ণিমার দিন সকাল বেলা বাণ বা লৌহশলাকা ও পাট পূজা করা হয়। এই সকল লৌহশলাকা দ্বারা ভক্ত্যাগণ জিহ্বা ফুঁড়িয়া থাকে—পাটের উপর লৌহশলাকা পুঁতিয়া তারপর শয়ন করে। সেইদিনই ভক্ত্যাগণ আর একটি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহার নাম 'নবখণ্ডসেবা'। ধর্মমঙ্গল গানে যে কাহিনী গীত হয়, তাহার নায়ক লাউসেন হাকন্দ নামক পুকুরের তীরে নয় খণ্ডে দেহ খণ্ডিত করিয়া ধর্মের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়, ভক্ত্যাগণ সেই ক্রিয়ার অভিনয় মাত্র করিয়া থাকে, ইহাকেই 'নবখণ্ডসেবা' বলে। পূজা-

মণ্ডপের মধ্যেই ধর্মঠাকুরের সম্মুখে একটি চতুষ্কোণ কূপ খনন করিয়া রাখা হয়, ইহাই হাকন্দ পুকুর। ভক্ত্যারা স্নান করিয়া শালবাণ, বাণ, জিহ্বাবাণ, ঝাঁপকাঁটা, সূচীমুখ, খড়্গ, অর্ধচন্দ্র ক্ষুরধার ইত্যাদি লৌহনির্মিত অস্ত্র লইয়া মণ্ডপে উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ইহাদের যথারীতি পূজা করিয়া দেন। তখন যে সকল ভক্ত্যা 'নবখণ্ডসেবা' করিবে তাহারা মন্ত্রপাঠ করিয়া দেহের নয়টি স্থানে বাণ বা লৌহশলাকা বিদ্ধ করে। যে সকল ভক্ত্যা নয়টি লৌহশলাকা বিদ্ধ করিতে না পারে, তাহারা কেবলমাত্র জিহ্বাবাণ দ্বারা জিহ্বা বিদ্ধ করিয়া থাকে। ভক্ত্যাগণ তখন লাল রঙের পুষ্পমাল্য গলায় ধারণ করিয়া থাকে। যে সকল ভক্ত্যা দেহের নয় জায়গায় লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা হাকন্দ পুকুরের মধ্যে উপবেশন করে, পুকুরের চারিধারে চারিটি ঘাট থাকে, চারি ঘাটে চারিটি ভক্ত্যা ও ইহার চারিধারে অন্যান্য ভক্ত্যাগণ শুইয়া থাকে। নবখণ্ডসেবীদিগের দুই ধারে দুইটি ধারাল খড়্গ রাখা হয়, তারপর পুকুরের উপরিভাগ কলার পাতা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়, ভক্ত্যাদিগের মাথাগুলি কেবল উপরের দিকে বাহির হইয়া থাকে। কেহ ঘৃতের প্রদীপ জ্বালাইয়া নবখণ্ডসেবীর মাথার উপর বসাইয়া দেয়, চিত্রটিকে একটি বাস্তব রূপ দিবার জন্য কেহ আল্‌তা গুলিয়া ভক্ত্যাদেব গায়ের উপর ছড়াইয়া দেয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেন যখন নবখণ্ডে দেহ কাটিয়া ধর্মকে পূজা করিয়াছিলেন, তখন এক বাটুয়া কুকুর সেই দেহখণ্ডগুলি পাহারা দিয়া রক্ষা করিয়াছিল। এখানেও কেহ কালো কম্বল গায়ে দিয়া বাটুয়া কুকুর সাজিয়া ঘেউ ঘেউ শব্দ করিয়া থাকে। এই সময় ধর্মমঙ্গল গানের গায়কদল আসর হইতে নামিয়া এই কৃত্রিম পুকুরের ধারে ভক্ত্যাদিগের নিকটে আসে, সেখানে আসিয়া লাউসেনের নবখণ্ড সেবার কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার পুনর্জীবন লাভ ও পশ্চিমদিকে সূর্যোদয়ের বৃত্তান্ত পর্যন্ত গান করে। গান শেষ হইলে সকল ভক্ত্যাই সেখান হইতে উঠিয়া কয়েকবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ধর্মঠাকুরের আসনের নিকট গিয়া তাহাদের গা হইতে লৌহশলাকাগুলি খুলিয়া দেয়।

লুয়ে পাঁঠার মুণ্ড রাখিবার জন্য একটি বড় মাটির হাঁড়ি সংগৃহীত হয়। হাঁড়ির একটি ঢাক্‌নাও থাকে। হাঁড়ির গায়ে কিছু মন্ত্র লিখিয়া দেওয়া হয়। হাঁড়িটি একটি পুরু হলুদবর্ণের নূতন বস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া ভিতরে রক্তপুষ্প ও পঞ্চফুল দিয়া একটি চাউলপূর্ণ কুলার ওপর বসাইয়া রাখা হয়। একটি হরিদ্রাবর্ণের

বস্ত্রে পাঁচটি ফল বাঁধিয়া তাহা হাঁড়ির গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তারপর ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত ভক্ত্যা ও লুয়া ছাগটি সহ বিবিধ পূজোপকরণ লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে একটি নির্দিষ্ট পুকুরে বা নদীতে যায়। এখানে স্নান-পূজা সম্পন্ন করে, লুয়া ছাগটিকেও স্নান করান হয়। তারপর পূজোপকরণাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া সকলে মহাসমারোহে বাদ্যভাণ্ড সহকারে মণ্ডপে ফিরিয়া আসে।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক এইবার ধর্মঠাকুরের নিকট লুয়া ছাগকে উৎসর্গ করা হয়, ইহার সঙ্গে আর একটি ছাগও উৎসর্গীকৃত হয়—তাহার নাম কোল-লুয়া। ডোম পুরোহিত ছাগের জন্ম সম্বন্ধে একটি বাংলা ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে। এইবার কর্মকারজাতীয় বলিকর লুয়ার মস্তক ছেদন করে—হাঁড়িকাঠে যথারীতি লুয়া বলি হয় না, ইহার বলিদানের বিধি একটু বিচিত্র। লুয়া ফুল বেলপাতা খাইতে থাকে, বলিকর সেই অবস্থায় এক কোপে ইহার মস্তক দেহচ্যুত করে। যদি ইহাতে কোন বিঘ্ন হয়, অর্থাৎ এক কোপে মস্তক দ্বিখণ্ডিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, পূজার কোন অঙ্গহানির জন্য দেবতা বলি গ্রহণ করেন নাই, সেইজন্য পুনরায় বলির ব্যবস্থা করিতে হয়। দ্বিতীয় ছাগ বা কোল-লুয়ারও এই ভাবেই বলি হয়। ডোম পুরোহিত তখন 'দিক ডাক' ও 'কাটা মন্ত্রই' নামক ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকেন। লুয়ার মস্তক ছিন্ন হইবা মাত্র তাহা পূর্বোল্লিখিত হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন করা হয়। হাঁড়ির মুখ সরা দিয়া ঢাকিয়া, একটু ফাঁক রাখিয়া ময়দার আঠা দিয়া তাহা জুড়িয়া দিতে হয়। একটি ঘৃতের প্রদীপ হাঁড়ির উপর বসাইয়া দেওয়া হয়। তারপর হাঁড়িতে কামিন্যাদেবীর পূজা হয়। কোল-লুয়ার মুণ্ড ও রক্ত যথারীতি ধর্মঠাকুরের নামে স্বতন্ত্রভাবে লইয়া নিবেদন করা হয়।

যে বন্ধ্যা নারী পুত্র কামনা করিয়া লুয়ার হাঁড়ি ধারণ করে, তাহাকে ডোম বা পুরোহিত মন্ত্রাদি বলিয়া দিলে সে হাঁড়িটি কোলে লইয়া বসে—উপবাসী থাকিয়া সারারাত্রি জাগিয়া হাঁড়ি ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। হাঁড়ির মুখের ফাঁক দিয়া সেই মুণ্ডের উদ্দেশ্যে বারবার দুধ ঢালিয়া দেওয়া হয়—ইতিপূর্বেই মন্ত্রদ্বারা লুয়ার মুণ্ডে প্রাণসঞ্চার করা হইয়া থাকে এবং মুণ্ডটিকে নবজাত শিশুসন্তানের মত গণ্য করা হয়। তারপর লুয়ার রক্তের সঙ্গে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিত পূর্ণহোম করিয়া থাকে। তারপর ডোম পুরোহিত মুক্তিমণ্ডপের মধ্যে মুক্তি বা

মুক্তা ও ধর্মের পূজা করিয়া থাকে। তারপর ভক্ত্যাগণ সহ পূজার অন্যান্য উদ্যোক্তারা মুক্তিদর্শনের জন্য মুক্তিমণ্ডপে যায়। ডোম পুরোহিত মুক্তিমণ্ডপের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াই কতকগুলি ছড়া বলেন; ছড়াগুলির বিষয়বস্তু 'দ্বারমুক্তি', 'দ্বারভেট' ও 'বৈতরণী'। ছড়া পাঠ হইয়া গেলে সকলে মুক্তিগৃহে প্রবেশ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মুক্তির পূজা করিয়া ধর্মপাদপদ্ম ও মুক্তিমণ্ডপ দর্শন করে। সাধারণ লোকও দর্শনী দিয়া মুক্তিমণ্ডপ দর্শন করিতে পারে। ইহার পর ভক্ত্যারা ঝাঁপ-কাঁটার উপর শয়ন, কণ্টকের উপর শয়ন ইত্যাদি 'সেবা' করিয়া থাকে। ইতিপূর্বে ডোম পুরোহিত ঝাঁপকাঁটা ও কণ্টকের পূজা করিয়া দেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাত্রির পূজা সম্পূর্ণ করিয়া দিলে ডোম পণ্ডিত লুয়ার হাঁড়িতে ও মুক্তিমণ্ডপে চারি প্রহরে চারিবার পূজা করে। তারপর অর্থাৎ পূর্ণিমার পরের দিন বিসর্জনের পালা। ইহার মধ্যে মুক্তিঘট বিসর্জন, লুয়ার হাঁড়ি বিসর্জনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিত্রিত মুক্তিমণ্ডলের উপর একটি জীবন্ত হাঁস বা পায়রা ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কোন কোন স্থলে একটি জীবন্ত মাগুর মাছ (clarias Batrachus)ও মুক্তিমণ্ডলের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার ছুটাছুটিতে মুক্তিমণ্ডল ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, তারপর ডোম পুরোহিত মুক্তি বিসর্জনের কতকগুলি ছড়া আবৃত্তি করেন—ইহাতেই মন্ত্র দ্বারা মুক্তিঘটের বিসর্জন হয়, পরে সেই দিনই সেই ঘট পুকুরে লইয়া বিসর্জন দেওয়া হয়।

এইবার লুয়ের হাঁড়ি বিসর্জনের কথা বলিতে হয়। যে নারী সারা রাত্র লুয়ের হাঁড়িটি কোলে করিয়া বসিয়া থাকে, সে হাঁড়িটি এইবার মাথায় লইয়া সকলের সঙ্গে বাদ্যভাণ্ড সহ পুকুরঘাটের দিকে অগ্রসর হয়। আরও যে সকল জিনিস বিসর্জন দিবার কথা, যেমন মুক্তিঘট, পঞ্চঘট ইত্যাদি, পুরোহিত ও ভক্ত্যাগণ তাহাও সঙ্গে লইয়া তাহার পিছন পিছন যায়। পুকুরের তীরে জলের একেবারে সংলগ্ন হাঁড়িটিকে মাটিতে নামাইয়া রাখা হয়। এইবার ডোম পুরোহিত সংক্ষেপে সমগ্র ধর্মমঙ্গলের কাহিনীটি ছড়ার আকারে আবৃত্তি করেন। লুয়ার হাঁড়ি ধারণকারিণী নারী তাহার স্বামিসহ পূর্বদিকে মুখ করিয়া বসে এবং হাঁড়ির মুখের ঢাক্‌নাটি খুলিয়া ফেলে। তারপর সেই হাঁড়িটি মাটির ঢেলা দিয়া পূর্ণ করে, লুয়ের মুণ্ডটি যাহাতে মাটির নীচে ঢাকা পড়িয়া না যায় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। মাটিতে হাঁড়িটি ওজনে খুব ভারি হয়। একটি প্রদীপ পূর্ব হইতেই জ্বালাইয়া সঙ্গে লইয়া আসা হয়, তাহা ধীরে ধীরে হাঁড়ির মধ্যে নামাইয়া লুয়ার মুণ্ডের উপর

রাখিয়া দেওয়া হয়। তারপর জ্বলন্ত প্রদীপটি ভিতরে রাখিয়াই হাঁড়ির মুখটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সন্তানকামী এই নারী ও তাহার স্বামীকে সর্বক্ষণ পূর্বদিকে মুখ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। ভক্ত্যাগণ ইতিপূর্বেই জলে নামিয়া একটি খুঁটি পুতিয়া রাখে; বন্ধ্যা নারী লুয়ার হাঁড়িটি মাথায় লইয়া সেই খুঁটিটি পর্যন্ত যায় এবং হাঁড়িটি মাথায় লইয়া ডুব দিয়াই হাঁড়িটি ছাড়িয়া দেয়। মাটির ভারে হাঁড়িটি জলের নীচে তলাইয়া যায়। তারপর স্নানাদি সারিয়া সকলে মণ্ডপে ফিরিয়া আসে। মন্দিরে ফিরিয়া পরবর্তী ঘরভরা উৎসবের জন্য আর একটি লুয়ে ছাগ উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, ইহার সামনের দিকের খুরে একটি লোহার খাড়ু পরাইয়া দেওয়া হয়, ইহা দেখিয়াই সকলে ইহাকে চিনিতে পারে—কেহ ইহার অনিষ্ট করিতে সাহস পায় না।

ইহার পর ডোম পুরোহিত ছড়া বলিয়া ভক্ত্যাগণের উত্তরীয় ছাড়াইয়া দেন। সেইদিনই লুয়ার মাংস রন্ধন করিয়া ধর্মঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হয়। ইহাতেই ভক্ত্যাগণ পারণা করিয়া থাকেন। সেইদিনই ধর্মমঙ্গলের শেষ পালা গীত হয়।

ধর্মমঙ্গল গান 'ঘর ভরা' অনুষ্ঠানের অন্তর্নিবিষ্ট একটি আচার। 'ঘর ভরা' অনুষ্ঠান ব্যতীত ধর্ম-পূজার যে নিত্য ও বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাতে সাধারণতঃ ধর্মমঙ্গল গান হয় না। তবে ধর্মপূজার বাৎসরিক অনুষ্ঠানে যে দিন সমারোহপূর্ণ উৎসব হইত, তখন শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি হইতে পূর্ণিমার পরের দিন এক বেলা পর্যন্ত ধর্মমঙ্গল গান হইত বলিয়া জানিতে পারা যায়। নিত্যপূজায় ধর্মমঙ্গল গান হইত না। কিন্তু যদি কাহারও মানসিক থাকিত, তবে যাহার গৃহে ধর্মঠাকুরের নিত্যপূজা হইত, তাহার গৃহেও ধর্মমঙ্গল গান শুনিতে পাওয়া যাইত। বরিশাল জিলায় মনসামঙ্গল সম্পর্কিত রয়াণী গান যেমন সাত দিনে, পাঁচ দিনে কিংবা আড়াই দিনেও গাহিবার ব্যবস্থা ছিল, ধর্মমঙ্গল গান সম্পর্কে সে রকম কোনও রীতি প্রচলিত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় না। ইহার সংক্ষিপ্ত কোনও রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী

ধর্মমঙ্গল গানের যে কাহিনীটি ঘর-ভরা অনুষ্ঠানের বার দিনে চব্বিশ পালায় গীত হয়, তাহা এখানে বর্ণনা করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। সেইজন্য তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল—

গৌড়ে ধর্মপাল নামক একজন বিখ্যাত সম্রাট্ ছিলেন ; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গৌড়ের সম্রাট্ হন। গৌড়েশ্বরের একজন মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার নাম মহামদ—তিনি সম্পর্কে গৌড়েশ্বরের শ্যালক। একদিন গৌড়েশ্বর হস্তীতে আরোহণ করিয়া শিকার করিতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, তাঁহার একজন অত্যন্ত অনুগত প্রজা সোম ঘোষ তাঁহারই মন্ত্রীর চক্রান্তে কারারুদ্ধ হইয়া বন্দিজীবন যাপন করিতেছেন। তিনি মন্ত্রীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্রী ইহার কোন সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারিলেন না। গৌড়েশ্বর ইহাতে মন্ত্রীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রচুর ভর্ৎসনা করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া সোম ঘোষের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। রাঢ়ে অজয় নদের তীরে ত্রিষষ্ঠীর গড়ে তাঁহার একজন সামন্ত রাজা বাস করিতেন, তাঁহার নাম কর্ণসেন, সেই কর্ণসেনের উপর তাঁহাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া অচিরে তাঁহাকে সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। সোম ঘোষের একটি শিশুপুত্র ছিল, তাহার নাম ইছাই। তিনি তাহাকে লইয়া ত্রিষষ্ঠীর গড়ে চলিয়া গেলেন। গৌড়েশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত তাঁহার তত্ত্বাবধায়ককে কর্ণসেন পরম সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। কালক্রমে সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ অত্যন্ত দুর্দান্ত হইয়া উঠিল। সে একদিন অকস্মাৎ কর্ণসেনের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া গড় হইতে তাড়াইয়া দিল, কর্ণসেন সপরিবারে গৌড়ে পলাইয়া গেলেন, ইছাই নূতন গড় নির্মাণ করিয়া তাহার নাম রাখিল ঢেকুর। গৌড় হইতে যখন রাজকর আদায় করিতে আসিল, তখন গৌড়রাজের কর্মচারীকে ইছাই অপমানিত করিয়া দূর করিয়া দিল। গৌড়েশ্বর মনে করিলেন, ইহার জন্য ইছাইকে সমুচিত দণ্ড দিবেন। তিনি নয় লক্ষ সৈন্য লইয়া ঢেকুর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু অজয় নদের বন্যায় তাঁহার সৈন্য বিনষ্ট হইল, তিনি অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া কোন মতে গৌড়ে ফিরিয়া আসিলেন, ইহাতে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হইল, ছয় পুত্রবধূ তাহাদের সঙ্গে সহমরণে গেল,

শোকে দুঃখে রাণী আত্মঘাতিনী হইলেন, এই আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া কর্ণসেন পাগল হইয়া গেলেন।

কর্ণসেনের অবস্থা দেখিয়া গৌড়েশ্বরের বড় দয়া হইল। তিনি পুনরায় তাহাকে সংসারী হইবার জন্য পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কর্ণসেন কোন কথাই কানে তুলিলেন না। গৌড়েশ্বরের এক কুমারী শ্যালিকা ছিল, তাহার নাম রঞ্জাবতী। গৌড়েশ্বর মনে করিলেন, তাহার সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দিয়া পুনরায় তাহাকে সংসারধর্মে আসক্ত করিবেন। কিন্তু এই বিবাহের একটি গুরুতর অন্তরায় ছিল। রঞ্জা রাজমন্ত্রী মহামদের অত্যন্ত প্রিয় ভগ্নী ছিল, মহামদ কিছুতেই তাহাকে এক বৃদ্ধের সহিত বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইবেন না, গৌড়েশ্বর ইহা জানিতেন। সেইজন্য গৌড়েশ্বর তাহার রাণীর সঙ্গে যুক্তি করিয়া এক কৌশল অবলম্বন করিলেন, তিনি কোন রাজকার্য উপলক্ষ্য করিয়া মন্ত্রী মহামদকে কামরূপে পাঠাইয়া দিলেন। এই সুযোগে কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে বহু দূর দক্ষিণে ময়নানগরের সামন্তরাজ নিযুক্ত করিয়া সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। মহামদ বিবাহের কথা জানিতেও পারিলেন না। কামরূপ হইতে ফিরিয়া মহামদ এই বিবাহের কথা শুনিলেন। রাজা কৌশল করিয়া তাঁহার একমাত্র ভগ্নীকে এক বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া রাজার উপরই তাঁহার ক্রোধ হইল—কিন্তু রাজাকে তিনি এ'জন্য কিছুই বলিতে পারিলেন না, সেই ক্রোধ গিয়া তাঁহার ভগ্নীপতি কর্ণসেনের উপর পড়িল; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, জীবনে এই বৃদ্ধের মুখদর্শন করিবেন না, সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নীর সঙ্গেও তাঁহার সকল সম্পর্ক ঘুচাইয়া দিবেন।

বহুদিন যাবৎ রঞ্জাবতী মাতাপিতার কোন সংবাদ পাইতেছিলেন না, সেইজন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এই অবস্থায় তিনিই বা গৃহে ফিরিয়া কি বলিয়াছেন, তাহাও জানিবার জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না। রঞ্জাবতী স্বামীকে গৌড়ে যাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বিনা আমন্ত্রণে তিনি যাইতে চাহিলেন না। অবশেষে রঞ্জাবতীর কাতর অনুনয় উপেক্ষা করিতে না পারিয়া গৌড় যাত্রা করিলেন। তিনি গৌড়ের রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মহামদ প্রকাশ্য রাজসভায় তাঁহাকে আঁটকুড়া ও তাঁহার পত্নীকে বন্ধ্যা বলিয়া নিন্দা করিলেন, গৌড়েশ্বর ইহার কোন প্রতিবাদ করিলেন না। অপমান ও লজ্জা মাথায় লইয়া তিনি নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। রঞ্জাবতী সকল কথা শুনিয়া স্বামীর এই নিদারুণ

অপমানের জন্য অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন ; তিনিও প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন ভ্রাতার কথা আর মনেও স্থান দিবেন না। তখন হইতে তিনি বন্ধ্যা অপবাদ ঘুচাইবার জন্য নানাপ্রকার তুক্‌তাক্ ঔষধ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। একদিন ধর্মঠাকুরের পুরোহিত রামাই পণ্ডিত ধর্মের গাজন লইয়া সেই নগরে প্রবেশ করিলেন। রামাই পণ্ডিতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিলেন, ধর্মঠাকুরের পূজা করিলে পুত্রলাভ হয়। শুনিয়া রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের পূজা করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি নগরে ধর্মের মন্দির নির্মাণ করিয়া দিলেন এবং বিবিধ উপায়ে ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তিনি পুত্রলাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি ধর্ম পুরোহিত রামাই পণ্ডিতের শরণাপন্ন হইলেন। রামাই বলিলেন, 'ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া যদি তুমি শালে ভর দিতে পার, তবে অবশ্যই তুমি পুত্রলাভ করিবে।' শালে ভর দিবার অর্থ লৌহ-শলাকার উপর ঝাঁপাইয়া পড়া। রঞ্জাবতী তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু কর্ণসেন তাঁহাকে এই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। রঞ্জাবতী সে কথা শুনিলেন না। অবশেষে কর্ণসেন আর বাধা দিতে পারিলেন না, শালে ভর দিয়া তাঁহার ধর্মপূজা করিবার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন। রঞ্জাবতী পূজার দ্রব্যসামগ্রী লইয়া চাঁপাই নদীর তীরে আসিয়া ধর্মঠাকুরের পূজা করিলেন, পূজা-শেষে লৌহ-শলাকায় ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া তাহাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখিয়া ধর্মঠাকুরের দয়া হইল, তিনি সশরীরে আবির্ভূত হইয়া রঞ্জাবতীর প্রাণদান করিয়া পুত্রবর দিয়া গেলেন। যথা সময়ে রঞ্জাবতীর এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল—তাহার নাম লাউসেন। শৈশবেই লাউসেনের আর একটি খেলার দোসর জুটিল, তাহার নাম কর্পূরসেন। দুই পুত্র লইয়া রঞ্জাবতীর জীবন সুখে কাটিতে লাগিল। যথাসময়ে লাউসেন ও কর্পূর মল্লবিদ্যা শিক্ষা করিলেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় অল্পদিনেই তাঁহারা মল্লবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন, বড় বড় মল্লবীরকে বাহুবলে পরাজিত করিতে লাগিলেন। মাতা-পিতার শিক্ষার গুণে ও ধর্মঠাকুরের আশীর্বাদে লাউসেন আদর্শ-চরিত্র যুবক হইয়া উঠিলেন। লাউসেন কর্পূরকে সঙ্গে লইয়া গৌড়ে গিয়া তাঁহাদের মেসো মহাশয় গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। বৃদ্ধ রাজা কর্ণসেন ও রাণী রঞ্জাবতী ইহাতে বড় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন—কিন্তু লাউসেন ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না। বাধ্য হইয়া অবশেষে মাতাপিতাকেও সম্মতি দান করিতে হইল। শুভদিন দেখিয়া

লাউসেন ও কর্পূর গৌড়ের পথে যাত্রা করিলেন। গৌড়ের পথে লাউসেন একটি দুর্দান্ত ব্যাঘ্র ও একটি নরমাংসখাদক কুম্ভীরকে বধ করিলেন। পথের বিপদ এখানেই শেষ হইল না। জামতী নামক স্থানে একটি কুচরিত্রা নারী লাউসেনকে বিপন্ন করিবার জন্য চক্রান্ত করিল, কিন্তু তাহার চক্রান্ত ব্যর্থ হইল। তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া লাউসেন ও কর্পূর গোলাহাটে প্রবেশ করিলেন; গোলাহাট স্ত্রীরাজ্য, তাহার রাণীর নাম সুরীক্ষা। সুরীক্ষা কতকগুলি হেঁয়ালী জিজ্ঞাসা করিয়া লাউসেনকে বন্দী করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু তিনি সকল হেঁয়ালীরই সন্তোষজনক উত্তর দিয়া তাহার হাত হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। রাজমন্ত্রী মহামদ ভাগিনেয়ের আগমনের সংবাদ পূর্ব হইতেই সংগ্রহ করিলেন এবং তাহাকে নানাভাবে বিপন্ন করিবার জন্য চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। মহামদ লাউসেন ও কর্পূবকে চোর বলিযা প্রতিপন্ন করিবার জন্য নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, কাহারও গৃহে যদি কোন প্রবাসী ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। লাউসেন ও কর্পূর এক তামুলীর গৃহে আশ্রয় লইযাছিলেন—লাউসেন তাহাকে নিরাপদ করিবার জন্য তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া এক বৃক্ষতলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মহামদের নির্দেশে রাজার পাটহস্তী লইয়া তাঁহার শিয়রে বাঁধিয়া রাখা হইল। তারপর তাঁহাকে হাতী-চোর বলিয়া ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। লাউসেন রাজার সম্মুখে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিলেন, রাজা তাঁহার পরিচয় পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। অবশেযে নিজের অশ্বশালা হইতে সর্বোত্তম অশ্বটি তাঁহাকে দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। বিবিধ রাজপ্রদত্ত সম্মানে ভূষিত হইয়া লাউসেন ও কর্পূর স্বদেশের পথে যাত্রা করিলেন। পথ হইতে তের জন ডোমকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার রাজ্যে লইযা গেলেন, তাহাদের মধ্যে যে প্রধান তাহার নাম কালু। কালু ডোমকে লাউসেন নিজের সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ডোমগণ পরম ভক্তির সঙ্গে লাউসেন ও তাহার পরিবারস্থ সকলের সেবা করিতে লাগিল। রাজমন্ত্রী মহামদ লাউসেনকে অপদস্থ করিবার জন্য নূতন নূতন উপায় সন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কামরূপের রাজা ইতিমধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, লাউসেনকে তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইবার জন্য মহামদ গৌড়েশ্বরকে পরামর্শ দিলেন। গৌড়েশ্বর নিতান্ত ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ, মন্ত্রী তাঁহাকে যখন যাহা করিতে বলেন, তিনি তখন তাহাই করেন। তিনি লাউসেনকে আসিয়া কামরূপ

আক্রমণ করিবার জন্য পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। লাউসেন তাঁহার সেনাপতি কালু ডোমকে সঙ্গে করিয়া গৌড় যাত্রা করিলেন, গৌড় হইতে সৈন্য লইয়া কামরূপ-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। লাউসেন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নদীর জল কানায় কানায় পূর্ণ—নদী পার হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অবশেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, গৌড়েশ্বরের মাতার নিকট একটি কাটারি ও একটি জপমালা আছে—কাটারির স্পর্শে ব্রহ্মপুত্রের জল শুকাইয়া যায় এবং জপমালার সাহায্যে সহজেই কামরূপ অধিকার করা যায়। লাউসেন গৌড়েশ্বরের মাতার নিকট হইতে কাটারি ও জপমালা চাহিয়া আনিয়া কাটারির সাহায্যে ব্রহ্মপুত্র অতি সহজেই অতিক্রম করিলেন এবং জপমালার সাহায্যে কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে মন্দির হইতে দূর করিয়া দিয়া সহজেই কামরূপ অধিকার করিলেন। কামরূপের রাজা লাউসেনের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পরমা-সুন্দরী কন্যা কলিঙ্গাকে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। লাউসেন বিজয়-গৌরবে গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গৌড় হইতে গৃহে ফিরিবার পথে মঙ্গলকোটের রাজা গজপতির কন্যা অমলাকে বিবাহ করিয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন। বর্ধমানের রাজাও তাহার কন্যা বিমলাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। মাতাপিতা তাঁহাদিগকে পরম আহ্লাদের সহিত বরণ করিয়া লইলেন।

সিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কানড়ার রূপযৌবনে মুগ্ধ হইয়া গৌড়েশ্বর বৃদ্ধ বয়সে তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। হরিপালের নিকট ঘটক প্রেরিত হইল। হরিপাল বিবাহে সম্মতি দিলেন, কিন্তু কানড়া তাহাতে আপত্তি করিলেন এবং গৌড়েশ্বরের ঘটককে অপমানিত করিয়া দূর করিয়া দিলেন। গৌড়েশ্বর এই অবমাননায় ক্রুদ্ধ হইয়া নয় লক্ষ সৈন্য লইয়া সিমুলায় উপস্থিত হইলেন। কানড়া গৌড়েশ্বরকে একটি লৌহনির্মিত গণ্ডার দিয়া বলিলেন, যে ইহা এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিবে, তিনি তাহাকেই বিবাহ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। বৃদ্ধ রাজা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও লৌহগণ্ডারের গায়ে একটু আঁচড়ও ফুটাইতে পারিলেন না। রাজমন্ত্রী মহামদের পরামর্শে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে ডাকাইয়া আনিলেন। লাউসেন অনায়াসেই গণ্ডার দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। কানড়া লাউসেনকে স্বামিরূপে বরণ করিতে চাহিলেন, ইহাতে গৌড়েশ্বর লাউসেনের উপর অপ্রসন্ন হইলেন। অবশেষে লাউসেনের সঙ্গে কানড়ার এই চুক্তিতে যুদ্ধ হইল যে, লাউসেন যদি কানড়ার হাতে পরাজিত হন, তবে কানড়াকে বিবাহ

করিবেন। যুদ্ধে লাউসেন কানড়ার হস্তে পরাজিত হইয়া তাহাকে নিজেই বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। গৌড়েশ্বর বিফলকাম হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। লাউসেন কানড়াকে সঙ্গে লইয়া নিজের রাজধানী ময়না নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

মহামদ এইভাবে বার বার চেষ্টা করিয়াও যখন লাউসেনের কোন ক্ষতি করিতে পারিলেন না, তখন আবার এক নূতন ফন্দি বাহির করিলেন। তিনি গৌড়েশ্বরকে পরামর্শ দিলেন যে ঢেকুর গড়ে ইছাই গোয়ালা বহুদিন যাবৎ স্বাধীনভাবে বাস করিতেছে—গৌড়ে রাজকর পাঠাইতেছে না; অতএব লাউসেনকে তাহার বিরুদ্ধে পাঠাইয়া তাঁহাকে দিয়া গৌড়ের রাজকর আদায় করা হউক। গৌড়েশ্বর ভাবিলেন, এ অতি উত্তম প্রস্তাব; তিনি অবিলম্বে লাউসেনকে গৌড়ে আসিতে পত্র লিখিলেন। রঞ্জাবতী ও কর্ণসেন এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন; কারণ, ঢেকুরেই কর্ণসেন একদিন ইছাই গোয়ালার হাতে পরাজিত হইয়া ছয় পুত্র হারাইয়া পথের ভিক্ষুক হইয়াছিলেন। লাউসেন সকলের আপত্তি উপেক্ষা করিয়া গৌড়েশ্বরের অনুমতি লইয়া নয় লক্ষ সৈন্য সহ অজয় নদের অপর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ইছাইর সেনাপতি লোহাটা বজ্জরের সঙ্গে তাঁহাদের তুমুল সংগ্রাম হইল। লোহাটা পরাজিত হইল, লাউসেন লোহাটার ছিন্ন মস্তক গৌড়েশ্বরের নিকট উপহার পাঠাইলেন। মহামদ এই মুণ্ড দ্বারা লাউসেনের একটি মায়ামুণ্ড প্রস্তুত করিয়া ময়না নগরে পাঠাইলেন। মায়ামুণ্ড দেখিয়া লাউসেনের বৃদ্ধ মাতাপিতা পুত্রশোকে কাতর হইয়া পড়িলেন এবং লাউসেনের চারিজন স্ত্রী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ধর্মঠাকুর তাহা জানিতে পারিয়া হনুমানকে ছদ্মবেশে সেখানে পাঠাইয়া প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া সকলে নিশ্চিন্ত হইল। ইছাই ঘোষের সঙ্গে লাউসেনের তুমুল যুদ্ধ হইল। দুইজনই দুইজনের সমকক্ষ বীর। লাউসেন ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত, আর ইছাই পার্বতীর আশ্রিত। অতএব এখানে মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র, প্রকৃত যুদ্ধ দেবতাদিগের মধ্যে—একদিকে ধর্মঠাকুর লাউসেনকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট হইয়া আছেন, আবার অপর দিকে পার্বতীও তাঁহার ভক্ত ইছাই ঘোষকে রক্ষা করিতে তৎপর। অবশেষে লাউসেনই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। ইছাই অপূর্ব বিক্রম দেখাইয়াও তাঁহার হস্তে নিহত হইলেন। রাজমন্ত্রী মহামদ দেখিলেন, লাউসেন ধর্মঠাকুরের ভক্ত বলিয়া এত পরাক্রমশালী হইয়াছেন, অতএব তিনিও পরাক্রম লাভের জন্য ধর্মঠাকুরের পূজা করিতে প্রবৃত্ত

হইলেন। কিন্তু তাঁহার সকাম ভক্তিতে ধর্মঠাকুর বিরক্ত হইয়া তাঁহার পূজায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিলেন—গৌড় নগরে অবিরাম বাদলের বর্ষণ আরম্ভ হইল, কিছুতেই তাহার নিবৃত্তি দেখা গেল না, সমস্ত নগর জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বিপন্ন হইয়া গৌড়েশ্বর লাউসেনের শরণাপন্ন হইলেন। লাউসেন গৌড় রাজ্যের সমস্ত পাপ দূর কবিবার জন্য ধর্মপূজার শ্রেষ্ঠ সাধনা পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় ঘটাইবার জন্য হাকন্দ নামক স্থানে গিয়া দুশ্চর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্মঠাকুরের নামে নিজের দেহ নয় খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাহা দ্বারা আহুতি দিলেন। যখন লাউসেন ধর্মপূজার এই কঠিনতম সাধনায় নিমগ্ন, তখন তাহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া মহামদ ময়না নগর আক্রমণ করিলেন। কালু ডোমের পত্নী লখাই ডোম্‌নীর সঙ্গে মহামদেব তুমুল যুদ্ধ হইল। একা লখাই মহামদের বিপুল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাহাকে সসৈন্যে নদীর তীর পর্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া আসিল। কালু ডোম নিজের সত্যরক্ষা করিবার জন্য বিশ্বাস-ঘাতকের হাতে নিজের প্রাণ বলি দিল। লাউসেনের অক্লান্ত সাধনায় তুষ্ট হইয়া ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতাকে অমাবস্যার রাত্রে পশ্চিম দিকে উদিত হইবার জন্য আদেশ দিলেন। রাজ্যের সকল অমঙ্গল দূব হইয়া গেল। লাউসেন সগৌরবে গৌড়েশ্বরের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহামদ লাউসেনের পশ্চিমে সূর্যোদয়ের ব্যাপারকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য হরিহর নামক বাদ্যকরকে ঘুষ দিয়া বাধ্য করিয়া রাখিলেন। কিন্তু ধর্মভয়ে হরিহর সত্যকথা প্রকাশ করিয়া দিল। মহামদ প্রকাশ্য রাজসভায় চরম লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। এই সকল অপকর্মের জন্য মহামদের উপর ধর্মঠাকুর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হইবার অভিশাপ দিলেন—দেখিতে দেখিতে কুষ্ঠব্যাধিতে তাঁহার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। লাউসেন দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে রোগ হইতে আরোগ্য করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহার দুষ্কার্যের শাস্তিস্বরূপ তাঁহার মুখে একটি শ্বেতকুষ্ঠের চিহ্ন রাখিয়া দিলেন। ধর্মঠাকুরের পূজা এইভাবে মর্ত্যে প্রচার করিয়া লাউসেন যথাকালে পুত্র চিত্রসেনকে রাজ্যভার দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

পশ্চিম বাংলার লৌকিক ধর্মবিষয়ক আলোচনায় ইহার সংলগ্ন অঞ্চল মানভূমের একটি বিশেষ স্থান আছে। একমাত্র পূর্ব দিক ব্যতীত মানভূমের আর সকল দিকই ছোটনাগপুরের আদিম জাতির বাসভূমির সহিত সংযুক্ত। এক সময়ে এই জিলার সমগ্র অঞ্চল জৈনধর্ম কর্তৃক বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল—ইহার লোক-

সংস্কৃতিতে এখনও তাহার সুস্পষ্ট প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও সময় সময় বিচ্ছিন্নভাবে ইহাতে আসিয়া কিছু কিছু উচ্চশ্রেণীর হিন্দুও বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তথাপি ইহার অধিবাসীদিগের মধ্যে এখনও ব্যাপক আর্যেতর জাতির প্রভাব বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গের আদিম অধিবাসী-দিগের মত ইহাদের উপর হিন্দুপ্রভাব তত কার্যকরী হইতে পারে নাই। এই জিলার উত্তরাংশে সামান্য কিছু অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র ধর্মঠাকুরের পূজা সর্বত্র পরিচিত। কিন্তু পূজার প্রণালীর মধ্যে পূর্ব-বর্ণিত পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত প্রণালী হইতে পার্থক্য আছে; এই পার্থক্যটুকু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। বাঁকুড়া জিলার সংলগ্ন কোন কোন গ্রামে পশ্চিম বঙ্গের অনুরূপই ধর্মপূজার অনুষ্ঠান হইলেও, মানভূম জিলার একটু অভ্যন্তরেই ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত ঘুটিতোড়া গ্রামে নিম্নলিখিত উপায়ে ধর্মঠাকুরের পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

এই অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজা দুই প্রকার—বাৎসরিক এবং মানসিক। বাৎসরিক পূজা বৈশাখী পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয় না,—বৈশাখী পূর্ণিমার পরবর্তী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি বারোয়ারী ধর্মতলা আছে, সেখানে খড়ো চালের একটি 'মন্দির'ও আছে; কিন্তু 'মন্দিরে' কোন ধর্মশিলা নাই। প্রতিবার বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে তিন মাইল দূরবর্তী আচকোদা গ্রামের এক ডোমের বাড়ী হইতে একটি ধর্মশিলা আনিয়া লওয়া হয়। নাপিত জাতীয় এক ব্যক্তি ধর্মশিলাটি মাথায় করিয়া লইয়া আসে,—পিছনে বাদ্যভাণ্ড বাজিতে থাকে। পুরুষানুক্রমিক নাপিত এই কার্য করিয়া আসিতেছে, এইজন্য তাহার পরিবার গ্রামের পক্ষ হইতে বৃত্তি ভোগ করিয়া থাকে। রাঢ়ীয় শ্রেণীর একজন ব্রাহ্মণ পূজায় পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। পূর্বে চড়ক হইত বলিয়া শোনা যায়, এখন তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রতি বৎসর বাৎসরিক পূজায় তিন চারিজন ভক্ত্যা হয়, তাহারা পূজার সকল আনুষঙ্গিক কার্যে পুরোহিতকে সাহায্য করে, মূল ভক্ত্যা 'পাট' মাথায় লইয়া তাহা পুকুরঘাট হইতে স্নান করাইয়া আনে। পূজার পর দিনই নাপিত বাদ্যভাণ্ড সহকারে মাথায় করিয়া ধর্মশিলাটিকে ডোমের বাড়ী ফিরাইয়া দিয়া আসে।

মানসিক পূজায়ই বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত কিংবা পরিবারস্থ কাহারও কল্যাণ-কামনায় ধর্মপূজা মানসিক করা হইয়া থাকে। অভীষ্ট পূর্ণ হইলে পূজার ব্যবস্থা করা হয়। এই পূজা বৎসরের শুক্লপক্ষের যে কোন রবিবার অনুষ্ঠিত হইতে পারে, রবিবার ব্যতীত অন্য কোন দিন হইতে পারে না। পূজা অনুষ্ঠিত

হইবার পূর্বে পূজা মানসিককারী ব্যক্তি দ্বাদশটি রবিবার ধর্মের নামে উপবাস পালন করিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ যে কেহ এইভাবে মানসিক করিয়া উপবাস পালন করিতে পারে, তবে স্ত্রী-মানসিককারিণীর সংখ্যাই সাধারণতঃ অধিক হইয়া থাকে। দ্বাদশটি রবিবারে উপবাস পালন করার পর, ধর্মের যে পূজা হইয়া থাকে, তাহাতে একটি সাদা রঙের পাঁঠা বলি দেওয়া হয়; পশুবলি যাঁহাদের কৌলিক প্রথার বিরোধী, তাঁহারা উক্ত সাদা রঙের পাঁঠার ডান কানটি সামান্য মাত্র কাটিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দেন।[১] পাঁঠাটি বলি দিবার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে—পূর্বাকাশে যখন সূর্যোদয় হয়, সেই মুহূর্তে পাঁঠাটি বলি দিতে হয়। বর্তমানে যদিও মানভূমে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণই এই পূজায় পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন, তথাপি এই উপলক্ষে একজন 'দেওঘরিয়া' ব্রাহ্মণকে আহ্বান করা হইয়া থাকে এবং তাঁহাকেও এই উপলক্ষে তাঁহার প্রাপ্য দান করা হয়। ইহাতে মনে হয়, উচ্চবর্ণ হিন্দুর গৃহে কিছুকাল পূর্বেও 'দেওঘরিয়া'-গণই পূজায় পৌরোহিত্য করিতেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, যেমন শুঁড়ি প্রভৃতির গৃহে এখনও নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণই পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। পূজায় যে সাদা রঙের পাঁঠাটি বলি দেওয়া হয়, পূজা মানসিক করিবার সময়ই তাহার পায়ে একটি লোহার খাড়ু পরাইয়া ধর্মের নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, আর্থিক সুবিধাই ইহার একমাত্র কারণ। ইহার গায়ের রঙ ও পায়ের খাড়ু দেখিয়াই ইহাকে সহজে চিনিতে পারা যায়—সেইজন্যই কেহ ইহার অনিষ্ট করিতে সাহস পায় না। মানভূমে প্রচলিত মানসিক ধর্মপূজার এই প্রণালী হইতে স্পষ্টতই অনুভূত হইবে যে, ধর্মপূজা সূর্যপূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে, কিন্তু ইহার বার্ষিক পূজার আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না।

যদিও পশ্চিম বঙ্গের সংলগ্ন অঞ্চলের উচ্চতর হিন্দু সমাজে ধর্মপূজা প্রচলিত আছে, তথাপি মানভূম জিলার অভ্যন্তরে অনেক অঞ্চলেই উচ্চতর হিন্দু সমাজে ধর্মপূজার প্রচলন নাই। মানভূম জিলার পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে বহু রাঢ়ীয় ও কান্যকুব্জ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস। বাঁকুড়া জিলার সংলগ্ন পুঞ্চা থানার অধীনস্থ রাঢ়ীয়

---

[১] দাক্ষিণাত্যের বেরিলী জিলাতেও 'people who do not approve of the slaughter of animals cut off the right ear of a goat or sheep and, after carrying it round the temple, offer it to the pujari' (H. Whitehead, op. cit. 75). কেবলমাত্র কানটি কাটিয়া লৌকিক দেবতার নামে পশু ছাড়িয়া দিবার রীতি উত্তর ভারতের অন্যত্রও প্রচলিত আছে। (দ্রষ্টব্য W Crooke, *The Tribes and Castes of the Western Provinces and Oudh*, London, 1896, p. 163.)

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও ধর্মপূজা অপ্রচলিত—তাঁহারা মনে করেন যে, ধর্মঠাকুর নিম্নশ্রেণীর বিশেষতঃ ডোম জাতির দেবতা,—তাঁহাদের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই অঞ্চলের উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলাগণ কোন কোন রবিবারে কিংবা ধর্মঠাকুরের বার্ষিক পূজার দিন ধর্মের নামে উপবাস পালন করিয়া থাকেন। মানভূম জিলার চন্দনকেয়ারী থানার অন্তর্গত এক গ্রামের অধিবাসী এক কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ পরিবারের পুরুষগণ ধর্মপূজাকে ছোট জাতির ধর্মানুষ্ঠান বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন, কিন্তু সেই পরিবারেরই মহিলাগণ ধর্মের মানসিক করিয়া কোন কোন রবিবার তাঁহার নামে উপবাস পালন করিয়া থাকেন —পুরুষদিগের সহানুভূতির অভাবে বাড়ীতে কোন পূজার অনুষ্ঠান হয় না।

মানভূম জিলার একমাত্র ধানবাদ মহকুমার উত্তরাংশ ব্যতীত আর সর্বত্রই নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে ধর্মপূজা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত আছে। বাউরী এবং ডোমজাতিই ধর্মের সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ভক্ত। মানভূম জিলার ডোম জাতির মধ্যে দুইটি শ্রেণী আছে,—একটি মঘৈয়া বা তুরী, অপরটি বাঙ্গালী। ইহাদের জাতিগত পরিচয়ও বিভিন্ন—প্রথমোক্ত শ্রেণী যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের কোন অনার্যজাতির বংশধর; দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ বাঙ্গালী ডোম বাংলা দেশের অধিবাসী কোন আদিম জাতির শাখার সন্তান। মানভূমের অধিবাসী বাঙ্গালী ডোম বলিয়া পরিচিত সমাজই ধর্মের সর্বাপেক্ষা উৎসাহী সেবক, মঘৈয়া কিংবা তুরী ডোমদিগের সঙ্গে ধর্মপূজার কোন সম্পর্ক নাই। মানভূম জিলার প্রায় সর্বত্রই বাঙ্গালী ডোম বিক্ষিপ্ত ভাবে বাস করিয়া থাকে। তবে মহাল, ঝরিয়া, নোয়াগড, করুহা, কল্যাণপুর—এই সকল অঞ্চলেই ইহাদের বসতি কিছু ঘন। মানভূমের বাঙ্গালী ডোমদিগের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, সেইজন্য ইহাদের সামাজিক অনুষ্ঠান স্বভাবতঃই নিতান্ত দারিদ্র্যব্যঞ্জক; অতএব ধর্মপূজারও কোন সুপরিণত প্রথা ইহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সাধারণতঃ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতেই তাহাদের এই পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আর্থিক কারণেই সাধারণতঃ কোন পশুবলিরও ব্যবস্থা হইতে পারে না। এই উপলক্ষে কিছুদিন পূর্ব হইতেই তাহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। চন্দনকেয়ারী থানার অন্তর্গত মহাল গ্রামের দুবে পদবীবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ জমিদারগণও ধর্মের নামে মানসিক করিয়া তাঁহার বার্ষিক পূজা উপলক্ষে তাঁহাদের পূজার উপকরণ ডোমের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন— নিজেদের গৃহে পূজার কোন অনুষ্ঠান করেন না। এই অঞ্চলেই পূর্বোল্লিখিত এই

প্রবাদটির সাক্ষাৎকার লাভ করা গিয়াছে,—'আর কোথাও জায়গা পেলে না, শেষে ডোমের বাড়ী উঠ্‌লে গিয়ে ধর্মঠাকুর।'

মানভূমের বাউরীগণও ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ধর্মপূজার কোন নির্দিষ্ট তারিখ নাই, প্রথাও অত্যন্ত শিথিল। কোন কোন সময় এই উপলক্ষে একটি শূকর বলি দেওয়া হয়। অন্যথায় পাঁঠা বলির প্রথাই ব্যাপক। পাঁঠার রঙ্‌ সাদা কিংবা কালোও হইতে পারে, কিন্তু সূর্যোদয় মুহূর্তই বলি দেওয়ার সময়। পাঁঠার অভাবে সাদা রঙের মুরগীও চলে।

মানভূম জিলায় কুর্মি জাতির লোকই সংখ্যায় অধিক। একমাত্র ধানবাদ মহকুমা ব্যতীত আর প্রায় সর্বত্রই কুর্মি জাতির মধ্যে ধর্মপূজার প্রচলন আছে। সিংহভূম ও রাঁচি জিলার সংলগ্ন অঞ্চলের কুর্মিগণ ধর্মকে সূর্য বলিয়াই পূজা করে। তাহাদের মধ্যে ধর্মের নামে উপবাস পালন করিবার কোন রীতির প্রচলন নাই, অভীষ্ট কামনায় তাঁহার নামে মানসিক করা হয় এবং তাহা পূর্ণ হইলে, যে কোন দিন সূর্যোদয়ের মুহূর্তে ধর্মের নামে একটি সাদা মুরগী বলি দিয়া তাঁহার পূজা করা হয়। পূর্বোক্ত বাউরী ও কুর্মিদিগের মধ্যে এই দেবতার কোন মন্দির কিংবা কোন মূর্তি নাই।

মানভূম জিলার সীমা অতিক্রম করিয়া আরও দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণে রাঁচি ও সিংহভূম জিলার ছোটনাগপুরের আদিম জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই অঞ্চলের আদিম জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে ধর্ম বা ধরম নামক এক দেবতার অস্তিত্ব আছে। প্রত্যেক জাতিরই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতার (Supreme Deity) সঙ্গে তাঁহাকে অভিন্ন মনে করা হইয়া থাকে এবং সর্বত্রই তাঁহাকে সূর্যদেবতা বলিয়াই মনে করা হয়। এমন কি, ছোটনাগপুরের অনার্য জাতি অধ্যুষিত অঞ্চল অতিক্রম করিয়া এক দিকে উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত ও অপর দিকে মধ্যভারতের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসী আদিম জাতিব সকল বিভিন্ন শাখার মধ্যেই ধর্মপূজার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বত্রই এই সকল আদিম জাতির উপাস্য সূর্যদেবতার সঙ্গেই তাঁহাকে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয়।

ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতি তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতাকে 'ধর্মেশ' নামে অভিহিত করিয়া থাকে।[১] তাঁহার আদিম জাতীয় নাম 'বিরিবেলাস'ও কখনও ব্যবহৃত

[১] Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal* (Calcutta, 1872), 256

হয়। ইহার অর্থ সূর্য রাজা বা সূর্য প্রভু।[১] দেবতার রঙ্ সাদা, সাদা রঙের পাঁঠা কিংবা মুরগী তাঁহার নিকট বলি দিতে হয়। এই দেবতার নিকট কিছু প্রার্থনা করিবার সময় পূর্ব দিকে মুখ করিয়া লওয়া হয়। দুষ্কৃতকারীকে ধর্মেশ দৃষ্টিহীনতা ও কুষ্ঠরোগ দিয়া থাকেন। এই প্রকার মুণ্ডা, হো, বীরহোর, খন্দ, খরিয়া, ভুইঞা, বোণ্ডা, জুয়াঙ্, শবর (শেওরা), সাঁওতাল, কোরোয়া, পার্বত্য খরিয়া, মালে বা সৌরিয়া পাহাড়িয়া প্রভৃতি বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসী অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী প্রত্যেক আদিম জাতির মধ্যেই ধর্ম কিংবা সম-উচ্চার্য কোন শব্দের নামীয় এক সূর্য দেবতার অস্তিত্ব আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উত্তর বিহারে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত করম একাদশী ব্রতের করম ও তাহার ভ্রাতা ধরমের সঙ্গে এবং ছোটনাগপুরের আদিবাসী সমাজের পরিকল্পিত অনুরূপ কর্মা ও ধর্মার সঙ্গে সূর্যরূপে পূজিত ধরমঠাকুরের বা 'ধরম দেওতা'র কোন যোগ নাই। কোন কোন অঞ্চলে ইনি স্থানীয় অনার্য নামেও অভিহিত হন ; কিন্তু তাঁহার পূজার প্রণালীর মধ্যে কোথাও কোন পার্থক্য নাই। বাংলার পূর্ব সীমান্ত-সংলগ্ন আসাম প্রদেশের অধিবাসী কোন কোন ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জাতির শাখার মধ্যেও এক অনুরূপ সূর্যদেবতার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।[২] আসামের অন্তর্গত ফায়েঙ্লুই'র পার্বত্য জাতি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে (April) সাদা রঙের একটি মোরগ ও একটি পায়রা বলি দিয়া সূর্যদেবতার পূজা করে। মণিপুর অঞ্চলের মাও নাগাগণও একটি সাদা রঙের মোরগ বলি দিয়া সূর্যদেবতার পূজা করে। আসামের মিকির নামক উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসী এক পার্বত্য জাতিও সাদা রঙের মুরগী বা পাঁঠা বলি দিয়া আরনাম পারো নামক এক সূর্যদেবতার পূজা করিত। উত্তর-পূর্ব ভারতের সাংতাম নামক নাগাজাতির অন্য এক শাখার মধ্যেও সাদা মোরগ বলি দিয়া সূর্যোদয়ের মুহূর্তে সূর্যপূজার প্রচলন আছে।[৩] এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে করা হইয়াছে যে, পূর্বভারতে প্রাচীনকালে সূর্য-পূজক এক আদিম জাতি বাস করিত, তাহাদের প্রভাব যে কোন কারণেই হউক, আসাম হইতে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে—

---

১ S. C. Ray, *Oraon Religion and Custom* (Ranchi, 1928), 19

২ T. C. Das, 'Sun-worship Amongst the Aboriginal Tribes of Eastern India', *J. D. L.* Vol. XI (1924), 93

৩ C. R. Stonor, 'The Feasts of Merit Among the Northern Sangtam Tribe of Assam,' *Anthropos* XIV (Jan-Jun, 1950), 8.

সেইজন্য এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী দৃশ্যত পরস্পর স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন জাতীয় লোকের মধ্যে এখনও ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বলাই বাহুল্য যে, যাহা আসাম হইতে মধ্যপ্রদেশের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার প্রভাব হইতে বাংলাদেশও কোনরূপেই মুক্ত ছিল না। নিম্নলিখিত আলোচনা হইতেই বাংলাদেশেও লৌকিক কতকগুলি সূর্যোপাসনার প্রণালীর অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যাইবে এবং পশ্চিম বঙ্গের ধর্মপূজা যে মূলতঃ উক্ত আদিম জাতির সূর্যপূজার উপরই প্রতিষ্ঠিত তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে।

উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রেবন্ত নামক এক দেবতার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কতকগুলি অর্বাচীন পুরাণের মতে তিনি সূর্যের পুত্র। তাঁহার নামের ব্যুৎপত্তিগত কোন সঙ্গত অর্থ সংস্কৃত অভিধানে সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। বাংলা দেশেও বহু রেবন্তমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইলে বাংলাদেশে এই দেবতা কোথা হইতে আসিলেন? কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, ইনি বাংলার লৌকিক ধর্ম (Folk religion) হইতে ক্রমে অর্বাচীন পুরাণের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন,—তাঁহার পূজা সূর্যপূজারই অঙ্গ হইয়া গিয়াছে।[১] কিন্তু দেবমূর্তিটিকে সর্বত্রই অশ্বারূঢ় দেখিতে পাইয়া আবার কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, আর্যেতর জাতির সঙ্গে যখন অশ্বের সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে, তখন এই দেবতার 'মূলে ভারতীয় সূর্য-পূজার বৈদিক ও পারসিক ধারার সম্মিলিত প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল।' কিন্তু অশ্বের সঙ্গে রেবন্তের সম্পর্ক পরবর্তী কালেও স্থাপিত হওয়া অসম্ভব নহে। এই ভাবেই আর্য প্রভাব বহির্ভূত অঞ্চলে উদ্ভূত হইয়াও ধর্মঠাকুর বাংলা দেশে মাটির ঘোড়া উপহার লাভ করিয়া থাকেন। আর্য ও পারসিক প্রভাবের পরবর্তী প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় লৌকিক সূর্য দেবতাই অশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাংলাদেশের মেয়েরা রালদুর্গা নামক এক দেবতার ব্রত করিয়া থাকে। এই 'রাল' শব্দটি 'রাতুল' অর্থাৎ সূর্য শব্দটিরই আধুনিক রূপ। এই 'রাল' যদিও মেয়েদের হাতে পড়িয়া দুর্গায় রূপান্তরিত হইয়াছেন, তথাপি ইনি পুরুষদেবতা সূর্য ব্যতীত আর কিছুই নহেন। তাঁহার ব্রতকথায় তাঁহাকে কুষ্ঠরোগের আরোগ্যকারী ও পুত্রসন্তানদাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে।[২]

H. B. I. 400 ; নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (১৯৪৯), ৬২৭

আশুতোষ মজুমদার, মেয়েদের ব্রতকথা (কলিকাতা, ১৯৪৭), ১৭৮

পশ্চিম বাংলায় আরও একটি লৌকিক সূর্যদেবতা আছেন, তাঁহার নাম ইতু। শব্দটিকে অনেকেই 'মিত্র', অর্থাৎ সূর্য, শব্দ হইতে জাত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা আদিত্য শব্দ হইতে জাত।[১] অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার এই ব্রত পালন করা হয়, সংক্রান্তি দিন ব্রত শেষ হয়। পূর্ববঙ্গে জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি দিন এই পূজা হইয়া থাকে, এই অঞ্চলে এই ব্রতের নাম করমাদি ব্রত এবং দেবতার নাম করমঠাকুর বা করমপুরুষ। বলা বাহুল্য, কোন পুরাণ কিংবা হিন্দুর ধর্মসম্পর্কিত গ্রন্থে করমঠাকুর নামক কোন দেবতার উল্লেখ নাই। পূর্ববঙ্গের কোন কোন পরিবারে চাউলের গুঁড়া দিয়া নির্মিত একটি ক্ষুদ্র পুরুষমূর্তি করমঠাকুর রূপে পূজিত হন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, রিজ্‌লি পশ্চিমবঙ্গের ডোমদিগের সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি দিন মৎস্যপুচ্ছবিশিষ্ট একটি পুরুষমূর্তিকে ধরম অথবা ধরমরাজ বলিয়া পূজা করে। মনে হয়, রিজ্‌লি কর্তৃক উল্লিখিত এই ধরম ও পূর্ববঙ্গে পূজিত এই করম অভিন্ন। অতএব করমঠাকুর যখন ইতু, আদিত্য বা সূর্যদেবতার সঙ্গে এক, তখন ধরম দেবতাও সূর্য ভিন্ন আর কিছুই নহেন। করমঠাকুর বা করমপুরুষ ধরমঠাকুরেরই এক স্বতন্ত্র নাম। ধরমঠাকুরের নীচ জাতির সঙ্গে সংস্রবের জন্য ধরমঠাকুর নামের পরিবর্তে করমপুরুষ বলিয়া তিনি পূজিত হইতেছেন। মূলতঃ ইহাদের উদ্ভব এক।

পূর্ববঙ্গে সূর্যোপাসনার আরও কয়েকটি লৌকিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাও সাধারণতঃ মেয়েদের মধ্যেই প্রচলিত। প্রথমটির নাম সূর্যের ব্রত। ইহা ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলেই প্রধানতঃ প্রচলিত আছে। তবে এই সমস্ত বিভিন্ন স্থানে ইহাদের আচারে কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। মাঘ মাসের কোন রবিবার গৃহাঙ্গিনায় জ্বলন্ত ঘৃতপ্রদীপ হাতে লইয়া সূর্যের দিকে মুখ করিয়া ব্রতিনীগণ সারাদিন দাঁড়াইয়া থাকে। সমস্ত দিন উপবাস পালন করিতে হয়; সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর ব্রতিনীগণ স্থান ত্যাগ করিয়া সামান্য জলযোগ করিতে পারে। চট্টগ্রাম জিলায় ইহার আচার স্বতন্ত্র ও বিস্তৃততর।[২] এতদ্ব্যতীত তপা ব্রত ও মাঘমণ্ডল ব্রত নামক দুইটি কুমারীব্রত সূর্যেরই ব্রত, কুমারী মেয়েরা এই ব্রত পালন করিয়া থাকে। এই সকল ব্রত-পার্বণ ব্যতীতও যে কোন রবিবার সূর্যের নামে উপবাস পালন করিবার রীতি বাংলা দেশের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য একমাত্র মেয়েরাই এই প্রকার উপবাস পালন করিয়া থাকে, পুরুষের সঙ্গে

[১] আদিত্য > আইত্ত, > ইত্ত, ইত, ইতু; [২] *JAnth S B*, XIII, 316-17.

ইহার কোন সম্পর্ক নাই। উপরের দৃষ্টান্তগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাংলা দেশে আর্যসভ্যতা বিস্তৃত হইবার পর যে বৈদিক ও পৌরাণিক সূর্যপূজা এ'দেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহাদের পার্শ্বে সূর্যপূজার আর কয়েকটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ধারারও অস্তিত্ব রহিয়া গিয়াছে। যদিও ইহাদের মধ্যে কালক্রমে আর্য উপকরণ কতকটা প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি ইহাদের মৌলিক স্বাতন্ত্র্যও সহজেই অনুভব করা যায়।

পূর্বোক্ত পূর্ব ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক সূর্যোপাসনা পূর্ববঙ্গে যেমন উল্লিখিত বিভিন্ন লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া আত্মরক্ষা করিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া আছে, তেমনই রাঢ় অঞ্চলে একমাত্র ধর্মপূজার ভিতর দিয়া ইহার অস্তিত্ব রক্ষা পাইয়াছে। যদিও এই অঞ্চলে পরবর্তী বৌদ্ধ ও হিন্দুপ্রভাবের ফলে ইহার মৌলিক পরিচয় স্বভাবতঃই অনেকটা প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি এই পূজার আচার ও ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আখ্যায়িকাসমূহ সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, ইহাদের মধ্য হইতে উক্ত আদিম সূর্যোপাসনারই মৌলিক উপাদানসমূহের সন্ধান পাওয়া যাইবে। তাহা হইলে ধর্মঠাকুর প্রকৃত পক্ষে কে? এই বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ধর্মঠাকুরের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির কথা স্পষ্ট স্মরণ রাখিতে হইবে। পূর্ববর্তী আলোচনায় এই সকল বৈশিষ্ট্যের কোন কোনটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি এখানে তাহা সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) চৈত্র মাস হইতে আষাঢ়ের অনাবৃষ্টির কয় মাসই তাঁহার বার্ষিক পূজার অনুষ্ঠান হয়। (২) আনুষ্ঠানিক স্নান তাঁহার বার্ষিক পূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। (৩) তিনি বন্ধ্যার সন্তান বর দাতা। (৪) পশুবলি তাঁহার পূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। (৫) তিনি সর্বশুক্ল বলিয়া কল্পিত হন, শুক্ল উপহারে তাঁহার তুষ্টি। (৬) তিনি চক্ষুরোগের পরিত্রাতা। (৭) তিনি ভয়ঙ্কর (malignant) দেবতা—অবিশ্বাসীকে কুষ্ঠরোগ দিয়া তিনি শাসন করেন। (৮) মাটির ঘোড়া উপহারে তাঁহার তৃপ্তি। (৯) তাঁহার নিকট দ্বাদশ সংখ্যাটি পবিত্র। (১০) ডোম তাঁহার পূজারী—এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিয়া এখন দেবতার প্রকৃত পরিচয় স্থাপন করিতে হইবে।

ধর্মরাজ ঠাকুরের পূর্বোদ্ধৃত প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রটির দুই একটি বিশেষণ ব্যতীত সমস্ত গুণাবলীই সূর্যদেবতারই উপর প্রযোজ্য। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা

যায় যে, সূর্যদেবতারই প্রাচীনতর একটি ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর পরবর্তী বৌদ্ধ ও হিন্দুপ্রভাবের যুগে এই ধ্যানমন্ত্রটি নূতন করিয়া রচিত হইয়াছে।

এমন কি যে শূন্যমূর্তি কথাটির উপর ভিত্তি করিয়া স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মপূজাকে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও সূর্যেরই একটি গুণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। 'ধর্মপূজাবিধানে' সূর্যকে শূন্যদেব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা 'শূন্যদেবং দিবাকরম্।'[১] অতএব এই শূন্যমূর্তির সঙ্গে বৌদ্ধ শূন্যবাদের সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের কোন সম্পর্ক নাই। এতদ্ব্যতীত 'ধর্মপূজাবিধানে'র বহু স্থলেই ধর্মকে সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হয়—এই জন্য যথার্থই ইহাতে বর্ণিত ধর্মঠাকুরকে সূর্য বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।[২]

ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে রাঢ়দেশে যে সকল লৌকিক আখ্যান প্রচলিত আছে, তাহা হইতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম সূর্য ব্যতীত আর কিছুই নহেন। ধর্মমঙ্গল কাহিনীর নায়ক লাউসেনকে স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'ললিত-বিস্তরে'র নায়ক বুদ্ধদেবের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন।[৩] কিন্তু শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বলিয়া এই মত খণ্ডন করিয়াছেন যে, 'the resemblance is not however very great and the similarity may be due to borrowing of details from one mythological tale by another, without the necessity of equating Buddha with Dharma. If any equation is justifiable then Lausen has to be equated to the hero of *Lalitavistara* which leaves the question at issue unsolved. But a detailed examination does not justify any such identification. For example, Lausen's mother sacrifices herself in order to get a son, and is again brought back to life. Buddha's mother dies within a few days after the birth of her son. The two circumstances are quite different.'[৪] তবে এই লাউসেন প্রকৃতপক্ষে যে কে, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই, তাহারই এখানে অবতারণা করা যাইতেছে।

১ ধর্মপূজাবিধান ৮৯

২ Sashibhusan Das Gupta, *Obscure Religious Cults* (Calcutta, 1946) 337-9.

৩ *J. A. S. B.* (1895), 65-8.

৪ K. P. Chattopadhyaya, op. cit. p. 131.

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে লাউসেনকে সর্বত্রই কশ্যপের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—তবে তিনি ধর্মের পূজা মর্ত্যলোকে প্রচার করিবার জন্য কর্ণসেনের ঔরসে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার নাম কশ্যপ-তনয় বলিয়াই বার বার উল্লেখ করা হইয়াছে। সূর্যকেও পুরাণাদিতে কশ্যপের পুত্র বা কাশ্যপেয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে।[১] যদিও ইহা বর্তমানে সূর্যের একটি গতানুগতিক বিশেষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপি ইহার মূলে যে একটি বিশিষ্ট জনশ্রুতি ছিল, তাহা স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যায়। এইজন্য মনে হয়, লাউসেন ও সূর্য অভিন্ন।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লাউসেনের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ব্যবহারের জন্য আণ্ডীরপাখর নামক এক ঘোড়ারও জন্ম হইল। ধর্মমঙ্গলের কবিগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই আণ্ডীরপাখর সূর্যের ঘোড়া। ঘনরাম চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,—'জন্মিল সূর্যের বাজী ভক্তের কারণ।' লাউসেন তাঁহার সমগ্র জীবনে এই পরম বিশ্বস্ত অশ্বটির কখনও সঙ্গচ্যুত হন নাই। দেহত্যাগের সময় ইহাকে সঙ্গে লইয়াই তিনি স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেও স্পষ্টত লাউসেন ও সূর্যের অভিন্নতা বুঝিতে পারা যায়।

লাউ কথাটির সঙ্গে সূর্যের কি সম্পর্ক আছে, তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারা যায় না; কিন্তু সম্পর্ক যে কিছু একটা আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেমন উত্তর বিহারের হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত সূর্যপূজা বা ছট্‌পূজার দিন তথাকার প্রত্যেক গৃহস্থের লাউ বা অলাবুর তরকারী খাইতে হয়।[২] লাউ পাওয়া না গেলে অগত্যা লাউয়ের পাতা দিয়াই তরকারী রান্না করিতে হয়। ইহা হইতেও সূর্যের সঙ্গে লাউ বা অলাবুর সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়। সূর্য অর্থে রাতুল শব্দ হইতে লাউ শব্দ উৎপন্ন হওয়াও আশ্চর্য নহে। এই সম্পর্কে আরও একটি কথা মনে হইতে পারে। বাংলার সূর্যব্রতের ছড়ায় সূর্যের নাম লাউল। শব্দটি সংস্কৃত রক্তুতুল্য হইতে রত্তউল্ল > রাতুল, রাউল, লাউল এইভাবে গঠিত হইয়াছে। রাঢ়দেশে কর্ণসেনের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হইবার পূর্বে লৌকিক সূর্যদেবতা লাউল নামেই পরিচিত হইতেন বলিয়া মনে হয়, অতঃপর কর্ণসেনের পুত্র বলিয়া লাউল শব্দটিকে লাউসেনে পরিবর্তিত করিয়া লওয়াও কিছুই আশ্চর্য নহে। উক্ত লাউল

[১] তুলনীয়ঃ প্রচলিত সূর্যস্তব—জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

[২] *JAnth S. B.* XIII, 319

শব্দটি সংক্ষেপে লাউ হওয়া সম্ভব। অতঃপর অলাবু লাউর সঙ্গে ইহার গোলযোগ (confusion) সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

রূপরামের ধর্মমঙ্গলে লাউসেনকে 'লাম্বাদিত্য' (বা লালু+আদিত্য) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কথাটির মধ্যে 'আদিত্য' কথাটি আছে; বলা বাহুল্য, ইহা দ্বারাও লাউসেনকে আদিত্য বা সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়।

ধর্মমঙ্গল কাহিনীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যখন পুত্র-কামনায় রঞ্জাবতী ধর্মের নামে শালে ভর দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন স্ত্রীহত্যার পাপ সূর্যকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। ধর্ম তৎক্ষণাৎ রঞ্জাবতীর মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করিয়া তাহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। ধর্ম ও সূর্য যদি এক না হয়, তবে ধর্মের কার্যের জন্য সূর্যকে কেন দায়ী করা হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ধর্মমঙ্গল কাহিনীতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় করাই ধর্মপূজার শ্রেষ্ঠ সাধনা। লাউসেন পশ্চিমে সূর্যোদয় নিষ্পন্ন করিয়াই ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবকরূপে খ্যাতিলাভ কবিয়াছিলেন। ধর্মপূজাদ্বারা সূর্যের গতি নিয়ন্ত্রণের যে কথা এখানে বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই মনে হয় যে, ধর্মপূজার সঙ্গে সূর্যপূজার নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। ধর্মপূজায় সিদ্ধিলাভ করিলে, সূর্যের গতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার জন্মে—ইহার অর্থই এই মনে হইতে পারে যে, ধর্ম ও সূর্য অভিন্ন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে বলা হইয়াছে, ধর্ম দুষ্কৃতকারীকে কুষ্ঠরোগ দিয়া শাসন করিয়া থাকেন। লাউসেনের সঙ্গে বিবাদ করিবার ফলে মহামদ পাত্র কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন, ধর্মনিন্দা করিবার ফলে মার্কণ্ড মুনিও তদবস্থা প্রাপ্ত হন। আজ পর্যন্তও পশ্চিম বঙ্গের ধর্মঠাকুরের দেয়াসিগণ কুষ্ঠরোগের প্রতিষেধকরূপে নানা টোট্‌কা ঔষধাদি দিয়া থাকে। বিহারের অন্তর্গত নালন্দায় একটি সূর্যমন্দির আছে। তাহাতে বহু দূরবর্তী অঞ্চল হইতে কুষ্ঠরোগিগণ আসিয়া সমবেত হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহাদের নামে সূর্যদেবতার পূজা দেয়, পূজান্তে মন্দিরসংলগ্ন এক পুষ্করিণীতে রোগিগণ স্নান করিয়া থাকে। উক্ত প্রদেশের গয়া জিলার গোবিন্দ-পুর নামক গ্রামেও অনুরূপ একটি সূর্য মন্দির আছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসী ওরাওঁ জাতির সূর্যদেবতা ধর্মেশও সামাজিক দুষ্কৃতকারীকে কুষ্ঠরোগ দ্বারা শাসন করিয়া থাকেন। বাংলাদেশে প্রচলিত মেয়েলি রালদুর্গাব্রতেও সূর্যকে কুষ্ঠরোগ-আরোগ্যকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সূর্যের

সঙ্গে কুষ্ঠরোগের সম্পর্ক পরবর্তী কালে স্থাপিত হইয়াছে। এই বিষয়ে অনুমিত হইয়াছে যে, ম্যগী বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সূর্যদেবতার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিবার গুণটি প্রাচীন পারস্য হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়।[১] এই অনুমান যথার্থ বলিয়া মনে হয়। ম্যগী বা শকদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের বিশিষ্ট সূর্যোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের এই বিশেষ গুণটিও এ'দেশে প্রচার করিয়া থাকিবেন। তাহা হইতেই পরবর্তী কালে তাহা সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণগুলিতেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ময়ূরভট্ট নামক একজন সংস্কৃত কবি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া আরোগ্য কামনায় সূর্যের নামে একশত সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন,—তাহা 'সূর্যশতক' নামে পরিচিত।[২] জনশ্রুতি এই যে, ইহার ফলে তিনি কুষ্ঠরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করেন। ময়ূরভট্ট খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন বলিয়া মনে করা হয়। পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, কৃষ্ণের পুত্র শম্ব পিতার শাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। আরোগ্য-কামনায় তিনি নারদের পরামর্শে পাঞ্জাবের অন্তর্গত এক তীর্থস্থানে গিয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা সূর্যকে প্রসন্ন করেন। অবশেষে সূর্যের বরে তিনি রোগমুক্ত হন।[৩] উড়িষ্যার কণারকের সূর্যমন্দির সম্বন্ধেও এই কাহিনীটি প্রচলিত আছে। পরবর্তী কালে কণারক সূর্যমন্দিরের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য এই পৌরাণিক কাহিনীটি ইহার সম্পর্কে উল্লেখিত হইত।

ঋগ্বেদে সূর্য, সবিতৃ, মিত্র প্রভৃতি দেবতাকে রোগ-আরোগ্যকারী দেবতা বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই, বরং রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এই গুণ আছে বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু কুষ্ঠরোগের সঙ্গে তাহাদের কাহারও কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। মনে হয়, পরবর্তী কালে শকদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব বশতঃ পৌরাণিক সাহিত্যে কুষ্ঠরোগের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা হইতেই ক্রমে অন্যান্য কোন কোন রোগ সম্পর্কে এই ধারণা প্রসার লাভ করিয়াছে।

ধর্মঠাকুরের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি অপুত্রককে পুত্রসন্তান দান করিয়া থাকেন। ধর্মমঙ্গল কাহিনীর মধ্যে মহিষী মদনা ও রাণী রঞ্জাবতী উভয়েরই ধর্মের বরে পুত্রসন্তান লাভের কথার উল্লেখ আছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বর্ধমান জিলার আসানসোলের নিকটবর্তী ডেমরা নামক গ্রামে যে

[১] দিলীপকুমার বিশ্বাস, 'ভারতীয় সূর্যপূজার একটি বৈশিষ্ট্য', সা-প-প, ৫৭, ২৫-৪৩

[২] সূর্য-শতকম্, হরিদাস গুপ্ত সম্পাদিত (বেনারস)

[৩] স্কন্দপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, অধ্যায় ২-৩, বরাহ-পুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, অধ্যায় ৩৩-৩৪

প্রাচীন ধর্মমন্দির আছে, তাহার বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনায় নিম্ন জাতির শত শত বন্ধ্যা নারী আসিয়া সমবেত হয়। বলা বাহুল্য, বৈদিক কিংবা পৌরাণিক সূর্যদেবতার পুত্রবর দান করিবার উপর তত বেশী জোর দেওয়া হয় না। ভারতীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের আদিম জাতির সূর্যদেবতারই ইহা বিশেষ একটি গুণ। তবে কোন কোন পুরাণে যে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনার্য সংস্কৃতিরই প্রভাবের ফল বলিতে হয়। যেমন 'ভাগবত পুরাণে' উল্লেখিত হইয়াছে যে, রাজা সত্রাজিৎ দ্বাদশ বৎসর নিরাহারে থাকিয়া সূর্যের তপস্যা করিয়া তাঁহার নিকট পুত্রবর চাহিয়াছিলেন। উইলিয়ম ক্রুক লিখিয়াছেন, পুত্রহীনা নারী কোন কোন অঞ্চলে সন্তান-কামনায় সূর্যের দিকে ফিরিয়া উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।[১] ভেরিয়র্ এলউইন এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, মধ্যপ্রদেশের কোন কোন আদিম জাতির মধ্যেও অনুরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। বাংলা দেশে আদিম সূর্যপূজার বহু উপকরণ লৌকিক শৈবধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইতেই অনেক স্থলে পুত্রসন্তানদাতৃরূপে বর্তমানে শিবকেই কল্পনা করা হইয়া থাকে। তারকেশ্বর, এক্তেশ্বর, রাঢ়েশ্বর প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গের সুপরিচিত শিব-মন্দির সমূহ পূর্বে আদিম সূর্যোপাসনার কেন্দ্র ছিল বলিয়া মনে হয়। এমন কি সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত বৈদ্যনাথধামের শিবমন্দিরও অনুরূপ ঐতিহ্যের উপরই স্থাপিত বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ, পৌরাণিক শিবের রোগ হইতে মুক্তি কিংবা পুত্রবর দিবার গুণের উপর তত বেশী জোর দেওয়া হয় না। তবে কোন কোন পুরাণে যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সূর্যোপাসনারই প্রভাব-জাত বলিয়া মনে হইতে পারে। অথচ এই সকল তথাকথিত শিবমন্দিরে রোগমুক্তি ও পুত্রবরের জন্য ধর্না দিবার রীতি অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে প্রচলিত আছে। এমন কি মনে হইতে পারে যে, এই দুইটি গুণের উপরই এই সকল মন্দিরস্থিত দেবতার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। এই সকল শিবমন্দির আদিম সূর্যমন্দির বলিয়া মনে হইবার আর একটি প্রধান কারণ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। এই সকল শিবমন্দিরে বার্ষিক অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ চড়ক। চড়ক অনুষ্ঠানটি আদিম সূর্যপূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে দিনটিতে এই চড়ক অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ বিষুব সংক্রান্তির দিনটি, তাহা কোন পুরাণ কিংবা স্মৃতি-অনুমোদিত শিব-

---

[১] W. Crooke, *Religion and Folklore of Northern India*, (Oxford, 1926), 35

পূজার দিন নহে; একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা সূর্য-পূজারই একটি বিশিষ্ট দিন হইতে পারে; কারণ, সূর্যই ঐদিন দ্বাদশ রাত্রির পথে ভ্রমণ শেষ করিয়া পুনরায় সেই পথে নূতন যাত্রা সুরু করে। মানভূম জিলার কোন কোন অঞ্চলে এখনও চড়ককে বিষুপরব অর্থাৎ বিষুবপর্ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চলে চড়কপূজা প্রচলিত আছে, সেখানেও শিবের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই।[১]

চড়ক গাছ ও চড়কের চক্র স্পষ্টতই সূর্যের আবর্তন ও চক্রাকারে ভ্রমণ বুঝায়। ইউরোপের কোন কোন জাতি—যেমন, শ্লাব্, লিথুনীয়, লেট্ প্রভৃতির মধ্যে সূর্য-পূজারূপেই চড়কের অনুরূপ অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে।[২] এইজন্য চড়ককে যথার্থই মনে করা হইয়াছে, 'imitation of swinging of the sun at the beginning of spring or at the solstices—a piece of magic to help the sun move.' পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য শিবমন্দিরেই এখনও চড়কের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বর্তমান হিন্দুধর্মের প্রভাববশতঃ কোন কোন স্থলে ধর্ম-মন্দির শিবমন্দির বলিয়া পরিচিত হইলেও উক্ত চড়কের সংস্রব হইতেই তাহা যে পূর্বে সূর্যদেবতা বা ধর্মঠাকুরেরই মন্দির ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বৈষ্ণব সম্প্রদায় পরিকল্পিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার মধ্যেও ইহার একটি স্বতন্ত্র রূপের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের রাসচক্রে পরিভ্রমণ বিভিন্ন রাশিচক্রের ভিতর দিয়া সূর্যের আবর্তনই বুঝায়। মনে হয়, চড়ক ও রাসলীলা একই অনার্য ভিত্তি হইতে উদ্ভূত। ধর্মপূজার সঙ্গে চড়কের সম্পর্ক হইতেও ধর্মপূজা যে সূর্যপূজা তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে চড়কগাছে যে ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসিগণ মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া বঁড়শী বিঁধাইয়া চক্রাকারে শূন্যে আবর্তন করিত, তাহা এই উপলক্ষে নরবলি দিবার প্রথার একটি নিদর্শন বলিয়া মনে হইতে পারে। সূর্যদেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য এই ভাবে

১ W. T. Elmore, *Dravidian Gods in Modern Hinduism* (Nebraska, 1915) 35, Hook-Swinging, Mysore, *Quarterly Journal of the Mythic Society* II (1911), 57-59; J. H. Powell, 'Hook-Swinging in India', Folk-lore XXV (1914), 147-97

২ W. Schmidt, *The Origin and Growth of Religion* (London, 1935), p. 49

নরবলি দিবার প্রথা এই দেশের আদিম সমাজে এককালে প্রচলিত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

একজন পাশ্চাত্ত্য নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'in the primitive stage of agriculture, the powers supposed to be concerned in sending rain to earth receive the largest share of worship.' আদিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানবও যথার্থই মনে করিত যে, সূর্যই বৃষ্টির নিয়ামক (regulator)। সেইজন্য যখনই অনাবৃষ্টি দেখা দিত, তখনই সমাজে সূর্যদেবতাকে পূজা করিয়া কিংবা ঐন্দ্রজালিক উপায়ে তুষ্ট করিয়া বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রয়াস দেখা যাইত। সেইজন্য পশ্চিম বাংলার যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া গ্রীষ্মকাল দুঃসহ হইয়া উঠে এবং কৃষিকার্যের সফলতা বিষয়ে আশঙ্কা উপস্থিত হয়, সেই অঞ্চলেই বিশেষতঃ এই গ্রীষ্মকালেই নানা উপায়ে সূর্যদেবতাকে প্রসন্ন করিয়া বৃষ্টিপাতের জন্য যে বিস্তৃত আচার পালন করা হইত, তাহাই বর্তমানে ধর্মপূজার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল আদিম আচারের মধ্যে কালক্রমে হিন্দুধর্মের উপাদান আসিয়া এমন ভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহাদিগকে আর পূর্ববর্তী আচারসমূহ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিবার উপায় নাই। এককালে যাহা ছিল ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া (magic), আজ তাহাই হিন্দুধর্মের প্রভাব বশতঃ পূজার রূপ লাভ করিয়াছে।

বাৎসরিক কিংবা ঘরভরা পূজা উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মঠাকুরের স্নান ধর্মপূজার একটি বিশেষ অঙ্গ। অনাবৃষ্টির কালে সূর্যদেবতার প্রতীক্‌কে জলের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া বৃষ্টিপাত করিবার চেষ্টা অনেক দেশেই প্রচলিত আছে। এই দেশে শিবের মাথায় জল ঢালিবার যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহা সূর্যদেবতার মাথায় জল ঢালিবার রীতিরই একটি প্রসারিত রূপ মাত্র। এ'দেশে বহু সূর্যশিলা স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ববর্তী রীতি তাহাতে অনুসৃত হইয়া তাহাদের মাথায়ও বর্তমানে জল ঢালিবার রীতি পালন করা হইতেছে। ইহাও sympathetic magic-এর নিদর্শন। প্রত্যেক ধর্মমন্দিরেই ধর্মঠাকুরের স্নান একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। বর্ধমান জিলার ডেমড়া গ্রামের ধর্মঠাকুরের স্নানের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বাঁকুড়া জিলার বেলিয়াতোড় গ্রামে তিনটি কাষ্ঠনির্মিত বৃহদাকার অশ্ব আছে, তাহাতে ধর্মঠাকুরকে আরোহণ করাইয়া বিশেষ আড়ম্বর সহকারে নির্দিষ্ট পুষ্করিণীতে লইয়া গিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করান হয়। পূর্বেই উল্লেখ

করিয়াছি, বর্ষার প্রারম্ভে পুরীর জগন্নাথদেবকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করাইবার মধ্যেও এই প্রবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব ধর্মপূজার এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ তাৎপর্যমূলক। ইহা হইতে স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্মঠাকুর সূর্য-দেবতা ভিন্ন আর কেহই নহেন।

পশ্চিম বাংলায় তারকেশ্বর, এক্তেশ্বর প্রমুখ স্থানে যে সকল শিবমন্দির আছে, তাহা যে পূর্বে সূর্যোপাসনার স্থান ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়; কারণ, বিষুব সংক্রান্তির দিন শিবের নামে এই সকল মন্দিরে যে গাজন ও চড়ক হয়, তাহার আচারসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহাতে শিব অপেক্ষা সূর্যেরই দাবী অধিকতর বলিয়া মনে হইবে। বিষুব সংক্রান্তি তিথিটি সূর্যপূজারই একটি বিশিষ্ট তিথি, ইহা শিবপূজার কোন তিথি নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, চড়কও সূর্যোৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সকল মন্দিরে বন্ধ্যা নারীগণ সন্তান-কামনায় যে ধর্না দিয়া থাকে, তাহার শিব অপেক্ষা সূর্যদেবতাই লক্ষ্য; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, সূর্য ভূমিরই হউক কিংবা নারীরই হউক উভয়েরই অনুর্বরতা বিদূরক। এই সকল মন্দিরে রোগ-মুক্তির জন্যও যে প্রার্থনা করা হইয়া থাকে, তাহাও সূর্যেরই পূর্ণ করিবার ক্ষমতা আছে, পৌরাণিক শিবের এই সম্পর্কে বিশেষ খ্যাতি আছে বলিয়া জানিতে পারা যায় না।

পশুবলি ধর্মপূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। প্রতি বৎসর বার্ষিক পূজার সময় বিভিন্ন ধর্মমন্দিরে শত শত পাঁঠা বলি হয়, এতদ্ব্যতীত যে সকল মন্দিরে নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে প্রায় প্রত্যহই পাঁঠা কিংবা কবুতর বলি দেওয়া হইয়া থাকে। ধর্মপূজার ঘরভরা অনুষ্ঠানের লুয়া বলি পূজার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যাঁহারা ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধ কিংবা বিষ্ণু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা ধর্মপূজার এই প্রথাটির সম্পর্কে কিছুই বলেন না। নরবলি পাইলেই দেবতা সর্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হন বলিয়া পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক আদিম জাতির অধিবাসীই বিশ্বাস করিত। কৃষিজীবী সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ ও উপকারী দেবতা সূর্য। সেইজন্য প্রায় প্রত্যেক আদিম সমাজেই সূর্যোপাসনা প্রচলিত আছে এবং সমাজের এই প্রিয়তম দেবতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলি বা নরবলি দিয়া প্রসন্ন করিবারও রীতি অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত ছিল বলিয়াও জানিতে পারা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বাংলার লৌকিক সূর্যোৎসব চড়ক উপলক্ষে মানসিক করিয়া পিঠে বঁড়শী বিঁধাইয়া শূন্যচক্রে আবর্তিত হইবার যে রীতি প্রচলিত ছিল, তাহা সূর্যের উদ্দেশ্যে নরবলি দিবারই

একটি নিদর্শন বলিয়া সকলে মনে করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ধর্মপূজার ঘরভরা উৎসবে লুয়া বলি যে নরবলিরই অবশেষ, তাহাও অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সার্থকভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। ধর্মপূজা উপলক্ষে যে ব্যাপক পাঁঠা বলি দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা সূর্বপূজার প্রাচীনতর রীতি নরবলিরই স্থান গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সূর্য একটি অতি উপকারী ও প্রধান দেবতা বলিয়াই তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য আদিম সমাজের যে শ্রেষ্ঠ দান বা বলি তাঁহাকে অর্পণ করা হইয়া থাকে, এই সংস্কার অত্যন্ত দৃঢ়মূল—এইজন্য ইহার ঐতিহ্যও অত্যন্ত প্রাচীন। বাংলাদেশে ব্যাপক বৈষ্ণবপ্রভাব সত্ত্বেও ধর্মপূজা হইতে এই রীতিটি কিছুতেই পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। ধর্ম যদি বুদ্ধ, যম, কিংবা বিষ্ণু প্রমুখ কোন হিন্দু দেবতাই হইতেন, তবে তাঁহার পূজাচারে পশুবলির প্রথা এত সুদৃঢ় শিকড় গাড়িতে পারিত না। অতএব তিনি এক অতি আদিম সমাজের সূর্যদেবতা বলিয়াই মনে হইবে।

ধর্মঠাকুরকে সাধারণতঃ চক্ষুরোগ হইতে পরিত্রাণকারী দেবতা বলিয়াও কল্পনা করা হইয়া থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, চক্ষুরোগাক্রান্ত ব্যক্তি ধর্মঠাকুরের নিকট মানসিক করিয়া আরোগ্যলাভ করিলে তাহাকে 'চিক্' উপহার দিয়া থাকে। এই চিক্ ধর্মশিলার গায়ে পরাইয়া দেওয়া হয়। আদিম জাতির বিশ্বাস অনুযায়ী সূর্য জগতের চক্ষু-স্বরূপ; ধর্মঠাকুর সূর্য বলিয়াই মানুষও তাহার নিজের চক্ষুপীড়ার জন্য তাঁহারই শরণাপন্ন হয়—ধর্মঠাকুর যদি বুদ্ধ, বিষ্ণু, বরুণ, যম কিংবা কচ্ছপ হন, তবে অন্ততঃ চক্ষুরোগের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইবার তাৎপর্য কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কুষ্ঠরোগ ও চক্ষুরোগ ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি রোগে, যেমন বাতরোগ প্রভৃতিতেও ধর্মঠাকুরের শরণাপন্ন হইতে দেখা যায়। পুরাণের মধ্যে সূর্যের যে সাধারণ রোগ-বিনাশন গুণ আছে, তাহাই ক্রমে এই প্রাগার্য সূর্যদেবতার উপরও আরোপিত হইয়াছিল বলিয়া ধর্মঠাকুরও প্রায় সর্বরোগহর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষুরোগ বিনাশনের গুণটি প্রাগার্য সমাজ-সম্ভূত বলিয়া মনে হয়।

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে দ্বাদশ সংখ্যাটির একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে দেখিতে পাওয়া যায়, সেকথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই সম্পর্কে ধর্মপূজার একটি ছড়াও উল্লেখ করা হইয়াছে—

> বার ভাই বার আদিত্য।
> হস্ত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ্য পুষ্প পানী ॥

ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পৌরাণিক দ্বাদশ আদিত্য হইতেই ধর্মঠাকুরের সঙ্গে দ্বাদশ সংখ্যার একটি বিশেষ সম্পর্ক যুক্ত হইয়াছে। ধর্মঠাকুর সূর্য বলিয়াই দ্বাদশ আদিত্যের সম্পর্ক তাঁহার সঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে। অন্য কোনও দেবতা হইলে তাহা কোন মতেই সম্ভব হইত না। বলা বাহুল্য, ধর্মঠাকুরের উপর পরবর্তী পৌরাণিক প্রভাবের যুগেই তাঁহার সঙ্গে দ্বাদশ সংখ্যার এই বিশিষ্ট সম্পর্কটি স্থাপিত হইয়াছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ধর্মঠাকুরকে মাটির ঘোড়া উপহার দিবার রীতি পশ্চিম বঙ্গে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। ধর্মঠাকুর হইতে এই রীতি এই অঞ্চল ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অন্যান্য দেবতাতেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে মাটির ঘোড়াই ধর্মঠাকুরকে দেয় একমাত্র উপহার, অন্য কোন উপহারে তাঁহার মনস্তুষ্টি হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি, বাঁকুড়া জিলার বেলিয়াতোড় গ্রামের ধর্মমন্দিরে তিনটি বৃহদাকার কাষ্ঠনির্মিত অশ্ব আছে; বার্ষিক পূজার সময় ধর্মঠাকুরকে ইহাতে আরোহণ করাইয়া স্নানার্থে লইয়া যাওয়া হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, পৌরাণিক সূর্যদেবতা অশ্বচালিত রথারূঢ়, অতএব ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মাটির ঘোড়ার সম্পর্ক এই পৌরাণিক প্রভাবেরই ফল। কিন্তু পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই সমুদ্রদেবতা ও সূর্যদেবতার সঙ্গে অশ্বের সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে মনে করা হয় যে, 'through its swiftness, strength and activity, it was itself a symbol of the sun.'[১] কেহ কেহ মনে করেন, ঋগ্‌বেদেও অশ্বকে কোন কোন স্থলে সূর্যেরই প্রতীকরূপে গণ্য করা হইয়াছে।[২] কিন্তু বাংলা দেশে পৌরাণিক প্রভাব বশতঃই যে, সূর্যদেবতার সঙ্গে অশ্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা কঠিন। কারণ, যে-অঞ্চলে পৌরাণিক প্রভাব বিস্তৃত হওয়া সম্ভব হয় নাই, সেই অঞ্চলে অশ্বের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের কোন সম্পর্ক নাই। উপজাতীয় অঞ্চলে পশ্চিম বঙ্গের ডোমের প্রভাব বশতঃ কোন কোন দেবতার নিকট মাটির ঘোড়া উপহার দিবার রীতি প্রবর্তিত হইলেও, তথাকার ধর্মপূজায় মাটির ঘোড়ার কোন প্রয়োজন হয় না।

ধর্মঠাকুরকে সর্বশুক্ল বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে। রূপরাম নামক ধর্মমঙ্গলের একজন কবি ধর্মঠাকুরের বর্ণনায় লিখিয়াছেন,

১ N. M. Penzer, *The Ocean of Story* (London, 1925), IV, 14.

২ A. A. Macdonell, *Vedic Mythology*, Strassburg, 1897, p. 150.

ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল মাথার ছাতি
ধবল বরণে বাড়ীঘর।
ধবল ভূষণ শোভা অনুপম মুনিলোভা
আলো কৈলে পরম সুন্দর ॥

ধর্মমঙ্গলের আর একজন কবি ঘনরাম চক্রবর্তী একজন ধর্মভক্ত সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, 'সর্বক্ষণ শুক্লফুলে পূজিল গোঁসাই।' ধর্মপূজার একটি প্রাচীন ছড়ায় ধর্মঠাকুরের অশ্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে, 'ধবল বরণ ঘোড়া নিলয় না জানি।'—শূন্যপুরাণ। অর্থাৎ ধর্মঠাকুরের অঙ্গের জ্যোতি শুভ্র, তাঁহার মাথার ছত্র শুভ্রবর্ণ, তাঁহার মন্দিরের বর্ণ শুভ্র, তাঁহার ভূষণ শুভ্র, শুক্লবর্ণের পুষ্পে তাঁহার পূজা হয়, তিনি শুভ্রবর্ণের অশ্বে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন। পূর্বে তাঁহার নিকট সাদা রঙের পাঁঠা ও কবুতরই বলি দেওয়া হইত, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুপ্রভাবিত অঞ্চলে কালো রঙের পাঁঠাও বলি দেওয়া হয়। ইহা সূর্যের গুণ-সম্পর্কিত একটি সুপ্রাচীন আদিম বিশ্বাসেরই পরিচায়ক। কারণ, বেদ কিংবা পুরাণে সূর্যকে কোথাও এমন সর্বশুক্ল বলিয়া ধ্যান করা হয় না। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বৈদিক যুগের পরবর্তী কালেই সূর্য-দেবতা সম্পর্কিত এই বিশ্বাসটি উচ্চতর হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যেও প্রবেশলাভ করিয়াছিল। মিত্র ও বরুণ দেবতার পূজা সম্পর্কিত আচারগত পার্থক্য নির্দেশ করিতে গিয়া 'তৈত্তিরীয় সংহিতা' ও 'মৈত্রায়ণী সংহিতা'য় উল্লেখিত হইয়াছে যে, মিত্র দেবতার নিকট সাদা রঙের বলি ও বরুণ দেবতার নিকট কালো রঙের পশু বলি দিতে হইবে। এই সম্পর্কে পণ্ডিত এ. এ. ম্যাক্‌ডোনেল উল্লেখ করিয়াছেন, 'The same contrast between Mitra as a god of day and Varuna as a god of night is implied in the ritual literature, when it is prescribed that Mitra should receive a white and Varuna a dark victim at the sacrificial post.' (*TS* 2, 1, 749 ; *MS* 2, 5⁷)।[১] এমন কি দেবতার কল্পিত রঙের সঙ্গে রঙ মিলাইয়া পশুবলি দিবার রীতি ব্রাহ্মণের যুগেই আর্য-সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'in the *Satapatha Brahmana* (5. 5. 4^1) the Asvins are described as red-white in colour and

১ A. A. Macdonell, *Vedic Mythology*, (Strassburg, 1897), pp. 29-30.

therefore a red-white goat is offered to them.'[১] তথাপি পুরাণে সূর্যকে 'জবাকুসুমের মত লাল' ('জবাকুসুমসংকাশম্' ইত্যাদি) বলিয়াই ধ্যান করা হইয়া থাকে। পুরাণে সরস্বতী এবং শিবকেই সর্বশুক্ল বলিয়া কল্পনা করা হয়, কিন্তু সূর্যকে নহে। বেদে সূর্যের অশ্বকে একবার মাত্র শুভ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[২] শিবের সঙ্গে শুভ্রতার সম্পর্ক ('রজতগিরিনিভ' ইত্যাদি) উক্ত অনার্য সূর্য উপাসনা হইতে গৃহীত হওয়াও কিছুই আশ্চর্য নহে। কিংবা চিরতুষারাবৃত হিমালয় শৃঙ্গমালার অথবা তুষারাচ্ছাদিত কৈলাস পর্বতের অধিষ্ঠিত দেবতা বলিয়াও শিবকে রজতগিরির মত শুভ্র বলিয়া কল্পনা করা সম্ভব। কিন্তু বাংলার পশ্চিম সীমান্ত সংলগ্ন উপজাতীয় অঞ্চলে সর্বত্রই সূর্যকে সর্বশুক্ল বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে এবং তাঁহার নিকট সাদা রঙের মুরগী বলি দেওয়া হয়। মানভূম জিলার সদর মহকুমায় কোন কোন গ্রামে মানসিক ধর্মপূজায় সূর্যোদয়ের মুহূর্তে একটি সাদা রঙের পাঁঠা বলি দিবার রীতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে। পশ্চিম বাংলা হইতেই এই রীতিটি মানভূমে গিয়াছে, কিন্তু বাংলা দেশে ক্রমাগত হিন্দুপ্রভাব বৃদ্ধির ফলে বলির পশুর রঙটি সম্পর্কে যে অনার্য রীতিটি প্রচলিত ছিল, তাহা কতকাংশে শিথিল হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহার প্রান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে এই প্রাচীন রীতিটি এখনও রক্ষা পাইয়াছে।

ধর্মঠাকুরের সর্বশুক্ল পরিকল্পনার মধ্যে তাঁহার প্রকৃত পরিচয়ের অনেকখানি অংশ উদ্ধার করা যায়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, আসামের পূর্ব সীমানা হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যপ্রদেশের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন শাখাভুক্ত কয়েকটি আদিম জাতির মধ্যে এক কালে একটি বিশিষ্ট প্রকৃতির সূর্যোপাসনা প্রচলিত ছিল। তাহাতে সূর্য দেবতাকে এই প্রকার সর্বশুক্ল বলিয়া কল্পনা করা হইত। দেখা গিয়াছে যে, আসামের ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির কয়েকটি শাখার মধ্যেও সাদা

[১] Ibid, p. 51. আফ্রিকার দক্ষিণ নাইজেরিয়া অঞ্চলের আদিবাসিগণ অজগর (python) সর্পের উদ্দেশ্যে যে মোরগ কিংবা পাঁঠা বলি দিয়া থাকে, তাহার রঙও সাদা। *Publications of the Field Museum of Natural History, Anthropological Series* Vol. XXI (Chicago, 1931), p. 15. কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অজগরের সঙ্গে সাদা রঙের কোন সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে এই অঞ্চলের অধিবাসিগণ সাদা রঙের কুম্ভীরকে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ইহার নিকট সাদা পশুপাখী বলি দিবার রীতিটি ক্রমে অজগর সর্পদেবতার পূজাচারেও প্রসারিত হইয়া থাকিবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই অঞ্চলে অজগর ও কুম্ভীর উভয়ই একসঙ্গে হ্রদে বা জলাশয়ে বাস করিয়া থাকে বলিয়া অনুমিত হয়।

[২] A. A. Macdonell, op cit. p. 31

রঙের পশু কিংবা পক্ষী বলি দিয়া সূর্য পূজা করিবার রীতি আজিও প্রচলিত আছে। অধ্যাপক শ্রীতারকচন্দ্র দাস বলিয়াছেন, 'The Sun-god is worshipped by the people of Fayeng Loi in Sajiban (April), when they offer up a white fowl and a white pigeon.' তিনি আরও বলিয়াছেন, 'The Mao Nagas of Manipur who regard the Sun-god as a beneficent deity sacrifice a white cock to him.'[১] আসামের মিকির (Mikir) জাতি আরনাম্ পরো (Arnam paro) নামক একজন দেবতার নিকট সাদা রঙের পাঁঠা ও সাদা রঙের মুরগী বলি দিয়া থাকে। Arnam paro পূর্বে সূর্যদেবতাই ছিলেন, এই বিষয়ে কোন সংশয় না থাকিলেও বর্তমানে ধর্মঠাকুরের মত তাঁহারও প্রকৃত পরিচয় একটু অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। C. R. Stoner নামক একজন নৃতত্ত্ববিৎ দেখাইয়াছেন যে, আসামের নাগাজাতির Sangtam নামক শাখাভুক্ত লোক সূর্যাস্তের সময় একটি সাদা রঙের মুরগী বলি দিয়া সূর্যদেবতার পূজা করিয়া থাকে।[২] পশ্চিমবঙ্গের ডোম জাতি যে সাদা রঙের পাঁঠা বলি দিয়া ধর্মঠাকুরের পূজা করিত, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। মানভূম জিলায় কোন কোন অঞ্চলে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া কুর্মী পর্যন্ত জাতির লোক যে সাদা রঙের পাঁঠা বলি দিয়া ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে, তাহার কথাও বলিয়াছি। মানভূম জিলা অতিক্রম করিয়া যদি আমরা ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার উপজাতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করি, তাহা হইলেও দেখিতে পাইব যে, তথাকার আদিম জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে সাদা রঙের মুরগী, শূকর কিংবা পাঁঠা বলি দিয়া সূর্যদেবতার পূজা করিবার রীতি প্রচলিত আছে।[৩] তবে সূর্যদেবতার নামটির মধ্যে কোন কোন স্থলে পার্থক্য আছে, যেমন মাল-পাহাড়িয়া জাতি সূর্যদেবতাকে বলে ধর্মের গোঁসাই, ওরাওঁ জাতি বলে ধর্মেশ বা ধর্মি, মুণ্ডা, সাঁওতাল, কোল, বীরহোড় ও হো জাতি তাহাকে বলে সিং বোঙ্গা, খরিয়া জাতি বলে ধর্ম, পার্বত্য খরিয়া জাতি বলে গিরিং, ভূঞা, বণ্ডো ও গঁড় বা জুয়াঙ্ জাতি বলে, ধরম দেওতা ; শবর জাতি বলে, দেরম্ম অথবা দেরম্মসুম্ (শবর

---

১ T. C. Das, op. cit.

২ C. R. Stoner, op. cit.

৩ 'There is a small temple of Dharmaraja within the temple precincts of Jagannath. The servitors of the temple point out the image of Dharmaraja as the original image of Surya of Konaraka.' Prabhat Mukherjee, *The History of Medieval Vaisnavism in Orissa* (Calcutta, 1940), p. 37.

ভাষায় সুম অর্থে দেবতা, দেরম শব্দ ধর্ম শব্দ হইতে জাত), কন্দ জাতি বলে ধর্ম পেন্নু, ও করোয়া জাতি বলে ভগবান্। ধর্ম কথাটি যে কি ভাবে ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার উপজাতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে, সে কথা একটু পরেই বলিব। উপরে যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, তাহাতে দেবতার নামের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু বিভিন্নতা থাকিলেও সর্বত্রই তাহাদের পরিচয় এক এবং অভিন্ন—তিনি সর্বত্রই সূর্যরূপে উপাসিত এবং এখানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে বিষয় তাহা হইতেছে যে, তিনি পূর্ব আসাম হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যপ্রদেশের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত সর্বত্রই সাদা রঙের মুরগী, কবুতর, কিংবা পাঁঠা বলিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট যে পশু কিংবা পক্ষী বলি দেওয়া হইবে তাহার রঙটি সর্বত্রই সাদা হওয়া চাই। পূর্বেই বলিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঠাকুরকে সর্বশুক্ল বলিয়া কল্পনা করা হয়, সাদা ফুল দিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয় এবং পূর্বে সাদা পাঁঠাই যে তাঁহার নিকট বলি দেওয়া হইত, তাহারও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, এখনও মানভূম জিলায় সাদা পাঁঠাই তাঁহার নিকট বলি দেওয়া হইয়া থাকে। বাঁকুড়া জিলার বেলেতোড় গ্রামেও সাদা রঙের পাঁঠা কিংবা কবুতর বলি দিয়াই তাঁহার পূজা হয়। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে যথার্থই এ'কথা মনে করা যাইতে পারে যে, 'at some remote past there had been a people living in this Eastern India who were ardent worshippers of Sun-god, and this is the keynote of similarity about sun-worship in tribes so widely separated from each other physically and geographically as the Khond and the Naga.'[১] পশ্চিমবঙ্গের অতি প্রাচীন অধিবাসী ডোম জাতিও স্বভাবতই ইহার এই ব্যাপক প্রভাব বশতঃ প্রাচীন কাল হইতেই এই ভাবে সূর্যদেবতার পূজা করিয়া আসিতেছে; হিন্দু ও বৌদ্ধগণ এই দেশে আসিবার পূর্বে ডোমগণ যে নামে এই দেবতার পূজা করিত বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবিত যুগে সেই নামটিকে একটি বৌদ্ধ বা হিন্দুরূপ দিবার প্রচেষ্টাতেই বর্তমানে 'ধর্ম' বা ধর্মঠাকুর বলিয়া তিনি পরিচিত হইয়াছেন। ইহা হইতেও পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুর যে মূলতঃ প্রাগার্য সূর্যদেবতা এই বিষয়ে সংশয় করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্মের শেষ; যদি তাহাই হয়, তবে তাহা বাংলা দেশের অন্যত্র কোথাও প্রচলিত না থাকিয়া কেবলমাত্র পশ্চিম

[১] T. C. Das, op. cit.

বঙ্গের একটি বিশেষ অংশে, প্রধানতঃ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার কি কারণ থাকিতে পারে? বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল চট্টগ্রাম। ধর্মঠাকুরের পূজা বৌদ্ধধর্মেরই শেষ নিদর্শন হইলে ইহা চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত না থাকিবার কি কারণ থাকিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হইবে যে, পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে বৈদিক ও শকদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ প্রভাবিত পৌরাণিক সূর্যোপাসনার অতিরিক্ত আরও এক বিশেষ প্রকৃতির সূর্যোপাসনার অস্তিত্ব ছিল। আদি-অস্ত্রাল বা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড্ জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যেই ইহার অধিকতর প্রচলন দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, ইহা ইহাদেরই উপজাতীয় কৃষ্টির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। আসামে খাসিয়াদিগের ভাষায় যেমন প্রোটো-অস্ট্রালয়েড্ জাতির সংস্কৃতি-চিহ্ন আজ পর্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে, তেমনই তথাকার কয়েকটি ইন্দো-মোঙ্গোলয়েড্ জাতির শাখার মধ্যে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড্ জাতির বিশিষ্ট সূর্যপূজার আজিও কিছু কিছু চিহ্ন বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা দেশেও স্বভাবতই তাহার প্রভাব বর্তমান রহিয়া গিয়াছে; এই দেশের সাধারণ-জনগণের মধ্যে প্রচলিত বেদ ও পুরাণ বহির্ভূত সূর্যপূজার বিবিধ আচারের মধ্যে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গের প্রোটো-অস্ট্রালয়েড্ জাতির শাখাভুক্ত ডোম জাতির মধ্যেও প্রাচীনকালে এই বিশিষ্ট সূর্যপূজার প্রচলন ছিল। কালক্রমে এই অঞ্চলে যখন বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে, তখন তাহা এই অঞ্চলেই বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়; বর্তমান হিন্দুধর্মের প্রভাবের যুগে সেই ধর্মের উপরই তাহা পুনরায় নূতন করিয়া হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়। কেহ আবার মনে করেন, কালক্রমে ইহার উপর মুসলমান ধর্মেরও কিছু প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।[১] ইহার উপর এই বিভিন্নমুখী ধর্মমতের প্রভাবের জন্য এই দেবতা এই অঞ্চলে কখনও বুদ্ধ, কখনও বিষ্ণুরূপে পূজিত হন। তথাপি তাঁহার প্রকৃত পরিচয়ও কোনদিন একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায় নাই। মধ্যে মধ্যে প্রত্যক্ষ সূর্যরূপেই তাঁহাকে ধ্যান করা হইয়াছে; যেমন, 'ধর্মপূজা-বিধানে' তাঁহার ধ্যানমন্ত্রের মধ্যে এই ধ্যানটিও পাওয়া যায়, যথা—

মণ্ডলং বর্তুলাকারং শূন্যদেহং মহাবলম্।
একচক্রধরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্॥[২]

১ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিত ভূমিকা, শূন্যপুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ।৶০-।৵০
২ ধর্মপূজাবিধান, ৫২

ধর্মপূজার অন্যতম পদ্ধতি 'শূন্যপুরাণে' দ্বাদশ আদিত্যকে 'বার ভাই' বলিয়া উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকেও পুষ্প নিবেদন করা হইয়াছে—ইহা প্রত্যক্ষ সূর্যপূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ধর্মপূজার 'ঘর-ভরা' অনুষ্ঠানে প্রত্যেকটি পুজোপকরণই বারটি করিয়া প্রয়োজন হয়; বলা বাহুল্য, ধর্মপূজা সূর্যপূজা বলিয়া দ্বাদশ আদিত্যের সংখ্যা হইতে পূজোপকরণও দ্বাদশটির প্রযোজন হয়। ধর্মপূজার ঘরভরা অনুষ্ঠানের আর এক নাম বার্মতি বা বারমতি;[১] বার দিনে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় বলিয়াই ইহার এই নাম। দ্বাদশ আদিত্যের পূজা বলিয়াই বার দিনে এই পূজা শেষ করিতে হয়। অতএব এই বার্মতির সঙ্গে 'ব্রহ্মে'র সম্পর্ক আছে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের অনুমান ঠিক নহে। বলা বাহুল্য, পৌরাণিক প্রভাবের যুগে দ্বাদশ আদিত্য হইতে ধর্মপূজার সঙ্গে দ্বাদশ সংখ্যার সম্পর্ক প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল। যে অঞ্চলে পৌরাণিক প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে নাই, সেই অঞ্চলে দ্বাদশ সংখ্যার সঙ্গে ধর্মপূজার কোন সম্পর্ক নাই।

উল্লিখিত কারণেই সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে, ধর্মপূজা আদিম সূর্যপূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে; ইহার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সম্পর্ক পরবর্তী কালে স্থাপিত হইয়াছিল। তথাপি ইহার আদিম উপকরণ ইহার মধ্যে এখনও কিছু কিছু বর্তমান আছে।

এইবার ধর্মঠাকুরের সঙ্গে ডোমজাতির সম্পর্কের কথা আলোচনা করিতে হয়। পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে যে, ডোমজাতি ধর্মপূজায় একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্বে ঘরভরা উৎসবের যে বর্ণনাটি দিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে, ব্রাহ্মণ ও ডোম উভয়েই সমান ভাবে ধর্মঠাকুরের পূজার আচারগুলি অনুষ্ঠান করিয়া চলিয়াছে, প্রভেদের মধ্যে এই যে ব্রাহ্মণ সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্র বলিতেছেন, ডোম বাংলা ভাষায় ছড়া বলিয়া যাইতেছেন। এই বিষয়ে সংশয় করিবার কোনই কারণ নাই যে, পূর্বে এইসকল অনুষ্ঠানে একমাত্র ডোমই আনু-পূর্বিক পৌরোহিত্য সম্পন্ন করিত, বর্তমানে গ্রামে ব্রাহ্মণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুও এই পূজায় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ডোম পুরোহিতের পার্শে ব্রাহ্মণ পুরোহিতও আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারা যেন

[১] মধ্যপ্রদেশের কোল জাতির মধ্যে 'বার্মতি' নামে এক দেবতা আছেন। (W. G. Griffiths, *The Kol Tribes of Central India*, Calcutta, 1946, p. 133) আপাত-দৃষ্টিতে তাঁহার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না।

পরস্পর হাত-ধরাধরি করিয়া এই কার্যে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন—ব্রাহ্মণ ও ডোমের এমন সম্মিলিতভাবে পূজানুষ্ঠান নির্বাহ করিবার চিত্র বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। পশ্চিম বাংলার হিন্দুর সামাজিক জীবনের এই যে একটি স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের মিলনচিত্র, তাহার তাৎপর্য গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

ধর্মঠাকুর মূলতঃ যে ডোম জাতিরই দেবতা এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বহু মন্দিরে এখনও সাংবাৎসরিক পুরোহিত ডোম, কেবলমাত্র বাৎসরিক পূজার তিন চারিদিনের জন্য তাহার পার্শ্বে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আবির্ভাব হয়। অবশ্য যে গ্রামে উচ্চবর্ণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে ডোমের পূজার অধিকার একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও ধর্মপূজা সম্পর্কে ডোমেরই যে প্রকৃত অধিকার, এ বিষয়ে কেহই সংশয় প্রকাশ করেন না। বাঁকুড়া জিলার সংলগ্ন মানভূম জিলার ঘুটিতোড়া গ্রামের ব্রাহ্মণগণ ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজার সময় গ্রামান্তরের এক ডোমের বাড়ী হইতে একটি ধর্মশিলা ধার করিয়া আনিয়া নিজেরাই তাহার পূজা করেন—পূজান্তে ডোমের বাড়ীতে তাহা পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। বাংলাদেশেও এমন কি খৃস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্যন্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের একটি উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তখন পর্যন্তও ডোম জাতির সঙ্গেই ধর্মপূজার একমাত্র সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে করা হইত। তাহাতে একজন বলিতেছেন, 'আঃ, আমি কি ডোম, যে ধর্মশাস্ত্র শিখে ধর্মপণ্ডিত হব?'[১] অতএব ডোম ও ধর্ম প্রায় এক কথা বলিলেও চলে। বর্তমানে ডোম ব্যতীতও যে অন্যান্য নিম্ন জাতি এই ধর্মঠাকুরের পূজার পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডোমগণ নানা কারণে তাহাদের আদিম বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে; তখন তাহাদের পরিত্যক্ত মন্দিরসমূহ অন্যান্য নিম্ন জাতি, কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চজাতিও, অধিকার করিয়া লইয়াছে। ডোমজাতির উত্থান-পতনের সঙ্গেই ধর্মপূজার ইতিহাস জড়িত।

H. H. Risley তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ *Tribes and Castes of Bengal*-এ (Vol. 1) ডোম জাতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু পশ্চিম বাংলার ডোম যে এক স্বতন্ত্র জাতি—বিহার কিংবা অন্যান্য অঞ্চলের ডোমের সঙ্গে

[১] 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' (কলিকাতা, ১৩০৮), পৃ. ৫৬

তাহাদের যে পার্থক্য আছে—সে সম্বন্ধে তিনি কিছু উল্লেখ করেন নাই। এই বিষয়টি সর্বপ্রথম W. B. Oldham-এর দৃষ্টিতে পড়িয়াছিল, কিন্তু তিনি ইহার আর বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই। পশ্চিম বাংলার ডোম জাতির উদ্ভব ও পরিচয়কে তিনি 'inexplicable' বলিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থ *Some Historical and Ethnic Aspects of the Burdwan District* (Calcutta, 1894) নামক গ্রন্থে বর্ধমান জিলার ডোম জাতি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, (p. 17), 'The inexplicable Doms are over 50,000 strong ; none of them as far as my enquiries went, calling themscvles Maghaihia, as do the most settled and respectable section of the race in the Katauri land (in Bihar), and its most nomad and criminal portion in Saran, Champaran and Gorakhpur.'

বর্তমানে বিহারে একশ্রেণীর ডোম আছে, বাংলার প্রান্তবর্তী জিলাসমূহেও তাহাদের সংখ্যা কম নহে, তাহারা নিজেদের মঘৈয়া বা তুরী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। তাহাদের সঙ্গে ধর্মপূজার কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু মানভূম প্রমুখ বাংলার সংলগ্ন জিলাসমূহে আর একশ্রেণীর ডোম এখন বাংলাদেশ হইতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহারা নিজেদের বাঙ্গালী ডোম বলিয়া পরিচয় দেয়। মঘৈয়া কিংবা তুরী ডোমদিগের সঙ্গে তাহাদের কোন প্রকার সামাজিক সম্পর্ক নাই, তাহাদের মাতৃভাষা বাংলা, মানভূম জিলায় বাস করিলেও মঘৈয়া ডোমগণ হিন্দী ভাষাই বলিয়া থাকে, অতএব তাহারা হিন্দী ভাষাভাষী কোন অঞ্চল হইতে গিয়া ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছে, বাঙ্গালী ডোমগণ স্বভাবতঃই বাংলাদেশ হইতে সে দেশে গিয়াছে।

বাংলাদেশে ডোম যে অত্যন্ত এক প্রাচীন অধিবাসী এই বিষয়ে বাংলার প্রাচীন সাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতিতে কিছু কিছু প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। শুধু প্রাচীন অধিবাসীই নহে, সমাজের মধ্যে তাহাদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল, তাহা কেবলমাত্র তাহাদের সামাজিক সংহতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, আধ্যাত্মিক সাধন-ভজন ও দৈহিক শক্তির ক্ষেত্রেও তাহা বিস্তৃত হইয়াছিল। খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালে প্রাচীন বাংলাভাষায় রচিত বৌদ্ধগান ও দোঁহা গ্রন্থে ডোম্ব বিশেষতঃ ডোম্বী (ডুম্নী) সম্পর্কে যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয়, দেশের সাধন-ভজনের মধ্যে তাহারা একটু বিশেষ অং

গ্রহণ করিয়াছিল। তারপর বাংলাদেশের ছেলেভুলানো যে-সব ছড়া আজিও শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কোন কোনটির মধ্যেও ডোম জাতির বীরত্বের কাহিনীই কীর্তন করা হইয়াছে। যেমন 'আগডুম, বাগডুম, ঘোড়াডুম সাজে', ইহা একটি ডোম চতুরঙ্গ সেনার বর্ণনা বলিয়াই মনে হয়। বাদ্যকারের বৃত্তি ডোম জাতির জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায়, সেই সূত্রে তাহারা বাংলার লোক-সংস্কৃতিতে ডমরু বা ডম্বরু (ডোম্-উরু) প্রমুখ বাদ্যযন্ত্র দান করিয়াছে। রাঢ়ের জাতীয় উপাদানে গঠিত মধ্যযুগের বাংলার লোক-সাহিত্যে ধর্মমঙ্গল নামক যে আখ্যান-কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছিল,—ইহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি,—তাহা প্রকৃতপক্ষে এই ডোম জাতিরই বিজয়-গাথা।

ডোম জাতি পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী উপজাতীয়দিগের মত মূলতঃ অস্ট্রিক ভাষা-ভাষী ছিল বলিয়া মনে হয়। ডোম শব্দটি যে অস্ট্রিক ভাষা হইতেই আগত, এই বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় নাই। এ'কথা অতি সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, যখন আমাদের পূর্বালোচিত আদিম সূর্যোপাসনা আসাম হইতে মধ্যপ্রদেশের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন আদিম জাতির শাখার মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তখন রাঢ়ের অধিবাসী ডোম জাতিও ইহার প্রভাব হইতে পরিত্রাণ পায় নাই—তখন হইতেই তাহাদের মধ্যে সাদা পশু কিংবা সাদা পক্ষী বলি দিয়া ভূমি কিংবা নারীর উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাহার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। তারপর ঐতিহাসিক যুগে রাঢ়দেশে ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুপ্রভাব বিস্তৃত হইল। তাহার ফলে এই অঞ্চলের ডোম জাতির সামাজিক সংহতি বিনষ্ট হইল, যে সমাজের উপর তাহারা প্রভুত্ব করিত, সেই সমাজের উপর নবাগত ব্রাহ্মণ সমাজ আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ডোম জাতির সামাজিক সংহতি অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল; সেইজন্য আজ পর্যন্তও সকল অঞ্চলে অন্ততঃ ডোম জাতির নিজস্ব Supreme God-এর পূজা সম্পর্কে ব্রাহ্মণজাতির এই প্রয়াস সর্বাংশে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। উপরের বর্ণনাই ইহার প্রমাণ।

সাধন-ভজনের পরবর্তী যুগে যখন রাঢ়ের উপর বহিরাগতের আক্রমণ সুরু হইল, তখন ডোম জাতি তাহাদের দৈহিক শক্তির উৎকর্ষের জন্য এক পরাক্রমশালী যোদ্ধ জাতিতে পরিণত হইল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। সেই যুগেই উপরি-উদ্ধৃত ছেলে-ভুলানো ছড়ার রচনার যুগ। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে একদিকে তাহাদের যেমন উচ্চ চরিত্রগুণের কথা কীর্তিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই

তাহাদের পরাক্রমশীলতার কথাও কীর্তিত হইয়াছে। যে জাতির কোন নৈতিক ঐতিহ্য নাই, তাহার মধ্যে উচ্চ চরিত্র-গুণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। ডোম জাতির পরাক্রমশীলতা তাহার নৈতিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল; মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গলের ব্রাহ্মণ কবিগণও তাহাদের মহিমা-কীর্তন না করিয়া পারেন নাই। মধ্যযুগে রাঢ়দেশ বহিরাগতের আক্রমণের ফলে নানাভাবে উপদ্রুত হইয়াছিল, যেমন পাল রাজত্বে গৌড়ীয় পালরাজদিগের রাঢ় আক্রমণ, ইহার কথা ধর্মমঙ্গল কাব্যেই বর্ণিত আছে, সেন রাজগণের রাঢ়দেশের প্রতিষ্ঠা স্থাপন, পাঠান আমলে বাংলার হুসেন সাহের সঙ্গে উড়িষ্যার প্রতাপ রুদ্রের যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির ফলে রাঢ়দেশকে সর্বদাই বহিরাক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; বিভিন্ন স্থান হইতে এই সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তাহাতে মনে হয়, এই সকল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে ডোম সৈন্যগণ প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। তারপর আরও পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুর ও স্থানীয় অন্যান্য রাজগণ নিজেদের রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার জন্য ডোম, মাল, বাগ্দী প্রভৃতিকে সৈন্যরূপে ব্যবহার করিতেন। তখন পর্যন্ত বাঙ্গালী ডোম জাতির সামাজিক সংহতি প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়াই মনে হয়। তারপর ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার পর যখন এই অঞ্চলের বহিরাক্রমণের আশঙ্কা দূর হইয়া যায়, তখন স্বভাবতঃই ডোম সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাদের সৈন্যবৃত্তি লুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর আর এক নূতন বিপদ দেখা দেয়। দেশে ডাকাতি প্রভৃতি ঘটনা ঘটিলে পুলিশ তাহাদিগকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে, ডোম জাতির লোক মাত্রকেই পুলিশ 'criminal' বলিয়া গণ্য করিতে থাকে। তাহারা এই কার্যে যে একেবারে নিরপরাধ ছিল, এমনও মনে হয় না; কারণ যুদ্ধবৃত্তি যাহাদের দীর্ঘকাল ব্যবসায় ছিল, তাহারা সহজে নিতান্ত নিরীহ কৃষক বনিয়া যাইতে পারে না। এই সূত্রে তাহাদের উপর পুলিশের কিছু অত্যাচারও চলিতে থাকে। ডোম তাহাদের প্রতিবেশী বাউরীর মত নহে। বাউরীর কোন ইতিহাস নাই, কোন ঐতিহ্য নাই, তাহাদের মান-অপমানও নাই। কিন্তু ডোমের ইতিহাস আছে, তাহাদের আত্মমর্যাদাবোধও আছে। পুলিশের এই অত্যাচার সহ্য করা অপেক্ষা তাহারা দেশত্যাগ করিয়া ক্রমে ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। সেই সূত্রে তাহাদের Supreme God-এর বা ধর্মঠাকুরের নামটি ঐসব অঞ্চলে বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ডোমজাতি নিজের দক্ষতার বলে অনেক ক্ষেত্রেই আদিম জাতিকে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহাদের নিজস্ব দেবতার

নামটির ব্যাপক প্রচার তাহাদের অন্যতম। ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার প্রায় সকল আদিম জাতি অধ্যুষিত গ্রামেই ডোমগণ এখন কেহ চৌকিদার কিংবা কেহ মহাজনের কাজ করিয়া থাকে। তাহাদের ভাষা এখন ভোজপুরিয়া কিংবা ওড়িয়া, বাংলা ভাষা প্রায় কেহই বলিতে পারে না; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই এখনও জানে যে তাহারা এককালে বাংলাদেশের অধিবাসী ছিল, বাংলাভাষা না জানিলেও তাহারা নিজেদের বাঙ্গালী ডোম বলিয়াই পরিচয় দেয়। ইহাদের শারীরিক গঠন ও সামাজিক আচার-বিচার লক্ষ্য করিলে ইহারা যে পশ্চিমবঙ্গেরই পূর্বপুরুষের সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হইয়াছে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাদের মেয়েরা ঠিক বাঙ্গালী মেয়েদের মত করিয়া শাড়ী পরে, চুল বাঁধে; ইহাদের পুরুষেরা এখনও 'ধরম দেবতা'র নাম করিয়া সূর্যদেবতার নিকট সাদা মুরগী বলি দিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, মানভূম জিলা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ধর্মপূজার বিস্তৃত আচারের সঙ্গে আর সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না।

এইবার পশ্চিমবঙ্গের ধর্মপূজার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছে। উপরের আলোচনা হইতে দেখিতে পাওয়া গেল যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত রাঢ় বলিয়া পরিচিত অঞ্চলে ডোম নামক জাতি সুসংহত সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিত। তাহারা এক অতি প্রাচীন পদ্ধতিতে সূর্যদেবতার উপাসনা করিত, তাহাদের মতে সূর্যদেবতা শ্বেতবর্ণ বলিয়া পরিকল্পিত হইত এবং সেই দেবতাকে তাহারা শ্বেতবর্ণের পশু বলি দিয়া তুষ্ট করিত। ইনি তাহাদের সর্বোত্তম দেবতা (Supremo God) ছিলেন। ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ সেই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়া সেই দেবতার মধ্যে নিজেদের ধর্মের কিছু কিছু উপাদান মিশ্রিত করিয়া দিয়া তাঁহাকে নিজেদের বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের পরিকল্পনায় এই দেবতার মৌলিক আদিম উপাদানগুলি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইল না। এইভাবে ডোমজাতির সর্বোত্তম দেবতা সূর্য, বৌদ্ধ নিরঞ্জন ও হিন্দু বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইলেন। অতএব ধর্মপূজার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু উপাদান দেখিয়া ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধ ও হিন্দুধর্মের কিছু কিছু উপাদান দেখিয়া তাহাকে বিষ্ণু বলিয়া দাবী করা ভুল হয়।

ধর্মপূজার মধ্যে সূর্যোপাসনার তিনটি ধারা, যথা—একটি আদিম (primitive), একটি বৈদিক ও একটি পারসিক একত্র মিশিয়া গিয়াছে। অবশ্য বৈদিক ধারাটি ইতিপূর্বেই পৌরাণিক বিষ্ণু-উপাসনার মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই সূত্রে

ধর্মপূজার মধ্যে হিন্দু-প্রভাবিত অঞ্চলে বিষ্ণু-আরাধনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এখন পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের যে ধ্যান-মন্ত্রটি তাঁহার পূজা উপলক্ষে আবৃত্তি করা হইয়া থাকে (পূর্বে দ্রষ্টব্য), তাহার মধ্যে ইহার আদিম পরিচয়ের অর্থাৎ সূর্যরূপের এখনও সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

ধ্যান-মন্ত্রের মধ্যে 'শূন্যমূর্তি' বলিয়া যে কথাটি উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতেই স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার সঙ্গে বৌদ্ধ শূন্যবাদ বা nihilism-এর সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু 'শূন্যমূর্তি'র অর্থ cipher বা circular shaped বা গোলাকৃতি; ইহা সূর্যেরই একটি গুণ, বৌদ্ধধর্মের কিছু নহে। এই অর্থেই শব্দটি 'ধর্মপূজাবিধান' নামক গ্রন্থেও গৃহীত হইয়াছে, ধর্মঠাকুরের বন্দনায় সেখানেও বলা হইয়াছে,

মণ্ডলং বর্তুলাকারং শূন্যদেহং মহাবলম্।
একচক্রধরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্ ॥

এখানে 'শূন্যদেহ'কেই সূর্য বলা হইয়াছে, অতএব শূন্যমূর্তিও যে সূর্য এই বিষয়ে সংশয় করিবার কোনই কারণ নাই।

এখানে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়, ধর্ম নামটির কোথা হইতে উৎপত্তি হইল। যদিও শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, শব্দটি কোন সমোচ্চার্য অস্ট্রিক জাতীয় শব্দের আধুনিক সংস্কৃত রূপ। বৌদ্ধ কিংবা হিন্দু প্রভাবের যুগেই এই অঞ্চলের নবাগত বৌদ্ধ কিংবা হিন্দুগণ যখন নিজেদের মধ্যে এই দেবতার পূজাকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখনই দেবতার নামটিও তাঁহারা এমনই ভাবে সংস্কৃত করিয়া ইহার একটু আভিজাত্য বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে দেবতার অস্ট্রিক নামটি কি ছিল? এই বিষয়ে অনুমান ভিন্ন নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। কিন্তু এই বিষয়ে কোন কিছু অনুমান করিবার পূর্বে একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, ডোমের সঙ্গে যখন দেবতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এই দেবতার নামটির মধ্যেও ডোম কথাটি মূলতঃ কোন না কোন ভাবে বর্তমান থাকা অসম্ভব নহে। কারণ, পূর্বেই দেখাইয়াছি, ইহাদের পরস্পর অতি নিকট সম্পর্কের জন্য ডোম আর ধর্ম প্রায় একার্থবাচক শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাংলার বাহিরেও যেখানেই ডোম জাতি গিয়াছে, সেখানেই ধর্ম বা তাহার সমোচ্চার্য কোন শব্দ, যেমন, 'ধরম', 'দেরাম্ম', 'ধর্মেশ'

ইত্যাদি প্রচার লাভ করিয়াছে। আসাম প্রদেশে ডোমের অধিকার বিস্তৃত হইতে পারে নাই, সেখানে সূর্যদেবতার নামে ধর্ম শব্দও পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই। ছোটনাগপুর অঞ্চলেও যে সকল আদিম সমাজ আজিও সংহত জীবন যাপন করিতেছে, সেখানেও বহিরাগত ডোমের প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে নাই; সেই সকল সমাজের সূর্যদেবতা আদিম জাতির নিজস্ব নামেই পরিচিত। অতএব বাঙ্গালী ডোমের সঙ্গে ধর্ম নামটির সম্পর্ক অতি নিবিড়। সেইজন্য ধর্ম শব্দটির উৎপত্তির মূলেও কোন না কোন ভাবে ডোম শব্দটির অস্তিত্ব কল্পনা করা অসমীচীন হইবে না। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের যে বিভিন্ন স্থানীয় নাম ব্যবহৃত হয়, তাহাতে সর্বদাই 'রায়' কথাটি যুক্ত হইয়া থাকে; যেমন কালু রায়, বাঁকুড়া রায়, বুড়া রায় ইত্যাদি। 'রায়' কথাটি 'রাজ' শব্দ হইতে আসিয়াছে এবং হিন্দুপ্রভাবের যুগেই ধর্মঠাকুরের স্থানীয় নামের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রধানতঃ ডোমদিগের পূজিত দেবতা বলিয়া রাঢ় অঞ্চলে নবাগত বৌদ্ধ ও হিন্দু বসতিস্থাপনকারিগণ বোধ হয় এই দেবতাকে 'ডোম রায়' বলিয়াই উল্লেখ করিত। 'ডোম রায়' হিন্দুপ্রভাবের যুগে ধ্বনিতত্ত্বের (phonology) সাধারণ নিয়মানুসারেই 'ধর্ম' কথাটিতে এই ভাবে পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে; যেমন, ডোম্ রায় > ডোম্‌বা Domra > ডোর্‌মা > ডোর্‌ম > ধর্ম। পশ্চিম বর্ধমানে নিত্যানন্দপুর গ্রামে 'ডেমুর‍্যা' নামক এক ধর্মরাজ আছেন, তাঁহার সঙ্গে ডোম্‌রা বা ডোম রায কথাটির সম্পর্ক থাকিতে পারে। বর্ধমান জিলার ডেম্‌রা, বীরভূম জিলার ডুম্‌রা ও মানভূম জিলার ডুমরাও নামক গ্রামসমূহে প্রাচীন ধর্মমন্দির ও ডোমজাতির ঘন বসতি আছে। ইহাদের সঙ্গেও 'ধর্ম' কথাটির সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়। ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভাবিত যুগে রাঢ়ে প্রচলিত সূর্যদেবতার ডোমের সঙ্গে সম্পর্কিত অনার্য নামটির পরিবর্তে ধর্ম কথাটির ব্যাপক প্রচার হয়—কারণ ধর্ম এক অর্থে বুদ্ধ, আবার হিন্দু পুরাণের মতে যম। তখন ধর্ম নামটিকে বৌদ্ধ সমাজ বুদ্ধ এবং হিন্দু সমাজ যম কল্পনা করিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম যখন হিন্দুধর্মের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিল; তখন ধর্মঠাকুরের বুদ্ধ-পরিকল্পনাও হিন্দু-পরিকল্পনার মধ্যে আসিয়া সংমিশ্রণ লাভ করিল; সেইজন্য ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক বিষ্ণু কিংবা যম বলিয়া কল্পিত হইয়াও নিরঞ্জন বলিয়া অভিহিত হন।

ধর্মপূজা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচার লাভ করিবার ফলে আর

এক দিক দিয়া একটি বড় সুফল দেখা গিয়াছিল। খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মমঙ্গল নামক এক অতি সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। মধ্যযুগের বাংলায় মঙ্গলকাব্য নামে যে এক শ্রেণীর আখ্যান-কাব্য প্রচলিত ছিল প্রধানতঃ তাহাদের আদর্শে ইহা রচিত হইলেও ইহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ইহার ভিত্তি যেমন ঐতিহাসিক তেমনই রাঢ়ের জাতীয় চরিত্র ইহার অবলম্বন। এই দিক দিয়া গতানুগতিক অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ইহার পার্থক্য রহিয়াছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যকে রাঢ়দেশের জাতীয় মহাকাব্য বা 'এপিক' বলা হইয়া থাকে—ইহাই রাঢ়ের রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত। কয়েকটি প্রথমশ্রেণীর কবিশক্তি ইহার সৃষ্টিমূলে নিয়োজিত হইয়া ইহাকে এই অপূর্ব জাতীয় গৌরব দান করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার মধ্যে রাঢ়ের ডোম-চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; শুধু পুরুষ নহে, ডোম নারীগণও বীরত্ব, সাহসিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি গুণে যে কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহে, উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ কবিগণও তাহা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সহিত কীর্তন করিয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলার সমাজে নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের মধ্যে এত মহিমার সন্ধান আর কোথাও পাওয়া যায় না।

ঐতিহাসিকতা

ধর্মমঙ্গল কাব্য যখন রচিত হইয়াছে, তখন আদিম জাতির এই সূর্যদেবতা বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের ভিতর দিয়া আসিয়া এক অভিনব মিশ্র পরিচয় লাভ করিয়াছেন—সেইজন্যই তাঁহার মৌলিক পরিচয়টি পণ্ডিতমণ্ডলীকে এত বিভ্রান্ত করিয়াছে। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেবতা কোনদিনই মুখ্য ছিল না বলিয়াই ইহার সাধারণ পৃষ্ঠপোষকদিগের মধ্যে দেবতার বিষয়ে কোনদিনই ঔৎসুক্য দেখা যায় নাই। বিশিষ্ট ধর্মোপাসনার মাহাত্ম্য বর্ণনা ব্যতীতও ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে ক্রমে ক্রমে এমন সব উপকরণ গিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে, যাহাতে ইহার সত্যকার সাম্প্রদায়িক পরিচয়টি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে ;—পরবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিই ইহার প্রমাণ। ইহাদের মধ্যে ইছাই গোয়ালার বীরত্ব, কালু ডোমের প্রভুভক্তি, কানড়াব তেজস্বিতা, রঞ্জাবতীর পুত্রবাৎসল্য ইত্যাদি এত আকর্ষণীয় হইয়া উঠিল যে, ইহাদের প্রভাবে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে ডোমজাতির মৌলিক সম্পর্কের কথা সকলে বিস্মৃত হইয়া গেল। ইহার কাহিনী একেবারে কাল্পনিক নহে—ইহাতে বর্ণিত চরিত্রগুলির ভিতর দিয়া রাঢ়ের বিশিষ্ট লোকচরিত্রের মহিমাই কীর্তিত হইয়াছে। এই ভাবে ইহা মানুষেরই মহিমা-জ্ঞাপক কাব্য বলিয়া একটি উপজাতীয় দেবতাকে আশ্রয় করিয়া হইলেও ইহার প্রসার ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল।

এই কাব্য প্রচারের কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণও ছিল। যে সময়ে সাধারণতঃ এই ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বিশেষভাবে রচিত হইতে আরম্ভ করে, সেই সময়ের রাঢ়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, তখন সে দেশে অরাজকতার যুগ। ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের সহিত বাংলার নবাব হুসেন শাহের যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গীর আক্রমণ পর্যন্ত রাঢ়দেশ নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। ইহা দ্বারা দেশের আভ্যন্তরিক শান্তি একেবারে লোপ পাইয়াছিল। অতএব তখন স্বভাবতঃই দেশের লোক লাউসেনের যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। এই সকল কারণেও এই বিশেষ লৌকিক দেবতাটির নাম তিন চারিটি জিলার মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিল। জাতীয় কাব্যরস-পিপাসার নিবৃত্তিই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ধর্মঠাকুরের নাম একটা উপলক্ষ্য হইল মাত্র।

পূর্বেই বলিয়াছি, ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তবে তাহা শুধু কবির কল্পনায় কিছু কিছু পল্লবিত হইয়াছে, এই মাত্র। ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন কবিগণ ইহার কাহিনীগত ঐক্য সর্বত্রই রক্ষা করিয়াছেন। অবশ্য এই কাব্য একই স্থানে বিকাশ লাভ করিয়াছিল বলিয়া, ইহাতে কাহিনীগত ঐক্য নষ্ট হইবার কোনও কারণ ছিল না। এখন এই কাব্যোক্ত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আলোচনা করিয়া দেখি।

কাহিনীভাগে উল্লিখিত আছে যে, ধর্মপালের পুত্র যখন গৌড়ের অধিপতি, তখন তাঁহার সামন্তরাজ সোম ঘোষের পুত্র ইছাই বিদ্রোহী হয়। কিন্তু কোনও ধর্মমঙ্গল কাব্যেই ধর্মপালের পুত্রের নামটির উল্লেখ নাই। ঘনরাম চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,

ধর্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর॥
পৃথিবী পালিয়ে স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর।
বীর্যবন্ত পুত্র তার গৌড়ের ঈশ্বর॥

রূপরামের ধর্মমঙ্গলেও পাই,—

মহী নব রাজা স্বধর্মপাল রায়।
তার পুত্র রাজা হয় শুনিতে উল্লাস॥

প্রায় প্রত্যেক ধর্মমঙ্গল কাব্যেই বর্ণিত একটি ঘটনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ধর্মপালেব পত্র এই গৌড়েশ্বর সিন্ধু বা সমুদ্রের ঔরসে রাণী বল্লভার গর্ভে জাত জারজ সন্তান—এই কাহিনী পালরাজদিগের উৎপত্তিমূলক কিংবদন্তী হইতে যে জাত এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' ধর্মপালকে 'সমুদ্র-কুল-দীপ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১] রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গলে ধর্মপালের রাণী বল্লভাকে মান্ধাতা বংশের কন্যা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[২] একজন গুজরাটি লেখকের একখানি সংস্কৃত আখ্যায়িকা-কাব্যে ধর্মপালকে মান্ধাতা বংশের সন্তান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[৩] অতএব দেখা যাইতেছে, ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি পালরাজগণ সম্পর্কিত জনশ্রুতিসমূহ অবলম্বন করিয়াই রচিত। এই সকল জনশ্রুতি বহুলাংশেই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়।

তাহা হইলে এই ধর্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বর কে? পালরাজদিগের বংশ-

---

১ রামচরিত, ১.৪, ২ রামদাস আদক (পরে দ্রষ্টব্য), ১৩৮;

৩ P. L. Paul *The Early History of Bengal*, 1 (Calcutta, 1943)

তালিকা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে গোলযোগ আছে, সেইজন্য এই সম্বন্ধেও নানা জন নানা মত পোষণ করেন। সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত শূন্যপুরাণের ভূমিকায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাংলার প্রাচীন বংশাবলীর উপর নির্ভর করিয়া এই ধর্মপালের পুত্র বলিয়া দ্বিতীয় ধর্মপাল নামক একজন গৌড়ের পালরাজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু স্বতন্ত্র কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ হইতে দ্বিতীয় ধর্মপাল বলিয়া কাহারও পরিচয় উদ্ধার করা যায় না। পালরাজদিগের বংশাবলী সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়, তাহাতে দেখা যায়, ধর্মপালের পুত্র দ্বিতীয় ধর্মপাল বলিয়া কেহ নাই।

পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র ধর্মপাল পালরাজদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে পাল-সাম্রাজ্য উত্তর ভারতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রাজা ধর্মপাল 'পরম ভট্টারক', 'পরমেশ্বর', 'মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি রাজগৌরব-সূচক পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শৌর্যবীর্যের কাহিনী সমাজে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল; সেইজন্য তাঁহার পুত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁহারই নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

ধর্মপালের পুত্রের নাম দেবপাল। তিনি আনুমানিক ৮১০ খৃস্টাব্দ হইতে ৮৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। তিনি তাঁহার খুল্লতাতপুত্র জয়পালের সাহায্যে উৎকল বা কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করেন। পালরাজদিগের ভাগলপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে যে, দেবপালের সেনাপতি জয়পাল উৎকলের রাজাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজাকেও পরাজিত করেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে গৌড়েশ্বরের একজন সামন্ত রাজপুত্র কর্তৃক এই দুইটি উল্লেখযোগ্য অভিযানের কথাই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে কলিঙ্গ-বিজয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কিছু উল্লেখ নাই; সামান্য একটি ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, ধর্মমঙ্গলের কবিগণ ইহা হইতেই লাউসেন কর্তৃক কলিঙ্গ-বিজয়ের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। ইঙ্গিতটি এই যে, তাহারা লিখিয়াছেন, কামরূপের রাজা কর্পূর ধলের কন্যার নাম কলিঙ্গা। কিন্তু কামরূপপতির কন্যার নাম কলিঙ্গা হইতে পারে না। ইহা দ্বারা বিজিত কলিঙ্গ-রাজেরই কন্যার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তবে ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের ভ্রমবশতঃ কামরূপের অধিপতির সঙ্গে কলিঙ্গ রাজকন্যার নাম আসিয়া যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। লাউসেন কর্তৃক কলিঙ্গ ও কামরূপ বিজয়ের দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনী এখানে একত্র মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'রামচরিতে'র ভূমিকায় ধর্মমঙ্গলোক্ত ধর্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বরকে দেবপাল বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, লাউসেন ও ইছাই ঘোষ দেবপালেরই দুইজন সামন্ত রাজা ছিলেন। ইতিহাসে দেবপালের সহিত কামরূপ ও কলিঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতেও তদনুরূপ কাহিনীর সমাবেশ হইতেই অনেকে এই মতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটু গোলযোগ আছে। একখানি তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঢেক্করী বিষয়ের সামন্ত রাজা মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ নিব্বোক শর্মা নামক একজন ব্রাহ্মণকে দিগ্‌ঘ্যাসোদিয়া নামে একখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছেন।[১] তাম্রশাসনখানিতে কোন তারিখের উল্লেখ নাই, কিন্তু স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ লিপিবিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন, ইহা খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই ঈশ্বর ঘোষ ও ধর্মমঙ্গল কাহিনীর ইছাই ঘোষ অভিন্ন,—ঢেক্করী ও ঢেকুর একই স্থানের নাম। তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে,—ঈশ্বর ঘোষের পিতার নাম ধবল ঘোষ, কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে ইছাই ঘোষের পিতার নাম সোম ঘোষ। স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন, "একজনের দুইরূপ নাম থাকা অসম্ভব নয়। কিংবা ময়ূরভট্ট প্রকৃত নাম বিস্মৃত হইয়া অর্থ চিন্তা করিয়া 'সোম' নাম রাখিয়াছেন।"[২]

ধর্মমঙ্গলের ইছাই ও তাম্রশাসনের ইছাই ঘোষ যদি অভিন্ন হয় এবং খৃস্টীয় দ্বাদশ শতকে যদি ঈশ্বর ঘোষ তাম্রশাসন লিখাইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই সময়ে গৌড়েশ্বর দেবপালকে পাওয়া যায় না। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, দেবপালের সময় আনুমানিক নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিয়াছেন। অতএব ধর্মমঙ্গল কাহিনীর মতে এই তাম্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষ দেবপালের সামন্ত রাজা হইতে পারেন না। এই অনুসারে দেখা যাইতেছে, ঈশ্বর ঘোষ আরও প্রায় তিন শত বৎসর পরে আবির্ভূত হন।

সেইজন্য কেহ আবার অনুমান করেন, হয়ত এই গৌড়েশ্বর বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেন।[৩] তিনি দ্বাদশ শতকেই গৌড়ের অধিপতি ছিলেন, তাঁহারই সামন্ত রাজা ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইয়া লাউসেনের হস্তে পরাজিত

১ N. G. Majumdar, *Inscription of Bengal*, (Rajshahi, 1929) III. 154

২ সা-প-প ৩৮, ৭৯; ৩ ঐ

হন। লক্ষ্মণসেনদেব কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। হয়ত লাউসেন তাঁহার এক সামন্ত সেনাপতি ছিলেন, উভয়ের নামে সেন দেখিয়া মনে হয়, তাঁহাদের মধ্যে বন্ধু-সম্বন্ধ ছিল।[১] কিন্তু এই ধারণা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সেনরাজদিগের রাঢ়ভূমির উপরই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব ছিল। তাঁহারা সর্বপ্রথম রাঢ়েই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তথাকার কোন সামন্ত রাজের সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের যুদ্ধবিগ্রহের কোন ইঙ্গিত ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। অথচ পাল-রাজদিগের সঙ্গে রাঢ়ের নিত্য যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পালরাজগণ উত্তর ভারতে বহুদূর রাজ্য বিস্তৃত করিলেও, তাঁহাদের রাঢ় ও বঙ্গে অধিকার স্থাপন করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে। বস্তুত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি পালরাজদিগের রাঢ়ে এই বিদ্রোহ দমনের কাহিনী লইয়াই রচিত। এ'কথা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি।

বিশেষতঃ ধর্মমঙ্গলকাব্যগুলি এক বাক্যে গৌড়েশ্বরকে ধর্মপালের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিতেছে। লক্ষ্মণসেন বহু পরবর্তী কালের লোক, বাংলার ইতিহাসে তাঁহার নাম সুপরিচিত। অতএব তিনিই যদি তখন গৌড়ের রাজা থাকিতেন, তবে ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার বহু পূর্ববর্তী একজন রাজার নামোল্লেখ করিবারও কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। অতএব মনে হয়, তাম্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাহার আর একটি প্রমাণ এই,—ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে আছে যে, ঈশ্বর ঘোষ 'জটোদায়াং স্নাত্বা'[২] অর্থাৎ জটোদা নদীতে স্নান করিয়া এই তাম্রশাসন দান করিতেছেন। এই জটোদা নদী জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত; ইহার বর্তমান নাম ঝড়্দা। 'কালিকা-পুরাণে'ও এই জটোদা নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কামরূপের বর্ণনা সম্পর্কে তাহাতে উক্ত হইয়াছে,—

> জটোদ্ভবা তত্র নদী হিমবৎ-প্রভবা শুভা।
> যস্যাং স্নাত্বা নরঃ পুণ্যমাপ্নোতি জাহ্নবী সমম্॥
> গৌরীবিবাহসময়ে সর্বৈর্মাতৃগণৈঃ কৃতঃ।
> জলাভিষেকো ভর্গস্য জটাজটেষু যঃ পুরা॥
> তৈস্তোয়ৈরভবদ্ যস্মাজ্জটোদাখ্যা নদী ততঃ।[৩]

[১] ঐ ৮০ [২] N. G. Majumdar, 154.

[৩] কালিকা-পুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত (বঙ্গবাসী, ১৩১৬), ৪৯৭

অতএব যে নদী হিমালয় হইতে উৎপন্ন ও কামরূপের নিকটে অবস্থিত, তাহার সহিত রাঢ়ের কোন সম্পর্ক থাকিবার কথা নহে।

বিশেষতঃ ধর্মমঙ্গলসমূহে প্রদত্ত ইছাই ঘোষের পিতার নামের সহিত এই তাম্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষের পিতার নামের ঐক্য নাই। সোম ঘোষও সংস্কৃত নাম, অতএব ইহাও অসম্ভব যে, ইছাই ঘোষ নিজের নামকে সংস্কৃত করিয়া যেমন ঈশ্বর ঘোষ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে, তেমনই পিতারও লৌকিক নামের পরিবর্তে সংস্কৃত নাম ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম সোম ঘোষ হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে তাহা সংস্কৃত তাম্রশাসনে ব্যবহার করিতে পারিতেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুমান করেন, এই তাম্রশাসনোক্ত ঢেক্করী রাঢ়ের অন্তর্গত নহে, বরং আসাম-প্রদেশের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জিলায় অবস্থিত। আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের অনেকেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। এই ঈশ্বর ঘোষ তাঁহার তাম্রশাসনে কোন সার্বভৌম রাজার অধীনতার কথা উল্লেখ করেন নাই; ইহাতে মনে হয়, দ্বাদশ শতাব্দীতে পালরাজগণ যখন হতবল হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন তাঁহাদের এই একজন সামন্ত রাজা নিজেকে স্বাধীন বলিয়াই বিবেচনা করিতেছিলেন। মনে হয়, তিনি রামপালের সমসাময়িক, অতএব দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁহার পক্ষে উক্ত তাম্রশাসন লিপিবদ্ধ করা সম্ভব।

অনেকে অবশ্য লিপি-বিশেষজ্ঞদিগের নির্দেশ অমান্য করিয়াও তাম্রশাসনের ঈশ্বর ঘোষকে তিনশত বৎসর পূর্বে লইয়া গিয়া ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষের সঙ্গে অভিন্নতা সম্পাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, লিপি-বিশেষজ্ঞ-দিগের মত অগ্রাহ্য করিবার পূর্বে তাহার যথেষ্ট কারণ প্রদর্শন করাইয়া লওয়া প্রয়োজন। শুধু ইছাই ঘোষ ও ঈশ্বর ঘোষের নামের সামঞ্জস্য হইতেই বিজ্ঞান-সম্মত একটি প্রমাণকে এত সহজে উপেক্ষা করা যায় না। তদুপরি সোম ঘোষ, ধবল ঘোষ, ঢেক্করী, ঢেকুর—ইহাদের মধ্যেও নিঃসন্দেহে অভিন্নতা কল্পনা করা যায় না। কেহ আবার এই তাম্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষকে ধর্মমঙ্গল কাব্যের ইছাই গোয়ালার বংশধর বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর পালবংশের রাজা রামপালের সভায় আগত যে ঢেক্করীর এক সামন্ত রাজা প্রতাপসিংহের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনিও সেই মতে ঈশ্বর ঘোষেরই বংশধর। কিন্তু নামের পদবী দিয়া মনে হয়, প্রতাপসিংহ স্বতন্ত্র বংশের লোক, অতএব ঢেকুর ও ঢেক্করী এক নহে। তাহা হইলে ধর্মমঙ্গল কাব্যোক্ত গৌড়েশ্বর দেবপাল হইবার পক্ষে আর কোন

বাধা নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, দেবপাল কামরূপ এবং উৎকল জয় করিয়াছিলেন। ভাগলপুরের তাম্রশাসনে পাওয়া যায়, উৎকল ও কামরূপ-বিজয়ে তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা জয়পালই সেনাপতির কার্য করিয়াছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায়, কামরূপ বিজয়ে তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল, এক সামন্ত রাজের পুত্র লাউসেন। এই লাউসেন ও জয়পাল কি এক ? কিন্তু জয়পালের পিতৃ-পরিচয় আছে। জয়পালের পিতা পালরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের দ্বিতীয় পুত্র বাক্‌পাল। গোপালের পুত্র ধর্মপাল হইতে যেমন দেবপাল, তেমনি বাক্‌পাল হইতে জয়পাল ; এই সূত্রে জয়পাল দেবপালের খুল্লতাতপুত্র। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাহিনীতে লাউসেনের পিতা কর্ণসেন। অতএব জয়পাল ও লাউসেন এক হইতে পারে না। ধর্মমঙ্গল ব্যতীত লাউসেনের কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমন কি শূন্য-পুরাণেও লাউসেনের নাম নাই। অতএব কোনও ঐতিহাসিক সূত্র হইতে তাঁহার পরিচয় সন্ধান করা অসম্ভব।

কিন্তু লাউসেনের কাহিনী একেবারেই অনৈতিহাসিক বলিয়াও উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির একমাত্র নায়কই এই লাউসেন, অতএব একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া এত বড় একটা ঐতিহাসিক কাব্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। সেইজন্য মনে হয়, ইহার মূলে সামান্য হইলেও ঐতিহাসিক ভিত্তি বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কবিগণ তাহার উপরে কল্পনার এমন বিরাট সৌধ তুলিয়াছেন যে, তাহার নীচ হইতে তাঁহার চরিত্রের ঐতিহাসিক পরিচয়টি উদ্ধার করা এক প্রকার দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য অনেকেই তাঁহার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান হইয়াছেন। লাউসেনের নাম যে একমাত্র ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতেই উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নহে, বাংলা পঞ্জিকায় কলিকালের রাজচক্রবর্তীদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে লাউসেনের নামও অদ্যাবধি উক্ত হইয়া থাকে। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ লবসেন নামক গৌড়ের একজন রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। তিব্বতীয় জনশ্রুতি অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লবসেন পালরাজ যক্ষপালের মন্ত্রী ছিলেন। লবসেন যক্ষপালকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে রাজা হন। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় পালরাজগণের যে নামের তালিকা পাওয়া যায়, তাহাতে যক্ষপাল কিংবা লবসেন কাহারও নাম পাওয়া যায় না। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তারানাথের উক্তির উপর কোনও ঐতিহাসিক গুরুত্ব না দিলেও, এই কাহিনী যে কোন বিশিষ্ট জনশ্রুতি হইতে গৃহীত, তাহা

স্বীকার করিতে হয়। অনেকে লবসেন ও লাউসেনকে অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন। "বর্ধমান জেলার অজয় নদের দক্ষিণে ইছাই ঘোষের দেউল আছে। ইহার নিকটে 'লাউসেন কুণ্ড' নামে এক পুকুর আছে। সে অঞ্চলের ডোমেরা ১৩ই বৈশাখ এই পুকুরে স্নান করিয়া স্বজাতি কালুবীরের তর্পণ করিয়া থাকে।"[১] ধর্মের নিকট মানসিক করিয়া পুত্র লাভ করিলে সাধারণতঃ রাঢ়ভূমিতে সেই ছেলের নাম রাখা হয় লুইধর কিংবা লাউসেন। এই সকল কারণে মনে হয়, লাউসেন নিতান্তই অনৈতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না। তবে তাঁহার পরিচয় কি, কোন্ কালেই বা তিনি বর্তমান ছিলেন ?

'শূন্যপুরাণে' লাউসেনের কোন উল্লেখ নাই। এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। কিন্তু অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দীতে সঙ্কলিত ধর্মপূজার মাহাত্ম্যসূচক এই গ্রন্থখানিতে ধর্মভক্ত লাউসেনের কোন উল্লেখ না দেখিয়া মনে হয়, ধর্মপূজার স্বতন্ত্র কোন কাহিনীর ধারা (tradition) হইতে তিনি আসিয়াছেন, ধর্মপূজার মৌলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার কোন সংযোগ ছিল না। প্রাচীনতম ধর্মসাহিত্যের কাহিনীর নায়ক ছিলেন এক পৌরাণিক রাজা হরিশ্চন্দ্র, তাঁহার সম্বন্ধেও পরে আলোচনা করিয়াছি। সম্ভবতঃ ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্টই লাউসেনের কাহিনীর সর্বপ্রথম প্রবর্তক। কারণ, পরবর্তী সমস্ত ধর্মমঙ্গলের কবিই এই বিষয়ে আদি কবি ময়ূরভট্টের পন্থানুসরণ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লাউসেনকে লইয়া ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হইবার পর উক্ত হরিশ্চন্দ্র রাজার অনৈতিহাসিক কাহিনী ইহাতে নিতান্ত অপ্রধান হইয়া পড়িল। কিন্তু তৎপূর্বে যে হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনীই ধর্মসাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ধর্ম-সাহিত্যের উদ্ভবের কিছুকাল পরে লাউসেনের আবির্ভাব হয়। লাউসেনের পিতার নাম কর্ণসেন। তিনি গৌড়েশ্বরের অধীন ত্রিষষ্ঠীর গড় বা ঢেকুরের সামন্ত রাজা ছিলেন। বর্ধমান জিলার পশ্চিম সীমান্তে সেনপাহাড়ী পরগণায় বর্তমান গৌরাণ্ডি গ্রামের নিকট কর্ণগড় নামে একটি স্থান প্রাচীন মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই কর্ণগড়েই কর্ণসেনের বাস ছিল। অতঃপর ইছাই ঘোষ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া তিনি দক্ষিণে ময়নানগরে চলিয়া যান এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লাউসেন গৌড়ের অধীনস্থ সামন্ত রাজা হন। ইতিহাসে পাই, দেবপাল উৎকল বা কলিঙ্গ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ

---

[১] সা-প-প ৩৮, ৮৩

বা কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। বর্তমান মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ প্রাচীন উৎকলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ দেবপাল লাউসেনকে তাঁহার এই বিজিত রাজ্যের সামন্ত রাজা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ময়নানগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, ময়নানগর রাঢ়ভূমির দক্ষিণে এবং সমুদ্রের একেবারে তীরবর্তী। ঘনরাম চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, 'ময়নানগর বাটি সাগর সমীপ'। ইহা হইতেই মনে হয়, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমার দক্ষিণভাগে ময়নানগর অবস্থিত ছিল। তমলুক মহকুমায় ময়না নামক এখনও একটি স্থান আছে। সে সম্পর্কে উল্লেখিত হইয়াছে,—

'Mayna—A village in the Tamluk sub-division, situated 9 miles south-west of Tamluk. It contains a Police Outpost and an old fort, called Maynagarh, situated on the western bank of the Kāsāi, a little above its junction with the Kāliāghāi. The fort was evidently constructed by excavating two great moats, almost lakes, so that it practically stands on an island within an island. The earth of the first was thrown inwards, so as to form a raised embankment of considerable breadth, which, having become overgrown with dense bamboo clumps, was impervious to any projectile that could have been brought against it 100 years ago. Inside the larger island, the outer edge of which is this embankment, another lake has been excavated with the earth thrown inwards, forming a large and well-raised island about 200 yards square. On this stands the residence of the Mayna raj.

According to the family records, the fort was originally constructed by one semi-mythical heroes of Midnapur, Raja Lausen, in the days when the district was under the dominion of the kings of Gaur. At the time of the Maratha ascendancy, the descendant of Lausen was ousted, owing to default of payment of usual tribute, and the possession of Mayna was made over to Bahubalendra (বাহুবলেন্দ্র), the founder of the Mayna raj.'[১] শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, 'বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বর্তমান 'ময়নাপুর'ই ময়নানগর। কারণ, এই গ্রামে রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ

[১] L. S. S. O' Malley, *Bengal District Gazetteers, Midnapur*, Calcutta, 1911, pp. 207-208.

এতকাল পর্যন্ত বাস করিয়া আছেন। গ্রামে পাঁচটি ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে—যাত্রাসিদ্ধি, বাঁকুড়া রায়, ক্ষুদি রায়, শীতল নারায়ণ ও চাঁদ রায়'।[১] কিন্তু এই দাবী গ্রহণযোগ্য নহে।

তাহা হইলে ইছাই ঘোষই কি একেবারে কাল্পনিক? এই সম্বন্ধে একমাত্র প্রাচীন কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করা ছাড়া আর উপায় নাই। কিংবদন্তীর মূলেও কিছু না কিছু সত্য থাকে। সেইজন্য এই সম্বন্ধেও যথাসম্ভব আলোচনা করা যাইতেছে। অজয় নদের তীরবর্তী জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুলির পূর্বদিকে এক বিস্তীর্ণ অরণ্য আছে। এই অরণ্যের নাম শ্যামারূপার গড়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, ইহাই ঢেকুর বা ত্রিষষ্ঠীর গড়—এখানে ইছাই গোয়ালার পূজিত ভবানীর দেউল ছিল; অরণ্যমধ্যে এখনও একটি চতুষ্কোণ ভগ্ন দেউল আছে; লোকে বলে, ইহাই সেই প্রাচীন দেউল। কিন্তু মন্দির-বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন, দেউলটি আধুনিক। দেউলের ভিতরেও কোন দেবতা নাই, আবদ্ধ একটি কৌটার মত জিনিস দেবতা বলিয়া পূজা করা হয়। প্রাচীন মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেই কর্ণগড় অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ মনে করেন, 'এখানে কর্ণসেনের বাড়ী ছিল, এবং এখানে তিনি পরাজিত হইয়া দক্ষিণে পলায়ন করিয়াছিলেন।'[২]

বঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে অজয় নদের দক্ষিণতীরে সেনপাহাড়ী পরগণার অন্তর্গত গৌরাঙ্গি নামে একটি স্থান আছে। এখানে ইছাই গোয়ালার রাজধানী ছিল বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইহার অদূরে অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী বর্তমান। ধর্মমঙ্গল কাব্য হইতে জানিতে পারা যায়, ইছাই গোয়ালার গড় পর্বত দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ঘনরাম লিখিয়াছেন,

চৌদিকে পাহাড় বেড়ি বাড়ী গড়
দুর্গম গহন কাটি।
করিয়া চত্বর বসাল নগর
রাজার বসত বাটি॥

এখানে একটি প্রাচীন মন্দির আছে। সেনপাহাড়ী পরগণার নামেও সেন রহিয়াছে, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, গৌরাঙ্গির

[১] শূন্যপুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা, ৭৩।
[২] রামচরিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ৩৫ শ্লোক. টীকা।

কিংবদন্তী সত্য হইতে পারে।[১] অবশ্য সেনপাহাড়ী কিংবা সেনভূম পরগণার নাম হইতেই, ইহার সহিত কর্ণসেনের কোন সম্পর্ক কল্পনা করা সমীচীন নহে। কারণ, একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাংলার সেন রাজবংশের প্রথম কয়েকজন রাজা এই অঞ্চলেই বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন। অতএব লক্ষ্মণ সেন, বল্লাল সেনের পূর্বপুরুষের নাম অনুসারেই যে স্থানীয় পরগণাগুলির নাম সেনভূম ও সেনপাহাড়ী হইয়াছে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ, তাঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই বিষয়ে বর্ধমান গেজেটিয়ারে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও বিবেচ্য। বর্ধমান গেজেটিয়ারে বলা হইয়াছে যে, বর্ধমানের রাজা চিত্রসেনের নামানুসারে এই পরগণাগুলির এই মত নামকরণ হইযাছে। উক্ত কিংবদন্তী দুইটি বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, সম্ভবতঃ ইছাই গোয়ালা বর্তমান গৌরাণ্ডির নিকটেই তাঁহার পার্বত্য দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তবে যে মন্দিরটি বর্তমানে তথায় ভগ্নদশায় পতিত হইয়া আছে, তাহা ইছাই গোয়ালার ভবানী-মন্দির ছিল না, তাহা নিশ্চিত। অবশ্য পূর্ববর্তী কোন জনশ্রুতির উপর মন্দির পরবর্তী কালেও নির্মিত হইতে পারে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেনের পিতা কর্ণসেনকেও কেহ কেহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। মালদহে অনুষ্ঠিত শিবের গাজনে যে লৌকিক ছড়া গীত হইয়া থাকে তাহাতে উল্লিখিত হয়,

কাউসেন দত্তের বেটা নয়সেন দত্ত।
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত ॥[২]

সাধারণের বিশ্বাস, এই কাউসেন কর্ণসেন ও নয়সেন লাউসেন। অবশ্য ধর্ম-ঠাকুরের সঙ্গে শিব যে সময় অভিন্ন হইয়াছিলেন, তখনই লাউসেনকে শিবপূজার প্রবর্তক বলিয়াও কল্পিত হওয়া আশ্চর্য কিছুই নহে। এই সকল লোক-প্রবাদেরও বিশেষ একটা মূল্য আছে। মনে হয়, লাউসেনের পিতৃপরিচয়ও সাধারণের অজ্ঞাত ছিল না, অতএব কর্ণসেনও সমসাময়িক সমাজে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিই ছিলেন এবং পুত্রের প্রতিষ্ঠা কতকটা এই পিতৃ-পরিচয়ের উপরও নির্ভর করিয়াছিল।

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে হরিশ্চন্দ্রের পালা নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। লাউসেন যেমন নিজের দেহ নয় খণ্ড করিয়া কাটিয়া ধর্মের পূজা করিয়াছিলেন, এই

---

১ সা-প-প-প ৩৮, ৭৯, পাদটীকা ২ ব-সা-প ১৫৭

অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাজা হরিশ্চন্দ্রও তেমনই ধর্মের আদেশে নিজের পুত্রকে বলিদান করিয়াছিলেন। লাউসেনের কাহিনী ধর্মসাহিত্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই তাহাতে কীর্তিত হইত বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রাচীনতম ধর্মসাহিত্যে এই লাউসেনের কাহিনী নাই, হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই আছে। কতকগুলি বিষয়ে এই কাহিনীটির একটু বিশেষ গুরুত্ব আছে; সেইজন্য সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করিতেছি;—

নিঃসন্তান রাজা হরিশ্চন্দ্র মহিষী মদনাকে লইয়া একদিন মনের দুঃখে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে বল্লুকা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল, সন্ন্যাসী ছদ্মবেশী ধর্ম। সন্ন্যাসীর নিকট রাজা তাঁহার দুঃখের কথা জানাইলেন, শুনিয়া সন্ন্যাসী রাজাকে পুত্রলাভের বর দিলেন; কিন্তু সর্ত রহিল, পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে ধর্মের উদ্দেশ্যে বলি দিতে হইবে। রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। যথাসময়ে তাঁহার এক পুত্র হইল, তাহার নাম রাখিলেন, লুইচন্দ্র (বা লুইদাস)। পুত্র পাইয়া রাজা অঙ্গীকারের কথা বিস্মৃত হইলেন। একদিন সেই ধর্মরূপী সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া রাজবাড়ীতে আসিয়া অতিথি হইলেন। রাজাকে জানাইলেন, রাজপুত্র লুইচন্দ্রের মাংস ব্যতীত অন্য কিছু তিনি আহার করিবেন না। রাজা ও রাণীর অনেক কাতর অনুনয় সত্ত্বেও তিনি নরমাংস ভক্ষণের অভিলাষ ত্যাগ করিলেন না। অগত্যা রাজরাণী লুইচন্দ্রকে কাটিয়া তাহার মাংস রন্ধন করিয়া অতিথিকে পরিবেশন করিলেন। অতিথি সেই মাংস তিনটি থালায় পরিবেশন করিতে বলিলেন। তিনি একা সেই মাংস খাইবেন না, রাজা ও রাণীকেও তাঁহার সঙ্গে বসিয়া খাইতে হইবে। তিন জনই খাইতে বসিলেন, রাজা গ্রাস তুলিতে যাইবেন, এমন সময় অতিথি রাজার হাত ধরিয়া ফেলিয়া আত্ম-পরিচয় দিলেন। রাজ-দম্পতির ভক্তিতে অসীম সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বর দিতে চাহিলেন। রাজারাণী পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। ধর্ম বলিলেন, লুইচন্দ্র জীবিত আছে,—সে গাজনে বেত হাতে করিয়া নাচিতেছে। রাজারাণী পুত্র ফিরিয়া পাইলেন।

এই কাহিনীটি অত্যন্ত প্রাচীন। কারণ, বাংলা দেশে প্রচলিত দাতা কর্ণের উপাখ্যানটিও এই কাহিনীরই অনুরূপ এবং তাহাও এই হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী হইতেই আসিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন।[১] কর্ণের নামের সহিত এই

[১] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্র পালা', বঙ্গশ্রী ১, ৩১৭।

কাহিনী পরবর্তী কালে এই দেশে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে বলিয়া সংস্কৃত মহাভারতেও এই কাহিনী দৃষ্টিগোচর হয় না। এমন কি, কাশীরাম দাসের মহাভারতেও ইহা নাই। ১০৮৪ বঙ্গাব্দের অর্থাৎ ১৬৭৭ খৃস্টাব্দের একখানি বাংলা পুঁথিতে দ্বিজ কবিচন্দ্র রচিত দাতা কর্ণের কাহিনীটি প্রথম পাওয়া যায়।[১] সম্ভবতঃ তিনি হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীকে একটা বিশেষ আভিজাত্য দিবার জন্য ধর্মমঙ্গল কাহিনী হইতে তাহা আনিয়া ইহাতে কর্ণের নাম সংযোগ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হরিশ্চন্দ্র পালা নামে হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যার কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত স্বতন্ত্র কাব্যের সহিতও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।[২] ইহাও মনে হইতে পারে যে, তিনি হরিশ্চন্দ্রের পালা স্বতন্ত্রভাবেই রচনা করিয়াছিলেন। কালক্রমে মহাভারতের প্রভাব বশতঃ তাহাতে হরিশ্চন্দ্রের স্থলে কর্ণের নাম আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ আবার মনে করেন, এই হরিশ্চন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি। স্বর্গত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মতে এই হরিশ্চন্দ্র ঢাকা জিলার অন্তর্গত সাভারের রাজা ছিলেন। তাঁহারই দুই কন্যা অদুনা ও পদুনাকে ত্রিপুরার রাজা গোপীচন্দ্র বিবাহ করেন। কিন্তু কতকগুলি কারণে এই মত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। প্রথমতঃ সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজা যে পুত্র বলিদান করিয়াছিলেন, এই সম্পর্কে কোন লোক-প্রবাদ পূর্ববঙ্গে প্রচলিত নাই। বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে ধর্মঠাকুরের পূজাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অতএব পূর্ববঙ্গের প্রাচীন একটি রাজবংশের একজন খ্যাতনামা রাজা ধর্মঠাকুরের এত বড একজন ভক্ত হইবেন, তাহা কখনই অনুমান করা যাইতে পারে না। তাহা হইলে গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের কাহিনীর মত নানা লোক-গাথায় রাজার এই অপূর্ব অতিথি-সৎকারের কথা পূর্ববঙ্গে প্রচলিত হইয়া পড়িত। কিন্তু পূর্ববঙ্গের কোন লোক-সাহিত্যেই তাহার কোন প্রমাণ পাওযা যায় না ; বিশেষতঃ সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র যে সময়ের লোক তাহার পূর্বেই হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী পশ্চিম বঙ্গের ধর্মসাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অতএব এই মত কোন ক্রমেই গ্রহণ করা যায় না। স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় অনুমান করিয়াছেন, এই হরিশ্চন্দ্র রাজা বর্ধমান জিলার অন্তর্গত অমরার রাজা ছিলেন। তাঁহার মতে রাজা হরিশ্চন্দ্র খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন। কোন কোন ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়, হরিশ্চন্দ্র রাজার রাজধানীর নাম অমরা। ইহা হইতেই স্বর্গত বিদ্যানিধি মহাশয় অনুমান

[১] গ-স ৩৭৪৫ [২] গ-স ৫৪৩৯

করিয়াছিলেন, এই 'অমরা দামোদরের উত্তরে, বর্ধমানের দিকে হইবে'।[১] অবশ্য ইহাই ধর্মপূজার এক প্রকার কেন্দ্রস্থল ছিল, কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী এই স্থানেই যে হইবে তাহার প্রমাণ কি? তিনি এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'বর্ধমান জেলার দামোদরের উত্তরে, মানকর রেল স্টেশনের ঈশান কোণে অমরা-গড় জানিতেছি। সেখানে পুরাতন গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। লোকে বলে, অমরার গড়; কেহ বলে, মহেন্দ্রের গড়, এবং কুতূহলী জনে রাজা মহেন্দ্রের পাটরাণীর নাম অমরাবতী রাখিয়া সেই রাণীর নামে গড়ের নাম কল্পনা করিয়াছে'।

কিন্তু এই অমরার রাজার বংশধরদিগের নিকট যে কুলপঞ্জী আছে, তাহাতে তাঁহাদেব পূর্বপুরুষের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র নামে কাহারও উল্লেখ নাই। তাঁহাদেব আদি পুরুষ রাঘব সিংহ ১০৩৫ খৃস্টাব্দে রাজ্য স্থাপন করেন। রাঘব সিংহের পুত্র গোপাল, তাঁহার পুত্র শতক্রতু ও শতক্রতুর পুত্র মহেন্দ্র ইত্যাদি। এই মহেন্দ্রের নামানুসারেই অমরার গড়কে কেহ কেহ মহেন্দ্রের গড় বলিয়া থাকে। বর্তমানে এই বংশের আদিপুরুষ হইতে ত্রিংশ পুরুষ চলিতেছে। স্বর্গত রায় মহাশয় অনুমান করেন, গোপালের পুত্র 'শতক্রতু নাকি শত যজ্ঞ করিয়া এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শতক্রতু তাঁহার প্রকৃত নাম নয়। বোধ হয় তাঁহার প্রকৃত নাম হরিশ্চন্দ্র।' কিন্তু বংশপঞ্জীতে প্রকৃত নামের উল্লেখ না করিয়া তাঁহার গুণবাচক একটি 'উপাধি' উল্লেখ করিবার রীতি স্বীকার করা যায় না; আর যদি তাহাও স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে তাঁহার নাম যে হরিশ্চন্দ্রই ছিল, তাহারই বা প্রমাণ কি? অতএব বংশপঞ্জিকায় যখন একটি স্বতন্ত্র নাম পাইতেছি, তখন তাহা অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক নামকে সেখানে স্থান দান করা কোন মতেই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

সেইজন্য কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, এই হরিশ্চন্দ্র পৌরাণিক ব্যক্তি। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে এক অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বরুণের বরে একটি পুত্র লাভ করেন, তাহার নাম রোহিত। হরিশ্চন্দ্র পুত্রকে বরুণের নিকট বলি দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। রোহিত একথা জানিতে পারিয়া বনে পলাইয়া যায়। সেখানে অর্থের বিনিময়ে এক লোভী ব্রাহ্মণের একটি পুত্র ক্রয় করিয়া লইয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসে। হরিশ্চন্দ্র নিজের পুত্রের পরিবর্তে তাহাকেই বলি দিয়া বরুণের ক্রোধ-শান্তির আয়োজন করেন। কিন্তু নরবলি দিবার

[১] সা-প-প ৩৮, ৭৭।

জন্য কোন ঘাতক পাওয়া গেল না; অতঃপর সেই ব্রাহ্মণ অধিকতর অর্থলোভে নিজের পুত্রকেই বলি দিতে প্রস্তুত হইল। হস্ত-পদ-বদ্ধ অবস্থায় যজ্ঞস্থলে নীত হইয়া ব্রাহ্মণ-পুত্র বরুণের স্তব করিতে আরম্ভ করিল, বরুণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ-পুত্রও বিশ্বামিত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশ করিল এবং কালক্রমে বেদের কতকগুলি মন্ত্র রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিল। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ', 'কৌষীতকী ব্রাহ্মণ' প্রমুখ বৈদিক সাহিত্য হইতে এই কাহিনী ক্রমে রামায়ণ ও পুরাণে প্রবেশ লাভ করে[১] এবং কালক্রমে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হইতে থাকে। ধর্ম-সাহিত্যে তাহারই আর এক রূপের সহিত আমরা পরিচয় লাভ করি। এই কাহিনীর সহিতই আবার প্রসিদ্ধ পৌরাণিক কাহিনী—কাশীর রাজা হরিশ্চন্দ্র, তৎপুত্র রোহিতাশ্ব ও মহিষী শৈব্যার কাহিনীর সুদূর সম্পর্ক রহিয়াছে।[২] উপরোক্ত একই বৈদিক কাহিনীর এই সমস্তই পৌরাণিক রূপান্তর মাত্র। ইহাদের সহিত ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই।

হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী হইতে জানিতে পারা যায়, হরিশ্চন্দ্র রাজা বল্লুকা নদীর তীরে ছদ্মবেশী ধর্মের সহিত সর্বপ্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ইহার পূর্ব হইতে বল্লুকাতীর ধর্মপূজার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, নতুবা ছদ্মবেশী ধর্ম সেখানে বাস করিবেন কেন? রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত শূন্যপুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়, 'বৈকুণ্ঠেতে জীয়ে ধর্ম বল্লুকাতে স্থিতি' এই কথার উল্লেখ রহিয়াছে। ধর্মসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্বের যে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেও বলা হইয়াছে, আদিদেব সর্বপ্রথম বল্লুকারই সৃষ্টি করিলেন। ধর্মনিন্দক মার্কণ্ড মুনি কুষ্ঠরোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বল্লুকা-তীরেই চন্দন কাঠের ধুনি জ্বালিয়া ধর্মপূজা করিয়াছিলেন। 'ধর্মপূজা-বিধানে'ও আছে, 'শনিবার ব্রত করিল বল্লুকার তীরে।' অতএব দেখা যাইতেছে যে, বল্লুকা নদীর সঙ্গে ধর্মপূজার প্রাচীনতম ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে।

এই বল্লুকা নদী কোথায়? 'ধর্মপূজা-বিধানে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—'বল্লুকা নদী বর্ধমানের নিকট দামোদর হইতে উঠিয়া মৃজাপুরের খালে পড়িয়াছে। নদীটি এখন মজিয়া গিযাছে; সব জায়গায় জল থাকে না, কিন্তু বড়োষাঁনে, বিশেষ ধর্মঠাকুরের মন্দিরের নীচে, একটি বাঁওর হইয়া বেশ চটাল নদীর মত দেখা যায়। উহার জল অতি পরিষ্কার। এই বল্লুকা

১ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭'৩; রামায়ণ ১'৬২ (মন্মথনাথ দত্তের ইংরেজি অনুবাদ)।

২ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ৩১৮।

নদীই ধর্মঠাকুরের তীর্থস্থান।' বর্ধমান শহরের দক্ষিণে দামোদর নদের উপর বাঁধ নির্মাণ হওয়ার পর হইতে এই নদীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, এখন তাহার চিহ্ন একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। মেমারি রেল স্টেশনের দক্ষিণে একটি খাল এখনও বল্লুকা নামে কথিত হয়, ইহাই প্রাচীন বল্লুকার স্মৃতি বহন করিতেছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, বর্ধমান শহরের পূর্ব দিক দিয়া যে বাঁকা নদী প্রবাহিত হয়, তাহাই প্রাচীন বল্লুকা। মনে হয়, এই বল্লুকা-তীরেই রামাই পণ্ডিতের আশ্রম ছিল ;—'শূন্যপুরাণে'ও পাই, 'রামাই পণ্ডিত করে নিত গীত পসন্ন হইল বল্লুকা।' এখনও বল্লুকা তীরে বড়োযাঁনে এক অতি প্রাচীন ধর্মঠাকুর আছেন।

মনে হয়, অপর কোন প্রসিদ্ধ ধর্মপূজারী হইতে বর্ধমানের দক্ষিণে আর একটি স্থান ধর্মপূজার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহা চম্পা নদীর ঘাট। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে পাই, রঞ্জাবতী পুত্র-কামনায় চাঁপায়ের ঘাটে শালে ভর দিয়া ধর্মপূজা করিয়াছিলেন। 'শূন্যপুরাণে'ও আছে, 'স্তান সন্ধ্যা গোঁসাঞির চাম্পা নদীর ঘাট।' দামোদর নদের দক্ষিণে প্রায় সমান্তরাল ভাবে দ্বারকেশ্বর নদী প্রবাহিত। ইহা কোতুলপুর পর্যন্ত আসিয়া দক্ষিণে ক্রমে ঝুমঝুমি ও পরে রূপনারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়া হুগলী ও মেদিনীপুর জিলার উপর দিয়া গিয়া গঙ্গাসাগরে পতিত হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলার পূর্ব সীমান্ত হইতে বর্ধমানের কোতুলপুর পর্যন্ত এই নদী চাঁপাই নদী বলিয়াই কথিত হইত। এখন রূপনারায়ণ পর্যন্ত সমস্ত নদীই দ্বারকেশ্বর বলিয়া কথিত হয়। এই চাঁপাই নদীর তীরেই এক স্থান ধর্মপূজার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, 'কোতুলপুরের ঈশান কোণে দ্বারকেশ্বরের কূলে খন্নগর ও বিহার গ্রাম আছে। বিহারে কালুরায় ধর্মরাজ আছেন। ইহার মন্দির পুরাতন নয়। কিন্তু নিকটে মাটি খুঁড়িতে গিয়া প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, আশে পাশে পুরাতন ইটও পড়িয়া আছে। এইখানে চাঁপায়ের প্রসিদ্ধ ঘাট ছিল। অন্য কোথাও দেহারার চিহ্ন নাই, বিহার নামও নাই'।[১] সম্ভবতঃ এই স্থানেই রঞ্জাবতী পুত্র-কামনায় ধর্মপূজা করিয়াছিলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যোক্ত কাহিনীর স্মৃতি সমগ্র রাঢ়দেশ ব্যাপিয়াই বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বীরভূম জিলার একজন প্রাচীন সাহিত্যসেবী লিখিয়াছেন, 'ধর্মমঙ্গলের লাউসেনের সঙ্গে চণ্ডীদাসের জন্মভূমি নান্নুর অঞ্চলের বিশেষ সংস্রব ছিল।

[১] সা-প-প ৩৮, ৭৮

ধর্মমঙ্গলোক্ত সামন্ত শেখর রাজার রাজধানী জলন্দার গড়, তারাদীঘি, বা কামদলের মাঠ, নানুর হইতে বেশী দূর নহে।' ঐ স্থানের সাঁকুলীপুর নামক স্থানে অবস্থিত সাফুলেশ্বর শিবকেও তিনি ধর্মমঙ্গলের একটি চরিত্র 'সাফুলা'র সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন।[১]

পূর্বেই বলিয়াছি, ধর্মমঙ্গল কাব্যের বর্তমান কাহিনী অর্থাৎ লাউসেনের বিবরণ পরবর্তী কালে ধর্মসাহিত্যের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীনতর ধর্মসাহিত্যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, এই প্রাচীন ধারারই অনুবর্তন করিতে গিয়া খৃস্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি সহদেব চক্রবর্তী লাউসেনের কাহিনীকে তাঁহার কাব্যে স্থান দান করেন নাই। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী তাঁহারও কাব্যের উপজীব্য। অতএব লাউসেনের বিবরণ ধর্মসাহিত্যের মুখ্য কাহিনী নহে। ইহাতেই মনে হয়, রাজা হরিশ্চন্দ্রকে লইয়াই ধর্মমঙ্গল কাহিনীর সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, হরিশ্চন্দ্র পৌরাণিক ব্যক্তি; অতএব তাঁহার কাল নিরূপণ করিয়া এই কাহিনীর উদ্ভবকাল সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছান যাইতে পারে না।

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, রামাই পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি ধর্মপূজার প্রবর্তক বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন। অবশ্য অনুমান করা যাইতে পারে যে, রামাই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের পূজার প্রবর্তক না হইলেও তিনি এই লৌকিক সংস্কারের উপর বৌদ্ধ প্রভাবের কালে তাঁহার বিশিষ্ট একটি পূজা-পদ্ধতির রচয়িতা ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার কালেই হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী ধর্মপূজার সম্পর্কে সর্বপ্রথম কীর্তিত হইতে আরম্ভ করে। তাঁহার নামে প্রচলিত ধর্মপূজাপদ্ধতিতে এই হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর আংশিক উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব তাঁহার কাল নিরূপণ করিতে পারিলেই, প্রাচীনতম ধর্মসাহিত্যের উদ্ভবকাল সম্বন্ধে একটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য এই রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবার কারণ নাই। ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি নামক ধর্মঠাকুরের ডোম পূজারিগণ নিজেদের রমাই পণ্ডিতের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই রমাই পণ্ডিত ও ধর্মপূজার প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত যে এক ব্যক্তি নহেন, সে বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ। রমাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত ধর্মপূজার পদ্ধতি প্রকৃতই তাঁহার নিজের রচিত কিনা, এ' বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ধর্মমঙ্গল

১ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'নানুর', প্রবাসী ১৩৩৩, অগ্রহায়ণ, ১২৫।

কাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি পূজার পুরোহিত মাত্র, সম্ভবতঃ তিনি এই পূজার একটা বিশেষ বিধির প্রবর্তন করেন, তাহাই পরবর্তী কালে তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক অনুসৃত হইতে আরম্ভ করে। মূলতঃ ধর্মসাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার কোন সংস্রব ছিল না। পরবর্তী কালে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার নামে কতকগুলি ছড়া-পাঁচালী রচনা করিয়া ধর্মপূজার আনুষঙ্গিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেগুলি ব্যবহার করিতে থাকে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক রচিত ভারতীয় সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্যের মূলে যেমন একমাত্র বেদব্যাসকেই কল্পনা করা হইয়া থাকে, তেমনি ধর্মপূজার সমস্ত লৌকিক ছড়াই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মপুরোহিত কর্তৃক রচিত হইয়াও একই রামাই পণ্ডিতের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। অতএব রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত ধর্মপূজা পদ্ধতিতে কোন্ সময়ে যে হরিশ্চন্দ্র রাজার গল্প গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে একটা অনুমান করা যায়, এই মাত্র।

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায়, রামাই পণ্ডিত কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর সমসাময়িক লোক। তাঁহারা গৌড়েশ্বর দেবপালের সমসাময়িক বলিয়া তিনিও খৃস্টীয় নবম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অবশ্য এই সম্পর্কে পরবর্তী ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের ঐতিহ্য গ্রহণ করার পূর্বে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ, তাঁহাদের অধিকাংশই ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাব্য রচনা করিতে গিয়া বহুলাংশে যে অনৈতিহাসিক লোকশ্রুতিরই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য। তবু ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, রাঢ়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বেই রামাই পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন। কারণ, তিনি অস্পৃশ্য জাতির লোক হইয়াও তৎকালীন সমাজে এতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন দেখিয়া মনে হয়, কোন ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সেই যুগের তদ্দেশীয় সমাজের সম্মুখে বর্তমান ছিল না। সেইজন্য রামাই পণ্ডিত গৌড়ের পালরাজগণের সময়েই বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি দেবপালের সমসাময়িক কালে খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির এই উক্তি এই ক্ষেত্রে মানিয়া লইতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। অতএব মনে হয়, খৃস্টীয় নবম শতাব্দীর পর রামাই পণ্ডিত কর্তৃক ধর্মঠাকুরের পূজার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি রচিত হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-সূচক নানা কাহিনী লোকগাথার মধ্য দিয়া প্রচার লাভ করে। অতঃপর

প্রাচীনতম মঙ্গলচণ্ডীর গীত ও বিষহরীর গীতের মত তাহা ক্রমে কাব্য-কাহিনীবদ্ধ হয়। কবি ময়ূরভট্টই সর্বপ্রথম এই কাহিনীকে মঙ্গলকাব্যের মর্যাদা দান করেন।

উপরোক্ত রামাই পণ্ডিতের নাম দিয়া 'শূন্যপুরাণ' বলিয়া একখানি পুস্তক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রামাই পণ্ডিত রাঢ়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানের পূর্ববর্তী লোক হইলেও, তাঁহার নামে প্রচলিত এই গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেও মনে হয়, তিনি এই গ্রন্থের রচয়িতা নহেন,—পরবর্তী কালের ধর্ম-পূজারিগণ ইহার সহিত তাঁহার নাম সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থের মধ্যে কোথাও ইহাকে 'শূন্যপুরাণ' বলিয়াও উল্লেখ করা হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার নাম দিয়াছিলেন, 'রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি।' প্রকৃত পক্ষে ধর্মপূজার নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান 'গৃহভরণ' বা 'ঘরভরা' উৎসবের ইহা একটি পদ্ধতি মাত্র। সেইজন্য এই নামই গ্রন্থখানির পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে বৌদ্ধ শূন্যবাদের কথা দেখিয়া ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গ্রন্থ-সম্পাদনকালে ইহার নাম দিয়াছিলেন, 'শূন্যপুরাণ'। গ্রন্থমধ্যে একস্থানে ইহা 'আগম-পুরাণ' বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—'রামাই পণ্ডিত কহএ আগম পুরাণে।' পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, গ্রন্থখানি একজনের রচনা নহে। সম্ভবতঃ খৃস্টীয় দশম শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মপূজারী ইহার বিভিন্ন অংশ স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কোন কোন অংশ গোঁসাই পণ্ডিত নামক কোন ধর্মপূজারী কর্তৃক রচিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীরও পরবর্তী কালে ইহা বর্তমান আকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল। অতএব ইহা হইতে প্রাচীন কোন তথ্য সন্ধানের উপায় নাই।

'শূন্যপুরাণ' সম্পর্কে একটি বিষয় আমাদের আলোচনা করিবার আছে এই যে, ইহা কি আমাদের আলোচ্য মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত? ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়,—প্রথম ভাগে দেবতাখণ্ড বা সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী, দ্বিতীয় ভাগে পূজা প্রবর্তনের ইতিহাস ও তৃতীয় ভাগে চরিতখণ্ড বা লাউসেনের কাহিনী। কিন্তু শূন্যপুরাণে একমাত্র প্রথম খণ্ডটি আছে, তাহাও সুগ্রথিত নহে। মঙ্গলকাব্যের দেবতাখণ্ড মুখ্য বিষয় নহে, বরং চরিতখণ্ডই ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এ কথা সত্য যে, 'শূন্যপুরাণে' পরবর্তী কালে সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যগুলির প্রভাবও কতক আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইজন্য

দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কবিও মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ ভক্ত ও নায়কের জন্য দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন,—

গাএন পণ্ডিত রামএ ধর্মপদতলে।
ভকত নাএকে পরভু রাখিব কুশলে॥
গাএন পণ্ডিত রাম ভাবি নিরঞ্জনে।
ভকত নাএকে ধর্ম রাখিব কল্যাণে॥

দুই এক জায়গায় ইহাকে গীত ও পাঁচালী বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন,—

ধর্মের চরণে গীত পণ্ডিত রামাই গাএ।
পরভুর চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীযুত রামাই রচিল পাঁচালী সঙ্গীত॥

কিন্তু এই সকল লক্ষণ প্রায় মধ্যযুগের সমস্ত রচনা-মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। অতএব ইহা হইতেই 'শূন্যপুরাণ'কে মঙ্গলকাব্যের মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে না। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহা ধর্মপূজার নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান 'গৃহভরণে'র পদ্ধতি মাত্র। অতএব ইহা আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নহে।

তাহা হইলে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির আদি রচনা কি ও তাহার রচয়িতা কে? পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহার কাহিনীর দুইটি স্বতন্ত্র ভাগ আছে। একটি হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী ও অপরটি লাউসেনের কাহিনী। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীটিই প্রাচীনতর। লাউসেনের কাহিনী পরবর্তী কালে ইহাতে সংযোজিত হইয়া ইহার মুখ্যবস্তু হইয়া পড়িলেও, তৎপূর্বে মার্কণ্ড মুনি ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই এই শ্রেণীর কাব্যের উপজীব্য ছিল। ধর্মপূজা-বিধান ও শূন্যপুরাণে মার্কণ্ড মুনি ও হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্মপূজার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাতে হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্রলাভ, ছদ্মবেশী অতিথির নরমাংস প্রার্থনা ইত্যাদি বিস্তৃত কাহিনীর উল্লেখ নাই। পরবর্তী ধর্মমঙ্গলগুলিতে মার্কণ্ড মুনির কাহিনী লোপ পাইলেও, হরিশ্চন্দ্র-পালায় হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী কতকটা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তবে ধর্ম-সাহিত্যে মার্কণ্ড মুনি ও হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী কে আনিল?

সংস্কৃত পুরাণে মার্কণ্ড মুনির নাম অপরিচিত না হইলেও তাহাতে তাঁহার নামে ধর্মসাহিত্যে প্রচলিত কাহিনীর অনুরূপ কোন কাহিনী নাই। হঠযোগের প্রধান একজন অনুষ্ঠাতা রূপে মার্কণ্ড মুনির নাম যোগশাস্ত্রাদিতে উল্লেখিত আছে। তিনি সুপন্থা নামক হঠযোগের একটি বিশিষ্ট প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া হঠযোগের অন্যতম সাধক গোরক্ষনাথের পন্থা হইতে স্বতন্ত্র এক পন্থার নির্দেশ দেন।[১] সম্ভবতঃ মার্কণ্ড মুনির যোগাচারসমূহ ধর্মপূজারীদিগের মনঃপূত ছিল না; সেইজন্য ধর্মসাহিত্যে তাঁহাকে নিন্দাভাজন করা হইয়াছে। মার্কণ্ড মুনি গোরক্ষনাথের সমসাময়িক লোক না হইলেও পরবর্তী কালের লোক হওয়া সম্ভব। ধর্মপূজার উদ্ভবের সময় তাঁহার প্রচলিত যোগাচারের কথা রাঢ়দেশে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্র পালায় দেখিতে পাওয়া যায়, রাণী রঞ্জাবতী

১ "দ্বিধা হঠঃ স্যাদেকস্তু গোরক্ষাদি সুসাধিতঃ।
অন্যোমৃকণ্ডুপুত্রাদ্যৈঃ সাধিতো হঠসংজ্ঞকঃ॥"
কালীচরণ বেদান্তবাগীশ কর্তৃক পাতঞ্জল দর্শন (কলিকাতা, ১৩২৬) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৪১২।

কর্ণসেনকে হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র-বলিদানের কাহিনী শুনাইতে গিয়া পণ্ডিত গোঁসাই রচিত কোন গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন।—

তবে রঞ্জাবতী বলে করি নিবেদন।
পণ্ডিত গোঁসাই গ্রন্থে কহিল যেমন॥[১]

অতএব মনে হইতেছে, পণ্ডিত গোঁসাই ধর্মসাহিত্যে হরিশ্চন্দ্র কাহিনীর আদি রচয়িতা। গোঁসাই পণ্ডিত 'শূন্যপুরাণো'ক্ত পঞ্চম পণ্ডিত বলিয়াই মনে হয়। ইনি রামাই পণ্ডিত নহেন, কিংবা 'পণ্ডিত গোঁসাই-গ্রন্থ' বলিতে 'শূন্যপুরাণ'কেও বুঝাইতেছে না। কারণ, শূন্যপুরাণে হরিশ্চন্দ্র রাজার বিস্তৃত কাহিনী নাই, কেবল তাঁহার ধর্মপূজার কথারই উল্লেখ আছে। অতএব মনে হয়, গোঁসাই পণ্ডিতের অধুনা-বিলুপ্ত কোন গ্রন্থই ধর্মসাহিত্যের আদি-রচনা। অতঃপর লাউসেনের বিস্তৃত কাহিনীর লোকপ্রীতির ফলে, তাহা কালক্রমে সংক্ষিপ্ত হইয়া ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র পালায় কোনভাবে আত্মরক্ষা করিয়া আছে।

ময়ূরভট্ট

পরবর্তী ধর্মমঙ্গলের কবিগণ লাউসেনের কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহাদের পূর্ববর্তী একজন কবিকে এই কাহিনীর আদি-রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার নাম ময়ূরভট্ট। তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত কিছুই জানিতে পারা যায় না, একমাত্র পরবর্তী কবিদিগের কাব্য হইতেই তাঁহার নামের সহিত পরিচয় লাভ করা যায় মাত্র।

মাণিক গাঙ্গুলী লিখিয়াছেন,

বন্দিয়া ময়ূরভট্ট কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্মমঙ্গল॥
বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্মগুণগান॥

ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁহার গীতারম্ভে লিখিয়াছেন,

হাকন্দ পুরাণ মতে, ময়ূর ভট্টের পথে
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম সভায়।
স্থানে স্থানে বন্দিব যতেক দেবদেবী।
ময়ূর ভট্ট বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি॥
ময়ূর ভট্টে বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়॥

---

[১] ঘনরাম, ৩১

গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ধর্মমঙ্গলে লিখিয়াছেন,

আছিল ময়ূর ভট্ট স্থকবি পণ্ডিত।
রচিল পয়ার ছন্দে অনাদ্যের গীত॥
ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্ম-শতদল।
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্মের মঙ্গল॥

সীতারাম দাস লিখিয়াছেন,

ময়ূর ভট্টকে বন্দিয়া মস্তকে
সীতারাম দাসে গায়॥
ময়ূরভট্ট মহাশয় যোগে নিরমল।
প্রকাশ করিল ধর্মের মঙ্গল॥
তাহার স্মরণ করি সবে গাই গীত।
সেই অঙ্ক শুনিলে ধর্মেতে যাবে চিত॥
ময়ূরভট্ট মহাশয়ের স্থন্দর পাঁচালী।
আনন্দে হইল নষ্ট ছুই এক কলি॥[১]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত একখানি নাম-তারিখহীন খণ্ডিত ধর্মমঙ্গলের পুঁথিতে পাওয়া যায়,

যথা তুমি উপনীত তথাই * গীত
তোমা বিনু আনন্দে চঞ্চল।
দ্বিজ ময়ূর ভট্ট বঙ্গে (বন্দে ?) * * গান স্কন্ধে
গাই গীত মঙ্গল॥[২]

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল হইতে উপরে যে পদ দুইটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার শেষটিতে ময়ূরভট্টের সঙ্গে রূপরাম বলিয়া একজন কবিরও বন্দনা রহিয়াছে। কিন্তু রূপরামও ময়ূরভট্টের পরবর্তী কবি এবং তিনিও যে তাঁহাকে বন্দনা করিয়া লইয়া নিজের কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত রূপরামের ধর্মমঙ্গল হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। রূপরাম লিখিয়াছেন, 'ময়ূরভট্টের পদ মনে অনুমানি'। অতএব দেখা যাইতেছে যে,

---

[১] গ-স ৪৯৯৮, শেষ পত্র।

[২] সা-প-প ১৭, (অতিরিক্ত সংখ্যা) ১৭০

ধর্মমঙ্গলের সকল কবিই তাঁহাদের কাহিনী মূলতঃ ময়ূরভট্টের কাব্য হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ময়ূরভট্ট কে ? তাঁহার পরিচয়ই বা কি ?

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণ' নাম দিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ হইতে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।[১] ইহার মূল পুঁথি কিংবা তাহার কোন অনুলিপি পাওয়া যায় না। ১৩১০ সালে লিখিত একখানি মাত্র পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থটি মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদক ইহাকেই ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্টের কাব্য বলিয়া মনে করেন। ইহাতে কবির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, কবি ময়ূরভট্ট লাউসেনের পৌত্র ধর্মসেনের সমসাময়িক। গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করেন, ময়ূরভট্ট খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক।

কিন্তু নানা কারণে এই পুস্তকখানির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। একাদশ শতাব্দীর একজন কবির একখানি গ্রন্থ সহসা বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিলে ইহার সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তাহা গ্রহণ করা উচিত। পুস্তকখানির ভাষা ও ভাবভঙ্গি অত্যন্ত আধুনিক। কিন্তু একখানি এতকাল অপ্রচলিত পুঁথির ভাষা এত আধুনিক হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদগুলি ব্যাপক প্রচলনের জন্য আধুনিকতা প্রাপ্ত হইয়াছে স্বীকার করা যায়, কিন্তু এত প্রাচীন পুঁথি-সংগ্রহের মধ্যে ময়ূরভট্টের আর একখানিও সম্পূর্ণ কিংবা খণ্ডিত পুঁথির পাতাও আবিষ্কৃত হয় নাই। অতএব যদি ইহা খাঁটি পুঁথিই হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত ইহারও ভাষার প্রাচীনত্ব রক্ষা পাইত। বিশেষতঃ এই আধুনিক পুস্তকখানি যাহার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে, স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাহার যে ব্যক্তিগত পরিচয় আবিষ্কার করিয়াছেন[২] তাহাও এই পুস্তকখানির উপর বিশ্বাস স্থাপনের অনুকূল নহে। অতএব এই পুস্তকখানিকে কোনমতেই মাণিক-ঘনরাম-বন্দিত ময়ূরভট্টের রচিত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহা সম্ভবতঃ অত্যন্ত আধুনিক কালে ময়ূরভট্টের নামের উপর অন্য কোন কবি রচনা করিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় মনে করেন, ইহা আধুনিককালে শ্রীআশুতোষ পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তির রচিত। এই রকম প্রয়াস আমাদের দেশে নূতন নহে।

---

[১] ময়ূরভট্ট, শ্রীধর্মপুরাণ, (সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৭) [২] সা-প-প ৩৮, ৬৭।

কিন্তু পুস্তকখানির রচনা আধুনিক হইলেও, ইহাতে ধর্মমঙ্গল কাহিনীর প্রাচীনতর ধারাটিরই অনুসরণ করা হইয়াছে। পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নহে, চরিতখণ্ড বা লাউসেনের কাহিনী ইহাতেও নাই। তবে সংজাত খণ্ডের শেষে চরিতখণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত স্থচী দেওয়া হইয়াছে, পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ বলিয়াই পরবর্তী কাহিনী ইহাতে পাওয়া যায় না। এমনও হইতে পারে যে, ময়ূরভট্টের কোন বিলুপ্ত-প্রায় স্মৃতি-অবশেষ কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ইহা আধুনিক কালে রচিত হইয়াছে; কারণ, ময়ূরভট্টের কোন পুঁথি আবিষ্কৃত না হইলেও তাঁহার রচিত অসংলগ্ন কতকগুলি পদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বীরভূম রতন লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ স্বর্গীয় শিবরতন মিত্র মহোদয়ের প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের মধ্যে ময়ূরভট্টের ধর্মপুরাণও একখণ্ড সংগৃহীত ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১] স্বর্গীয় মিত্র মহাশয় উক্ত পুঁথিখানি এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি সংগ্রাহক স্বর্গীয় রাখালদাস কাব্যতীর্থের নিকট অর্পণ করেন, অতঃপর পুঁথিখানির আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ময়ূরভট্টের এই পুঁথিখানি দেখিয়াছিলেন বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছিলেন।[২] তাঁহার অনুমান, পুঁথিখানি পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখা। ময়ূরভট্ট এই সময়ের লোক হওয়াই খুব সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শাস্ত্রী মহাশয় পুঁথিখানির আর কোন সন্ধান দিতে পারেন নাই, পুঁথিখানি প্রকাশিতও হয় নাই। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'মাণিক গাঙ্গুলী ও ধর্মমঙ্গল' নাম দিয়া ১৩১২ (১ম সংখ্যা) সালে এক লেখক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, ময়ূরভট্টের 'গ্রন্থ এখনও বাঁকুড়া জেলায় প্রচলিত আছে'। কিন্তু তিনিও ইহার আর কোন পরিচয় দিতে পারেন নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে, ময়ূরভট্টের নাম ও কাব্যকীর্তি যে একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা নহে—হয় ত কোন কোন ধর্মমঙ্গলের কবির কাব্য-মধ্যে তাঁহার রচনাও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। নব্য ময়ূরভট্ট তেমনই মূল ময়ূরভট্টের প্রাচীন কোন অসংলগ্ন কাব্যকাহিনীকে ভিত্তি করিয়া হয়ত তাঁহার নূতন কাব্য গড়িয়াছেন, কিন্তু তাহা হইতে প্রাচীন ময়ূরভট্টের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধারের উপায় নাই।

ময়ূরভট্ট জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন কোন ধর্মমঙ্গলের কবি তাঁহাকে 'দ্বিজ ময়ূরভট্ট' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বারেন্দ্র কুল-পঞ্জিকায় বাৎস্য গোত্রীয় ভট্টশালী

[১] ব-প্রা-পু-বি ২।১, ।০ ; [২] বৌদ্ধ গান ও দোঁহা (১৩২৩), ভূমিকা ৩।

গাঞির আদি পুরুষ মহীধরের পুত্র এক ময়ূরভট্টের উল্লেখ আছে।[১] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব ইঁহাকেই ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি ময়ূরভট্ট বলিয়া অনুমান করিয়া ইঁহাকে ১১৭৯ বা ১১৮০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছির লোক বলিয়া ধরিয়াছেন।[২] এই ময়ূরভট্ট কবি ছিলেন, এমন প্রসিদ্ধিও আছে।[৩] কিন্তু তিনি বরেন্দ্রভূমির লোক, সেখানে ধর্মপূজাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সেখান হইতে কোনও ধর্মমঙ্গল আবিষ্কৃত হয় নাই—ধর্মমঙ্গল একমাত্র রাঢ়েই রচিত হইয়াছিল—অন্যত্র কোথাও ইহা রচিত হয় নাই। অতএব, এই ময়ূরভট্টের সহিত ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি ময়ূরভট্টের কোন সম্পর্ক কল্পনা করা যাইতে পারে না। মনে হয়, ময়ূরভট্ট কোন বাঙ্গালী কবির প্রকৃত নাম নহে—সংস্কৃত 'সূর্যশতক' রচয়িতা ময়ূরভট্টের নামটিই এখানে কোন বাঙ্গালী কবি গ্রহণ করিয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। ধর্মঠাকুরের পূজা তখনও নিম্ন সমাজের মধ্যে আবদ্ধ ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণ কবি ছদ্মনামের মধ্যেই আত্ম-গোপন করিয়া থাকিবেন। ধর্মমঙ্গল কাব্য এক হিসাবে সূর্যদেবতার মাহাত্ম্যসূচক কাব্য—এই উদ্দেশ্যেই বাঙ্গালী কবি সংস্কৃত কবির নামটি এখানে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ময়ূরভট্ট নামধারী কবিই ব্রাহ্মণ কবিদিগের মধ্যে ধর্মমঙ্গল রচনার পথপ্রদর্শক। তাঁহারই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া পরবর্তী কালে মাণিকরাম, ঘনরাম প্রভৃতি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কবি এই কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

ময়ূরভট্টের কাব্যের নাম 'হাকন্দ-পুরাণ'। ঘনরাম চক্রবর্তী এই সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, 'হাকন্দ-পুরাণ মতে, ময়ূরভট্টের পথে'। হাকন্দ-পুরাণ বলিয়া স্বতন্ত্র কোন কবির লেখা কোন কাব্য নাই। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণে'র নামও 'হাকন্দ-পুরাণ' নহে। কারণ, 'শূন্যপুরাণে' পশ্চিমোদয়ের কোন কথা নাই, অথচ ঘনরাম উল্লেখ করিয়াছেন,

হাকন্দ-পুরাণে লেখা সাক্ষাৎ আমার দেখা
কলিকালে পশ্চিম উদয়।

লাউসেন যেখানে দেহ নয়খণ্ড করিয়া কাটিয়া ধর্মের পূজা করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নামই হাকন্দ ; ঘনরাম লিখিয়াছেন,

দিবস দ্বাদশ দণ্ডে হাকন্দেতে নব খণ্ডে
হবে যবে রঞ্জার তনয়।

[১] যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী, কুলশাস্ত্র-দীপিকা (?), ২৬০
[২] সা-প-প ৬০, ১৩-১৫ [৩] ব-সা-প-প, ১৩১৮ সাল, পৃ. ৪০

ময়ূরভট্টই এই হাকন্দ-কাহিনীর রচয়িতা বলিয়া তাঁহার কাব্যের নামও হাকন্দ-পুরাণ। পূর্বোল্লিখিত ময়নাপুর গ্রামে হাকন্দ পোখর নামে এক অতি পুরাতন ও বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। বারুণীর সময় ইহার পাড়ে মেলা বসে। যাত্রীরা ইহাতে স্নানের জল পায় না, কাদা জলই মাথায় দেয়। ময়ূরভট্টের বর্ণিত হাকন্দের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে। নব্য ময়ূরভট্ট তাঁহার কাব্যখানিকে সর্বত্রই 'ধর্মপুরাণ', 'শ্রীধর্মপুরাণ', কোথাও বা 'অনাদি-পুরাণ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন —কোথাও 'হাকন্দ-পুরাণ' বলেন নাই। ইহা হইতেও এই পুস্তকের অর্বাচীনত্বই প্রমাণিত হয়।

আদি রূপরাম

ময়ূরভট্টের পথানুসরণ করিয়া সর্বপ্রথম কোন্ কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলিবার উপায় নাই। তবে মাণিক গাঙ্গুলীর কাব্যেই ময়ূরভট্টের নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে আর একজন কবির নামের উল্লেখ রহিয়াছে, তাঁহার নাম রূপরাম। মাণিকরাম তাঁহাকে আদি রূপরাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন,

বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্মগুণগান ॥[১]

ইহাতে মনে হয়, মাণিকরামের সমসাময়িককালে রূপরাম নামে আরও একজন ধর্মমঙ্গলের কবি বর্তমান ছিলেন; সেইজন্য ইঁহাদের মধ্যে যিনি প্রাচীনতর, তাঁহাকেই তিনি আদি রূপরাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও বাংলা সাহিত্যে দুইজন রূপরামের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না,—রূপরাম ভণিতায় যে সকল পুঁথি এ' যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা একজনেরই বা পরবর্তী রূপরামের রচনা বলিয়া মনে হয়—তথাপি মনে করা যাইতে পারে যে, সম্ভবতঃ আদি রূপরামের অনেক রচনা নাম-সামঞ্জস্য হেতু পরবর্তী রূপরামের নামে চলিয়া গিয়াছে। তবে বর্তমান অবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে আদি রূপরামের পরিচয় উদ্ধার করিবার কোন উপায় নাই।

খেলারাম

আদি রূপরামের পর সম্ভবতঃ খেলারাম তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য প্রণয়ন করেন। অবশ্য পরবর্তী কোন কবি খেলারামের কথা উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার কাব্যে

[১] মাণিকরাম, ১৯১

গ্রন্থ-রচনার কাল-নির্দেশক যে পদটি পাওয়া যায়, তাহা হইতেই অনুমিত হয়, তিনি এই বিষয়ে একজন অতি প্রাচীন কবি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধানকারীদিগের মধ্যে একজন মাত্র তাঁহার পুঁথি দেখিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাকর্তৃক উদ্ধৃত কয়েকটি পদই তাঁহাদের খেলারাম সম্পর্কিত আলোচনার একমাত্র ভিত্তি। তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথি হইতে গ্রন্থরচনার কাল-সম্বন্ধে এই পদ দুইটি সাধারণতঃ উদ্ধৃত হইয়া থাকে,

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন॥
হে ধর্ম এ দাসের পূরাও মনস্কাম।
গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম॥

'ভুবন' অর্থে চতুর্দশ, 'বায়ু' ঊনপঞ্চাশ। অতএব দেখা যাইতেছে, ১৪৪৯ শক অর্থাৎ ১৫২৭ খৃস্টাব্দে খেলারাম গ্রন্থরচনা আরম্ভ করেন। 'শরের বাহন' বলিতে তিনি সম্ভবতঃ কার্ত্তিক মাস মনে করিয়া থাকিবেন। কেহ কেহ মনে করেন, শরের বাহন ধনু অর্থাৎ ইহা পৌষ মাস। খেলারামের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন,

তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ সাঙ্গ হয়।
অষ্টমঙ্গলায় দিব আত্ম-পরিচয়॥

কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের শেষ ভাগ পাওয়া যায় নাই। অতএব ধর্মঠাকুর তাঁহার এই মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছিলেন কি না, তাহাও জানিতে পারা যায় না।

মাণিকরাম

ইহার পরই সম্ভবতঃ মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। তাঁহার পুস্তক মুদ্রিত হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।[১] মাণিকরাম তাঁহার কাব্য-মধ্যে গ্রন্থ-রচনার কাল সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কালক্রমে লিপিকর-প্রমাদে এত বিকৃত হইয়াছে যে, বর্তমানে ইহা হইতে একটা নির্দিষ্ট সময় নিরূপণ করা এক প্রকার দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে মুদ্রিত পুস্তকে তাঁহার গ্রন্থ-সমাপ্তির কাল এইভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে,—

সাফেরী ও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ সহ যুগ দক্ষে যোগতার সনে॥

১ মাণিকরাম গাঙ্গুলী (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

বলা বাহুল্য, এই পদে কোথাও কোনও মারাত্মক লিপিকর-প্রমাদ রহিয়াছে। তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য স্বর্গত পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় কবির বর্তমান বংশধরের গৃহে এই কাব্যের যে একখানি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে, তাহা হইতে এই গ্রন্থ-সমাপ্তির কাল-নির্দেশক পদটির একটি নকল আনাইয়াছিলেন। তাহাতে উক্ত পদটি এইভাবে পাওয়া যায়,—

সাকে রীত্ত সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সির্ধসহ জ্জোগ দক্ষে যোগ তার সনে॥
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
সর্ববি সরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল্য গীত॥

ইহা হইতে এই পদটির প্রকৃত পাঠ সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহার প্রকৃত পাঠ এই প্রকার হইবে,—

শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ (বা সিদ্ধি) সহ যুগ পক্ষে যোগ তার সনে॥
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহৃত।
শর্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হইল গীত॥

তাহা হইলে মাণিকরামের গ্রন্থ-সমাপ্তির এই সময় পাওয়া যাইতেছে, 'ঋতু' ৬, তাহার সঙ্গে 'বেদ' অর্থাৎ ৪ এবং তাহার দক্ষিণে বা ডাইনে 'সমুদ্র' বা সাত, ইহাতে ৬৪৭ পাওয়া যাইতেছে, ইহার সহিত পরবর্তী পদে যে রাশির উল্লেখ আছে, তাহা যোগ করিতে হইবে। পরবর্তী পদে আছে 'সিদ্ধ', তাহাকে সিদ্ধি ধরিলে ৮, তাহার দক্ষিণে 'যুগ' আর 'পক্ষ' অর্থাৎ ৪ ও ২ ; অতএব ইহাতে হয়, ৮৪২, এই উভয় রাশি যোগ করিলে ১৪৮৯ শক পাওয়া যায়। ইহাতে ১৫৬৭ খৃস্টাব্দ হয়।

কিন্তু মাণিকরামের এই সময় সম্বন্ধে সকলেই একমত নহেন। ডক্টর স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উক্ত 'সিদ্ধ' শব্দের অর্থ ঋষি ধরিয়া ইহার অর্থ ৭ বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহাতে মাণিকরামের সময় আরও একশত বৎসর পিছাইয়া ১৪৬৭ খৃস্টাব্দ হয়। স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় মাণিকরামের ভাষা, বংশলতা ও গীতসাঙ্গকালে উদ্ধৃত উক্তির সহিত প্রাচীন পঞ্জিকার বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, মাণিকরাম দেড়শত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন।[১] তিনি উক্ত

[১] সা-প-প ১৫, ৪৭-৫২

পদের সিদ্ধা শব্দের অর্থে ২৪ ধরিয়াছেন; কিন্তু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, সিদ্ধা শব্দের ২৪ অর্থে প্রয়োগ অধিক পাওয়া যায় না। এ কথাও স্বীকার্য যে, বংশলতার প্রমাণ সকল সময় নির্ভুল নহে এবং প্রাচীন পঞ্জিকার গণনার উপরও যে একান্তভাবে নির্ভর করা যায় না, কৃত্তিবাস সম্পর্কে তাহারও প্রমাণ স্বর্গীয় রায় মহাশয় নিজেই দিয়াছেন। তাঁহার মতে মাণিরামের গ্রন্থ-সমাপ্তি কাল ১৭০৩ শক বা ১৭৮১ খৃস্টাব্দ। কিন্তু মাণিকরামের কাব্য পড়িয়া তাঁহাকে এত আধুনিক বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ যে মূল পুঁথিখানি হইতে সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার 'বিতারিখ ১০ই ফাল্গুন শকাব্দ ১৭৩১।' কিন্তু কাব্য রচনার ২৭।২৮ বৎসরের মধ্যেই ইহার রচনা-কাল নির্দেশক পদটি এত বিকৃত হইতে পারে না। এমন কি তখন পর্যন্ত কবির বংশধরদিগের গৃহে মূল পুঁথিটি পর্যন্ত থাকিবার কথা, কিন্তু তাঁহার বংশধরদিগের গৃহে ইহার অনুলিপিই আছে, মূল পুঁথি নাই।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, 'মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, বিষ্ণুপুরে মদনমোহন-মন্দির প্রতিষ্ঠার (১৬৯৪ খৃঃ) পর এবং মদনমোহন ঠাকুরের বিষ্ণুপুর ত্যাগের (১৭৪৮-৫৮ খৃঃ) পূর্বে রচিত।'[১] কারণ, তাঁহার কাব্যমধ্যে এই দুইটি পদ পাওয়া যায়,—

বিষ্ণুপুরের বন্দিব শ্রীমদনমোহনে।
পূর্বেতে আছিলা প্রভু বিপ্রের সদনে॥

কিন্তু মনে হয়, এই পদ দুইটি মাণিকরামের রচনা নহে, ইহা পরবর্তী কোন গায়েনের বন্দনা মাত্র। মঙ্গলকাব্যের প্রায় এই শ্রেণীর বন্দনার কোন পদই মূল কবি কর্তৃক রচিত হইত না, হইলেও তাহার মধ্যে পরবর্তী কালে সমসাময়িক প্রভাব বশতঃ গায়েনের অনেক রচনাও আসিয়া প্রবেশ লাভ করিত। এই দুইটি পদও তেমনই কোন পরবর্তী গায়েন মূল কবির কাব্যমধ্যে যোজনা করিয়া দিয়াছে; অতএব ইহা অবলম্বন করিয়া মূল কবির সময় নিরূপণের প্রয়াস সমীচীন নহে। সুরিক্ষার পাটে বন্দী বিদগ্ধ বিদেশী পুরুষের তালিকায় কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, খেলারাম, ঘনরাম প্রভৃতি নামগুলি এই ভাবেই তাঁহার কাব্যমধ্যে পরবর্তী কালে কোন রসিক গায়েন কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। মাণিকরাম যদি খেলারাম, ঘনরাম প্রমুখ ধর্মমঙ্গল কবিদিগের নাম জানিতেন, তবে তিনি স্থানান্তরে

[১] ময়ূরভট্ট।৵০-।৶০

ময়ূরভট্ট ও রূপরামের সঙ্গে ইঁহাদেরও নাম উল্লেখ করিতেন, কিংবা তাঁহার রচনায় ইঁহাদের প্রভাব থাকিত। অন্ততঃ ঘনরামের প্রভাব এড়াইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব অনুমান করেন, মাণিকরাম ১৫৬৯ খৃস্টাব্দে তাঁহার ধর্মমঙ্গল লিখেন। তাঁহার মতে ঋতু ৬, বেদ ৪, সমুদ্র ৭ অর্থাৎ ৬৪৭; তাহার সহিত সিদ্ধ ৮৪ (চৌরাশী সিদ্ধা হইতে), যুগ ৪, অর্থাৎ ৮৪৪ যোগ করিয়া ১৪৯১ শক বা ১৫৬৯ খৃস্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে।[১] আমাদের গৃহীত সময়ের সঙ্গে ইহার মাত্র দুই বৎসরের ব্যবধান; অতএব এই মতও সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায়। মাণিকরাম কাব্যমধ্যে এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

বাঙ্গাল গাঙ্গুলি গাঁই পিতা গদাধর।
স্বসাহীন সম্প্রতি ছয় সহোদর॥
দুর্গারাম দ্বিতীয় বিখ্যাত গুণধাম।
মুক্তারাম তৃতীয় চতুর্থ ছকুরাম॥
রামতনু পঞ্চম রসিক রসে পূর্ণ।
সর্বানুজ নয়ন সকল লোকে ধন্য॥
এক কন্যা অভয়া, আখ্যাত অতি ভব্যা।
শান্তমতি সুলক্ষণা সীমন্তিনী সখা॥
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে কাত্যায়নী-সুত।
সত্যগুণে ধর্ম জাগে সদয় সদত॥

কবির পিতামহ অনন্তরাম, প্রপিতামহ সুদাম, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম গোপাল। কবির পিতামহ একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের বংশ অত্যন্ত প্রাচীন, তাঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের বংশ বাঙ্গাল মেল গাঙ্গুলী গাঁই নামে পরিচিত। বেলডিহা গ্রাম কবির জন্মস্থান। গ্রন্থ-রচনার কারণ সম্বন্ধে কবি এক বিস্তৃত কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। কবি নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অবশেষে তর্কশাস্ত্র পড়িতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তুঙ্গারি গ্রামে গমন করেন। পাঠ আরম্ভ করিবেন, এমন সময় রাত্রিতে এক দুঃস্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া পর দিবসই 'খুঙ্গি পুঁথি' বাঁধিয়া বাটি রওনা হইলেন। গৃহে ফিরিবার পথে তিনি

[১] *I. H. Q.* 1. (1925), 185

দৈবক্রমে পথ ভুলিয়া যান। একে দুশ্চিন্তায় তাঁহার মন অস্থির, তাহাতে আবার পথশ্রমে দেহ অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এমন অবস্থায় এক নির্জন মাঠের মধ্যে এক অপরিচিত বৃদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ যুবকের মূর্তি ধারণ করিলেন। অতঃপর উভয়ে শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ কবির শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং কবিকে

সঙ্গোপনে কহিলেন সাবধান হইবে।
অধ্যযন করিতে আমার কাছে যা'বে ॥
জগতে তোমার যশ হবেক যেরূপে।
সেই বিদ্যা দিব আমি সত্যের স্বরূপে ॥

এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কবি বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। এমন সময় ধর্মের দুইটি পাদুকা গলায় বাঁধিয়া লইয়া এক ডোম পণ্ডিত আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। কবির নিকট পণ্ডিত এই পথে কোন ব্রাহ্মণকে যাইতে দেখিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিল। কবি তাহার কোন জবাব দিতে পারিলেন না, পণ্ডিতকে সেই ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, পণ্ডিত বলিল,—

চিনিতে নারিছ বাছা দ্বিজবর কেবা।
পদ্মতুল্য সম্প্রতি পাদুকা কর সেবা ॥
পরে তাঁর পরিচয় পাবে অচিরাৎ।
সত্য মিথ্যা মোর কথা বুঝিবে সাক্ষাৎ ॥

কবি এই কথার কোন অর্থ পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ সম্মুখে এক দিব্য সরোবর দেখিতে পাইলেন। তাহাতে গিয়া কবি তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন, কিন্তু বৃক্ষতলে ফিরিয়া দেখেন, পাদুকা সহ পণ্ডিত অদৃশ্য হইয়াছে। অবশেষে কবি নিজের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপরিচিত ব্রাহ্মণ কবিকে তাঁহার নিকট গিয়া অধ্যয়ন করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন—ইহা স্মরণ করিয়া তৃতীয় দিবসে কবি সেই ব্রাহ্মণের নিবাস রঙ্গাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই এক দীঘির তীরে ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এইবার ব্রাহ্মণের মূর্তি বড় ভয়াবহ, হস্তে এক দীর্ঘ যষ্টি, মুখে ক্রুদ্ধ ভাব। কবি দেখিয়া ভয় পাইলেন—

বিপ্র কন তোর পারা না দেখি বর্বর।
দস্যুবৃত্তি করেছেন বাল্মীকি মুনিবর ॥
বুঝি তোর আজি হল বিঘোর মরণ।
এত শুনি মোর হল অঘোর নয়ন ॥

কোন অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য হয়ত ব্রাহ্মণ তাঁহার উপর অপ্রসন্ন হইয়া থাকিবেন, ভাবিয়া কবি তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। এইবার ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অভয় দিলেন,—বলিলেন, রঙ্গাপুরে আমার গৃহে গিয়া অপেক্ষা কর, আমি এখনই ফিরিব। কিন্তু কবি রঙ্গাপুরে গিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, এমন কোন ব্রাহ্মণ সেই গ্রামে নাই। কবি নিরাশ হইয়া স্বগৃহে ফিরিলেন, পথশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন, নিদ্রায় অভিভূত হইলে পর অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করিলেন, যেন সেই ব্রাহ্মণ শিয়রে আসিয়া বসিয়া বলিতেছেন,—

কহেন কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ।
উঠ বাছা আমার বচনে মন দেহ ॥
গীত রচ ধর্মের গৌরব হবে বাড়া।
নকল লেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া ॥
বিশ্বের কারণ আমি বাঁকুড়া রায় নাম।
না করিবে প্রকাশ হইবে সাবধান ॥
সঙ্কটে সদয় হব করিলে স্মরণ।
অন্তকালে দিব দুটি অভয় চরণ ॥

বাঁকুড়া রায় আরও বলিলেন যে, বার দিনে এই বারমতি সম্পূর্ণ করিতে হইবে, অন্যথায় তাঁহার সমূহ বিপদ। তিনি তাঁহার বীজমন্ত্র লিখিয়া দিলেন, ইহাতেই কবির লেখনী হইতে অনর্গল কবিতা বাহির হইবে বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। মাণিকরামের চতুর্থ সোদর ছকুরামকে এই গানের গায়েন হইবার জন্য তিনি কবির নিকট বলিয়া গেলেন। এই নির্দেশ মত অগত্যা কবি কাব্য-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন, বাধ্য হইয়া কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তানকে গায়েন হইয়া আসরে নামিতে হইল।

মাণিকরামের গ্রন্থ অন্যান্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের মতই ২৪ পালায় সম্পূর্ণ। প্রথম পালায় কবি গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ, ধর্মের বন্দনা, তন্মধ্যে মার্কণ্ড মুনির ধর্ম-পূজার কথা, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন; ইহাই ধর্মমঙ্গল কাব্যের স্থাপন

পালা, পরবর্তী আরও ২৩টি পালায় লাউসেনের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কাহিনীভাগে দুই এক স্থলে অন্যান্য ধর্মমঙ্গল হইতে একটু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু অন্যত্র প্রায় অভিন্ন। দুই এক স্থলে যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়, তাহা মাণিকরামের প্রাচীনত্বেরই পরিচায়ক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরামের কাব্যে মার্কণ্ড মুনির ধর্মপূজার কোনই উল্লেখ নাই, হরিশ্চন্দ্র রাজার উল্লেখ রহিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, এই মার্কণ্ড মুনি ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই ধর্মসাহিত্যের প্রাচীনতর উপজীব্য ছিল। লাউসেনের কাহিনী পরবর্তী যোজনা মাত্র। অতএব মাণিকরামের এই মার্কণ্ড মুনির উল্লেখ হইতেই তাঁহার প্রাচীনত্বের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। মাণিকরামে গৌড়েশ্বরের মাতার নাম সাফুল্লা, ঘনরামে বল্লভা। সাফুল্লা নামটি প্রাচীনতর। মাণিকরামে লাউসেনের অশ্বের নাম অশ্বির পাথর, ঘনরামে আণ্ডিব পাথর। আরও কযেকটি বিষয়ে মাণিকরাম ও পরবর্তী ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের মধ্যে সামান্য অনৈক্য রহিয়াছে। এই সমস্ত ব্যতিক্রম দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের সময়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান।

মাণিকরাম যে কেবল একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহাই নহে—তিনি একজন সুকবিও ছিলেন। ধর্মমঙ্গল বীর-রসাত্মক কাব্য। তাঁহার কাব্যে এই বীররস ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যেমন স্থানে স্থানে ওজস্বিনী ভাষা ও বর্ণনার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনই আবার তিনি নিপুণ চিত্রকরের দৃষ্টিদ্বারা সামাজিক চরিত্র-চিত্রণের প্রয়াসও সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। পাণ্ডিত্যের প্রভাবে তাঁহার রচনা কোথাও ব্যাহত হইয়া পড়ে নাই। তবে সংস্কৃত রচনার আদর্শানুযায়ী তাঁহার রচনায় নানা অলঙ্কারের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সংগৃহীত উপকরণরাশি বাংলা ছন্দের সূত্রেও তিনি এমনভাবে গাঁথিয়াছেন যে, ইহাতেও বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইয়াছে, তাহা সংস্কৃতের অন্ধ অনুকৃতিতে পর্যবসিত হয় নাই,—

কলুষনাশিনী কালরাত্রি করালিনী।
নৃসিংহনাশিনী নমোস্তুতে নারায়ণী॥
দক্ষের দুহিতা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী।
নাগারিবাহিনী নমোস্তুতে নারায়ণী॥

মাণিকরামের এই সকল রচনা হইতে তাঁহার সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের অনেকটা

আভাস পাওয়া যায়। তিনি লাউসেনের বিদ্যাভ্যাস সম্পর্কে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একমাত্র তাঁহার নিজের সম্পর্কেই প্রযোজ্য হইতে পারে,—

অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল।
মুরারি ভারবি ভট্ট নৈষধ পিঙ্গল॥
কালিদাস কৃত কাব্য অন্য কাব্য কত।
অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্ক শাস্ত্র॥
ছন্দ শাস্ত্র পুরাণ পড়িল তারপর।
উত্তম হইল বিদ্যা নয় দশ বচ্ছর॥

এই সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে কবি জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রচুর রসও আহরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কাব্য হইতে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। মাণিকরামের কবিকল্পনায় চরিত্রসৃষ্টিও কতকটা সার্থক হইয়াছে। লখ্যা ডোমনীর চরিত্র তাঁহার কাব্যের এক অতি অপূর্ব সৃষ্টি। আদিরস বর্ণনায় মাণিকরাম অন্যান্য ধর্মমঙ্গল কবিদিগের তুলনায় একটু বিশেষ অগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও তাঁহার সংস্কৃত রসশাস্ত্র অনুশীলনের ফলই বলিতে হইবে।

রূপরাম

সম্ভবতঃ মাণিকরামের সমসাময়িক কালেই দ্বিতীয় রূপরাম আবির্ভূত হইয়াছিলেন।[১] কিন্তু মাণিকরামের কাব্যের কয়েক বৎসর পরে তাঁহার কাব্য রচিত হয়। দ্বিতীয় রূপরাম তাঁহার কাব্যমধ্যে যে গ্রন্থরচনার কাল নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার বিশুদ্ধ পাঠ এই প্রকার হইবে বলিয়া মনে হয়,—

তিন বাণ চারি যুগে বেদে যত রয়।
শাকে সনে জড হৈলে কত শক হয়॥
রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই শকে গীত হৈল লেখা কইরা লেহ॥

ইহার অর্থ হইতেছে, শক আর সন জড়াইয়া যুগপৎ বলিতেছি। তিন বাণ (৩×৫), চারি যুগ (৪×৪) অর্থাৎ ১৫১৬ বেদ দ্বারা হীন (minus) করিলে যত থাকে, তত শক অর্থাৎ ১৫১২ শক। আর রস+রস+রস=৯৯৯ হিজরী সন (বাংলা সন তখনও প্রবর্তিত হয় নাই)। ৯৯৯ হিজরীতে ১৫১২ শকাব্দ পাইতেছি। অতএব রূপরামের গ্রন্থরচনার কাল ১৫১২ শকাব্দ বা ১৫৯০ খৃস্টাব্দ।

[১] রূপরামের ধর্মমঙ্গল (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় সঠিক পাঠটি ধরিতে না পারিয়া ইহার আনুমানিক একটা অর্থ গ্রহণ করিয়া ইহাতে ১৭৪৮ শক বা ১৮২৬ খৃস্টাব্দ পাইয়াছেন।[১] শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার অর্থ ১৬৪১ শকাব্দ বা ১৭১৯ খৃস্টাব্দ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[২] ডক্টর স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় রূপরামকে পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করেন।[৩] রূপরামের কাব্যের যথেষ্ট প্রচার হইয়াছিল, সেই জন্য ভাষা হইতে তাঁহার কালনিরূপণ অসম্ভব, তবে ভাষার বিচারেও তিনি ষোড়শ শতাব্দীর লোক হইতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জন্মস্থানের অনতিদূরবর্তী বর্ধমান জিলার অন্তর্গত রায়না থানার এলাকায় কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে রূপরামের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা একজন পরম পণ্ডিত ছিলেন, শতাধিক ছাত্র তাঁহার গৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। রূপরামের আর তিন সহোদর ছিলেন, জ্যেষ্ঠের নাম রত্নেশ্বর, তিনি রূপরামের লেখাপড়ায় ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে সর্বদা ভর্ৎসনা করিতেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া রূপরাম খুঙ্গি পুঁথি লইয়া পাঠাভ্যাসের জন্য কবিচন্দ্রের পুত্র রঘুরাম ভট্টাচার্যের টোলে আসিয়া ভর্তি হইলেন। রূপরাম অত্যন্ত দুর্বিনীত ছাত্র ছিলেন, গুরুর সঙ্গে একদিন বচসা আরম্ভ করিলেন, ক্রুদ্ধ হইয়া গুরু তাঁহাকে এক ঘা পুঁথির বাড়ি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। রূপরাম নবদ্বীপে বিদ্যানিধি ভট্টাচার্যের টোলে পড়িতে চলিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে জননীর কথা মনে হওয়ায় গৃহের মুখে ফিরিলেন। রূপরাম তাঁহার আত্মবিবরণী ও গ্রন্থোৎপত্তির কারণে লিখিয়াছেন, এই সময়েই ধর্মঠাকুর পথিমধ্যে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন,—

স্থবর্ণ পইতা গলে পতঙ্গ-স্থন্দর।
কলধৌত কাঞ্চন কুণ্ডল ঝলমল॥
তরাসে কাঁপিল তনু প্রাণ দুর দুর।
আপুনি বলেন ধর্ম দয়ার ঠাকুর॥
আমি ধর্ম ঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।
বারদিনের গীত গাও শুন রূপরাম॥
চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব মাদুলি।
তুমি গেছ পাঠ পড়িতে আমি খুঁজে বুলি॥

[১] প্রবাসী, ভাদ্র (১৩৩৪), ৬৪২; [২] ময়ূরভট্ট, ৷৵৹ পাদটীকা; [৩] ব-পা-প ১,৩৮৫।

পথিমধ্যে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া কবির 'তরাসে কাঁপিল তনু চঞ্চল পরাণ।' তিনি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইয়া একেবারে নিজের বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রত্নেশ্বর পুনরায় তর্জন গর্জন আরম্ভ করিলেন, বলিলেন, 'কালি গিয়াছ পাঠ পড়িতে আজি আইলা ঘরে।' রূপরাম পুনরায় গৃহত্যাগ করিলেন, নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গোপভূমের রাজা গণেশের আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা গণেশ কবিকে চামর মন্দিরা উপহার দিয়া গানের দল বাঁধিয়া দিলেন। রূপরাম বলিয়াছেন, 'সেই হত্যে গীত গাই ধর্মের আসরে', পাঠে আর মনঃসংযোগ করেন নাই। রূপরাম সর্বত্র নিজেকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সেই যুগে ব্রাহ্মণগণ এই বৃত্তি গ্রহণ করিলে সমাজে পতিত হইতেন, সম্ভবতঃ তিনিও পতিত হইয়াছিলেন। গোপভূমের রাজা গণেশ কবে বর্তমান ছিলেন, তাহা জানা যায় নাই ; তাহা হইলেও কবির কাল-নিরূপণের অনেকটা সাহায্য হইত।

মাণিক গাঙ্গুলী রূপরামকে আদর্শ করিয়াই তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, অনেক স্থলে রূপরামের সহিত মাণিকরামের যে যে অংশ একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সম্ভবতঃ আদি রূপরামেরই রচনা, তাহা মাণিকরামের কাব্যেও যে ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, পরবর্তী রূপরামের কাব্যেও সেইভাবেই প্রবেশ করিয়াছে। উভয় কবির ইছাই বধ পালাটি প্রায় অভিন্ন, এই জন্য অবশ্য মাণিকরামই রূপরামের নিকট ঋণী, না উভয় কবিই তাঁহাদের পূর্ববর্তী ময়ূরভট্টের কাব্য এইভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন, ময়ূরভট্টের পুঁথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত তাহা বলিবার উপায় নাই।

ভট্টাচার্যের টোলে অধ্যয়ন শেষ না করিলেও রূপরাম যে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচনা হইতেই প্রকাশ পায়। জামতি পালায় কুলটা নয়ানীর রূপ-সজ্জার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে—

কপালে সিন্দূর পরে তপন-উদয়।
চন্দন-চন্দ্রিমা তার কাছে কাছে রয়॥
চন্দ্র-কোলে শোভা যেন করে তারাগণ।
ঈষৎ করিয়া দিল বিন্দু বিচক্ষণ॥
এক ঠাঞি রবি শশী তারাগণযুতা।
আনন্দ অম্বুদকুলে বিজুরীর লতা॥

মধ্যে মধ্যে রূপরামের রচনায় এই প্রকার পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় তাঁহার কাব্যমধ্যে সুলভ নহে। অন্যত্র প্রায়ই তাঁহার বর্ণনা সরল, রচনাও মধ্যে মধ্যে শ্রুতি-মধুর। কাহিনী বর্ণনা করিবার একটি সহজ ভঙ্গিমা তাঁহার ছিল—তাহা দ্বারাই এই দীর্ঘ কাহিনীটি তিনি একটানা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আত্মবিবরণী রচনার অংশে কবি ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে সম্পর্কের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হইলেও ইহার মধ্যে তাঁহার একটি সুগভীর আন্তরিকতার পরিচয় মূর্ত হইয়া আছে।

শ্যাম পণ্ডিত

শ্যাম পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ইহার একখানি মাত্র পুঁথির বিষয় জানিতে পারা যায়।[১] পুঁথিটির তারিখ ১৬২৫ শকাব্দ বা ১৭০৩ খৃস্টাব্দ। অতএব শ্যাম পণ্ডিত ইহার পূর্বেকার লোক।

পুঁথির মধ্যে শ্যাম পণ্ডিতের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পণ্ডিত উপাধি দেখিয়া মনে হয়, তিনি ধর্মপূজারী ছিলেন। নিজেকে তিনি ধর্মদাস বলিয়াও ভণিতায় উল্লেখ করিয়াছেন। বীরভূম অঞ্চলে তাঁহাব পুঁথির প্রচলন হইতে ইহাই মনে হয় যে, তিনি ঐ অঞ্চলেরই লোক ছিলেন। শ্যাম পণ্ডিত লাউসেন কাহিনীর স্থানীয় জনশ্রুতি লইয়াই কাব্য লিখিয়াছেন। বীরভূম অঞ্চলকেই তিনি তাঁহার কাহিনীর ঘটনা-স্থান করিয়াছেন। 'শ্যাম পণ্ডিত ইছাই ঘোষকে ঈশ্বর ঘোষ ও তাহার অনুজকে বিজয় ঘোষ নামে অভিহিত করিয়াছেন, ইঁহার পুঁথিতে ঢেকুর গড়ের নাম ত্রিহট্ট গড়। মাণিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম প্রভৃতি জালন্দার গড়ের রাজার নাম লিখিয়াছেন জল্লাদ শেখর,—শ্যাম পণ্ডিতের পুঁথিতে সামন্তশেখর নাম পাওয়া যায়, সুতরাং স্থানীয় প্রবাদ-কথিত নামের সঙ্গে শ্যাম পণ্ডিতের মিল আছে।'[২] বাংলার মেয়েলী ব্রতের ছড়ায় এক শ্যাম পণ্ডিতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—যেমন, 'অশথ পাতা পুণ্য লতা শ্যাম পণ্ডিতের ঝি।' ইহার সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের শ্যাম পণ্ডিতের কোন সম্পর্ক আছে কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না। শ্যাম পণ্ডিতের পুঁথিতে এক চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে। ইনি

---

[১] গ-স ৪৯৯২; ইঁহার আর একখানি অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ পুঁথি শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট আছে। পুঁথিখানির একটি অসম্পূর্ণ বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল।

[২] মহিমারঞ্জন চক্রবর্তী ৩, ১৯১

সম্ভবতঃ বীরভূম জিলার নান্নুরের কবি দ্বিজ চণ্ডীদাস। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, শ্যাম পণ্ডিত বীরভূম অঞ্চলের বহু স্থানীয় জনশ্রুতিকে তাঁহার কাব্যের উপকরণ রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। শ্যাম পণ্ডিতের কবিত্বশক্তি উচ্চাঙ্গের ছিল না। তাঁহার রচনায় দেবতাই লক্ষ্য, মানুষ উপলক্ষ মাত্র। শ্যাম পণ্ডিত তাঁহার কাব্যের নাম 'নিরঞ্জন-মঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন,

নিরঞ্জন-মঙ্গলের অপূর্ব বন্দনা।
আদর করিয়া ভাই শুন সর্বজনা ॥[১]

শ্যাম পণ্ডিতের পুঁথিতে ধর্মদাস নামক একজন স্বতন্ত্র কবির ভণিতাযুক্ত বহু পদ পাওয়া যায়। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত শ্যাম পণ্ডিতের পুঁথির লিপিকাল ১৭০৩ খৃস্টাব্দ। অতএব ধর্মদাসও ইহার পূর্ববর্তী লোক।

ধর্মদাস প্রকৃতই কোন কবির নাম, কিংবা তিনি ধর্মঠাকুরের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া নিজেকে ধর্মদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বলা কঠিন। তবে তাঁহার নিম্নলিখিত ভণিতা হইতে মনে হয়, তাঁহার নামই ধর্মদাস ছিল এবং তিনি জাতিতে বণিক ছিলেন,—

ধর্মদাস বণিকের রচন সুসার।
ধর্মদাস বণিকের সরস রচন।
বাণ্যা ধর্মদাস গীত করিল রচন।

কিন্তু তাহাতে 'রচিল ধর্মের দাস' এই প্রকার ভণিতাও আছে—তাহাতে তাঁহার প্রকৃতই এই নাম ছিল কিনা বলা সহজ নহে। শ্যাম পণ্ডিতই ধর্মদাস ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াও সন্দেহ হইতে পারে।

সীতারাম

সীতারাম দাস ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি।[২] তাঁহার যে সকল প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়, তাহাদের তারিখ ১০৩৪ মল্লাব্দ (১৭২৮ খৃস্টাব্দ), ১০৫৪ মল্লাব্দ (১৭৪৮ খৃস্টাব্দ), ১০৬০ মল্লাব্দ (১৭৫৪ খৃস্টাব্দ)। সীতারামের ধর্ম-মঙ্গল রচনা কাল ১০০৪ সাল বলিয়া তাঁহার পুঁথিতে উল্লেখ আছে।[৩] ইহাকে

[১] গ-স ৪৯৯২, ৩৭ক

[২] গ-স ৪৯৯৮, পুঁথিখানি ১১১৫ সালে বা ১৭০৮ খৃস্টাব্দে অনুলিখিত; [৩] ঐ, ৩ক

বঙ্গাব্দ ধরিয়া কেহ কেহ ১৫৯৭ খৃঃ এই কাব্যের রচনাকাল বলিয়া অনুমান করেন, আবার মল্লাব্দ ধরিয়া ১৬৯৮ খৃস্টাব্দ গ্রন্থরচনার কাল বলিয়াও কেহ কেহ মনে করেন। মল্লভূম অঞ্চলে মল্লাব্দের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল, অতএব শেষোক্ত মতও সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু বঙ্গাব্দ ও শকাব্দের প্রচলনও সে দেশে অজ্ঞাত ছিল না, অতএব এই সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উপায় নাই।

বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত ইন্দাস গ্রাম সীতারাম দাসের জন্মস্থান। কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে তাঁহার স্বগ্রামের ধর্মঠাকুরের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, 'ইন্দাসের দেহারা বন্দিব সাবধানে'। কোন কোন খণ্ডিত পুঁথিতে কবির এই প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়,—তাঁহারা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ জাতিভুক্ত। তাঁহার আদি পুরুষের নাম গোপীনাথ দে; গোপীনাথের তিন পুত্র, মথুরা, মদন ও ধর্মদাস; কনিষ্ঠ ধর্মদাসের চারি পুত্র ছিল, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ মদনের এক পুত্রের নাম দেবীদাস, দেবীদাসের পুত্র সীতারামদাস। সীতারামের এক ভ্রাতা ছিল, নাম সভারাম। সীতারামও স্বপ্নাদেশেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এই স্বপ্নাদেশের মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। স্বপ্নাদেশের কর্তা এখানে ধর্মঠাকুর নহেন, বরং 'গজলক্ষ্মী মা'। ইনিই বৌদ্ধ আদ্যা বা চণ্ডী। কবি লিখিয়াছেন,—

শিওরে বসিল মোর গজলক্ষ্মী মা।
উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখ গা॥

অবশ্য এই স্বপ্নের মধ্যে বিবিধ বিগ্রহের সঙ্গে ধর্মও আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যেমন কবি লিখিয়াছেন—'ধর্ম দেখা দিল জামকুড়ির বনে।' খণ্ডঘোষ নিবাসী অযোধ্যারাম চক্রবর্তী ও নারায়ণ পণ্ডিত সীতারামের সমসাময়িক লোক। তাঁহারা সীতারামকে কাব্য রচনায় উৎসাহ দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

সীতারাম তাঁহার রচনার শেষে ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্টকে যে ভাবে বন্দনা করিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয়, তাঁহার সময়ও ময়ূরভট্টের স্মৃতি ধর্মমঙ্গল কবিদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ জাগরূক ছিল এবং তাঁহার রচনাকেই ভিত্তি করিয়া তিনি নিজের কাব্য রচনা করিয়াছেন,—

ময়ূর ভট্ট মহাশয় যোগে নিরমল।
প্রকাশ করিল যেই ধর্মের মঙ্গল॥

তাহার স্মরণ করি সবে গাই গীত।
সেই অঙ্ক শুনিলে ধর্মেতে থাকে চিত ॥
ময়ূরভট্ট মহাশয়ের সুন্দর পাঁচালী।
আনন্দে হইল নষ্ট দুই এক কলি ॥
ভুল ভ্রান্তি গীত যদি গেছি এড়াইয়া।
নিদ্রার আলসে যদি না গেছি গাইয়া ॥
তুমি না ক্ষেমিলে ক্ষেমিবে কোন জন।
দাসের অশেষ দোষ না লবে নারায়ণ ॥

সীতারামের রচনা সরল। ধর্মমঙ্গলের পরবর্তী কবিগণ রচনা-বিষয়ে যেমন আলঙ্কারিক পারিপাট্য দেখাইয়াছেন, সীতারামের রচনায় তাহা দৃষ্ট হয় না। ইহাতে তাঁহার আপেক্ষিক প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়। মনে হয়, বঙ্গভাষা তখনও সংস্কৃত অলঙ্কার-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই। তাঁহার রচনা অনেকটা প্রাচীন পাঁচালীর লক্ষণাক্রান্ত, কাহিনী কিংবা চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়াও কোন বৈশিষ্ট্য তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। তবে কাহিনীর অনাড়ম্বর বর্ণনা স্বচ্ছন্দ গতিতে সর্বত্রই সহজভাবে অগ্রসর হইয়া চলিতে দেখা যায়।

সীতারামের রচনা কবিত্ব-বর্জিত, পাণ্ডিত্যও তাঁহার রচনায় যে খুব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও নহে—কাহিনী বিষয়ে সর্বতোভাবে তিনি গতানুগতিকতারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের খুব বিশেষ প্রচার হইয়াছিল বলিয়াও মনে হয় না।

সীতারামের সহজ বর্ণনা ও সরল ভাষার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার কামরূপের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

গড় দেখি সমুখে একাশী হাত খাণ্ডা।
সারি পথ ঘোড়ার বসিতে নাঞি দাণ্ডা ॥
তারপর বেতগড় যাটি হাত থানা।
কেয়া বনে দেখি কত পিব্যাসীর থানা ॥
গুয়া-গড় গভীর দেখিয়া প্রাণ উড়ে।
সাতহাত দরিয়া পঞ্চাশ হাত আড়ে ॥

রামদাস

ইহার পর রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গল কাব্যখানি রচিত হয়। তাঁহার কাব্যের প্রকৃত নাম অনাদি-মঙ্গল।[১] রামদাস কৈবর্ত বংশোদ্ভব। তাঁহার পিতার নাম রঘুনন্দন। হুগলী জেলার হায়ৎপুর গ্রামে কবির আদি নিবাস ছিল, পরে তাঁহারা সেই জেলার অন্তর্গতই পাড়াগ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। কবি আত্ম-পরিচয়চ্ছলে লিখিয়াছেন,—

ভুরস্যুটে রাজা রায় প্রতাপ নারায়ণ।
দানদাতা কল্পতরু কর্ণের সমান॥
তাঁহার রাজত্বে বাস বহুদিন হ'তে।
পুরুষে পুরুষে চাষ চষি বিধিমতে॥

এই প্রতাপনারায়ণ রায় কবি ভারতচন্দ্র রায়ের পূর্বপুরুষ। ইহাতেই মনে হয়, কবি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন। কবি তাঁহার গ্রন্থোৎপত্তির যে কারণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এখানে সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে,—কবির স্বগ্রামে এক অতি অত্যাচারী তহ্‌শীলদার ছিলেন। তাঁহার নাম চৈতন্য সামন্ত। পিতার ঋণের জন্য তিনি তাঁহার কারাগারে আবদ্ধ হন। কবি দ্বারবানের হাতে-পায়ে ধরিয়া অবশেষে সেখান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। কিন্তু মাতুলালয়ে পলাইয়া যাইবার পথে এক সিপাহী কর্তৃক ধৃত হইয়া অশেষ অত্যাচারিত হন। তারপর পিপাসার্ত হইয়া জলপানের নিমিত্ত সম্মুখস্থ এক দীঘিতে অবতরণ করিলেন, দীঘি তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়, কবি দারুণ নৈরাশ্যে সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন, তখনই এক দিব্য পুরুষ স্বর্ণভৃঙ্গারে জল লইয়া তাঁহার সম্মুখস্থ হইলেন। তিনি তাঁহাকে জল পান করাইয়া সুস্থ করিয়া বলিলেন,—

জলপানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি।
ধর্মের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি॥

রামদাস এই বিষয়ে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করাতে সেই দিব্য পুরুষ আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন,

আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি।
ঝাড়গ্রামে কালুরায় ধর্ম হই আমি॥

---

[১] রামদাস আদক, অনাদি-মঙ্গল, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৫)।

আসরে জুটিবে গীত আমার স্মরণে।
সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাসিবে বদনে॥

এই দৈবনির্দেশক্রমে রামদাস তাঁহার কাব্য রচনা করিলেন। ১৬৬২ খৃস্টাব্দে এই কাব্য তাঁহার স্বগ্রামে সর্বপ্রথম গীত হয় বলিয়া প্রকাশ।

অনাদি-মঙ্গলের ভাব ও ভাষার মধ্যে পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর নাই। ইহা সীতারামের কাব্য হইতেও অনেকাংশে সরল। তবে ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সীতারামে তাহার অভাব আছে।

প্রভুরাম

দ্বিজ প্রভুরাম নামক একজন কবির ভণিতা-যুক্ত একখানি ধর্মমঙ্গলের পুঁথি পাওয়া যায়।[১] পুঁথিখানি ১০৭৩ সাল (বা ১৬৬৬ খৃস্টাব্দে) অনুলিখিত হইয়াছিল। ইহার কোন কোন অংশ ১১১৭ সাল বা ১৭১০ খৃস্টাব্দে অনুলিখিত। কবি কাব্যমধ্যে এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

মল্লভূমে বাটি ফুল্যার মুখটি
শ্রীযুত জানকীরাম।
তস্য সুত গায় সখা ক্ষুদিরায়
নায়কে পূরহ কাম॥[২]

মনে হয়, প্রভুরাম ক্ষুদিরাম নামক ধর্মঠাকুরের সেবক ছিলেন। তিনি ভণিতায় ক্ষুদিরামের নাম বার বার ভক্তির সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থ-সমাপ্তিতেও তাঁহার এই প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায়,

সঙ্গীত সমাপ্ত দ্বিজ প্রভুরাম বলে।
অন্তকালে ক্ষুদিরাম রাখ পদতলে॥
এই বর মাগি মুই দৃঢ় করি মন।
বাসনা করহ পূর্ণ প্রভু নিরঞ্জন॥

প্রভুরামের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার পুঁথি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই।

---

[১] গ-স ৫৪৪১; [২] ঐ ৩ক

ঘনরাম

১৬৩৩ শকাব্দ বা ১৭১১ খৃস্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্তীর সুপ্রসিদ্ধ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা সম্পূর্ণ হয়।[১] তিনি তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে এই ভাবে ইহার রচনা-কাল নিদেশ করিয়াছেন,

সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাহিক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপন॥
শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি॥

ইহাতে দেখা যায়, ১৬৩৩ শক অথবা ১৭১১ খৃস্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে তাঁহার পুস্তক রচনা সম্পূর্ণ হয়। স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রাচীন পঞ্জিকার সাহায্যে এই শক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লিখিয়াছেন, "মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসের আদ্য অংশে হংস সূর্য ছিলেন (১লা কি ২রা), শুক্রবার, সুলক্ষণ শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি। পাঁজি গণিয়া দেখিতেছি, ১৬৩৩ শকে ১লা অগ্রহায়ণ শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া। ১লা হওয়াতে আদ্য অংশেও বটে। 'যাম সংখ্য দিনে'—যাম অর্থে প্রহর। এক প্রহর বেলার সময় সঙ্গীত সাঙ্গ হয়।"[২] কিন্তু ইহার অর্থটি পরিষ্কার হইল না। 'যাম সংখ্য দিনে' অর্থাৎ যাম অর্থে যদি প্রহর ধরি, তাহা হইলে ৮ সংখ্যা[৩] (অষ্ট প্রহর) হয়, অর্থাৎ ৮ই তারিখে এই গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু ৮ই তারিখে অন্যান্য তিথি-নক্ষত্র পাওয়া যায় না, অতএব 'দিন' শব্দটিকে যদি 'দণ্ড' ধরি, তাহা হইলে বেলা ৮ দণ্ডের সময় পুঁথি সম্পূর্ণ হয়, এরূপ বলা যাইতে পারে। ইহাতে শেষ পদটির অর্থও সুসঙ্গত হয়। সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদে দণ্ড 'দিনে' হইয়া থাকিবে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যেমন ভারতচন্দ্র, ঘনরামও

১ ঘনরাম চক্রবর্তী (পূর্বে দ্রষ্টব্য) ২ প্রবাসী, ভাদ্র (১৩৩৬), ৬৪১

৩ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই হিসাব মত '৮ই তারিখে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়' বলিয়া লিখিয়াছেন (শ্রীধর্মপুরাণ, ভূমিকা পৃঃ।৵০)। কিন্তু এই ৮ই তারিখে শুক্লা তৃতীয়া তিথি হয় না।

তেমনই ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। পূর্বেই দেখাইয়াছি, ভারতচন্দ্রও অনেকাংশে তাঁহার নিকট ঋণী।

বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কইয়ড় পরগণায় কৃষ্ণপুর গ্রামে কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর জন্ম হয়। তিনি এইভাবে নিজের বংশ-পরিচয় দিয়াছেন,

ঠাকুর পরমানন্দ কৌশল্যার বংশে।
ধনঞ্জয় পুত্র তার সংসারে প্রশংসে॥
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত।
তার সুত ঘনরাম গুরু পদাক্রান্ত॥

মাতার পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, 'মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।' কবির এই মাতামহের কুল রাজবংশসম্ভূত। তিনি লিখিয়াছেন,

কৌকুসাবি অবতংসে কুশধ্বজ রাজবংশে
দ্বিজ গঙ্গাহরি পুণ্যবান,
তাঁহার দুহিতা সীতা, সত্যব্রতী পতিব্রতা
তার সুত ঘনরাম গান।

ঘনরামের চারি পুত্র,—বামপ্রিয়, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ। কবি তাহাদের জন্যও তাঁহার কাব্যমধ্যে দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন। কবির অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র বর্তমানে জীবিত আছেন। ঘনরাম তাঁহার কাব্যে বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচন্দ্রেরও কল্যাণ-কামনা করিয়াছেন,

অখিলে বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তার রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥

সম্ভবতঃ কীর্তিচন্দ্র কবির পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক ছিলেন। কিন্তু কীর্তিচন্দ্রের সহিত তাঁহার মুখ্য কি সম্পর্ক ছিল, তাহা তাঁহার কাব্যপাঠে জানা যায় না। তিনি কীর্তিচন্দ্রের আদেশে এই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন কথা কোন স্থানেও উল্লেখ করেন নাই; কিংবা তিনি কীর্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন, এমন উক্তিও কোথাও নাই। তবে সম্ভবতঃ কীর্তিচন্দ্রের রাজ্যের প্রজা বলিয়া এবং নিজেও ব্যক্তিগতভাবে কোন কারণে তাঁহার নিকট হইতে উপকৃত হইয়া কৃতজ্ঞতাভরে এই রাজার নাম তাঁহার কাব্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এতদতিরিক্ত তাঁহার সহিত

কীর্তিচন্দ্রের আর কোন সম্পর্ক ছিল না। এই কথা বিশদভাবে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, অনেকেই ঘনরামকে কীর্তিচন্দ্রের সভাকবি ও তাঁহারই আদেশে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত ঘনরামের এই সৌভাগ্য হয় নাই।

ঘনরাম তাঁহার কাব্য-রচনার মূলে একজনের কথা শ্রদ্ধার সহিত বার বার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার গুরু,—

গুরুপদে হয়ে যত্ন ঘনরাম কবিরত্ন
বিরচিল শ্রীধর্ম মঙ্গল।

এই গুরু তাঁহার টোলের অধ্যাপক। গ্রন্থোৎপত্তির মূলে কবি কৃতজ্ঞতাভরে এই গুরুর ঋণ স্মরণ করিয়াছেন। ধর্মের বন্দনায় তিনি লিখিয়াছেন,

ভাবি তব পদদ্বন্দ্ব দুই এক ভাষা ছন্দ
কবিতা করিতাম পূর্বফলে।
শুনে হয়ে কৃপান্বিত বর্ণিতে বলিয়া গীত
গুরু ব্রহ্ম বদন-কমলে॥

ঘনরামের কাব্য-রচনায় দেবতার স্বপ্নাদেশের কোন উল্লেখ নাই। এখানে গুরুর আদেশই দেবতার স্বপ্নাদেশের কার্য করিয়াছে। এই গুরুই তাঁহাকে কবিরত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন,—তিনি লিখিয়াছেন, 'নিজ গুণে করি যত্ন, নাম দিলা কবিরত্ন, কৃপাময় করুণা-আধান।' কবিরত্ন তাঁহার রাজ-দত্ত উপাধি নহে। ঘনরাম শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন, তিনি প্রায় সর্বত্রই লিখিয়াছেন, 'প্রভু যার কৌশল্যা-নন্দন কৃপাবান্।' সেইজন্য তাঁহার লাউসেনের চরিত্র অঙ্কনেও শ্রীরামচন্দ্রের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। এই সম্বন্ধে পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ঘনরাম বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতেন, তদুপরি তাঁহার পরবর্তী জীবনে সঞ্চিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান তাঁহার স্বভাব-কবিত্বের উপর পাণ্ডিত্যের প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছে। লাউসেনের বিদ্যাভ্যাস বর্ণনা সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা একমাত্র তাঁহার নিজের উপরই প্রযোজ্য,—

বেদবাণী বিজ্ঞ হ'ন পড়িয়া পাণিন।
কাব্য অলঙ্কার কোষ আগম নিগম।
ভক্তিযোগ সার যার ঘুচে মনোভ্রম॥

স্বভাব-কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের সংযোগই ঘনরামের কাব্যকে বৈশিষ্ট্য দান

করিয়াছে। পাণ্ডিত্যের প্রভাব ঘনরামের সহজ কবিত্বকে কোন স্থানে প্রতিহত করিতে পারে নাই, এই বিষয়ে একমাত্র তাঁহার পরবর্তী কবি ভারতচন্দ্রের সহিতই তাঁহার তুলনা হইতে পারে। তাঁহার কাব্যে ভারতচন্দ্রের ভাষা ও ভাবের পূর্বসূচনা দেখিতে পাই। ঘনরামের ভাষা অত্যন্ত মার্জিত এবং উন্নত রুচির পরিচায়ক। অনুপ্রাস-প্রয়োগ-বাহুল্য তাঁহার রচনাকে অনেক সময় শ্রুতিমধুর করিয়াছে। তাঁহার কাব্যের যে কোন জায়গা হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে,—

করপুটে এ' সঙ্কটে কাতরে কিঙ্কর রটে
উর ঘটে পূর অভিলাষ।
নিশি-নাশে নয়নে ছাড়িল নিদ্রা-মায়া।
জগতে জাগাবে যশ যদি জিন যেয়ে।
গদ গদ গরুড় গোবিন্দ গুণ গায়।
গুড়ি গুড়ি গরুড় গমনে গুড়ি যায়॥
ঘোর রবে ঘুঘু যেন ঘন ঘন ডাকে।
চঞ্চল চড়ুই চিল লিখে চক্রবাকে।
চকোর চকোরী নাচে চাহিয়া চপলা।
মনে হৈল নিকটে আইল মেঘমালা॥

অবশ্য এই সকল স্থলেও অনেক সময় তিনি অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া মধ্যে মধ্যে রচনার অর্থপরিগ্রহ দুর্ঘট করিয়া তুলিয়াছেন। উত্তর দিক বুঝাইতে কোথাও লিখিতেছেন, 'বিরাট-তনয়-মুখ'; প্রাতঃকাল অর্থে উষা শব্দ বুঝাইতে লিখিয়াছেন, 'গোবিন্দ-তনয়-সুত-জায়া', দশ বাণ সোনা বুঝাইতে লিখিয়াছেন, 'ইন্দু বিন্দু বাণ হেম' ইত্যাদি। প্রবচনের মত সংক্ষিপ্ত কথায় গভীর ভাব প্রকাশ করিতে ভারতচন্দ্র যে রচনার দক্ষতা দেখাইয়াছেন, ঘনরামেই তাহার সূচনা দেখিতে পাই। অবশ্য ঘনরামের রচনার আপেক্ষিক অপ্রচলনের জন্য তাহা লোকমুখেও বিশেষ প্রচার লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু এই ধরণের রচনার ঘনরামই পথপ্রদর্শক। তাহার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, ইহা হইতে কবির গভীর সামাজিক অভিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যাইবে,—

রোগ-ঋণ-রিপু-শেষ দুঃখ দেয় র'য়ে।
হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাই খুঁজি॥

না করে মিথ্যারে ভয় বিশেষে ঘটক।
বিবাহ বিষয়ে মিথ্যা দোষ নাহি তায়॥
কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব।
সুব্যঞ্জন ঝোল ঝালে, কুটুম্বিতা হালাহোলে,
পরকালে কেহ কার নয়॥

লখাইর সপত্নী সনকার মুখ দিয়া মাত্র একটি কথায় কবি বাঙ্গালী সংসারের যে একটি চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। শত্রু আসিয় নগর আক্রমণ করিলে লখাই তাহার সপত্নীর নিকট নগর রক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু এই সপত্নী ছিল কালুর উপেক্ষিতা ; সে এই সুযোগে শুনাইয়া দিল,—

মোর গায়ে উড়ে খড়ি তোর গায়ে চুয়া।
দাসীতে যোগায় পান গালে গোটা গুয়া॥

অতএব এই বিপদের সময় এখন তাহার সাহায্য প্রার্থনা নিষ্ফল। কথাগুলিতে কবির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি নূতন মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সৃষ্টিতেও ঘনরাম কয়েক স্থানে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাই পরবর্তী কালে গিয়া ভারতচন্দ্রে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। মৌলিকতাহীন ও গতানুগতিক কাহিনীর মধ্যেও ঘনরাম কয়েকটি চরিত্রসৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কর্পূরের চরিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ভীরু বাঙ্গালীর চরিত্রটি একঘেয়ে বীররসাত্মক ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে একটি বিপরীতধর্মী সৃষ্টি। ইহার পরিকল্পনায় কাব্যের আখ্যানভাগের মধ্যে অনেক স্থানেই একটু বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। বীর লাউসেনের পার্শ্বে এই ভীরু বাঙ্গালীর চরিত্রটি অঙ্কিত করিয়া ধর্মমঙ্গলের কবিগণ দুইটি চরিত্রকেই পরস্পরের সান্নিধ্যে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ঘনরামের এই কর্পূর চরিত্রটি একটি অতি সুন্দর বাস্তব চরিত্ররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। বীরত্বের আদর্শ বাঙ্গালী কবির পরিকল্পনায় যে কত নিষ্ফল, তাহা কর্পূর চরিত্রের সার্থকতা হইতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। লাউসেন ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদর্শ সৃষ্টি, কিন্তু এই কর্পূরই একমাত্র বাস্তব সৃষ্টি। ঘনরামের সামাজিক চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস এই কর্পূরের চরিত্রসৃষ্টিতে সুসঙ্গত সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছে।

ঘনরামের কাব্যে তাঁহার পূর্ববর্তী কয়েকজন কবির সামান্য প্রভাব বর্তমান

থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত তাহা এত স্পষ্ট নহে, কিংবা তাহা একেবারে তাঁহার কাব্যের মূলেও নিহিত নহে। দেবতাদিগের ছলে আত্মপরিচয় প্রদান করা মুকুন্দরামের পরবর্তী কাল হইতে মঙ্গলকাব্যের একটা বিশেষ লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারেব প্রয়োগ করিয়া কবিগণ পাণ্ডিত্যের কৌশল দেখাইতেন। কালকেতু ভবনে চণ্ডীর আত্মপরিচয় দানের মত ঘনরামেও অনেক স্থলে দেবতাদের আত্মপরিচয় দানের কথা আছে, তাহাতে সাধারণতঃ মুকুন্দরামেরই পথ অনুসরণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঘনরামের নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি মুকুন্দরাম হইতেই গৃহীত হইয়াছে,—

গজ পৃষ্ঠে সাজি' চলে ভূপতির মামা।
আন্ধারের মণি তুমি অন্ধকের নড়ি॥
হরি-হর-হিরণ্য গর্ভের তুমি মূল।
ননদী সতিনী নাই বচনের জালা।

ঘনরামের নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুবাদ হইতেই গৃহীত বলিয়া মনে হয়,—

মিছা বাণী সেঁচা পানী কতক্ষণ রয়।
কতক্ষণ জলের তিলক রয় ভালে।
কতক্ষণ রয় শিলা শূন্যেতে ফেলিলে॥

এতদ্ব্যতীত ঘনরাম অসংখ্য সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক সুন্দর ও সহজ ভাবে অনুবাদ করিয়া তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

মৃত দেহ দাহ করে চিতার অনলে।
সজীব শরীর সদা দহে চিন্তানলে॥

('চিতাচিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে'…)

রাজা বলে দূর নহে যেবা যার বন্ধু।
দুই লক্ষ যোজন অন্তর দেখ ইন্দু॥
কেমন কুমুদ ফুটে চন্দ্র দরশনে।
সরোরুহ বিকশিত সূর্যের কিরণে॥

—('গিরৌকলাপী'…)

তেজীয়ান্ যা করে করিতে পারে তাই।

('তেজীয়সাং ন দোষায়'…)

সুবৃক্ষ চন্দন গন্ধে সুশোভিত বন।
সুপুত্র হইলে গোত্রে প্রকাশে তেমন ॥

('একেনাপি সুবৃক্ষেণ'…)

কুপুত্র হইলে কুলে কুলাঙ্গার কহে।
কুবৃক্ষ কোটরে অগ্নি উঠে বন দহে ॥

—('একেনাপি কুবৃক্ষেণ…')

বহু বাংলা প্রবচনকে ঘনরাম নিজের কাব্যমধ্যে যেমন স্থান দিয়াছেন, তেমনই তাঁহার নিজের রচিত বহু পদও বাংলা প্রবচনে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই বিষয়ে তিনি ভারতচন্দ্রেরই অগ্রদূত।

অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীতে তাঁহার কাব্য একেবারে পরিপূর্ণ। গৌড়পতির পুরাণপাঠ-শ্রবণ-প্রসঙ্গে কত পৌরাণিক কাহিনী যে তিনি আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তাহার অন্ত নাই। তবে এই কাহিনীগুলি বর্ণনাতেও কবি বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন, যথেচ্ছভাবে তাহা বর্ণনা করিয়া যান নাই। ধর্মমঙ্গল কাহিনীর মধ্যে মধ্যে পুরাণের অনুরূপ এক একটি ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া তিনি এক একটি সুদীর্ঘ পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। একদিকে মঙ্গলকাব্যের বিধি-নিয়মের গণ্ডী, অন্যদিকে সংস্কৃত পৌরাণিক আদর্শ, এই উভয়ের মধ্যবর্তী হইয়া ঘনরামের বিপুলায়তন কাব্য আর নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পায় নাই।

ঘনরামের কাব্যে কেহ কেহ করুণরসের অভাব বোধ করিয়াছেন। অবশ্য প্রাচীন বাংলা কাব্যে করুণরস বলিতে যাহা বুঝায়,—অর্থাৎ লাচারী ছন্দে দীর্ঘ বিলাপোক্তি, তাহা ঘনরামের কাব্যে একেবারেই নাই। বিলাপ করিবার চরিত্রগুলি অর্থাৎ স্ত্রীচরিত্রগুলি ধর্মমঙ্গলকাব্যে পুরুষের অপেক্ষাও বীর, সম্মুখযুদ্ধে সর্বদাই তাহারা সশস্ত্র অগ্রসর হইয়া যায়; অতএব ইহাদিগকে লইয়া ধর্মমঙ্গলের গতানুগতিক করুণরস সৃষ্টির অবকাশ নাই। কিন্তু সেইজন্য স্বাভাবিক মানবীয় প্রবৃত্তিগুলি বিমূঢ় করিয়া কোন ধর্মমঙ্গলের কবিই কাব্য লিখিতে বসেন নাই, অতএব করুণরসও তাহাতে প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা কর্তব্যের শাসনে অত্যন্ত সংযত। ইহাদ্বারা প্রাচীন বাংলা কাব্যের একটি নূতন দিক উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইহা কোন কবির বিশেষ কোন রস বর্ণনার ক্ষমতার অভাব-জাত নহে,

ইহা এই জাতীয় কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য হইতেই জাত। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহত হইয়া লাউসেনের পত্নী কলিঙ্গা প্রাসাদ-দ্বারে ফিরিয়াই প্রাণত্যাগ করিল। সপত্নীর শোকে কানড়া কাঁদিয়া আকুল হইল। যোদ্ধবেশিনী কলিঙ্গার মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া কানড়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু সেই কান্না এক মুহূর্তের জন্য মাত্র, হয়ত অশ্রুও তাহাতে নির্গত হয় নাই, দুর্মুখা দাসী আসিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিল,—

এ'লাল কবরী কেশ ধূলায় লুটায়।
মুখানি মুছায়ে দাসী দুর্মুখা পেতায়॥
কেঁদ না সুন্দরী শুন উঠ বুক বেঁধে।
মরিলে কে কোথাকারে প্রাণ পেল কেঁদে॥
শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে।
সংহার সংগ্রামে সাজি শোক ত্যজ দূরে॥

যে যুদ্ধে পুত্র নিহত হইয়াছে, সেই যুদ্ধে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া জননী পুত্রশোক ভুলিতেছে, ভ্রাতা মৃত ভ্রাতার পরিত্যক্ত যুদ্ধাশ্ব গ্রহণ করিয়া সেই যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভ্রাতৃশোক ভুলিতেছে; অতএব এই কর্ম-তৎপরতার মধ্যে ধর্মমঙ্গলের কবিগণ কোন চরিত্রের জন্যই অলস বিলাপের দীর্ঘ অবকাশ রচনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তথাপি কোন চরিত্রকেই যে তাঁহারা হৃদয়হীন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাও নহে। মাতার মুখ হইতে যুদ্ধে ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া মাতার আদেশেই যুদ্ধসজ্জা করিতে করিতে শুকা বলিতেছে,

শুকা বলে শুন মা সমরে সেজে যাব।
শত্রু ত সংহারি রণে ভাই কোথা পাব॥
যে শোকে ব্যাকুল রাম অখিলের নাথ।
হেন শেল বুকেতে বাজিল বজ্রাঘাত॥
এত বলি কাঁদে শুকা লখে দেয় বোধ।
শোক তেজে সমরে ভেয়ের ধার শোধ॥

প্রাচীন বঙ্গের জাতীয় চরিত্রের ইহাতে আর একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব ইহার মধ্যে কোন বস্তুর যে অভাব আছে, তাহা বলা যায় না।

রামচন্দ্র

চামট গ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মল্লভূমের রাজা গোপাল সিংহের সময় ১০৩৮ মল্লাব্দে বা ১৭৩২ খৃস্টাব্দে তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।[১]

মল্লভূমে নিবসি মল্লের লিখি শক।
হাজার আটত্রিশ সালে হইল পুস্তক ॥

তাঁহার কয়েকটি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কাব্যমধ্যে তিনি মল্লভূমের তদানীন্তন রাজা গোপাল সিংহের নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন,—

দুর্জন সিংহ সুত গোপাল সিংহ খ্যাত
বৈষ্ণব প্রহ্লাদ সমান।
তস্য দেশে বাস ধর্মের ইতিহাস
দ্বিজ রামচন্দ্রে গান ॥

রামচন্দ্রের রচনা বৈশিষ্ট্য-বর্জিত—অত্যন্ত সাধারণভাবে তিনি কাহিনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন মাত্র, তাঁহার রচনা অনেকটা প্রাচীন পাঁচালীর লক্ষণাক্রান্ত। তবে ধর্মমঙ্গল কাব্যের দীর্ঘ কাহিনী ইহাতে কোথাও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে নাই বলিয়া তাহা শেষ পর্যন্ত সহজভাবে অগ্রসর হইযা গিয়াছে। কাহিনী-পিপাসু পাঠকের মন পড়িতে পড়িতে কোথাও পীড়িত হইয়া পড়ে না।

রামচন্দ্রের মধ্যে প্রকৃত কবিত্বের অভাব থাকিলেও পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল না। ইছাইর বিরুদ্ধে গৌড়েশ্বরের যুদ্ধাভিযানের বর্ণনাটি এইরূপ,—

নানা বাদ্য বাজে সাজে নৃপসেনাগণ।
তোলপাড় করে রাজ্য গৌড্ড ভুবন ॥
রায়বেলি গন্ধবেলি জম্বুরা ক্রলান।
ক্ষমরি মোহরি কাড়া ফুকরে কাহান ॥
দগড় দগড়ী বেনু রুদ্ধ বীণা বাঁশী।
কাংস্য করতাল ঘণ্টা ঘোর শব্দ কাঁসী ॥
সিন্ধু আনবরোল ভেরী রণভেরী কালী।
জয় ঢাক বীর ঢাক কর্ণে লাগে তালি ॥

এই পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরের সহিত যদি একটু প্রকৃত কবিত্বের সংযোগ হইত, তাহা হইলে রামচন্দ্রের কাব্যরচনা সার্থক হইত।

১ ব-সা-প ১, ৪১১-৪২০

সহদেব

১১৪১ সাল (১৭৩৫ খৃস্টাব্দ) ৪ঠা চৈত্র তারিখে সহদেব চক্রবর্তী কালুরায় ধর্মের স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন।[১] এই বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন,—

দ্বিজ সহদেব গান পূর্ব তপফলে।
যাহারে করিলে দয়া একচল্লিশ সালে॥
চৈত্রের চতুর্থ দিন পূর্ণিমার তিথি।
হেন দিনে যারে দয়া কৈলা যুগপতি॥

পাঁজির গণনায় দেখা গিয়াছে, ১১৪১ সাল ১৬৫৬ শকাব্দের ৪ঠা চৈত্র পূর্ণিমা তিথি ছিল না, কৃষ্ণা চতুর্থী তিথি ছিল। ইহার এক শত বৎসর পূর্বে কিংবা পরেও এই তারিখে পূর্ণিমা ছিল না, অতএব পূর্ণিমার তিথি বলিতে পূর্ণিমার পর চতুর্থীর তিথিই হয়ত কবি মনে করিয়া থাকিবেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।[২]

হুগলী জেলায় বালিগড় পরগণার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে কবি সহদেব চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার এই কাব্য রচনায় কালুরায় ধর্মের কথা বার বার শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। কোথাও লিখিয়াছেন, 'দয়া কৈলে কালুরায় স্বপনে শিখালে যারে গীত'; আবার কোথাও লিখিয়াছেন, 'দ্বিজ সহদেব ভণে, বিল্বমূলে যেই জনে দয়াবান্ হৈলে কালুরায়'। লাউসেনের কাহিনী ইহাতে নাই। ধর্মসাহিত্যের প্রাচীনতর কাহিনী অর্থাৎ হরিশ্চন্দ্র রাজা ও তৎপুত্র লুইচন্দ্রের বৃত্তান্ত ইহাতে সংক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া গেলেও, লৌকিক শিবের প্রাচীনতর কাহিনী, পৌরাণিক শৈব কাহিনী, মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রমুখ সিদ্ধাচার্যগণের জীবনী, তদুপরি পৌরাণিক দেব-দেবীর কাহিনীও ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। পৌণ্ড্রবর্ধন হইতে পালরাজত্বের সময়ে বৌদ্ধ প্রভাব যখন এই দেশে বিস্তৃত হয়, তখন তাহার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যোগতান্ত্রিক নাথদিগের ধর্মের কথাও এই দেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যের জামতি পালা ও গোলাহাট পালা যে নাথ-সাহিত্য হইতে গিয়া ধর্মসাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এই বিষয়ে

---

১ ব-সা-প ১, ৪৮২-৪৮৫

২ যোগেশচন্দ্র রায়, 'ধর্মের গান কত কালের,' প্রবাসী, ১৩৩৪, ভাদ্র, ৬৪১

পরে আলোচনা করিয়াছি। সহদেবের কাব্যেও নাথ-সাহিত্যেরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত নাথ-সাহিত্যের সহিত ধর্মসাহিত্যের আভ্যন্তরিক আর কোন সম্পর্ক নাই।

কতকগুলি স্বতন্ত্র বিষয়বস্তুর একত্র সমাবেশের জন্য সহদেবের কাব্য কোন দিক দিয়াই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহাকে সমগ্র ভাবে বিচার করিবারও উপায় নাই। ইহাতে চরিত্রসৃষ্টির কোন প্রয়াস নাই, কাহিনীর ঘটনা-সন্নিবেশেও কোন কৃতিত্ব নাই; ইহাতে কতকগুলি অসংলগ্ন উপকরণ আনিয়া একত্র সংকলনের চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। অতএব কাব্য হিসাবে ইহা নগণ্য।

তবে সহদেবের রচনার যে একটা বিশেষত্ব ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার ভাষা সুমার্জিত না হইলেও স্থানে স্থানে সরল ও মর্মস্পর্শী। বৈষ্ণব কবিতার ভাষার প্রভাব তাঁহার রচনায় অনুভব করা যায় এবং তাহাই তাঁহার ভাষাকে সরসতা দান করিয়াছে। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভাষা গ্রাম্যতা-দোষ-দুষ্ট; পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁহার স্বভাব-কবিত্ব সকল সময় সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। অনেক সময় তিনি গ্রাম্য উপমা প্রয়োগ করিয়া কোন কোন উন্নত কবিত্বপূর্ণ চিত্র ম্লান করিয়া দিয়াছেন। এই একটি ত্রুটি অন্ততঃ সংস্কৃত পুরাণ-প্রভাবিত সেই যুগে একটু বিশেষ ত্রুটি বলিয়াই মনে করিতে হয়।

নিম্নোদ্ধৃত রচনাটি হইতে সহদেবের কবিত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যাইবে,—

মিছা মায়া মধুরসে বন্দী হয়্যা মায়াপাশে
হরিপদে না রহে ভকতি।
তসরের পোকা যেন লূতায় বসিয়া হেন
নিজ সুখে মজে লঘু গতি॥

যোগীর পরম ধন গোবিন্দের পদে মন
শুনেছি সনক সনাতন।
না শুনি ব্রহ্মার কথা সবে হ'লো ঊর্ধরেতা
সাক্ষাৎ পাইল নারায়ণ॥

মস্তকেতে জটা ধরি গাছের বাকল পরি
বিভূতি ভূষণ ধরি গায়।
কি করিব রাজ্যধন পরম সুন্দরীগণ
উহা কি আমারে শোভা পায়॥

দ্বিজ সহদেবের ভণিতায় 'তারকেশ্বর বন্দনা'র একটি ক্ষুদ্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে,[১] ইহা ১২৪৪ সাল অর্থাৎ ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে অনুলিখিত। এই সহদেব উক্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যের সহদেব হওয়াই সম্ভব।

নরসিংহ

১৬৫৯ শকাব্দ বা ১৭৩৭ খৃস্টাব্দে নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল রচনা আরম্ভ হয়।[২] নরসিংহের পিতামহ মথুরা বসু বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচন্দ্রের সময় বর্ধমানের অন্তঃপাতী শাঁখারীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। মথুরা বসুর তিন পুত্র, তাঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁহার নাম ঘনশ্যাম। নরসিংহ ঘনশ্যামের পুত্র।

নরসিংহ নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে বীরভূমের তদানীন্তন নবাব আসাদুল্লাহ্ খাঁয়ের ওকালতি পদ লাভ করেন। বহুকাল তিনি এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদা তিনি নবাব আসাদুল্লাহ্ খাঁয়ের মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে দেয় এক লক্ষ টাকা খাজনা লইয়া শিবিকারোহণে মুর্শিদাবাদ যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে সহসা ঝড়বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইয়া আউস গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় তাঁহার এক আত্মীয় বাড়ীতে তিনি অত্যন্ত আদর সম্ভ্রম লাভ করিলেন। তাহার অনতিদূরেই একস্থানে ধর্মপূজার অনুষ্ঠান হইতেছিল, তিনি তাহা অবগত হইয়া তথায় তাহা দেখিবার নিমিত্ত গমন করেন। এক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, সন্ন্যাসী তাঁহাকে ধর্মের সঙ্গীত রচনা করিতে আদেশ করিলেন। নরসিংহ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এই সন্ন্যাসীর আদেশ-বৃত্তান্ত তাঁহার পরিজনের নিকট প্রকাশ করিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় উৎসাহ প্রদান করেন।

কবি নরসিংহ বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যতীতও পারসী, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার কাব্যের-মধ্যে এই সকল পাণ্ডিত্যের অযথা প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার কাব্যখানি আকারে সুবৃহৎ। কিন্তু ইহার কাহিনীর স্বচ্ছন্দ

[১] গ-স ৫৩৬৪, [২] ব-সা-প ১, ৪৫৬-৮১; ক৩২২৪

গতি কোথাও পাণ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে নাই। যে কোন স্থান হইতেই তাঁহার সামান্য একটু রচনা গ্রহণ করিয়া দেখাইলেই ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কর্ণসেন লাউসেনকে পশ্চিমোদয় করিয়া গৌড়রাজ্যের সমস্ত পাপ দূর করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন,

এত শুনি মহারাজ সেন পানে চান।
হাত ধর্‌্যা বচন বলেন বিদ্যমান॥
অনেক কর্‌্যাছ কার্য প্রাণধন বাপ।
এ'বার ঘুচাইয়া লহ মোর এই পাপ॥
অস্তাচলে যাইয়া দেহ পশ্চিমে উদয়।
তোমা বিনে এ' কার্য অন্যের সাধ্য নয়॥

নরসিংহের ভাষা মার্জিত, কোথাও গ্রাম্যতা দোষ-দুষ্ট নহে।

হৃদয়রাম

হৃদয়রাম সাউ ১১৫৬ সাল বা ১৭৪৯ খৃস্টাব্দে তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা সম্পূর্ণ করেন।[১] 'হৃদয়রামের পূর্ব নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার খুকুল গ্রামে, খুকুল বনপাশ স্টেশনের নিকটবর্তী। সেখানে মাতামহের বাড়ীতে চাঁদরায় নামক ধর্মঠাকুরের সেবার অংশ লইয়া মামাদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তিনি গ্রামত্যাগ করেন। মাতৃপিতৃহীন বালক মাতুলালয়ে পালিত হইয়াছিলেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বড় মামা কিছু সম্পত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু চাঁদরায়ের সেবার অংশ দিতে চাহেন নাই, হৃদয় মনের দুঃখে গ্রামপ্রান্তে তুলসীপুকুরে আত্মহত্যা করিতে গেলে ধর্মঠাকুর দেখা দিয়া অজয় নদের সিদিয়াদহ হইতে তাঁহার মূর্তি উদ্ধার করিতে আদেশ দেন। হৃদয়রাম সিদিয়াদহ হইতে ঠাকুরের মূর্তি সংগ্রহ করিয়া উচকরণে চলিয়া আসেন। উচকরণ নানুরের দক্ষিণে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম, সে গ্রামে হৃদয়রামের বংশধরগণ আজিও বাস করিতেছেন। উচকরণে আসিয়া তিনি ধর্মের গীত রচনার জন্য স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন এবং ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। কবির পিতামহের নাম গোবিন্দ, মাতার নাম মুকুতা, পিতার নাম কমল, তিনি জাতিতে শুঁড়ি'।[২]

হৃদয়রামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। ভাষা সংস্কৃতবহুল ও বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

১ বীরভূম বিবরণ ৩, ১৯১; ২ ঐ

গোবিন্দরাম

গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত একখানি ধর্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়।[১] ইহাতে কবির কোন পরিচয় কিংবা তাঁহার রচনাকাল সম্বন্ধেও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ডক্টর স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহাকে ময়ূরভট্টের পরবর্তী কবি বলিয়া মনে করিয়া খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন। ইঁহার যে হস্তলিখিত খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া যায়, তাহা ১০৭১ সালে লিখিত। কেহ মনে করেন, ইহা বঙ্গাব্দ, আবার কেহ মনে করেন ইহা মল্লাব্দ; মল্লাব্দ হইলে পুঁথির বয়স আরও ১০০ শত বৎসর কম হয়, অর্থাৎ ১০৭১ মল্লাব্দে ১৬৬৫ খৃস্টাব্দ ও ইহা বঙ্গাব্দ হইলে ইহাতে ১৭৬৬ খৃস্টাব্দ হয়।

কিন্তু কতকগুলি কারণে গোবিন্দরামকে ধর্মমঙ্গলের একজন প্রাচীন কবি বলিয়াই মনে হয়। রচনায় তখনও অষ্টাদশ শতাব্দীর মত পারিপাট্য দেখা দেয় নাই, ভাষাও সংস্কৃত শব্দ দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে নাই; চরিত্রগুলির পরিচয়ও একটু প্রাচীনতা-দ্যোতক। অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন কবির প্রভাব তাঁহার উপর খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় না। রচনায় একটা গ্রাম্যতাসুলভ স্বাভাবিক সরলতা আছে। বিশেষতঃ ময়ূরভট্টের স্মৃতি তাঁহার মন হইতে তখনও বিলুপ্ত হয় নাই; সেইজন্য কৃতজ্ঞতাভরে সুদীর্ঘ বন্দনায় তিনি ময়ূরভট্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘনরাম ও অপর কেহ কদাচিৎ অতি সংক্ষেপে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়াছেন।

তাঁহার কাব্য হইতে সামান্য কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিলেই গোবিন্দরামের রচনার বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যাইবে। 'ইন্দ্বা' মেটে ময়নানগর জুড়িয়া নিদুটি লাগাইয়াছে,

> যাবন্ত গড়ের লোক হল্য নিদ্রাতুর।
> নিদ্রা গেল পক্ষী মৃগ বিড়াল কুকুর॥
> কালুসিংহ নিদ্রা গেল যত বীরগণ।
> চারি নারী সেনের নিদ্রায় অচেতন॥
> সুখে নিদ্রা গেল ঘোড়া আস্তির পাথর।
> দুয়ারী পহরী দাসী যতেক নফর॥

সমসাময়িক
গুলি অপ্রধান
মূল কাহিনীর
ছেন, তেমনই

---

[১] ব-সা-প ১, ৩৭৯-৮৪

সন্তান মায়ের কোরে কত নিদ্রা যায়।
সামন্তের বৌ একা গড়েতে বেড়ায়॥

গোবিন্দরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক না হইলেও তাঁহাকে আনুমানিক মঙ্গলকাব্যের সৃজন যুগের কবি বলা যাইতে পারে।

রামনারায়ণ

রামনারায়ণ নামক একজন ধর্মমঙ্গলের কবির পুঁথি পাওয়া গিয়াছে,[১] কিন্তু পুঁথির মধ্যে তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তিনি সপ্তদশ কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। তাঁহার যে প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়, তাহা ১১৯৩ বঙ্গাব্দ বা ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে লিখিত। কাব্যের রচনা অনেকাংশে আধুনিক বলিয়া মনে হয়, ভাষায়ও পারিপাট্য আছে। অতএব মনে হয়, খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তিনি বর্তমান ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ও মার্জিত ভাষার একটু নিদর্শন দেখান যাইতেছে। ইছাইয়ের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার আরাধ্যা কালী তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন,—

মন্ত্রের অধীন আর ভক্তের কারণ।
নিজ মূর্তি ধরি কালী দিলা দরশন॥
মুক্তকেশী চতুর্ভুজা করাল বদনা।
লহ লহ বদনেতে লম্বিত রসনা॥
কোটর নয়ন তিল গলে মুণ্ডমাল।
ঊর্দ্ধ বাম ভুজে খড়্গ শোভিত বিশাল॥

এই মার্জিত ভাষা ও সুপরিণত কল্পনাগুণ হইতেই কবিকে মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগের লোক বলিয়া অনুমিত হয়।

রামকান্ত

...ায় নামক একজন কবিই ধর্মমঙ্গল কাব্যের সর্বশেষ কবি বলিয়া মনে ...াল বা ১৭৫০ খৃস্টাব্দে তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। তিনি ...ার কাব্যরচনার কাল নির্দেশ করিয়াছেন,—

এগার শ সাতানয় সালের আশ্বিনে।
আরম্ভ করিনু শুক্ল একাদশী দিনে॥

দেশ
আসেন।
বংশধরগণ আ...
জন্য স্বপ্নাদে...
গোবিন্দ, মা...
হৃদয়রামে
অত্যন্ত প্রবল।

———— , ৪২১-৩৬

[১] বীর সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৪৮), ৭২৯-৩৭

মনে যাহা করি তাহা লিখি অনায়াসে।
বারমতী সাঙ্গ হল্য বাষট্টি দিবসে॥

কেহ কেহ 'এগার শ সাতানয়' কথা কয়টির অর্থ ১১৯৭ বা ১১৭৯ বলিয়াও মনে করেন।

বর্ধমান সহরের দক্ষিণে দামোদর নদের অপর তীরে অবস্থিত সেহারা গ্রামে কবির নিবাস ছিল। তিনি তাঁহার কাব্যমধ্যে বিস্তৃত বংশপরিচয় ও কাব্য রচনার ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। শেষোক্ত বিষয়ের বর্ণনায় তিনি রাঢ়ের অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিদিগকেই প্রধানতঃ অনুকরণ করিয়াছেন। কাব্যের মধ্যে এই বর্ণনাটি অত্যন্ত বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে আধুনিকতার স্পর্শ অত্যন্ত স্পষ্ট।

বিবিধ কবি

যে সকল ধর্মমঙ্গলের কবির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধেই যথাসম্ভব আলোচনা করা গেল।

এতদ্ব্যতীত দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ,[১] নিধিরাম গাঙ্গুলি,[২] শঙ্কর চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজন কবিও ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, কিন্তু তাঁহাদের কাব্য কিংবা জীবন সম্বন্ধে কোন পরিচয় লাভ করা যায় না। ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের পরিচয় হইতে জানা যাইতেছে যে, ধর্মমঙ্গল কাব্য একই স্থানে উৎপত্তি ও প্রসার লাভ করিয়াছিল; এমন কি ধর্মপূজা মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ময়ূরভঞ্জ, মানভূম, বীরভূম অঞ্চলে সামান্য প্রসার লাভ করিলেও, সেই সকল দেশে কোন ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয় নাই। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী রাঢ়ের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বতন্ত্র দেশে ও সমাজে তাহা লোক-প্রীতি লাভ করিতে পারে নাই।

কাব্যবিচার

অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে, ধর্মমঙ্গল কাব্যের উপরও বাংলার সমসাময়িক সাহিত্যের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। অনেকগুলি অপ্রধান চরিত্র-পরিকল্পনায় ধর্মমঙ্গলের কবিগণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিলেও, মূল কাহিনীর পরিকল্পনায় যেমন ধারাবাহিক গতানুগতিকতাকে আশ্রয় করিয়াছেন, তেমনই

[১] ক ১৬৫১ [২] ব ৩৯৪

ঘটনাবিন্যাসেও অনেক স্থানেই সমসাময়িক একখানি বিশেষ কাব্যকে ভিত্তি করিয়া লইয়াছেন—তাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

অবশ্য কৃত্তিবাসের খাঁটি রামায়ণ পাওয়া যায় না; বর্তমানে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রচলিত আছে, তাহাতে অনেক অংশই পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত। অতএব সাধারণভাবে ইহাও মনে হইতে পারে যে, সম্ভবতঃ ধর্মমঙ্গলের কাহিনী হইতেই তাহা গিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্য নহে; কারণ, ধর্মমঙ্গল যে সকল অংশে রামায়ণ কর্তৃক প্রভাবিত বলিয়া অনুমিত হয়, সেই সকল অংশের কোন কোন চরিত্র বিশেষভাবে রামায়ণেরই চরিত্র। যেমন হনুমান। অতএব ইহা ধর্মমঙ্গলের উপর রামায়ণেরই প্রভাব বলিয়া অনুমিত হয়, ইহা রামায়ণের উপর ধর্মমঙ্গলের প্রভাবজাত নহে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি সমগ্র পালার নাম মায়ামুণ্ড পালা। নব্য ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণে'র শেষভাগেও পরবর্তী চরিত-খণ্ডের যে সূচী পাওয়া যায়, তাহাতেও বারমতির নবম মতি মায়ামুণ্ড বলিয়া উল্লিখিত আছে। তিনি বলিয়াছেন, 'নবমেতে মায়ামুক্ত (মুণ্ড) ইছাই নিধন।' অতএব ধর্মমঙ্গলের প্রাচীনতম যে কাহিনীর ধারা, তাহার মধ্যেও মায়ামুণ্ড পালার উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। ধর্ম-মঙ্গলের আদিকবি ময়ূরভট্টই লাউসেনের কাহিনী লইয়া বারমতি বা চতুর্বিংশতি পালায় বিভক্ত করিয়া কাব্য রচনা করেন। অতএব মায়ামুণ্ড পালা তাঁহারই সৃষ্টি। ইহাতেও মনে হয়, ময়ূরভট্ট কৃত্তিবাসের পরবর্তী লোক। ধর্মমঙ্গলের মায়ামুণ্ড পালাটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের একটি কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত। রামায়ণের কাহিনীটি এই যে, রাবণ রামচন্দ্রের এক মায়ামুণ্ড রচনা করিয়া অশোকবনে সীতার নিকট উপস্থিত করিলেন। সীতা ইহা দেখিয়া স্বামীর শোকে কাঁদিয়া অধীর হইলেন। অতঃপর হনুমানের নিকট হইতে প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইলেন। মায়ামুণ্ড পালাতেও লাউসেনের একটি মায়ামুণ্ড রচনা করিয়া, তাহা তাঁহার পত্নীদিগের সম্মুখে আনিয়া স্থাপন করার কাহিনী আছে। অতএব দেখিতে পাইতেছি, ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ই রামায়ণের কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রামায়ণের ছোট বড় কত ঘটনা যে ধর্মমঙ্গলের মধ্যে গিয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ধর্মমঙ্গলের কতকগুলি চরিত্রসৃষ্টিতেও কৃত্তিবাসী রামায়ণের কতকগুলি চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া লওয়া হইয়াছে। রামায়ণের হনুমান চরিত্রটিকে ধর্মমঙ্গল

কাব্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য হনুমানের উল্লেখ একমাত্র যে ধর্মমঙ্গল কাব্যেই দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, পরবর্তী মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলেও এই হনুমান চরিত্রের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। এমন কি পরাগলী মহাভারতে পর্যন্ত হনুমান চরিত্রটি আছে। অবশ্য তাহাও রামায়ণেরই প্রভাবজাত।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যে রুচিদুষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা আকস্মিক বস্তু নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য অর্থাৎ পদ্মাপুরাণগুলির আদর্শ ছিল কতকগুলি শৈব পুরাণ। শৈব পুরাণগুলির নৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত দূষিত ছিল। ইহা হইতেই মঙ্গলকাব্যের নায়কের রূপদর্শনে নারীদিগের নিজেদের পতিনিন্দা ইত্যাদি বিষয় অতি প্রাচীন কাল হইতেই মঙ্গলকাব্য রচনার বিধিনিয়মের অন্তর্বর্তী হইয়া পড়ে। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি এই বিষয়ে আরও একটুকু অগ্রসর ছিল। ইহাদের মধ্যে জামতি ও গোলাহাট পালা নামে যে দুইটি স্বতন্ত্র পালা বা অধ্যায় আছে, তাহা বিশেষভাবেই এই দূষিত নৈতিক দৃষ্টির পরিচায়ক। অবশ্য এই অধ্যায়ের পরিকল্পনা যে ধর্মমঙ্গল কবিদিগের মৌলিক কল্পনা-প্রসূত, তাহা বলা যায় না। নাথসাহিত্য হইতেই তাহা ধর্মসাহিত্যে সংক্রমিত হইয়াছে। নাথসাহিত্যে মীননাথের যে কাহিনী আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি স্ত্রীরাজ্য কদলীপত্তনে গিয়া ব্যভিচারে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কদলীপত্তন স্ত্রীরাজ্য—

কদলিত দেখে যুবতী সব প্রজা।
স্ত্রীরাজ্য হয় সে যে স্ত্রী হয় রাজা॥

ধর্মমঙ্গলের গোলাহাট পালার পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ ইহারই অনুরূপ। কর্পূর লাউসেনকে গোলাহাটের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিতেছে,

এ বড় বিষম বাট বামে রাখ দূরে।
নারী রাজা দারী তায় বৈসে ঐ পুরে॥

মঙ্গলা ও কমলা যেমন মীননাথকে কুহকজালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তেমনই লাউসেনকেও সুরীক্ষা নানা কৌশলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। গোরক্ষনাথ কতকগুলি হেঁয়ালীর উত্তর দিয়া যেমন মীননাথকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তেমনই লাউসেনও কতকগুলি হেঁয়ালীর জবাব দিয়া সুরীক্ষার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

অতএব অন্যান্য মঙ্গলকাব্য হইতে স্বতন্ত্র ধর্মমঙ্গলের কবিগণ এই জামতি ও

গোলাহাট পালা রচনায়ও অশ্লীলতার দিক দিয়া কোন মৌলিকতা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। মায়ামুণ্ড পালা যেমন রামায়ণ হইতে গৃহীত, জামতি ও গোলাহাট-পালার পরিকল্পনাও সম্পূর্ণভাবেই নাথসাহিত্য হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। নাথসাহিত্যের সঙ্গে ধর্মসাহিত্যের যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহা সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। ধর্মসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্বের যে কাহিনীর পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেও ধর্মসাহিত্যের উপর নাথসাহিতের প্রভাব অনুভব করা যায়। নাথসাহিত্যে বিশেষতঃ গোরক্ষবিজয়-মীন-চেতন প্রমুখ কয়েকখানি মধ্যযুগের কাব্যে দুর্নীতির যে নগ্নমৃত্যের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহারই ফলে মধ্যযুগের বহু সাম্প্রদায়িক সাহিত্যই কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্তী অধ্যায়ের কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কথাপ্রসঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

এতদ্ব্যতীত আখড়া পালার একটি প্রসঙ্গও নাথসাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। নাথসাহিত্যে পাই, পার্বতী গোরক্ষনাথকে ছলনা করিবার জন্য তাঁহার প্রণয় যাজ্ঞা করেন, কিন্তু গোরক্ষনাথ চরিত্রবলে তাঁহার ছলনা-জাল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হন। ধর্মমঙ্গলের আখড়া পালার বর্ণনাতেও আছে, লাউসেনকে ছলনা করিবার জন্য পার্বতী মোহিনীমূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রণয় যাজ্ঞা করেন। লাউসেনও নিজের চরিত্রবলে তাঁহার ছলনা হইতে আত্মরক্ষা করেন। অতএব মনে হয়, ধর্মসাহিত্যের এই লাউসেন নাথসাহিত্যের গোরক্ষনাথেরই প্রকারভেদ মাত্র। এই চরিত্রের পরিকল্পনায় ধর্মমঙ্গলের কবিগণ কোনও মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই। ধর্মমঙ্গলের মহামদ পাত্রের চরিত্রটিও ভাগবত-পুরাণের দশম স্কন্ধে বর্ণিত কংস চরিত্রের সম্পূর্ণ অনুরূপ। মহামদ পাত্র লাউসেনের পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,

দৈবকী হইল রঞ্জা উগ্রসেন তুমি।
সবংশে করিতে ধ্বংস কংসরূপী আমি॥

ধর্মমঙ্গলের কবিগণ এই চরিত্রটির পরিকল্পনায় কংসকেই সর্বতোভাবে আদর্শ করিয়া লইয়াছিলেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিশেষত্ব সম্বন্ধে ভূমিকাভাগেই সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়াছি, এখন ইহার চরিত্রগুলির বিচার সম্পর্কে তাহা আরও একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করা যাইতেছে। লাউসেন

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির নায়ক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নায়ক-চরিত্রের জন্য যে সকল গুণ নির্বাচন করিয়া থাকেন, লাউসেনের মধ্যে তাহাদের একটিরও অভাব নাই। তিনি ধীর এবং উদাত্ত গুণ-সম্পন্ন, কখনও কর্তব্য-বিমুখ নহেন। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ তাঁহাকে যদি দেব-সম্পর্ক হইতে একটু স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মহত্ত্ব আরও প্রকাশ পাইত। কিন্তু এই বীর চরিত্রটি কোন কারণে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াই যখন ধর্মের স্তব করিতে আরম্ভ করে, তখনই তাঁহার উপর হইতে নিরপেক্ষ পাঠকের সমগ্র সহানুভূতি দূর হইয়া যায়। কারণ, এইখানে তাঁহার আত্মশক্তির উপর কবিগণ দারুণ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি এই দেব-প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়াও এই চরিত্রটির মধ্যে মহানুভবতার সন্ধান করা যায়। অতএব দেবতাই তাঁহার সমগ্র কর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত এবং পরিণামে সার্থকতা-মণ্ডিত করিয়া দিলেও, ইহার মধ্যে তাঁহার যে ব্যক্তিগত একটা সংযম ও উদারতার সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। পার্বতী তাঁহার চরিত্রবল পরীক্ষা করিতে গেলে লাউসেন মাত্র সংক্ষেপে ছদ্মবেশিনী পার্বতীকে বলিলেন,

সকল তীর্থের ফল ঘরে বসি' করতল,
পতি পদে ভক্তি বল যার।
পৃথিবী পবিত্র যা'র পায়ের ধূলায় আর
আমি কি মহিমা ক'ব তার ॥

সমগ্র ধর্মমঙ্গল কাব্যের নৈতিক দূষিত আবহাওয়া এই প্রকার কয়েকটি উক্তি হইতেই যথাসম্ভব বিনষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যে কাব্যে সমাজের পতিগণ স্ত্রীকর্তৃক অহর্নিশি নিন্দা ও অসন্তুষ্টির ভাজন, সেই কাব্যেই এই প্রকার নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়া কবিগণ সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাসুন্দরের নায়ক ও ধর্মমঙ্গলের নায়কে এই পার্থক্য।

লাউসেনের দেবতার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা, মাতাপিতার প্রতিও তেমনই ভক্তিশ্রদ্ধা বর্তমান। সকল সময়ই গৃহ হইতে যাত্রা করিবার কালে তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া, তারপর নিজের সঙ্কল্প সাধন পথে অগ্রসর হন।

লাউসেন সৎসাহসী ও নির্ভীক, কিন্তু দুঃসাহসী নহেন। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আছে বলিয়াই যে কোন অবস্থার মধ্যে আত্মসমর্পণ করেন এবং এই আত্মশক্তির

সহিত দৈবশক্তির সহযোগে প্রায় সকল প্রতিকূল অবস্থা হইতেই মুক্তিলাভ করিয়া আসেন। গৌড়ের পথে সমস্ত বিপদের কথা অবগত থাকিয়াও তাহা হইতে কখনও তাঁহাকে পশ্চাৎপদ হইয়া আসিতে দেখা যায় না। এই নির্ভীক সাহসিকতাই তাঁহাকে একটি কাব্যের নায়ক-চরিত্রের উপযুক্ততা দান করিয়াছে। লাউসেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল, যখন কর্পূর স্বরীক্ষার 'কাটিল লোটন নাক ঘষারিল ভূঁয়ে', তখন 'দয়ার ঠাকুর সেন জল দেন মুখে।' একদিকে নাথসাহিত্যের গোরক্ষনাথের প্রভাব ও অপর দিকে রামায়ণের রামচরিত্রের প্রভাব—এই উভয় প্রভাবের মধ্যবর্তী হইয়া লাউসেন এই উভয়েরই বিশিষ্ট গুণাবলীর অধিকারিরূপে কল্পিত হইয়াছেন।

লাউসেনের বিচার-বিচক্ষণতা প্রশংসনীয়। গৌড়ের পথে লাউদত্ত কর্মকারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া শুনিলেন, মহামদ পাত্র প্রচার করিয়া দিয়াছেন যে, যাহার ঘরে প্রবাসী কোন পুরুষকে পাওয়া যাইবে, তাহার রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যে একাগ্রতা ও সত্যনিষ্ঠা থাকিলে জগতের যে কোনও কার্যে জয়লাভ করা যায়, লাউসেনের তাহাই ছিল। পশ্চিমোদয় কবির রূপক মাত্র; কিন্তু যে নিজের দেহকে নয়খণ্ড করিয়া কাটিয়া আদর্শের পূজা করিতে পারে, তাহার পক্ষে সংসারের যে কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা আশ্চর্য কিছুই নহে। কারণ, একমাত্র সাধনা দ্বারাই জগতের যত অসম্ভাব্য বস্তু সম্ভব হইয়াছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের চরিত্রকে একটা আদর্শরূপে কল্পনা করা হইলেও, এই ভাবেই সেই আদর্শের পরিকল্পনাও সার্থক হইয়াছে।

এইবার রঞ্জাবতীর চরিত্রটি আলোচনা করিব। লাউসেনের ব্যক্তিগত জীবনের সমগ্র সাধনার মূলে তাঁহার জন্মের ইতিহাস জড়িত হইয়া আছে। যে দুশ্চর তপশ্চর্যা দ্বারা লাউসেনকে তাঁহার জননী সন্তানরূপে লাভ করিয়াছিলেন, লাউসেনের জীবনেও সেই দুশ্চর তপশ্চর্যার শক্তিলাভের তাহাই মূলীভূত কারণ। আদর্শের সন্ধানে জননীর যে সাধনা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই সন্তানে নূতন রূপ লাভ করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু পুত্রমুখ দর্শন করিয়াই রঞ্জাবতী তাঁহার পূর্ব জীবনের আদর্শ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিলেন বলিয়াই মনে হয়। বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি রঞ্জাবতীর কোনদিনই অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই, এমন কি স্বামীর অপমানের জন্য ভ্রাতার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—

কিছু হক আজ হতে ঘুচিল মমতা।
শুনে রঞ্জাবতী বলে মোর ঐ কথা॥
আজ হতে ও'পথে আপনি দিনু কাঁটা।
সোদর বচন বুকে বাজে যেন জাঠা॥

অভিমানিনী ভগ্নীর এই দুঃখ যে ভাই তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়াছে,

বয়স বছর বার বন্ধ্যা বলি হেলে।
প্রাণনাথে সভায় বিন্ধেছে বাক্‌ছলে॥
সেই অগ্নি উঠে নিত্য অন্ন নাহি রুচে।
কাণা খোঁড়া পুত্র হক তবু দুঃখ ঘুচে।

এই অভিমানের জন্য তিনি শালে ভর দিয়া দেহত্যাগ করিয়া পর্যন্ত পুত্রলাভের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন, এই দুঃখাভিমান-জাত ঐকান্তিকী নিষ্ঠার জন্যই তাঁহার একাগ্র সাধনায় সিদ্ধিলাভও সম্ভব হইয়াছে।

এত সাধনার ধন এই পুত্র লাভ করিয়া রঞ্জা তাঁহার পূর্বপ্রকৃতি একেবারে বিস্মৃত হইলেন। অতঃপর তাঁহার যে চরিত্রের সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটে, তাহা কোনমতে কোন বীর নায়ক-চরিত্রের জননী হইবার ধৃষ্টতা রাখিতে পারে না। বিশেষতঃ ধর্মমঙ্গলের স্ত্রীচরিত্রের যে বিশেষত্ব সম্বন্ধে ভূমিকাভাগে আলোচনা করিয়াছি, রঞ্জাবতীর চরিত্রের মধ্যে তাহা লেশমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। এই চরিত্র-চিত্রণে রাঢ়ের জাতীয় চরিত্র প্রভাব অপেক্ষা গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের নায়ক-জননীর চরিত্রের আদর্শ ই জয়ী হইয়াছে। পদ্মাপুরাণের সনকা, চণ্ডীমঙ্গলের খুল্লনা ও ধর্মমঙ্গলের রঞ্জা এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিন্না। বরং রঞ্জাবতী ইহাদের তুলনায় অধিকতর সন্তান-স্নেহাতুরা। লাউসেন যখন গৌড়যাত্রা করিবার অনুমতি চাহিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত হীন কৌশলে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিয়া মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন,

বরঞ্চ এমন কেহ মহামল্ল থাকে।
বিক্রমে বাছারে মোর খোঁড়া করি রাখে॥
চরণ ভাঙ্গিলে ঘুচে গমনের আশ।
ঘরে বসে চাঁদমুখ দেখি বারমাস॥

সমগ্র মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে মাতৃস্নেহের এমন শোচনীয় দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। একটা গতানুগতিকতার প্রভাব বশতঃ ধর্মমঙ্গলের কবিগণ রাজমহিষী ও

বীরমাতা রঞ্জাবতীর চরিত্র এত হীনভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন,—পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই কাব্যের কবিগণ এতদ্দেশের জাতীয় চরিত্র সৃষ্টিতে যে অসীম কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। নিম্নলিখিত কয়েকটি স্ত্রীচরিত্রই তাহার প্রমাণ।

কেবলমাত্র রাজোচিত আভিজাত্য রক্ষা করিয়া কোন উচ্চাদর্শের চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা যে ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের ছিল না, রঞ্জাবতীর দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বলিবার উপায় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, রঞ্জার চরিত্রটি গতানুগতিকতার অনুকরণে বিনষ্ট হইয়াছে, নতুবা কামরূপের রাজমহিষীর সংক্ষিপ্ত একটি চরিত্র কি অপূর্ব হইয়া ফুটিয়াছে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কামরূপরাজ কর্পূরধবল লাউসেনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া নিজের কন্যা তাঁহার নিকট বিবাহ দিয়া দীনতা স্বীকার করিতে চাহিলেন, শুনিয়া রাজমহিষী বলিলেন,—

রাণী বলে কুলের পদ্মিনী ওই বালা।
না করো মাথায় নাথ কলঙ্কের ডালা॥
এ' বড় অবনী জুড়ে অতিশয় লাজ।
পরাজয় হয়ে কন্যা দিলা মহারাজ॥
কলঙ্ক না করো কুলে কন্যা কর বই।
বরঞ্চ সকল ছেড়ে দেশান্তরী হই॥
কোথাকার বরে তুমি দিতে চাও ঝি।
বাপ হ'য়ে জলে ফেল আনে কবে কি॥

অবশ্য মঙ্গলকাব্যে প্রকৃত পুরুষ চরিত্রের অভাব আছে, সেইজন্য রাণীর এই নিতান্ত সুযুক্তিপূর্ণ উদ্দীপনাময়ী বাণীও অরণ্যে রোদনের মত হইল—রাজা ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

গৌড়েশ্বরের চরিত্রে পূর্বাপর সামঞ্জস্য সুন্দর রক্ষা পাইয়াছে। তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ, মন্ত্রীর হাতের পুতুল মাত্র। বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে এই অবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে; কারণ, তিনি বয়সে বৃদ্ধ, কোন বিষয়ে নিজে অগ্রসর হইয়া কিছু করিবেন, সেই ক্ষমতা নাই,—সেইজন্য মন্ত্রীর উপরই সকল বিষয়ে নির্ভর করিতে হয়। তিনি একটু স্ত্রৈণ প্রকৃতির লোক, কোন কোন সময় মন্ত্রীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়াও এই বলিয়া তাঁহার উপর কোন শাসন করিতে পারেন না যে, তিনি তাঁহার স্ত্রীর 'কুটুম্ব'।

অন্য যদি পাত্র হত পেত বড় দাব।
কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব॥

তবে তিনি ন্যায়পরায়ণ ও স্নেহশীল। সোমঘোষকে কারামুক্ত করিয়া দিয়া, লাউসেনকে তাহার যোগ্যতার জন্য বরাবরই পারিতোষিক দিয়া তিনি এই ন্যায়পরায়ণতা ও সৌজন্যেরই পরিচয় দিয়াছেন।

মহামদ পাত্রই ধর্মমঙ্গল কাব্যের খল-চরিত্র (villain)। কাব্যের সার্থকতার জন্য এই চরিত্রটির পরিকল্পনা বড় সুন্দর হইয়াছে। লাউসেনকে হতপ্রভ করিবার জন্য তিনি যত চক্রান্তের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়াই লাউসেনের পৌরুষ জীবন্ত রহিয়াছে,—এক মুহূর্তের জন্য স্তিমিত হইয়া পড়িতে দেয় নাই। স্বভাবতঃই ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদিগের সহানুভূতি-বঞ্চিত এই চরিত্রটি নিজের মধ্যে নিজেই এক সুন্দর ও সুসঙ্গত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। চরিত্রটির আদ্যোপান্ত সামঞ্জস্যও সুন্দর রক্ষা পাইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, রাঢ়ের কতকগুলি জাতীয় স্ত্রীচরিত্র-পরিকল্পনায় ধর্মমঙ্গলের কবিগণ সমগ্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। লাউসেনের কোন কোন পত্নীর চরিত্রের মধ্যেও রাঢ়ের এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে প্রথমেই কানড়ার চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। কানড়া বীর রমণী। গৌড়েশ্বরের আক্রমণে পিতা সপরিবারে দুর্গত্যাগ করিয়া গেলেন, কিন্তু সে যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইল। বাঙ্গালী নারীর ইহা এক অভিনব পরিচয়। এই চিত্রের স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে এখানে প্রশ্ন করিয়া কোন লাভ নাই, শুধু ইহাতে যে বাঙ্গালী স্ত্রী-চরিত্রের গতানুগতিকতা-বর্জিত নূতন একটা দিকের সন্ধান পাইলাম, তাহার কথাই উল্লেখ করিতেছি।

কানড়ার হৃদয়ে ধর্মমঙ্গলের কবিগণ এক অপূর্ব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন—যাঁহাকে সে আশৈশব পতিরূপে কামনা করিয়াছে, সেই আজ যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার প্রতিপক্ষের সেনাপতি হইয়া তাহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। রণক্ষেত্রে লাউসেনের নিকট কানড়া এইভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিল,—

এতেক বলিল যদি ময়নার নাথ।
ঘুঁড়ি পিঠে কানড়া যুড়িল দুটি হাত॥
বার সাত অমনি চরণে দণ্ডবৎ।
বদনে বসন দূর করিল ঈষৎ॥

বলিতে লাগিল বালা বিনয় বচন।
শুন মহাশয় রায় মোর নিবেদন॥
হরিপাল দুহিতা আমি প্রমাদে পড়িয়া।
পিতামাতা ভাই বন্ধু গেল পলাইয়া॥
কানড়া আমার নাম স্বামী ভাবি তোমা।
পঞ্চম বৎসর হতে সেবি শিব উমা॥

মোসো গৌড়েশ্বর যাহাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন, তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া লাউসেন কর্ণ রুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিতে বাধ্য হইলেন যে, 'বলে ধরে তোমারে পাঠাব রাজধানে। হারি যদি এখনি বিবাহ এইখানে॥' শুনিয়া কানড়া বলিল,—

ভবানী ভাবিয়া বালা বলে ভালো ভালো।
কোপে বিধুবদন ঈষৎ হ'লো আলো॥
বলে ধ'রে নিতে পারে কার এ'ত বুক।
বলিতে বলিতে কোপে ধরিল ধনুক॥
এখন বাঁচাই নাথ অনুমতি দে।
না হয় দাসীর এক বাণ সয়ে নে॥
মরি যে তোমার হাতে মোক্ষ ফল পাব।
হানি যে তোমার শির সহমৃতা হব॥

সংস্কার ও কর্তব্য-বুদ্ধির মধ্যবর্তী এই নারীচরিত্রটির সামান্য কয়টি মুখের কথায় এই যে অকৃত্রিম আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছে, সমগ্র মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যে বুঝি তাহার তুলনা হয় না। এই চিত্র অঙ্কনে ধর্মমঙ্গলের কবিগণ কোন অমূলক আদর্শকে অনুসরণ করেন নাই বলিয়াই ইহার চিত্র এত জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে হয়।

নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলিকে ধর্মমঙ্গলের কবিগণ অপূর্ব মহিমামণ্ডিত করিয়া কল্পনা করিয়াছেন; ইহার কারণ, নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলিই ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। শৌর্যবীর্যে, কর্তব্যজ্ঞানে, ধর্মবুদ্ধিতে তাহাদের যে কোন দিক দিয়া কোন অভাব নাই, বৈষম্যমূলক সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও সেই যুগের ব্রাহ্মণ কবিগণ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সমুন্নত ও উদার মানব চরিত্রের পরিকল্পনাই ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির

রাঢ়ের জাতীয় কাব্য হিসাবে সার্থকতার কারণ। অস্পৃশ্য ডোম জাতীয় চরিত্রের মধ্যেও যে কত মহত্ত্ব থাকিতে পারে, লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোমের চরিত্রটিই তাহার প্রমাণ। অবশ্য এই চরিত্রটি রামায়ণের হনুমান-চরিত্রের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়া রচিত, কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের কল্পনায় তাহা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। জাগরণ পালায় বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ-কল্প কাম্বাডোম যখন কালুকে সত্যে আবদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক প্রার্থনা করিল, তখন কালুডোম বলিল,—

কি করিব কোথা হ'তে পরকাল মজে।
এ পাপে পরশে পাছে সেন মহারাজে॥
এ পাপে না হয় পাছে পশ্চিম উদয়।
সেনের কঠোর সেবা পাছে ব্যর্থ হয়॥
সত্য না লঙ্ঘিনু আমি ইহার কারণ।
অতেব অধম তোর বাঁচিল জীবন॥

সরল প্রকৃতির মানব-মন হইতে উৎসারিত ধর্মবিশ্বাসের অতি স্বাভাবিক অভিব্যক্তি এই কথাগুলির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, ইহাতে আদর্শবাদের লেশ-মাত্রও নাই।

কালু ডোমের পত্নী লখাইর চরিত্রেও অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নারীর বাঙ্গালী-সুলভ স্বাভাবিক মনোবৃত্তিগুলির ইহাতে বিকাশ লাভ সম্ভব হয় নাই। কর্তব্যের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিগত হৃদয়-বেদনা পুরুষের মত নারীও যে অনেক সময় বলি দিতে সক্ষম হয়, ধর্মমঙ্গল কাব্যের এই চরিত্রগুলিই তাহার প্রমাণ। পূর্বেই বলিয়াছি, ধর্মমঙ্গলে পুরুষ-চরিত্রের চরম অবমাননা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার স্থলে নারী-চরিত্রই মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। ময়নানগর শত্রু আক্রমণ করিয়াছে, লাউসেন নগরে অনুপস্থিত। কালুর হস্তে নগরের ভার অর্পিত আছে, কিন্তু কালু মায়া-নিদ্রায় অভিভূত। তখন লখাই স্বামীর কর্তব্যভার নিজে গ্রহণ করিল। পুত্রকে যুদ্ধে যাইবার জন্য বলিল, কিন্তু পুত্র অস্বীকৃত হইল। লখাই বলিল—

মোর দুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হ'লি।
তু বেটা তখনি কেন হ'য়ে না মরিলি॥

স্ত্রী আসিয়া স্বামীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল,—

ময়ূরা বলেন নাথ তুমি কৈলে কি।
দেশের বিপত্তি এই শ্বশুরের সেই ॥
শাশুড়ী বিকল কাঁদে শত্রু দেশ লেই।
মহাগুরুবচন রাজার লুন খেলে ॥
পাতক সঞ্চয় কেন কর বুক হেলে ॥
জগতে জাগাবে যশ যদি জিন যেয়ে।
মর ত মুকুন্দ পাবে মুক্তিপদ পেয়ে ॥

বাঙ্গালী নারী-চরিত্রের এই মহিমায় ধর্মমঙ্গল কাব্য সমুদ্ভাসিত। মাতা এবং স্ত্রীর ভর্ৎসনায় শাকা নিজের কর্তব্য বুঝিতে পারিয়া যুদ্ধযাত্রা করিল। যুদ্ধে সে নিহত হইল। তখন মাতা লখাইর আর এক মূর্তি দেখিতে পাই,—

শোয়ায়ে সোনার খাটে শাকায়ের শির।
ছোট পো শুকায় ডাকে চক্ষে বহে নীর ॥

একে একে সমস্ত পুত্র যখন যুদ্ধে নিহত হইল, তখন মাতা নিজে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া শত্রুকে বিনাশ করিয়া পুত্রশোক ভুলিতে গেল। বাঙ্গালী নারী-চরিত্রের এই একটি বিশেষ দিক ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মৌলিকতাহীন গতানুগতিক কাহিনীর মধ্যে এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবিধ মঙ্গলকাব্য

কালিকা-মঙ্গল, শীতলা-মঙ্গল, ষষ্ঠী-মঙ্গল, সারদা-মঙ্গল, রায়-মঙ্গল, সূর্য-মঙ্গল

কাহিনীর পরিকল্পনা ও কবিত্ব সৃষ্টির দিক দিয়া আর কোন মঙ্গলকাব্যই তেমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। পূর্বালোচিত প্রধান তিনখানি মঙ্গলকাব্য অবলম্বন করিয়াই ইহাদের কাহিনী সাধারণতঃ পরিকল্পিত হইয়াছে; উপরন্তু চরিত্রসৃষ্টির মধ্যেও এই সকল কাব্যের চরিত্রগুলির প্রভাব অনেকাংশেই বর্তমান রহিয়াছে। বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যের সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় মূল্য ব্যতীতও যে আরও একটা দাবী আছে, এই অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে তাহা প্রায়ই পূর্ণ হয় নাই। ইহারা পূর্বোক্ত প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিরই ব্যর্থ অনুকরণে পর্যবসিত হইয়াছে মাত্র। কোন কোন কাব্যে দেবতাই একমাত্র লক্ষ্য, কাহিনী উপলক্ষ মাত্র; আবার কোন কোন কাব্যে কাহিনীই একমাত্র লক্ষ্য, দেবতা উপলক্ষ—ইহাদের কোনটির মধ্যেই ইহাদের উভয়ের একত্র সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া লইবার প্রয়াস দেখা যায় না। 'শীতলা-মঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দরের কথা'ই ইহার প্রমাণ,—একটির মধ্যে দেবতাই আছে, কাহিনী নামে মাত্র আছে, আর একটির মধ্যে কাহিনীই আছে, দেবতা এক রকম নাই বলিলেই চলে। বিশেষ কোন শক্তিমান কবিও এই শ্রেণীর কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। অনেক সময় দেখা যায় যে, বিষয়বস্তুগুলি প্রকৃত মঙ্গলকাব্যের আদর্শোপযোগী নহে, তথাপি সমসাময়িক প্রভাবকে স্বীকার করিয়া কোন না কোন উপায়ে ইহাদিগকে মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই চেষ্টা অনেক সময়ই সফল হয় নাই। এই শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যগুলির উপর পৌরাণিক প্রভাব কোন কোন স্থানে অত্যন্ত অধিক দেখা যায়। শুধু কাহিনীভাগে প্রসঙ্গতঃ যে পৌরাণিক প্রভাব আসিয়াছে, তাহা নহে—অনেক সময় পৌরাণিক চরিত্র লইয়া কাহিনী রচনারও প্রয়াস দেখা গিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই কাহিনীর কোন নির্দিষ্ট জাতীয় আদর্শ সম্মুখে না থাকার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবি হয়ত বিভিন্ন প্রণালীতে একই দেবতার বিষয়ক কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাদের রচনার যুগে পৌরাণিক কিংবা লৌকিক দেবতার প্রতি সমাজের ভক্তি ও বিশ্বাস শিথিল হইয়া

আসিয়াছিল—কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, এই যুগে দেবতাকে নামে মাত্র আখ্যানভাগের মধ্যে স্থান দিয়া ঐতিহাসিক আখ্যানমূলক কয়েকখানি কাব্যও রচিত হয়। ঐতিহাসিক ঘটনাকে মঙ্গলকাব্যের পরিবেশের মধ্যে স্থান দিবার প্রবৃত্তি এই যুগেই প্রথম দেখা দেয়। এই শ্রেণীর কাব্যগুলিকে 'ঐতিহাসিক কাব্য' নাম দিয়া পরবর্তী অধ্যায়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়াছি। একমাত্র বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত এই শ্রেণীর আর কোন মঙ্গলকাব্যই খুব ব্যাপক প্রচার লাভ করিতে পারে নাই—এক একটা বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে এক একটি বিশেষ কাব্য সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই শ্রেণীর কোন কাব্যের মধ্যেই আঞ্চলিক কোন বৈশিষ্ট্য রূপলাভ করিতে পারে নাই,—সাহিত্যের অধঃপতিত (decadent) যুগে ইহার মধ্যে যে সকল ত্রুটি প্রকাশ পায়, এই শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সেই সকল ত্রুটি অত্যন্ত প্রকট বলিয়া অনুভূত হয়। তথাপি ইহাদের মধ্যে একখানি কাব্য কয়েকজন শক্তিমান কবির হাতে পড়িয়া যে একটু বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার কথাই সর্বাগ্রে আলোচনা করিব,—তাহার নাম কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর।

কালিকা-মঙ্গল

তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লেখিত হইয়াছে যে, কালী শক্তিদেবতা চণ্ডীরই রূপভেদ মাত্র। অবশ্য নিম্নস্তরের অনার্য সমাজ হইতেই যে কালিকাদেবীর উদ্ভব হইয়াছে, তাহা তাঁহার দেবত্বের প্রকৃতি হইতেই উপলব্ধি করা যায়। তন্ত্রের ভিতর দিয়া ইনি ক্রমে পৌরাণিক সাহিত্যেও প্রবেশ লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তী পৌরাণিক সম্পর্কের ফলেও তাঁহার অনার্য প্রকৃতির মূলে বিন্দুমাত্রও আর্য প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব অনার্য সমাজের মধ্যে তিনি যে একজন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্না দেবী ছিলেন, তাহাই মনে হয়। 'লিঙ্গপুরাণ', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', 'কালিকা-পুরাণ' ইত্যাদিতে অনেক কাহিনীর অবতারণা করিয়া কালীর সহিত একটা মৌলিক আর্যসম্পর্ক স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; পুরাণে চণ্ডীর সহিতও কোন কোন স্থানে তিনি অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার বিশিষ্ট অনার্য প্রকৃতি অত্যন্ত স্পষ্ট।

বহির্বাংলার কোন অনার্য সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়া এই দেবী ক্রমে তন্ত্র ও পুরাণের ভিতর দিয়াই বাংলার সমাজে আসিয়া প্রবেশলাভ করিয়াছেন, এই দেবী অনার্য বাংলার নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টি বলিয়া মনে হয় না। তাহা না হইলে বাংলার

প্রাচীনতম সাহিত্যেও তাঁহার সম্বন্ধে গতানুগতিক নিয়মে মঙ্গলকাব্য রচনার প্রয়াস দেখা যাইত। কালীর পরিকল্পনায় আসামের নরমুণ্ড শিকারী (head-hunter) নাগাজাতির কোন প্রভাব থাকিতে পারে। কারণ, কালীর মত শত্রুর ছিন্নমুণ্ড মস্তকে ও কণ্ঠে ধারণ করার রীতি তাহাদের মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত Sten Konow কালীর সঙ্গে জার্মাণ দেশের নার্থুস্ নামক লৌকিক দেবীর মৌলিক সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন যে, কালী ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির দেবতা—তিনি ভারতে কালী এবং জার্মাণিতে নার্থুস নামে পূজিতা হন।[১] কিন্তু তাঁহার মতের স্বপক্ষে তিনি যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা বিশেষ সারবান বলিয়া মনে হয় না। কালিকা-মঙ্গলে কালিকার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, অন্য কোন দেবতার সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বও ইহাতে বর্ণিত হয় নাই,—বিদ্যা ও সুন্দরের গুপ্ত প্রণয়-কাহিনীই এই কাব্যের মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয়, এই কাহিনীর মধ্যে মঙ্গলকাব্যের আধ্যাত্মিকতা আরোপ করিবার জন্যই একটি দেবতার নাম আনিয়া ইহাতে সংযুক্ত করা হইয়াছে।

চণ্ডীর মত কালীরও প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্নতা আছে। চণ্ডীর মত বিভিন্ন অনার্য সমাজের স্বতন্ত্র ধর্মপ্রবৃত্তি হইতে বিভিন্ন দেবতার প্রায় অনুরূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছিল—কালক্রমে তাহা সকলই কালী নামের সাধারণ পদবী গ্রহণ করে। ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, দক্ষিণাকালী, শ্মশানকালী, নিশিকালী, মহাকালী, উন্মত্তকালী প্রভৃতি সকলই এক কালীর সাধারণ নামের অন্তর্গত হইলেও মূলতঃ ইঁহাদের উদ্ভব ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র। অবশ্য অনেকের উদ্ভব পরবর্তী হইলেও ইঁহাদের মধ্যে যিনি মূল, তিনি অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভৈরব শিবের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লইয়াছিলেন। আনুমানিক খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ পশ্চিম ভারতের ইলোরা গুহা-ভাস্কর্যে শিবের সহিত কালীর মূর্তিও পাওযা যায়। ইহাই কালীর প্রাচীনতম রূপ বলিয়া মনে হয়। 'তন্ত্রসারে' ভদ্রকালীর যে ধ্যান বর্ণিত আছে, তাহার সহিত ইহার অনেক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়,[২] ধ্যানটি এইরূপ,—

'ক্ষুৎকামা কোটরাক্ষী মসীমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী।
নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি ॥

১ 'A European Parallel to the Durgा Puja'; *JASB*, XXI (1925), pp. 315-24.

২ V. A. Smith, *A History of Fine Art in India and Ceylon* (Oxford, 1911), Plate XLIII, 210.

হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জলদনলসন্নিভং পাশমুগ্রম্।
দন্তৈর্জম্বুফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী।'

এই পরিকল্পনা আশ্রয় করিয়া পরবর্তী কালে সম্ভবতঃ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অনুরূপ লৌকিক দেবীর পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। কলিকাতা কালীঘাটের কালীও তাহাদের অন্যতম। সমগ্র দাক্ষিণাত্য ব্যাপিয়া নিম্ন জাতির মধ্যে এখনও কালী-পূজার ব্যাপক প্রচলন আছে; সেখানকার প্রাচীন ভাস্কর্যেও বিভিন্ন প্রকৃতির বহু কালীমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ প্রকৃতির এক কালী দস্যু-তস্করের দেবতা ছিলেন। তান্ত্রিক আচারে তাঁহার পূজা হইত এবং তান্ত্রিক সমাজেই এই দেবতার উদ্ভব হইয়াছিল, 'তন্ত্রসারে' তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'চৈতন্য ভাগবতে' দেখিতে পাওয়া যায়, দুই চোর শিশু চৈতন্যকে হরণ করিবার জন্য এই দেবীর শরণাপন্ন হইতেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যেও আছে যে, শিশু লাউসেনকে হরণ করিবার উদ্দেশ্যে ইন্দা মেটে নিশাযোগে কালীপূজা করিয়া লইতেছে। এই বিশেষ প্রকৃতির কালীকে লইয়াই প্রাচীন বাংলায় বহু পাঁচালী রচিত হইতেছিল। তাহা 'চোরের পাঁচালী' নামে পরিচিত। কালিকা-মঙ্গলেও এই প্রকৃতির এক দেবীর উল্লেখ আছে। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এই সম্বন্ধে অন্যান্য প্রশ্নের বিচার করা যাইতেছে,—

গভীর রাত্রে এক রাজপুত্র ভদ্রকালীর পূজা করিতেছিল, রাজপুত্রের নাম সুন্দর। পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া কালী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাহাকে বলিলেন, 'যে বর প্রার্থনা কর, তাহা লইতে পার।' রাজপুত্র বলিল, 'নিভৃতে রাজকন্যা বিদ্যার সঙ্গে সাক্ষাতের বর প্রার্থনা করি।' কালী 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাকে একটি শুকপক্ষী দিলেন, বলিলেন, এই পক্ষীটি তাহার এই কার্যের সহায়ক হইবে। সুন্দর শুকপক্ষী লইয়া অদৃশ্য প্রণয়িনীর উদ্দেশে যাত্রা করিল, অবশেষে তাহার প্রণয়িনীর পিতৃরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে সুন্দর রাজধানীতে আসিয়া পহুঁছিল। সুন্দর এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছিল। তথায় এক মালিনী ফুল বেচিতে আসিল। মালিনী রাজ-অন্তঃপুরে ফুল যোগায়। সুন্দরের সহিত মালিনীর পরিচয় হইল। মালিনী তাহাকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিল। সুন্দর মালিনীকে মাসী বলিয়া ডাকিল। মালিনীর নিকট সুন্দর বিদ্যার বিস্তৃত পরিচয় পাইল, তাহার বিবাহের প্রতিজ্ঞার কথাও শুনিল,—সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে তাহাকে বিদ্যায় পরাজিত করিতে পারিবে, তাহাকেই সে বিবাহ করিবে—অন্য কাহাকেও নহে।

শুনিয়া সুন্দর বিদ্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। প্রত্যহ মালিনী রাজবাড়ীতে ফুল লইয়া যায়, সেদিনও গেল। ফুলের মধ্যে এক ছড়া অতি চিকণ মালা গাঁথিয়া সঙ্গে দিয়া দিল, মালার সঙ্গে একটি লিখনে নিজের পরিচয় লিখিয়া দিল। মালার সঙ্গে লিখন পাইয়া বিদ্যা সুন্দরের প্রতি আসক্ত হইল, মালিনীকে বলিল, সরোবরে স্নানের সময় তোর ভাগিনাকে দেখিতে চাই। স্নানের ঘাটে দুইজনে দেখা হইল, সঙ্কেতে আলাপও হইল। সুন্দর সঙ্কেতে জানাইল, সেই রাত্রেই তাহার সহিত সে সাক্ষাৎ করিবে। কিন্তু কি ভাবে সুন্দর রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না, অনন্যোপায় হইয়া কালীকে ডাকিতে লাগিল। কালী সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন; বলিলেন, আমার বরে মালিনীর গৃহ হইতে বিদ্যার গৃহ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ হইয়া যাইবে, তুমি সেই সুড়ঙ্গ-পথে গিয়া বিদ্যার সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিবে। সুড়ঙ্গ-পথে সুন্দর বিদ্যার শয়নগৃহে প্রত্যহ যাতায়াত করিতে লাগিল। গান্ধর্বমতে তাহাদের বিবাহ হইল, কালক্রমে বিদ্যা গর্ভবতী হইল। এক দাসী গিয়া রাণীর নিকট এই সংবাদ দিল। শুনিয়া রাণী মহাক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, তারপর রাজাকে গিয়া এই সংবাদ জানাইলেন। শুনিয়া রাজা কোটালকে আহ্বান করিয়া বিদ্যার গৃহে যে গোপনে যাতায়াত করে তাহাকে ধরিবার জন্য আদেশ দিলেন। বহু অনুসন্ধানেও চোর ধরা পড়িল না। সুন্দরের যাতায়াত তেমনই চলিতে লাগিল। অবশেষে কোটাল এক কৌশল অবলম্বন করিল। বিদ্যার সমস্ত গৃহ সিন্দূরে রাঙাইয়া দিল, সুন্দর তাহার গৃহে আসিলে তাহার বস্ত্রও রঞ্জিত হইল। রজকের গৃহে রঞ্জিত বস্ত্রের সন্ধান করিয়া কোটাল সুন্দরকে ধরিল। রাজা তাহার শিরশ্ছেদ করিবার আদেশ দিলেন। সুন্দরকে বাঁধিয়া দক্ষিণ মশানে লইয়া যাওয়া হইল। সুন্দর মশানে কালীর স্তব পাঠ করিল। কালী আবির্ভূত হইলেন এবং সুন্দরের হস্তে বিদ্যাকে সমর্পণ করিতে রাজাকে আদেশ করিলেন। রাজা সুন্দরের পরিচয় পাইয়া সাগ্রহে তাহাতে সম্মত হইলেন। সুন্দর বিদ্যাকে বিবাহ করিয়া লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল।

প্রাচীনকাল হইতেই প্রায় সকল দেশের লোক-সাহিত্যে চোরের বুদ্ধির প্রখরতা সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। ইউরোপীয় লোক-সাহিত্যেরও একটি সাধারণ বিষয় (motif) Princess won by cleverness.[১] সংস্কৃত ভাষায় 'চতুর' শব্দ হইতেই 'চৌর' শব্দ জাত। ইহাতে উপস্থিত বুদ্ধির অনুশীলন হইয়া থাকে বলিয়া, ইহা

[১] Stith Thompson, *The Folktale* (New York, 1946), p. 153.

একটি শিক্ষণীয় ও উচ্চশ্রেণীর বিদ্যা বলিয়া কল্পিত হইত। বাংলার অনেক রূপকথায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজপুত্র অন্যান্য বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে চৌর্য বিদ্যায়ও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দেশান্তরের রাজকন্যাকে কৌশলে হরণ করিয়া আনিতেছেন। প্রাচীন বাংলায় চোরের এই বিচিত্র জীবন-কাহিনী অবলম্বন করিয়া পাঁচালী আকারে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য রচিত হইয়াছিল। বীর কাশীশ্বর রচিত 'চোর-চক্রবর্তী' নামক একখানি কাব্য বহুবার বটতলায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন পুঁথিশালায় 'চোর-চক্রবর্তী কথা' নামে এই শ্রেণীর আর একখানি পাঁচালী আকারের ক্ষুদ্র কাব্য রক্ষিত আছে। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় ইহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।[১] তাহার চোর-নায়ক বিজয়নগরের রাজমন্ত্রীর পুত্র, নাম খরবর; কাব্য, জ্যোতিষ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সে 'কৌতুকে শিখিল উত্তম অধম চৌরবিদ্যা'। খরবর কালীর সহায়তায় রাজার শয়নগৃহ হইতে রাণীকে চুরি করিল, বহু অনুসন্ধানেও কোটাল চোরের সন্ধান পাইল না। যে চতুঃষষ্টিকলা লোকের নিকট বিশেষ আদর ও সম্মান পাইত, তাহার মধ্যে চুরিবিদ্যারও স্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

বাংলা দেশের বাহিরেও চোরের এই প্রকার বুদ্ধি-বিচক্ষণতা সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত রহিয়াছে।[২] উড়িষ্যায় প্রায় বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর অনুরূপ মুঘলমারীর রাজকন্যা শশীসেনার গল্প প্রচলিত আছে। এই শ্রেণীর গল্প যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সর্বত্র প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে তাহার বিস্তৃত উল্লেখ হইতেই জানিতে পারা যায়। 'কথাসরিৎসাগর', 'দশকুমার-চরিত' ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থে রাজপুত্রের চুরিবিদ্যা শিক্ষাবিষয়ক অনেক গল্প বর্ণিত হইয়াছে। কালক্রমে চৌর্য শাস্ত্র নামে এক বিশেষ শাস্ত্র সম্বন্ধে সংস্কৃতে কতকগুলি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থও রচিত হয়। ইহাদের একখানির নাম 'ষন্মুখকল্প' ও অপর একখানির নাম 'চোরচর্য' বা 'চৌর্যস্বরূপ'। সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাসুন্দরের একখানি সমগ্র কাব্যও রচিত হইয়াছিল।[৩] কিন্তু তাহা খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। অনেকগুলি বাংলা বিদ্যাসুন্দর লিখিত হইবার পর ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে

[১] সা-প-প ৪৫, ২১৭-১৮

[২] Bloomfield, The Art of Stealing in Hindu Fiction, *American Journal of Philosophy*, Vol. 44, 97-133, 193-239.

[৩] জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত ও প্রকাশিত (কলিকাতা, ১৯১৮)

হয়। বররুচিই এই সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের লেখক বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু তাহা লোকশ্রুতি মাত্র। বেহুলার কাহিনী লইয়াও সংস্কৃতে কাব্য রচিত হইয়াছে, চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীও সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু সেইজন্য বেহুলা ও চণ্ডীর এই সংস্কৃত কাহিনীকেই পদ্মাপুরাণ ও চণ্ডীমঙ্গলের মূল বলা যাইতে পারে না। 'বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানম্' নামক বাংলা ও নাগরীর অদ্ভুত মিশ্র অক্ষরে লিখিত ও বিক্রমাদিত্যের সভাকবি বররুচি কর্তৃক রচিত বলিয়া উল্লেখিত একটি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] পুঁথিখানি কোন বাঙ্গালী লিপিকর কর্তৃক অত্যন্ত আধুনিক কালে লিখিত—তাহা যে কেহ ইহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাংলা দেশে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে বররুচি এই শ্রেণীর একখানি কাব্যের রচয়িতা ও উজ্জয়িনী এই কাহিনীর ঘটনা-স্থান।[২] অতএব মনে হয়, এই জনশ্রুতি ভিত্তি করিয়াই এই সংস্কৃত উপাখ্যানখানি পরবর্তী কালে কোন বাঙ্গালী কর্তৃক রচিত হইয়াছে,—ইহা হইতে বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে, বিবেচনা করা সঙ্গত নহে। বররুচি প্রণীত এই সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরকে বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মূল বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। তবে সংস্কৃত হইতেই যে ইহার কাহিনীর কতক অংশ বাংলার পূর্বোল্লিখিত কোন লৌকিক চোরের কাহিনীর সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়া বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু এই সংস্কৃত গল্পাংশটি কি এবং ইহা কোথা হইতে আসিল ?

কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি বিল্‌হণ রচিত 'চৌর-পঞ্চাশিকা' একখানি সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। ইহার পঞ্চাশটি শ্লোকে কবি তাঁহার প্রেমিকার উদ্দেশ্যে গভীর হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ ধর্মভাব-বিবর্জিত। কথিত আছে, কবি বিল্‌হণ কোন রাজকন্যার সহিত গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ ছিলেন। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হন। তিনি তখন এই পঞ্চাশটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া রাজকন্যার প্রতি তাঁহার অন্তরের গভীর প্রণয় জ্ঞাপন করেন। ইহাই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মূল বলিয়া মনে হয়। কাশ্মীরী কবি বিল্‌হণ আনুমানিক খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। অতএব দ্বাদশ শতাব্দীতেই

১ S. C. Mitra, 'The long-lost Sanskrit Vidyasundar', *Proceedings of the Oriental Conference, Second Session* (Calcutta, 1923), 215-20.

২ রামগতি ন্যায়রত্ন ১৫৮।

ইহা রচিত হইয়াছিল,—পরে সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে। কাশ্মীরে প্রচলিত কাহিনীতে রাজকন্যার পিতার নাম বীরসিংহ, বাংলা বিদ্যাসুন্দরেও রাজার নাম তাহাই। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত এই কাহিনীতে ইহার নামগুলি একটু স্বতন্ত্র, অবশ্য ইহা স্থানীয় প্রভাব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

ক্রমে 'চৌরপঞ্চাশিকা'র কাহিনীটি বাংলা দেশেও আসিল এবং তাহা এতদ্দেশে পূর্ব হইতেই প্রচলিত একটি গুপ্ত প্রণয়-কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু এই গুপ্ত প্রণয়কাহিনীটি যে কি, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। 'ভাগবত-পুরাণে'র অন্তর্গত ঊষা-অনিরুদ্ধের কাহিনীও ইহার ভিত্তি হইতে পারে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ঊষা-অনিরুদ্ধের প্রণয়-কাহিনীটি ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল—ইহা মনসা-মঙ্গলেরও অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহারই কালক্রমে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীরও প্রেরণা দান করা সম্ভব। কেহ মনে করেন, পালি ভাষায় রচিত উম্‌মগ্‌গ জাতক হইতে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটি আসিয়াছে।[১] কিন্তু উম্‌মগ্‌গ জাতকের কাহিনী বাংলার লোকসাহিত্যে যে প্রচলিত ছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে ঊষা-অনিরুদ্ধের কাহিনীটি যে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুন্দর মশানে নীত হইয়া 'চৌর-পঞ্চাশিকা'র অনুরূপ সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করিলেন। অবশ্য দুইজন বাঙ্গালী বিদ্যাসুন্দরের লেখক—কঙ্ক ও কাশীনাথ—সম্ভবতঃ বাংলার অবিমিশ্র প্রাচীন লৌকিক কাহিনীটি লইয়াই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, বিল্‌হণের 'চৌর-পঞ্চাশিকা' তাঁহাদের কাব্যে স্থান লাভ করে নাই। এই প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে একটি গুপ্ত চৌর্যের বৃত্তান্ত জড়িত আছে বলিয়া ক্রমে কালিকা দেবীকে এই কাহিনীর মধ্যে আনিয়া স্থান দান করা হইল। শক্তি-দেবতা কালীর মাহাত্ম্যই যে এই কাহিনীর মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয় নহে, তাহা একজন বৈষ্ণব কবি ও একজন মুসলমান কবি লিখিত বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী হইতেও জানিতে পারা যায়।

[১] S. C. Mitra, 220

কালিকা-মঙ্গলের কবিগণ

বাংলায় বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর আদি-রচয়িতা কে? এই পর্যন্ত বিদ্যাসুন্দরের যত পুঁথি সম্বন্ধে জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, পূর্ব ময়মনসিংহের অধিবাসী কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরই প্রাচীনতম।[১] কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে। প্রথমতঃ যিনি তাঁহার পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, তিনি ব্যতীত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আর কোন অনুসন্ধানকারীই তাঁহার পুঁথি দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন নাই—ভবিষ্যতেও তাহা আর কাহারও পক্ষে দেখিবার আশা কম। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার ভাষা অত্যন্ত আধুনিক,—প্রাচীন ভাষা বলিয়া তাহা গ্রহণ করা কঠিন। তবে ভাষা কালক্রমে পরিবর্তিত হইতে পারে। তাঁহার কাব্য রচনার নির্দিষ্ট কোন সময়েরও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কঙ্ক

কবি কঙ্কের রচনা হইতে অনুমান করিতে পারা যায়, তিনি চৈতন্যের সম-সাময়িক লোক। তিনি এই বিষয়ে তাঁহার কাব্যমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

কবে বা হেরিব আমি গৌরার চরণ।
সফল হইবে মোর মনুষ্য জনম॥
পাপী তাপী মুঞি প্রভু আমি অল্প মতি।
হইবে কি প্রভুর দয়া অভাগার প্রতি॥
হউক বা না হউক পদ না ছাড়িব।
বাজন্ত নূপুর হইয়া চরণে লুটিব॥

কঙ্ক তাঁহার আত্ম-পরিচয়ে বলিয়াছেন, তাঁহার পিতার নাম গুণরাজ, মাতা বসুমতী। রাজ্যেশ্বরী নদীর তীরবর্তী বিপ্রগ্রাম তাঁহার জন্মভূমি; ব্রাহ্মণবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শৈশবেই মাতৃপিতৃহীন হ'ন। সংসারে তাঁহাকে

---

[১] স্বর্গীয় চন্দ্রকুমার দে মহাশয় কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরের আবিষ্কর্তা। ইহার একখানি পুঁথি তিনি ডক্টর স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে দেন, আরও একখানা তাঁহার সন্ধানে ছিল বলিয়া তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই পুঁথিখানি আজিও প্রকাশিত হয় নাই। তিনি ১৩২৫ ও ১৩২৬ সনের ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রিকায় কঙ্কের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন। তাহাই সকলের এই সম্পর্কিত আলোচনার ভিত্তি।

দেখিবার মত কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না, এক চণ্ডালের গৃহে তিনি মানুষ হইতে লাগিলেন। চণ্ডালিনী মাতাই তাঁহার নাম রাখিল কঙ্ক। চণ্ডালের নাম মুরারি এবং তাহার পত্নীর নাম কৌশল্যা। তাহারাই কবির মাতাপিতার স্থান পূর্ণ করিল।

বাল্যে গর্গ নামক এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তিনি রাখালের কার্যে নিযুক্ত হন। গর্গ পরম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পত্নীর নাম গায়ত্রী। তাঁহারা কঙ্ককে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজ তাহার বিরোধিতা করে। গর্গের কন্যা লীলার সহিত কঙ্কের প্রণয়-কাহিনী বর্ণনা করিয়া পূর্ব ময়মনসিংহের গীতিকাব্যে কবি রঘুসুত কর্তৃক এক পালাগান রচিত হইয়াছিল, তাহা 'কঙ্ক ও লীলা' নামে মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।[১] ইহার মধ্যে কিছু সত্যতা থাকাও অসম্ভব নহে।

কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর কালিকার মাহাত্ম্য-প্রচারক কাব্য নহে, বিপ্রগ্রামবাসী এক পীরের আদেশে কঙ্ক তাঁহার কাব্য রচনা করেন; সেইজন্য তাঁহার কাব্যোল্লিখিত দেবতা সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ। তিনি তাঁহার কাব্যকে 'পীরের পাঁচালী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—'গুরুর আদেশে গাহি পীরের পাঁচালী।' অবশ্য এতদ্ব্যতীত কাহিনীর মধ্যে আর কোন পার্থক্য নাই। সত্যপীরের উল্লেখ করিবার জন্যই কেহ মনে করিয়াছেন যে, কঙ্কের কাব্য খৃস্টীয় যোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইতে পারে না, কিন্তু স্কন্দপুরাণেও সত্যপীরের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] স্কন্দপুরাণ ইহারও পূর্ববর্তী রচনা। বিদ্যাসুন্দরের কবিদিগের মধ্যে কাব্যোক্ত স্থানসমূহের নামের কোন স্থিরতা ছিল না। বিদ্যা ও সুন্দরের নাম ব্যতীত অন্যান্য নামগুলিতেও অনেক সময় অনৈক্য দেখা যায়। অবশ্য ইহাতে মূল কাহিনীর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, কালিকা-মঙ্গলে দেবতা মুখ্য নহে। কঙ্কের কাব্য ও পরবর্তী কালিকা-মঙ্গল কাব্যের কতকগুলি বিষয়ে একটু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মূল কাহিনী বর্ণনায়ও সামান্য একটু ব্যতিক্রম আছে।

কঙ্কের কাব্য আদিরস-প্রধান নহে। চৈতন্যে আসক্তি দেখিয়াই মনে হয়, তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, সেইজন্য রচনায় নীতির সংযম তিনি কোথাও লঙ্ঘন করেন

১ মৈমনসিংহ গীতিকা, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত (১৯২৩) ১।২, ২৪৯-৯৮

২ স্কন্দপুরাণ (বঙ্গবাসী, ১৩১৮), ৩৬৬০-৬২

নাই। কঙ্কের রচনা সরল ও মধুর, অনেক স্থানে বৈষ্ণব কবিতার সুরও ধ্বনিত হইতে শোনা যায়; তাঁহার পূর্বোদ্ধৃত 'বাজন্ত নূপুর হয়্যা চরণে লুটিব' পদটি লোচন দাসের প্রসিদ্ধ পদ 'বাজন নূপুর হয়্যা চরণে রহিব গো' পদটির সহিত তুলনা করা যায়। ময়মনসিংহ অঞ্চলে কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল।

শ্রীধর

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের মধ্য হইতে একজন অতি প্রাচীন বিদ্যাসুন্দরের কবির নাম জানিতে পারা যায়।[১] তাঁহার নাম শ্রীধর, উপাধি কবিরাজ। তাঁহার দুইখানি মাত্র অসম্পূর্ণ পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কবির কালনিরূপণের কোন অসুবিধা হয় না। কারণ, তিনি তাঁহার রচনার মধ্যে গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের পৌত্র ফিরোজ শাহের উল্লেখ করিয়াছেন। ফিরোজ শাহ্ নস্‌রত শাহের পুত্র। নস্‌রত শাহের মৃত্যুর পর তিনি ১৫৩২-৩৩ খৃস্টাব্দ মাত্র কয়েক মাসের জন্য গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।[২] পুঁথির আবিষ্কর্তা মনে করেন যে, শ্রীধর গৌড়ে ফিরোজ শাহের সভাকবি ছিলেন। কিন্তু এ'কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না; কারণ, তাঁহার কাব্যের যে খণ্ডিত অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এ'কথা কোথাও উল্লেখ নাই। তিনি তাঁহার ভণিতায় কেবল মাত্র ফিরোজ শাহের প্রশংসা করিয়াছেন। গৌড়ের দরবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে না থাকিয়াও কোন কোন কবি সেকালে যে গৌড়েশ্বরের স্তুতিগান করিয়া গিয়াছেন, মনসা-মঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্তই তাহার প্রমাণ।

শ্রীধর তাঁহার কাব্যের ভণিতায় ফিরোজ শাহ্‌কে কোথাও রাজা, কোথাও যুবরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, ফিরোজ শাহ্ যখন যুবরাজ তখনই শ্রীধর তাঁহার কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ কোন উপায়ে যুবরাজ কবির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন—নতুবা গৌড়ের সুলতানকে বাদ দিয়া তাঁহার পুত্রের নিকট কবির কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

---

[১] আব্দুল করিম, 'গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত বিদ্যাসুন্দর', বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী, চন্দননগর, বিংশ অধিবেশন (১৩৪৩)-এর কার্যবিবরণী, ৫৭-৫৯। সা-প-প ৪৪, ২২-২৪। সাহিত্য পত্রিকা (ঢাকা) ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১১৫-৩৪; ইহাতে পুঁথিটি আদ্যোপান্ত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] H. B II. 159

মনে হয়, নসরত শাহের রাজত্বকালের শেষভাগে শ্রীধর তাঁহার কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তারপর ফিরোজ শাহ্‌ যখন গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার রচনা সম্পূর্ণ হয়। নসরত শাহ্‌ ১৫১৯ খৃস্টাব্দ হইতে ১৫৩২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। ফিরোজ শাহ্‌ ১৫৩২ খৃস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভ করিয়া মাত্র কয়েক মাস মধ্যে পরলোক গমন করেন। শ্রীধরের কোন কোন ভণিতায় ফিরোজ শাহ্‌কে রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে দেখিয়া মনে হয়, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর ও তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার কাব্য রচনা সম্পূর্ণ হয়। অতএব ১৫৩৩ খৃস্টাব্দই শ্রীধরের কাব্য রচনাকালের শেষ সীমা ধরিতে হয়। সুতরাং পুঁথির আবিষ্কর্তা যে মনে করেন যে, নসরত শাহের রাজত্বকালেই ইহার রচনা সম্পূর্ণ হয়, তাহা সমর্থনযোগ্য নহে।

দুইখানি পুঁথিই খণ্ডিত বলিয়া দ্বিজ শ্রীধরের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। তাঁহার কোন কোন ভণিতায় তিনি নিজেকে দ্বিজ বলিয়া উল্লেখ করিযাছেন। অতএব মনে হয়, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দুইখানি পুঁথিই চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে—অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটি সুপরিচিত ছিল—তথাকার আরও কয়েকজন প্রাচীন কবি এই বিষয় লইয়া পরবর্তী কালেও কাব্যরচনা করিয়া গিয়াছেন—মনে হয়, দ্বিজ শ্রীধরই তাঁহাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, প্রাচীন বাংলার বিদ্যাসুন্দরের কবিদিগের মধ্যে শ্রীধর কবিরাজের সময় সম্বন্ধে সর্বপ্রথম স্পষ্ট ঐতিহাসিক নির্দেশ পাওয়া যায়। কবি কঙ্কের সময় সম্পর্কে একমাত্র অনুমানের উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছে।

শ্রীধর তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী রচনায় অনেক স্থলেই সংস্কৃত ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন—বাংলা রচনার মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্বরচিত কতকগুলি সংস্কৃত বচনিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। যেমন প্রথমেই তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন,

'অস্তি উত্তর দেশে রত্নাবতী নাম দিব্যা পুরী। তত্র রাজা সর্বগুন-বিভূষিতা গুণসারো নানা শাস্ত্র সুনিপুণো ধর্মপরায়ণস্তস্য কলাবতী নাম্নী ভার্যা সর্বগুন-শালিনী। তস্যাঃ গর্ভে সুতো জাতঃ কালিকায়াঃ প্রসাদাৎ। সাক্ষাৎ কামঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।'

ইহার পর এই অংশের একটি পদ্যানুবাদ দিয়াছেন। ইহা হইতে পুঁথির

আবিষ্কর্তা মনে করিয়াছেন যে, বিদ্যাসুন্দরের কোন সংস্কৃত আখ্যায়িকা হইতে শ্রীধর তাঁহার কাব্যখানি বাংলায় অনুবাদ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে; কারণ, প্রাক্-চৈতন্যযুগের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত রচনার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া আসিতে পারে নাই—বাংলা ভাষায় কাব্যরচনা করিলেও, সেকালের কোন কোন কবি তাঁহাদের রচনার স্থানে স্থানে স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকও যোজনা করিয়া দিতেন—তাহার প্রমাণ বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। সংস্কৃত পুরাণ পাঠে অভ্যস্ত পাঠকের নিকট ইহাতে ভাষাসাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইত—সাধারণ অজ্ঞ লোকের নিকটও কাহিনীর আভিজাত্য সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইত—অতএব ইহা প্রাক্-চৈতন্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রীতি বলিয়াই গণ্য করিতে হয়, ইহার আর কোন তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

শ্রীধরের রচনায় সুন্দরের পিতার নাম গুণসার ও মাতার নাম কলাবতী—সুন্দরের পিতৃরাজ্যের নাম বিজয়নগরী রত্নাবতী। বিদ্যার পিতার নাম বীরসিংহ, মাতার নাম শীলাদেবী, রাজধানীর নাম কাঞ্চী। শ্রীধরের রচনায় পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় দুর্লভ।

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যের ধর্ম ও সাহিত্যের প্রভাব স্থাপিত হইবার পূর্বেই বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচয়িতাদিগের মধ্যে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী বিদ্যার রূপবর্ণনার যে একটি বিশিষ্ট রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল, শ্রীধরের রচনাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারই ধারা ভারতচন্দ্র পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়া তাঁহার মধ্যে একটি পরিণত রস-রূপ প্রকাশ করিয়াছে। শ্রীধরের রচনায় বিদ্যার রূপবর্ণনাটি এই—

নবীন ঘনের পুঞ্জ যেন কেশভার।
ধরণী বিলোটায় সে লম্বিত অপার॥
বিদ্যার বদনশশী যেন অববান্ধা।
খঞ্জন জিনিয়া দুই নয়নের ছন্দা॥
উহার ললাট যেন আধশশীখণ্ড।
অধর বান্ধুলী যেন মুখ রসভাণ্ড॥
দশন মুকুতা পাঁতি বাক্য মধুপান।
ভুরুভঙ্গে কামদেব ধনুর সমান॥

গ্রীবাখণ্ড দেখি শঙ্খ জলধি প্রবেশ।
মদন-মোহন-বিদ্যা যৌবন বিশেষ॥
কহত মাধব ভাট স্বরূপ উহার।
শ্রুতি নাসা কুচযুগ কিরূপ আকার॥
কুচযুগ মধ্যদেশ কুহরের ছন্দ।
উরুযুগ নিতম্ব কেমন প্রবন্ধ॥

॥ মাধব ভাট কথয়তি॥

একমন হই শুন কহি যুবরাজ।
শ্রবণ গৃধিণী দেখি পাইলেক লাজ॥
দেখিয়া ফাটিল তাল পয়োধর দেশ।
কমল-কলিকা জলে করিল প্রবেশ॥
সমুখে কমলনাসা যেন তিল ফুল।
এ রামকদলী ভুজ নিতম্ব বিপুল॥
দেখিয়াছি কুমারীর বাহু ভুজঙ্গ।
সুবর্ণ মৃণালবর পদ্মএ সুরঙ্গ॥
ক্ষীণ মাঝা দেখি সিংহ পাই উপহাস।
লজ্জায় করিল গিরি কোটরেতে বাস॥
রক্ত-পদ্মসম পদযুগ সুকোমল।
নবশশী জিনি পদ-নখ নিরমল॥
চরণে মল সাজে গমন লীলায়।
চলিতে চলএ যেন রাজহংস যায়॥[১]

ইহার সঙ্গে পরবর্তী বিদ্যাসুন্দরের কবিদিগের বিদ্যার রূপবর্ণনার অংশ তুলনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই বিষয়ে একটি বিশিষ্ট অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত রীতি প্রথম হইতেই স্থাপিত হইয়াছিল;—খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ পর্যন্ত তাহাই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

[১] সাহিত্য পত্রিকা, ১ (১৩৬৪), ১২১-২২

সাবিরিদ খাঁ

সম্ভবতঃ শ্রীধর কবিরাজের কালিকা-মঙ্গল রচনার অব্যবহিত পরেই সাবিরিদ খাঁ নামক চট্টগ্রাম অঞ্চলের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান কবি বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী লইয়া একখানি কাব্য রচনা করেন। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে তাঁহার যে খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন,[১] তাহাতে কবির এই প্রকার আত্মপরিচয় পাওয়া যায়,—

পিয়ার মল্লিক[২] সুত বিজ্ঞবর শাস্ত্রযুত
উজীয়াল মল্লিক প্রধান।
তান পুত্র জিঠাকুর তিন 'সিক'[৩] সরকার
অনুজ মল্লিক মুসাখান॥
রসেত রসিক অতি রূপে জিনি রতিপতি
দাতা অগ্রগণ্য অর্কসুত।[৪]
ধৈর্যবন্ত যেন মরু জ্ঞানেত বাসবগুরু
মানে কুরু ধর্মে ধর্মসুত॥[৫]
তান সুত গুণাধিক নান্নুরাজা মহল্লিক
জগত প্রচার যশখ্যাতি।
তান সুত অল্পজ্ঞান হীন সাবিরিদ খান
পদবন্ধে রচিত ভারতী॥

উদ্ধৃত কবির আত্মবিবরণীতে তাঁহার পূর্বপুরুষ জিঠাকুরকে তিনসিকের সরকার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনসিক নামে কোন পরগণা চট্টগ্রামের কোথাও নাই। বরং নোয়াখালি জিলায় উত্তরসিক, দক্ষিণসিক—এই সকল নামে পরগণার

[১] পুঁথিখানির দুইটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী মুন্সী আবদুল করিম সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, —'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যপ্রসঙ্গ', সওগাত (কলিকাতা), ১৩২৬ সাল, পৌষ, ৮৫; 'মুসলমান কবির বিদ্যাসুন্দর', ভারতবর্ষ ১৩২৫, ৬৩৩-৩৬। বর্তমান গ্রন্থের আলোচনা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত উক্ত মুন্সী সাহেবের আবিষ্কৃত মূল পুঁথিখানির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। সম্প্রতি এই পুঁথিখানি আনুপূর্বিক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, 'সাহিত্য পত্রিকা', ঢাকা ১ (১৩৬৪), পৃষ্ঠা ৯৬-১১৪।

[২] মল্লিক—মহল্লিক, মহলের তত্ত্বাবধায়ক

[৩] সিক—চাক্‌লা, পরগণা

[৪] সূর্যের পুত্র কর্ণ

[৫] যুধিষ্ঠির

অস্তিত্ব আছে। অতএব পুঁথির আবিষ্কর্তা মনে করেন, তিনসিক পরগণাও নোয়াখালি জিলাতেই অবস্থিত ছিল। সুতরাং কবি নোয়াখালি জিলারই অধিবাসী হইবেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমানদিগের মধ্যে ঠাকুর পদবী নূতন নহে। প্রসিদ্ধ পদ্মাবতের অনুবাদক কবি আলাওলের মুসলমান পৃষ্ঠপোষকের নাম ছিল মাগন ঠাকুর—তিনি সৈয়দ বংশজাত সম্ভ্রান্ত মুসলমান ছিলেন। মনে হয়, সেই অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগকেই ঠাকুর বলিয়া সম্মানিত করা হইত।

সাবিরিদ খান তাঁহার কাব্য রচনায় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দ্বিজ শ্রীধরকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। উভয়ের কাব্যেই চরিত্রের নামগুলি অভিন্ন—উভয়ের পুঁথিরই খণ্ডিত অংশ হইতে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে মনে হয়, একই সূত্র হইতে তাঁহারা উভয়েই কাহিনীভাগ আহরণ করিয়াছিলেন, কিংবা সাবিরিদ খাঁ শ্রীধরকে অনুসরণ করিয়াছিলেন।

সাবিরিদ খাঁ সংস্কৃত ভাষায়ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন—শ্রীধরের মত তিনিও সংস্কৃত বচনিকা এবং স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা এই মুখবন্ধ রচনা করিয়া তিনি তাঁহার বাংলা কাব্যের সূচনা করিয়াছেন।

অস্ত্যত্তরে শুভদেশে সর্বশান্তি সমন্বিতা।
পুরী রত্নাবতী নাম্নী সর্বরত্ন বিভূষিতা॥
গুণসার নৃপস্তত্র নীতিধর্ম-পরায়ণঃ।
তস্য কলাবতী নাম্নী ভার্যা চ গুণশালিনী॥
তস্যা গর্ভে সুতঃ জাতঃ কালিকায়া প্রসাদতঃ।
সুন্দর ইতি-আখ্যাত সর্বশাস্ত্র-বিশারদঃ॥

অতঃপর শ্রীধরের মত ইহার একটি পদ্যানুবাদ দ্বারা তাঁহার কাব্যের সূচনা হইয়াছে। শ্রীধরের রচিত বচনিকা কিংবা শ্লোক তিনি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার এই শ্লোকগুলি পুঁথির পরবর্তী লিপিকর কর্তৃক বিকৃত হইয়াছে—অতএব ইহাতে সাবিরিদ সংস্কৃতভাষায় অজ্ঞ ছিলেন, এমন অনুমান করা ভুল হইবে। এই শ্লোকগুলি শ্রীধর ও সাবিরিদ কোন তৎকালীন প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, কারণ তাহা হইলে উভয়ের রচনার মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি শ্লোক অভিন্নরূপে পাওয়া যাইত—কিন্তু তাহা পাওয়া যায় না। অতএব সংস্কৃত শ্লোকগুলি উভয়েরই স্বাধীন রচনা বলিয়া মনে হয়।

সাবিরিদ খাঁর সময় সম্পর্কে তাঁহার কাব্যমধ্যে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাঁহার পুঁথিখানি অসম্পূর্ণ ভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব এই বিষয়ে তাঁহার পুঁথির মধ্যে কোন উল্লেখ ছিল কিনা, তাহাও বলিবার উপায় নাই। অতএব পুঁথির ভাষা বিচার করিয়া তাঁহার কাল-নিরূপণ করিবার চেষ্টা করা যাইবে। ভাষা বিচার করিবার কালে এই একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হয় যে, পুঁথির যদি প্রচার ব্যাপক হইয়া থাকে, তবে তাহার ভাষার বিচার নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না—কারণ, বহুল প্রচার দ্বারাই মূল ভাষা পরিবর্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় সাবিরিদ খাঁর পুঁথি বহুল প্রচার লাভ করিতে পারে নাই; কারণ, তাঁহার একখানি মাত্র খণ্ডিত পুঁথি ব্যতীত আর কোন পুঁথি আবিষ্কৃত হয় নাই। অতএব তাঁহার পুঁথির ভাষা বিশেষ পরিবর্তিত হইতে পারে নাই। এমন কি আবিষ্কৃত পুঁথিখানিকে কবির সমসাময়িক বলিয়াও মনে হইতে পারে।

সাবিরিদ খাঁর পুঁথিতে ক্রিয়াপদের ব্যবহার এই প্রকার,—সম্মানার্থক প্রথম পুরুষ—'শুনন্ত', 'করন্তি', 'পলায়ন্ত', 'যান্ত', 'জানয়ন্ত' ও তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষ—'ফিরসি' ইত্যাদি। ইহা ভাষার প্রাচীনতা-দ্যোতক। 'কে' বিভক্তির পরিবর্তে 'ক' বিভক্তির প্রয়োগ পুঁথিখানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যথা—'তনয়ক' (তনয়কে), 'তা-সবাক' (তাহাদিগের), 'পতিক' (পতিকে), 'বিদ্যাক' (বিদ্যাকে), 'তাক' (তাহাকে)। ইহাও ভাষার প্রাচীনতা-দ্যোতক। এতদ্ব্যতীত এই সকল প্রাচীন বিভক্তিযুক্ত শব্দ পুঁথিখানির সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে,—যেমন, 'তথি' (সেখানে), 'তছু' (তাহার), 'মোহর' (আমার), 'আহ্মি' (আমি), 'তুহ্মি' (তুমি) ইত্যাদি। 'তোহ্মা', 'আহ্মা' শব্দগুলি বাদ দিলেও এ'কথা স্বীকার করিতে হয় যে, উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদে 'উঁ' ও 'অম্' প্রমুখ প্রত্যয়ের প্রয়োগ বাংলা ভাষায় অত্যন্ত প্রাচীন—প্রাচীনতম বাংলা ভাষারই ইহা একটি নিদর্শন।[১] ইহাতে অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়াপদে স্বার্থে 'ক' বিভক্তির সর্বত্র অভাব,—যেমন, যাউ (যাউক নহে)—ইহা হইতেও পুঁথিখানিকে ভাষার দিক দিয়া প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এই ভাষা বিচার করিয়া মনে হয়, পুঁথিখানি খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী যুগে রচিত হইতে পারে না। অতএব মনে হয়, শ্রীধর কবিরাজের মাত্র অল্পকাল পর, কিংবা সমসাময়িক কালেই সাবিরিদ খাঁ তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। কেহ অনুমান

[১] **S. K. Chatterji**, ***The Origin and Development of the Bengali Language*** **(Calcutta, 1929), II, 934.**

করিয়াছেন, '১৪৮০ থেকে ১৫৫০ খৃস্টাব্দের মধ্যেই' সাবিরিদ খাঁ বর্তমান ছিলেন।[১]

রচনার মধ্যে সাবিরিদ খাঁ তাঁহার সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। স্বভাবস্ফূর্ত কবিত্বের বিকাশ তাঁহার কাব্যের মধ্যে প্রায় নাই বলিলেই হয়, তাঁহার পাণ্ডিত্য কবিত্ব-বিকাশের বাধা হইয়াছে। বিদ্যার রূপবর্ণনায় তিনি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়া চিত্রটিকে প্রাণহীন করিয়া তুলিয়াছিলেন। ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি সাবিরিদ খাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—

দ্বিজ বর তনয় পণ্ডিত।
আহ্মা জান বৈদেশী নিশ্চিত॥
পাঠ পঢ়ি ভ্রমিএ নগর।
পণ্ডিতালি করিএ বিচার॥
বেলি শেষে অস্ত যায় সূর।
বাসা খানি মাগি তোহ্মাপুর॥
পালহ বচন সুনয়নী।
প্রেম-চিত্তে দেহ বাসাখানি॥

তারপর,

ভাটের উত্তর কল্পিত সুন্দর হৃদএ আনন্দ অতি।
বিদ্যারূপগুণ ভাবিয়া যখন বিরহে জ্বলিত মতি॥
এ নাট-নাটিকা কাব্যবেদগীতা পুরাণ আগম সুতা।
অলঙ্কার বোধ ভারত জ্যোতিষ পুছিয়া মন উন্মতা॥

বহিরঙ্গের কৃত্রিম অলঙ্করণ ব্যতীত সাবিরিদ খানের রচনায় আর কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার ভাষা একান্ত সংস্কৃতানুগ এবং আরবি-পারসির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

গোবিন্দ দাস

১৫৯৫ খৃস্টাব্দে চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী কবি গোবিন্দ দাসের 'কালিকা-মঙ্গল' রচিত হয়। ইহার কাহিনীভাগে একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। বিদ্যার পিতা রত্নপুরের রাজা, সুন্দর পশ্চিমবঙ্গের কাঞ্চননগরের অধিবাসী ও মালিনী মাসীর নাম

[১] সাহিত্য পত্রিকা ১,৯১

রম্ভা, হীরা নহে। চট্টগ্রাম অঞ্চলেই তাঁহার পুস্তকের প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল, অন্যত্র প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। এসিয়াটিক সোসাইটির প্রাচীন পুঁথি-সংগ্রহে গোবিন্দ দাসের 'কালিকা-মঙ্গল' নামক একখানি পুঁথি সংগৃহীত আছে।[১] কিন্তু তাহাতে 'মার্কণ্ডেয়-পুরাণে' উল্লেখিত সুরথ ও বৈশ্যের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সঙ্গে তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। ইনি একজন স্বতন্ত্র কবি বলিয়াই মনে হয়।

গোবিন্দ দাসের কাব্যমধ্যে কালীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়-কাহিনী ইহার উপলক্ষ্য মাত্র। কঙ্কের রচনার মত তাঁহার কাব্যেও অল্পাধিক ভক্তিরস ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি গোবিন্দ দাস পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার রচনার মধ্যেও এই পাণ্ডিত্য যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার শিবস্তোত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,

নৌমি নন্দিকেশ ঈশ, কণ্ঠে কালকূট বিষ,
নীলকণ্ঠ নাম রামদেব দেববন্দিনী।
অর্ধ অঙ্গ গৌরীসঙ্গ, মৌলী কেলি চতুরঙ্গ,
অঙ্গভঙ্গ অতিরঙ্গ, সোহি জহ্নুনন্দিনী॥
রঙ্গনাথ লোকপাল, অর্ধঅঙ্গ বাঘছাল,
ব্যোমকেশ শেষ মাল ভালে ইন্দুমোহিনী।

বিদ্যার বিলাপ বর্ণনায় কবি গতানুগতিকতার প্রভাব অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই—

বিদ্যা ক্ষণে মূর্ছিত হয় ক্ষণেক চেতনা।
ক্ষণে চমকিত ক্ষণে করেন করুণা॥
ক্ষণে ক্ষণে মেলে আঁখি ক্ষণেক মুদিত।
সিন্দূর কজ্জল বিদ্যার হইল গলিত॥
ছিঁড়িল গলার হার খসিল কবরী।
ধরিতে না পারি কেহ যায় গড়াগড়ি॥
বিদ্যার বিলাপ দেখি রাণীর করুণা।
কতো বা সহিব বিদ্যার এ সব যন্ত্রণা॥
বিদ্যা কোলে করি রাণী পরম তাপিত।
চাহিয়া সুন্দর পানে হইলা মূর্ছিত॥

[১] গ-স ৪২৬২

কৃষ্ণরাম

অতঃপর সম্ভবতঃ কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকা-মঙ্গল' রচিত হয়।[১] কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' ১৬৮৬ খৃস্টাব্দে রচিত হয়। 'কালিকা-মঙ্গলে' তিনি তাঁহার গ্রন্থ রচনার কাল এই ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন,

সারসা সানের নেত্র, ভীমাক্ষিবর্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর নাম, রচনাতে কহিলাম,
বুঝ সকল বিচারিয়া সভে ॥[২]

ইহার অর্থ সম্ভবতঃ এই প্রকার, 'সারসা সানের' অর্থাৎ শরাসনের, 'শরাসন' শব্দের অর্থ ধনু, ধনু নবম রাশি; অতএব ধনুতে ৯, তাহা হইতে নেত্র অর্থাৎ ৩ বর্জিত, তাহা হইলে ৬; ভীমাক্ষি বর্জিত মিত্র, অর্থাৎ মিত্র বা ১২ হইতে ভীম ও অক্ষি একত্রে বর্জিত হইল, তাহা হইলে ৮ রহিল; 'তেজিয়া ঋষির পক্ষ' অর্থাৎ ৭ হইতে ২ বাদ যাইবে, তাহা হইলে পাই ৫; তারপর বিধুব নাম, অর্থাৎ ১। এখন অঙ্কের বামা গতিতে ইহা হইতে পাই ১৫৮৬ শকাব্দ, অর্থাৎ ১৬৬৪ খৃস্টাব্দ। এই সময়ের সমর্থক আর একটি ঐতিহাসিক উক্তি তাঁহার কাব্যমধ্যে আছে। কবি সায়েস্তা খাঁ ও আওরঙ্গজেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন,

অরংসাহা ক্ষিতিপাল, রিপুর উপরে কাল
রামরাজা সর্বজনে বলে।
নবাব সা[illegible]স্তা খাঁ আদি করি সাতগাঁ
বহু সরকার করতলে ॥

সায়েস্তা খাঁ ১৬৬৪ খৃস্টাব্দে বাংলার সুবেদার ছিলেন।[৩] অতএব এই সময়েই কবি কৃষ্ণরামের 'কালিকা-মঙ্গল' রচিত হয়। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করিয়াছেন, 'রায়মঙ্গল' কৃষ্ণরামের প্রথম বয়সের রচনা, তাঁহার 'কালিকা-মঙ্গল' বা বিদ্যাসুন্দর ইহার পরে রচিত।[৪] কিন্তু 'রায়মঙ্গলে'র আলোচনা সম্পর্কে দেখাইয়াছি যে, 'রায়মঙ্গল'ই কালিকা-মঙ্গলের পর রচিত হয়। 'কালিকা-মঙ্গল' হইতে দেখা যায়, ইহাই কবির প্রথম বয়সের রচনা, বিদ্যাসুন্দরের

গ-স ৩৭২৮ (মুদ্রিত তালিকায় ৩৯২৮)।
ব ২৩৯৬, ৩থ; [৩] H. B. II., 371.
'কবি কৃষ্ণরাম' সাহিত্য, ১৩০০ সাল, পৃঃ ১১৫

কাহিনী প্রথম বয়সের রচনা হওয়া স্বাভাবিক; রামপ্রসাদের জীবনেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণরাম তাঁহার 'কালিকা-মঙ্গলে' উল্লেখ করিয়াছেন, এই কাব্য রচনার সময় তাঁহার বয়স মাত্র বিংশতি বৎসর; বিংশতি বৎসরের পূর্বে কবি আর কোন কাব্য লিখিয়াছিলেন বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে না,—

সেই গ্রামের মধ্যে বাস, নাম ভগবতী দাস,
কায়স্থ কুলেতে উৎপত্তি।
তাঁহার তনয় হই, নিজ পরিচয় কই,
বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি ॥
শুন সভে একচিত, যেমনে হইল গীত
কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি;
প্রথম বৈশাখ মাসে, স্বপনে আপন বাসে
দেখিনু সারদা ভগবতী ॥[১]

কলিকাতার নিকটবর্তী নিমিতাগ্রাম কবির বাসভূমি। 'রায়মঙ্গলে'র আলোচনা সম্পর্কে তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় উল্লেখ করিয়াছি। কারণ, 'রায়মঙ্গল' পুঁথিতেই কবি তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কোন বিদ্যাসুন্দরে কবি এই কাব্যের ঘটনাস্থল বর্ধমান বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কৃষ্ণরামের কাব্যেও বর্ধমানের উল্লেখ নাই, রাজার নাম বীরসিংহ; কিন্তু 'বীরসিংহের দেশ' বর্ধমান নহে, বীরসিংহপুর। মালিনীর নাম বিমলা। কৃষ্ণরামের রচনা সরল, কিন্তু পাণ্ডিত্য-বর্জিত নহে। রচনা সরল হইলেও তাহা মার্জিত ও সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা-মুক্ত। সুন্দরের বীরসিংহপুর যাত্রার বর্ণনাটি এইরূপ,—

জনকেরে না বলিল না জানে জননী।
একাকী করিল গতি কবি শিরোমণি ॥
জয়পত্র যুবক বিচিত্র ছত্র ধরি।
দিব্য বস্ত্র ভূষণ দ্বিজেরে দান করি ॥
কবি পণ্ডিতের বেশে প্রতাপের শূর।
সারদা সহায়ে যায় বীরসিংহপুর ॥

প্রাণরাম

সম্ভবতঃ ইহার অল্পদিন পরেই প্রাণরাম চক্রবর্তীর 'কালিকা-মঙ্গল' রচিত হয়।[১] প্রাণরাম এইভাবে তাঁহার কাব্যরচনার সমাপ্তি-কাল নির্দেশ করিয়াছেন,

বসুদ্বয় বাণচন্দ্র শক নিরূপণ।
কালিকা-মঙ্গল গীত হৈল সমাপন॥

ইহা হইতে ১৫৮৮ শকাব্দ বা ১৬৬৬ খৃস্টাব্দ পাওয়া যায়। 'দ্বয়' শব্দটিকে পৃথক্‌ভাবে দুই সংখ্যা ধরিয়া কেহ ইহাতে ১৫২৮ শকাব্দ বা ১৬০৬ খৃস্টাব্দ পাইয়াছেন। কিন্তু তাহা সমীচীন মনে হয় না। কাব্যখানি মুদ্রিত হইয়া ১২৪৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু মুদ্রিত পুঁথিখানিরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। বহুপূর্বে ইহার সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রাণরামের নিম্নোদ্ধৃত ভণিতাটির জন্য তাঁহাকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পুত্র বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। কিন্তু মুকুন্দরামের পুত্রের নাম ছিল শিবরাম, তাঁহার কবিখ্যাতি ছিল বলিয়াও জানা যায় না। ভণিতাটি এই—

মুকুন্দনন্দন ভণে, নৃপবৈশ্য দুইজনে, চলিল মুনির সন্নিধান।
কালিপদ সরসিজ, হৃদয়ে চিন্তিয়া দ্বিজ, শ্রীকবিবল্লভ রসগান॥

প্রাণরামের উপাধি ছিল কবিবল্লভ।

বলরাম

সম্ভবতঃ তারপর কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তীর 'কালিকা-মঙ্গল' রচিত হয়।[২] তাঁহার মাত্র একখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া মুদ্রিত পুঁথিখানি সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহার সময় সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু জানা না গেলেও, তিনি যে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবি এই বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ। ইহার প্রমাণ এই যে, বলরামের কাব্য-মধ্যে কাহিনীর দিক দিয়া প্রাচীনত্বের লক্ষণ আছে। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনার পর, অন্য কেহ এই কাহিনী লইয়া কাব্যরচনায় প্রয়াসী হইলেও ভারতচন্দ্রের প্রভাব অস্বীকার করিতে পারিতেন না; বিশেষতঃ কাহিনীর দিক দিয়া হইলেও ভারতচন্দ্রের

১ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'প্রাণরাম চক্রবর্তীর কালিকা-মঙ্গল,' সা-প-প ৫০, ৬২-৬৩
২ বলরাম কবিশেখর, কালিকা-মঙ্গল, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত (সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫০)।

সঙ্গে কোন না কোন সঙ্গতি লক্ষ্য করা যাইত; কিন্তু এই বিষয়ে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের কোন প্রভাবই বলরামের কাব্যের উপর দৃষ্টিগোচর হয় না। অবশ্য বলরামকে কেহ কেহ পূর্ববঙ্গের কবি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[১] তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের প্রভাব তাঁহার উপর না থাকিবারই কথা; কারণ, একেবারে সমসাময়িক কালেই সুদূর পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত ভারতচন্দ্রের প্রচার হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু বলরাম পূর্ববঙ্গের কবি ছিলেন, তাহা মনে করিবার পক্ষে কোন নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য যুক্তি নাই। গ্রন্থ-সম্পাদক মহাশয়ের একমাত্র যুক্তি এই যে, তাঁহার পুস্তকের অনেক স্থানে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু পুঁথিখানি যখন কবির স্বহস্ত লিখিত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই, তখন ইহার ভাষা দেখিয়া কবির বাসস্থান নির্ধারণ করিতে যাওয়া সমীচীন বোধ হয় না, অনুলিপিকারগণও ভাষা বিকৃত করিয়া থাকে। বিশেষতঃ যে শব্দগুলি গ্রন্থ-সম্পাদক পূর্ববঙ্গের ভাষার নিদর্শন-স্বরূপ কবির কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন (১৲-১৵০), তাহাদের মধ্যে কোন কোন শব্দ আজ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের ভাষায় প্রচলিত থাকিলেও, সবগুলিই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় সর্বত্রই প্রচলিত ছিল—প্রাচীন বাংলা পুঁথি হইতে তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ এই শব্দগুলির অধিকাংশ এখনও পশ্চিমবঙ্গেও প্রচলিত আছে।

কিন্তু আমাদের অনুমান হয়, বলরাম পশ্চিমবঙ্গেরই কবি। দেবদেবী-বন্দনায় তিনি যে সকল দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের কোন দেবতারই নাম নাই। এক বিক্রমপুরের বিশালাক্ষীর কথা উল্লেখ আছে; কিন্তু বিক্রমপুরের বিশালাক্ষীর খ্যাতি বহুকাল হইতেই যে অনেক দূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা ধর্মমঙ্গলের কবি রামদাস কৈবর্তের উল্লেখ হইতেও জানা যায়।[২] বলরাম রাঢ়েরই সমস্ত দেবদেবীর নাম করিয়াছেন; এমন কি, তিনি পশ্চিম বঙ্গের ঘাটু নামক লৌকিক দেবতারও নাম করিয়াছেন, ইহাতেই তিনি পশ্চিম বর্ধমান অঞ্চলের লোক বলিয়া মনে হয়; অতএব তিনি যদি ভারতচন্দ্রের পরবর্তী হইতেন, তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারিতেন না। বলরামের কাব্যে তাঁহার বিস্তৃত আত্মপরিচয় নাই, মাত্র এক স্থলে [উল্লে]খ আছে,—

১ ঐ. ১৲;
২ 'বিক্রমপুরের বন্দিলাম বিশাল-লোচনী'—অনাদি-মঙ্গল (রামদাস), পৃঃ ৬, সা-প সংস্করণ

পিতামহ চৈতন্য লোকেতে বলয়ে ধন্য
জনক আচার্য দেবীদাস।
জননী কাঞ্চন নাম তার সুত বলরাম
কালিকা পূরিল যার আশ ॥

বলরামের উপাধি ছিল কবিশেখর। ভণিতার অনেক স্থলেই তিনি নামের পরিবর্তে উপাধিই ব্যবহার করিয়াছেন, 'শ্রীকবিশেখর গায় কালিকার গীত।' কাব্যের কোন স্থলে তিনি 'বলরাম', কোন স্থানে 'চক্রবর্তী বলরাম' বা 'দ্বিজ বলরাম' ভণিতাও ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতেই তাঁহার পূর্ণ নামটির পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যা ও সুন্দরের গুপ্ত প্রণয়-কাহিনী অপেক্ষা কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণনাতেই কবির অধিকতর আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ইহাতে মঙ্গলকাব্যের নিষ্ঠা সম্পূর্ণ রক্ষা পাইয়াছে। তিনি আদিরস-বর্ণনায়ও কবি ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের মত যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেন নাই, এই বিষয়ে তিনি সংযমের মর্যাদা যথাসম্ভব রক্ষা করিয়াছেন। বররুচির নামে প্রচলিত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সহিত তাঁহার কাহিনীর অনেকাংশেরই ঐক্য আছে। কাহিনীর দিক দিয়া আরও কয়েকটি সামান্য বিষয়ে অন্যান্য বিদ্যাসুন্দরের সহিত তাঁহার পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

বলরাম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচনা পাণ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত নহে; তাঁহার রচনা অনেক স্থানেই সরল, উচ্চাঙ্গের কবিত্ব ইহাতে সুলভ না হইলেও ইহার অনাড়ষ্ট ভাব সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে। সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাতের বর্ণনাটি এই,—

নগরে পশারি সব আছে সারি সারি।
আপন ইংসায় সভে বেচা কিনি করি ॥
দেখিল মালিনী বৃক্ষতলে ফুল বেচে।
পুষ্প না বিকায় সেই একাকিনী আছে ॥
ধীরে ধীরে কুমার গেলেন বৃক্ষ তলে।
কৌতুকে মালিনী মাল্য দিল তার গলে ॥

রামপ্রসাদ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত হালিসহরের নিকটবর্তী ভাগীরথী তীরস্থ কুমারহট্ট গ্রামে কুলীন বৈদ্য বংশে ধন্বন্তরী গোত্রে বাংলার সাধক কবি রামপ্রসাদের জন্ম হয়।[১] তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। কবি তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যে এই ভাবে তাঁহার বংশের পরিচয় দিয়াছেন,—

ধন হেতু মহাকুল পূর্বাপর শুদ্ধ মূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণান্বিত
প্রসন্না কালিকা কৃপামই॥
সেই বংশে সমুদ্ভব পুরুষার্থ কত কব
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনতির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রাম রাম মহাকবি গুণধাম
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ' প্রসাদে কহে কালিকার পদে
কৃপাময়ি ময়ি কর দয়া॥

কবির সর্বজ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম অম্বিকা, সম্ভবতঃ অম্বিকা বালবিধবা ছিলেন; দ্বিতীয়া ভগিনীর নাম ভবানী, ভগ্নীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ। কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিশ্বনাথ। কবির রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুই পুত্র ও পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কবির কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের বংশধর অদ্যাপি বর্তমান আছেন।

রামপ্রসাদ ১৭২০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[২] উদ্ধৃত কবির বংশ-পরিচয় হইতে জানা যায় যে, কবির পরিবার দরিদ্র ছিল না, রামপ্রসাদও শৈশব হইতেই সচ্ছল অবস্থার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। পিতৃ-বিয়োগের পর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া সংসারের ভার তাঁহার উপরই পড়িল, তিনি কর্মের সন্ধানে বর্তমান কলিকাতার নিকটবর্তী কোন স্থানে

১ রামপ্রসাদ সেন, গ্রন্থাবলী (বসুমতী, তৃতীয় সং), ১-৫৬
২ সা-প-প ৬৩, ৫-৬

আসিয়া এক ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারের মুহুরীর কার্যে নিযুক্ত হইলেন। কেহ অনুমান করেন, দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট তিনি কর্মগ্রহণ করেন, আবার কেহ মনে করেন, নবরঙ্গ কুলাধিপতি দুর্গাচরণ মিত্র তাঁহার কর্মদাতা।[১] কিন্তু এই সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিবার প্রমাণাভাব। সম্ভবতঃ পিতৃবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই রামপ্রসাদের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হইয়া পড়ে, বৃহৎ পরিবারের ভরণ-পোষণের চিন্তায় অল্পদিনের মধ্যেই কবি মানসিক স্থৈর্য হারাইয়া ফেলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার ভাব-তন্ময়তার সূত্রপাত হয়। তিনি তাঁহার হিসাব লিখিবার খাতায় কালী-কীর্তনের পদাবলীর পদ রচনা করিয়া লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। কথিত আছে, ইহারই সঙ্গে তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ পদ—'আমায় দাও মা তহবিলদারী। আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।'—লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার উপরিস্থিত কর্মচারী একদিন ইহা দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করেন, তারপর মনিবের নিকট সেই হিসাবের খাতাখানি লইয়া উপস্থিত করেন। কিন্তু তাঁহার মনিব রামপ্রসাদের এই অপূর্ব ভক্তিরস-সিক্ত রচনাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গৃহে যাইতে অনুমতি দেন। রামপ্রসাদও গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া একাগ্রমনে আধ্যাত্মিক চিন্তায় কালাতিপাত করিতে থাকেন; রামপ্রসাদ যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন তাঁহার এই গুণগ্রাহী মনিব-প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিয়া গিয়াছেন। কুমারহট্ট নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই গ্রামে মহারাজের একটি কাছারীও ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া বাস করিতেন। একবার কৃষ্ণচন্দ্র কুমারহট্টে আসিয়া রামপ্রসাদের কথা শুনিলেন, তাঁহার অপূর্ব ভক্তিরস-মিশ্রিত পদাবলীর কথা শুনিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। তাঁহার মুখ হইতে দুই একটি পদ-কীর্তন শুনিয়া তিনি এতই আকৃষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে নিজের সঙ্গে রাজধানী নবদ্বীপ লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিষয়-বিরাগী স্বাধীন-প্রাণ কবি ইহাতে সম্মত হইলেন না। গুণগ্রাহী রাজা রামপ্রসাদের এই অসম্মতিতে বিরক্ত না হইয়া বরং তাঁহাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। তদুপরি তাঁহাকে একশত বিঘা জমি নিষ্কর ভোগাধিকার স্বত্ব দান করিলেন। রামপ্রসাদ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার আরাধ্য দেবতা কালীর মাহাত্ম্য-সূচক কাব্য 'বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী' রচনা করিয়া

[১] অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ (১৯২৫), ৪৩

মহারাজের সম্মুখে নিজেই তাহা পাঠ করিয়া শ্রবণ করান, তাঁহার রচনায় প্রীত হইয়া মহারাজ তাঁহার কবিত্বশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রামপ্রসাদ তন্ত্রোক্ত কৌলিক ধর্মাচারী ছিলেন। সেইজন্য শক্তির রূপ-ভেদ কালিকাই তাঁহার আরাধ্যা ছিল। তিনি তন্ত্রের আচারে কালীর সাধনা করিতেন, আনুষঙ্গিক মদ্যপানেও তাঁহার অভ্যাস ছিল। সেইজন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আজু গোঁসাই নামক অন্য একজন কবি এই সম্বন্ধে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন, তিনিও স্বরচিত পদে তাহার প্রত্যুত্তর দান করিতেন। হালিসহর শিবের গলিতে এখনও রামপ্রসাদের পঞ্চমুণ্ডী সাধনাসন বর্তমান আছে। কুমারহট্ট বর্তমানে হালিসহরেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বাহ্যিক এই আচারের অন্তরালেও রামপ্রসাদের একটি বিশিষ্ট ধর্মমত ছিল। তাহা বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ। কালীকে তিনি এক ব্রহ্মময়ীরূপে বিশ্ব-প্রকৃতির সকল বৈষম্যের মধ্যেও অধিষ্ঠিতা দেখিয়াছেন। অখণ্ড প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ-স্বরূপিণী যে শক্তি, তাঁহার আরাধ্যা কালিকা তাহারই রূপময়ী। এই বিশ্বপ্রকৃতি সেই অদৃশ্য শক্তি-স্বরূপিণীর লীলাস্থলী। পরবর্তী যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ধর্মমতের মধ্যে যে সর্বমূলীভূত ঐক্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, রামপ্রসাদে তাহারই স্থচনা দেখিতে পাই। রামপ্রসাদের জীবনে এই আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতার জন্য তিনি সিদ্ধপুরুষ বলিয়া সমাজে খ্যাতি লাভ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই এই স্থত্রে তাঁহার জীবনের সঙ্গে নানা আলৌকিক বৃত্তান্ত জড়িত হইয়া নানা কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হইয়া পড়িল। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধেও এক আলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। কবিরঞ্জন কোন্ সময়ে তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাহিনী রচনা করেন, কাব্যমধ্যে তাহা উল্লেখ করেন নাই। কেহ অনুমান করেন, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের কাব্যের দুই এক বৎসরের পূর্ববর্তী রচনা। কেহ আবার মনে করেন, ভারতচন্দ্রের রচনাই পূর্ববর্তী। অবশ্য ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদা-মঙ্গলের রচনা-কাল ১৬৭৪ শকাব্দ বলিয়া বা ১৭৫২ খৃস্টাব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের রচনা ইহার দুই এক বৎসর অগ্রপশ্চাৎ হইতে পারে, এই বিষয়ে কিছুই নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। উভয়ের কাহিনীগতও যথেষ্ট ঐক্য লক্ষিত হয়। আদিরস বর্ণনায় উভয়ই সমান পটু।

রামপ্রসাদের কাব্যের নাম 'কবিরঞ্জন'। কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীই ইহার মূল লক্ষ্য। কথিত আছে, রামপ্রসাদের 'কবিরঞ্জন' তাঁহার কালিকা-মঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত ছিল, কালক্রমে

কাব্যের পূর্বপর অংশ বিনষ্ট হইয়াছে, একমাত্র বিদ্যাসুন্দর কাহিনীই রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদের কালিকা-মঙ্গল বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পুঁথি পাওয়া যায় না। তাঁহার কালী-কীর্তন বলিয়া যে কাব্যগ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহাও খণ্ড গীতি-কবিতার সমষ্টি মাত্র, সমগ্র কাব্য একটি বিশেষ কোন কাহিনী-বদ্ধ নহে, অতএব তাঁহার সুদীর্ঘ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ইহার অন্তর্গত হওয়া অসম্ভব।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী-রচনায় রামপ্রসাদ বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার কালী-কীর্তন ও কৃষ্ণ-কীর্তনের খণ্ড গীতি-কবিতাগুলির সহিত ইহা একাসনে স্থান পাইতে পারে না। খণ্ড গীতি-কবিতা রচনায় রামপ্রসাদের যে প্রকৃত কবি-প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে, তাহা তাঁহার আগমনী-বিজয়াগান রচনার সার্থকতা হইতেই অনুমিত হইবে। রামপ্রসাদের প্রতিভা প্রকৃত এই খণ্ড গীতি-কবিতা রচনারই প্রতিভা। ভাব-প্রবণ কবির কোন ভাব-প্রেরণার সংক্ষিপ্ত রসস্ফূর্তি যত স্বাভাবিক হয়, দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে তাহা তত স্বাভাবিক হইতে পারে না। কেহ কেহ অনুমান করেন, বিদ্যাসুন্দর তাঁহার প্রথম বয়সের রচনা। ইহা খুবই সম্ভব বলিয়া মনে হয়, একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রের বিদগ্ধ মনের পরিতুষ্টির জন্যই যে তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে—ইহার সহিত তাঁহার প্রথম বয়সোচিত ভাব ও রুচির অসংযত বিলাসের নিদর্শনও হয় ত প্রকট হইয়া আছে।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী-রচনায় রামপ্রসাদ অনেক স্থলেই অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা রচনায় সংস্কৃত শব্দ-প্রয়োগের কৌশল তখনও তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই ; সেইজন্য প্রায়ই তাহা তাঁহার রচনায় ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই স্থানে স্থানে তাঁহার রচনা প্রায় দুর্বোধ্যও হইয়া রহিয়াছে। অবাধে তিনি অনেক স্থলে সংস্কৃত ধাতুবিভক্তি-নিষ্পন্ন পদ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, যেমন,—

পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিবতি চকোর।
ক্ষেপ করে দশদিক্ষু লোষ্ট্র বিবর্ধনে॥

কিন্তু মধ্যে মধ্যে এই শ্রেণীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায়ও তাঁহার অনুপ্রাস সৃষ্টির প্রয়াস কতক সার্থক হইয়াছে, যেমন,—

ডুবিল কুরঙ্গ শিশু মুখেন্দু শোভায়।
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দৃশ্য হয়॥

সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়।
তপ্ত তপনীর তনু তারাপতি প্রায়॥

রামপ্রসাদ 'শিবায়নে'র কবি রামেশ্বরের সমসাময়িক কালে বর্তমান ছিলেন, সেইজন্য যুগ-প্রভাব তাঁহাকে এই বিষয়ে স্বীকার করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর উপর রামপ্রসাদের কবি-প্রতিভা প্রতিষ্ঠিত নহে, তাঁহার শ্যামা-সঙ্গীতই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

ভারতচন্দ্র

রামপ্রসাদের সমসাময়িক কালেই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচিত হয়। সমগ্র মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য যুগের মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

'অন্নদা-মঙ্গলে'র আলোচনা সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য সম্বন্ধে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' 'অন্নদা-মঙ্গলে'রই অন্তর্ভুক্ত। মানসিংহের বাংলা আক্রমণের কাহিনী-বর্ণনা উপলক্ষ্য করিয়া কবি কৌশলে ইহা মূল কাব্য-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহা 'অন্নদা-মঙ্গলে'র কাহিনীতে অবান্তর অংশ মাত্র। সেইজন্য স্বতন্ত্র কাব্য-হিসাবেই ইহার বিচার করিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যগুলিতে ধর্মভাব অনেকটা হ্রাস পাইয়া আসিয়াছিল, দেবতা ইহা হইতে বহুদূরে সরিয়া গেল—কেবল তাহার ছায়াটুকু মাত্র ইহাতে অবশিষ্ট রহিল, বাংলা কাব্য উপলক্ষ্য করিয়া সংস্কৃত অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রেরই অনুশীলন আরম্ভ হইল। বিশেষতঃ উন্মুক্ত লোকালয়ের প্রাঙ্গণ হইতে গিয়া দেশের সাহিত্য তখন প্রহরিবেষ্টিত রাজসভায় প্রবেশ করিল ও নাগরিক রস ও রুচির পরিতুষ্টির কার্যে আত্মনিয়োগ করিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নৈতিক ত্রুটির জন্য ভারতচন্দ্রকে কোন ভাবেই দায়ী করা যায় না। কাহিনী-ভাগের গতানুগতিকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গিয়া তিনি যে নূতন কোন পরিকল্পনা দ্বারা তাঁহার কাব্যের নৈতিক আবহাওয়া দূষিত করিয়াছেন, তাহা নহে—বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী মাত্রেরই যাহা লক্ষ্য, তাঁহার কাব্যেও তিনি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, কালিকা-মঙ্গল রচনা করিয়া দেবতার মনস্তুষ্টি সাধন তাঁহার মুখ্য কিংবা

গৌণ কোন অভিপ্রায়ই ছিল না, সমসাময়িক নাগরিক রস ও রুচির তুষ্টি সাধন করিতে গিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান রাজপরিবারের প্রতি নিজের যে আক্রোশ ছিল, তাহাও আংশিক মিটাইতে গিয়া তাঁহার কাব্য-মধ্যে কতকগুলি অতিরিক্ত উপকরণও আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ কতকগুলি উপকরণ বর্জন করিলেও তাঁহার মূল কাব্যের কোন হানি হইত না। অবশ্য ইহাতে নৈতিক আপত্তির কারণ থাকিলেও, তাহা দ্বারা তাঁহার কাব্যের বহির্গুণ কোন অংশেই খর্ব হয় নাই; কারণ, সামাজিক নীতির বিচারে কাব্যের মূল্য নির্ধারিত হইতে পারে না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নৈতিক আবহাওয়া যে খুব সুস্থ ছিল, তাহাও বলিতে পারা যায় না। বিদ্যাসুন্দরের কোন চরিত্রই অষ্টাদশ শতাব্দীর আকস্মিক সৃষ্টি নহে। ধর্মমঙ্গল কাব্য আলোচনা সম্পর্কে বলিয়াছি, বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্য হইতেই ইহার যাত্রা সুরু হইয়াছে। গোরক্ষ-বিজয়-মীনচেতনের যোগিনী, ধর্মমঙ্গলের নয়ানী, বিদ্যাসুন্দরের মালিনীতে আসিয়া স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিয়াছে মাত্র। ভারতচন্দ্র এখানে একটি জাতীয় প্রাচীন ধারারই অনুবর্তন করিয়াছেন। নাথ-সাহিত্যে যেমন পাই যে, গোরক্ষনাথ মীননাথের সন্ধান করিতে করিতে কদলীপত্তনে গিয়া উপস্থিত হইলে তথাকার এক যোগিনী গোরক্ষনাথের পরম সুন্দর কান্তি দেখিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল,

নাথের দেগিয়া রূপ যোগিনীএ পাএ শোক
চল চল পরদেশী যোগাই।
যথ কিছু কহি আহ্মি মনে ভাবি চাহ তুহ্মি
আহ্মার বাড়ীতে চল যাই॥

ধর্মমঙ্গল কাব্যের জামতি-পালায় তেমনই দেখিতে পাই যে, লাউসেনের সুন্দর কান্তি দেখিয়া নয়ানী তাঁহাকে নানা ছলনায় প্রলুব্ধ করিয়া নিজের গৃহে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে,—

বচনে মিশাল মধু মন্দ মন্দ বলে।
কোন্ দেশে ঘর বঁধু কেন তরুতলে॥
এসো এসো আমার মন্দিরে উত্তরিবে।
যে কিছু বাসনা কর সকলি পাইবে॥

ভারতচন্দ্রের মালিনীতে ইহারই এই প্রকার একান্ত স্বাভাবিক পরিণতি ঘটিয়াছে, এখানেও অনুরূপ অবস্থায় সুন্দরকে দেখিয়া ভারতচন্দ্রের মালিনীর—

হেরিয়া হরিল চিত্ত বলে হরি হরি।
কাহার বাছুনিরে নিছুনি লয়ে মরি ॥
কাছে আসে হাসে হাসে করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কোথায় যাবে কোন্ খানে বাসা ॥

বিদ্যা ও সুন্দরের জীবনের গুপ্ত অভিসার বর্ণনার যে নির্লজ্জ কাহিনী পাঠ করিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লই, তাহাই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' মধ্য দিয়া সমগ্র পরবর্তী বৈষ্ণব গীতি-সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহা হইতেই বাংলার রসিক সমাজের তাহা একেবারে মজ্জায় গিয়া স্থান লাভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যগুলির আদর্শ যে সংস্কৃত পুরাণ, তাহাও এই ভাব হইতে মুক্ত ছিল না। তদুপরি সংস্কৃত শিক্ষিত দেশের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে সংস্কৃত অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রের ব্যাপক অনুশীলন দ্বারা নবরসের চর্চাও ব্যাপক ভাবেই আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব ইহার এই ঐতিহাসিক দিকটি উপেক্ষা করিয়া বিংশতি শতাব্দীর মার্জিত রুচি ও সংস্কার লইয়া বাংলার এই অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যের রস-বিচার করা যাইতে পারে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বিশেষ করিয়াই খণ্ড গীতি-কাব্যের যুগ। রামপ্রসাদের খণ্ড কাব্য রচনার সার্থকতাও তাঁহার যুগন্ধর প্রতিভার উপরই প্রতিষ্ঠিত বলিতে হইবে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী খণ্ড গীতি-কবিতার সমষ্টি না হইলেও ইহার সুর মূলতঃ গীতি-প্রধান। চরিত্র-সৃষ্টি কিংবা কাহিনী পরিকল্পনায় কাব্যের সমুচ্চ আদর্শ ইহাতে অনুসৃত হয় নাই। এই বিষয়ে ইহা প্রকৃত মঙ্গলকাব্য ও খণ্ড গীতি-কবিতাগুলির মধ্যবর্তী বলিতে পারা যায়। ভারতচন্দ্রও যুগন্ধর প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; সেইজন্য গীতি-ভাবাপন্ন কাব্য বিদ্যাসুন্দর রচনাতেই তাঁহার প্রতিভার সম্যক বিকাশ হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট আদর্শ হইতে এই বিষয়ে একটু বলিয়া মনে হইবে। পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যগুলি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দ ভারতচন্দ্র গীতি-প্রধান (lyric) নহে। কথিত আছে, বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানি র·না হয় না, ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট তাহা উপস্থিত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র ·হা দ্বারা কোন ব্যাপৃত ছিলেন, পুঁথিখানি কবির হাত হইতে লইয়া তাহা ন লে রাজান্তঃপুরের উপাধানের উপর হেলান দিয়া রাখিয়া তিনি নিজের ·, এই চরিত্রটি হইতে ভারতচন্দ্র কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, 'মহা·র নির্ভীক সাহসিকতার

ভাবে রাখিবেন না, ইহার রস গড়াইয়া পড়িবে।' শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পুঁথিখানি খুলিয়া দুই একটি পাতা পড়িলেন, পড়িয়া হাস্যমুখে কবিকে বলিলেন, 'বাস্তবিকই যে রস তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা গড়াইয়া পড়িবারই মত।'

মধ্যযুগের বৈচিত্র্যহীন কাহিনীর জের টানিয়াও ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে এমন এক ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা সেই যুগের আদর্শ হইয়াও তাঁহার নিজস্ব। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য থাকিলেই যে রচনা মার্জিত হইবে, এমন কোন কথা নাই। মধ্য যুগের বহু কবি সংস্কৃতে অশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াও ভাষা-রচনায় অনেক স্থলে গ্রাম্যতা-মুক্ত হইতে পারেন নাই। কিন্তু ভারতচন্দ্র আপন প্রতিভাবলে উচ্চতর কাব্যের উপযোগী করিয়া ভাষা নিজের হাতে সৃষ্টি করিলেন, ইহা তাঁহার অপূর্ব সৃজনীশক্তিরই পরিচায়ক। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে একই নিয়মে গতানুগতিক বর্ণনায় যে সকল আনুষঙ্গিক কাহিনী আমরা এতকাল পাঠ করিতেছিলাম, তাহাই নবতর শব্দ-যোজনায় নূতন ভঙ্গিতে রচনা করিয়া ভারতচন্দ্র ইহার মধ্যেই অভিনবত্বের সৃষ্টি করিলেন; যাহা বৈচিত্র্যহীনতার জন্য প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই একমাত্র নূতন রূপ-গরিমায় ঝলমল করিয়া উঠিল।

ভাষার উপর এতখানি অধিকার ছিল বলিয়াই ভারতচন্দ্র ভাবপ্রকাশের অনুযায়ী নূতন নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। মঙ্গলকাব্যে রচিত বাংলা ছন্দের গতানুগতিক রীতিকে সর্বতোভাবে লঙ্ঘন করিয়া তিনি নিজের শক্তি অনুযায়ী ভাবের অনুকূল ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; ইহাও তাঁহার কাব্যের বহিরঙ্গ নির্মাণ-সার্থকতার অন্যতম কারণ। এই দিক দিয়াও বাংলাকাব্যের একটি স্বতন্ত্র ও নূতন পরিচয় পাওয়া গেল। পদের মিলের দিক দিয়াও ভারতচন্দ্র সর্বপ্রথম উপান্ত স্বর হইতে মিলের নিয়ম প্রবর্তিত করিলেন, ইহার পূর্বে এমন কি পরেও রবীন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত বিশুদ্ধ এই নিয়মে কাব্য রচিত হয় নাই।

যাইবাস্থগভীর রস-দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের চরিত্র-সৃষ্টি সার্থকতায়
হইতে পারে নাই। গভীর সামাজিক জ্ঞান ও ব্যক্তি-চরিত্র সম্বন্ধে
সুগভীর অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু ব্যক্তি-চরিত্রের মূলে তাঁহার
তিবোধ না থাকায় চরিত্রগুলি তাঁহার আন্তরিকতার স্পর্শে সজীব
ারে নাই—ইহারা যেন সুসজ্জিত কৃত্রিম পুত্তলি মাত্র হইয়া
ভারতচন্দ্রের মালিমধ্যে মালিনী ও বিদ্যার চরিত্রই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।
ঘটিয়াছে, এখানেও অন্নদামঙ্গলিকা-মঙ্গলের কোন কবিই এই দুইটি চরিত্র-সৃষ্টির বিষয়ে

কোন বিশেষত্ব দেখাইতে পারেন নাই, গতানুগতিকতারই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র, ভারতচন্দ্রের রচনায় ইহাদের বাহিরের চাকচিক্য একটু বাড়িলেও ইহাদের অন্তর্লোক অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গিয়াছে।

হীরার বর্ণনায় ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাড়ী কথা কয় ছলে॥
চূড়া বান্ধা চুল পরিধান সাদা সাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কোন্দলের দায়॥

মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর চরিত্র নূতন নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, গোরক্ষ-বিজয়ের যোগিনী, ধর্মমঙ্গলের নয়ানী ও বিদ্যাসুন্দরের মালিনী অভিন্ন চরিত্র। সংস্কৃত সাহিত্যেও কুট্টনী নামক অনুরূপ চরিত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। এই বিশেষ প্রকৃতির স্ত্রী-চরিত্রের পরিকল্পনা বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের উপরও কতক প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের এই বর্ণনাতে এই চরিত্রটি কেমন যেন নিষ্প্রাণ মৃৎ-প্রতিমার মত—বাহিরে কৃত্রিম অলঙ্কার সজ্জায় সমুজ্জ্বল, কিন্তু দৃষ্টি অপলক। ইহাকে তিনি একটি ছাঁচ (type) চরিত্ররূপেই কল্পনা করিয়াছেন—বিশিষ্ট একটি রূপের মধ্যে ইহাকে জীবন দান করিতে পারেন নাই।

একটি গুপ্ত প্রণয়-কাহিনীর নায়িকার চরিত্র যে প্রকার হওয়া উচিত, ভারতচন্দ্র বিদ্যাকে সম্পূর্ণ সেইরূপই চিত্রিত করিয়াছেন। বুদ্ধিমত্তায় তাঁহার তুলনা হয় না, কথাবার্তা ও কার্যপ্রণালীতে রাজকন্যার সমুচিত মর্যাদাও যে তাহা দ্বারা কোন অংশে খর্ব হইয়াছে, তাহাও নহে। বিদ্যা, বুদ্ধি ও বয়স থাকিলে রাজান্তঃপুরের বিলাসজীবন কুমারী রাজকন্যার পক্ষে যে প্রকার হইতে পারে, এই চরিত্রটি হইতে তাহারই একটি সুন্দর এবং সঙ্গত আভাস পাই। তাহার নির্ভীক সাহসিকতার

মূলেও রহিয়াছে তাহার জন্ম ও শিক্ষাগত সংস্কার। এই শিক্ষা দ্বারা মানসিক সংযমও যে তাহার আয়ত্ত না হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। রাণীর তিরস্কারেও সে অবিচলিতা, কোটাল সুন্দরকে ধরিয়া শ্মশানে লইয়া গেলেও প্রণয়ীর এই বিপন্মুহূর্তেও তাহার অন্তরাবেগ কোথাও অসংযত হইয়া উঠে নাই। বিলাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আধ্যাত্মিক সম্পর্কহীন বিদ্যার্জনের যে কুফল হইতে পারে, বিদ্যার চরিত্রেও স্বভাবতঃই তাহা হইয়াছিল,—ইহার এই অত্যন্ত সঙ্গত এবং স্বাভাবিক বিষয়ের অতিরিক্ত আর কিছুই হয় নাই। তথাপি ভারতচন্দ্র বিদ্যাকে যেন রক্তমাংসের মানবী করিয়া গড়িতে পারেন নাই।

ভাবের গভীরতার জন্য নহে, রসের উচ্ছলতার জন্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। কাব্যখানি মঙ্গলকাব্যের আকারে লিখিত হইলেও কালীর মাহাত্ম্য-কীর্তন করিয়া তাঁহাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। একটি মানবিক প্রণয়-কাহিনীকেই আধ্যাত্মিক গৌরব দিবার জন্য কালিকার নাম ইহাতে আনিয়া যুক্ত করা হইয়াছে।

নিধিরাম

ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কালে নিধিরাম আচার্য নামক একজন কবি একখানি কালিকা-মঙ্গল রচনা করেন।[১] তাঁহার পিতার নাম দুর্লভ আচার্য ও মাতার নাম লক্ষ্মী। কবি নিজের গণক বংশে জন্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—অতএব তিনি আচার্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। গ্রন্থ রচনার কাল সম্বন্ধে তিনি যে নির্দেশ দিয়াছেন[২] তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৬৭৮ শকাব্দ বা ১৭৫৬ খৃস্টাব্দে তাঁহার কাব্য রচিত হয়। নিধিরামের কাব্যে আলী আকবর নামক এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনি কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিধিরামের উপাধি ছিল কবিরত্ন। চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে তাঁহার পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে; অতএব মনে হয়, তিনি এই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন।

নিধিরামের কাব্যের ঘটনাস্থান উজ্জয়িনী। কাব্য-বর্ণিত চরিত্রসমূহের নাম সম্পর্কে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত জনশ্রুতিকেই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে রচিত কালিকা-মঙ্গলসমূহ নীতির দিক দিয়া তত দূষণীয় ছিল না—

১ সা-প-প ৯, ৩০-৩১; ব-প্রা-পু-বি ১।২, ১০-১১; বিশ্বকোষ ১৮, ৬৭;

২ সা-প-প ৯, ৩১।

কাহিনীর মধ্যে দেবতা একেবারে অন্তরালবর্তী নহেন, নিধিরামের কাহিনীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইয়াছে। নিধিরামের রচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও, তাহাতে কবিত্বের পরিচয় খুব সুলভ নহে।

দ্বিজ রাধাকান্ত

দ্বিজ রাধাকান্তের ভণিতাযুক্ত একখানি কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের পুঁথি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।[১] তাঁহার কাব্যে তাঁহার ব্যক্তিগত কোনও পরিচয় কিংবা কাব্যরচনার কাল সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে 'কণ্বমুনির পারণাভঙ্গ' নামক তাঁহার একখানি পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে[২] দেখিয়া তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, এমন অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্যে বিদ্যার পিতৃরাজ্য বর্ধমান এবং পিতার নাম বীরসিংহ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে, কিন্তু চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিদ্যাসুন্দর রচনার যে ধারা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে এই নামগুলি যে স্বতন্ত্র তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণতঃ ভারতচন্দ্রের প্রভাববশতঃ তাঁহার পরবর্তী কাল হইতেই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ঘটনাস্থল বর্ধমান বলিয়া উল্লেখিত হইয়া থাকে। সুতরাং মনে হয়, দ্বিজ রাধাকান্ত ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কবি। তাঁহার ভাষায়ও আধুনিকতার পরিচয় অতি সুস্পষ্ট। যেমন,

এমনি কতেক দিন করিয়া ভ্রমণ।
সমুখে বিষম ঘোর গহন কানন॥
প্রবেশে পরমা পাদপদ্ম অনুবলে।
সম্মুখে শার্দূল সিংহ শত শত চলে॥
তর্জন করিয়া তারে মারিবারে ধায়।
অসিধারী শ্যামা বামা দেখিয়া পালায়॥
লোভ সম্বরিতে নারে আইসে পুনর্বার।
কি করিতে পারয়ে পার্বতী সখা যার॥
পথতে প্রদোষ হৈল অন্ধকার নিশি।
নির্ণয় না হয় দিক হারাইল দিশি॥

১ বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী (বসুমতী—প্রকাশকাল অনুল্লেখিত) পৃ. ১-৫৪
২ ব-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ. ২৫

দ্বিজ রাধাকান্ত তাঁহার কালিকা-মঙ্গলকে 'শ্যামার সঙ্গীত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন, 'শ্যামার সঙ্গীত দ্বিজ রাধাকান্ত গায়।'

কবীন্দ্রের ভণিতা-যুক্ত একখানি কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের পুঁথি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।[১] তিনি রামপ্রসাদ এবং ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কালে খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁহার কাব্য রচনা করেন বলিয়া অনুমিত হয়; কারণ, ইঁহাদের কোনও প্রভাব তাঁহার কাব্যে অনুভব করা যায় না। ভণিতা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার পদবী ছিল চক্রবর্তী এবং তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। একটি ভণিতায় তাঁহার পিতৃ-পরিচয়ও পাওয়া যায়,

ঘটক চক্রবর্তী সুত কৃষ্ণচন্দ্র পদে রত
শ্রীযুক্ত ঘটকচূড়ামণি।
তাহার অনুজ কহে কালীপদ সরোরহে
রক্ষ রক্ষ নগেন্দ্রনন্দিনী॥

কেহ অনুমান করিয়াছেন, তাঁহার নাম ছিল মধুসূদন। তাঁহার সমগ্র কাব্যের মধ্যে একটি মাত্র ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে,

কুসুম সরস জর জর অন্তর
দংশিল কালিনী সাপ।
কহে মধুসূদন রহ ধনি দুই দিন
পহর কি পঞ্চ উপাস॥

ইহার প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, ইহা কোনও স্বতন্ত্র কবির রচনা; বিশেষতঃ ইহা বিদ্যাসুন্দর কাব্যকাহিনীর অন্তর্নিবিষ্ট অংশ নহে। সুতরাং সমগ্র কাব্যমধ্যে এই একটি মাত্র ভণিতা হইতেই ইহার কবির নাম যে মধুসূদন ছিল, এমন মনে করিবার কিছুই কারণ নাই। তাঁহার রচনা হইতে তাঁহার সময় কিংবা বাসস্থানের কথা জানিতে পারা যায় না। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর ধারাটি তিনি সাধারণভাবেই অনুসরণ করিয়াছেন। তবে তাঁহার ভাষার মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর পারিপাট্য বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিবার মত। বৈষ্ণব কবিতার প্রভাবও তাহার মধ্যে বিলক্ষণ অনুভব করা যায়।

---

[১] বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী (বসুমতী)

এই সকল কবি ব্যতীতও মধুসূদন[১], ক্ষেমানন্দ[২], বিশ্বেশ্বর দাস[৩], কবিচন্দ্র[৪] প্রভৃতি প্রণীত কালিকা-মঙ্গলের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের কবি সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না।

মধ্যযুগের সমগ্র কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের মত এমন আর কোন কাব্য প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। আরবি অক্ষরে পর্যন্ত লেখা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর উর্দুতেও অনূদিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অনেকগুলি পদ বাংলার খনার বচনের মত প্রবচনের রূপে আজিও প্রচলিত আছে, 'অন্নদা-মঙ্গলে'র প্রথম খণ্ড হইতে ইহাতে এই শ্রেণীর পদের সংখ্যা অনেক অধিক। এই প্রবচন-গুলির মধ্য দিয়া ভারতের বিদ্যাসুন্দর আজিও বাংলার সমাজে বাঁচিয়া আছে। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী লইয়া কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও বাংলায় কাব্য ও নাটক রচিত হইত।

মধ্যযুগের বাংলার কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহারা প্রধানতঃ দুইটি ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে; প্রথমতঃ পশ্চিমবঙ্গের একটি ধারা, দ্বিতীয়তঃ চট্টগ্রামের একটি ধারা। চট্টগ্রামের ধারাটি কেবল মাত্র যে প্রাচীনতর, তাহাই নহে—তাহা নানাদিক দিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল; কারণ কয়েকটি শতাব্দীর ভিতর দিয়া ইহা অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার মধ্যে অশ্লীলতার বর্ণনা অপেক্ষাকৃত অল্প। উদ্দিষ্ট দেবতা কালিকা ইহাতে কাহিনীর পটভূমিকায় একেবারে বিলীন হইয়া যান নাই। পশ্চিমবঙ্গের ধারাটি ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত তেমন শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে দেবতা পটভূমিকায় বিলীন হইয়াছেন, মানবিক লালসা উদ্দাম নৃত্য করিয়াছে। চট্টগ্রামের ধারাটিতে ভক্তিভাব কখনও একেবারে বিদূরিত হইয়া যায় নাই।

[১] বিশ্বকোষ ১৮, ৬৫; [২] D. C. Sen, *History of Bengali Language and Literature* (Calcutta, 1911), 656; [৩] ঐ; [৪] ব, ২৩৮৩, এই পুঁথির একটি মাত্র পত্র পাওয়া গিয়াছে।

শীতলা-মঙ্গল

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিষ-চিকিৎসা প্রকরণে বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও রোগ-প্রশমনকর্ত্রী বলিয়া শীতলাদেবীর উল্লেখ আছে। এই দেবীর পূজা শুধু বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ নহে, ভারতের বহু স্থানেই এই শ্রেণীর দেবতার পূজা প্রচলিত আছে।[১] সেকেন্দর লোদী (খৃঃ ১৪৮৮-১৫১৬) মথুরার মন্দিরসমূহ ধ্বংস করিয়া হিন্দুদিগকে শীতলা পূজা করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।[২] কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর এক অতি প্রাচীন শীতলা মন্দির আছে। বিহারের অন্তর্গত সাসারামের নিকটবর্তী এক গ্রামে একটি শীতলা মন্দির আছে। উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত মির্জাপুরের ধাঙ্গরেরা শীতলা-ভবানী নামে বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবীর পূজা করিয়া থাকে। অন্যান্য উপলক্ষ্যেও তাহারা এই দেবীকে স্মরণ করিয়া থাকে। মধ্যভারতেও শীতলা পূজার প্রচলন আছে।[৩] পুনায় কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে জননী শীতলার পূজা করে—বোম্বাই প্রদেশে পুত্রলাভের উদ্দেশ্যেও শীতলা দেবীর পূজা করা হয়। ময়ূরভঞ্জ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারেও কয়েকটি শীতলা-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু উড়িষ্যার অন্যত্র বর্তমানে বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে ঠাকুরাণী নামে অভিহিত করা হয়—কোথায়ও তাঁহার শীতলা নাম প্রচলিত নাই।[৪] আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রায় সর্বত্র, বিশেষতঃ ইহার পশ্চিমাংশে, বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 'আই'।[৫] শব্দটি সংস্কৃত আর্যিকা বা আর্যা হইতে জাত। সেখানে তাঁহার শীতলা নাম অবিদিত। আইগণ সাত ভগিনী, ইঁহাদের নামে অসমীয়া ভাষায় বহু লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে। তাহাদিগকে 'আই নাম' বলে। কাহারও বসন্ত রোগ হইলে 'আই নাম' কীর্তন করা হয়, শীতলা বলিয়া কোনও দেবীর নাম তথায় অজ্ঞাত। মনে হয়, নামটি ঐ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

---

[১] Asutosh Bhattacharyya, 'The cult of the goddess of smallpox in West Bengal', *Quarterly Journal of the Mythic Society* XLIII (1952) 55-69.

[২] Elliot, *History of India*, Vol. IV., pp. 447-48

[৩] *MIA* V (1925), 258-60.

[৪] *MIA* VII (1927), pp. 277-86.

[৫] *MIA* Vol. XXX, (1950), p. 76.

আয়ুর্বেদ গ্রন্থ 'ভাব-প্রকাশে'র মসূরিকা চিকিৎসায় (২য় খণ্ড, ৪র্থ ভাগ) যে স্থলে শীতলাদেবীর স্তব বর্ণনা করা আছে, তাহাতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, স্কন্দপুরাণান্তর্গত 'কাশীখণ্ড' হইতে এই শীতলা-স্তব গৃহীত হইয়াছে। মনে হয়, পরবর্তী কালে শীতলা দেবীর পৌরাণিক আভিজাত্য স্থাপন করিবার জন্য এই শ্লোক কয়টি কেহ রচনা রিয়া 'কাশীখণ্ডে'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

যাহা হউক, শীতলা-পূজারীদিগের বিশ্বাস, এই দেবীর বর্তমান পূজাবিধান পিচ্ছিলা-তন্ত্র' হইতে সংকলিত ও তাঁহার ধ্যান 'স্কন্দপুরাণ' হইতে গৃহীত। াকৃতপক্ষে ইনি লৌকিক দেবী, পরবর্তী কালে হিন্দু পৌরাণিক আভিজাত্য লাভের ায়াস পাইয়াছেন মাত্র। তথাকথিত 'পিচ্ছিলা-তন্ত্রে' দেবীর ধ্যান এই প্রকার,

শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগলবিলসম্মার্জনীপূর্ণকুম্ভম্।
মার্জন্যা পূর্ণকুম্ভাদমৃতময়জলং তাপশান্তৈঃ ক্ষিপন্তীম্॥
দিগ্‌বস্ত্রাং মূর্ধ্নিস্থূর্পাং কনকমণিগণৈর্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রাম্।
বিস্ফোটকাদ্যুগ্রতাপ-প্রশমনকরী শীতলা ত্বাং ভজামি॥

তলা-স্তবে পাওয়া যায় যে, শিব বলিতেছেন,—

নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জনীকলসোপেতাং স্থূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাম্ ত্বমেকামৃতবর্ষিণীম্॥
গলগণ্ডগ্রহরোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাং।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি তে ক্ষয়ম্॥
মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাম্।
যস্ত্বাং বিচিন্তয়েদ্দেবীং তস্য মৃত্যুর্নজায়তে॥
যস্ত্বামুদকমধ্যে তু কৃত্বা সংপূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকং ভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে॥

'স্তবকবচমালা'তেও শীতলার এই স্তব উদ্ধৃত আছে। শীতলা প্রকৃতপক্ষে লৌকিক দেবী, অতএব বৈদিক সাহিত্যে ইঁহার অনুসন্ধান বৃথা। ইঁহার পূজার আচার, মূর্তি-পরিকল্পনা সমস্তই উন্নত আর্য-সমাজের দেব-কল্পনার বিরোধী। বিশেষতঃ বসন্ত রোগ গ্রীষ্মপ্রধান দেশেরই ব্যাধি, অতএব প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের সহিত

ইহার কোনও সম্পর্ক থাকা সম্ভব নহে।[১] কেহ কেহ শীতলার মূর্তি ও পূর্বোদ্ধৃত ধ্যান-মন্ত্রের এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া বৈদিক সাহিত্যের অপ্‌দেবীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক কল্পনা করিয়াছেন।[২] কিন্তু অনার্যের সমাজ হইতে যে এই দেবীর উৎপত্তি হইয়াছে, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধ তন্ত্রে হারীতী নামে এক দেবী আছেন। বৌদ্ধ তন্ত্র-সাহিত্য ও পুরাণে তিনি যক্ষিণী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন,[৩] তিনি কুবেরের পত্নী। কিন্তু হারীতী যক্ষিণী হইলেও কালক্রমে দেবীর মতই তিনি বৌদ্ধ সমাজে পূজা পাইতে থাকেন। কারণ, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নেপালে বুদ্ধ বা ধর্মঠাকুরের মন্দিরের পার্শ্বেই হারীতীর মন্দির অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য কোন বৌদ্ধ মন্দির কিংবা বৌদ্ধ মঠের অভ্যন্তরে তাঁহার স্থান হয় নাই। তান্ত্রিক মতে এই দেবীর পূজা করিতে হয়,—

যে চ যা বা মনুষ্যাশ্চ পঞ্চোপচারকৈরপি।
মদ্যাধারাদিভিঃ পূজ্যৈর্মাংসৈর্বলিভির্মীনকৈঃ॥

বৃহৎ স্বয়ম্ভূপুরাণ (বঙ্গবাসী), পৃঃ ৪২৮

বৌদ্ধ সমাজের এই হারীতী হইতেই পরবর্তী বাংলার সমাজে লৌকিক দেবতা শীতলার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।[৪] এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে বৌদ্ধ সমাজে পূজিতা হারীতী দেবীর প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে হারীতী শব্দের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই—যিনি হরণ করেন, তিনি হারীতী। এই হরণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে চীনা বৌদ্ধদিগের মধ্যে একটি

১ বিশ্বকোষকার স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বৈদিক তক্মন্‌ ও শীতলা অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন (১৮. ৪২); কিন্তু শীতলা অনার্য সমাজ হইতে উদ্ভূত, ইহার সহিত বৈদিক সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নাই।

২ 'শীতলা পূজা প্রকৃত কি?' (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সমীরণ, ১৩০২ সাল, ১ম, ২য় খণ্ড। (স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্তৃক সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৫, পৃঃ ২৯, উদ্ধৃত)

৩ অত্রজা লোকাঃ শৈবাপি বৌদ্ধশৈবকাঃ। হারীত্যামপি যক্ষিণ্যাং সদা মুদা প্রপূজিতম্। স্বয়ম্ভূপুরাণ, এসিয়াটিক সোসাইটি সং, পৃঃ ৪২৮

৪ 'It is difficult to ascertain whether Hindus have taken Sitala from the Buddhistic Hariti or the Buddhists from the Hindu Sitala. I am inclined to think that the Hindus are the borrowers.' (Mm. H. P. Sastri, *Discovery of Living Buddhism in Bengal.* p. 20.)

গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্য হইতেই চীন দেশে গিয়াছে, কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে আর তাহার অস্তিত্বের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। চীন দেশে প্রচলিত গল্পটি এইরূপ,—রাজগৃহে এক যক্ষিণী বাস করিত। এই যক্ষিণী সমগ্র মগধের রক্ষয়িত্রীরূপে কল্পিতা হইত। কালক্রমে এই যক্ষিণী নগরের শিশুদিগকে অপহরণ করিয়া ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। নগরবাসিগণ এইজন্য তাহার নাম দেয়, হারীতী বা হরণকারিণী। বুদ্ধের নিকটে এই বিষয়ে তাহারা অভিযোগ করে। অতঃপর বুদ্ধের কৌশলে হারীতী তাহার জাতাপহরণবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্ত জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধও তাহাকে বৌদ্ধ মঠ ও মন্দিরের রক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত করেন।[১]

উদ্ধৃত কাহিনীর মধ্যে শীতলার যে বিশেষ গুণ অর্থাৎ তিনি যে বসন্ত রোগ নিবারণকারিণী, তাহার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে সংক্রামক কোন রোগদ্বারা ব্যাপক শিশুমৃত্যুর কারণ, তাহার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এই সংক্রামক ব্যাধি যে বসন্ত তাহার কোন প্রমাণ নাই। পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে হারীতী সন্তানদাত্রী ও শিশুর রক্ষয়িত্রী রূপে কল্পিতা হইয়াছেন। পুরাণের ষষ্ঠীদেবীর সহিত তখন তাঁহার আর কোন পার্থক্য নাই। অতএব বৌদ্ধ সমাজের এই মঠ-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী সন্তানদাত্রী ও তাহার রক্ষয়িত্রী হারীতীর সহিত বাংলার লৌকিক দেবতা বসন্ত-রোগনাশিনী শীতলার কোন সঙ্গত সম্পর্ক কল্পনা করা যাইতে পারে না। বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, একমাত্র শিশুর সহিতই হারীতীর সম্পর্ক, কিন্তু বসন্তরোগ বালবৃদ্ধ-নির্বিশেষে সমান ভয়াবহ। অথচ শীতলার শিশুর সহিত যে বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে, তাহা নহে—সমাজের সকল বয়সের লোকের সহিতই তাঁহার সম্পর্ক সমান। সেইজন্য মনে হয়, পৌরাণিক ষষ্ঠীদেবী কিংবা পৌরাণিক জাতাপহারিণীর সহিতই হারীতীর সম্পর্ক, শীতলার সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক নাই।

বৌদ্ধ ভাস্কর্যে হারীতীর যে সকল মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলেও আধুনিক শীতলার ধ্যানোক্ত বর্ণনা কিংবা তাঁহার যে সকল মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সহিত হারীতীর সুদূর পার্থক্য সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, হারীতী যক্ষিণী ও যক্ষপতি কুবেরের পত্নী। সেইজন্য কুবেরের

[১] T. Watters, *On Yuan Chwang's Travels in India*, 629-645 A. D. (London, 1904), 216.

মূর্তির পার্শ্বে আসীনা হারীতীর মূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] এতদ্ব্যতীত শিশু-পরিবৃতা তাঁহার স্বতন্ত্র দণ্ডায়মানা মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্তিগুলির গঠন-ভঙ্গি অনুপম এবং উন্নত শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁহার দুই স্কন্ধারূঢ় দুই শিশু, অঙ্কে স্তন্যপানরত এক শিশু, পাদনিম্নে ক্রীড়ারত আরও দুই একটি শিশু দেখিতে পাওয়া যায়। মুখে প্রসন্ন হাস্য। দেবীর সর্বাঙ্গে অলঙ্কারসম্ভার ও পরিধানে বিচিত্র বসন। ইহার সহিত রাসভস্থা দিগ্বস্ত্রা স্থর্পমূর্ধা সম্মার্জনীহস্তা শীতলাদেবীর কি ভাবে সামঞ্জস্য কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অতএব মনে হয়, বৌদ্ধ হারীতী হইতেই পরবর্তী হিন্দু পুরাণে জাতাপহারিণীর পরিকল্পনা হইয়া থাকিলেও লৌকিক শীতলার সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর শীতলা-মঙ্গলে (পরে দ্রষ্টব্য) শীতলার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই অর্বাচীন পৌরাণিক কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে,—

করিল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নহুষ রাজন।
কত মুনি ঋষি আইল কে করে গণন॥
নির্বিঘ্নে করিয়া যজ্ঞ দিলেক আহুতি।
হইলেক পূর্ণ যজ্ঞ শান্ত মতি॥
যজ্ঞপূর্ণে নিভাইল যজ্ঞের অনল।
তাহে জনমিল এক কন্যা সমুজ্জ্বল॥
মস্তকে ধরিয়া কুলা বাহির হইলা।
দেখি প্রজাপতি তারে যত্নে সুধাইলা॥
কে তুমি সুন্দরী কন্যা কাহার গৃহিণী।
কি হেতু অগ্নিতে ছিলা কহ সে কাহিনী
দেবী কন অগ্নিকুণ্ডে মম জন্ম হইল।
কোথা যাই কি করিব পরাণ বিকল॥
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলা বচন।
যজ্ঞ শীতলের কালে তোমার জনম॥
সেহেতু শীতলা নাম তোমার হইল।
মম বাক্যে যাহ তুমি শীঘ্র ভূমণ্ডল॥

---

১ V. A. Smith, 114-15

শীতলা নামটি পৌরাণিক প্রভাব-জাত বলিয়া মনে হয়। বসন্ত রোগের দারুণ প্রদাহ-গুণ হইতেই, ইহার উপশমকারিণী দেবীর নাম বিপরীতোক্তি (euphemistic tendency)তে শীতলা হইয়াছে। ধ্যানেও তাঁহাকে 'বিস্ফোটকাদ্যুগ্রতাপ-প্রশমনকরী' বলা হইয়াছে। কিন্তু এই শীতলা শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃত। দাক্ষিণাত্যেও শীতলম্মা বলিয়া এক গ্রাম্য দেবী আছেন।[১] কিন্তু তিনি জলের দেবতা (water-goddess)। অবশ্য দাক্ষিণাত্যের গ্রাম্য জলদেবতাগণই বসন্তরোগনাশিনী দেবী বলিয়া কোন কোন স্থানে কল্পিত হইয়া থাকেন। মস্‌লিপট্টম্‌ জিলায় জলদেবী গঙ্গম্মা বসন্ত রোগেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া কল্পিত হ'ন। পূর্বোদ্ধৃত শীতলাস্তবেও বলা হইয়াছে যে, জলমধ্যেই শীতলার পূজা হয়, যথা,—'যস্ত্বামুদকমধ্যে তু কৃত্বা সংপূজয়েন্নরঃ'। কাশীতে যে শীতলা মন্দির আছে, তাহা একপ্রকার জলের উপরই অবস্থিত—প্রতি বৎসর বর্ষায় এই মন্দির নদীজলে নিমজ্জিত হয়। ইহার সম্পর্কে এই প্রকার জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, গঙ্গাদেবী প্রতি বর্ষায় তিনবার শীতলাদেবীকে তাঁহার জলে নিমজ্জিত করিয়া থাকেন। তাহাতেই ইহার পবিত্রতা রক্ষা পায়। দাক্ষিণাত্যের শীতলম্মা নামক জল-দেবতার বৈশিষ্ট্য বাংলার শীতলার মধ্যেও বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। শীতলম্মাও যে বসন্ত রোগেরই দেবী এই বিষয়ে কোন ভুল নাই। দাক্ষিণাত্যের এই লৌকিক দেবী শীতলম্মা ও বাংলার লৌকিক দেবী শীতলা অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। পূর্বেই দেখা গিয়াছে, দাক্ষিণাত্যের কোন কোন উপদেবতা বাংলার লৌকিক দেবতাতে পরিণত হইয়াছেন। শীতলাও তাঁহাদের অন্যতম। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে এই বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বিভিন্ন নামও পাওয়া যায়; যেমন,—মহীশূর জেলায় হাম ও বসন্তের দেবীর নাম সুখজম্মা, আরকট জেলায় তাঁহার নাম কন্নিয়ম্মা, ইনি দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রাম্য দেবতা মরী অম্মারই রূপান্তর মাত্র, কোথাও তাঁহার নাম মরম্মা বা মরম্মা-হেথনা। আদি মানবের সাধারণ রোগভীতি হইতে এই সকল দেবতার পরিকল্পনা করা হইলেও, ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সম্পর্কও ছিল। বাংলার শীতলা ও এই দাক্ষিণাত্যের শীতলম্মা একই সূত্র হইতে উদ্ভূত। হারীতীও স্বতন্ত্র কোন সমাজকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধ তন্ত্রসাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন; অতএব হারীতী হইতে শীতলার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। পরবর্তী কালে

[১] Whitehead, 23

ইহাদের উপর সামান্য পৌরাণিক প্রভাব স্থাপিত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত নগণ্য।

দাক্ষিণাত্যের যে সমস্ত বসন্তরোগনাশিনী লৌকিক দেবতার উল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের কাহারও কোন নির্দিষ্ট মূর্তি নাই, স্বাভাবিক প্রস্তরখণ্ডেই তাঁহাদের পূজা হইয়া থাকে। পূজারীগণ সেই প্রস্তরখণ্ডে সিন্দুর লিপ্ত করিয়া দেন। বাংলার শীতলারও পূর্বে কোন মূর্তি ছিল না, স্বাভাবিক প্রস্তরখণ্ডেই তাঁহার পূজা হইত। মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতার যে ধর্মমন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,[১] তাহার অভ্যন্তরস্থ ধর্মমূর্তির আসন-নিম্নে যে শীতলার মূর্তি ছিল, তাহার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, 'Below there is a stone with eruptions representing small-pox. This is Shitala.' স্বর্গত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ও লিখিয়াছেন, 'শীতলা-পণ্ডিতদিগের শীতলা করচরণহীনা, সিন্দূর-লিপ্তাঙ্গী, শঙ্খ বা ধাতুখচিত ব্রণ-চিহ্নাঙ্কিতা মুখমণ্ডলমাত্রাবশিষ্টা প্রতিমা মাত্র।'[২] এই ক্ষুদ্র ব্রণ-চিহ্নাঙ্কিত শিলাখণ্ডই শীতলার প্রাচীনতম রূপ। ইহাও ধর্মশিলার উপাসনার মত আদি মানবের প্রস্তরোপাসনার প্রবৃত্তি হইতে জাত, দাক্ষিণাত্যেও সেইজন্য অনুরূপ গঠন শিলাখণ্ডেই বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা হইয়া থাকে। তাহা হইলে পূর্বোদ্ধৃত শীতলার ধ্যানমন্ত্রে তাঁহার যে নির্দিষ্টগঠন একটি মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা যে বহু পরবর্তী বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক প্রভাব-জাত, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ময়ূরভঞ্জ হইতে অনেকটা এই ধ্যানের অনুরূপ একটি শীতলা-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩] এই মূর্তি যে অত্যন্ত আধুনিক সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ধর্মের পূজারীগণ যেমন ধর্মপণ্ডিত, শীতলার পূজারীগণও তেমনই শীতলাপণ্ডিত নামে পরিচিত। গ্রহ-বিপ্রেরাই বসন্ত রোগের চিকিৎসা ও শীতলা পূজা করিয়া থাকেন। শীতলার অনার্য সংস্রবের ইহাও প্রমাণ।

শীতলা-মঙ্গলের কাহিনী

শীতলা-মঙ্গলের বিশিষ্ট কোন একটি কাহিনী পাওয়া যায় না। ইহার বিভিন্ন পালায় বিভিন্ন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৩০৫ সাল, ১ম সংখ্যা,) একখানি শীতলা-মঙ্গল কাব্যের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইহার চারিটি পালা চারিটি স্বতন্ত্র কাব্য। এই

[১] H. P. Sastri, 22; [২] সা-প-প ৫, ৩০-৩১; [৩] N. N. Vasu, XCVI.

স্বতন্ত্র পালাগুলি আবার স্বতন্ত্র কবির ভণিতা-যুক্ত। মনে হয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শীতলা-পূজারী এই শীতলা-মাহাত্ম্য-সূচক বিভিন্ন কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে তাহা আসিয়া একত্র সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'গোকুল পালা' নিত্যানন্দ চক্রবর্তী নামক কবির রচিত। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ-বলরামের শরীরে বসন্ত দেখা দেয়, তাঁহারা শীতলা পূজা করিয়া পরে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইহার আর একটি পালার নাম 'বিরাট পালা'। ইহাতে বিরাট রাজ্যে ব্যাপক বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ও শীতলা পূজায় এই রোগের উপশমের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার আর একটি পালার নাম 'চন্দ্রকেতুর পালা', ইহাতেও চন্দ্রকেতুর রাজ্যে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ও শীতলা পূজায় তাহার শান্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আর একটি লৌকিক পালা আছে, তাহার নাম 'রঘুনাথ দত্তের পালা'। শেষোক্ত পালা দুইটির রচয়িতা কবিবল্লভ। পূর্বোল্লিখিত বিরাট পালা আবার আরও কয়েকটি খণ্ডপালায় বিভক্ত, 'জাগরণ পালা', 'হেমঘট তোলা পালা' ও 'নিমাই জগাতির পালা'। নিম্নে চন্দ্রকেতুর পালাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া ইহার কাহিনীগত বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা যাইতেছে।

শীতলাদেবী মর্ত্যে পূজা প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার অনুচর জ্বরাসুরকে বলিলেন,

সকল দেবেতে আছে মোর অধিকার
মনুষ্য গৃহেতে পূজা না হয় আমার ॥

জ্বরাসুরের পরামর্শে শীতলা চৌষট্টি বসন্তকে ডাকাইলেন। সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, জ্বরাসুর আগে গিয়া মনুষ্যদেহে জ্বররূপে প্রবেশ করিবে, অতঃপর মাতা শীতলা তাহার অনুসরণ করিবেন। এই পরামর্শ মত সকলে চন্দ্রকেতুর রাজ্যে চলিলেন।

শীতলা অপূর্ব বেশ ধারণ করিলেন। সমস্ত আভরণ ত্যাগ করিয়া এলোচুলে চৌষট্টি বসন্তের ঝুড়ি কক্ষে লইয়া হস্তে নড়ি ধারণ পূর্বক লোলচর্মা বৃদ্ধার বেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শীতলা চন্দ্রকেতুর রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, প্রথমেই তিনি নগরের কুলরমণীদিগকে দেখিলেন। তাহারা ছদ্মবেশিনী দেবীকে দেখিয়া মুখ ফিরাইল। তিনি ইহাতে মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন; মনে করিলেন, ইহার প্রতিশোধ লইবেন। অতঃপর তিনি পথে নগরের বালক-বালিকাদিগকে

দেখিলেন। 'কিন্তু নাহি দেখি কার মুখে বসন্তের চিন।' তখন 'ছাওয়ালে দেখিয়া দয়া জন্মিল অন্তরে।' দয়া অর্থে রোগের আক্রমণ। প্রথমেই নগরের বালকগণ বসন্ত রোগের কবল-গ্রস্ত হইল।

শীতলা এইবার রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার বাড়ী শান্তিপুর। সাতটি পুত্র তাঁহার বসন্ত রোগে মরিয়াছে। স্বামী শৈব, শীতলার পূজা করিতে স্বীকার করেন না, সেইজন্য তাঁহার পরিবারে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। শীতলা রাজাকে বলিলেন, 'তোমার রাজ্যেও বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে দেখিতেছি, তুমি অচিরে শীতলার পূজা না করিলে রাজ্য ছারখারে যাইবে। বিশেষতঃ তোমারও একশত পুত্র আছে। অতএব এই পুত্রদিগের কল্যাণের জন্য তোমার শীতলা পূজা করা কর্তব্য।' কিন্তু রাজা চন্দ্রকেতু পরম শৈব, তিনি বলিলেন,

নৃপতি বলেন বুড়ী হয়্যাছ অজ্ঞান।
কেমনে ছাড়িব আমি প্রভু ত্রিনয়ান॥

শীতলা শিবের নিন্দা করিলেন। শুনিয়া রাজা কানে হাত দিলেন, আরাধ্য দেবতার নিন্দা নিজ কর্ণে শ্রবণ করিলেন না। তিনি বলিলেন,

কেবা কার পুত্রবধূ কেবা কার পিতা।
মরিলে সম্বন্ধ নাই শুন এই কথা॥

অতএব পুত্রের কল্যাণের জন্য তিনি শীতলা পূজা করিয়া নিজের দেবতার অবমাননা করিবেন না,—

জন্মেও না ছাড়িব মহেশ ঠাকুর।
শুনরে অজ্ঞান বুড়ী এথা হৈতে দূর॥

শুনিয়া শীতলা ক্রোধে অন্ধ হইলেন। তাঁহার রাজ্য ছারখার করিতে জ্বরাসুরকে আদেশ দিলেন। রাজপুত্রগণ একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে রাণী রাজার নিকট কাঁদিয়া বলিলেন, 'এখনও শীতলার পূজা করিয়া রাজ্যের অশান্তি দূর কর।' কিন্তু শীতলার কার্যে রাজার আক্রোশ আরও বাড়িয়া গেল, তিনি বলিলেন,

রাজা বলে শীতলা করেছে যদি বাদ।
কদাচিৎ আমি তার না লব প্রসাদ॥

রাজা দিবারাত্র শিবের পূজা করিতে লাগিলেন। শিব ভক্তের বিপদে তাঁহার

একজন অনুচর ভীমকে তাঁহার রক্ষার্থ পাঠাইলেন। শিবও যুদ্ধে সাজিয়া আসিলেন, কিন্তু শীতলার হস্তে পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেলেন। রাজার উনসত্তরটি পুত্র বসন্তরোগে মরিল, তিনি কনিষ্ঠ পুত্রটিকে সূর্যের সাহায্যে পদ্মবনে লুকাইয়া রাখিলেন। শীতলা তাহার সন্ধান করিতে লাগিলেন, রাজপুত্র পদ্মের নাল বাহিয়া একেবারে গিয়া পাতালে উপস্থিত হইল। কিন্তু পাতালের রাজা বাসুকি সর্পকুলকে শীতলার ক্রোধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজপুত্রকে লইয়া এক পর্বতগহ্বরে লুকাইয়া রাখিলেন। সেখানেই বসন্তরোগের আক্রমণে রাজপুত্র প্রাণত্যাগ করিল। রাজকুমারের পত্নী চন্দ্রকলা পিতৃগৃহে থাকিয়া এই দুঃস্বপ্ন দেখিলেন। শীতলা চন্দ্রকলাকে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ দিয়া আসিলেন। চন্দ্রকলা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। শীতলা জরতী বেশে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন,

ব্রাহ্মণী দেখিয়া দণ্ডবত হৈল সতী।
ঈশ্বরী বলেন হও জনম এয়তি॥

চন্দ্রকলা বলিলেন, তিনি স্বামীর সহমৃতা হইতেছেন, এই অবস্থায় তাঁহার এই আশীর্বাদ কি ভাবে সফল হইতে পারে? শীতলা বলিলেন, তাঁহার কথা মিথ্যা হইবার নহে। তিনি 'মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্রে' রাজকুমারের প্রাণদান করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি চন্দ্রকলাকেও এই মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্র শিক্ষা দিলেন। চন্দ্রকলা স্বামীকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল এবং উনসত্তর ভাসুরকে জীবিত করিবে এইরূপ আশ্বাস দিয়া রাজাকে শীতলা পূজা করিতে বলিল, কিন্তু রাজা স্বীকৃত হইলেন না; বলিলেন,

পুনর্বার পুত্র-বধূ মরুক দুজন।
জন্মে নাহি ছাড়িব প্রভু ত্রিলোচন॥

কিন্তু এইবার প্রভু শিব নিজেই আসিয়া চন্দ্রকেতুকে শীতলার পূজা করিতে বলিলেন। নিজের আরাধ্য দেবতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া নৃপতি অবশেষে বাধ্য হইয়া শীতলার পূজা করিলেন। রাজ্যে যে সকল প্রজা বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই বাঁচিয়া উঠিল।

এই কাহিনীর রচনা যে আধুনিক, ইহার বিষয়বস্তু ও তাহার রচনা-প্রণালী একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই কাহিনীভাগে কোনই মৌলিকতা নাই। মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর উপরই ইহার ভিত্তি মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত, মৌলিক অংশও

কাব্যগুণ-বিবর্জিত। এই কাহিনী রচনায় মঙ্গলকাব্য রচনার একটা ধারাবাহিক ও পর্যুষিত প্রথারই অনুকরণ করা হইয়াছে মাত্র। অতএব প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি রচনার বহু পরে ইহাদেরই আদর্শে যে এই কাহিনী রচিত হইয়াছে, এই বিষয় নিশ্চিত। গোকুল পালা ও বিরাট পালা হইতেও জানা যায় যে, বৈষ্ণবধর্ম সাধারণ সমাজে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই এই সকল কাহিনী রচিত হয়। কারণ, ইহাতে মঙ্গলকাব্যের নায়ক কোনও কল্পিত শাপভ্রষ্ট দেব-সন্তান নহে, একেবারে স্বয়ং কৃষ্ণ-বলরাম। কৃষ্ণ-বলরামকে নায়ক করিয়া মঙ্গলকাব্য রচনার প্রয়াসও এই প্রথম। অর্থাৎ চাঁদ সদাগর, ধনপতি, লাউসেনের মত নির্দিষ্ট কোন নায়কের অভাবে এই শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যগুলি প্রকৃত কাহাকে যে নায়ক করিয়া কাব্যরচনা করিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না ; সেইজন্য শীতলা-মঙ্গল কাব্যে নির্দিষ্ট কোন কাহিনী নাই, ঘটনাগুলিও সুগ্রথিত নহে, সর্বোপরি কোন প্রথম শ্রেণীর কবিও এই বিষয় লইয়া কাব্যরচনা করেন নাই। সেইজন্য ইহাদিগকে দ্বিতীয় স্তরের মঙ্গলকাব্য বলা যাইতে পারে।

শীতলা-মঙ্গলের কবিগণ—নিত্যানন্দ

শীতলা-মঙ্গলের কাহিনীর আদি রচয়িতা কে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। বটতলায় মুদ্রিত নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর 'বিরাট পালা'য় গ্রন্থ-প্রকাশক ৺ত্রৈলোক্য নাথ দত্ত মহাশয় 'প্রকাশকের উক্তি' নামে কয়েকটি পদ রচনা করিয়া তাহাতে বলিয়া গিয়াছিলেন,

শীতলার জাগরণ পালা বঙ্গভাষায়।
নাহি ছিল কোন দেশে সুশৃঙ্খলায়॥
অনেকের ইচ্ছা দেখে মনেতে ভাবিয়া।
উড়িষ্যা হইতে পুঁথি আনি মাঙ্গাইয়া॥
উড়িষ্যায় লিখেছিল দ্বিজ নিত্যানন্দ।
নানাবিধ কবিতায় করিয়া সুছন্দ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যয় করি অর্থ।
বাঙ্গালা ভাষায় দিলাম করিবারে অর্ঘ্য।
শিবনারায়ণ সিংহ উড়িষ্যায় নিপুণ।
গীতছন্দে এই পুঁথি করিল রচন॥

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, উড়িষ্যায় সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ঠাকুরাণী, শীতলা নহে। বাংলাদেশের শীতলা-মঙ্গলের অনুরূপ কোনও কাহিনীও সেখানে প্রচলিত নাই। সুতরাং নিত্যানন্দ সেখান হইতে কাহিনীটি বাংলাদেশে আনিয়াছেন, এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

উদ্ধৃত অংশে যে দ্বিজ নিত্যানন্দের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তিনি উড়িয়া নহেন, বাঙ্গালী কবি; বাংলা ভাষাতেই তাঁহার শীতলা-মঙ্গল পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে পরে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই নিত্যানন্দই এই শ্রেণীর কাব্যের আদি কবি বলিয়া একটা লোকপ্রবাদ প্রচলিত ছিল, উদ্ধৃত কাহিনী তাহা অবলম্বন করিয়াই রচিত।[১] 'গোকুল পালা'য় নিত্যানন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন,

সৌতিসম সর্বশাস্ত্র, শ্রীযুত ভবানী মিশ্র, তস্য সুত মিশ্র মনোহর।
তার পুত্র চিরঞ্জীব, কি গুণে তুলনা দিব, যার সখা প্রভু দামোদর॥
মহামিশ্র তস্যাত্মজ, শ্রীরাধাচরণাম্বুজ, চৈতন্য তাহার নন্দন।
তাহার মধ্যম ভ্রাত, নিত্যানন্দ নামযুত, গাহে ভেবে শীতলা চরণ॥

অন্যত্র তিনি তাঁহার বাসস্থানের নামও উল্লেখ করিয়াছেন, 'কাঁটাদের ডিণ্ডিসাঞি গোত্র ভরদ্বাজ।' তিনি নিজেকে চক্রবর্তী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, 'বিরচিল চক্রবর্তী কবি নিত্যানন্দ।' ডিণ্ডিসাহীগ্রামী কাঁটাদিয়াবাসী কবির পূর্বপুরুষ বল্লালের আমল হইতে কৌলীন্যহীন হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁহারা সিদ্ধ শ্রোত্রিয় নামে পরিচিত হন। কাঁটাদিয়া গ্রামে বল্লালী কুলীন বংশ অদ্যাপি কাঁটাদিয়া বাঁড়ুয্যা বলিয়া পরিচিত। কবিবংশের সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব নাই। নিত্যানন্দ মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী কাশীযোড়ার রাজা রাজনারায়ণের সভাসদ্ ছিলেন; তিনি তাঁহার কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

কাশীজোড়া সৃষ্টিপাড়া অতি বিচক্ষণ।
রামতুল্য রাজা তথা রাজনারায়ণ॥
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ্।
শীতলা মঙ্গল রচে পান সুধামত॥

রাজা রাজনারায়ণের সময় জানা যায় না। তবে মেদিনীপুর অঞ্চলের একজন শক্তিশালী এবং 'গ্রন্থরসিক' জমিদার রাজনারায়ণের পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁহার

[১] সা-প-প ৫, ৩২-৭০

সভায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল।[১] মনে হয়, নিত্যানন্দের পৃষ্ঠপোষক রাজনারায়ণ এবং এই রাজনারায়ণ অভিন্ন। রাজনারায়ণের সভায় ১৬৯৯ শকাব্দ বা ১৭৭৭ খৃস্টাব্দে 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে'র অন্তর্গত 'গণেশ খণ্ড' এবং ১৭০৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে 'বৃহন্নারদীয় পুরাণ' অনুলিখিত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ চক্রবর্তী এই সময়েই বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। নিত্যানন্দের ভাষা সুমার্জিত এবং একটু আধুনিকতার পরিচায়ক। ভাষা দেখিয়া তাঁহাকে অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেকার লোক বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। বরং তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার রচনা সরল, কোথাও পাণ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত নহে; একটু নিদর্শন দেখাইতেছি। কি ভাবে পৃথিবীতে নিজের পূজা প্রচার হইতে পারে, দেবী জ্বরাসুরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে জ্বরাসুর বলিল,

নাশিতে ক্ষিতির ভার দৈত্যের নিধনে।
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ নন্দের ভবনে॥
বাল্যবেশে ব্রজপুরে বিহরে গোপাল।
শ্রীদামের অংশ কলা দ্বাদশ রাখাল॥
ষোড়শ সহস্র গোপী স্বয়ং আদ্যা রাধা।
কলাবতী কেবল কৃষ্ণ অঙ্গ আধা॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি ত্যজি স্বর্গশালা।
ত্রিসন্ধ্যা গোকুলে আসি দেখে কৃষ্ণলীলা॥
ত্রিসর্গপ্রিয়া গঙ্গা কাশী বারাণস।
এসব এখন নয় গোকুল সদৃশ॥
এমন গোকুলে মাতা পূজা নেয় যদি।
ত্রিভুবনে যশ হয় জব্দ হয় ক্ষিতি॥

গোকুলে শীতলা পূজা প্রতিষ্ঠিত হইলে সমস্ত পৃথিবী জব্দ হইবে এবং ত্রিভুবনবাসী তাঁহাকে পূজা করিতে বাধ্য হইবে। যাহা হউক, উদ্ধৃত অংশের ভাষা হইতে কবিকে কিছুতেই প্রাচীন বলিয়া মনে হইতে পারে না।

[১] ঐ ৫৮, ১৭-১৮

বল্লভ

বল্লভের শীতলা-মঙ্গলের[১] কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় অনুমান করিয়াছেন, ইহা ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কালে রচিত। সম্ভবতঃ কবি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কাব্য-মধ্যে তাঁহার রচনা-কাল সম্বন্ধে তিনি কিছুই উল্লেখ করিয়া যান নাই। একমাত্র ভাষার বিচার হইতে তাঁহার কাল-সম্বন্ধে অনুমান করা যায় মাত্র। তিনি এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,

পিতামহ পুরুষোত্তম, জগতে ঈশ্বর নাম,
শ্রীচৈতন্য তাহার কুমারে।
তস্য সুত শ্রীশ্যাম, সকল গুণের ধাম,
কতকাল হস্তিনা নগরে॥
তস্য সুত শ্রীগোপাল, মান্দারণে কতকাল
নিবাস করিল বৈদ্যপুরে।
শ্রীবল্লভ তাহার সুত, গোবিন্দ পদেতে রত
হরি বল পাপ গেল দূরে॥

শ্রীবল্লভ কবির নাম, উপাধি নহে; তিনি কাব্যমধ্যে বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন, 'শ্রীকবি-বল্লভ গায় মধুর সঙ্গীত', 'শ্রীকবি-বল্লভ রস গায়।' ইত্যাদি। কবি কোন্ সম্প্রদায়-ভুক্ত লোক ছিলেন, তাহা জানা যায় না; তবে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না, তাহা তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়; তিনি লিখিয়াছেন,

শ্রীকবি বল্লভে গায় সেবিয়া ঈশ্বর।
পাষণ্ড বৈষ্ণবার মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর॥

কবি সম্ভবতঃ বসন্ত-চিকিৎসক গ্রহবিপ্র ছিলেন। কারণ, তিনি তাঁহার কাব্যে চৌষট্টি প্রকার বসন্ত রোগের যে জ্বলন্ত বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা তাঁহার এই রোগ-সম্পর্কে সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকিলে কিছুতেই সম্ভব হইত না। 'কাঁটাল্যা', 'মসূরিয়া', 'শিখর্যা', 'উনানিঞা', 'বেউচিয়া', 'চামদল', 'মগর্যা', 'গজশুঁড়া', 'আলকুশ্যা', 'আমবোয়া' ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বসন্ত রোগ ও তাহার চিকিৎসার যে বর্ণনা ইহাতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে বসন্ত-চিকিৎসক শীতলা-পণ্ডিত গ্রহবিপ্র বলিয়াই মনে হয়।

[১] সা-প-প ৫, ৩২-৫১

নিত্যানন্দের ভাষার মত শ্রীবল্লভের ভাষা এত মার্জিত নহে, ইহা অনেকাংশে গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট। অবশ্য ইহা হইতেই শ্রীবল্লভকে প্রাচীনতর কবি বলিয়া নির্দেশ করিবার উপায় নাই। কারণ, নিত্যানন্দ উচ্চবর্ণের শিক্ষিত কবি ছিলেন, তাঁহার ভাষা সেইজন্য স্বভাবতঃই মার্জিত ছিল। কিন্তু বল্লভ তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কার-অনুযায়ী যে ভাষায় তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা মার্জিত ও সুপরিচ্ছন্ন হইতে পারে নাই। অবশ্য শ্রীবল্লভ নিত্যানন্দের পূর্ববর্তী কবিও হইতে পারেন, কিন্তু এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিবার বিশেষ কিছু অবলম্বনও নাই। তবে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, নিত্যানন্দ সর্বপ্রথম ওড়িয়া ভাষায় তাঁহার শীতলা-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন, তাহাই এই বিষয়ের আদি রচনা। সেইজন্য নিত্যানন্দকেই প্রাচীনতর কবি বলিয়া মনে হয়।

বল্লভের মধ্যে কবিত্ব ছিল। তাঁহার নিম্নলিখিত পদগুলি প্রায় প্রবচনের মত শোনায়,

সুখের হাটে দাগা বিধি দিলা এত দিনে।
কেবা কার পুত্র বধূ কেবা কার পিতা।
মরিলে সম্বন্ধ নাই শুন এই কথা॥ ইত্যাদি।

স্বর্গত ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কৃষ্ণনাথ, রামপ্রসাদ, শঙ্করাচার্য ও রঘুনাথ দত্ত নামক আরও কয়েকজন শীতলা-মঙ্গল রচয়িতার নাম করিয়াছেন,[১] কিন্তু তাঁহাদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, তিনি নিজেও তাঁহাদের কোন পরিচয় দিতে পারেন নাই। কালিকা-মঙ্গলের কবি কৃষ্ণরাম রচিত একখানি শীতলা-মঙ্গলের সন্ধান পাওয়া যায়।[২] মনে হয়, ইহা তাঁহার রায়-মঙ্গল কাব্যের (পরে দ্রষ্টব্য) পরিশিষ্ট। ইহার কাহিনী কৃষ্ণরামের অন্যতম কাব্য ষষ্ঠীমঙ্গলের (পরে দ্রষ্টব্য) প্রায় অনুরূপ। নিত্যানন্দ ও বল্লভের কাব্য ইহার পরে কিংবা পূর্বে রচিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। ধর্মমঙ্গলের কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলীও একখানি শীতলা-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত দয়াল, অকিঞ্চন চক্রবর্তী, দ্বিজ গোপাল ও শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র প্রণীত শীতলা-মঙ্গলেরও উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহাদের সকলেরই খণ্ডিত পুঁথি দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে,[৩] তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

১ দীনেশচন্দ্র সেন ১৫৯; ২ প-স ৫৬৭৫; ৩ সুকুমার সেন ৮০০

প্রাচীন কোন সংস্কৃত পুরাণ কিংবা ধর্মসাহিত্যে ষষ্ঠীদেবীর নাম পাওয়া যায় না। কতকগুলি পরবর্তী পুরাণ, যেমন 'দেবী-ভাগবত', 'ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ' ইত্যাদিতে তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। 'দেবী-ভাগবতে' আছে যে, ষষ্ঠী কাত্যায়নীরূপা দুর্গারই এক নাম। সমাজে ষষ্ঠীর আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কতকগুলি পরবর্তী পুরাণ তাঁহাকে দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। কিন্তু মনসা, মঙ্গলচণ্ডীর মতই ষষ্ঠী লৌকিক দেবী—মনসা ও মঙ্গলচণ্ডী যে ভাবে কয়েকখানি পরবর্তী পুরাণে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সেই উপায়েই ষষ্ঠীদেবীও কয়েকখানি অর্বাচীন পুরাণের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন।[১]

শিশুমৃত্যু বাংলার চির-কলঙ্ক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন সমাজে ইহার প্রকোপ স্বভাবতই অধিকতর ছিল। এইজন্যই অজ্ঞ ও অসহায় সমাজ শিশুর রক্ষয়িত্রীরূপে কোন কোন দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, ষষ্ঠী তাঁহাদেরই অন্যতম। বাংলার প্রতিবেশী কোন কোন অনার্য সমাজের মধ্যে পুংশিশুর মৃত পিতামহ ও স্ত্রীশিশুর মৃত পিতামহীর (কিংবা মাতৃক বা matriarchal সমাজের মাতামহ ও মাতামহীর) আত্মাকেই শিশুর রক্ষক কিংবা রক্ষয়িত্রীরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। শিশু রোগগ্রস্ত হইলেই মনে করা হয় যে, ইহার পিতামহ কিংবা পিতামহীর আত্মা কোন কারণে কুপিত হইয়াছে। সেইজন্য শিশুর রোগমুক্তি কামনায় সেই কুপিত আত্মাকে প্রশমিত করিবার জন্য নানারূপ 'পূজা'র ব্যবস্থা করা হয়। পিতামহ কিংবা মাতামহের আত্মা হইলে আদিম সমাজে তাহার নামে মোরগ কিংবা শূকর বলি দেওয়া হয়, পিতামহী কিংবা মাতামহীর আত্মা হইলে, তাহার সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীশিশুর পায়ে লোহার বালা, পুঁতি বা হাড়ের মালা কিংবা কর্ণাভরণ পরাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রকার পিতামহী, মাতামহীর আত্মার পরিকল্পনা হইতেই পরবর্তী হিন্দু প্রভাবের যুগে ষষ্ঠীদেবীর পরিকল্পনা আসিয়া থাকিবে—সেই জন্য পূর্ববর্তী কোন পুরাণে তাঁহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। আমরা ছেলেপিলেদিগকে যে জুজুর ভয় দেখাইয়া

[১] Asutosh Bhattacharyya, 'The Cult of Sasthi in Bengal', *Man in India*, XXVIII (1948), 152-162.

থাকি, মনে হয় এই জুজু শিশুর পিতামহদেরই প্রেতাত্মা ; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, উড়িষ্যার অস্ট্রিকভাষী শবর নামক উপজাতীয় লোক পিতামহ অর্থে জুজুমা কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকে এবং শিশুর কোনও পীড়া হইলে পূজার ব্যবস্থা করিয়া তাহার পিতামহের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিবার প্রয়াস পায়।[১] আদিম সমাজে এই প্রকার পিতৃপুরুষের পূজা হইতেই পরবর্তী কালে দেবপূজা সমাজে প্রবর্তিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু আর্য সমাজে প্রবেশ করিবার পূর্বে কবে কোন্ অনার্য সমাজ হইতে মৃত পিতৃপুরুষের আত্মার পরিকল্পনার সূত্র ধরিয়া ষষ্ঠীদেবীর পরিকল্পনার সর্বপ্রথম উন্মেষ হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিয়াও বলিতে পারা যাইবে না। প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কারের ফলে অনুমান করা যায় যে, সমাজে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শিশুর রক্ষয়িত্রী এক 'গৃহ-দেবতা'র অস্তিত্ব ছিল। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার খননকার্যের ফলে কতকগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি মাতৃমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দেবতা একদিকে 'গৃহ-দেবতা' (guardian deity of the house) ও অন্যদিকে নবজাত শিশুর রক্ষয়িত্রী বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন।[২]

বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজের হারীতীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। হারীতীর সঙ্গে ষষ্ঠীর একটু পার্থক্য আছে। হারীতী শিশু-অপহরণকারিণী, অর্থাৎ শিশুমৃত্যুর কারণ; সেইজন্যই তাঁহার এই নাম। তাঁহার পূজা দ্বারা নবজাত শিশুর মৃত্যুর আশঙ্কা দূর করা হয়, তাঁহার চরিত্রের মধ্যে অনিষ্টকারী গুণটিই প্রধান। কিন্তু ষষ্ঠী শিশুর রক্ষয়িত্রী, তাঁহার চরিত্রের মধ্যে কল্যাণগুণই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে— অতএব বৌদ্ধ হারীতী ও পৌরাণিক ষষ্ঠী দুই স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। বাংলাদেশে হারীতীর অনুরূপ আর একটি লৌকিক দেবীচরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়—তাঁহার নাম জাতাপহারিণী, অর্থাৎ যিনি নবজাত শিশুকে হরণ করিয়া থাকেন। মনে হয়, হারীতী ও জাতাপহারিণী অভিন্না, ষষ্ঠীদেবীর সঙ্গে ইঁহাদের কাহারও মৌলিক কোন সম্পর্ক নাই। ষষ্ঠী চরিত্রের মধ্যে তাঁহার অনিষ্টকারিণী (malignant) শক্তি অপেক্ষা তাঁহার ইষ্টকারিণী (beneficent) শক্তিই অধিকতর প্রবল। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত মাতৃকা-মূর্তিগুলির মধ্যে প্রধানতঃ

---

[১] আফ্রিকার দক্ষিণ নাইজেরিয়া অঞ্চলের আদিবাসীদিগের কথ্যভাষায় ভূত অর্থে জুজু শব্দ ব্যবহৃত হয়। (Feild Museum of Natural History, Anthropological Series Vol. XXI., No. 1, Chicago, 1931, p. 15).

[২] E. Mackay, *The Indus Civilization* (London, 1935), 67.

যে সকল গুণের অস্তিত্ব অনুমান করা হইয়া থাকে, ষষ্ঠীর মধ্যেও তাহাই বর্তমান থাকিতে দেখা যায়। বাংলার লৌকিক দেবদেবী চরিত্রের মধ্যে ষষ্ঠীর এই বিষয়ক বৈশিষ্ট্যটি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই বাংলার সমাজে সূতিকা গৃহে শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠীদেবীর পূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৃন্দাবন দাস কর্তৃক রচিত 'চৈতন্যভাগবতে' চৈতন্যদেবের জন্মের ষষ্ঠ দিবসে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠীপূজার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ইহার বহু পূর্ব হইতেই ইহা সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে ইহার বিধান রহিয়াছে। এই বিষয়ে বাংলার প্রতিবেশী কোন কোন আদিম সমাজের সঙ্গে বাংলায় অনুষ্ঠিত আচার-সমূহের আশ্চর্য রকম ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়; মনে হয়, ইহাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক রহিয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক পল্লীতে ষষ্ঠীতলা নামক একটি স্থান থাকে—ষষ্ঠীদেবী সাধারণতঃ এই স্থানে অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া বিশ্বাস। সন্তানের মঙ্গল কামনায় বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়, কিংবা নির্দিষ্ট ষষ্ঠীপূজার তিথিতে সেইখানে গিয়া দেবতার নামে পূজা নিবেদন করা হয়। যে সকল গ্রামে বারোয়ারী ষষ্ঠীতলা নাই, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে, সেখানে সাধারণতঃ গৃহে দেবীর অর্চনা করা হইয়া থাকে। ষষ্ঠীতলায় কিংবা গৃহে পূজিতা ষষ্ঠীদেবীর সাধারণতঃ কোন মূর্তি নাই, অনেক স্থলে প্রস্তরনির্মিত মনসার মূর্তি ষষ্ঠী বলিয়া পূজিতা হয়। যদিও প্রাচীন ভাস্কর্যে অনেক হারীতীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথাপি সুনির্দিষ্ট ষষ্ঠীদেবীর মূর্তির সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। অন্ততঃ বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্যে যে সকল দেবীমূর্তি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের কোনটিকেই সুনির্দিষ্ট ভাবে ষষ্ঠীদেবীর মূর্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না—শিশু আস্তিক-ক্রোড়া মনসার মূর্তিই সাধারণতঃ ষষ্ঠী বলিয়া পূজিতা হইয়াছে—পশ্চিম বাংলার সর্বত্রই মনসাতলা ও ষষ্ঠীতলা অভিন্ন স্থান, উভয় দেবীই সেখানে একই স্থানে পূজিতা হইয়া থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রাচীন ভাস্কর্যে মনসা যে স্থানটুকু অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, ষষ্ঠীদেবী তাহা পারেন নাই। তাঁহার পূজার প্রচলন আরও সীমাবদ্ধ ছিল—মনে হয়, তাহা স্ত্রী-সমাজ অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কয়েকটি অর্বাচীন পুরাণে তাঁহার সামান্য উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। শিশুর সঙ্গে জননীর সম্পর্কই নিকটতর, সেইজন্য শিশুর রক্ষয়িত্রী দেবী

ষষ্ঠীও প্রধানতঃ স্ত্রী-সমাজের পূজ্যা। সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পটভূমিকা হইতে বিভিন্ন স্ত্রী-দেবতার উদ্ভব হইয়া কালক্রমে যেমন এক চণ্ডী নামের মধ্যে আসিয়া একত্ব লাভ করিয়াছে, তেমনই বিভিন্ন কালে সমাজের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক পটভূমিকা হইতে বিভিন্ন রূপে শিশুর রক্ষয়িত্রী রূপিণী বিভিন্ন দেবতা বলিয়া কল্পিত হইয়া কালক্রমে তাহাদের সকলেই এক ষষ্ঠী নামের মধ্যে আসিয়া একত্ব লাভ করিয়াছে। এই দেবীর ষষ্ঠী নাম হইবার একমাত্র কারণ এই যে, তিনি প্রধানতঃ শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে কৃত জাতকর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—ষষ্ঠ দিবসের স্ত্রী-দেবতা বলিয়াই তাঁহার নাম ষষ্ঠী; এতদ্ব্যতীত শিশু-সম্পর্কিত দেবীর ষষ্ঠী নাম হইবার আর কোন কারণ নাই। দেবীর এই ষষ্ঠী নামটিই পরবর্তী কালে শিশুর রক্ষয়িত্রী বলিয়া কল্পিত সকল দেবী কিংবা মৃত পিতামহী কিংবা মাতামহীর আত্মার উপর প্রযোজ্য হইতে থাকে। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাংলা দেশে বৎসরের বার মাসে এই বিভিন্ন প্রকৃতির ষষ্ঠীর পূজা হইয়া থাকে, যেমন বৈশাখে ধূলা ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী, আষাঢ়ে কোড়াষষ্ঠী, শ্রাবণে লোটনষষ্ঠী, ভাদ্রে মন্থনষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গাষষ্ঠী, কার্ত্তিকে গোটষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে মূলাষষ্ঠী, পৌষে পাটাইষষ্ঠী, মাঘে শীতলষষ্ঠী, ফাল্গুনে অশোকষষ্ঠী এবং চৈত্রে লালষষ্ঠী। মূলতঃ ইঁহারা সকলেই শিশুর রক্ষয়িত্রী দেবী ছিলেন, ইঁহারা এখনও একমাত্র স্ত্রী-সমাজ কর্তৃক পূজিতা, তবে ইঁহাদের মৌলিক পরিচয় প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে,—অনেককে বাহির হইতে দেখিলে ইঁহাদের সঙ্গে আদৌ যে শিশুর কোন সম্পর্ক ছিল, তাহা মনে হয় না। মূলতঃ ইঁহাদের কাহারও নাম ষষ্ঠী ছিল বলিয়া মনে হয় না,—কারণ, যে দেবী শিশুর ষষ্ঠ দিবসে অনুষ্ঠিত জাতকর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই ষষ্ঠী নাম হওয়া উচিত। শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার করিয়া দেখিলে অন্য কাহারও নাম ষষ্ঠী হইতে পারে না। কিন্তু কালক্রমে এই নামটি শিশু ও জননীর সম্পর্কিত সকল লৌকিক দেবীর উপরই প্রযোজ্য হইতে থাকে। যে দেবী শিশুর ষষ্ঠ দিবসের জাতকর্মের অধিষ্ঠাত্রী, তিনি জন্ম-ষষ্ঠী নামে বিশিষ্টতা লাভ করেন। তবে তিনি সূতিকাষষ্ঠী নামে অধিকতর পরিচিত। জন্ম-ষষ্ঠীর পূজাচার ও তাঁহার সম্পর্কিত ব্রতকথা উল্লিখিত সকল ষষ্ঠীর পূজাচার ও ব্রতকথা হইতে স্বতন্ত্র। কালক্রমে উক্ত দ্বাদশ রকমের ষষ্ঠীর মধ্য হইতে একটি ষষ্ঠী বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন—তাঁহার নাম অরণ্যষষ্ঠী বা প্রচলিত কথায় জামাই ষষ্ঠী। আম্রফল এই পূজার একটি বিশিষ্ট উপকরণ বলিয়া

কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষতঃ পাবনা বগুড়া জিলায় ইহা আমষষ্ঠী নামে পরিচিত। ইহার পূজা প্রকৃতপক্ষে কন্যার সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে জামাতার সম্বর্ধনা। বাংলার সমাজে জামাতার একটু বিশেষ অধিকারবশতঃই তাহার সম্পর্কিত এই অনুষ্ঠানটি এ'দেশের সমাজে কালক্রমে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে। উল্লিখিত দ্বাদশ প্রকৃতির ষষ্ঠীর মধ্যে পূর্ব বঙ্গে একমাত্র অরণ্যষষ্ঠীর বা জামাইষষ্ঠীর পূজাই প্রচলিত আছে—ইহা ছাড়া আর কোন ষষ্ঠীর পূজা স্ত্রী-সমাজে সেখানে অজ্ঞাত। সূতিকাষষ্ঠীর পূজা বাংলার বাহিরেও সর্বত্রই প্রচলিত আছে।

অরণ্যষষ্ঠী কিংবা জামাইষষ্ঠীর কাহিনী লইয়া দুই একটি মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগের বাংলায় রচিত হইয়াছিল; সাধারণতঃ এই সম্পর্কে যে কাহিনী পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে বর্ণনা করা যাইতেছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অরণ্যষষ্ঠীর মাহাত্ম্য-সূচক কাহিনীটি এক নহে। নিম্নলিখিত কাহিনীটি খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম বঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই একখানি প্রাচীন ষষ্ঠীমঙ্গল-কাব্য রচিত হইয়াছিল—

সপ্তগ্রামে শক্রজিৎ নামক এক রাজা ছিলেন। ষষ্ঠীদেবী নিজের পূজা প্রচার করিতে গিয়া ভাবিলেন, যদি শক্রজিৎ তাঁহার পূজা করে, তবেই উচ্চতর সমাজে তাঁহার পূজা সহজে প্রচারলাভ করিতে পারে। ইহা ভাবিয়া তিনি এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করিলেন। তারপর শক্রজিতের রাণীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'গঙ্গাস্নান করিবার জন্য আমি বর্ধমান হইতে আসিয়াছি, আজ অরণ্যষষ্ঠী পূজার দিন। তোমাকে আমি সঙ্গে করিয়া লইব ও ষষ্ঠীর পূজা করাইব।' রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ষষ্ঠীর পূজা করিলে কি হয়?' বৃদ্ধা বলিলেন, 'তুমি রাণী, সংসারের দুঃখকষ্ট কিছুরই ধার ধার না। সেইজন্যই ষষ্ঠীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছুই জান না। ষষ্ঠীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, মন দিয়া শোন'—

সায়বেণে নামে এক বণিক ছিল। ষষ্ঠীর কৃপায় তাহার স্ত্রী সাতটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। বণিকের স্ত্রী তাহার সাত পুত্রবধূ লইয়া সর্বদা কায়মনে ষষ্ঠীর পূজা করিত। একদিন ষষ্ঠীপূজার আয়োজন শেষ করিয়া শাশুড়ী ছোট পুত্রবধূটিকে সেখানে রাখিয়া নিজে কি কাজের জন্য বাহিরে চলিয়া গেলেন। ছোট বউ গর্ভবতী ছিল। পূজার দ্রব্য নিজে খাইয়া ফেলিবার জন্য তাহার অত্যন্ত লোভ হইতে লাগিল, অবশেষে কিছুতেই লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া কিছু কিছু দ্রব্য খাইয়া ফেলিল। শাশুড়ী যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন সে বলিল যে, এক কালো

বিড়াল সকল খাইয়া গিয়াছে। কালো বিড়াল ষষ্ঠীর বাহন। যখন কালো বিড়াল শুনিতে পাইল যে, ছোট বউ নিজে পূজার সামগ্রী খাইয়া তাহার উপর মিথ্যা করিয়া দোষ চাপাইয়াছে, তখন সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং মনে মনে ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। যথাসময়ে ছোট বউ একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল, কালো বিড়াল শিশুটিকে সূতিকা-গৃহ হইতে মুখে করিয়া লইয়া পলাইয়া গেল। এই ভাবে ছোট বউ ক্রমে ছয়টি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল—কালো বিড়াল একে একে ছয়টিকেই সূতিকা-গৃহ হইতে হরণ করিল। ছোট বউ পুনরায় গর্ভবতী হইল। যথাসময়ে প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইলে সে এইবার অরণ্যের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল এবং সেখানেই একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। শিশুটিকে কোলে লইয়া সে সারারাত জাগিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু শেষ রাত্রির দিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এই সুযোগে কালো বিড়াল তাহার কোল হইতে শিশুটিকে লইয়া পলাইয়া গেল। ছোট বউ সহসা জাগিয়া উঠিয়া দেখিতে পাইল যে, কালো বিড়াল শিশুটিকে মুখে করিয়া পলাইতেছে। ছোট বউ তাহার পিছন পিছন ছুটিয়া গেল, কিন্তু বেশী দূর যাইতে পারিল না, কিছু দূর গিয়াই হুমড়ি খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কালো বিড়াল শিশুটিকে মুখে করিয়া ষষ্ঠীদেবীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট বউর উপর এই নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিবার জন্য কালো বিড়ালকে ষষ্ঠীদেবী তিরস্কার করিলেন। তারপর তিনি নিজে যেখানে ছোট বউ মাটিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া ছিল, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ছোট বউ তাঁহার প্রতি ভক্তিমতী নহে বলিয়া ষষ্ঠীদেবী অনুযোগ দিলেন, তাঁহার পূজার সামগ্রী খাইয়া ফেলিবার জন্য তাহার যে অপরাধ হইয়াছে, সে বিষয়েও তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন। কিন্তু তিনি তাহার সকল অপরাধই ক্ষমা করিলেন। তাহার সাতটি পুত্রই তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। গৃহে ফিরিয়া ছোট বউ ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিল। শত্রুজিতের রাণী ছদ্মবেশিনী বৃদ্ধার নিকট হইতে ষষ্ঠীদেবীর এই মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া নিজেও মহাসমারোহে তাঁহার পূজা করিলেন। এই ভাবে ষষ্ঠীদেবীর পূজা রাজপরিবারের মধ্যে প্রচার লাভ করিল।—

ষষ্ঠীমঙ্গলের কবিগণ—কৃষ্ণরাম ও রুদ্ররাম

উপরোক্ত কাহিনী লইয়া যে সকল মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যখানিরই সন্ধান পাওয়া যায়,[১] এই কৃষ্ণরাম দাস পূর্বালোচিত কালিকা-মঙ্গলের কবি। কৃষ্ণরাম তাঁহার ষষ্ঠীমঙ্গল রচনার কাল যে ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ১৬০১ শকাব্দ বা ১৬৭৯ খৃস্টাব্দে তাঁহার ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। ইহাতে সপ্তগ্রামের একটি বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা হইতে বাংলার এই প্রাচীন নগরের অতীত ঐশ্বর্য সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। তখন পর্যন্তও সপ্তগ্রামের স্মৃতি এই দেশের সমাজে জাগরূক ছিল। কৃষ্ণরাম রচিত ষষ্ঠীমঙ্গলের কোন সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় না। এখানে যে পুঁথিখানির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা খণ্ডিত। কৃষ্ণরাম রচিত ষষ্ঠীমঙ্গলের উদ্ধৃত কাহিনীটি অদ্যাপি পশ্চিম বঙ্গ অঞ্চলে অরণ্যষষ্ঠীর ব্রতকথায় প্রচলিত আছে।

ইহার পর আর একজন কবির রচিত ষষ্ঠীমঙ্গলের কথা উল্লেখ করিতে হয়, তাঁহার নাম রুদ্ররাম চক্রবর্তী।[২] তাঁহার কাব্যখানি নিম্ন বঙ্গ, বিশেষতঃ খুলনা জিলায়ই প্রচলিত ছিল—অন্যত্র বিশেষ প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। কাব্যমধ্যে কবির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না ; কেবল এই মাত্র জানিতে পারা যায় যে, কবির পিতার নাম গঙ্গারাম, তাঁহার উপাধি ছিল বিদ্যাভূষণ। কাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি একটি বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, একবার কবির কন্যা গুরুতর রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তখন ষষ্ঠীদেবী কবিকে স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার মাহাত্ম্যসূচক একখানি কাব্য রচনা করিতে আদেশ দেন। তাঁহারই আদেশ পালন করিতে গিয়া কবি তাঁহার ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যখানি রচনা করেন। ইহার ফলেই কবির কন্যা রোগমুক্ত হন।

রুদ্ররামের সময় কিংবা তাঁহার কাব্যরচনার কাল সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে কিছুই জানিতে পারা যায় না। পূর্বোদ্ধৃত অরণ্যষষ্ঠীর কাহিনী তাঁহার বর্ণিতব্য বিষয় নহে। তাঁহার বিষয়বস্তু প্রধানতঃ সংস্কৃত পুরাণ হইতে গৃহীত। মনে হয়, ষষ্ঠীদেবীর কাহিনী-সম্পর্কিত লৌকিক ধারাটির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন না,

১ গ-স, ৫৬৭৪ ; ২ ইঁহার একখানি অসম্পূর্ণ ও আধুনিকতা-প্রাপ্ত পুঁথি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (আশুতোষ দত্ত সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৩৯ সাল)।

কিংবা সংস্কৃত পুরাণের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বশতঃ তিনি পুরাণকেই উপজীব্য করিয়া লৌকিক ধারাটিকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্য তের পালায় বিভক্ত,—এই তের পালায় মোট তিনটি কাহিনী ব্যক্ত করা হইয়াছে, প্রথম কাহিনীটি পৌরাণিক চরিত্র কার্ত্তিকেয়কে অবলম্বন করিয়া লিখিত,—কাহিনী-ভাগ সম্পূর্ণই পুরাণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় কাহিনীটি ক্ষেত্রমিশ্র নামক এক রাজার ষষ্ঠীদেবীর বরে পুত্র ও রাজ্যলাভের বৃত্তান্ত লইয়া এবং তৃতীয় কাহিনীটি কলাবতীর উপাখ্যান লইয়া রচিত। শেষোক্ত কলাবতীর উপাখ্যানটি লৌকিক কোন জনশ্রুতি হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। উক্ত তিনটি কাহিনীতে রুদ্ররাম যে উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কোনটিরই বঙ্গদেশে প্রচলিত ষষ্ঠীদেবী সম্পর্কিত কোন কাহিনীর সঙ্গে মিল নাই,—এই হিসাবে রুদ্ররামের রচনা বাংলা ষষ্ঠীমঙ্গল সাহিত্যের মূল ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন। ভাষা বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, রুদ্ররাম খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার ভাষা সুপরিচ্ছন্ন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ, প্রকৃত কবিত্বের স্পর্শ তাহাতে এক প্রকার নাই বলিলেই চলে।

কবিচন্দ্র ও গুণরাজের ভণিতায় ষষ্ঠীমঙ্গলের পদ পাওয়া যায় বলিয়া জানিতে পারা যায়।[১] কিন্তু তাঁহাদের পরিচয় কিছুই জানা যায় না।

শঙ্কর

সম্প্রতি শঙ্কর নামক একজন কবির একখানি ষষ্ঠীমঙ্গলের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার বিষয়ে এ' যাবৎ কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।[২] মেদিনীপুর জিলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এই কবির ষষ্ঠীমঙ্গল এখনও গীত হয়। কবি তাঁহার রচিত ষষ্ঠীমঙ্গলে এইভাবে আত্ম-পরিচয় এবং কাব্য রচনার কাল নির্দেশ করিয়াছেন,

আদ্য বসু চন্দ্রকলা শেষে রাণী পাটনীলা (?)
নাম যার ছিদাম সুদাম।
রাণীর বাজারে স্থিতি যশোমতী পুণ্যবতী
বিশালাক্ষী পদে যার আশ॥

১ বিশ্বকোষ ১৮, ৭৫

২ মেদিনীপুর জিলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল হইতে শ্রীভূপতি দত্ত এই কবির দুইখানি পুঁথির সন্ধান পাইয়াছেন।

তাহার অনুজ শ্যাম (?) সীতারাম তার নাম
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবর্ধন।
তাহার অনুজ ভাই ষষ্ঠীর আদেশ পাই
শ্রীকবি শঙ্করে রসগান ॥

এই পাঠটিতে নানা ভ্রমপ্রমাদ আছে স্বীকার করিয়া লইলেও 'আঘ্য বসু চন্দ্রকলা' অর্থাৎ ১৬৮১ শকাব্দ বা ১৭৫৯ খৃস্টাব্দে তাঁহার কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তিনি শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র হইতে যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি তাহা তাঁহার উদ্ধৃত পাঠদুষ্ট আত্ম-পরিচয় হইতেও বুঝিতে পারা যায়। সীতারাম যে তাঁহার পিতার নাম এবং গোবর্ধন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহা অন্যান্য ভণিতায়ও উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্কর রচিত ষষ্ঠীমঙ্গলের কাহিনীটি কৃষ্ণরাম দাসের কাহিনী হইতে স্বতন্ত্র ; তাহা সংক্ষেপে এই—

একদিন সুলোচনাকে ষষ্ঠীদেবী জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় গেলে তাঁহার পূজা প্রচারিত হইবে। সুলোচনা বলিলেন, দিলীপনগরে জয়সিংহ নামে এক রাজা আছেন, তাঁহার সাত রাণী, কিন্তু পুত্রকন্যা নাই। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধরিয়া তুমি ভিক্ষা করিবার ছলে রাজার কাছে যাও এবং রাজার নিকট পূজা চাহিয়া লও ; রাজা অস্বীকৃত হইলে ঘাটের কূলে অপেক্ষা করিও, ছোটরাণী ঘাটে আসিলে তাহাকে পুত্রবর দিও। এই ভাবেই রাজবাড়ীতে তোমার পূজা প্রচারিত হইবে। ষষ্ঠীদেবী তাহাই করিলেন। রাজা রাজসভা হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তিনি ঘাটের কূলে ছোটরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহেন। ছোটরাণী বলিলেন, 'আমার কোনও ধনের অভাব নাই, আমি তোমার নিকট কি বর চাহিব ?' তখন ষষ্ঠীদেবী বলিলেন, 'সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধন পুত্র, তাহাই তোমার নাই,

পর্বত প্রমাণ যদি গৃহে ধন রহে।
অপুত্রির মৃত্যু কালে রাজা সব লহে ॥
কাণা খড়া হইয়া যদি পুত্র থাকে ঘরে।
মৃত্যুকালে অবহেলে পিণ্ড দান করে ॥'

ছোটরাণীকে ষষ্ঠীদেবী পুত্রবর দিলেন। যথাসময়ে তিনি এক পুত্র প্রসব করিলেন, ইহাতে অন্যান্য রাণীগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহার শিশু পুত্রকে জলে ফেলিয়া দিলেন। রাজাকে মিথ্যা করিয়া সংবাদ দেওয়া হইল যে, ছোটরাণী ইট, কাঠ, মুড়া

ঝাঁটা প্রসব করিয়াছে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ছোটরাণীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু পাত্রমিত্রের কথায় শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে ঘোড়াশালে বন্দিনী করিয়া রাখিলেন। ষষ্ঠীদেবী ছোটরাণীর সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,

বেঁচে আছে তব পুত্র জলের ভিতরে।
এস বাছা দুগ্ধ দিয়া আসিবে সত্বরে॥

রাণী ষষ্ঠীদেবীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া শিশুকে স্তন্যপান করাইয়া আসিলেন। ষষ্ঠীদেবী ছোটরাণীকে নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া পুনরায় ঘোড়াশালে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। এ' সংবাদ শুনিয়া রাজা ছোটরাণীকে দ্বিচারিণী বলিয়া সন্দেহ করিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তারপর রাণীর অনুনয়ে তিনি সরোবরে গিয়া ষষ্ঠীদেবীর সাক্ষাৎ পাইলেন। দেবী তখন সাতটি শিশু লইয়া আবির্ভূত হইলেন।

ডালেতে বসিয়া যেন পক্ষী করে রা।
সেই মত শব্দ করে পাইয়া নিজ মা॥

শিশুদের দেখিয়া রাজা পরম বিস্মিত হইলেন। ষষ্ঠীদেবী করুণাপরবশ হইয়া তাঁহার অবশিষ্ট ছয়টি রাণীকে এক একজনকে এক একটি করিয়া ছয়টি শিশু উপহার দিলেন। সেই হইতেই দিলীপনগরে ষষ্ঠীপূজা প্রচারিত হইল।

শঙ্করের কাহিনীতে যে ষষ্ঠীদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, তাঁহার নাম জলষষ্ঠী বলিয়া কবি উল্লেখ করিয়াছেন,

জলষষ্ঠী নাম মোর জগতে খ্যাতি।
প্রথমে করিল পূজা শ্রীহরি পার্বতী॥

বাংলাদেশে বার মাসে যে বার রকম ষষ্ঠীর পূজা হয়, তাহাদের মধ্যে জলষষ্ঠীর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না ; তবে শীতল ষষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায় ; কিন্তু তাহার পরিচয় স্বতন্ত্র। শিশুকে 'জলের ফাঁড়া' হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য জলষষ্ঠীর পরিকল্পনা হওয়া স্বাভাবিক। শঙ্করের রচনায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট অনুভূত হয়। এই সম্পর্কে ছোটরাণীর সাধভক্ষণের বর্ণনাটির সঙ্গে মুকুন্দরামের অনুরূপ বর্ণনার তুলনা করা যাইতে পারে। ইহা মুকুন্দরাম রচিত কালকেতু-কাহিনীর নিদয়ার সাধভক্ষণের বর্ণনা হইতেই আনুপূর্বিক গৃহীত হইয়াছে।

বাথুয়া টলটলি তৈলেতে পাক।
ডগডগি ভাজা ছোলার শাক॥

চুনার চড়চড়ি কুমুড়ার বড়ি।
সরল সফরি ভাজা চিঙ্গুড়ি॥
যদি ভাল পাই মহিষা দই।
ফেলে চিনি কিছু মিশায়ে থই॥
পাকা চাঁপা কলা করিব জড়।
খেতে মনে সাধ করেছে বড়॥
কনক থালাতে অন্ন যে ঢালি।
কাঞ্জিকা সহিত করিয়া মেলি॥
হেন কাঁজি খাইতে মনে যে ভায়।
কচি কচি মূলা বেগুন তায়॥
আমরা লুফাড়ি পাকা চাল্‌তা।
আম্‌লি কাগুণ্ডি কুল করঞ্জা॥
থোড় ডম্বুর যে ইলিশ মাছে।
পাইলে মুখের অরুচি ঘুচে॥
হিয়া ধক্‌ধকি অন্তরে ভোক।
মুখে নাহি রুচে এ বড় শোক॥
দুধে তিলে গুড়ে মিলায়ে লাউ।
দধির সহিত ক্ষুদের জাউ॥
চিনি চাঁপা কলা দুধের সর।
কহ বড় দিদি শুন গো আর॥
ঝুনা নারিকেল চিনির গুড়া।
কহি আপনার সাধের চূড়া॥
কি কহিব আর অধিক মনে।
শ্রীকবি শঙ্করে সঙ্গীত ভনে॥

মঙ্গলকাব্যে এক কবির রচনা অন্য কবি যে কি ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন, ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

সারদা-মঙ্গল

সারদা বা সরস্বতী বৈদিক দেবতা, তিনি বিদ্যা ও চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যদিও পরবর্তী কালে পৌরাণিক সাহিত্যে তাঁহার পূর্ববর্তী বৈদিক পরিকল্পনার কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছিল, তথাপি বৈদিক কাল হইতে পৌরাণিক কাল পর্যন্ত তাঁহার মৌলিক গুণাবলীর মধ্যে বিশেষ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। বাংলার সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে এই দেবীকে অবলম্বন করিয়া কয়েকখানি মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, মঙ্গলকাব্যের বাঙ্গালী কবিগণ তাঁহার বৈদিক কিংবা পৌরাণিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-সমূহ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া মঙ্গলকাব্যের স্ত্রী-দেবতার চরিত্রের অনুরূপ, তাঁহার চরিত্র পুনর্গঠন করিয়া লইয়াছিলেন—দেবতার নামটি বৈদিক হইলেও তাঁহার অন্তরটি বাঙ্গালী কবির নিজস্ব পরিকল্পনা-অনুযায়ী নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছিল। এই দেবী-সম্পর্কিত মঙ্গলকাব্য একটিও অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে,—পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্যহীন আদর্শ ও রচনারীতি ইহাদের রচনায়ও নিয়োজিত হইয়াছিল—কাহিনী-পরিকল্পনায় কিংবা রচনায় ইহাদের মধ্যে কোন মৌলিক কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। দেবতার কল্পিত মাহাত্ম্য রচনা করাই ইহার উদ্দেশ্য—মানবিক চরিত্র বিকাশ ইহাদের লক্ষ্যও ছিল না, কিংবা ইহার কবিদিগের দ্বারা তাহা ফুটাইয়া তোলা সম্ভবও ছিল না। বিদ্যার মাহাত্ম্য প্রচার করাই এই মঙ্গল-কাব্যের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া অশিক্ষিত সাধারণ সমাজে ইহার কোন প্রচার ছিল না। সাধারণতঃ কোন ধনিসন্তানের বিদ্যারম্ভ উপলক্ষ্যে ব্যবসায়ী গায়েন কর্তৃক সময়োপযোগী এই সারদা-মঙ্গল গীত হইত। সরস্বতী পূজার সময়ও ধনিগৃহে এই গানের অনুষ্ঠান হইত। কিন্তু বর্তমান কালের মত সরস্বতীপূজা সেকালে এত ব্যাপক ছিল না। এই সকল কারণেই সারদা-মঙ্গলের প্রচার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এই বিষয়ক একখানি মাত্র কাব্য এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দয়ারাম নামক একজন কবির রচিত।[১] দয়ারাম রচিত সারদা-মঙ্গলের কাহিনীটি এইরূপ—

সুরেশ্বর নামক রাজ্যে সুবাহু নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। রাজার

---

১ ক ৩৭৮০

কোন পুত্রসন্তান ছিল না। সেইজন্যই অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করিয়াও তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। অবশেষে তিনি পুত্রের জন্য কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন, তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব তাঁহাকে পুত্রবর দান করিলেন। পুত্রের নাম রাখা হইল লক্ষধর। পুত্রের যখন সাত বৎসর বয়স, তখন রাজা তাঁহার কুলগুরু গৌরীদাস পণ্ডিতের হস্তে তাহার শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। তাহার বিদ্যারম্ভ-সময়ে মহাসমারোহে সরস্বতী দেবীর পূজা করা হইল, গৌরীদাস সানন্দচিত্তে রাজপুত্রের শিক্ষার ভার লইলেন। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রাজপুত্রকে নাগরী (হিন্দী), পারসী, বাংলা, উড়িয়া ইত্যাদিতেও যথার্থ শিক্ষিত করিয়া দিবার জন্য গৌরীদাসকে নির্দেশ দেওয়া হইল। বার বৎসর যাবৎ গুরু রাজপুত্রকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন বিষয়েই তাহার সাধারণ জ্ঞানও জন্মাইতে পারিলেন না। পূর্বজন্মকৃত তাহার কোন পাপের জন্য দেবী সরস্বতী তাহার উপর বিরূপ ছিলেন, এই জন্যই সে এই জন্মে সাধারণ বর্ণজ্ঞানও লাভ করিতে পারিল না। গুরু রাজার নিকট সমস্ত খুলিয়া বলিলেন এবং তাঁহাদ্বারা রাজপুত্রের আর কিছু হইবে না, তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিলেন। রাজা তাঁহার পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কোটালকে তাহার শিরশ্ছেদ করিবার আদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, মূর্খ পুত্র থাকার চাইতে অপুত্রক থাকা ভাল। কোটাল রাজপুত্রকে লইয়া বধ্যভূমিতে গেল। দেখিয়া সরস্বতীর অত্যন্ত দয়া হইল। তিনি কোটালের কানে কানে বলিলেন, 'আমার আদেশ, ইহাকে মুক্ত করিয়া দাও, রাজা তোমাকে কিছু বলিবেন না'। কোটাল রাজপুত্রকে মুক্ত করিয়া দিল। তারপর একটা শিয়াল মারিয়া তাহার রক্ত আনিয়া রাজাকে দেখাইয়া বলিল, 'রাজপুত্রকে বধ করিয়া আসিয়াছি'। লক্ষধর একাকী এক গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে কোথায় যাইবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য দেবী সরস্বতী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে একটি পাতার কুটির নির্মাণ করিয়া সেই বনেই বাস করিতেছিলেন। লক্ষধর সেই কুটিরে আশ্রয় পাইল, ছদ্মবেশিনী ব্রাহ্মণী তাহার প্রতি পরম সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন এবং তাহাকে নিজের পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। একদিন ব্রাহ্মণী লক্ষধরকে একাকী কুটিরে রাখিয়া নিজে কি কাজে বাহির হইয়া গিয়াছেন। কুটিরের এক কোণে একটি পুঁথি ছিল—তাহাতে রাধাকৃষ্ণের নাম লেখা। লক্ষধর পুঁথিটি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া যখন কিছুই বুঝিতে পারিল না, তখন তাহা ছুঁড়িয়া নিকটবর্তী নদীর জলে ফেলিয়া

দিল—পুঁথিটি জলে ভাসিতে লাগিল—তাহা হইতে রাধাকৃষ্ণের নামটি ধুইয়া গেল। স্বর্গ হইতে দেবতাগণ তাহা দেখিতে পাইলেন, এই পবিত্র গ্রন্থটি জল হইতে উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য তাঁহারা নারদকে মর্ত্যলোকে পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণী যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন পুঁথিটি দেখিতে না পাইয়া ইহার সন্ধান করিলেন—পরে সকল বিষয় জানিতে পারিলেন। লক্ষধরকে এইজন্য তিনি কঠিন শাস্তি দিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু পরমুহূর্তে তাহাকে নিরক্ষর ও অজ্ঞান বলিয়া ক্ষমা করিলেন। ব্রাহ্মণী নিজের মূর্তি ধারণ করিলেন, লক্ষধরকে সেখান হইতে বৈদেব নামক রাজ্যে যাইতে বলিলেন। তিনি তাহাকে বলিয়া দিলেন যে, সেখানে গিয়া তাহার নিজের পরিচয় গোপন করিয়া সেখানকার রাজকন্যাদিগের ভৃত্যরূপে সেবা করিতে হইবে—এই ভাবে চারি বৎসরকাল কাটিলে পর সে সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত হইতে পারিবে। রাজকন্যাদিগের শিক্ষাগুরুর নাম জনার্দন ওঝা—তাঁহার নিকট হইতে তাহাকে পরোক্ষে বিদ্যালাভ করিতে হইবে। লক্ষধর বৈদেব রাজ্যে আসিল। এখানে আসিয়া সে রাজকন্যাদিগের ভৃত্যের পদ লাভ করিল—তাহার নাম দেওয়া হইল ধূলাকুট্যা। কিছুদিন পরে যখন সরস্বতী পূজার সময় আসিল, তখন তাহাকে পূজার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হইল। পূজার দ্রব্যসামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিল,—কিন্তু শেষ রাত্রির দিকে সে আর কিছুতেই থাকিতে পারিল না, নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই দেখিতে পাইল, এক বৃদ্ধা পূজার সামগ্রীগুলি খাইয়া ফেলিতেছে। সে তাহাকে চোর বলিয়া ধরিয়া ফেলিল, এবং প্রহার করিতে লাগিল। বৃদ্ধা স্বমূর্তি ধারণ করিলেন; ধূলাকুট্যা দেখিল, তিনি দেবী সরস্বতী। তিনি তাহাকে বর দিলেন,—অল্পদিনের মধ্যেই সে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইবে। ধূলাকুট্যা এ'কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। গুরু জনার্দন তাঁহার শিষ্যা রাজকন্যাদিগের প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি তাহাদিগকে তাঁহার অধীত সমস্ত বিদ্যায় শিক্ষিতা করিয়া দিতে এক সর্তে সম্মত হইলেন যে, তাহাদিগকে তাঁহার সঙ্গে পলাইয়া যাইতে হইবে। রাজকন্যাদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ এত প্রবল ছিল যে, ইহার জন্য তাহারা কুলে জলাঞ্জলি দিতেও রাজী হইল—ইহা যে তাহাদের পক্ষে কত বড় কলঙ্কের কথা, তাহা তাহাদের অপরিণত বুদ্ধিতে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এই উদ্দেশ্যে রাত্রিযোগে একটি নৌকা সংগ্রহ করা হইল—দেবী সরস্বতী এখানে অন্তরায় হইয়া জনার্দনের

সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিলেন। কারণ, তাঁহার ইচ্ছা যে, তাঁহার অনুগৃহীত ছদ্মবেশী রাজপুত্রই এই কন্যাদিগকে বিবাহ করুক। তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন—তাহার ফলে জনার্দন নিজের গৃহে বন্দী হইয়া রহিল এবং ধূলাকুট্যাই তাঁহার স্থান গ্রহণ করিয়া নৌকায় আরোহণ করিল। সরস্বতী স্বয়ং নৌকার হাল ধরিয়া বসিলেন। রাজকন্যাগণ পূর্বেই আসিয়া নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল—তাহারা দেবীর এই কৌশল তখন জানিতেও পারিল না। রাত্রি যখন ভোর হইয়া গেল, তখন তাহারা ধূলাকুট্যাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। ক্রমে তাহারা সকল ব্যাপার জানিতে পারিল এবং অগত্যা ধূলাকুট্যাকেই তাহাদের স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। নৌকা রাজা সুবাহুর রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিল। ইতিমধ্যে সুবাহুর রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে—তিনিও দারিদ্র্যের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছেন। বিজয় দত্ত নামক এক বণিকের গৃহে ধূলাকুট্যা তাহার পত্নীসহ আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিল। দেবীর অনুগ্রহে সুবাহুর নিকট হইতে ধূলাকুট্যা প্রভূত পতিত জমি লাভ করিল এবং তাহাতে এক নগর পত্তন করিল। একদিন ধূলাকুট্যা তাহার গৃহে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিল, তাহাতে সে নিকটবর্তী সকল রাজ্যের রাজাকেই নিমন্ত্রণ করিল। সুবাহুও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন, কিন্তু তাঁহার দারিদ্র্যব্যঞ্জক পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখান হইল না। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কোটালকে আদেশ দিলেন, 'ইহাকে বন্দী করিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া ইহার শিরশ্ছেদ কর।' কোটাল তাহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল, কিন্তু এইবারও পূর্বেকার মত তাহাকে মুক্তি দিল। রাজা এই কথা জানিতে পারিলেন, জানিবামাত্র তিনি কোটালের শিরশ্ছেদ করিবার আদেশ দিলেন। এইবার সরস্বতী স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া রাজার নিকট সকল কাহিনী বিস্তৃত ভাবে ব্যক্ত করিলেন। কোটাল রাজপুত্রের জীবন-রক্ষা করিয়াছিল শুনিয়া তিনি তাহাকে মুক্তি দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। পিতাপুত্রে মিলন হইল—রাজকন্যাগণ রাজপুত্রের বধূরূপে সসম্মানে রাজান্তঃপুরে গৃহীত হইল।

সরস্বতী বৈদিক দেবী হইলেও উদ্ধৃত কাহিনীতে তাঁহার বৈদিক কিংবা পৌরাণিক চরিত্রের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এখানে তাঁহার শুধু বৈদিক নামটিই গ্রহণ করা হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক শাক্তদেবীর মতই

এখানে তাঁহার পরিকল্পনা করা হইয়াছে—নিজের পূজা প্রচার করিতে গিয়া মঙ্গলকাব্যের দেবতাগণ যেমন তাঁহাদিগের নির্বাচিত ভক্তকে অনুগ্রহ ও অন্যকে নিগ্রহ করিয়া থাকেন—এখানেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি কাহিনীটির মধ্যে লক্ষ্য করিবার মত কতকগুলি বিষয় আছে। সরস্বতী দেবী এখানে মূর্খকেই অনুগ্রহ করিতেছেন—বিদ্যার যাঁহারা গুরু, যেমন গৌরীদাস কিংবা জনার্দন, তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার কোন সহানুভূতি নাই, গৌরীদাস রাজপুত্রকে শিক্ষাদান করিতে ব্যর্থকাম হইল ও হতভাগ্য জনার্দন তাঁহারই চক্রান্তে তাহার নিষ্ফল প্রণয়-স্বপ্ন লইয়া নিজের গৃহে বন্দী জীবন কাটাইতে লাগিল। যদিও বিদ্যা ব্রাহ্মণেরই ব্যবসায় এবং এখানে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরই মাহাত্ম্য-কীর্তন করা হইয়াছে, তথাপি এখানেও কোন ব্রাহ্মণ চরিত্রই কোন বিশেষ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। তবে কোন মঙ্গলকাব্যেই যেমন ব্রাহ্মণ চরিত্র কোন উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিতে পারে নাই, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই কাহিনীটির মধ্য হইতে মধ্যযুগের বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত কতকগুলি মূল্যবান উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। ইহার মধ্যে বিদ্যালাভের বিনিময়ে রাজকন্যাদিগের কুলবিসর্জন ও গুরু জনার্দনের পাপাভিলাষ সম্পর্কে যে নির্ভীক ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা সমসাময়িক বাংলার সামাজিক অবস্থারই প্রত্যক্ষচিত্র, না কবিকল্পনার ফল মাত্র তাহা কে বলিবে ?

এই কাহিনীটি কোথা হইতে আসিল ? মনে হয়, বিষ্ণুশর্মা রচিত 'পঞ্চতন্ত্র' নামক পুস্তকের 'কথামুখ' অংশের নিম্নোদ্ধৃত সুপরিচিত সংস্কৃত শ্লোকটি হইতেই এই কাহিনীর প্রেরণা আসিয়াছে,—

> অজাতমৃতমূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম্।
> যতস্তৌ স্বল্পদুঃখায় যাবজ্জীবং জড়ো দহেৎ ॥
> কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ভক্তিমান্।
> কিং তয়া ক্রিয়তে ধেন্বা যা ন সূতে ন দুগ্ধদা ॥

মনে হয়, প্রধানতঃ এই শ্লোকটিকেই ভিত্তি করিয়া পরবর্তী মঙ্গলকাব্য রচনার গতানুগতিক রীতিতে দয়ারামের এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে, ইহার আর কোনও স্বাধীন ভিত্তি ছিল না। রচনাখানির বিশেষ কোন কাব্যগুণ নাই, তবে ইহার মধ্যে যে সমাজচিত্রটির আভাস পাওয়া যায়, তাহা সুনিপুণ হস্তের রচনা।

কিন্তু এই সমাজ বাংলার প্রাচীন সমাজ বলিয়া মনে হয় না—তাহা খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের সমাজ হওয়াই সম্ভব।[১]

সারদা-মঙ্গল বা 'সারদা-চরিত্রে'র কবি দয়ারামের সময় সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারা যায় না। কাব্যমধ্যে তিনি নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রপিতামহের নাম রমেন্দ্রজিৎ, পিতামহ পরীক্ষিৎ এবং পিতার নাম জগন্নাথ। কিশোরচক পরগণার কাশীযোড়ায় তাঁহার নিবাস ছিল। ইহা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত। স্থানীয় জমিদারের অনুগ্রহে তিনি সেই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানে বাসকালীনই তাঁহার কাব্য রচনা করেন। দয়ারামের পদবী ছিল দাস। তাঁহার ভাষা ও রচনাভঙ্গি দেখিয়া মনে হয়, তিনি খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই বর্তমান ছিলেন। দয়ারামের কাব্যখানি ক্ষুদ্রাকৃতি; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার যে পুঁথি সংগৃহীত আছে, তাহা মাত্র কুড়িটি পাতায় সম্পূর্ণ—প্রতি পাতায় আটটি করিয়া মাত্র চরণ। ইহা পনরটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালায় বিভক্ত। ইহার রচনা পাঁচালীর লক্ষণাক্রান্ত, এবং প্রায় কাব্যগুণ-বিবর্জিত; 'সারদার পাঁচালী' নামই ইহার যথার্থ পরিচয়।

সারদা-মঙ্গল বা সরস্বতী-মঙ্গল কাব্যের আর একজন কবির নাম জানিতে পারা যায়, তিনি বীরেশ্বর।[২] এই কবির সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে ইঁহার কাহিনী দয়ারাম রচিত উল্লিখিত কাহিনী হইতে স্বতন্ত্র,—সংস্কৃত সাহিত্যে সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস, বররুচি প্রভৃতির আখ্যায়িকা বর্ণনাই ইহার উদ্দেশ্য।

খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ময়মনসিংহ সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ বাহাদুর কর্তৃক 'ভারতী-মঙ্গল' নামক একখানি কাব্য রচিত হয়।[৩] সংস্কৃত কবি কালিদাস সম্পর্কিত একটি লৌকিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত—তিনি সরস্বতীকুণ্ডে স্নান করিয়া কি ভাবে যে অপার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব লাভ করিলেন, ইহাতে তাহাই বর্ণিত আছে—মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক লক্ষণ ইহাতে নাই। ইহার ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট।

উক্ত কয়েকখানি রচনা ব্যতীত মধ্যযুগের বাংলায় এই বিষয় অবলম্বন করিয়া আর কোন কাব্যরচনার কথা জানিতে পারা যায় না।

---

১ কাব্যখানি ডক্টর শ্রীতমোনাশ দাশগুপ্ত কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত হইয়া একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজি ভূমিকাসহ প্রকাশিত হইয়াছে (*J. D. L.* XXIII, pp. 1-30), XXIX (pp.30-81)

২ ব, ২৭১৩; সা-প-প ৪৮, ১৪৮ ৩ আরতি (ময়মনসিংহ) ৩, ১৬৮; সা-প-প ১২, ২৩১

রায়মঙ্গল

আদিম মানব-সমাজের সহিত পশু-জগতের যে সম্পর্ক ছিল, বর্তমান সমাজের সেই সম্পর্ক নাই।[১] প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ ও পশু নিত্য প্রতিবেশী ছিল এবং পরস্পর আত্মরক্ষার জন্য সমভাবে সচেষ্ট থাকিত। জাগতিক পরিবর্তনের নিয়মে মানুষ আত্মরক্ষায় দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, অথচ অরণ্যবেষ্টিত বাসভূমি মধ্যে অবস্থান করিয়া পশু-জগতের সান্নিধ্য হইতেও অধিক দূরে সরিয়া আসিতে পারিতেছে না। অতএব নানা দৈব উপায়ে মানুষ হিংস্র পশুকুলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় সন্ধান করিতেছে। তাহারই ফলে সমাজের বিশেষ বিশেষ পশুর অধিষ্ঠাতা এক একজন দেবতা কল্পনা করিয়া তাঁহার পূজা দ্বারা অত্যাচারী পশুদিগকে প্রসন্ন করিবার প্রয়াস দেখা দিয়াছে। এই ভাবেই মানব-সমাজে পশুপূজার উৎপত্তি হইয়াছে। ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের পূজাও এই পশুপূজার অন্তর্গত।

ভারতীয় প্রাগার্য সমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্যাঘ্রের পূজা প্রচলিত ছিল। মহেঞ্জোদরোতে যে প্রাচীন শিবলিঙ্গ পাওয়া যায়, তাহার পার্শ্বেই ব্যাঘ্রের আকৃতি কতকগুলি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ভারতের প্রাচীন অনার্য সমাজের দেবতা শিব বাঘাম্বর বা কৃত্তিবাস এবং ব্যাঘ্রচর্মই তাঁহার আসন। সম্ভবতঃ ব্যাঘ্রই প্রাচীনতম শিবের বাহন ছিল, তারপর সমাজে গো-পূজা আরম্ভ হইলে পর, তাঁহাকে বৃষভ-বাহন করিয়া তাঁহার পরিধেয় বসন ও আসনে ব্যাঘ্রচর্মটি রক্ষা করা হইয়াছে। শিব দেবতার সহিত এই একটি বিশেষ পশুর সংস্রব হইতে ইহাই মনে হয়, প্রাচীনতম সমাজের ব্যাঘ্রোপাসনা শৈব ধর্মের মধ্যে পরবর্তী কালে আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। উত্তর ভারতে আর্য-সমাজের বহির্ভূত অংশে ব্যাঘ্রপূজা যে বিশেষ প্রচলন লাভ করিয়াছিল, তাহার আরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজপুতানায় 'বাঘেল রাজপুত' বলিয়া একটি সম্প্রদায় আছে। সম্ভবতঃ তাহা প্রাচীনতম কোন ব্যাঘ্রোপাসক সম্প্রদায়েরই বংশধর। মধ্য ভারতেও ব্যাঘ্রোপাসক

---

[১] Asutosh Bhattacharyya, 'The Tiger-cult and its Literature in Lower Bengal' : *Man in India*, XXVII (1947), 44-56.

এক সম্প্রদায় আছে। তাহারা ব্যাঘ্রের পূজা করে এবং কখনও ব্যাঘ্র শিকার করে না। সাহেবরা যদি বাঘ ধরিবার জন্য কোন ফাঁদ তৈয়ার করে, তাহা হইলে এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণ রাত্রিকালে সেই ফাঁদের নিকটে গিয়া অরণ্য মধ্যে বাঘের উদ্দেশ্যে বলিতে থাকে যে, এই ফাঁদ তাহারা নির্মাণ করে নাই, কিংবা তাহাদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াও নির্মিত হয় নাই ; অতএব এইজন্য তাহাদিগের কোন অপরাধ নাই। রাজপুতানার ভীলেরা নিজেদের ব্যাঘ্রবংশজ বলিয়া মনে করে। নেপালে 'বাঘযাত্রা' বলিয়া এক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাও এক প্রকার ব্যাঘ্রেরই পূজা, ব্যাঘ্রের মুখোস্ পরিয়া পূজারীরা নৃত্য করিয়া থাকে। নেপালে বাঘের দেবতার নাম 'বাঘভৈরব'। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর অঞ্চলে বাঘেশ্বর নামে এক ব্যাঘ্র-দেবতা নিম্নশ্রেণীর সমাজ কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। ছোট নাগপুরের সাঁওতালদিগের মধ্যেও ব্যাঘ্রের পূজা প্রচলিত আছে। বিহারের কিষাণেরাও কোন কোন স্থানে 'বনরাজা' বলিয়া এক ব্যাঘ্রদেবতার পূজা করিয়া থাকে। মধ্যপ্রদেশে হোসাঙ্গাবাদের কুর্কু জাতি 'বাঘদেও' বলিয়া এক বাঘের দেবতার পূজা করে, বেরারেও এই বাঘদেওর পূজা প্রচলিত আছে। হোসাঙ্গাবাদের ব্যাঘ্রের পূজারীদিগকে ভোম্কা বলে ; তাহারা নিম্নশ্রেণীর লোক, গ্রামে বাঘ আসিয়া উপদ্রব করিলে এই ভোম্কারা গিয়া বাঘদেওর নিকট পূজা দেয়। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সর্বত্র অনুরূপ ব্যাঘ্র-পূজার প্রচলন আছে। ত্রিচিনপল্লী জিলায় এক গ্রামে ব্যাঘ্র-মূর্তির উপর আসীন তিনটি পুরুষমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা প্রাচীন কোন ব্যাঘ্র-দেবতা হইবেন। দাক্ষিণাত্যে, বিশেষতঃ কর্ণাট অঞ্চলে, এই প্রকার আরও ব্যাঘ্র দেবতার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়।[১]

উপরের উল্লেখ হইতেই জানা যায় যে, অরণ্যচারী জাতির মধ্যেই ব্যাঘ্র-পূজা সবিশেষ প্রচলিত আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, পশুপূজার প্রবৃত্তি মূলতঃ নিম্নশ্রেণীর সমাজ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে এবং ইহা উন্নত আর্য দেব-পরিকল্পনার বিরোধী। বঙ্গদেশও বহুকালাবধিই অরণ্যাকীর্ণ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের গৌরব সুন্দরবনের প্রসিদ্ধ

১ এই সম্পর্কিত বিস্তৃততর আলোচনার জন্য W. Crooke, II, 211-15, H. Whitehead, 98, Verrier Elwin, *The Agaria* (Bombay, 1943), 78, *Folk-Tales of Mahakoshal* (Bombay, 1944), 393, 416, 424, *The Baiga* (London, 1939) 351 ; S. Hivali, *The Pardhans* (Bombay, 1946), *JAnth SB* III, 45-60, 158-63, *JASB* LXV (1896), 1-8 ; *JAnth S B* IV (1895), 80-9 ; VIII (1907), 113-35 ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

ব্যাঘ্র এই দেশের অতি আদিম অধিবাসী। সেইজন্য ব্যাঘ্র-পূজা বঙ্গদেশেও বহুকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। মধ্যভারতে সাধারণতঃ কোন কোন স্থানে যে প্রণালীতে ব্যাঘ্র-পূজা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সঙ্গে বাংলায় অনুষ্ঠিত প্রাচীন ব্যাঘ্র-পূজার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। ইহা হইতেই মনে হয়, এই পূজার বিশিষ্ট কোন পদ্ধতি বাংলার বাহির হইতে এই দেশে আনীত হয় নাই। নাগরিক জীবনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্র-ভীতি এই দেশের সমাজে আর নাই বলিলেই চলে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের বসতি ঘনসন্নিবিষ্ট; সুন্দরবনের অরণ্য ব্যতীত ঘন অরণ্যও এই দেশে বিশেষ নাই; সুন্দরবনও অনেকদিন হইতেই লোকালয়ে পূর্ণ হইতেছে; সেইজন্য ব্যাঘ্র-পূজা এই দেশে বিশেষ প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। নাগরিক জীবনের প্রসারের পূর্বে এই বিশিষ্ট পশু-পূজা সমাজে সম্ভবতঃ প্রবর্তিত হইয়াছিল; কিন্তু এখন ইহার অনুষ্ঠানের কথা বিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলা দেশে প্রচলিত ব্যাঘ্রোপাসনার সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত বহির্বাংলার ব্যাঘ্রোপাসনার পার্থক্য আছে। উল্লিখিত নিম্নজাতিসমূহের মধ্যে ব্যাঘ্রকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুলকেতু (totem) বলিয়া মনে করা হয়—তাহারা ব্যাঘ্রের কোন অনিষ্ট করে না—ইহাদের কেহ কেহ নিজদিগকে ব্যাঘ্রের বংশধর বলিয়া মনে করে। কিন্তু বাংলা দেশে ব্যাঘ্রের সঙ্গে কাহারও সেই সম্পর্ক নাই। এ'দেশে সুবিধা পাইলে ব্যাঘ্র বধ করিতে বাধা নাই—কেবল মাত্র ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই এখানে ব্যাঘ্র-দেবতার পূজা করা হইয়া থাকে। সাপের ওঝার মত সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাঘ্রেরও ওঝা আছে, তাহারা মন্ত্রবলে ব্যাঘ্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে বলিয়া দাবী করে।

নিম্নবঙ্গে ব্যাঘ্রের অধিকারী দেবতা বলিয়া একটি দেবতাকে কল্পনা করা হইয়া থাকে, তাঁহার নাম দক্ষিণ রায়। বাংলার দক্ষিণ দিকের অধিকারী দেবতা বলিয়া তাঁহার নাম দক্ষিণ রাজ বা দক্ষিণ রায়। বাংলার দক্ষিণেই প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রের বাসভূমি সুন্দরবন অবস্থিত; সেইজন্যই ইহার দেবতাকেও দক্ষিণ দিকের অধিকারী বলিয়াই কল্পনা করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন, দক্ষিণ রায় সুন্দরবনের একজন প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন, তিনি বহু ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর ধনুর্বাণে শিকার করেন, তাঁহার চরিত্রটিই দেবত্বে পরিণত হয়। এই দক্ষিণ রায় নাকি যশোহর জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি ছিলেন, তিনি নিম্নবঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপাধি ছিল ভাটীশ্বর বা আঠার ভাটি বা বিভাগের

অধীশ্বর।[১] অবশ্য এই সকল কাহিনীর মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই। দক্ষিণ রায়কে লইয়া যে দুই একটি মঙ্গলকাব্য রচিত হয়, তাহাই রায়মঙ্গল নামে পরিচিত। দক্ষিণ রায় বাংলার নিজস্ব লৌকিক দেবতা,[২] সংস্কৃত পুরাণাদিতে তাঁহার কোন উল্লেখ নাই। বাংলার নিজস্ব লৌকিক দেবতাদিগের মধ্যে তিনি অন্যতম পুরুষ চরিত্র। অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বাঘের দেবতা সর্বত্রই পুরুষ। বাংলা দেশেও তাঁহার পরিকল্পনা উন্নত সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি দিব্যকান্তি-বিশিষ্ট, ব্যাঘ্রাসীন ও তাঁহার হস্তে ধনুঃশর। দেবতার এই সুন্দর পরিকল্পনা আদিম প্রস্তরোপাসক সমাজের দেব-কল্পনা হইতে অনেক মার্জিত; সেইজন্য মনে হয়, ইহার উদ্ভব অনেক পরবর্তী এবং পৌরাণিক প্রভাব-যুক্ত। কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহার কোন পূর্ণাঙ্গ মূর্তির পরিবর্তে তাঁহার মৃন্ময় মুণ্ড মাত্র পূজিত হয়। মুণ্ডটিকে সাধারণতঃ দক্ষিণদর দেবতা বলা হইয়া থাকে। স্থানীয় জনশ্রুতি এই—শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়িয়া আসিয়া এই অঞ্চলে পতিত হয়—ইহা সেই মুণ্ড এবং তদবধি ইহা ব্যাঘ্র-ভয় নিবারণ-কল্পে এই অঞ্চলে পূজিত হইতেছে।[৩] বলা বাহুল্য, এই লৌকিক দেবতাকে পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য দিবার জন্যই পরবর্তী কালে এই কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে। একটি বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই অঞ্চলে সুবৃষ্টির জন্যও দক্ষিণ রায়ের পূজা করা হইয়া থাকে।

দক্ষিণ রায় দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া যে কয়খানি মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একখানির মাত্র বর্তমানে সন্ধান পাওয়া যায়।[৪] তাহাতে কাহিনীটি এই প্রকার—

বড়দহে পুষ্পদত্ত নামে এক বণিক বাস করিতেন—তিনি রতাই বাউল্যা নামক এক ব্যক্তির উপর সমুদ্রগামী কয়খানি ডিঙ্গা নির্মাণ করিবার উপযুক্ত কাঠ সংগ্রহ করিবার ভার দিলেন। রতাই তাহার ছয় ভাই ও একমাত্র পুত্রকে লইয়া কাঠ সংগ্রহ করিতে সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রচুর কাঠ সংগৃহীত হইল, ছয় সাতটি নৌকা একেবারে বোঝাই হইয়া গেল। যখন তাহারা ফিরিবার উপক্রম

১ S. C. Mitra, 'On a Musalmani Legend', *J. D. L.* X. 167; *JAnth S B* XI (1918), 438-54.

২ S. C. Mitra, 'The Cult of Dakshin Roy in Southern Bengal', *Hindustan Review*, Jan., 1623, 167-71.

৩ *JASB* XI (1915), pp. 175 ff.

৪ ক ১৭৭৮

করিল, তখন একটি সুবৃহৎ বৃক্ষের দিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। গাছটি কাটিয়া মাটিতে ফেলা হইল। সেই গাছটিতে দক্ষিণ রায় বাস করিতেন,—তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ছয়টি বিশ্বস্ত ব্যাঘ্রকে আদেশ দিলেন—'রতাইর ছয় ভাইকে বধ কর, রতাই ও তাহার পুত্রের কিছু করিও না।' তৎক্ষণাৎ আদেশ পালিত হইল। ভ্রাতৃশোকে রতাই প্রাণবিসর্জনের সঙ্কল্প করিল। এমন সময় দক্ষিণ রায় দৈববাণী করিলেন—সে যদি নিজের পুত্রকে বলি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে পারে, তবে ছয় ভাইয়ের জীবন ফিরিয়া পাইবে। রতাই তাহাই করিল। তাহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া দক্ষিণ রায় তাহার ছয় ভাই ও পুত্রকে ফিরাইয়া দিলেন। সকলকে লইয়া রতাই বড়দহে ফিরিল। সুদক্ষ ডিঙ্গি-নির্মাতা দ্বারা পুষ্পদত্ত সাতটি সমুদ্রগামী ডিঙ্গা নির্মাণ করাইলেন। ডিঙ্গার পূজা করিয়া পুষ্পদত্ত সর্বোৎকৃষ্ট ডিঙ্গাটির নাম রাখিলেন, মধুকর। তারপর রাজার নিকট গিয়া সমুদ্র-যাত্রার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পুষ্পদত্তের পিতা সমুদ্র-বাণিজ্যে গিয়া বহুকাল যাবৎ নিরুদ্দিষ্ট, তাঁহার অনুসন্ধানের জন্যই পুষ্পদত্তের এই সমুদ্র-যাত্রা। রাজা প্রথমতঃ আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহার দৃঢ়তা দেখিয়া শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিলেন। ডিঙ্গা সাজাইয়া পুষ্পদত্ত পিতার সন্ধানে বাহির হইলেন, মাতা সুশীলা চোখের জলে সন্তানকে বিদায় দিলেন। পুত্রকে বলিয়া দিলেন, বিপদে পড়িলে যেন সর্বদা দক্ষিণ রায়ের কথা স্মরণ করে। পুত্রকে বিদায় দিয়া তিনি দক্ষিণ রায়ের পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া দক্ষিণ রায় তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, যে-কোন বিপদ হইতে তিনি তাঁহার পুত্রকে রক্ষা করিবেন। বড়দহ পিছনে ফেলিয়া পুষ্পদত্ত ক্রমে কল্যাণপুর, হোগ্‌লাপাথরঘাটা, বারাসত পার হইয়া খনিয়ায় আসিয়া পৌছিলেন। খনিয়ায় পুষ্পদত্ত দক্ষিণ রায়ের পূজা করিলেন। দক্ষিণ রায়ের থানের সম্মুখেই পীরের মোকাম দেখিতে পাইয়া কর্ণধারের নিকট ইহার উৎপত্তি ও ইতিহাস জানিতে চাহিলেন। একটি মৃত্তিকার বেদী ঘেরিয়া কয়েকজন ফকির বসিয়া ছিলেন—সেই মৃৎবেদীতে তাঁহারা পীরের উপাসনা করিতেছিলেন। সেখানেই দক্ষিণ রায়ের মুমুণ্ডও স্থাপিত ছিল। কর্ণধার বলিল—একবার দক্ষিণ রায় ও বড় গাজী খাঁর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়—কেহই কাহাকেও পরাজিত করিতে পারেন না। তাঁহাদের যুদ্ধের ফলে পৃথিবী রসাতলে যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ভগবান পৃথিবী রক্ষা করিবার জন্য অর্ধেক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্ধেক পয়গম্বর মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দিলেন।

সন্ধির সর্ত অনুসারে স্থির হইল যে, সমস্ত ভাটি অঞ্চল দক্ষিণ রায়ের অধিকারে থাকিবে, কালুরায় হিজ্‌লীর অধীশ্বর থাকিবে, বড় গাজী খাঁ সর্বত্র সম্মান লাভ করিবেন—বড় গাজী খাঁর সমাধি ও দক্ষিণ রায়ের মুণ্ড সর্বত্র পূজিত হইবে। তখন হইতেই বড় গাজী খাঁকে সমাধির প্রতীক মৃত্তিকা বেদী এবং দক্ষিণ রায়ের মুণ্ডের প্রতীক একটি মৃন্মুণ্ড একত্র পূজিত হইতেছে। এই কাহিনী শুনিয়া পুষ্পদত্ত সেখানে বড় গাজী ও দক্ষিণ রায়ের পূজা করিলেন। তারপর পুনরায় যাত্রা করিলেন। ছত্রভোগ পার হইয়া মগরা অতিক্রম করিয়া গেলেন, তারপর গঙ্গা-সাগরে প্রবেশ করিলেন। মার্তণ্ড রাজার রাজ্য অতিক্রম করিয়া উড়িষ্যার উপকূলে গিয়া পৌছিলেন, এইভাবে রামেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামেশ্বর হইতে তাঁহারা শ্রীহত্যাদহ, কাঁকড়াদহ এবং জোকাদহ অতিক্রম করিয়া গেলেন। এইবার তাঁহারা সমুদ্র-মধ্যবর্তী রাজদহে আসিয়া পৌছিলেন। সেখানে পুষ্পদত্ত এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে পাইলেন—যেন সমুদ্রবক্ষে এক বিচিত্র নগরী জলের উপর ভাসিতেছে। দৃশ্য দেখিয়া পুষ্পদত্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন। পুষ্পদত্ত তাঁহার সঙ্গীদিগকেও এই দৃশ্য দেখিতে বলিলেন; তাহারা বলিল, তাহারা সম্মুখে জল ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না—ইহাতে পুষ্পদত্তের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। অবশেষে পুষ্পদত্ত গিয়া তুরঙ্গ নগরে উপস্থিত হইলেন, সাত ডিঙ্গা লইয়া তীরে ভিড়াইলেন। সংবাদ শুনিয়া রাজা কোটালকে আগন্তুকের সংবাদ জানিবার জন্য পাঠাইলেন। উপযুক্ত ভেট লইয়া পুষ্পদত্ত রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন,—পথের দুই ধারে রাজধানীর ঐশ্বর্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি রাজা সুরথের সম্মুখে নীত হইলেন। পুষ্পদত্তের অল্প বয়স দেখিয়া রাজা সুরথ তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পুষ্পদত্ত বলিলেন, আমার পিতা দেবদত্ত বহুকাল নিরুদ্দিষ্ট, তাঁহার সন্ধানের জন্য আমি আসিয়াছি। রাজা তাঁহার পিতৃভক্তির প্রশংসা করিলেন, তারপর কি ভাবে এতদূর আসিয়া পৌছিলেন, সেই বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলেন। তাহা বর্ণনা-প্রসঙ্গে পুষ্পদত্ত সমুদ্র-বক্ষস্থিত পুরীর কথাও উল্লেখ করিলেন। রাজা সুরথ তাহা বিশ্বাস করিলেন না, বরং মিথ্যা কথা বলিবার জন্য পুষ্পদত্তকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পুষ্পদত্ত বলিলেন, 'আমার সঙ্গে আপনি চলুন, যদি আমি ইহা আপনাকে দেখাইতে না পারি, তবে আমার শিরশ্ছেদ করিবেন।' রাজা বলিলেন, 'বেশ, আর যদি তুমি ইহা আমাকে দেখাইতে পার, তবে তোমাকে আমার অর্ধেক রাজ্য ও আমার কন্যা দান

করিব।' পুষ্পদত্ত রাজা সুরথকে লইয়া রাজদহে গেলেন, কিন্তু মায়াপুরী দেখাইতে পারিলেন না। তিনি কারাগারে বন্দী হইলেন, পরদিন তাঁহার শিরশ্ছেদের আদেশ হইল। কারারুদ্ধ পুষ্পদত্ত দক্ষিণ রায়ের স্তব করিতে লাগিলেন। প্রসন্ন হইয়া দক্ষিণ রায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে অভয় দিলেন। পরদিন পুষ্পদত্তকে যখন শিরশ্ছেদের জন্য মশানে লইয়া যাওয়া হইল, তখন সহসা চারিদিক হইতে ব্যাঘ্র আসিয়া রাজপ্রহরীদিগকে আক্রমণ করিল—ক্রমে তুরঙ্গ সহরে ব্যাঘ্রের আক্রমণ ছড়াইয়া পড়িল—নগরের লোক প্রাণ লইয়া চারিদিকে ছুটিতে লাগিল, কেহ বা প্রাণ হারাইতে লাগিল। ব্যাঘ্রের আক্রমণে কোটালের দুর্গতির একশেষ হইল। রথে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ রায় স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া পুষ্পদত্তকে রক্ষা করিলেন; অবশেষে রাজা সুরথ স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন, দক্ষিণ রায় স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিলেন। যখন রাজান্তঃপুরে এই সংবাদ পহুঁছিল, তখন রাণী বিলাপ করিতে করিতে সহচরীদিগের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দক্ষিণ রায় রথে চড়িয়া শূন্যে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'আমার ভক্তকে অন্যায় ভাবে নির্যাতন করিবার জন্য তোমার স্বামীর প্রাণবধ করিয়াছি। বিলাপ করিয়া এখন আর কিছু ফল নাই; প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমার কন্যাকে পুষ্পদত্তের হাতে সমর্পণ করিবে ও প্রতিমা গড়িয়া আমার পূজার ব্যবস্থা করিবে। তাহা হইলে তোমার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়া পাইবে।' রাণী তাহাতেই সম্মত হইলেন। তখনই অমৃতকুণ্ড হইতে জলসিঞ্চন করিয়া দক্ষিণ রায় সুরথ রাজা ও তাঁহার মৃত সৈন্যদিগকে বাঁচাইয়া দিলেন। রাজা ও রাণী পরম আনন্দের সঙ্গে রাজকন্যা রত্নাবতীকে পুষ্পদত্তের হস্তে সমর্পণ করিলেন। দক্ষিণ রায় পুষ্পদত্তকে বলিলেন, 'তোমার পিতাও সুরথ রাজাকে সমুদ্রের মধ্যে মায়াপুরী দেখাইতে না পারিয়া রাজকারাগারে বন্দীজীবন যাপন করিতেছেন। এইবার তাঁহার মুক্তির উপায় কর।' পুষ্পদত্ত রাজাকে বলিয়া পিতার মুক্তি সাধন করিলেন। পিতাপুত্রে মিলন হইল। ডিঙ্গা সাজাইয়া পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া দেবদত্ত স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। মাতা সুশীলা পরম আহ্লাদের সঙ্গে তাঁহাদিগকে বরণ করিয়া লইলেন। দক্ষিণ রায়ের পূজা সর্বত্র প্রচার লাভ করিল।

দেখা যাইতেছে যে, দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বড় গাজী খাঁর যুদ্ধ বৃত্তান্তই এই কাহিনীর মৌলিক অংশ—এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অংশ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী

হইতে অবিকল গ্রহণ করা হইয়াছে। মনে হয়, দক্ষিণ রায় ও বড় গাজী খাঁর যুদ্ধ বৃত্তান্তের একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। সম্ভবতঃ সুন্দরবন অঞ্চলের অধিকার লইয়া ইঁহাদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল—পরে বিরোধের একটা আপোষ মীমাংসা হইয়াছিল।

এই কাহিনী লইয়া মুসলমান সমাজেও কোন কোন মুসলমান কবি কর্তৃক কাব্য রচিত হয়। ব্যাঘ্রের উপদ্রব হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সমান ভয়াবহ, সেইজন্য উভয় সম্প্রদায় একই উপায়ে এই উপদ্রবের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় সন্ধান করিয়াছে। নিম্নবঙ্গের বিশেষতঃ চব্বিশ পরগণা জিলার মুসলমান সমাজে প্রায় রায়মঙ্গলের অনুরূপ এক কাহিনী প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ উভয়ের মূল এক। মুন্সী বয়নদ্দীন সাহেব রচিত 'বনবিবি জহুরানামা'[১] নামক একখানি কাব্যে হিন্দু সমাজের কল্পিত দক্ষিণ রায় ও মুসলমান সমাজের কল্পিত বনবিবির একটি মিশ্র কাহিনী পাওয়া যায়। ইহাই রায়মঙ্গলের কাহিনীর মুসলমান সংস্করণ। ইহার মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর কোন প্রভাব নাই। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই,—

কলিঙ্গ নগরে এক সদাগর বাস করিত। একবার সে সুন্দরবনে মধু ও মোম সংগ্রহ করিবার জন্য নৌকা লইয়া যাত্রা করিল, সঙ্গে করিয়া তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রটিকেও লইল; তাহার নাম দুখে। দুখে তাহার দরিদ্রা বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান। একমাত্র পুত্রকে গভীর অরণ্যে পাঠাইয়া দুখের মাতা কাঁদিয়া বনবিবিকে ডাকিল,—

কাঙ্গালের মাতা তুমি বিপদনাশিনী।
আমার দুখেরে মাগো তরাবে আপনি॥

দলবল সহ সদাগর গিয়া গভীর বনে প্রবেশ করিল। দক্ষিণ রায়ের পূজা করিয়া সদাগর নৌকা হইতে অবতরণ করিল, দুখে নৌকার মধ্যেই রহিল, সদাগর ও তাহার লোকজন মধু আহরণের জন্য বনের অভ্যন্তরে চলিয়া গেল। সমস্ত দিন অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিয়া এক বিন্দুও মধু পাইল না, দক্ষিণ রায় ছলনা করিয়া বনের সমস্ত মধু গোপন করিয়া ফেলিলেন। অসীম নৈরাশ্যে সদাগর সন্ধ্যায় নৌকায় ফিরিয়া আসিল, অবসন্ন দেহে অল্পকাল মধ্যেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। দক্ষিণ রায় স্বপ্নে আবির্ভূত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সদাগর নিজের

১ পুঁথিখানি সর্বপ্রথম ১২৮৪ সালে মুদ্রিত হইয়া ৩৩৭।২ আপার চিৎপুর রোড, আফাজদ্দীন আহম্মদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

দুরবস্থার কথা জানাইল। দক্ষিণ রায় বলিলেন, 'তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব, কিন্তু তৎপূর্বে দুখেকে আমার নিকট বলি দিতে হইবে।' সদাগর প্রথমত ইহাতে অস্বীকৃত হইল, কিন্তু পরে মনে মনে তাহাকে দক্ষিণ রায়ের পায়ে বলি দিবে বলিয়া স্থির করিল। দক্ষিণ রায় প্রসন্ন হইয়া তাহার নৌকা বোঝাই করিয়া মোম ও মধু দিয়া দিলেন। দেশে রওয়ানা হইবার সময় সদাগর দুখেকে ঠেলিয়া নৌকা হইতে জলে ফেলিয়া দিয়া গেল। দুখে কোনমতে নদীর তীরে আসিল, অমনি দক্ষিণ রায় ব্যাঘ্রের রূপ ধরিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। দুখে চক্ষু মুদিয়া বনবিবিকে স্মরণ করিল, বনবিবি আসিয়া তাহাকে কোলে লইলেন, ব্যাঘ্ররূপী দক্ষিণ রায় পলাইয়া গেলেন। বনবিবির আদেশে তাহার ভ্রাতা জঙ্গলী দক্ষিণ রায়কে বন হইতে তাড়াইয়া দিতে গেল। দক্ষিণ রায় তাড়িত হইয়া জেন্দা গাজী (বা বড় গাজী খাঁ)র শরণাপন্ন হইলেন। জেন্দা গাজী তাঁহাকে অভয় দিলেন। বনবিবি দক্ষিণ রায়কে ক্ষমা করিলেন।

এই কাহিনীতে যেমন দক্ষিণ রায়ের উপর বনবিবিরই মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, রায়মঙ্গলের পরিণামে দক্ষিণ রায়েরই প্রতিষ্ঠা নির্দেশ করা হইয়াছে।

রায়মঙ্গলের কবিগণ

রায়মঙ্গল কাব্যের একজন পরবর্তী কবি কৃষ্ণরাম এই কাব্যের আদি কবি বলিয়া মাধব আচার্যের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায় মাধব আচার্যের রচিত কাব্যে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার পরবর্তী আর একজন কবিকে তাহা রচনা করিবার জন্য স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন,—

পূর্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য॥

এই মাধব আচার্য যে কে, তাহা জানিতে পারা যায় না। তাঁহার রচিত রায়-মঙ্গলের পুঁথিও পাওয়া যায় না।

ইহার পরই কবি কৃষ্ণরাম তাঁহার 'রায়মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।[১] মঙ্গল-কাব্যের গতানুগতিক নিয়মানুসারে কবি কৃষ্ণরামও তাঁহার গ্রন্থোৎপত্তির একটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা পরবর্তী পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিতেছি,—

---

[১] ক ১৭৯৮

শুনহ সকল ধীর অপূর্ব কথন।
যেমতে রচিল এই কবিতা রচন॥
খাসপুর পরগণা নামে মনোহর।
বড়িস্থা তাহার এক তপ বিশাম্বর॥
তথায় গেলাম ভাদ্র মাস সোমবারে।
নিশিতে শুইলাম গোয়ালার গোল ঘরে॥
রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপীঠে আরোহণ এক মহাজন॥
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায়॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠার ভাটীর মধ্যে হইবে প্রচার॥
পূর্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য॥
মশান নাহিক তাহে সাধু গেলে পাশা।
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা॥
মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়ন।
অন্য গীত করাইয়া গায় জাগরণ॥
কাকুটি নাকুটি করে আর রঙ্গি ভঙ্গি।
পরম কৌতুকে শুনে মউল্যা মলঙ্গি॥[১]

দক্ষিণ রায় কবিকে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত করিবার জন্য আর একটু বিশেষ ক্ষমতা তাঁহার হাতে দিয়া গেলেন, তাহা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় একটু অভিনব। তিনি বলিয়া দিলেন,

তোমার কবিতা যার মনে নাই লাগে।
সংবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে॥[২]

যে তাঁহার কাব্যকে অনাদর করিবে, তাহাকে বাঘ দিয়া ধরিয়া খাওয়াইবার ক্ষমতা তিনি কবির হাতে দিয়া দিলেন। তথাপি কবি নিজেকে 'শিশু' বলিয়া

---

১ ঐ ১৭; ২ ঐ

গীত-রচনায় অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, দেবতা তখন নিজের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া কবিকে শুনাইলেন, ইহাতেই—

রায়ের চরণ-চারু অরবিন্দ ভাবি।
রচিল পাঁচালী ছন্দ কৃষ্ণরাম কবি॥

কবি তাঁহার কাব্যরচনার কাল-সম্বন্ধেও গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।
বসু শূন্য ঋতুচন্দ্র শকের বৎসর॥[১]

ইহা হইতেই দেখা যায় যে, ১৬০৮ শক বা ১৬৮৬ খৃস্টাব্দে কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' কাব্য রচিত হয়। কবির আত্ম-পরিচয় সম্বন্ধে গ্রন্থ-মধ্যে উল্লেখ আছে,—

নিমিতে গ্রামেতে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়স্থ কুলেতে উৎপতি।
হইয়া যে একচিত, রচিয়া রায়ের গীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি॥[২]

কবির বাসস্থান নিমিতা। অতএব এই কৃষ্ণরাম ও কালিকা-মঙ্গলের কবি কৃষ্ণরাম অভিন্ন ব্যক্তি। এই নিমিতা সম্বন্ধে স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় লিখিয়াছেন,—'কলিকাতা হইতে চারি ক্রোশের মধ্যে, বেলঘরিয়া স্টেশনের অর্ধক্রোশ পূর্বে, নিমিতায় কৃষ্ণরামের বাড়ী। তিনি যখন জীবিত ছিলেন, তখন কবি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। কারণ, এখনও নিমিতা গ্রামে দুই একজন লোক কবি কৃষ্ণরামের নাম করে, এবং তাঁহার ভিটা দেখাইয়া দেয়। সে ভিটায় একশত বৎসরেরও অধিককাল কেহ বাস করে না, অথচ প্রাচীন লোকেরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন—উহা কৃষ্ণরামের ভিটা; কৃষ্ণরামের বংশ নাই, কিন্তু তিনি নিজে নিঃসন্তান ছিলেন কিনা, কেহ বলিতে পারে না'।[৩]

কৃষ্ণরাম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, 'কালিকা-মঙ্গল' রচনাতেও তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে। কোন কোন স্থানে সংস্কৃত শ্লোকের বাংলা পদ্যানুবাদে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, যেমন,—

যদি করি পরিণয়, বহু পুত্র-কন্যা হয়
সহোদর ভাই নাহি মিলে।

[১] ঐ ২ক, পুঁথিতে 'চন্দ্র' স্থানে 'চয়' পাঠ। [২] ঐ ৩খ
[৩] সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩০০, ১১২-১৩

ইহার সঙ্গে মূল সংস্কৃত শ্লোকটি তুলনা করা যাইতে পারে—

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥

কিন্তু তিনি পণ্ডিত হইলেও তাঁহার রচনা সরল, তাঁহার 'কালিকা-মঙ্গলে'র আলোচনায়ও তাহা উল্লেখ করিয়াছি। 'রায়মঙ্গল' কালিকা-মঙ্গলের পরবর্তী রচনা, ইহার রচনাতেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণরামের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ রচনা-ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। রচনার একটু নিদর্শন উল্লেখ করা যাইতেছে। কাব্যের শেষে সদাগর কর্তৃক দক্ষিণ রায়ের এই স্তব বর্ণিত আছে,—

স্তব করে সদাগর হইয়া কাতর।
ভকত বৎসল তুমি গুণের সাগর॥
অপরাধ ক্ষমা কর বলি যোড় পাণি।
কৃপার সাগর প্রভু রায় গুণমণি॥
ইন্দু হেন বদন মদন জিনি রূপ।
তোমা বিনা দক্ষিণের কেবা আছে ভুপ॥

'রায়মঙ্গল' কাব্যখানি নাতিবৃহৎ। কিন্তু আজিও তাহা মুদ্রিত হয় নাই। কৃষ্ণরামের পর দ্বিজ হরিদেব ও বলরাম নামক দুইজন কবি একসঙ্গে একখানি রায়মঙ্গল কাব্য লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।[১] হরিদেবের হস্তলিখিত যে পুঁথিখানি পাওয়া যায়, তাহার লিপি-সমাপ্তির তারিখ ১৭২৩ খৃস্টাব্দ। বলরাম তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন, তিনি হরিদেবেরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে এবং হরিদেবের কাব্যেরই তিনি কোন কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন। রায়মঙ্গলের দেবতা লৌকিক দেবতা মাত্র। নিম্নবঙ্গেই ব্যাঘ্রের অত্যাচার অধিক বলিয়া সেইখানেই এই কাব্য ও দেবতার পরিকল্পনা উদ্ভূত হইয়াছিল, অন্যত্র ইহার প্রসার সম্ভব হয় নাই। উত্তরবঙ্গে পরিকল্পিত ব্যাঘ্র-দেবতার নাম সোনারায়।[২] সম্প্রতি তাঁহার সম্পর্কিত একটি আখ্যায়িকা-কাব্য মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।[৩] তাঁহার নামে উত্তরবঙ্গে বহু ছড়া প্রচলিত আছে—সুসংবদ্ধ কাহিনীযুক্ত রচনা বিশেষ নাই। মুসলমান কৃষকগণ সোনারায়কে পীর

১ পু-প ২২০
২ JDL VIII (1922), 141-72, 141-72; *JAnth SB* XIII (1925), 265-76.
৩ অজয়কুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত 'সোনা রায়ের গীত' (ধুবড়ী, ১৩৫৪)

বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। রাজসাহী জিলায় পৌষ-সংক্রান্তির দিন বাস্তু-পূজা উপলক্ষ্যে একটি ব্যাঘ্রের মৃন্মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করা হয়। কিন্তু তাঁহার যে প্রকৃত কি নাম, তাহা জানিতে পারা যায় না। তাঁহার সম্বন্ধে কোনও সুসংবদ্ধ কাহিনীও প্রচলিত নাই। পূর্ববঙ্গে 'বাঘাইর বয়াৎ' নামক ছড়াজাতীয় ব্যাঘ্র-বিষয়ক কিছু কিছু রচনার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়—কিন্তু এই বিষয়ক সুসংবদ্ধ কাহিনীযুক্ত আর কোন রচনার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায় না। প্রাচীন হিন্দু পুরাণ কিংবা হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্যে ব্যাঘ্র-বাহন কোন দেবতার সন্ধান পাওয়া যায় না। অতএব একান্তভাবে এই কাব্য ও দেবতা বাংলার বিশেষ একটি অঞ্চলের নিজস্ব কল্পনা-প্রসূত। নিম্নবঙ্গের মুসলমান সমাজকে আশ্রয় করিয়া বড় গাজী খাঁ, কালু গাজী খাঁ, বনবিবি প্রভৃতির সঙ্গে দক্ষিণ রায় আজিও বাঁচিয়া আছেন। হিন্দু সমাজে বড় গাজী খাঁ ও কালু গাজী খাঁর যেমন প্রতিপত্তি, তদ্দেশীয় মুসলমান সমাজে দক্ষিণ রায়েরও তেমনই প্রতিপত্তি রহিয়াছে। সমগ্র চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুরের দক্ষিণ ভাগে বড় গাজী, কালু গাজী ও দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতা বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান সমাজে সমভাবে শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছেন। সেইজন্য এই দেবতার সম্পর্কিত লোক-সাহিত্য এই উভয় সমাজেরই উপাদানে গঠিত হইয়াছে।

দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে আর একজন লৌকিক ব্যাঘ্র-দেবতার নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি কালু রায়। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গেই তাঁহার পূজা প্রচারিত আছে। তাঁহার সম্পর্কিত লোক-সাহিত্য সাধারণতঃ 'কালু রায়ের গীত' নামে পরিচিত; ইহা মঙ্গলকাব্যের মর্যাদায় উন্নীত হইতে পারে নাই; সংক্ষিপ্ত পাঁচালীর আকারেই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে 'শীতলা-মঙ্গল' রচয়িতা শ্রীবল্লভ এবং দ্বিজ নিত্যানন্দের 'কালু রায়ের গীত' উল্লেখযোগ্য।[১] দুইখানি রচনাই নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং অকিঞ্চিৎকর। ইহাদের কাহারও কোনও সাহিত্যিক মূল্য নাই। মঙ্গল-কাব্য কথাটিকে যাঁহারা নিতান্ত শিথিল ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহাদিগকেও 'কালু রায়-মঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের এই দাবী নিতান্তই অর্থহীন।

[১] সা-প-প ৬২, ৮১-৮৯ ; ঐ ৬৩, ১৭-২৪—ইহাদের মধ্যে দুইটি গীতই আনুপূর্বিক প্রকাশিত হইয়াছে।

সূর্যমঙ্গল

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ধর্মঠাকুর পূজার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে সূর্যপূজার তিনটি স্বতন্ত্র ধারা আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে—তাহা বৈদিক, স্মাইথীয় ও অনার্য। কিন্তু পূর্ববঙ্গে ধর্মঠাকুর পূজার প্রচলন না থাকায় সেখানে এই স্বতন্ত্র ধারাগুলি বিশেষ একটি ধর্মাচারকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া প্রায় স্বাধীন ভাবেই বর্তমান আছে। অবশ্য এ'কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, ইহাদের উপর এক হিন্দুধর্মের সর্বজয়ী প্রভাবের ফলে এই স্বাতন্ত্র্যগুলি অনেক সময় খুব সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যায় না। তথাপি বৈদিক সূর্যোপাসনার সঙ্গে ইহাদের স্থূল পার্থক্য অনুভব করিতেও বেগ পাইতে হয় না। পূর্ববঙ্গের কুমারীগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত মাঘমণ্ডলব্রতের ভিতর দিয়া প্রাচীন বাংলার সূর্যোপাসনার একটি বিশিষ্ট ধারা বিকাশ লাভ করিয়াছে। ইহা ধর্মপূজার দেশ পশ্চিম বঙ্গে একেবারেই অপরিচিত। ইহার নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি হইতেই ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যাইবে।[১]

চারি পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই কুমারী মেয়েরা এই ব্রত আরম্ভ করিয়া থাকে। ইহা আরম্ভ করিবার পর পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রতি মাঘ মাসের প্রত্যেক দিন ইহা উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে, পঞ্চম বৎসরে ইহা সম্পূর্ণ হয়। সূর্যোদয়ের পূর্বেই কুমারীগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠে, তারপর মাঘের শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে পুকুরঘাটে কিংবা নিকটবর্তী নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা হাতে এক একটি করিয়া ফুল লইয়া জলের একেবারে ধারে গিয়া বসে এবং একজন মহিলার নির্দেশ মত সূর্যদেবতা-বিষয়ক কতকগুলি লৌকিক ছড়া আবৃত্তি করিয়া যায়। এই ছড়াগুলির ভিতর দিয়া তাহারা সূর্যঠাকুরের শৈশব, যৌবনপ্রাপ্তি, বিবাহ ও পুত্রলাভ ইত্যাদি বর্ণনা করে; এই সকল ছড়ার মধ্য দিয়াই নিজেদেরও ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহারা ব্যক্ত করিয়া থাকে। ইহাদের সঙ্গে তাহাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির যোগ এত নিবিড় যে, ইহা কোন ধর্মীয় আবহাওয়া সৃষ্টি

[১] Asutosh Bhattacharyya, 'The Popular Sun-cult of Bengal', *The Amrita Bazar Patrika Annual*, 1945.

করিবার পরিবর্তে, একান্ত গার্হস্থ্য ও বাস্তব অনুভূতির বাহন হইয়া আছে। উদয়োন্মুখ সূর্যের দিকে তাকাইয়া তাহারা গায়,—

উঠ উঠ সুরুজাই ঝিকি মিকি দিয়া।
তোমারে পূজিব আমি রক্তজবা দিয়া॥
উঠ উঠ সুরুজাই ঝিকি মিকি দিয়া।
উঠিতে পারি না আমি হিমানীর লাগিয়া॥

দুরন্ত মাঘের শীতে সূর্যের উদয়-মুহূর্তটি যতই বিলম্বিত হইতে থাকে, কুমারী ব্রতিনীগণ ততই অধৈর্য হইয়া গাহিতে থাকে,—

উত্তর আলা কদম গাছটি দক্ষিণ আলা বাওরে।
গা তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মাও রে॥
শিয়রে চন্দনের বাটি বুকে ছিটা পড়েরে।
গা তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মাও রে॥

শীতের অলস সূর্য কুজ্ঝটিকার অন্তরাল হইতে কাতর চক্ষু মেলিয়া চাহিল। এইবার সূর্যের ধুতি-গামছা পরা, সূর্যের পূজা, আকাশ-রথে সূর্যের যাত্রা, খেয়াপার, সূর্যের বিবাহ করিবার ইচ্ছা, ঘটকের আগমন, সূর্যের বিবাহ, সূর্যের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা, গৌরার সঙ্গে বিবাহান্তে তাঁহার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি কাহিনী গীত হয়। উল্লিখিত মাঘমণ্ডল ব্রতের ভিতর দিয়া বাংলার সূর্যোপাসনার প্রাক্-পৌরাণিক যুগের একটি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়। অতএব ইহার একটু বিস্তৃত বর্ণনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

শীতের প্রভাতে পুকুরে বা নদীতে স্নান করিয়া কুমারী ব্রতিনীগণ গৃহে ফিরিয়া আসে। গৃহের সমস্ত আঙ্গিনা জুড়িয়া সেখানে বিচিত্র আলপনা আঁকা হইয়া থাকে। ইহাদের পূর্বদিকে একটি বৃত্ত ও পশ্চিমদিকে একটি অর্ধবৃত্ত আঁকা হয়—ইহারা যথাক্রমে সূর্য ও চন্দ্র। ব্রতিনীগণ এই বৃত্তাকৃতি সূর্যের পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া সূর্যবিষয়ক বিবিধ লৌকিক ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর এক একটি নূতন বৃত্ত এখানে যোগ করিতে হয়, পাচ বৎসরে পাঁচটি বৃত্ত পূর্ণ হইলে ব্রত সাঙ্গ হয়। এই বৃত্তগুলি বিবিধ রঙিন গুঁড়া দিয়া সুরঞ্জিত করা হয়। চন্দ্রসূর্যের চিত্র ব্যতীত সেই আঙ্গিনার মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের নানা ব্যবহারিক বস্তু, যথা আয়না, চিরুণী, দোলা, থালা, গ্লাস ইত্যাদিও অঙ্কিত হয়। এই সকল চিত্রাঙ্কনে চাউল ও ইটের গুঁড়ি ও ছাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—ইহাদিগদ্বারা যথাক্রমে সাদা, লাল ও

কালো রং-এর কাজ চলিয়া থাকে। প্রতিদিন এই প্রকার চিত্রিত প্রত্যেকটি জিনিসের নিকট ব্রতিনী নানা ঐহিক বর প্রার্থনা করিয়া থাকে, যেমন,—চিরুণীর নিকট এই বর প্রার্থনা করে, 'আমি পূজি গুঁড়ির চিরুণী—আমার লাগি থাকে যেন সোনার চিরুণী।' আয়নার নিকট প্রার্থনা জানায়, 'আমি পূজি গুঁড়ির আয়না—আমার লাগি থাকে যেন আভের আয়না', ইত্যাদি। পূর্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক আদিম জাতির মধ্যেই সূর্য উর্বরতা (fertility) বা উৎপাদন বৃদ্ধির দেবতা বলিয়া কল্পিত হ'ন, এখানেও বাংলার কুমারী কন্যাদিগের সূর্যের নিকট নানা ঐহিক বর প্রার্থনার মধ্যে যে তাহাদের মাতৃত্বেরও একটি সলজ্জ কামনা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেইজন্য আদিম সূর্যদেবতার সঙ্গে নারী, বিশেষতঃ কুমারী নারীরই সম্পর্ক বেশী। পশ্চিম বঙ্গের কুমারীপূজার শিব, পূর্ববঙ্গের উক্ত কুমারী ব্রতের সূর্য ছাড়া আর কিছুই নহেন—এই বিষয়ে পূর্ব বঙ্গ পশ্চিম বঙ্গ হইতে অধিকতর রক্ষণশীল। মাঘমণ্ডল ব্রত যে সময়ে উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে, সেই সময়টিও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়—তখন হইতেই সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহা পৃথিবীর বহু আদিম ও সভ্যজাতির সূর্যোৎসবের (sun-festival) অন্যতম সময়।

মাঘমণ্ডল ব্রত উপলক্ষ্যে একটি সূর্যের পাঁচালী গীত হইয়া থাকে—ইহা শিথিলবদ্ধ কতকগুলি খণ্ড গীতিকবিতারই সমষ্টি—তাহা পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকা-কাব্যের রূপ লাভ করিতে পারে নাই। ইহার বিষয়বস্তুর মধ্যে যে একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু হইতে অধিকতর প্রত্যক্ষ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন হিসাবে তাহা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে পারি।[১]

শীতের প্রভাতে সূর্যঠাকুরের ঘুম কিছুতেই ভাঙ্গিতে চাহে না—অবশেষে তাঁহার মাতার অবিশ্রাম ডাকাডাকিতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল। কুজ্ঝটিকার ভিতর দিয়া পূর্বাকাশে সূর্য উঁকি দিলেন—তাঁহার আভা ক্রমে রক্ত হইতে স্বর্ণবর্ণে পরিণত হইল—পল্লীর গৃহচূড়া সেই আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। এইবার সূর্যঠাকুর রূপার বাটি হইতে তৈল ও সোনার বাটি হইতে গন্ধদ্রব্য লইয়া ক্ষীরসাগরে স্নান করিতে চলিলেন। স্নান করিয়া সূর্যঠাকুর একটি গামছা পরিধান করিলেন, তারপর তিনি ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পূজা গ্রহণ করিয়া বারুই বাড়ীতে গিয়া

১ ব-সা-প ১, ১৪৬-৮১

পান হরীতকী দিয়া মুখশুদ্ধি করিলেন, তারপর যেখানে তাঁহার মঙ্গলগান হইতেছে, তিনি সেখানে চলিলেন। যাইবার পথে যখন তিনি খেয়া নৌকায় নদী পার হইতেছিলেন, তখন পরপারে তুইটি ব্রাহ্মণকন্যার দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—

ঐ পার তুই বাউনের কন্যা মেল্যা দিছে শাড়ী।
তাহা দেখ্যা সূর্যাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ী বাড়ী॥

ব্রাহ্মণকন্যা তুইটিকে দেখিয়া সূর্যঠাকুরের মনে পূর্বরাগের সঞ্চার হইল। পাড়ার লোকের কাছে এ'কথা গোপন রহিল না। তাহারা সূর্যঠাকুরের মায়ের নিকট গিয়া বলিল,

ওগো সূর্যাইর মা!
তোমার সূর্যাই ডাঙ্গর হৈছে বিয়া করাও না॥

কিন্তু সূর্যের মা জানেন, তাঁহার ছেলে মাত্র সেই দিনের শিশু, সে আজই কি বিবাহ করিবে? তিনি এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এদিকে সূর্যঠাকুরের কি অবস্থা?

ও পার তুইটি বাউনের কন্যা মেল্যা দিছে কেশ।
তাহা দেখ্যা সূর্যাই ঠাকুর ফেরেন নানা দেশ॥

সূর্যের মা'র নিকট পাড়ার লোক গিয়া আবার বলিল—

ওগো সূর্যাইর মা।
তোমার সূর্যাই ডাঙ্গর হৈছে বিয়া করাও না॥

সূর্যের মা এইবার সংশয়ে পড়িলেন, ছেলের হাবভাব ত নিজে এখনও কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু সূর্যঠাকুর নিজের মনের ভাব আর কিছুই গোপন করিতে পারেন না—

ওপার তুইটি বাউনের কন্যা মল খাড়ুয়া পায়।
তাহা দেখ্যা সূর্যাই ঠাকুর বিয়া করতে চায়॥

সূর্যের মা পুত্রের বিবাহে আর আপত্তি করেন না। এই সূর্যঠাকুরই বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়ার শিবঠাকুর—বাংলার লৌকিক ধর্মে সূর্যই যেমন পরবর্তী কালে শিব হইয়া গিয়াছেন, এ'দেশের লোক-সাহিত্যেও তেমনই সূর্য ও শিব একাকার হইয়া আছেন। এইবার সূর্যঠাকুরের বিবাহের পালা। বিবাহ স্থির করিবার জন্য একজন ঘটক নিযুক্ত হইল। অবিলম্বে সূর্যের সঙ্গে গৌরার বিবাহ স্থির হইল। কন্যার বয়স আট বৎসর মাত্র। সূর্যঠাকুর শ্বশুরবাড়ী যাত্রা

করিলেন—সেখানে কি রকম আচরণ করিতে হইবে, মা তাহাকে তাহা শিখাইয়া দিলেন। নির্বিঘ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইল। এইবার বধূ লইয়া সূর্যঠাকুরের স্বগৃহে যাত্রার পালা। কাহিনীর মধ্যে এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা করুণ। বিবাহের উৎসবাড়ম্বর শেষ হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গৌরা বুঝিতে পারিল, এইবার তাহার পিতৃসংসার হইতে বিদায় লইতে হইবে। সে নীরবে মায়ের বস্ত্রাঞ্চলের নীচে গিয়া লুকাইল। মা তাহার মস্তকে স্নেহহস্ত বুলাইতে বুলাইতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—

টাকা নয় রে কড়ি নয় রে কোটরে রাখিব।
পরের লাগ্যা হইছ গৌরা পরেরে সে দিব ॥

সমাজের নির্মম বিধানকে মাথা পাতিয়া লইয়া জননীর অন্তরের স্নেহবোধকে স্তম্ভিত করিয়া লইতে হইবে। শিশুকন্যা এ'যাবৎ মায়ের অঞ্চলের নীচে নিরাপদ আশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে—কিন্তু আজ তাহা সে পাইল না,—

অর্ধেক গাঙ্গে ঝড় বৃষ্টি অর্ধেক গাঙ্গে খুয়া।
মধ্য গাঙ্গে বাদ্য বাজে গৌরা লবার লইঞা ॥
আড়শী কান্দে পড়শী কান্দে কান্দে রইয়া রইয়া।
গৌরার জনকে কান্দে গাম্‌ছা মুড়ি দিয়া ॥
গৌরার যে ভাই কান্দে খেলার সজ্জ লইয়া।
গৌরার যে মায়ে কান্দে শানে পাছাড় খাইয়া ॥

মাতার ক্রোড়চ্যুতা অসহায়া ক্ষুদ্র বালিকা অবশেষে নৌকায় আরোহণ করিয়া স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরগৃহে যাত্রা করিল। অশ্রুমুখী জনতা নদীতীরে দাঁড়াইয়া তাহাকে বিদায় দিল—নৌকার ভিতর হইতে জনতার দূরাগত ক্রন্দনের ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল,—

ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানী।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি মায়ের কান্দন শুনি ॥
নাইয়ারে দিয়াম তাড় বালা মাঝিরে দিয়াম কড়ি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি ভায়ের কান্দন শুনি ॥
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানী।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি বাপের কান্দন শুনি ॥

অভিমানিনী কন্যা পিতার ক্রন্দন শুনিয়া বলিতেছে—

এখন কেন কান্দ বাপধন মুখে গামছা দিয়া।
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া॥

এমন কি এইজন্য সে তাহার মাতা ও শিশু ভাইটিকে পর্যন্ত দোষী করিতেছে—

এখন কেন কান্দ মাগো শানে পাছাড় খাইয়া।
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া॥
এখন কেন কান্দ ভাইগো খেলার সজ্জ লইয়া।
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া॥

একটি অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয় বুকে করিয়া লইয়া নৌকা নদীপ্রবাহে দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেল—ক্ষুদ্র আনন্দ-প্রতিমাটিকে নদীর জলে বিসর্জন দিয়া অশ্রুমুখী জনতা শূন্যগৃহে ফিরিয়া গেল।

কন্যা-বিদায় বাঙ্গালীর গৃহের বিজয়া। ইহার বেদনা যে কত গভীর, তাহা বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না,—সাহিত্যে ইহার অনুভূতি বাঙ্গালীকে কবি করিয়াছে, সাধনায় ইহাই মৃন্ময়ী দেবী-প্রতিমাকে চিন্ময়ী করিয়াছে।

বহুদূরাগত ক্রন্দন যখন আর নদীতীর হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না, তখন অশ্রুমুখী গৌরা তাহার নববিবাহিত পতির দিকে ফিরিয়া তাকাইল। তাহার আশঙ্কা কিছুতেই দূর হইতেছে না—স্নেহময় স্বামী নবোঢ়া পত্নীর সকল অপরিচয়ের আশঙ্কা এইভাবে দূর করিয়া দিতেছে—

'তোমার দেশে যাব স্বর্যাই বাপ বলিব কারে।'
'ঘরে আছে আমার বাপ, বাপ বলিবে তারে॥'
'তোমার দেশে যাব স্বর্যাই মা বলিব কারে।'
'ঘরে আছে আমার মা, মা বলিবে তারে॥'
'তোমার দেশে যাব স্বর্যাই কাপড়ের দুঃখ পাব।'
'নগরে নগরে আমি তাঁতিয়া বসাব॥'

বাঙ্গালী কবির দৃষ্টিগুণে আকাশের দেবতা যে কি ভাবে মাটির মানুষ হইয়া গিয়াছে, তাহাই এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

উল্লিখিত কাহিনী লইয়া কোন পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকা-কাব্য রচিত হয় নাই—ইহা শিথিলগ্রন্থি কতকগুলি গীতিকবিতার আকারেই মুখে মুখে প্রচলিত। গার্হস্থ্য

স্নেহ-সম্পর্কের বাস্তব অনুভূতির উপরই ইহার ভিত্তি—ইহাদের মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক সুর নাই। ইহাদের উদ্ভবের ইতিহাস কিংবা ইহাদের রচয়িতারও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা প্রকৃতপক্ষে বাংলার লোক-সাহিত্যেরই অন্তর্গত। বাংলার লৌকিক সূর্যকাহিনীর বিশিষ্ট একটি ধারার সঙ্গেই এখানে পরিচয় হয়—এই ধারাটির সঙ্গে এই বিষয়ক স্বতন্ত্র ধারাটির কোন যোগ নাই।

বাংলার লৌকিক সূর্যকাহিনীর স্বতন্ত্র একটি ধারা গতানুগতিক পথে অগ্রসর হইয়া মঙ্গলকাব্যের রূপের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু এই ধারাটি অত্যন্ত ক্ষীণ—কয়েকজন মাত্র কবি এই বিষয় অবলম্বন করিয়া সাধারণ কয়েকখানি মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে যে কাহিনীটি সাধারণতঃ বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা সংক্ষেপে এই,—

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ,—তাহার দুই কন্যা, রুমুনা ও ঝুমুনা। কিছুদিনের মধ্যে ব্রাহ্মণের পত্নীবিয়োগ হইল—তিনি অতি কষ্টে কন্যা দুইটিকে লইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ভোর বেলায় ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাইতেন, সারাদিন ঘুরিয়া যাহা পাইতেন, তাহা লইয়া সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিতেন—যাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তাহাতেই তিনজনের কোনরকমে দিন কাটিত। একদিন ব্রাহ্মণ যখন ভিক্ষায় বাহির হইয়া গেলেন, তখন তাঁহার কন্যা দুইটি নিকটেই এক বনের মধ্যে শাক তুলিতে গেল। পিতা বাড়ী ফিরিবার পূর্বেই তাহারা শাক তুলিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিল। পরদিনও তাহারা এইরকম করিল। এইভাবে প্রত্যহ যখন তাহাদের পিতা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেন, তখনই তাহারা শাক তুলিবার জন্য বনের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিত, তিনি ফিরিবার পূর্বে তাহারা ফিরিয়া আসিত। একদিন যখন তাহারা এইভাবে বনের মধ্যে শাক তুলিতে গেল, তখন দেখিতে পাইল, দেবকন্যাগণ এক সরোবরের পার্শ্বে বসিয়া সূর্যদেবতার পূজা করিতেছে। ভগ্নী দুইজন তাঁহাদের কাছে গেল। দেবকন্যাগণ জানিতে চাহিলেন তাহারা কে। তাহারা তাহাদের দুঃখের কথা তাঁহাদের নিকট খুলিয়া বলিল। দেবকন্যাগণ বলিলেন, 'সূর্যদেবতার পূজা কর, সকল বিপদ দূর হইবে।' ভগ্নী দুইজন সেখানেই দেবকন্যাদের সঙ্গে সূর্যদেবতার পূজায় যোগদান করিল। সূর্যদেবতা তাহাদের ভক্তিতে প্রীত হইয়া স্বয়ং তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, এবং অচিরে তাহাদের দুঃখ দূর হইবে বলিয়া বর দিলেন। ভগ্নী দুইটি বাড়ীতে ফিরিয়া

দেখিল, তাহাদের ভাঙ্গা কুটিরখানি রাজপ্রাসাদে পরিণত হইয়াছে—প্রথম তাহারা তাহা চিনিতেই পারিল না, পরে সূর্যদেবতার বরের কথা স্মরণ করিয়া অতি সঙ্কোচের সঙ্গে গিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল—ব্রাহ্মণ বাড়ী ফিরিলে তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। পরদিন হইতে ব্রাহ্মণকেও আর ভিক্ষায় বাহির হইতে হইল না। সেই রাজ্যের রাজা সহসা একদিন দেখিলেন, রাজকন্যার অনেক বয়স হইয়াছে—তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া যাহারই মুখ প্রথম দেখিবেন, তাহার হস্তেই রাজকন্যাকে সমর্পণ করিবেন। সূর্যদেবতা স্বপ্নে রুমুনা ও ঝুমুনার নিকট আবির্ভূত হইয়া এই বৃত্তান্ত তাহাদিগকে বলিলেন এবং তাহাদের পিতাকে পরের দিন প্রভাতে রাজবাড়ীতে যাইবার জন্য পরামর্শ দিতে বলিলেন। ভগ্নী দুইজন ভোর না হইতেই ব্রাহ্মণকে রাজবাড়ীতে পাঠাইয়া দিল—রাজা ঘুম হইতে উঠিয়া সকলের আগে তাঁহারই মুখ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার কথামত তিনি রাজকন্যাকে তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজকন্যাকে লইয়া ব্রাহ্মণ নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ভগ্নী দুইজন তাহাদের বিমাতাকে পাইয়া প্রথম খুব খুসী হইল, কিন্তু অল্পদিনেই বুঝিতে পারিল, তাঁহার নিকট হইতে তাহাদের সুখের আশা নাই। একদিন তাহারা সূর্যদেবতার পূজা করিতেছিল, বিমাতা তাহাতে আপত্তি করিলেন, এবং তাহাদিগকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য স্বামীকে বলিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তরুণী ভার্যার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনিও ইহাতে আপত্তি করিতে পারিলেন না। কন্যা দুইটিকে মাসীর বাড়ী লইয়া যাইবেন বলিয়া ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন,—দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া এক গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কন্যা দুইটি এক গাছের নীচে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এই সুযোগে ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে সেইখানেই ফেলিয়া রাখিয়া নিজে একাকী বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়াই কন্যা দুইটি নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিল। তখন গভীর রাত্রি। হিংস্র পশুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহারা উপায় সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু যখন তাহারা কোন উপায়ই দেখিতে পাইল না, তখন উপরিস্থিত অশ্বত্থ বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'যদি সত্যযুগের অশ্বত্থ হও, তবে আমাদিগকে আশ্রয় দাও।' বলিবামাত্র অশ্বত্থ শাখা-প্রশাখা ভূমিতল পর্যন্ত আনত করিয়া দিল, তাহারা তাহাতে আরোহণ করিবামাত্র পুনরায় তাহা উর্ধ্বে উঠিয়া গেল—হিংস্র পশুর আক্রমণ হইতে তাহারা সেই রাত্রির জন্য রক্ষা পাইল।

পার্বতীপুরের রাজা অনঙ্গশেখর পরের দিন বনে শিকার করিতে আসিলেন। তিনি কন্যা দুইটিকে দেখিতে পাইয়া নিজের প্রাসাদে লইয়া গেলেন। বড়টিকে নিজে বিবাহ করিলেন ও ছোটটিকে তাঁহার কোটালকে সম্প্রদান করিলেন। কালক্রমে তাহারা উভয়েই অন্তঃসত্ত্বা হইল। একদিন রবিবারে যখন রাণী সূর্য-দেবতার পূজা করিতেছিলেন, তখন রাজা সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি জানিতে চাহিলেন, রাণী কাহার পূজা করিতেছেন। যখন শুনিতে পাইলেন, সূর্য-দেবতার পূজা, তখন পদাঘাতে পূজার ঘট ভাঙ্গিয়া দিয়া রাণীর প্রাণবধ করিবার জন্য তাঁহাকে কোটালের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কোটাল দয়া-পরবশ হইয়া গোপনে রাণীকে মুক্তি দিল। রাণী অরণ্যে পলাইয়া গেলেন। যথাসময়ে দুই ভগ্নীর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। রাণীর পুত্রের নাম হইল দুখরাজ ও কোটালের পুত্রের নাম হইল সুখরাজ। জন্মের পর হইতে দুখরাজ নিজের পিতাকে দেখে নাই, সেইজন্য তাহার মনে শান্তি ছিল না। একদিন বনবাসিনী রাণী দুখরাজকে তাহার মাসীর বাড়ীতে পাঠাইলেন, মাসী তাহাকে অনেক জিনিস দিলেন—তাহা লইয়া যখন সে মায়ের নিকট ফিরিতেছিল, তখন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া সূর্যদেবতা আসিয়া তাহার নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়া গেলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে দুখরাজ শূন্য হাতে মায়ের নিকট ফিরিল। কিছুদিন পর বনবাস হইতে রাণী দুখরাজকে লইয়া নিজেও তাঁহার ভগ্নীর বাড়ীতে আসিলেন। কোটালের সংসারে তাঁহার ভগ্নী সুখেই বাস করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে সূর্যদেবতার কৃপায় রাজা অনঙ্গশেখরও নিজের পত্নীকে স্মরণ করিলেন—তিনি কোটালকে তাঁহার রাণীকে ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। কোটালের গৃহেই রাজা ও রাণীর মিলন হইল—যখন রাজরাণী দুখরাজকে লইয়া প্রাসাদে ফিরিতে-ছিলেন, তখন পথিমধ্যে এক অমঙ্গল দেখিতে পাইয়া সাতজন হাড়ীর শিরশ্ছেদ করিবার আদেশ দিলেন। কোটাল বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া অবিলম্বে সাত হাড়ীর শিরশ্ছেদ করিল। এই সংবাদ শুনিয়া হাড়ীদের জননী পুত্রশোকে বিলাপ করিতে লাগিল। সূর্যদেবতা দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের প্রাণ ফিরাইয়া দিলেন, দেখিয়া রাজা পরম বিস্মিত হইলেন; সূর্যদেবতার প্রতি রাজার বিশ্বাস হইল—তিনিও তখন হইতে পরম ভক্তিভরে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। সূর্যের কৃপায় তিনি পরম সুখে রাজত্ব করিয়া বৃদ্ধ বয়সে পুত্রকে সিংহাসন দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

এই কাহিনী লইয়া যে কয়খানি মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদের একখানির মাত্র কবির পরিচয় পাওয়া যায়—তাঁহার নাম রামজীবন। ১৬৩১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭০৯ খৃস্টাব্দে তিনি তাঁহার এই সূর্যমঙ্গল বা 'আদিত্য-চরিত' রচনা করিয়াছিলেন।[১] তিনি একখানি মনসা-মঙ্গলও রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার মনসা-মঙ্গলের আলোচনা সম্পর্কে তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'মনসা-মঙ্গল' রচনার ছয় বৎসর পর রামজীবনের 'সূর্যমঙ্গল' রচিত হয়। তিনি ইহাকে 'আদিত্য-চরিত' বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাতে প্রচলিত সূর্যব্রতের কাহিনীকে একটি পাঁচালির রূপ দিয়াছেন বলিয়া নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন—তাঁহার পূর্বে এই বিষয়ক আর কোন পদ্য-রচনা প্রচলিত ছিল বলিয়া তিনি জানিতেন না। কিন্তু তথাপি কাহিনীটি তাঁহার মৌলিক নহে। পূর্ব-ময়মনসিংহে প্রচলিত করমাদি ব্রতে উক্ত কাহিনীটি শুনিতে পাওয়া যায়। ধর্মপূজার আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি, করমাদি ব্রত সূর্যেরই ব্রত। মেয়েদের মুখে মুখে প্রচলিত ব্রতকথার কাহিনী কোন কোন সময় পুরোহিত পদ্যরূপ দিয়া থাকেন, ক্বচিৎ তাহাতে কবিত্বের স্পর্শও অনুভব করা যায়—এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। রামজীবনের রচনা কবিত্বের বৈশিষ্ট্য-বর্জিত ও সর্বাংশেই পরবর্তী মঙ্গলকাব্যসমূহের বৈচিত্র্যহীন ও গতানুগতিক প্রণালীতে রচিত। ইহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত কিছু নাই।

মালাধর বসু নামক একজন কবি প্রায় অনুরূপ কাহিনী লইয়া 'অষ্টলোকপাল কথা' নামক একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[২] সূর্যকেই অষ্টলোকপাল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীতও কালিদাস নামক একজন কবি সূর্যমঙ্গল অথবা সূর্যের পাঁচালী নামক একখানি আখ্যায়িকা-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।[৩] তিনি নিজেকে 'দ্বিজ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে পারা যায় না। তিনি খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। দ্বিজ কালিদাস নামক অন্যান্য বিষয়ক মঙ্গলকাব্যের একজন কবির সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই।

১ সা-প-প ১৩, ৮৯
২ পু-প ১৫ ১৯
৩ বিশ্বকোষ ১৮, ১৭৪

অন্যান্য মঙ্গলকাব্য

উল্লিখিত বিবিধ বিষয়ক মঙ্গলকাব্য ব্যতীত স্থানীয় ও পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া ক্ষুদ্র পাঁচালীর আকারে বহু আখ্যায়িকা কাব্য সেই যুগে রচিত হইয়াছিল—কিন্তু প্রকৃত মঙ্গলকাব্যের মর্যাদায় ইহাদের আর একখানিও উন্নীত হইতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে শিবানন্দ কর নামক একজন কবি রচিত 'লক্ষ্মীমঙ্গল' নামক একখানি কাব্য একটু ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু 'লক্ষ্মীমঙ্গল' 'দেবী-ভাগবত' নামক একখানি অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণের অন্তর্গত নবম স্কন্ধ, একচত্বারিংশৎ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ মাত্র। অতএব ইহা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন বাংলার অনুবাদ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

মঙ্গল নামক পৌরাণিক আরও কতকগুলি পদ্য রচনা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। তাহাদের মধ্যে 'গঙ্গা-মঙ্গল' ও 'কপিলা-মঙ্গল' নামক কাব্য দুইখানি বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। 'গঙ্গা-মঙ্গল' গঙ্গাবতরণ ও সগরবংশ উদ্ধারের পৌরাণিক কাহিনী লইয়া রচিত—মানবিক কোন চরিত্র কিংবা বাংলার সমাজের কোন চিত্র ইহার মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারে নাই—সেইজন্য ইহাও পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। 'কপিলা-মঙ্গল' ভাগবতের কাহিনী-বর্ণিত ব্রহ্মা কর্তৃক কপিলা-ধেনু হরণের বৃত্তান্ত লইয়া রচিত। ইহার কাহিনীকেও জাতীয় কোন রূপ দিবার চেষ্টা করা হয় নাই। তবে ইহাদের রচনায় কোন কোন স্থানে সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যের বহিরঙ্গগত প্রভাব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা জিলায় বরদাখাত পরগণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বরদেশ্বরীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া 'বরদা-মঙ্গল' নামক একখানি কাব্য রচিত হইয়াছিল।[১] ইহার একমাত্র পুঁথির পত্রসংখ্যা ৫৫, রচয়িতার নাম দ্বিজ নন্দকিশোর। তিনি ত্রিপুরা জিলার শ্রীকাইল গ্রামের নিকটবর্তী রোয়াচালা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার স্বহস্তলিখিত পুঁথির লিপিকাল ১২২৬ সন অর্থাৎ ইংরেজি ১৮১৯ খৃস্টাব্দ। বিবিধ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের ভিত্তির উপর ইহাতে এই লৌকিক দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। এই বিষয়ে ইহা আমাদের পূর্ব-বর্ণিত 'গোসানী-মঙ্গল' কাব্যের অনুরূপ। এই প্রকার স্থানীয় দেবতার লৌকিক মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া আরও মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়া থাকিবে কিন্তু তাহাদের পরিচয় জানিতে পারা যায় না।

১ সা-প-প ৫৯, ১-১২

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঐতিহাসিক কাব্য

যদিও পূর্ববর্ণিত অনেক মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে সমগ্রভাবে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া মঙ্গলকাব্যের পরিবেশের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য রচনাই প্রকাশিত হয় নাই।[১] কারণ, তখন হইতেই মঙ্গলকাব্য রচনার গতানুগতিক বিধিনিয়মের বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ করে এবং যে দেবতা এতদিন পর্যন্ত ইহার উপলক্ষ্যটুকু মাত্র হইয়া ছিলেন, তিনিও সেই যুগেই এই শ্রেণীর আখ্যায়িকা-কাব্য রচনার ক্ষেত্র হইতে এক প্রকার বিদায় গ্রহণ করেন। তখন হইতে দেবতার মধ্যস্থতা বাদ দিয়া, দেবতার স্বপ্নাদেশ ব্যতিরেকেই প্রত্যক্ষভাবে মানুষ নিজের ব্যবহারিক সুখদুঃখের কাহিনী আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ'কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই সকল কাব্যে দেবতাকে কাহিনীর মধ্যে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে না দেওয়া হইলেও, ইহাদের আখ্যায়িকার কাঠামো রচনায় প্রচলিত আখ্যায়িকা-কাব্য বা মঙ্গলকাব্যের ধারাটিকেই বহুলাংশে অনুসরণ করা হইয়াছে। যদিও দেবতার উল্লেখ ইহাতেও আছে, তথাপি সমগ্রভাবে ইহারা দেবতা-বিষয়ক কাব্য নহে, মানুষেরই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা-বিষয়ক (secular) কাব্য। আলোচনার সুবিধার জন্য ইহাদিগকে ঐতিহাসিক কাব্য বলিয়া উল্লেখ করা যাইতেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, পূর্ববর্তী যুগের ধর্মমঙ্গল কাব্য ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। কিন্তু তথাপি ধর্মমঙ্গল ইতিহাস না হইয়া কাব্যই হইয়াছে; কারণ, কবিকল্পিত মানব ও দেব-চরিত্র দ্বারা ইহার ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক ঘটনার খুঁটিনাটি সেখানে কবি কিংবা পাঠক কাহারও লক্ষ্য ছিল না—মানুষ ও দেবতাই ছিল সেখানে লক্ষ্য। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই দৃষ্টিভঙ্গির কতকটা পরিবর্তনের ফলে ঐতিহাসিক ঘটনার খুঁটিনাটির উপর কবি ও তাঁহার পাঠকের দৃষ্টি কতকটা নিবদ্ধ হইয়াছিল। যদিও এই দৃষ্টিকে

---

[১] Asutosh Bhattacharyya, 'Medieval Bengali Narrative Poetry on Historical Themes' *I. H. Q.* XX, 21-35.

সম্পূর্ণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক দৃষ্টি বলা যায় না, তথাপি ইহাতে এ'দেশে ইহার সর্বপ্রথম উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার ভিতর দিয়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নূতন একটি ধারার উদ্বোধন হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই পাশ্চাত্ত্য আদর্শসম্মত বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইতিহাস আলোচনার পদ্ধতি এ'দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়—তাহার ফলেই খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বিষয়ক মাত্র কয়খানি কাব্যই সেকালের বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক কাব্যের নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে।

গঙ্গারাম দত্ত—'মহারাষ্ট্র-পুরাণ'

ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ'।[১] ইহার রচয়িতার নাম গঙ্গারাম। ইহার প্রকৃত রচনাকাল জানা যায় না; কারণ, পুঁথিতে এই বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু পুঁথিখানি ১৬৭২ শক ও ১১৫৮ বঙ্গাব্দে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহাতে ১৭৫১ খৃস্টাব্দ পাওয়া যায়। গ্রন্থমধ্যে যে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা মাত্র ইহার ছয় সাত বৎসর পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। অতএব পুঁথিখানি লেখার তারিখ ইহার রচনারও তারিখ হইতে পারে। পুঁথিখানি কবির স্বহস্তলিখিত হওয়াও কিছুই আশ্চর্য নহে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় বর্গীর আক্রমণ একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা। পশ্চিম বঙ্গের ছেলেভুলানো ছড়া ও লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ে ইহার প্রভাব অনুভব করা যায়। এই ঐতিহাসিক ঘটনাই গঙ্গারামের কাব্যের অবলম্বন। সম্ভবতঃ তাঁহার কাব্যের একটি কাণ্ড বা অধ্যায় মাত্র রচিত হইয়াছিল। এই কাণ্ডের নাম 'ভাস্কর-পরাভব'। প্রথমতঃ ইহার কাহিনী বর্ণনা করিয়া পরে ইহার ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করা যাইতেছে।—

পাপের ভারে পৃথিবী ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন—তিনি ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন,—'আর পারি না, এই ভার হইতে আমাকে মুক্ত কর।' ব্রহ্মা শিবকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পৃথিবীর একটা বিধান কর।' শিব নন্দীকে ডাকিলেন,—বলিলেন, 'তোমাকে এখনই মর্ত্যলোকে যাইতে হইবে—

[১] ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্তৃক প্রকাশিত, সা-প-প ১৩, ২০৯-৩৬। ইহার একমাত্র পুঁথি ময়মনসিংহ জিলার ধারীশ্বর গ্রাম হইতে স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। (সা-প-প ১৫, ২৫৩)

নন্দীরে ডাকিয়া শিব বলিছে বচন।
'দক্ষিণ সহরে তুমি যাহ ততক্ষণ॥
সাহু রাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে।
অধিষ্ঠান হও যাইয়া তাহার দেহেতে॥
বিপরীত পাপ হইল পৃথিবী উপরে।
দূত পাঠাইয়া যেন পাপী লোক মারে॥'

নন্দী কালবিলম্ব না করিয়া দক্ষিণ সহরে সাহুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সকল কথা খুলিয়া বলিল। রাজা সাহু রাজা রঘুর নিকট গিয়া বলিলেন, 'দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে সংবাদ লও,—কেন কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলার চৌথ পাইতেছি না।' রাজা রঘু সম্রাটের নিকট এই বিষয়ে এক পত্র লিখিলেন। সম্রাট তাহার উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন,—'ভৃত্য প্রভুকে বধ করিয়া বাংলার মস্‌নদ অধিকার করিয়াছে। আমাকে সে কোন নজরানা পাঠায় না। আমার সৈন্য নাই যে আমি ইহার প্রতিবিধান করি। দুই বৎসর হইয়া গেল, বাংলা হইতে এক কাণাকড়িও দিল্লীতে পৌছায় নাই। বাংলার নবাব এখন স্বাধীন—অতএব তাঁহার নিকট হইতেই তোমরা চৌথ আদায় কর, আমাকে আর এইজন্য বিরক্ত করিও না।' এই উত্তর পাইয়াই রাজা রঘু তাঁহার দেওয়ান ভাস্করকে চল্লিশ হাজার মারাঠা সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া বাংলার চৌথ আদায় করিতে পাঠাইলেন। সাতারা হইতে ভাস্কর বিজাপুর আসিয়া এক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া নাগপুর আসিয়া পৌছিলেন। সেখান হইতে তিনি একজন গুপ্তচর পাঠাইয়া জানিলেন, বাংলার নবাব তখন বর্ধমানে রাণীদীঘির তীরে তাঁবু ফেলিয়া বাস করিতেছেন। বীরভূম বামে রাখিয়া গোয়ালাভূমির উপর দিয়া ১৯শে বৈশাখ ভাস্কর বর্ধমানে পৌছিলেন এবং সহরটিকে অবরোধ করিলেন। নবাব পূর্ব হইতে বর্গীর এই অভিযানের কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই। বর্ধমান সহর অবরোধ হওয়ার পর একজন গুপ্তচর আসিয়া নবাবকে বিস্তৃত সংবাদ দিল।

নবাব মুস্তাফা খাঁকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দিল্লী হইতেই বর্গীরা বাংলার চৌথ পাইত, এখন তাহারা নিজেরা চৌথ আদায় করিবার জন্য বাংলায় আসে কেন?' মুস্তাফা খাঁ ইহার জবাব জানিবার জন্য ভাস্করের নিকট একজন উকিল পাঠাইলেন। ভাস্কর উত্তরে জানাইলেন, দিল্লীর সম্রাটই তাহাদিগকে বাংলা

হইতে নিজেদের চৌথ আদায় করিয়া লইতে বলিয়াছেন—অতএব নবাব তাহা পরিশোধ করুন উত্তম, নতুবা গ্রাম ও সহর লুট করিয়া তাহারা নিজেরাই তাহা আদায় করিয়া লইবে। নবাব কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। সৈন্যনায়কগণ পরামর্শ দিলেন, বর্গীদিগকে টাকা না দিয়া সেই টাকা বরং নবাবের সিপাহীদিগকে দেওয়া হউক—তাহার বিনিময়ে তাহারাই বর্গীদিগকে হটাইয়া দিবে। নবাব ইহাতে সম্মত হইলেন এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া গেল ভাবিয়া প্রফুল্ল চিত্তে বাটা হইতে পান লইয়া নিজে খাইলেন ও পার্শ্বস্থ সকলের মধ্যে বিতরণ করিলেন। নবাবের সিপাহীর দল বর্গীদিগকে পাল্টা আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ভাস্করও নবাবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সাত দিন যাবৎ বর্ধমান সহর অবরুদ্ধ হইয়া রহিল, সহরের লোকের দুঃখ-দুর্দশার সীমা রহিল না। বর্গীদিগের ভয়ে লোক ঘরের বাহির হইতে পারে না, খাদ্যদ্রব্য মহার্ঘ ও দুর্লভ হইল। গরীবেরা অনাহারে মরিতে লাগিল, এমন কি নবাবকেও কলার বীচি খাইয়া কোন রকমে দিন কাটাইতে হইল। ক্রমে অবরুদ্ধ অবস্থা সহরবাসীর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। নবাব বর্গীদিগকে আক্রমণ করিয়া সহর অবরোধমুক্ত করিবার জন্য তাঁহার সেনাপতিকে আদেশ দিলেন। একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মুস্তাফা খাঁ বর্গীদিগকে আক্রমণ করিলেন। বর্গীরাও প্রতি-আক্রমণ করিল। নবাবের পক্ষে পশ্চাদ্‌রক্ষী সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন মীর হাবিব। বর্গীদের প্রতি-আক্রমণে তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইল—তিনি প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেলেন। বর্গীরা নবাবের তাঁবুতে আগুন লাগাইয়া দিল। নবাবের সেনাপতি মুসাহাব খাঁ বর্গীদিগের পার্শ্বরক্ষী সৈন্যদিগের উপর এক আকস্মিক আক্রমণ করিয়া নবাবের পলায়নের পথ করিয়া দিলেন—নবাব সেই পথে পলাইয়া একেবারে কাটোয়াতে গিয়া তাঁবু ফেলিলেন। নৌকাযোগে কাটোয়ায় নবাবের খাদ্য সরবরাহ করা হইল। ভাস্কর বর্ধমান সহর লুট করিবার জন্য বর্গীদিগকে আদেশ দিলেন। ভয়ে লোক চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সুবর্ণ বণিক, গন্ধ বণিক, কাঁসারু, কর্মকার, তাঁতী, জেলে, যে যাহার বৃত্তি ফেলিয়া পলাইল। অন্তঃপুর হইতে নারীগণও বাহির হইয়া আসিয়া পলাইবার পথ সন্ধান করিতে লাগিল। বর্গীরা তাহাদের উপরও অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ তরবারি ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। কেহ কাহাকেও রক্ষা করিবার নাই। বর্গীদিগের অত্যাচারে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ জনশূন্য

হইয়া গেল। তাহারা লোকের ঘরবাড়ী পুড়াইয়া দিতে লাগিল। তারপর ক্রমে বর্ধমান সহর, চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর, দিঙ্‌নগর, ক্ষীরপাই, নিমগাছি, শেরগাঁও, সিকুলিয়া, চণ্ডীপুর এবং শ্যামপুর গ্রাম সমূহ পুড়াইয়া দিয়া বর্গীরা হুগলী বন্দরে পৌছিল। সেখানকার সৈন্যাধ্যক্ষ পীর খাঁ সসৈন্যে তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন—তাঁহার জন্যই সেখানে বর্গীরা আর কিছু করিতে পারিল না। তাহারা অন্য এক পথ ধরিয়া ভাগীরথী অতিক্রম করিল, এবং মুর্শিদাবাদে গিয়া পৌছিল। মুর্শিদাবাদে তাহারা জগৎ শেঠের প্রাসাদ লুট করিল। নবাবের দুইজন সেনাপতি হাজি আহ্‌মদ ও নোয়াজিস্‌ মহম্মদ অতি কষ্টে নবাবের প্রাসাদ রক্ষা করিলেন। বর্গীরা মুর্শিদাবাদ লুট করিতেছে শুনিয়া নবাব সসৈন্যে কাটোয়া হইতে মুর্শিদাবাদ ফিরিলেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র বর্গীরা কৌশলে নগর ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেল। জগৎ শেঠের প্রাসাদ লুট করিয়া বর্গীরা আড়াই কোটি টাকা পাইল। ভাগীরথী অতিক্রম করিয়া ভাস্কর কাটোয়ায় গিয়া তাঁবু ফেলিলেন—সেখানে গিয়া তিনি তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে নূতন করিয়া গঠন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সকল সৈন্য লইয়া সেখানে তিনি সমস্ত কাটোয়া সহর ও তাহার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে শিবির করিলেন। অচিরেই বর্ষা আরম্ভ হইল—লুটতরাজ আর সম্ভব হইল না। কেবল পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে ভাস্কর খাজানা আদায় করিতে লাগিলেন।

ক্রমে আশ্বিন মাস পড়িল। মহাসমারোহে ভাস্কর দুর্গাপূজা সম্পন্ন করিলেন। ইতিমধ্যে বর্গীরা গঙ্গার উপর দিয়া এক সেতু নির্মাণ করিয়া লইয়াছে। একদিন তাহারা সেতুর উপর দিয়া নদীর পূর্বতীরে উপস্থিত হইল। ইহা শুনিবামাত্র নবাব ষাট হাজার ঘোড়া ও দেড় লক্ষ সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই বিপুল সৈন্য তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল। বর্গীরা তাহাদের সেতুপথে কোন রকমে নদী পার হইয়া সেতুটি তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া দিল। নবাবের সাহায্যের জন্য পূর্ণিয়া ও পাটনা হইতে সৈন্য প্রেরিত হইল। নবাব সসৈন্যে ভাগীরথী পার হইতে চাহিলে বর্গীরা তাহাতে প্রাণপণ বাধা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নবাবের সৈন্য নৌকাযোগে নদী পার হইয়া অজয়ের তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গেল। অজয় পার হইবার কালে নবাবসৈন্যের মধ্যে এক দুর্ঘটনার ফলে তাহাদিগকে সাঁতরাইয়া তীরে উঠিতে হইল—তাহারা বর্গীর পিছনে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। বর্গীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া নিজ দেশে পলাইয়া গেল।

সেই বৎসরই চৈত্র মাসে ভাস্কর বর্গীর দল লইয়া পুনরায় আসিয়া বাংলা দেশ

আক্রমণ করিলেন। এইবার তাঁহার অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল, গো-ব্রাহ্মণ ও নারী নির্বিচারে বধ করা হইতে লাগিল। এইবার আসিয়াও তিনি কাটোয়াতে তাঁবু ফেলিলেন। নবাবও তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া মানকরে তাঁবু ফেলিলেন। আলী ভাই নামক এক ব্যক্তি ভাস্করকে কহিলেন, 'এই-ভাবে বারবার আক্রমণ করিয়া সৈন্যক্ষয় করিবার প্রয়োজন কি? নবাবের সঙ্গে এই বিষয়ে একটা আপোষ-মীমাংসা করিয়া লইলেই ত হয়?' ভাস্কর বলিলেন, 'বেশ, নবাব যদি ইহাতে রাজী হন, তাহা হইলে আমার আপত্তি কি? তুমি বরং নবাবের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ কর।' আলী ভাই নিরস্ত্র অবস্থায় একাকী নবাবের সম্মুখীন হইয়া ভাস্করের প্রস্তাব তাঁহাকে জানাইল। আলী ভাই বলিল, 'যদি আপনার দুইজন সরদারকে আমার সঙ্গে দেন, তবে ভাস্করকে আমি নিজেই তাহাদের সঙ্গে করিয়া আপনার সম্মুখে লইয়া আসিতে পারি। আপনারা দুইজনে সামনা-সামনি সন্ধির সর্ত বিষয়ে আলোচনা করুন।' নবাবের পক্ষ হইতে জানকীরাম ও মুস্তাফা খাঁ আলী ভাইকে লইয়া ভাস্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য গেল। তাহারা ভাস্করকে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু ভাস্করের লোক তাঁহাকে এই কাজ করিতে নিষেধ করিল। ইহাতে জানকীরাম গঙ্গাজল ও মুস্তাফা খাঁ কোরাণ স্পর্শ করিয়া ভাস্করের নিরাপত্তার ভার নিজেদের উপর গ্রহণ করিল। মাত্র কুড়িজন সঙ্গী লইয়া ভাস্কর নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। সেদিন শনিবার, ২রা বৈশাখ। ভাস্কর নিরস্ত্র হইয়া একাকী নবাবের সম্মুখীন হইলেন—তাঁহার সঙ্গিগণ বাহিরে রহিল। সামান্য দুই একটি কথার পর নবাব একটি সামান্য অজুহাত দেখাইয়া বাহির হইয়া গেলেন—তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া ভাস্কর উঠিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় নবাবের লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল। তাঁহার সঙ্গিগণও নিস্তার পাইল না। নবাবের শিবির আনন্দ-কোলাহলে নিমগ্ন হইল।

এই কাহিনীতে ঐতিহাসিক তথ্য সমাবেশ করিতে কবি যথেষ্ট নিপুণতা দেখাইয়াছেন। কারণ, উপরে যে সকল ঘটনা পর পর [illegible]র্ণনা করা হইল, তাহাদের সঙ্গে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের বিশেষ [illegible] বির[illegible][1] দুই এক জায়গাতে অতি সামান্য যে তাহার ব[illegible] [illegible]পেক্ষা করা যাইতে পারে। কবি দক্ষিণ দেশের রা[illegible] [illegible]ম ময়মন[illegible] উল্লেখ করিয়াছেন—অবশ্য

[1] H. B. II., 45[illegible] , 40;

দক্ষিণ দেশ বলিতে কবি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মহারাষ্ট্রদেশই যে মনে করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না। মহারাষ্ট্রপতি ও তাঁহার অনুচরদিগের নামোল্লেখ করিতে কবি ভুল করেন নাই। রাজা সাহু বলিতে শিবাজীর পৌত্র রাজা সাহুর কথাই মনে করা হইয়াছে। ১৭৪৯ খৃস্টাব্দে রাজা সাহুর মৃত্যু হয়, কিন্তু তাহার পূর্বেই তিনি মহারাষ্ট্রের শাসনভার বালাজী বাজিরাও'র হাতে অর্পণ করেন। বালাজী বাজিরাও ১৭৫০ খৃস্টাব্দ হইতে ১৭৬১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মহারাষ্ট্র-জাতির অধিনায়ক ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে যখন ভাস্কর বাংলা আক্রমণ করেন, তখন রাজা সাহু জীবিতই ছিলেন। রাজা রঘু বলিতে কবি নিশ্চয়ই বেরারের ভোঁস্‌লা পরিবারের প্রতিনিধি রঘুজী ভোঁস্‌লার কথা মনে করিয়াছেন। বালাজী বাজিরাও'র সময় মারাঠাগণ যে দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে বাংলার রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ বা চৌথ আদায় করিত, তাহাও ঐতিহাসিক সত্য।

১৭৪০ খৃস্টাব্দে আলীবর্দী খাঁ নবাব সরফরাজ খাঁর নিকট হইতে বাংলার মস্‌নদ অধিকার করিয়া লন। দেশের আভ্যন্তরিক গোলযোগের জন্য ইহার পর দুই বৎসর বাংলার রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরিত হয় নাই। সেইজন্য মারাঠাগণও তাহাদের চৌথ হইতে বঞ্চিত হয়। ১৭৪২ খৃস্টাব্দে নাগপুরের শাসনকর্তা রঘুজী ভোঁস্‌লা ভাস্কর রাম কোলহৎকারের অধীনে একদল মারাঠা সৈন্য দিয়া তাঁহাকে চৌথ আদায় করিবার জন্য বাংলায় পাঠান। মারাঠাগণ পশ্চিম বঙ্গ আক্রমণ করিয়া তাহার অন্তর্গত কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়া লয়, এবং অর্থ আদায়ের জন্য তথাকার লোকজনের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। প্রথমবারের আক্রমণ শেষ পর্যন্ত আলীবর্দী প্রতিহত করিতে সমর্থ হ'ন। ১৭৪৪ খৃস্টাব্দে রঘুজীর সেনাপতি ভাস্কর পুনরায় বাংলা আক্রমণ করেন—সেইবার আলীবর্দী বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া ভাস্করকে হত্যা করেন, ফলে মারাঠা সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়া যায়। এই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরই গঙ্গারাম তাঁহার কাহিনী রচনা করিয়াছেন। উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ অনুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গঙ্গারামের কাহিনীর সঙ্গে তাহাদের ঐক্য আছে। অতএব গঙ্গারামের এই রচনাটি অষ্টাদশ শতাব্দীর [illegible]কটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনার নির্ভুল বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করা যাই[illegible]ব। গঙ্গারামের উল্লেখিত কোন কোন বিষয় ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া [illegible], তাহাও একেবারে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না,—প্রত্যক্ষ[illegible] হউক, কিংবা নির্ভরযোগ্য কোন তথ্যের

উপর ভিত্তি করিয়াই হউক, গঙ্গারাম তাহা রচনা করিয়া তাঁহার কাব্যমধ্যে স্থান দিয়া থাকিবেন, এই বিষয়ে ইতিহাসের সঙ্গে তাঁহার এই রচনাখানি সমপর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। কল্পনার রশ্মি গঙ্গারাম অত্যন্ত সংযত করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে কবিত্বের নিতান্ত অভাব ছিল বলিয়াই নীরস ঐতিহাসিক তথ্যগুলিই তাঁহার রচনায় সহজ স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে।

গঙ্গারাম তাঁহার রচনার মধ্যে নিজের কোন পরিচয় দিয়া যান নাই। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মনে করেন যে, কবি রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন।[১] কিন্তু ইহার স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি এই যে, তাঁহার কাব্যে তিনি রাঢ়ে বর্ণিত একটি ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন, গঙ্গারাম যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের অধিবাসী।[২] ইহারও একমাত্র যুক্তি এই, নড়াইলে গঙ্গারাম দত্ত নামক রামায়ণের একজন অনুবাদকের নিবাস ছিল। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে, রামায়ণের অনুবাদক গঙ্গারাম দত্তের সময় জানা যায় নাই—রামায়ণের অনুবাদের ভাষা ও 'মহারাষ্ট্র-পুরাণে'র ভাষায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য, রামায়ণের অনুবাদ সংস্কৃত-প্রভাবিত ও তৎকালীন প্রচলিত সাধুরীতি সম্মত, কিন্তু 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ' আনুপূর্বিক পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলের কথ্যভাষায় রচিত। অতএব রামায়ণের অনুবাদ-রচয়িতা গঙ্গারাম দত্তই 'মহারাষ্ট্র-পুরাণে'র গঙ্গারাম এ'কথা স্বীকার করা যায় না।

এ'কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'মহারাষ্ট্র-পুরাণে'র একমাত্র পুঁথি পূর্ব-ময়মনসিংহের অন্তর্গত ধারীশ্বর গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে—এবং এই অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষাতেই যে ইহা রচিত, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। স্বর্গত মুস্তফী মহাশয় বলিয়াছেন, পুঁথির পূর্ববঙ্গবাসী অনুলিপিকার ইহা তদ্দেশীয় ভাষায় পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের বহু কবির পুঁথি পূর্ববঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছে—কিন্তু এই প্রকার আনুপূর্বিক ভাষা পরিবর্তীকরণের দৃষ্টান্ত আর কোন পুঁথির বেলায় দেখা যায় নাই,—কবির জীবদ্দশাতেই তাহা আরও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অতএব যথার্থই মনে করা হইয়াছে যে পুঁথিখানি কবিরই স্বহস্ত-লিখিত।[৩] সুতরাং পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলই যে কবির নিবাস তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

অতএব যিনি মনে করিয়াছেন, গঙ্গারাম ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ

---

[১] সা-প-প ১৩, ২৫৭; [২] সা-প-প ৪৬, ৪০; [৩] সা-প-প ১৫, ২৫০

মহকুমার অন্তর্গত ধারীশ্বর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, তাঁহার অনুমান যথার্থ বলিয়া মনে হয়।[১] গঙ্গারামের বংশধরগণ আজও ঐ গ্রামে বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে গঙ্গারামের সম্পর্কে এই বিবরণ জানিতে পারা যায়—গঙ্গারাম ঈশা খাঁর বংশধর জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদিগের অধীনস্থ একজন নায়েব ছিলেন। সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদে বর্গীর আক্রমণের সময় তিনি তাঁহার প্রভুর দেয় রাজস্ব পরিশোধ করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ গিয়াছিলেন,—মুর্শিদাবাদে সংঘটিত ঘটনাসমূহ তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং সেখানে অবস্থান কালেই অন্যান্য প্রত্যক্ষ সূত্র হইতে এই সংক্রান্ত অন্যান্য ঘটনারও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াই তিনি তাঁহার এই অপূর্ব অভিজ্ঞতার বিষয় এই আখ্যায়িকা কাব্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—তাঁহার কাব্যখানির কোন প্রচার হয় নাই, ইহার আর দ্বিতীয় পুঁথি পাওয়া যায় নাই।

ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠাই গঙ্গারামের রচনার একমাত্র গুণ। রচনা কিংবা ভাষাগত কোন কৃতিত্ব তাঁহার কাব্যে প্রকাশ পায় নাই। বহুস্থলে তাঁহার রচনা নিতান্ত গ্রাম্যতা-দোষ দুষ্ট। সেকালের বাংলা সাহিত্যে দেবদেবীর অলৌকিক মাহাত্ম্যসূচক গতানুগতিক রচনার মধ্যে তাঁহার এই ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন বিষয়ে সতর্কতা কৌতূহলী পাঠকের নিকট একটু নূতনত্বের আস্বাদ সৃষ্টি করে মাত্র, ইহার আর কোন গুণ নাই।

ভারতচন্দ্র—'মানসিংহ-কাব্য'

এইবার খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ-কাব্যে'র কথা উল্লেখ করিতে হয়।[২] তাঁহার জীবনী পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, অতএব তাহার আর পুনরুল্লেখ করিব না। তাঁহার 'মানসিংহ-কাব্যে'র ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্যই এখানে বিচার করিয়া দেখা যাইবে। 'মানসিংহ-কাব্য' ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গলে'রই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি স্বতন্ত্র কাব্য। আট দিনের বিভিন্ন পালায় ইহা অন্নদা ও বিদ্যার কাহিনীর সঙ্গে ক্রমান্বয়ে একত্র গীত হইলেও, কাহিনীর দিক বিচার করিয়া দেখিলেই ইহার স্বাতন্ত্র্য সহজেই অনুভূত হইবে। সেইজন্য এখানে ইহার পৃথক আলোচনা করা যাইতেছে।

কেদারনাথ মজুমদার, ৭৫
ভারতচন্দ্র রায়, গ্রন্থাবলী (বসুমতী, ১৪সং), ১১৫-১৪৩

'মানসিংহ-কাব্যে'র রচনাকাল ১৭৫৩ খৃস্টাব্দ—সমগ্র 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যখানিই এক সঙ্গে এই সময়েই রচিত—ইহার প্রথম খণ্ডে দেবতা, দ্বিতীয় খণ্ডে মানুষ ও তৃতীয় খণ্ডে অতীত ইতিহাস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহার তৃতীয় খণ্ড বা 'মানসিংহ-কাব্য' রচনায় ভারতচন্দ্রের প্রতিভার একটা নূতন দিকের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়।

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও 'মানসিংহ-কাব্য' কাব্যই, ইতিহাস নহে। এমন কি গঙ্গারামের মধ্যে যে তথ্যনিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ-কাব্যে'র মধ্যে তাহা নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, গঙ্গারাম সম্ভবতঃ তাঁহার বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, ভারতচন্দ্র তাহা ছিলেন না—প্রচলিত জনশ্রুতি ও কুলপঞ্জী শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে তাঁহার তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভারতচন্দ্র ছিলেন কবি, গঙ্গারাম ছিলেন বর্ণনাদাতা (narrator)। অতএব ভারতচন্দ্রের নিকট তথ্য যে বহুলাংশে পল্লবিত হইবে, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। 'মানসিংহ-কাব্য' ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া রচিত হইলেও তাহাতে দেবতারও একটি স্থান আছে, কিন্তু গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র-পুরাণে' তাহা নাই—এই সকল কারণে ভারতচন্দ্রের রচনা হইতে ঐতিহাসিক তথ্য অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যখানির পরিচয় দিতে গিয়া মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম তাহাতে যুক্ত করিয়াছেন—তিনি মোগল সম্রাট্ আকবরের রাজপুত সেনাপতি মানসিংহ। মানসিংহের বাংলা আক্রমণের কাহিনী লইয়াই তাঁহার এই কাব্য রচিত। বাংলার ইতিহাসে ইহা একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরামও মানসিংহের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহার কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন। মানসিংহের সঙ্গে বাংলার বারভূঞার যুদ্ধের বৃত্তান্ত বাংলার ইতিহাসের অতি মূল্যবান উপাদান। ভারতচন্দ্র এই উপাদান তাঁহার কাব্যে কি ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, এখন তাহাই বিবেচ্য।

মানসিংহ ব্যতীতও এই কাব্যে জাহাঙ্গীর, প্রতাপাদিত্য, ভবানন্দ প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গেও আমরা সাক্ষাৎকার লাভ করি। প্রকৃত ঐতি[illegible] তথ্যের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জা[illegible] যদি ভারতচন্দ্র কোন ঐতিহাসিক তথ্য এই কাব্যের মধ্য হইতে পাওয়া যায় [illegible]রণী হইতে ভবানন্দ সম্পর্কে যাহা পাওয়া যায়, তাহা ইতিহাস-বিরোধী[illegible] [illegible]শোর ও খুলনা জিলার

প্রতাপাদিত্য ও ভবানন্দ সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাও বহুলাংশে বিকৃত। 'মানসিংহ-কাব্য' রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য—কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের মহিমা-কীর্তন, অন্নদার মাহাত্ম্য বর্ণনাও নহে, কিংবা ইতিহাসেরও মর্যাদা রক্ষা নহে। নবদ্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা, অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য তিনি মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন —ইহাই প্রধানতঃ 'মানসিংহ কাব্যে'র প্রতিপাদ্য বিষয়। ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ প্রসঙ্গতঃ ইহার সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, কাব্যখানির নাম মানসিংহ না হইয়া ভবানন্দ হওয়া উচিত ছিল। মানসিংহের মত একটি খ্যাতনামা ঐতিহাসিক চরিত্রের নাম ইহার সঙ্গে যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই এই কাব্যের নাম মানসিংহ রাখা হইয়াছে। মূল কাহিনীর মধ্যে প্রতাপাদিত্যেরও কোন স্থান নাই—কেবলমাত্র মানসিংহকে একটু প্রাধান্য দিবার জন্যই প্রতাপাদিত্যের অবতারণা করা হইয়াছে। কাহিনীর তথাকথিত ঐতিহাসিক অংশটি সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করিয়া লইলেই বিষয়গুলি স্পষ্ট হইবে,—

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক বসন্ত রায়ের হত্যার পর বসন্ত রায়ের পুত্র কচুরায় দিল্লীতে জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। জাহাঙ্গীর প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য মানসিংহকে বাংলায় পাঠাইলেন। মানসিংহ কচুরায়কে সঙ্গে লইয়া বর্ধমান পর্যন্ত আসিলেন। ভবানন্দ মজুমদার তখন সামান্য একজন কানুনগোর কাজ করিতেন—তিনি বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়া মানসিংহকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বাংলাদেশের বিস্তৃত অবস্থা তাঁহাকে জানাইলেন। যশোরের পথে মানসিংহ বাগোয়ানে আসিয়া পৌছিলেন—বাগোয়ানে ভবানন্দ মজুমদারের নিবাস ছিল। এখানে আসিয়া ঝড় বাদলে মানসিংহের সৈন্যগণ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। ভবানন্দ মানসিংহকে এই বিপদে সাহায্য করিলেন। যশোর যাইবার সময় মানসিংহ ভবানন্দকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া দিল্লীর পথে ফিরিয়া চলিলেন। ভবানন্দও তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। পথিমধ্যে অনাহারে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইল। ভবানন্দের অনুভূত হই...। বশতঃ মানসিংহ তাঁহাকে জাহাঙ্গীরের দরবারে লইয়া উপস্থিত ...সিংহের নিকট হইতে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জাহাঙ্গীর ...দিলেন। দিল্লীশ্বরের ফরমান লইয়া ভবানন্দ স্বদেশে

১ কেদারনাথ মজু...

২ ভারতচন্দ্র রায়, গ্র...

প্রত্যাবর্তন করিলেন। কবি অন্নদার মুখ দিয়া ভবানন্দের 'দ পাওয়া যায় নাই।
সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যেও হার শোচনীয় ভাবে
সত্য আছে। তে তাঁহার মৃত্যু

'মানসিংহ-কাব্যে'র ঐতিহাসিক অংশটি কবি অতি সংক্ষেপে বর্ণনার বলিয়া কেহ পূর্বেই বলিয়াছি, এই কাব্যের মূল উদ্দেশ্য ইতিহাস কীর্তন নহে, বলেন—তিনি পূর্বপুরুষ ভবানন্দের মহিমা কীর্তন। অতএব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র ঐ পাঁচ ছয় ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। ভবানন্দের সম্পর্কেই মানসিংম খাঁ প্রতাপাদিত্যের কথা আসিয়াছে—কবির মধ্যে কোন ঐতিহাসিক প্রেরণা ...তে তাঁহাদের কথা এখানে আসে নাই। ভবানন্দ ও কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে পাঁচ পুরুষ বা অন্ততঃ ১২৫ বৎসরের ব্যবধান মাত্র, এবং ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া তাঁহার রচনায় অন্ততঃ ভবানন্দ সম্পর্কে কতকটা নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্য আশা করা অসঙ্গত নহে। এখন দেখা যাউক, ভারতচন্দ্র এই আশা কতদূর পূর্ণ করিতে সক্ষম হইযাছেন।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, 'মানসিংহ-কাব্যে'র ভিত্তি কি? সেকালে ইতিহাস আলোচনার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির তখনও বিকাশ হয় নাই। ঘটকের পুঁথি নামক এক শ্রেণীর কুলজী-গ্রন্থে খ্যাতনামা পরিবারসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিত। দুইশত বৎসরের অধিককালের বিবরণ তাহাতে পাওয়া যাইত না—তাহাও ক্রমিক ঘটনার যথাযথ ইতিহাস না হইয়া সাধারণতঃ বিশেষ কোন সময়ের, বিশেষ ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিদিগের বিবরণই তাহাতে বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া থাকিত। জনশ্রুতি ইহাদের প্রধান ভিত্তি। প্রধানতঃ এই শ্রেণীর ঘটকের পুঁথি অবলম্বন করিয়াই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে 'ক্ষিতীশবংশাবলী' ও ভারতচন্দ্রের এই 'মানসিংহ-কাব্য' রচিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কালে নবদ্বীপ রাজবংশ সম্পর্কে যে সকল জনশ্রুতি এদেশে প্রচলিত ছিল, তাহাদের সমস্তই তিনি তাঁহার কাব্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি যেমন তাঁহার নিজেরও ছিল না, তেমনই তৎকালীন সমাজে তাহার জন্য দাবীও অন্য কাহারও ছিল না। তথ্য-পরিবেশনের পরিবর্তে মহিমা কীর্তনই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে তাহা আশাও করা যাইতে পারে না। যদি ভারতচন্দ্র প্রকৃতই তথ্যনিষ্ঠ হইতেন, তবে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের রিবারিক বিবরণী হইতে ভবানন্দ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিতে পারিতেন। দীয়া, যশোর ও খুলনা জিলার

প্রতাপাদিত্য ও ভবানন্দয়তা উক্ত ‘ক্ষিতীশবংশাবলী’ ও ‘মানসিংহ-কাব্য’র ভিত্তি কিন্তু তাহাও বহুলাঃ ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। কিন্তু কয়েকজন আধুনিক পূর্বপুরুষ ভবানন্দ.বেষণায় মানসিংহ, ভবানন্দ ও প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে সম্প্রতি ইতিহাসেরও মসিক তথ্যের উদ্ধার হইয়াছে। তাঁহাদের গবেষণালব্ধ তথ্যের দেবতা, অন্নদম্নে ‘মানসিংহ-কাব্যে’র ঐতিহাসিকতা বিচার করা হইতেছে।

—ইহাই পাদিত্যের সঙ্গে মানসিংহের যুদ্ধ বর্ণনায়ই ভারতচন্দ্রের মূল ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গেমানসিংহের কোন যুদ্ধই হয় নাই ;[১] মানসিংহ বারভূঞার মধ্যে এই সকল স্বাধীন ভূঞাদিগের সঙ্গে বাংলাদেশে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন,—যেমন ইস্‌লাম খাঁ, কত্‌লু খাঁ, সুলেমান, ওস্‌মান, ঈশা খাঁ, কেদার রায় ইত্যাদি—ইঁহাদের মধ্যে প্রতাপাদিত্যের নাম আসে না। মানসিংহের সঙ্গে বাংলার ভূঞাদিগের যুদ্ধের বৃত্তান্ত ‘আকবর-নামা,’ ‘ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী,’ ‘মুন্তা-খাবুৎ-তাওয়ারখ্‌’, ‘মখ্‌জান-ই-আফ্‌গানা’—সমসাময়িক কালে রচিত ও পারসী ভাষায় লিখিত এই সমস্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কিন্তু ইহাদের কাহারও মধ্যে প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ নাই। প্রতাপাদিত্যের বৃত্তান্ত একমাত্র ‘বাহার-ই-স্তান’ নামক একখানি পারসী-ভাষায় লিখিত পুস্তকে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা মিরজা নথন নামক এক ব্যক্তি ইস্‌লাম খাঁর সেনাপতি ছিলেন। ইস্‌লাম খাঁর বাংলা আক্রমণের সময় তিনি তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং ইস্‌লাম খাঁর অভিযানের বৃত্তান্ত ডায়েরীর আকারে এই গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানসিংহ দিল্লী ফিরিয়া যাইবার পর বারভূঞার বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ইস্‌লাম খাঁ ১৬০৭ খৃস্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন। সেই সময় প্রতাপাদিত্য প্রথম তাঁহার পুত্র ও মন্ত্রীকে পাঠাইয়া ও পরে নিজেও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লন। প্রতাপাদিত্য ভূঞাদিগকে দমন করিবার কার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ১৬১১ খৃস্টাব্দে ওস্‌মানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইস্‌লাম খাঁ প্রতাপাদিত্যের নিকট আশানুরূপ সাহায্য না পাইয়া নিজেই প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া যান। এই অভিযান ভবানন্দের নিবাস বাগোয়ানের উপর দিয়া অগ্রসর হয়। ইস্‌লাম খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হ’ন। বন্দী অবস্থায় তিনি ঢাকায়

[১] H. B. II, 251, 264-70

(দিল্লীতে নহে) নীত হন—তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মনে হয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকায় মোগলের কারাগারে তাঁহার শোচনীয় ভাবে মৃত্যু হয়; কিংবা বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে নীত হইবার কালে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহাও সত্য হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। মানসিংহ ১৬০৬ খৃস্টাব্দে বাংলা ত্যাগ করিয়াছিলেন—তিনি আর বাংলায় ফিরিয়া আসেন নাই। ঐতিহাসিক সত্য এই যে, ইহার পাঁচ ছয় বৎসর পর প্রতাপাদিত্যের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে—অতএব ইহার সঙ্গে ইস্‌লাম খাঁ জড়িত, মানসিংহ নহেন।

কোন প্রামাণিক ইতিহাস হইতে ভবানন্দ সম্পর্কে কিছু জানিবার উপায় নাই। ভারতচন্দ্র তাঁহার বিষয়ে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সাধারণ ভাবে সত্য হইতে পারে। মানসিংহ যখন বর্ধমানে আসেন, তখন ভবানন্দ তাঁহার সঙ্গে গিয়া হয়ত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন—তখন তিনি মোগল সম্রাটের অধীনে দুই তিনটি পরগণার জমিদার ও হুগলীর কানুনগো ছিলেন। এই সূত্রেই মানসিংহকে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া লওয়া সম্ভব। মানসিংহের বাগোয়ান যাওয়া সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। ভবানন্দ মানসিংহের নিকট হইতে তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য নহে। মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষরিত যে দুইটি ফরমান্ কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে অদ্যাপি রক্ষিত আছে, তাহাদের প্রথমটির তারিখ ১৬০৬ খৃস্টাব্দ—ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভবানন্দ মানসিংহের নিকট হইতে মাহ্‌মুদপুর নামক একটি পরগণা লাভ করেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় মনে করেন যে, তাঁহার জমিদারীর সংলগ্ন এই সাধারণ জনবিরল পরগণাটি ভবানন্দ স্বাভাবিক ভাবেই পাইয়াছিলেন—এইজন্য প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন সাহায্যদানের কথারই আবশ্যক হইতে পারে না।[১] কৃষ্ণনগর রাজবাটীর দ্বিতীয় ফারমান্‌টির তারিখ ১৬১৩ খৃস্টাব্দ, অর্থাৎ ইহা প্রতাপাদিত্যের পতনের পরে প্রদত্ত হয়। মনে হয়, ইস্‌লাম খাঁ যখন ভবানন্দের বাসস্থান বাগোয়ানের উপর দিয়া প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া যান, তখন তাঁহার কোন সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ কিংবা সাহায্যের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আরও সাতটি পরগণা তাঁহাকে দান করা হয়—কিন্তু উক্ত 'বাহার-ই-স্তান' কিংবা ফরমানে এই বিষয় কিছুই উল্লেখিত নাই—অতএব এই বিষয়ে

[১] নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 'প্রতাপাদিত্যের কথা', ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩৮, ৩৫৩-৬৩ দ্রষ্টব্য।

নিঃসংশয়ে কিছুই বলিতে পারা যায় না। ভবানন্দ দুর্গাদাস ও রায় বসন্ত নামক তাঁহার দুই ভ্রাতাকে দিল্লী পাঠাইয়া প্রথম ফরমান্‌টি আনাইয়াছিলেন—তিনি নিজে দিল্লী গিয়াছিলেন বলিয়া কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, কিন্তু তাঁহার নিজের যাওয়াও খুব স্বাভাবিক। প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মানসিংহের সাক্ষাৎকারের কথা কোন প্রামাণিক ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

ভারতচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন যে, যশোর আক্রমণ করিবার পূর্বে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন, দূতের হস্তে একটি তরবারি ও একটি শৃঙ্খল দিয়া বলেন, 'ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি তাঁহাকে বাছিয়া লইতে বলিও।' প্রতাপাদিত্য ইহাদের মধ্য হইতে তরবারিটি তুলিয়া লইয়া দূতের মুখে মানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন—

'কহ গিয়া আরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে ॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে ॥'

মানসিংহের উদ্দেশ্যেই হউক, কিংবা ইস্‌লাম খাঁর উদ্দেশ্যেই হউক, প্রতাপাদিত্যের এই বীরত্ব-ব্যঞ্জক উক্তি কবি-কল্পনারই ফল বলিতে হয়। বহু বীর যোদ্ধার জীবনী সম্পর্কে অনুরূপ উক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। বিশেষতঃ এখানে প্রতাপাদিত্যের মোগলের প্রতি আনুগত্যের কথা যখন ইতিহাসে লিখিত আছে, তখন ইহার অনৈতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

ভারতচন্দ্র যে প্রতাপাদিত্যের 'বাহান্ন হাজার ঢালী'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও কবি-কল্পনারই ফল বলিতে হয়। আব্দুল লতিফের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রতাপের বিশ হাজার সৈন্য ও ৭০০ শত রণতরী ছিল। ভারতচন্দ্র তাঁহার রণতরীর কথা কিছুই উল্লেখ করেন নাই—অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্র হইতেও প্রতাপের নৌবাহিনীর কথা জানিতে পারা যায়।

'মানসিংহ-কাব্যে'র উপসংহারে ভারতচন্দ্র অন্নদার মুখ দিয়া কৃষ্ণনগরের রাজবংশাবলী ও তাহার রাজাদিগের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা হইতেই

জানিতে পারা যায়, ভবানন্দের পর গোপাল, গোপ[illegible]
রাজা হ'ন। রাঘব সম্পর্কে ভারতচন্দ্র অন্নদার মুখ দিয়া [illegible]

দেগাঁয়ে আছিল রাজা দেপাল কুমার
পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার ॥
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্য ধন ॥

দেবগ্রামের রাজা দেবপাল তন্তুবায় বংশজাত ছিলেন। প্রণেতা বলিয়াছেন, 'এই উক্তির মূলে কতখানি ঐতিহাসিক সত্য অ বলিতে পারা যায় না'।[১] কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, দেবপালের বংশের প তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজা রাঘবের হস্তগত হয়। রাঘব সম্পর্কে ভারতচন্দ্র আরও বলিয়াছেন,

গ্রাম দীঘি নগর যে করিবে পত্তন।
দীঘি কাটি করিবেক শঙ্কর স্থাপন ॥
তার পুত্র হইবেক রাজা রুদ্র রায়।
বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায় ॥

উদ্ধৃত বিবরণ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই মনে হয়। রুদ্র রায় জমিদারী বিস্তৃততর করেন, তাঁহার তিন পুত্র ছিল—রামচন্দ্র, রামজীবন ও রামকৃষ্ণ। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন

রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার।
রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার ॥
জিনিবেক শোভা সিংহ আদি রাজযাজি।
সোমযাগ করি নাম হবে সোমযাজী ॥
এই ঝাঁপী হেলন করিবে অহঙ্কারে।
সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে ॥
নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে।
রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে ॥

দীর্ঘ ঐতিহাসিক তথ্যকে কবি এখানে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথার ভিতর দিয়া অতি কৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে যে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের উল্লেখ করা

১ কুমুদনাথ মল্লিক, নদীয়া-কাহিনী (রাণাঘাট, ১৩১৯), ২৭

পুত্র রামকৃষ্ণকে যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া রুদ্র রায়
াধিকারী নির্বাচিত করিয়া গিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার
জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র ঢাকার নবাব ও হুগলীর ফৌজদারের
মিদারী নিজে হস্তগত করেন। একবার রামজীবন কিছু
করিয়া তাঁহাকে গদিচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন—কিন্তু ব্যর্থকাম
ত বিতাড়িত হ'ন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর রামজীবন দ্বিতীয় বার
র করিবার চেষ্টা করেন—কিন্তু তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণের
কার নবাব কর্তৃক বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হ'ন। রামকৃষ্ণের সঙ্গে
ব মুর্শিদকুলি খাঁর কোন কারণে মনোমালিন্য হয়। এইজন্য রামকৃষ্ণকে তিনি ঢাকায় বন্দী করিয়া রাখেন। কারাগারে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয়—তাঁহার মৃত্যুর পর রামজীবন মুক্তিলাভ করেন ও নদীয়ায় আসিয়া এইবার পৈতৃক জমিদারী লাভ করেন।

খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ধমানে শোভা সিংহ প্রবল হইয়া উঠেন এবং বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামকে বধ করেন।[১] তাঁহার পুত্র জগৎ রায় পলাইয়া আসিয়া নবদ্বীপে রামকৃষ্ণের আশ্রয়প্রার্থী হ'ন। শোভা সিংহ মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের নিকট তাহারা পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যায়। রামজীবনের চারি পুত্র ছিল—রাজারাম, রামকৃষ্ণ, রঘুরাম এবং রামগোপাল। ইঁহাদের মধ্যে রঘুরাম রাজা হইলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রঘুরামের পুত্র। কৃষ্ণচন্দ্র সম্পর্কে ভারতচন্দ্র অন্নদার মুখ দিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন,

> শকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে।
> বরগীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে॥
> আলিবর্দী কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি ল'য়ে যাবে।
> নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে॥
> বদ্ধ করি রাখিবেক মুর্শিদাবাদে।
> মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে॥

আলীবর্দীর রাজ্য লাভ ও বর্গীর আক্রমণ সম্বন্ধে ইহাতে যে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সঙ্গে ইতিহাসের মোটামুটি মিল আছে। এই সকল ঘটনা কবির

---

১ H. B. II, 93-94

জীবদ্দশাতেই ঘটিয়াছিল বলিয়া এই বিষয়ে তাঁহার উক্তিসমূহ প্রামাণিক বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনাকে পল্লবিত করিয়া প্রকাশ করিবার অভ্যাস ভারতচন্দ্রের ছিল না—কিন্তু যে সকল ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না, কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে তাহাদের বিবরণও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, কেবল মাত্র সেই সকল ক্ষেত্রেই ভারতচন্দ্র প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করিতে পারেন নাই। পুনঃ পুনঃ বর্গীর আক্রমণের জন্য আলীবর্দীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল—রাজভাণ্ডার শূন্য হইয়া গেল। কৃষ্ণচন্দ্র দশ লক্ষ টাকা পৈতৃক ঋণ ও নিজের দুই লক্ষ টাকা নজরানা আলীবর্দীকে পরিশোধ করিতে না পারিয়া মুর্শিদাবাদের কারাগারে বন্দী হইলেন। কিন্তু রঘুনন্দন মিত্র নামক তাঁহার একজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী পরম যোগ্যতার সঙ্গে জমিদারী তত্ত্বাবধান করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই এই অর্থ সংগ্রহ করিয়া মহারাজকে কারাগার হইতে মুক্ত করেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস রচনার রীতি তখনও আরম্ভ হয় নাই—বিশেষতঃ ঐতিহাসিক তথ্যের খুঁটিনাটির দিকে তখনও সমাজের কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হইতে পারে নাই; অতএব প্রকৃত ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝায়, ভারতচন্দ্রের মধ্যে তাহা নাই। ভারতচন্দ্র যদি ইচ্ছা করিতেন, তবে ভবানন্দ সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক ইতিহাস কিংবা 'ঐতিহাসিক কাব্য' রচনা করিতে পারিতেন—কারণ, নবদ্বীপ রাজপরিবারের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন বলিয়া এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতে তাঁহার কোন অসুবিধা হইত না। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সেই ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কৃষ্ণচন্দ্রের বংশমহিমা প্রচার—অতএব 'মানসিংহ-কাব্য' উদ্দেশ্য-মূলক রচনা, সুতরাং ইহা হইতে ইতিহাস কিংবা কাব্য কাহারও পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা পাইতে পারে না।

'মানসিংহ-কাব্যের' কাহিনীর মধ্যকার এই সকল ঐতিহাসিক ত্রুটির কথা ছাড়িয়া দিলেও কাব্য হিসাবেও যে ইহা খুব সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহাও বলিতে পারা যায় না। ইহার আখ্যায়িকার প্রকৃত কোন নায়ক কিংবা নায়িকা নাই; কাহিনীর মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ সংহতি নাই, কিংবা কেন্দ্রমুখী কোন ঐক্য নাই। ইহার মধ্যে যে কতকগুলি চরিত্র আছে, তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক কোন যোগ নাই। আপাত-দৃষ্টিতে ভবানন্দকে কাব্যের নায়ক মনে হইতে পারে—কিন্তু নায়কোচিত কোন গুণ তাঁহার মধ্যে নাই। সেইজন্য কাব্যের মূল আদর্শ ই অত্যন্ত দুর্বল হইয়া

পড়িয়াছে। যদি ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্যকে অবলম্বন করিয়া প্রচলিত জনশ্রুতির ভিত্তিতেও কোন কাব্য রচনা করিতেন, তাহা হইলেও ইহা অপেক্ষা সফলকাম হইতে পারিতেন; কারণ, জনশ্রুতিমূলক প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের মধ্যে কাব্যের নায়কোচিত উপাদান ছিল—ভবানন্দের মধ্যে তাহা ছিল না। দুই এক জায়গায় প্রতাপাদিত্যের যে উল্লেখ আছে, তাহাতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ না পাইলেও, কাব্যের দিক দিয়া নায়কোচিত গুণে তাহা সার্থকতা লাভ করিয়াছে—অতএব মনে হয়, ভারতচন্দ্রের মধ্যে ঐতিহাসিক কাব্য রচনার প্রতিভা ছিল, কিন্তু প্রকৃত আদর্শের অভাবে তাহা স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই। এই কাব্যে ভবানন্দের জীবনের যে বাস্তব অংশটির বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতেও ভারতচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। মনে হয়, তাঁহার পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে কিছু লিখিতে গিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে—স্বাধীন প্রতিভা-বিকাশের অবকাশ তিনি পান নাই। সেইজন্য ইহা জীবন্ত না হইয়া নিতান্ত কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ভবানন্দ তাঁহার দুই স্ত্রীর সঙ্গে যে আচরণ করিয়াছেন, তাহার বর্ণনায় ভারতচন্দ্র তাঁহার সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন—তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা-বিকাশের এই একটি দুর্লভ অবকাশের তিনি সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। সকল দিক বিবেচনা করিয়া বলিতে হয়, 'মানসিংহ-কাব্যের' কোন কোন স্থানে ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ পাইলেও, কাব্যের দিক দিয়া ইহা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই—ইহা রাজার মুখাপেক্ষী রচনা, অতএব ইহার মধ্যে ইহার বেশী কিছু আশাও করা যায় না।

বিজয়রাম—'তীর্থমঙ্গল'

আর একখানি একটু অভিনব প্রকৃতির মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াই এই পুস্তকের উপসংহার করিব। ইহা পৌরাণিক, বৈষ্ণব কিংবা লৌকিক কোন মঙ্গলকাব্যেরই অন্তর্গত নহে। ইহার বিষয়-বস্তু স্বতন্ত্র। কাব্যখানির নাম তীর্থমঙ্গল।[১] ক্রমে 'মঙ্গল' শব্দটি এত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল যে, যে কোন বিষয়ক মাহাত্ম্যপূর্ণ কাব্য হইলেই তাহা মঙ্গল নামে অভিহিত হইত। তীর্থমঙ্গলও প্রকৃত পক্ষে একখানি তীর্থভ্রমণ কাহিনী এবং এই

১ বিজয়রাম সেন, তীর্থমঙ্গল, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত (সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২)

প্রসঙ্গেই ইহাতে তীর্থের মাহাত্ম্যাদিও বর্ণনা করা হইয়াছে। এই জন্যই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'তীর্থমঙ্গল'।

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে যে ভ্রমণ-কাহিনী কাব্যাকারে লিখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, চৈতন্যচরিতকারগণের চৈতন্যদেবের বিস্তৃত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রচনা হইতেই তাহা জানা যায়। অবশ্য তীর্থ যাত্রা ব্যতীত পূর্বে কেহ দেশান্তর-ভ্রমণে বাহির হইত না। সেই জন্য এই ভ্রমণ ব্যপদেশে দেশ-দেশান্তরের রীতিনীতির যেমন বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তেমনই তীর্থের দেবতাদিগেরও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশ্য দেব-মাহাত্ম্যই ছিল তাহার মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয়।

'তীর্থমঙ্গল'-রচয়িতার নাম বিজয়রাম সেন। তাঁহার নিবাস ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত ভাজনঘাট। তিনি জাতিতে বৈদ্য ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল বিশারদ। পলাশীর যুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক কালে চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত খিদিরপুরে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল নামে এক অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। কাশী যাত্রার মানসে তিনি বহু লোকজন সহ নৌকা সাজাইয়া গঙ্গাপথে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে পুঁটিমারীতে তাঁহার নৌকা আসিয়া লাগিল। এখান হইতে দুইজন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচন্দ্রের সহযাত্রী হইলেন। কবি বিজয়রাম সেনও আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহানুগমনের প্রার্থনা জানাইলেন। সঙ্গে একজন চিকিৎসক লওয়া ভাল বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ইহাতে আর আপত্তি করিলেন না। কবি সেখান হইতেই তাঁহার সঙ্গী হইলেন। অতঃপর নবদ্বীপ, হাঁড়রা, ঝিনুকঘাটা, টুঙ্গিবালী, জলঙ্গী, রাজমহল, মুঙ্গের, গয়া, রামনগর, কাশী, প্রয়াগ, বিন্ধ্যগিরি হইয়া পুনরায় ফিরিবার পথে মুঙ্গের, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ হইয়া ১১৭৭ সন ভাদ্র মাসে তাঁহারা সকলে খিদিরপুর প্রত্যাবর্তন করেন,

সাতাত্তরি সনেতে আর ভাদ্রপদ মাসে।
বিশারদে কহে পুঁথি কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে॥
শিবনিবাস সন্নিধানে ভাজনঘাট ধাম।
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে কহে সেন বিজয়রাম॥
শুন শুন মহাশয় বলিগো তোমারে।
মহাশয়ে আজ্ঞা দিলাম বিদায় কর মোরে॥

তীর্থযাত্রীদিগের মধ্যে একবার মারাত্মক বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হয়, বিজয়-রামের চিকিৎসায় অনেকেই আরোগ্য লাভ করে, এই কারণে বাটী ফিরিয়া কৃষ্ণচন্দ্র

তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বিজয়রাম প্রত্যেকটি স্থানের বর্ণনা দিয়াছেন। বিন্ধ্যগিরি দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে তাঁহারা মির্জাপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মির্জাপুরের বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন,

গঙ্গার তীরেতে গ্রাম বড়ই সহর।
যাহা চাহে তাহা মিলে সামগ্রী বিস্তর॥
স্নান পূজা ভোজন করিয়া মহাশয়।
আনন্দে সামগ্রী লয়েন যাহা মনে লয়॥
তুলিচা গালিচা আদি শতরঞ্চি শীল।
নানাবর্ণে ছিট লয়েন হয়্যা হৃষ্ট দিল্॥
অল্প কর্য়া দ্রব্য লৈল যার কিছু নাই।
শীল জাঁতা লয়্যা কৈল নৌকায় বোঝাই॥

কবি তাঁহার পুস্তককে তীর্থমঙ্গল বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন,—

তীর্থ মঙ্গল গানে, মনোযোগে যেই শুনে
তাঁহাকে সদয় হন শিব।

কবির রচনা লালিত্যহীন, কিন্তু তাঁহার বর্ণনাগুলি সর্বত্র স্পষ্ট ও যথাযথ।

শব্দসূচী

শব্দসূচী

[পার্শ্বলিখিত সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠাসংখ্যা-নির্দেশক]

অ

অকিঞ্চন চক্রবর্তী ৪৫৮-৬৭, ৭০৬

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৫৮৮

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৩৯২

'অদ্বৈত-মঙ্গল' ৮০

'অথর্ব বেদ' ১৬৮-৯, ১৭৮-৯

অনন্ত (দাস) ৩৮৪

অনন্তরাম ৬১৫

অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ৯০, ১২৬, ৩৩৬, ৩৪০, ৬৬৭

অনন্ত রায় ৩৮৪

'অর্জুন-সংবাদ' ৭৭২

'অনাদি-পুরাণ' ৬১১

'অনাদি-মঙ্গল' ৬২৬

অনুপ ভট্ট ২৩১

'অন্নদা-মঙ্গল' ১৯, ৫১, ৬০, ১২৩, ১৩৩, ১৫৯, ২৪২, ৩৬৩, ৪৩৪-৪০, ৪৪৪, ৪৪৯-৫১, ৪৫৮, ৪৮৫, ৪৯৪, ৬৮৩, ৬৯১, ৭৫৬, ৭৫৭

'অভয়া-মঙ্গল' ৪১৫, ৪৬৯, ৪৭৩, ৪৭৫

'অমর-কোষ' ৪৭৫, ৫০৪

অম্বিকাচরণ গুপ্ত ৩৯২

'অম্বিকা-মঙ্গল' ৪১৫

অযোধ্যারাম চক্রবর্তী ৬২৪

অরংসাহা ৬৭৪

অশোক ১

'অশ্বমেধ পর্ব' ২৫২-৩

অষ্টমঙ্গলা ৭৯, ৮৯, ৩০৯, ৩৯৩

'অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঞ্চালী' ৪২৫

'অষ্টলোকপালকথা' ৭৪৬

আ

'আইন-ই-আকবরী' ১৮৭, ২৫৪, ৩৭১

'আইচের ঝিরপুনী' ৪২৭

আওরঙ্গজেব ২৫৫, ৬৭৪

আকবর (সম্রাট্) ২৫৪, ৭৫৭

'আকবর-নামা' ৭৬০

'আগমপুরাণ' ৬০৩

আগমনী গান ২৭

আগমনী বিজয়া গান ১৬

'আচারাঙ্গ সূত্ত' ৫০৩

আজু গোঁসাই ৬৮১

'আদিত্যচরিত' ৩০৩, ৭৪৬

আদি রূপরাম ৬১১

আনন্দ, বুদ্ধশিষ্য ১৭৬

আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ ৬৬৫, ৬৬৯

আব্দুল লতিফ ৭৬২

আলীবর্দী খাঁ ৭৫৪, ৭৬৪

আলীভাই ৭০৩

আলেকজাণ্ডার ১৬৬

আশুতোষ পণ্ডিত ৬০৮
'আশ্বালয়ন গৃহ্যসূত্র' ১৬৯
আসাদুল্লা খাঁ ৬৩৯
আস্কর্ণ রায় ২৬৩
আহমদ (হাজি) ৭৫২

ই

'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গিরী' ৭৬০
ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ৪৩৪
ইস্‌লাম খাঁ ৭৬০-৬২

ঈ

ঈশা খাঁ ২৫৪, ৭৫৬
ঈশ্বর ঘোষ ৫৮৮-৯০
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৪২৯-৩১, ৪৪৮, ৪৫৩

উ

'উষাহরণ' ৩০৬

ঋ

ঋগ্বেদ ১৬৮-৯, ৫৬৪, ৫৭০
'ঋতু-সংহার' ৬৪

এ

একাব্বর (আকবর) ৩৭৩-৪
এল্‌উইন্‌, ভেরিয়র ৫৬৫
এলিয়েন ১৬৬
এসিয়াটিক সোসাইটি ১৫১, ২২৩, ২৯৬, ৫০১, ৫৯৯, ৬০৯, ৬৭৩

ঐ

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' ১৭২

ও

ওস্‌মান ৩৯১, ৭৬০

ক

কঙ্ক ৬৬২-৫
কচু রায় ৭৫৮
কত্‌লু খাঁ ৭৬০
'কথাসরিৎসাগর' ৬৬০
'কপিলা-মঙ্গল' ৭৪৭
কবিকঙ্কণ (শ্রী বাবলরাম) ৩৬৫
'কবিকণ্ঠহার' ২৯২
কবিগান ৪৪৮
কবিচন্দ্র (দ্বিজ) ৫৯৭
কবীন্দ্র ৬৯০-১
কবীর ৩৮৪
কমলনয়ন ২৩১
কমলনয়ন (দ্বিজ) ২৪৮
'কমলা-মঙ্গল' ৮১
কর্ণওয়ালিস, লর্ড ২৫৬
কর্ণপূর (কবি) ২৪৮
কলিকাতা (ইণ্ডিয়ান) মিউজিয়ম ১৯০
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২২৯, ২৮৮, ৩৩২, ৭২৩
'কাদম্বরী' ৬৬
কামদেব (দ্বিজ) ৩৮৪
কার্ত্তিক (দ্বিজ) ২৬১
কালিদাস (সংস্কৃত কবি) ৬৪, ১৪৮, ২৩২, ২৩৩, ৪৫৫, ৭২৩
কালিদাস (মনসামঙ্গলের কবি) ২৬১-২
কালিদাস (দ্বিজ) ১৪৮, ৭৪৬
'কালিকা-পুরাণ' ১২৭, ২২২-৪, ৪৬৯-৭০, ৫৮৯, ৬৫৬

'কালিকা-মঙ্গল' ৮১, ৪৪৪, ৪৫০, ৪৮৩, ৬৫৬-৯১, ৬৭৩-৬, ৬৯০, ৭৩৪
'কালিকা-বিলাস' ১৪৮
'কালী-কীর্তন' ৬৮২
কালীপ্রসন্ন ৩১৪
'কাশীখণ্ড' ১২৭, ৪১৮, ৪৩৮
কাশীনাথ ৬৬১
কাশীরাম দাস ৫৯৭, ৬১৪
'কালুরায়ের গীত' ৭৩৬
'কালুরায় মঙ্গল' ৭৩৬
'কিরাতার্জুনীয়ম্' ২৭৯
কিশোর দাস মিশ্র (মিত্র) ৪৭২
'কিশোরীমঙ্গল' ৮১
কীর্তিচন্দ্র ৪৩১-২, ৪৬০, ৪৭২, ৬২৯-৩০, ৬৩৯
কীর্তিচাঁদ ৪৩১
কুতুব খাঁ ৩৯৩
'কুমারসম্ভবম্' ১৪৪, ১৪৮, ২৩২-৩৩, ৪৫৫
কুলপতি সেন ২৫২-৩
'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' ৫৭৭
'কূর্মপুরাণ' ৫, ৫০৮
কৃত্তিবাস ৩২, ১১৯, ২৯১, ৪১৮, ৪৩ ৬১৪, ৬৪৪
'কৃত্যতত্ত্বার্ণব' ৯২
'কৃষ্ণকীর্তন' ৬৮২
কৃষ্ণচন্দ্র (মহারাজ) ৬০, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৪৪, ৭৫৯, ৭৬৫
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ৭৬৭
কৃষ্ণচন্দ্র রায় (রাজা) ৪৩০, ৬৮০, ৬৮২, ৭৫৮
কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৮০
কৃষ্ণনাথ ৭০৬
'কৃষ্ণমঙ্গল' ৮০-১
কৃষ্ণরাম দাস ৬৭৪-৫, ৭১৩-৫, ৭৩২, ৭৩৪
কেদার রায ৭৬০
'কৌমূদি-মিত্রানন্দ' ১৭৮
'কৌলীকতী ব্রাহ্মণ' ৫৯৯
ক্রুক (Crooke). উইলিয়ম ৫৬৫
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৫০৫, ৫৬১
'ক্ষিতীশ-বংশাবলী' ৭৫৯, ৭৬০
ক্ষেত্রনাথ ৬৪৩
ক্ষেমকর্ণ ৮৩
ক্ষেমানন্দ (কেতকাদাস) ২৩৫, ২৬২-৯, ৩১৬
ক্ষেমানন্দ (কালিকা-মঙ্গল রচয়িতা) ৬৯১
ক্ষেমানন্দ (দ্বিতীয়) ২৬৭

খ

খনার বচন ১১, ৪৩৮
খেলারাম ৯৬, ৬১১, ৬১৪

গ

গঙ্গাদাস সেন ২৫২-৩, ২৯৬-৮
'গঙ্গামঙ্গল' ৮১, ৭৪৭
গঙ্গারাম ৭১৩
গঙ্গারাম দত্ত ৭৪৯-৫৬
গম্ভীরা ১১০

গর্গ ৬৬৪
'গাছ বেড়া' ২১৬
গাম্ভারী-মঙ্গল। ৫৩৯
গায়ত্রী ৬৬৪
গিরিশচন্দ্র দাস ২৮৭
'গীত-গোবিন্দ' ৮৪
গুণরাজ ৬৬৩
গুণরাজ খান ২৮৮-৯
গুণিরাজ মিশ্র ৩৯০
গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ৬৮০
গোকুল-মঙ্গল ৮১
গোপাল (দ্বিজ) ৭০৬
গোপাল (পাল রাজা) ৫৮৭, ৫৯১
গোপাল (মাণিক গাঙ্গুলীর বৃদ্ধ-প্রপিতামহ) ৬১৫
গোপাল সিংহ ৬৩৬
গোপীনাথ দে ৬২৪
গোপীনাথ নন্দী ৩৮৭
গোপীনাথ রাও ৩৫১
গোবিন্দদাস (বৈষ্ণব কবি) ৯১
গোবিন্দদাস (কালিকা-মঙ্গলের কবি) ৬৭২-৩
'গোবিন্দ-বিজয়' ৩৫, ২৮৯
গোবিন্দ-মঙ্গল ৮০-১
গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০৭, ৬৪১-২,
গোবিন্দরাম (রায়) ৪২৭
'গোরক্ষ-বিজয়' ৩৫, ৬৮৭
গোলোকনাথ ২৬১
'গোসানী-মঙ্গল' ৪৭৭-৮৩, ৭৪৭
গোঁসাই পণ্ডিত ৬০৬
'গৌরীমঙ্গল' ৮১, ৪১৫, ৪৬৯

ঘ

ঘনরাম চক্রবর্তী ৪৬, ৯৫-৬, ৩৩৭, ৪৪২, ৫০৩, ৫৭১, ৫৮৬, ৫৯৩-৪, ৬০৫-৬, ৬০৮, ৬১০, ৬১৪-৫, ৬২৮-৩৬, ৬৪১

চ

চক্রধর দত্ত ২৯২
চক্রপাণি দত্ত ২৯২
'চণ্ডিকা খণ্ড' ৩৬১
'চণ্ডিকা-মঙ্গল' ৮১, ৪১৫
চণ্ডী (মার্কণ্ডেয়) ২২
চণ্ডীদাস, বড়ু ৯০, ১২৬, ৩৩৬, ৩৪০, ৬৬৭
চণ্ডীদাস, দ্বিজ ৩৪০, ৩৪৫, ৬০৮, ৬১৪, ৬২৩
'চণ্ডীবিজয়' ৩৫
'চণ্ডীমঙ্গল গীত' ৪৫৬
'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' ৩৯৫
চতুর্ভুজ সেন ২৯২, ২৯৫
'চত্বারিংশচ্ছত রাগনিরূপণম্' ৮৩
চন্দ্রকুমার দে ২৫৬, ২৫৯
চন্দ্রপতি ২২৬, ২৩৭-৮, ২৪৮
চন্দ্রধর ২৩৭
'চন্দ্রপ্রভা' ২৯২
চন্দ্রহাস ২৬৩
চন্দ্রাবতী ২৩৭, ২৫৭

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯৫, ৪৮৫
চিত্রসেন ৫৯৫
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ৬৬০
'চূড়ামণি তন্ত্র' ৪৩৮
চৈতন্যদেব ৩২, ৪৪, ১৬১-২, ২৬৬, ৩৫০, ৩৬৬, ৩৭৫, ৭০৯, ৭৬৭
'চৈতন্যচরিতামৃত' ৫০, ৮০
'চৈতন্য-ভাগবত' ১৮, ৬৬, ৮০, ৮৪, ১১৩, ২৯০, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৯৫, ৬৫৮, ৭০৯
'চৈতন্য-মঙ্গল' ৮০
'চোর-চক্রবর্তী ৬৬০
'চোর-চর্য' ৬৬০
'চোরের পাঁচালী' ৬৫৮
'চৌর চক্রবর্তী কথা' ৬৬০
'চৌর-পঞ্চাশিকা' ৬৬১-২
'চৌর্য-স্বরূপ' ৬৬০

ছ

ছকুরাম ৬১৭

জ

জগজ্জীবন ঘোষাল ২৬৮-৮৬, ৩৭২
'জগৎমঙ্গল' ৮১
জগৎ রায় ৭৬৪
জগৎ শেঠ ৭৫২
জগন্নাথ দাস ২৩৭
জগন্নাথ (দ্বিজ বা বিপ্র) ২২৬, ২৩৭
জগন্নাথ (বৈদ্য) ২৩৭
'জগন্নাথ বিজয়' ৪৭২
'জগন্নাথ-মঙ্গল' ৮১, ৪৭২
জগন্নাথ মিশ্র ৩৮৯, ৩৯৫
জগমোহন মিত্র ৩১৩
জনার্দন ৪৬৭-৬৯
জয়দেব ৮৪, ৩৯৯, ৪৫২, ৫৯৪
জয়নারায়ণ সেন ৪৫৩-৬
জয়পাল ৫৮৭, ৫৯১
জয়রাম গোস্বামী ৩৭৫
জয়ানন্দ ৮০
জাগগান ৮৮
জাগরণ ৮৭-৯
জাগরণের পুঁথি ৪৫৯
জানকীনাথ (বিপ্র) ২৩৭-৮, ২৪৮
জানকীরাম ৭৫৩
জি ঠাকুর ৬৬৯
জীবনকৃষ্ণ মৈত্র ২৩৫, ৩০৪-৬
জ্ঞানদাস ২৪৩
'জ্ঞান-সংহিতা' ১৪৯

ট

টোডর মল্ল ২৫৪

ঢ

ঢাকা গ্রন্থাগার ১৯০-১,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২২২, ২৫৬, ২৮৭, ২৯১, ৩৬১

ত

'তন্ত্রসার' ৬৫৭-৮
তারকচন্দ্র দাস ৫৭৩
তারানাথ (লামা) ৫৯১
'তিথি-তত্ত্ব' ৯২
তিলকচন্দ্র (মহারাজ) ৪৬০, ৪৬৭

'তীর্থমঙ্গল' ৭৬৬-৬৮
তেজশ্চন্দ্র ১৫১, ৪৬০
'তৈত্তিরীয় সংহিতা' ৫৭১

দ

দরঙ্গরাজ ২৩০
'দশকুমারচরিত' ৬৬০
দয়ারাম ৭১৮
দামোদর নন্দী ৩৮৮
দীনেশচন্দ্র সেন ১৪২, ২০০-১, ২২১, ২৪৯, ২৮৮, ২৯৬, ২৯৯, ৩০০, ৩৪০, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৯৪, ৪৬৮, ৪৮৪, ৬১৩, ৬২০, ৬৪১, ৭০৬
দুর্গাচন্দ্র ২৮৬
'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' ৪৬৯
'দুর্গামঙ্গল' ৮১, ৯৭, ৩৪২, ৪৬৯, ৪৯৪
'দুর্গাপুরাণ' ৪৬৯, ৪৯৪
'দুর্গাবিজয়' ৪৬৯
'দুর্গালীলা' ৪৬৯
'দুর্গাসপ্তশতী' ৩৫
দেবপাল ৫৮৭, ৫৯০-৯৩, ৬০২, ৭৬৩
দেবীদাস ৬২৪
'দেবীপুরাণ' ৩৬১
'দেবী-ভাগবত' ১৫৫, ১৮৭, ৩২৯, ৩৩৩, ৩৪৭, ৩৫১, ৭০৭
'দেবীমঙ্গল' ৪৬৯
'দেবী-মাহাত্ম্য' ৪৬৯

ধ

ধবল ঘোষ ৫৮৮
ধরাধর দত্ত ২৯২
ধর্মদাস ৬২৩
ধর্মপাল ৫৮৭-৯, ৫৯১
'ধর্মপূজাবিধান' ৩৩৮, ৩৪০, ৫৬১, ৫৭৫, ৫৮২, ৫৯৯, ৬০৫

ন

নগেন্দ্রনাথ বসু ৫০৯, ৫৮৭, ৫৯০, ৬০৩
'নদীয়া-কাহিনী' ৭৬৩
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯৯
নরসিংহ (বসু) ৬৩৯-৪০
নরীমঙ্গল ৮৫
নরেন্দ্র রায় ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩
নলিনীকান্ত ভট্টশালী ৫৯৭, ৭৬১
নসরত শাহ ৬৬৫-৬৬
'নাগাষ্টক' ৪৩১, ৪৩৪
নারায়ণ দেব ৯০, ৯৬, ২২৪, ২২৭-৩৮, ২৪৪-৬, ২৫৪, ২৮৬-৭, ৩০০-১, ৩৫০, ৪১৮, ৪৭০
নারায়ণ পণ্ডিত ৬২৪
নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ৬৯৬, ৬৯৯, ৭০২-৪, ৭০৬
নিধিরাম আচার্য ৬৮৮-৯
নিধিরাম গাঙ্গুলী ৬৪৩
নিধিরাম রায় ৪২৭
নির্ব্বোক শর্মা ৫৮৮
নিরঞ্জন-মঙ্গল ৬২৩
নীলাম্বর ২৬৪
নোয়াজিস্ আহ্‌মদ ৭৫২

প

'পঞ্চতন্ত্র' ৭২২

পঞ্চদেবতা ৬২
পঞ্চোপাসক ৩
'পণ্ডিত গোঁসাইগ্রন্থ' ৬০৬
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ২৩০
'পদ্মপুরাণ' ১৫৫, ১৮৭, ২৮৬-৭
পদ্মাবতী, জৈন দেবী ১৯২
'পরাগলী মহাভারত' ৬৪৫
পরাশর ৩৭৫, ৩৮৫
পাঁচালী ৩০-৪, ৮৩, ৯৭, ৪৪৮
'পাণ্ডব বিজয়' ৩৫
পার্বতী (দ্বিজ) ৩৮৪
'পার্বতী-পরিণয়' ৪৫৫
'পার্বতীর সংকীর্তন' ৪৬১
'পিচ্ছিলা-তন্ত্র' ৬৯৩
'পীরের পাঁচালী' ৬৬৪
পাণিনি ১৮০
পুরুষোত্তম ২২৬, ২৪৮, ২৯৪
'পোলেকণ্ড-মঙ্গল' ৮৫
প্রতাপচন্দ্র মিশ্র ৫২৪
প্রতাপ নারায়ণ ৪৩০, ৬২৬, ৭৫৭-৬২
প্রতাপ রুদ্র ৫৮০, ৫৮৫
প্রতাপ সিংহ ৫৯০
প্রভুরাম ৬২৭
প্রাণচন্দ্র ১৫১
প্রাণনাথ ২৬৮
প্রাণরাম চক্রবর্তী ৬৭৬

ফ

ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস ২৮৭, ৩০১
ফার্গুসন, জে ১৬৩
ফা-হায়েন ৫০৩
ফিরোজ শাহ ৬৬৫-৬

ব

বংশীদাস (দ্বিজ) ৯৬, ২২৬, ২৩৫, ২৩৭
বংশীধর (বংশীদাস) ২৩১
বংশীবদন (ঐ) ২৩১, ২৬৮
বঙ্কিমচন্দ্র (চট্টোপাধ্যায়) ৪৫২-৩
বঙ্গবাসী ৩৯২
'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ২৯৬, ৩৭৭
'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়' ২৮৮, ২৯৬, ২৯৯
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৩৪৩
বচনিকা ১৩৪
'বনবিবি জহুরানামা' ৭৩১
বলভদ্র ২৬৩
বর্ধমান দাস ২৪৮
'বরদা-মঙ্গল' ৭৪৭
বররুচি ৬৬১, ৭২৩
বলরাম, কবিকঙ্কণ ৩৮৫
বলরাম চক্রবর্তী ৬৭৬-৮
বল্লভ ৭০৫-৬
বল্লভ ঘোষ ২৩০-১
বল্লাল সেন ২৯২, ৪৫৭, ৫৯৫
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৯৪, ৩৯৫, ৫৯৩, ৬০৮, ৬১৪, ৬২০, ৬৪১
বসন্তকুমার সেনগুপ্ত ২৯২
বসন্ত রায় ৭৫৮
বসুমতী ৬৬৩
'বহাপরব' ১১১

বয়নদ্দীন মুন্সী ৭৩১
'বাইশ কবি মনসা' ২৯১, ৩১৫
বাইশা ২৯০-১, ৩১৫-৬
বাঁকুড়া রায় ৩৮৮
বাক্‌পাল ৫৯১
'বাঘাইর বয়াং' ৭৩৬
বাণভট্ট ৬৬, ১৭৭-৮
বাণেশ্বর রায় ৩১১-৩
বারা খাঁ ২৬৩, ২৬৬
'বারেন্দ্র কুল-পঞ্জিকা' ৬০৯
বালাজি বাজিরাও ৭৫৪
বাল্মীকি ২৩৫, ৩৬৫
'বাসুলী-মঙ্গল' ৪৭০-৭
'বাহার-ই-স্তান' ৭৬০-১
বিক্রম খান ২৯১
বিক্রমাদিত্য ৬৬১
বিজয় গুপ্ত ৯৫-৬, ২১২-৩, ২২১-২, ২২৪, ২২৬, ২৩১, ২৩৪, ২৩৮-৪৯, ২৫০, ২৫৪, ৩০১, ৩৫০, ৬৬৫
বিজয়রাম সেন ৭৬৬-৮
বিজয় সেন ১৮৮-৯
বিদ্যাপতি ১১৭, ৩৬৫, ৪৫২, ৪৯৬
'বিদ্যাভূষণী মনসা' ৩০৪
'বিদ্যাসুন্দর' (কালিকা-মঙ্গল দ্রষ্টব্য) ৬৭, ১২৬, ৪৪৪, ৪৫০, ৪৯৭, ৬৮৩
'বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানম্' ৬৬১
বিপ্রদাস ১৮০, ২১৯, ২৪৯-৫২
বিরজাকান্ত ঘোষ ২৮৭
বিল্‌হণ ৬৬১-২
'বিশ্বকোষ' ৩৪৪
বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার ৬২৩
বিশ্বেশ্বর দাস ৬৯১
বিষ্ণুদাস (রাজা) ২৬৪
বিষ্ণুপাল ৩৭, ২১৬, ৩০৮-১১
বিষ্ণুশর্মা ৭২২
বীরসিংহ (মল্লভূমির রাজা) ১৩৮
বীরেশ্বর ৭২৩
'বৃত্রসংহার' ৪৪৯
বৃন্দাবন দাস ১৮-৯, ৮০, ১১৩, ২৯০, ৩৪৯, ৩৯৫, ৪১৮, ৭০৯
'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' ৭৭, ৯২, ৯৪, ১০৯, ৩২৯, ৩৫১, ৩৬১
'বৃহন্নারদীয় পুরাণ' ১২৭, ১৫৫, ৭০৪
বুদ্ধদেব ১, ১০৫, ১৭৬, ৫৬১, ৫৭৫, ৫৮১, ৫৮৩
বুঢ়ুয়া-মঙ্গল ৮৪
বেদব্যাস ৬০, ২৩৫, ৩৬৫, ৬০২
'বৈদ্যজাতির ইতিহাস' ২৯২
'বৈদ্যজাতির কুলপঞ্জী' ২৯২, ২৯৫
বৈদ্যনাথ ৩১৪
'বৈদ্যনাথ-মঙ্গল' ১৪৯
'বৈষ্ণবামৃত' ৪৭২
'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' ৫৭৮
ব্যোমকেশ মুস্তাফি ৬৯৮, ৭০৫, ৭৫৫
ব্রজবুলি ১৩২
ব্রজলাল ৪২৭
'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ৪৪৬, ৪৭৮
'ব্রহ্মপুরাণ' ১৫৫

'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ' ৯২, ১০৯, ১৮৭, ৩২৭, ৩২৯, ৩৩৩, ৩৪২, ৩৪৭, ৩৫১, ৬৫৬, ৭০৪, ৭০৭

ভ

'ভব-কলহ-ভঞ্জিকা' ৪৫৪
ভবানন্দ মজুমদার ৪৩৭, ৭৫৭-৬২
ভবানী বেণে ৪৯৮
'ভবানী-মঙ্গল' ৮১, ৩৪২-৩
ভবানী মিশ্র ৭০৩
ভবানী, রাণী ৩০৫
ভবানীশঙ্কর দাস ৩৪৩, ৪৫৬-৭
'ভাগবত পুরাণ' ২২, ৫৬৫, ৬৬২
'ভাগবতামৃত' ১৩৮-৯
ভাদুগান ৮৮
'ভাব-প্রকাশ' ১৭৪, ৬৯৩
ভারতচন্দ্র রায ১, ১৯, ৩৩, ৪৬, ৫১-২, ৬০, ৬৭, ৯৩, ৯৬-৮, ১২৩, ১২৭, ১৩৩-৪, ১৫৯, ২০১, ২৪২-৩, ৩৬৩, ৩৮০, ৩৮২-৫, ৩৯৮, ৪১৩, ৪২৯-৫৩, ৪৫৫-৮, ৪৬৬-৭, ৪৮৫, ৪৯৪, ৬২৬, ৬২৮-৩৪, ৬৪৫, ৬৬৭-৮, ৬৭৫-৭, ৬৮৩-৯০, ৭৫৬-৭
ভারতীয় গ্রন্থাগার ১৯০
'ভারতীমঙ্গল' ৭২৩
ভারবি ২৭৯
ভারামল্ল ২৬৪, ২৬৬
ভাস্কররাম কোল্‌হৎকার ৭৫০-৪
ভুবনানন্দ ২৯৪
ভূপতি রায় ৪৩৩
ভূমানন্দ ২৯৪

ম

'মখজান-ই-আফগান' ৭৬০
'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' ৩৩২, ৩৭৯
'মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা' ৩৪৩
মণিরাম (দ্বিজ) ১৪৯
মথুরা বসু ৬৩৯
মধুরাম ৪২৭
মধুসূদন (মাইকেল) ৯১, ৪৪৬, ৪৪৮, ৪৫৩
মনে মঙ্গল ৮৫
মনোহর (দ্বিজ) ২৩৭
মরণচাঁদ চৌধুরী ৪২৬
'মহারাষ্ট্র-পুরাণ' ৭৪৯-৫৬
মহাবীর ৫০৩
মহাসিংহ ৪২৭
মহীধর ৬১০
মহেন্দ্র ৫৯৮
মহেন্দ্র রায় ৪৩০
মহেশ-মঙ্গল ১৫১
মযূরভট্ট ৯৫, ৫৬৪, ৫৯২, ৬০৩, ৬০৬-১১, ৬১৫, ৬২১, ৬২৪, ৬৪১, ৬৪৪
মাগন ঠাকুর ৬৭০
মাণিক দত্ত ৫০-১, ৯৫, ৩৪৪, ৩৫০-১, ৩৫৩, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৬-৭৩, ৩৯৫, ৪৭৩
মাণিকরাম গাঙ্গুলী ৯৬, ৫০৭, ৬০৬-২২
মাণ্ডা পরব ১১০
মাধব ৪৬৮, ৪৯২

মাধব আচার্য ৩৭৭-৮, ৭৩২
মাধব, দ্বিজ ৮২, ৯৬, ৩৩২, ৩৪৪, ৩৪৮, ৩৫৩, ৩৭৩-৮৬, ৪১৬, ৪২০, ৪২৮, ৪৫৭
মাধব রায় ৪২৬
'মাধব-বংশ-তত্ত্ব' ৩৭৫
মাধবাচার্য ৩৭৭-৮, ৩৮৫
মাধবানন্দ ৩৭৭
মাধবানন্দ (দ্বিজ) ৩৭৭, ৩৮৪
মানসিংহ ২৫৪, ৩৯০-১, ৩৯৩-৪, ৬৮৩, ৭৫৭-৬২
মানসিংহ কাব্য' ৭৫৬-৬৬
'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী' ২২২, ৩৪৮, ৪৭৫
'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' ৩৫, ৯৭, ৩২৯, ৩৩৩, ৩৬০, ৪৬৯, ৬৭৩
মারীযাত্রা ১১০
মালাধর বসু ৩৪, ৬০, ৮৭, ২৮৯, ৭৪৬
মাহ্মুদ সরীপ ৩৯৬
'মায়াতিমির চন্দ্রিকা' ৫৫৪
মির্জা নথন্ ৭৬০
মুকুট রায় ৪৩০
মুকুন্দ (কবিচন্দ্র) ৪৭০-১, ৪৭৫
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ৪৬, ৫০-১, ৫৫, ৭০-২, ৮২, ৯৫-৬, ২০১, ২৪২, ২৬৩, ২৬৬, ৩৪৪, ৩৫৩, ৩৬৫-৭, ৩৮০, ৩৮২-৫, ৩৮৬-৪১৫, ৪২০-১, ৪২৩, ৪৩৫-৭, ৪৩৯-৪২, ৪৪৪, ৪৫১-৩, ৪৫৭-৮, ৪৬১-২, ৪৬৬-৮, ৪৭১-৬, ৪৯১-২, ৫০৩, ৬১৪, ৬২০, ৬৩৩, ৬৪০, ৭১৬
মুক্তারাম সেন ৪২৪-৮
'মুন্তা-খাবুৎ-তাওয়ারিখ' ৭৬০
মুসাহাব খাঁ ৭৫১
মুস্তাফা খাঁ ৭৫০, ৭৫৩
'মৃগলুব্ধ' ৯৭, ১৫৩-৯
'মৃগলুব্ধক' ১৫৩
'মৃগলুব্ধ সংবাদ' ১৫৩
'মেঘদূতম্' ৬৪
'মেঘনাদবধ কাব্য' ৯১
মেদিনীশ্বর দত্ত ২৯২
'মৈত্রায়ণী-সংহিতা' ৫৭১
'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ৬৩
ম্যাক্‌ডোনেল, এ. এ. ৫৭১

য

যক্ষপাল ৫৯১
যজুর্বেদ ১৬৮
যদুনাথ ২৩১
যশশ্চন্দ্র ১২৫
যশোবন্ত সিংহ ১৪১-৩
যাদব রায় ৪২৬-৭
'যোগকল্প লতিকা' ৫৫৪
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ৩৬২
যোগেশচন্দ্র রায় ৫৮৮, ৫৯৭, ৬০০, ৬০৮, ৬১৩, ৬২০, ৬২৮

র

রঘুজী ভোঁসলা ৭৫৪
রঘুনন্দন (স্মার্ত) ৯২, ৩৫২, ৭৪৮
রঘুনন্দন (আদক) ৬২৬
রঘুনন্দন (মিত্র) ৭৬৫

রঘুনাথ (রাজা) ৩৮৮-৯, ৩৯৫
রঘুনাথ (নাপিত) ৪৩৩
রঘুনাথ (দত্ত) ৭০৬
রঘুনাথ (দেবরায়) ৩৯৩
রঘুসুত (কবি) ৬৬৪
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪৮
রজনীমোহন চক্রবর্তী ২৯০-১
রতন লাইব্রেরী ৬০৯
রতিদেব ৯৭, ১৫৬-৯
রত্নেশ্বর ৬২০-১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮, ১৩, ২০, ১০৩, ৩১৯, ৩৯৮, ৪৪৮, ৪৫২, ৪৮৬, ৪৮৮
রমেশচন্দ্র দত্ত ৯৭, ৪১৪, ৪৪০
'রসমঞ্জরী' ৪৩২
রসিক, দ্বিজ ৩০৭-৮
'রসিক-মঙ্গল' ৮১
'রসুল-বিজয়' ৩৫
রাখালদাস কাব্যতীর্থ ৬০৯
'রাগমালা' ৮৩
রাঘব সিংহ ৫৯৮
রাজনারায়ণ বসু ৩৯৪
রাজনারায়ণ (রাজা) ৭০৩-৪
রাজবল্লভ ৪৫৪
রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ১৯০
রাজসিংহ (রাজা) ৭২৩
রাধাকান্ত (দ্বিজ) ৬৮৯-৯০
রাধাকৃষ্ণ দাস (বৈরাগী) ৪৭৭
রাধানাথ রায়চৌধুরী ৩১৪
'রাধিকা-মঙ্গল' ৮১
রামকান্ত রায় ৬৪২-৩
রামকৃষ্ণ (দ্বিজ) ২৫৩
রামকৃষ্ণ (চক্রবর্তী) ৬২৯
রামকৃষ্ণ পরমহংস ৩২, ১২৭, ৫০০, ৬৮১
রামকৃষ্ণ, রাজা ৩০৫
রামকৃষ্ণ রায় ১২৪-৩৮, ৭৬৩
রামগতি ন্যায়রত্ন ১২৩, ২৬২
রামগোপাল ৬২৯
রামগোবিন্দ ৬২৯
রামচন্দ্র (জৈন) ১৭৮
রামচন্দ্র (দ্বিজ) ১৫১
রামচন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) ৬৩৬
রামচন্দ্র (মুন্সী) ৪৩২-৩
'রামচরিত' ৫৮৬, ৫৮৮
রামজীবন বিদ্যাভূষণ ৩০৩-৪, ৭৪৬, ৭৬৩
রামদাস আদক ৫৮৬, ৬২৬-৭
রামদাস কৈবর্ত ৬৭৭
রামদেব, দ্বিজ ৩৪৪, ৪১৫-২৪
রামদেব নাগ ৪৩৪
রামনাথ ২৬৮
রামনারায়ণ (কবি) ৬৪২
রামনারায়ণ তর্করত্ন ৫৭৭
রামনিধি ২৩১
রামপাল ৫৯০
রামপ্রসাদ সেন ১৬, ১৪৮, ৪৯৪, ৪৯৭-৫০০, ৬৬৮, ৬৭৫-৭৭; ৬৭৯-৮৩
রামপ্রিয় ৬২৯

রাম রাজা ১৫৫
রামসিংহ ১৪১-২
রামাই পণ্ডিত ৬০১-৪, ৬০৬
রামেশ্বর ভট্টাচার্য ১২, ৩৩, ১৪১-৫২, ৪৫৯, ৪৬৬-৬৭, ৬৮৩
'রায়-মঙ্গল' ৮১, ৬৭৪-৫, ৭২৪-৩২, ৭৩৪
'রাঢ়-মিউজিয়ম্' ৪৭০
রিজ্‌লি (Risley, H. H.) ৫০৭, ৫০৯, ৫১৫, ৫৫৯, ৫৭৭
রুকনুদ্দীন বারবাক শাহ ২৮৯
রুদ্ররাম চক্রবর্তী ৭১৩-৪
'রূপমণ্ডম্' ৩৫১
রূপনারায়ণ ঘোষ ৯৭
রূপরাম ৫৬৩, ৫৭০, ৫৮৬, ৬০৭, ৬১১, ৬১৫, ৬১৯-২২
রূপরাম, আদি ৬১১
রেবতী ২৬৮

ল

লক্ষ্মণ সেন ৫৮৮, ৫৯৫
লক্ষ্মণ হাজরা ২৫৪
লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার ৪২৬
লক্ষ্মীচরিত্র ২৮৯
লক্ষ্মীনাথ (দ্বিজ) ৩৮৪
'লক্ষ্মীমঙ্গল' ৭৪৭
লছমীনারায়ণ ৪৩১
লঙ্ (রেভারেণ্ড্) ১৫১
'লিঙ্গ-পুরাণ' ৬৫৬
লোচনদাস ৯১

শ

শঙ্কর আচার্য ৭০৬
শঙ্কর চক্রবর্তী (কবিচন্দ্র) ১৩৮-৪০, ৬৪৩, ৭০৬, ৭১৪-১৫
শতক্রতু ৫৯৮
'শনির পাঁচালী' ২৬২
শরৎচন্দ্র মিত্র ৫০৮
শরৎচন্দ্র রায় ৩৩২, ৫০৫
শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ ৬১০, ৬১৫
শাক্তপদাবলী ১২৬, ৪৯৪-৫০০
'শান্তি পর্ব' ১২৭
শিবচন্দ্র সেন ৪৭০
শিবচরণ দাস ৩০৪
শিবচরণ সেন ৪৬৯
'শিব-পুরাণ' ১৫৫
শিব ভট্ট ৪৩৩
শিবমঙ্গল কাব্য ১২০-৩
'শিবরামের যুদ্ধ' ১৫১
'শিব-শঙ্করীর রাস' ১৫১
শিব-সংকীর্তন ১৪১-৫২
শিবাজী ৭৫৪
শিবানন্দ ২৩৭
শিবানন্দ কর ২৮৯
শিবায়ন (শিবমঙ্গল দ্রষ্টব্য) ৮১, ১২৪, ৪৫৯, ৬৮৩
'শীতলা-মঙ্গল' ৮১, ৪৬৭, ৬৫৫, ৬৯২-৭০১
শুক্লাম্বর মিশ্র ২৯২

'শূন্যপুরাণ' ১১৫, ১৩০, ১৩৪, ২১২, ৫৭১, ৫৭৬, ৫৯১-২, ৫৯৯, ৬০০, ৬০৩-৫, ৬১০
শোভা সিংহ ৭৬৩-৪
শ্যাম পণ্ডিত ৬২২-৩
'শ্যামার সঙ্গীত' ৬৮৯
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ১২৬, ২৪৩, ৩৩৬, ৬০৮, ৬৬৭, ৬৮৫
শ্রীকৃষ্ণচরণ ২৩৮
'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ৩৫, ৮৭, ২৮৯
'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' ৩৭৪-৬
শ্রীচন্দ্রদেব ২০২
শ্রীধর (কবিরাজ) ৩৫০, ৬৬৫-৮
'শ্রীধর্মপুরাণ' ৬০৮, ৬১১, ৬৪৪
শ্রীনাথাচার্য ৯২
শ্রীবৎস ৪৮১
'শ্রীমদ্ভাগবত' (পুরাণ) ৩৫, ৬০, ১৩৮-৯, ২৮৯, ৩৪৪, ৩৭৪
শ্রীমন্ত ৪২৬

ষ

ষট্‌কবি ৩১৫
ষট্‌পদী ৩১৫
'ষণ্মুখকল্প' ৬৬০
ষষ্ঠীবর দত্ত ২৮৬-৩০৩, ৪১৮
ষষ্ঠীবর সেন ২৫২, ২৯৬-৯
ষষ্ঠীমঙ্গল ৮১, ৭০৭-১৭

স

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪০৬
'সত্যপীরের কথা' ৪৩১
'সত্যপীরের পাঁচালী' ১৪২
সদাশিব রায় ৪৩১
সন্ধ্যাকর নন্দী ৫৮৬
সপ্তশতী ২২২
সভারাম ৬২৪
সর্‌ফরাজ খাঁ, নবাব ৭৫৪
সহদেব চক্রবর্তী ৬০১, ৬৩৭-৯, ৬৪৬
'সংবাদ প্রভাকর' ৪৩০
'সাধনমালা' ১৭৭, ৩৩৪-৬
সাবিরিদ খাঁ ৬৬৯-৭২
'সারদা-চরিত' ৩৭৯, ৪১৮, ৭২৩
'সারদার পাঁচালী' ৭২৩
'সারদা মঙ্গল' ৮১, ৩৫৩, ৩৭৯, ৪২৪, ৪৭০, ৭১৮-২৩
সাহিত্য পরিষৎ (বঙ্গীয়) ৫৮৭, ৬০৩, ৬০৭, ৬১২, ৬১৪, ৬৬০
সাহু, রাজা ৭৪৮, ৭৫৪
সায়েস্তা খাঁ ৬৭৪
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৩৯২, ৬০৯
সাহী যাত্রা ১১০
সীতারাম দাস ৬০৭, ৬২৩-৫
সুকনান্নি (হুকনান্নি) ২২৯
সুদাম ৬১৫
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫০৫
সুবুদ্ধিনারায়ণ ২৯২
সুলেমান ৭৬০
'সূর্যমঙ্গল' ৮১, ৩০৩, ৭৩৭-৪৬
'সূর্যশতক' ৫৬৪
সেকেন্দর লোদী ৬৯২

সেক্সপীয়র ৫৭
সোম ঘোষ ৫৮৮
'স্কন্দ-পুরাণ' ৩১, ১০২, ১২৭, ১৫৭, ৪৩৮, ৬৬৪, ৬৯৩
স্টোনর, সি. আর. ৫৭৩
'স্তবকবচমালা' ৬৯৩
'স্মরণ-মঙ্গল' ৮১

হ

'হরগৌরীবিলাস' ১৫৩
'হরপার্বতীমঙ্গল' ১৫১
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৫০১-২, ৫০৪, ৫৬১, ৫৭৪, ৫৮৮, ৬০৩, ৬০৯, ৬৭৪, ৬৯৮, ৭৩৪
হরিচরণ আচার্য ১৪৩
হরিদত্ত ২২১-৭, ২৩৮, ২৪৮
হরিরাম ৪২৮
'হরিহর-মঙ্গল' ১৫১
হরেন্দ্রনারায়ণ, মহারাজ ৪৭৭
'হর্ষচরিত' ১৭৭